সেরা নবীনদের
সেরা গল্প

সম্পাদনা

অজয় দাশগুপ্ত

সুবর্ণা প্রকাশনী
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৩

প্রকাশক : বিমলকান্তি সাহা
সুবর্ণা প্রকাশনী
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

লেজারটাইপ সেটিং : তরুণ মজুমদার
ক্রসলাইন
৬৩/২ডি, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সূ চী প ত্র

সেরা নবীনদের সেরা গল্প

নেশা ॥ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিরাম বলল- না, আপনি অন্যত্র চেষ্টা করে দেখুন।

দশ আঙুলে আটখানা আংটি পরা সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে লোকটা কেমন একটু অবাক হয়ে তাকাল- যদি ডবল দিই? চার হাজার?

টাকার কথা হচ্ছে না। কাজটা আমি করব না।

মানুষ চরিয়ে খায় বলে লোকটার মনে গর্ব আছে। শহরে কত খাতির তার, সব জায়গায় সম্মান আর খাতির পায়। মুখের ওপর 'না' শোনার অভ্যেস নেই একেবারেই। সে বুদ্ধিমানের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল- নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। রেট বাড়িয়েছ তা বললেই পারতে। কত দিতে হবে?

অভিরাম স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল—আপনি বড্ড লোকের সময় নষ্ট করেন। আপনার এখন অন্য কোনো কাজ নেই?

অসহ্য অপমানে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বালা করলেও কিছু করবার নেই। যারা অন্যায় করে তাদের অপমানবোধ থাকলে চলে না। লোকটা যেন অভিরামের রসিকতা বুঝতে পেরেছে এমনভাবে বলল—তুমি কি তাহলে কাজ ছেড়ে দিচ্ছ?

তাই।

– এরপর খাবে কি? লটারি পেয়েছ নাকি? আর নীতির কথাই যদি বল, তাহলে মাখন সর্দারের আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। ব্যাটা কী পাপ না করেছে বল তো? এখন আমার পেছনে লেগেছে

প্লাস্টিকের চৌকো বাক্স থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল অভিরাম, বলল—নিজে থেকে লাগেনি, মাখন সর্দারের কী স্বার্থ আছে এতে? যে তাকে টাকা দিয়ে লাগিয়েছে সে লোককে আপনি ভাল করে চেনেন। যদি নিকেশ করতে হয় তাকেই করুন গিয়ে—

তারপর একটু থেমে বলল—যদি হিম্মত থাকে।

লোকটা এ বক্রোক্তিও গায়ে মাখল না। তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছে:—সে তো খুব ভাল। পারবে তুমি? ছ'হাজার পর্যন্ত উঠতে পারি—

পাশে রাখা কোদাল হাতে উঠে দাঁড়াল অভিরাম। আমি এখন বাগান কোপাবো, কাল লঙ্কার চারা লাগাতে হবে। আপনি আসুন—

লোকটা এবার সহজভাবেই উঠে দাঁড়াল, হালকা চালে বলল- আমাকে ফিরিয়ে ভাল করলে না অভিরাম। কাজটা করে দিলেই পারতে।

এবার অভিরাম সত্যিই হাসল, বলল—ভয় দেখাচ্ছেন নাকি? ওতে লাভ নেই, এ তল্লাটে যারা নিকাশী কাজ করে তারা আমার গায়ে কেউ হাত দেবে না—আমার কাছেই সবার শিক্ষা কিনা। আমরা যারা এইসব নোংরা কাজ করি, আমাদের মধ্যে বেশ একটা ভালবাসা আছে—আপনাদের মত নয়। আমরা কেউ কারো সঙ্গে বেইমানি

করি না। তাছাড়া যেদিন এ কাজে নেমেছি, মরার ভয় ছেড়েই নেমেছি।

বিড়িতে শেষ দুটো সুখটান দিয়ে বলল—যান, বাড়ি যান—

অভিরাম দু'পুরুষে এই কাজ করছে। বাপকে বেশিদিন পায়নি, কিন্তু বাপের সব গুণগুলো পেয়েছিল। নিখুঁত সময়-বোধ, শক্ত স্নায়ু এবং কোন কাজটা করবে আর কোনটা করবে না এই বোধ ছাড়াও অন্য একটা গুণ বিশেষ প্রয়োজন, সেটা হল উদাসীনতা। অভিরাম মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এটা একরকম ব্যবসা। অন্য ব্যবসায় মূলধন -টাকা! এই ব্যবসায় মূলধন—সাহস। একজনকে খতম করবার জন্য আর একজন তাকে টাকা দিচ্ছে, এতে মনের দিক দিয়ে তার জড়িয়ে পড়বার কোনো কারণ নেই। যাকে সরাতে হবে, দিনের পর দিন তার গতিবিধি লক্ষ করে, অভ্যেসগুলো বিচার করে, চক্রাকারে উড়তে উড়তে বাজপাখি যেমন তার বৃত্তকে ক্রমশ ছোট করে আনে, তারপর লাফিয়ে পড়ে শিকারের ওপর—তেমনি অভিরাম বহু পরিশ্রম আর পর্যবেক্ষণের ফল হিসেবে যখন শিকারকে হাতের মুঠোয় পায়, তখন তার মনে নিষ্ঠুরতা নেই, হিংসা নেই, ক্রোধ নেই—আছে শুধু পরিষ্কারভাবে কাজ শেষ করার চমৎকার আনন্দ। প্রতিটি হত্যার পর তার মনে আশ্চর্য প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। কাজ শেষ হতে দেরি হলে, কিম্বা বাধা পড়লে ভয়ানক বিরক্তি জন্মায়। জীবনের দ্বিতীয় কি তৃতীয় কাজের কথা এখনো মনে পড়ে। তখন নতুন হাত, ভোজালি ঠিকমত চালাতে পারেনি, কচুবনের পাশে লোকটা পড়ে গোঙাচ্ছিল। কাটা জায়গা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে জমি, তবু ব্যাটা মরে না! একমুঠো ঘাস ছিঁড়ে ভোজালি মুছতে মুছতে নিস্পৃহভাবে দেখছিল অভিরাম। সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হতে বড্ড দেরি হচ্ছে দেখে মজুমদারদের ভাঙা ভিতের থেকে একখানা থান ইঁট এনে তাই দিয়ে লোকটার মাথা থেঁতলে দেয় সে। এইখানেই উদাসীনতার কথা এসে যায়। থান ইঁটের একটা ঘা-ই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে লোকটার কড়া জান, যদি আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে নাড়িভুঁড়ি হাতে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে হাজির হয়? এমন কাণ্ডের কথা সম ব্যবসায়ীদের কাছে শুনেছে অভিরাম। তাতে অবশ্য তার কিছু আসে যায় না, কারণ অন্ধকারে আচমকা পেছন থেকে মুখ চেপে ধরে ছুরি চালিয়েছিল সে। লোকটা তার মুখ দেখতে পায়নি, কাজেই তার নাম ফাঁস করে দেবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। এমন ঘটলে কাজটা সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হবে না, যে কাজের জন্য সে টাকা নিয়েছে। কাজেই খুব শান্তভাবে উবু হয়ে বসে আট-দশটা ঘা দিয়ে সন্দেহাতীত ভাবে কাজ শেষ করল অভিরাম।

তারপর চরখালির শুকনো বিলের ওপর দিয়ে, ঘুমন্ত গাজিপাড়ার পাশ দিয়ে, হাতিবাগেড়ার গোভাগাড় বাঁয়ে রেখে নিজের নিঃসঙ্গ ঝুপড়িতে ফিরে খাস জনতা স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল বসাল সে। অভিরাম, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, মদ খায় না। অন্য কোনো নেশাও করে না। কিন্তু মনে খুব আনন্দ হলে তক্ষুণি তার চা খাওয়া চাই। দোকানের চায়ে তার পোষায় না। পৌনে একসের জল ধরে এমন একটা গ্লাসভর্তি চা প্রয়োজন। সে চা তৈরি হবে শুধু মোষের দুধ দিয়ে। দুধ ফোটানোর সময় তাতে ফেলতে হবে ছোট এলাচ, তেজপাতা আর দারচিনি। যেদিন কাজ হবে সেদিন রাতে ব্যবহারের জন্য অভিরাম আগে থেকেই দুধ এনে রেখে দেয়। অত রাত্তিরে কোথাও কি পাওয়া সম্ভব? অথচ প্রতিবার হত্যার পর মনে যে অদ্ভুত আনন্দ হয় সেটাকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে চা চা-ই-ই চাই।

এই ঝুপড়িতে অনেকদিনের বাস অভিরামের। তার বউ আছে, ছেলে আছে—

তারা সব থাকে দেশের বাড়িতে। এখানে তারা কখনো আসে না। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে বছরপাঁচেক আগে, জামাই কলকাতা-শিলিগুড়ি লাইনে ভারী ট্রাক চালায়। শ্বশুরের প্রকৃত ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা বোঝা যায় না, তবে এ নিয়ে সে কোনো কথা বলে না বা প্রশ্ন করে না। দেশে যে টাকা পাঠায় অভিরাম, তা দিয়ে বউয়ের নামে বেশ কিছু জমি কেনা হয়েছে। ছেলে সে জমি চাষ করে। সম্প্রতি মুরগির চাষ করবে বলে তোড়জোড় করছে। ভাল। দু'পুরুষ এইভাবে গেল। ছেলেকে এ ব্যবসায়ে এনে লাভ নেই। আজকাল দিন বদলেছে কাজে, ঝুঁকিও আগের চেয়ে বেশি। চাষের কাজ করে ছেলেটাও কেমন নরম ধাতের হয়ে পড়েছে, ভোজালি চালাতে পারবে বলে বিশ্বাস হয় না। যাক, সে যা রেখে যাচ্ছে বুদ্ধি করে খেলে ছেলের কষ্ট হবে না।

ঘন ঘন কাজ নেয় না অভিরাম। লোভ করলেই মৃত্যু। নেহাত চেনা লোকের সুপারিশ নিয়ে না এলে সে কাজ হাতে নেয় না। ডবল টাকা কবুল করলেও অচেনা মানুষের কাজ নেবে না অভিরাম। চারদিকে কত শত্রু, কে কোথায় ফাঁদ পেতে রেখেছে কে জানে? বছরে খুব বেশি হলে পাঁচ-ছ'টা কাজ করে সে। তার দর চড়া বলে, সামান্য কাজেই পুষিয়ে যায়। যারা আসে তাদের গলায় কাঁটা বিঁধে আছে, চড়া দর শুনে পিছিয়ে গেলে তাদের চলে না। আর অভিরামের সততার খ্যাতি আছে, টাকা দিলে কাজ হবেই। বাকি সময়টা অভিরাম পাম্প সেট সারানো, গ্যাস ওয়েল্ডিং ইত্যাদি কাজ করে।

শেষ বড় কাজ সে করেছে মাস দুই আগে। কথাবার্তা হবার দিনটার কথা এখনো ছবির মত ভাসছে চোখের সামনে।

সারাদিন আকাশ মেঘলা, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধে থেকে বেশ ঝুপঝুপ করে নামল। গোভাগাড়ের দিক থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। বড় একগ্লাস চা বানিয়ে দাওয়ায় বসে খেল অভিরাম। স্টেশন চত্বরের হোটেল থেকে মাটির ভাঁড়ে কষা মাংস আর খবরের কাগজে জড়িয়ে আটখানা রুটি নিয়ে এসেছিল। সেগুলো সাবাড় করে একলোটা জল খেয়ে শোবার উদ্যোগ করতে লাগল অভিরাম। বিছানার পাশে শুইয়ে রাখল তেল চুকচুকে লাঠিটা, বালিশের তলায় গুঁজে রাখল ধারালো ভোজালি। তার ঘুম খুব হালকা, এ দুটো জিনিস হাতের কাছে থাকলে দশজন মানুষেও তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। একটু আগে চরখালির বিলের ওপর দিয়ে দশটার লোকাল যাবার শব্দ পাওয়া গিয়েছে। আর রাত না করে এবার শুয়ে পড়াই ভাল।

দরজায় টকটক আওয়াজ।

নিমেষে ঘুমের চটকা কেটে গেল, লাঠি উঠে এল হাতে। সমস্ত দেহ সম্ভাবিত বিপদের আশঙ্কায় টানটান--প্রস্তুত।

বাইরে অঝোরধারে বৃষ্টির শব্দ। দরজায় আওয়াজটা কি ভুল শুনেছে?

না, ওই তো আবার টকটক শব্দ।

কে?

দরজা খোলো।

একহাতে লাঠি ধরে অন্যহাতে বালিশের তলা থেকে ভোজালি বের করে নিল অভিরাম। বলল--এখন দরজা খোলা যাবে না, ভাগো!

- আমি লাল সর্দারের কাছ থেকে আসছি। নিশানি আছে।

লাল সর্দার! অভিরামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে, এই জেলার উত্তর অংশে তার আধিপত্য।

বিছানা থেকে উঠে দরজার কাছে যায় অভিরাম, বলে—সঙ্গে টর্চ আছে?

— আছে।

—হাতে নিশানি নিয়ে তার ওপর টর্চ ফেল—

দরজার ফুটোয় চোখ রাখে সে। হ্যাঁ, টর্চের উজ্জ্বল আলোকবৃত্তের নিচে হাতের তালুতে চকচক করছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা ধাতব পদার্থ। ভাল করে তাকালে বোঝা যায়—অর্ধেক করে কাটা একখানা রুপোর টাকা; লাল সর্দারের দলের চিহ্ন।

দরজা খুলে আগন্তুককে ভেতরে এনে বসাল অভিরাম চটের থলে পেতে।

—কি চাই?

গায়ের পলিথিনের বর্ষাতি খুলে পাশে রেখে লোকটা বলল—একজনকে সরাতে হবে। লাল সর্দার তোমার কাছে পাঠাল।

—সে নিজেই তো কাজটা করতে পারত, আমার কাছে কেন?

—কাজটা এদিকের, তার এলাকার বাইরে।

—টাকাটা সবটা আগাম চাই। কাজ হবে পনেরোদিন পরে।

—টাকা পাবে। আজই দিয়ে যাচ্ছি—

আগন্তুক পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে অভিরামের হাতে দিতে গেল, অভিরাম বলল—দাঁড়াও, টাকায় আগে হাত দেব না—

লোকটা অবাক হয়ে বলল—তার মানে? টাকা নেবে না?

—নেব। কিন্তু তার আগে কাজ আছে। এসো আমার সঙ্গে।

ঘরের কোণে ঠাকুরের আসনের সামনে দেশলাই ঠুকে প্রদীপ জ্বালাল অভিরাম। বলল—একটা কাঁচা টাকা দাও—

বিস্মিত আগন্তুক পকেট হাতড়ে একখানা একটাকার মুদ্রা বের করে দিলে। ফুলে আর মালায় ঢাকা ছোট কালী প্রতিমার পায়ের কাছে রাখা কৌটো থেকে তেল-সিঁদুর নিয়ে টাকাটায় মাখালো অভিরাম, আগন্তুকের হাতে দিয়ে বলল—ধরো। এগিয়ে এসো, এটা মা কালীর পায়ে ছুঁইয়ে রেখে আমি যা বলছি বলে যাও—

লোকটা তাই করল। অভিরাম বলল—বলো, হে মা কালী, আমি অমুকচন্দ্র অমুক আজ মজুরির বিনিময়ে অমুকচন্দ্র অমুককে খতম করবার জন্য অভিরাম পাড়ুইকে নিয়োগ করছি। এ কাজের যাবতীয় পাপ আমার হবে, অভিরামের নয়। সে টাকা পেয়ে আমার আজ্ঞা পালন করছে মাত্র।

আগন্তুক কলের পুতুলের মত কথাগুলো বলে গেল। তারপর বাকি রাতটুকু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিকারের নাম, স্বভাব, বন্ধুবান্ধব, আড্ডার ঠেক আর কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করল অভিরাম। ভোরের দিকে দরজা খুলে দিয়ে বলল—যাও, কাজ হয়ে যাবে। আমার কাছে আর আসবার দরকার নেই। মনে রেখো, আমাকে তুমি চেনো না, কোনোদিন দেখনি।

যাবার সময় আগন্তুকের বোধহয় একটু রসিকতা করার ইচ্ছে হয়েছিল। সে বলল—যদি কাজের পরে তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিই?

প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ যথাথহি অবাক হয়ে অভিরাম লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল—কিন্তু এরকম ভুল তুমি কেন করবে?

অভিরামের কণ্ঠস্বরে সেই উদাসীন, আদিম নিষ্ঠুরতা। লোকটার বুক কেঁপে উঠল, বোধহয় এই প্রথম সে বুঝতে পারল লাল সর্দার তাকে ঠিক লোকের কাছেই পাঠিয়েছে। পেছনে ফিরে সে দ্রুত পালিয়ে গেল।

কেবল একটা প্রশ্নই অভিবাম কবে নি—কেন লোকটা শিকাবকে মাবতে চায়। এ বিষযে তাব কোনো কৌতূহল নেই। ঝগডা অন্যেব, কাজটা তাব।

একদিন বাত্তিবে কাজটা হযেও গেল। শনিবাব বিকেলে নিযম কবে শিকাব যায শহবেব বাইবে সন্ন্যাসীবাগানে হিন্দুস্থানি মহল্লায। কী সব কথাবার্তা বলে ফেবে অনেক বাত্তিবে। অভিবাম আবছা আবছা টেব পেযেছিল ঝগডাটা ভাগাভাগি নিযে। বর্ডাবেব ওদিক থেকে মাল আসছে, ক্যামেবা, শাডি, ভিডিও, ঘডি—আবো হবেকবকম মালপত্র। তাব লাভেব বখবা নিযে এখন মনান্তব হচ্ছে। শিকাব চাইছে আলাদা বিজনেস কবতে। দলেব অন্য লোকেবা ছাডবে কেন? তাদেব সুলুক-সন্ধান জেনে নিযে শিকাব যদি এখন বিশ্বাসঘাতকতা কবে? এ লাইনে সর্বদাই বেষাবেষি।

সন্ন্যাসীবাগান থেকে বেবিযে এসে পথ যেখানে প্রথম বাঁক নিযেছে, সেই নির্জন জাযগায কাজ সেবে ফেলল অভিবাম। চকিতে। তাব হাত এখন অভিজ্ঞতায পাকা। সব মিলিযে মিনিটখানেকেব মামলা। বাস্তা দিযে হেঁটে না এসে সে উলটো দিকেব মাঠে নেমে পডল, উঁচু-নিচু জমি আব তিনটে নালা পাব হযে আধঘণ্টা পব বাডিতে ঢুকেই জনতা স্টোভ জ্বালিযে দুধ বসিযে দিল। মনে ভাবি ফুর্তি—ফলে এখুনি একবাব চা খেতে হবে।

একটু পবে বড গেলাসটায তেজপাতা-দাবচিনিব গন্ধওযালা চা নিযে চুমুক দিতে দিতে তৃপ্তিতে অভিবামেব চোখ বুজে আসছিল।

আশ্চর্য ব্যাপাবটা ঘটল দিন-তিনেক পবে।

শহবে শম্ভু মিস্ত্রিব গ্যাবেজে গ্যাস ওযেল্ডিং-এব কাজ কবছিল সে। দুপুবে কাজ থামিযে শম্ভু বাডি গেল খেতে, যাবাব সময চাবটে টাকা তাকে দিযে বলে গেল—তুমিও কিছু খেযে নাও। একঘণ্টা পবে এলেই হবে। টাকাটা পকেটে পুবে হোটেলে যাবাব জন্য একটা শর্টকাট পথ ধবেছিল অভিবাম। হঠাৎ একটা জটলা দেখে সে কৌতূহলী হযে দাঁডিযে পডল।

টিনেব চালওযালা ছোট একখানা বাডিব সামনে পনেবো-কুডিজন নাবী-পুবুষেব ভিড, তাবা নিজেদেব মধ্যে কি বলাবলি কবছে। ভিডেব বৃত্তেব মধ্যে থেকে ভেসে আসছে কান্নাব শব্দ, মেযেব গলা।

এমনিতে কোনো পথচলতি ব্যাপাবে নাক গলায না অভিবাম। আজ হঠাৎ কি হল, ভিডেব পেছন থেকে উঁকি দিযে দেখতে গেল ঘটনাটা কি।

বাডিব দবজায সিঁডিব ধাপেব ওপব বসে হাপুসনযনে কাঁদছে বছব চল্লিশ বযেসেব একজন মেযেছেলে, মাঝে মাঝে বুক চাপডাচ্ছে। পাশে বসে আছে ইজেব-পবা খালি গা একটা বাচ্চা, সে মাঝে মাঝে অবাক হযে ক্রন্দনবতা নাবীটিব দিকে, আব একবাব জমাযেত হওযা ভিডেব দিকে তাকাচ্ছে।

শোকেব কান্নাব ভাষা বোঝা কঠিন, অভিবাম ব্যাপাবটা ভাল বুঝতে পাবল না। পাশেব লোকটিকে জিজ্ঞাসা কবল—কি হযেছে ভাই এখানে?

লোকটি বলল– এব ছেলে খুন হযেছে। ওই যে সন্ন্যাসীবাগানে একটা লাশ পাওযা গিযেছে না কদিন আগে? এ সেই লাশেব বিধবা মা আব ওই ছেলে। লাশেব বউ অজ্ঞান হযে ঘবেব ভেতবে পডে আছে—আঠাবো বছব বযেস। আহা, গেঞ্জিকলে কাজ কবে মা আব বউকে খাওযাচ্ছিল—

আবো কি সব বলে চলল লোকটা। অভিবাম তখন আব শুনছিল না, সে একদৃষ্টে

তাকিয়েছিল মেয়েছেলেটার দিকে, ছোট্ট বাচ্চাটার দিকে। কেন সে মরতে দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল! চলে গেলেই হতো।

কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থেকে সে আস্তে করে সরে এলো বটে, কিন্তু তার ভেতরে কি একটা জিনিস যেন গোলমাল হয়ে গেল। নিজের কাজ সে এতদিন করেছে মনের আনন্দে, কর্তব্য ভেবে। কৃতকর্মের পরবর্তী ঘটনাবলী কখনো চোখের সামনে দেখেনি। তার প্রত্যেকটি কাজের পর কোথাও না কোথাও এমন কিছু ঘটে তাহলে? এইরকম কান্না আর হাহাকার? আশ্চর্য, সে তো বোকা নয়, এটা তো তার আগেই বোঝা উচিত ছিল, কখনো তবু মাথায় আসে নি কেন? গেঞ্জিকলে কাজ করে মা আর বউকে খাওযাতো। হাঃ! তার মানে তারই মত দশা, সবাই যেমন জানে সে মিস্ত্রির কাজ করে।

অভিরাম আদৌ নরম ধাতের লোক নয়, কল্পনাশক্তির লেশমাত্রও তার মধ্যে নেই, তবু সে কি করে যেন নিজেকে শিকারির বদলে শিকারের জায়গায় বসিয়ে ফেলল। যদি তার বৌ—অথবা তার ছেলে যদি বাত্তিরে বাড়ি ফেরবার পথে—

কে যেন বাইরে কোথায় কাঁদছে না? নাঃ, ও মনের ভুল।

জড়িয়ে পড়তে নেই। কক্ষনো না। জড়িয়ে পড়লেই আর কাজ করা যায় না।

গত তিনমাসে দুটো ভাল কাজ ফিরিয়ে দিয়েছে অভিরাম। আর কাজ করবে না—এ সিদ্ধান্ত যেমন সে নেয়নি, তেমনি এখন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না, সে কথাও ঠিক। বেশ কিছু জমি কেনা আছে, বরং দেশে ফিরে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে চাষবাস করবে।

তবে কিছুদিন পরে, এখনই নয। অনেকদিন এখানে বাস করছে, অকস্মাৎ জিনিসপত্র গুছিয়ে বাড়ি চলে গেলে লোকের মনে নানারকম সন্দেহ জাগবে। ততদিন উঠোন কুপিয়ে লঙ্কা আর বেগুনের চাষ করা যাক।

কোদালের মুখে আগাছা উপড়ে ফেলতে ফেলতে হঠাৎ বাতাসে ভেসে আসা কান্নার শব্দ শুনতে পায। কে কাঁদে?

নাঃ, টিয়াপাখির বাচ্চা ডাকছে নারকেল গাছের মাথায় বসে।

কিন্তু সময় যাওয়ার সঙ্গে একটু একটু করে পুরনো ক্ষুধাটা আবার জেগে উঠতে লাগল। শুধু বেগুনের চাষ করে কি জীবন কাটে? যে একবার ভয়ঙ্করতম কাজে নিজেকে লিপ্ত করেছে, নির্জন রাত্রিতে অন্ধকারের গুণ্ঠনে গা ঢেকে লৌহকঠিন হাতের পেষণের মধ্যে অনুভব করছে হতভাগ্য শিকারের ক্রমক্ষীয়মান জীবনস্পন্দন, চাষের মত শান্ত বৃত্তি তার জন্য নয। জীবন যেন কেমন পানসে পানসে লাগে।

হত্যার পরেই সারা দেহে আর মনে সেই অপূর্ব তৃপ্তি—আঃ, কতদিন সে অনুভব করেনি। সেই সময়টা নিজেকে যেন ভগবানের মত লাগে।

এর পরের কাজটা বরং সে নিয়েই নেবে। পাপ আর কি বাড়বে তার? অপরাধই বা কতটা বাড়বে? একটা বেশি খুন করলে কি একবার বেশি ফাঁসি হয়? রক্তের নেশা তার রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছে, সে ছাড়লেও নেশাটা তাকে ছাড়বে না। বৃথা লড়াই করে লাভ কি? এবার কাজের ডাক এলেই সে রাজি হবে।

পরের দিন একটা ঘটনায় অভিরামকে আবার সিদ্ধান্ত বদল করতে হল।

রঙ ওঠা নীল ফুলপ্যান্ট আর ঘিয়ে রঙের নোংরা গেঞ্জি পরে সকালে অভিরাম কাজে যাচ্ছিল। বেলা আটটা হবে। শসাপুকুরের ধার দিয়ে রাস্তা। পুকুরের পাড়ে আসার আগেই অভিরাম শুনতে পেল চিৎকার চেঁচামেচি। বাঁক ফিরে দেখল বছর কুড়ি-

বাইশের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে পাগলের মত দৌড়ে জলে নামতে চাইছে, তাকে বাধা দিচ্ছে রায়পাড়ার বুড়ো পুরোহিত—করো কি ! সাঁতার জানো না, ডুবে যাবে যে ! পাড়ায় খবর গেছে, এক্ষুণি ছেলেরা এসে তুলবে এখন—

মেয়েটি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল—ওগো, ততক্ষণে আমার খোকা মরে যাবে ! আমায় ছেড়ে দাও—

পাড় থেকে বেশ কিছুটা দূরে জলের ওপর একজোড়া হাত ভেসে উঠে ব্যর্থ প্রত্যাশায় শূন্য আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে পরক্ষণেই আবার ডুবে গেল।

একমুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝে নিল অভিরাম। মেয়েটি এর ভেতর বৃদ্ধের হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। তার কাছে গিয়ে অভিরাম ধমক দিল—চুপ করে দাঁড়াও।

চোখের নিমেষে গেঞ্জিটা খুলে জলে লাফিয়ে পড়ল অভিরাম। তার দেশের বাড়ির গ্রামে সতেরোটা পুকুর আর দুদিকে দুটো নদী। মাছকে সে সাঁতার শেখাতে পারে। সবল হাতে জল কেটে এগিয়ে গিয়ে জোরে দম নিয়ে ডুব দিল। নাঃ ছেলেটা বহুত নিচে তলিয়েছে। এদিক-ওদিক হাতড়ে পাওয়া গেল না। ভেসে উঠে আবার দম নিল সে। তাকে খালি হাতে উঠতে দেখে কেঁদে উঠল তরুণী মা। এবার ডুব দিয়ে একেবারে তলায় চলে গেল অভিরাম। হ্যাঁ, ঠেকেছে হাতে। চুলের গোছা শক্ত মুঠোয় ধরে একহাতে ছেলেটাকে ভাসিয়ে রেখে পাড়ে নিয়ে এলো সে। ততক্ষণে পাড়ার ব্যায়াম সমিতির ছেলেরা এসে পড়েছে হৈ-হৈ করে। ছেলেটাকে উপুড় করে শুইয়ে একজন পিঠ চেপে পেটের জল বের করতে লাগল। মেয়েটি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আস্তে আস্তে বলল অভিরাম—ভয় নেই, বেশি জল খায়নি। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে—

ছেলেটা নড়ে উঠে চোখ মেলার পর গেঞ্জি দিয়ে গা-মাথা মুছে নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে এলো অভিরাম, কেউ তাকে খেয়াল করল না।

কি আশ্চর্য ! মনে তাব সেই অদ্ভুত তৃপ্তিটা ! সেই—সেই কাজ করার পর যেমনটা পাওয়া যেত। অন্যভাবেও এ আনন্দ আসে তাহলে ?

কাজে না গিয়ে বাড়ির দিকে ফিরল অভিরাম। এক্ষুণি খাঁটি দুধ দিয়ে বড় একগ্লাস চা বানিয়ে খেতে হবে।
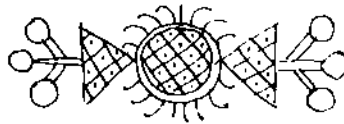
সে ফেরেনি ॥ ভগীরথ মিশ্র

উনুনে জল চড়েছে। মাটির হাঁড়িতে। ফুটছে।

হাঁড়ির ওপর মাটির সরা ঢাকা দেওয়া। জটার বউ মাঝে মাঝে শুকনো পাতা, কাঁটা-খোঁচা এনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে উনুনের পেটে। কোলের বাচ্চাটা কান্না থামিয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রয়েছে হাঁড়ির দিকে।

তিনবছর বাদে ঘরে ফিরছে মানুষটা। গা-গতর কেমনটি আছে কে জানে। পড়শিরা বলে, জ্যালে গ্যালে মাইনসে মটা হয়। পরিচিত চোখ-মুখ, গা-গতরে বাড়তি মেদ চর্বি লাগলে মানুষটার আদল কেমনটি দাঁড়াবে, সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল জটার বউ।

জটা যখন জেলে যায় বউ তখন সাত মাসের পোয়াতি। যাবার সময় জটা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে গিয়েছিল, ডরাস লারে বউ। কোবরাজ মশায়কে বলিস, য্যান, কিছো ট্যাকা দ্যান। বলিস, জটা ফিরে আসলে পাটি খাটে শুধে দিবে। উই ট্যাকা দে' উকিল-মুক্তার করিস।

হারিন কোবরেজ টাকা দেয় নি। ফলে জটারও আর ফেরা হয় নি। হাজত থেকে জেলে চলে গেছে কোর্টের রায়ে।

একবার, কাঠগড়া থেকে হাজতে ফিরে যাওয়ার সময় গাঁয়ের শশী ভুঁইয়ার ব্যাটার সাথে ভেট হয়েছিল। জটা খবর পাঠিয়েছিল তার হাতে, বউ য্যান একটিবার আসে।

জটার বউয়ের বলে তখন যমে-মানুষে লড়াই। কাঁচা গা'। কোলের বাচ্চাকে নিয়ে খাটা-বাটারও উপায় নেই। ওদিকে পেটে অষ্টপহর চিতার আগুন জ্বলছে। সারা গায়ে খোস-পাঁচড়া বাসা বেঁধেছে। চোখের কোল অবধি। মাথার চুল যেন বাবুই পাখির বাসা। সদরে যাবার ভাড়াও কম নয়। যেতে আসতে পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকা!

বাচ্চাটা ফের বায়না ধরে, অ' মা, বাত্ দে' না, বাত্।

মাটির হাঁড়িতে জল ফুটছিল টগবগিয়ে। মাটির সরায় ধাক্কা মারছিল ভাপ। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে জটার বউ ভোলাতে থাকে ছেলেকে। ভাত ফুটতিছে তো। ফুটুক। লরম হউক। সবুর ধর বাপ।

কোলের বাচ্চাকে দুপুর গড়তির মুখে এমন কথা বলতে বুক ফেটে যায়। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই। বাচ্চা ছেলের পেটের আগুন শুধু মুখের কথায় নিভবে না।

এতক্ষণে হয়তো ঝাপটে আসছে লোকটা। জটার বউ থির হয়ে ভাবতে থাকে। করাতডাঙার বুক ফেঁড়ে কিংবা মহিষডোবার পাড় ধরে পড়ি কি মরি করে ছুটছে। পা মাটিতে পড়ছে কি পড়ছে না। মানুষটার ঘরের টানটা তো জটার বউ জানে। যত দূরেই যার ঘরেই খাটতে যাক, সন্ধ্যার পর বেঁধে রাখলেও থাকবে না কোথাও। সেই মানুষটা আজ তিনবছর ঘরছাড়া। ওর বুকের পাঁজরগুলো কি আর আস্ত আছে? ভাবতে ভাবতে বউয়ের চোখে জল এসে যায় সহসা। কোলের বাচ্চার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সামলাতে থাকে নিজেকে।

ছেলেকে বসিয়ে রেখে জটার বউ ওঠে। ঘর দোরে একটু ঝাটা বোলানো দরকার। দুয়ারটা একটু গোবর দিয়ে নিকিয়ে দিলে ভালো হয়। মানুষটা আসছে।

এমন বোকাসোকা মানুষ যেন কারুর ভাগ্যে না জোটে। এ যুগে এমন মানুষ হয়? চট করে বুঝে ওঠে না কিছুই। ফ্যালফ্যাল করে দেখে খানিকক্ষণ। তারপর ধীরে-সুস্থে চলে, বলে, অঙ্গ নাড়ায়। ওকে নিয়ে সারাটা জীবন জটার বউয়ের কি যে দিগ্‌দারি!

বড্ড মাথাখাটো লোক। পাঁচের কথায় ভুলে আকমবাকম করে ফেলে। সামলাতে পারে না শেষ অবধি। তা নালে সব্বাই গেল পার্টির কথায় দাঙ্গা করতে, কেবল এ গাঁয়ের জটা দন্‌পার্টের নামেই ওয়ারেন্ট বেরুল কেন? খবর পেয়ে সব্বাই ছুট লাগাল, তুই পারলি না? আসলে ওই যে, বুঝতে, ভাবতে, চলতে, ফিরতে, সময় চলে যায়।

তবু কেমন মায়া হয়। মানুষটা তো ভালোই। বড় ন্যাওটা বউয়ের। মুখ ঝামটা মারলে, বোকার মতো তাকিয়ে থাকে, অনেকক্ষণ। তারপর বিনা বাক্যে মেনে নেয় বউয়ের বুদ্ধিসুদ্ধি। চোখের আড়ালে হেসে গড়িয়ে পড়ত বউ। ভাবত, এমন উদার লোক যে কি করে জুটল ভাইগ্যে?

ওই নিয়ে আবার রাগও হয় মাঝে মাঝে। মাথায় রক্ত চড়ে যায়। গলা চড়িয়ে কাঁদতে মন লাগে। সামনে ধপ করে পান্তার জাম নাবিয়ে দিয়ে রাগরোষ দেখাতে হয়।

আচ্ছা, পুরুষ মানুষের এ কামগুলান সহ্য করা যায়? আফিসারের সুমুখে সক্কলে বলল, রঘু ঘোষালের জমিন আধি করি মোরা, আজ পাঁচ বচ্ছর। ভাগ রেকর্ড হয়ে গেল সক্কলের লামে। তু' আর বলতে পারলি নি কতাটা? মাথাটাও লাড়ে দিতে পারলি নি, সক্কলের সাথে? ইটুকু বুদ্ধি জুগালো নি তুর মাথায়?

জগা মিস্তিরি উঠোনে থাবড়ে বসে কত আক্ষেপ করল। 'কত করে পাইক পড়া পড়ালাম গ' মামী, কাজ্যকালে বিপরীত কাম কইরলেন মামু মোর; কত হ্যতইশারা কইরলাম আপিসারের পিছু থিকে, কত চোক ঠারলাম। মামুর মোর মাথাটা যদি টুকচার খ্যালে!'

লাভ হল কি? সক্কলে জমিনের ধান কাট্যে ঘরে লে' গেল, আর তুমার জমিনে রাত পুহাতেই মুনিষ লামায়ে দিল রঘু ঘোষাল।

অথচ মাতাটা টুকচার লাড়ায়ে দিলেই, জমিনটা তুমার। ভাগ-রেকর্ড তুমার লামে। তুমি কাটতে পারতে দ্যাড় বিঘা জমিনের ধান। পঁচিশ-পঁচাত্তরে ভাগ পাতে কম করেও বারো মনটাক। তাথিকে দু-মন জগা মিস্তিরি লিতো। লিতো তো লিতো। তব্বো থাকে দশ মন ধান। ছা' ছাওয়ালের প্যাটে দুদিন খুঁদ কুঁড়া ঢুকত তো। মানুষটা কথা বুঝল লাকো কুনো দিন। সেই অবোধটি রয়ে গেল চেরটা কাল।

এমন মানুষ যে জেলের মধ্যে কি করে কাটাল তিনটে বছর, বউ ভেবে পায় না। সেখানে তো শুধু চোর-ছ্যাচোড়-ধড়িবাজদের আড্ডা। সহজ সরল 'উদার' মানুষটাকে যে কত লতি-লাঞ্ছনা করেছে সবাই মিলে। ভাবতে ভাবতে ভারী হয়ে আসে বউয়ের মন। চোখের কোনা ভিজে আসে।

বড় মেয়েটার বোঝার বয়েস। তাকে সামলে-সুমলে রাখতে হিমশিম খেতে হয়। জেলে যাওয়ার কথাটা চাপা-চোপা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে বউ। এটা-সেটা বানিয়ে বলে। পড়শিরা ইলচি করে কত কথা কয়। সব কথার পালটা কথাটি মজুত রাখতে হয়।

'বাপ আলে ধৌড়ে যাস্‌লা কাছে।' বউ সাবধান করে দিয়েছে মেয়েকে, 'খাটে' খুটে' আ'লো। জিরাবে, দম লিবে... তারপর...।'

মেয়ে পিটপিট করে তাকায়, 'বাবা কী আনবে সাথে?'

'আহ্‌। লক্ষ্মীছাড়ি! জিব দে' য্যান্‌ লালা ঝরতিছে এক্কেরে।' মুখঝামটা দেয় বউ, 'মানুষটা বলে আসতিছে কদ্দিন বাদে, সেদিকে লজর লাইকো। কী আনবে ভাবন মেয়ার।'

বউও ভাবে। কত কিছু আশা মনে। জেলে নাকি মাইনে দেয় রোজকার। সে সব নাকি জমা থাকে জেলবাবুর কাছে। ছাড়া পেলে সে সব পাবে জটা। এসব কথা শশী ভুঁইয়ার ব্যাটার মুখ থেকে শোনা। জেলকাচারির বিত্তান্ত সে জানে খোব। কত টাকা পাবে কে জানে? আনতেও পাবে কিছু বাচ্চাগুলোনের তরে।

সে সব গুণ আছে মানুষটার। ভোখে-শোষে থেকেও ছা' ছাওয়ালের তরে কোঁচড় ভরে আনত খই-মুড়ি ফল-ফুলারি চেয়েচিন্তে। বড় দয়া মানুষটার পেরাণে।

সকাল থেকে জটার মেয়েটা নেংচাচ্ছিল। বঁইচির কাঁটা বিঁধেছে পায়ে। দেখে ভারি রাগ হয় বউয়ের। জ্বলে ওঠে মেয়ের ওপর 'আহ্‌হা, ঢপী। লেংচাছিস ক্যানে?'

'কাঁটা ফুটিছে না?'

'কে কয় কাঁটা ফুটিয়ে আনতে?' ধমকে ওঠে বউ।

গতকাল মণ্ডলদের ছাগল চরাতে গিয়েই তো এ হেন বিপত্তি, খাসিটা ঢুকল বঁইচির ঝোপে। বেরোয় না আর কিছুতেই। সুয্যি ডোবে ডোবে। বাধ্য হয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে, খাসিটাকে বার করতে গিয়ে পায়ে গোটাকতক কাঁটা বিঁধল পটাপট। রক্ত ঝরল অনেক। বালি চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করতে হল। কিন্তু রাত পোহাতেই ব্যথা।

বউ এসব শুনতে চায় না। গাল পেড়ে বলে, 'এক্কুরে ল্যাংচারি লাকো মানুষটার সম্মুখে। খরায় খরায় বলে আসতিছে কদ্দূর থিকে। সামনে ল্যাংচে ল্যাংচে ঢং দেখানো...।'

দুপুর পড়তির মুখে এক হাঁটু ধুলো নিয়ে উঠোনে পা দিল জটা। কাঁধের পুঁটলিটা নামিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল দাওয়ায়। দরজার আড়াল থেকে জটাকে একদৃষ্টিতে দেখছিল বউ। বেশ খানিকক্ষণ। তারপর এনামেলের ঘটিতে জল এনে নামিয়ে দেয় সুম্মুখে।

জটা এক চিলতে ভারি অদ্ভুত হাসি হাসে বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। 'কি ব্যা, তুরা সব ক্যামন ছিলি?'

প্রশ্নটা যেন কেমন ঠেকে বউয়ের কানে। বড় ঠশরা গলা। তিনটে বছর তিল তিল করে, কি ভাবে যে সংসারটা টেনে টেনে নিয়ে গেছে বউ, কি করে দুঃখের রাতগুলো পুয়েছে একের পর এক, তা একমাত্র সে-ই জানে। আর জানেন, যিনি দিনকে রাত করবার 'মালেক'। কত লতি-লাঞ্ছনা, লাথি ঝাঁটা, কত লোভ-প্রলোভন...। সব গিলে নিয়েছে বিষের মতো। মানুষটার সোজা-সাপটা প্রশ্নটার জবাব কি করে দেয় সে? কোন বাক্যি দিয়ে বোঝায় তার চোখের জলে ভোর হয়ে যাওয়া রাতগুলোর কথা?

'ভ্যালা।' খুঁটির গায়ে মুখ চেপে মৃদু গলায় বলে জটার বউ, 'তুমি বারায়েছিলে কখন?'

'সক্কাল বেলায়। সেকেন বাসে।' বলতে বলতে এনামেলের ঘটিটা মুখের ওপর ধরে জটা। ঢক ঢক করে জল ঢালতে থাকে শূন্য থেকে।

বউ আড়চোখে তাকিয়েছিল জটার দিকে। পলক পড়ছিল না তার। এত দিনের বুভুক্ষু চোখদুটো যেন বাগ মানে না। শরীরের জীর্ণ পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চায় আর এক উপোসী নারী।

জটার গা গতরের দিকে তাকিয়ে প্রথম ভাবনাটা ঘোচে বউয়ের। শরীরটা ভেঙে পড়েনি। বরং যেন অল্প চেকনাই খুলেছে। গলার হাড়গুলো মোলায়েম। গা'টা বেশ সোরস। আগে সেই কাকতাড়ুয়া গোছের চেহারাটার অল্প বদবদল হয়েছে। জটার বউয়ের মনটা ঠান্ডা হয়। জ্যালে আজকাল খাতে পরতে দেয় তা'লে।

ঘটিটা নামিয়ে রেখে বারকয়েক জোরে জোরে নিশ্বাস দেওয়া-নেওয়া করে জটা। তারপর পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ফুঁ'লাগায় জে'বসে।

বিড়ির ধোঁওয়া ছাড়তে ছাড়তে জটা সহসা বলে, 'বুঁচি কুথারে? দেখতিছি না তারে?'

'মণ্ডলদ্যার ছাগলগুলান লিয়ে বেইরেছে।' বউ খাটো গলায় জবাব দেয়।

বউকে চাল বাছার মতো করে দেখছিল জটা। বলে, 'তোর শরীলখান তো ভারি খ্যারাব হয়ে গিছেরে। কণ্ঠির হাড় যে বেইরে পড়িছে, এক্কেরে।'

এ কথায় জটার বউয়ের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। খুঁটির গায়ে মুখ চেপে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে সে থির পলকে।

জটা সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। চারপাশের গাছপালা, ঝোপ ঝাড়, খানা-খন্দ—সব কিছুকে জরিপ করছিল দুচোখ দিয়ে।

'ইখানকার লিম গাছটা কুথা গেলরে?' ভুরু কুঁচকে শুধোয় জটা।

বউ উশখুশ করে খানিক। তারপর মাটির দিকে নজর রেখে বলে, 'উটা কাট্যে লে' গ্যাছে মণ্ডলরা।'

'ক্যানে?' রুক্ষ গলায় শুধোয় জটা।

'কি করব? ষোলো ট্যাকায় ব্যাচে দিলাম উটায়।'

জটা চুকচুক করে ওঠে মুখে। 'ইস, অত বড় গাছখান।'

ভীষণ কান্না পাচ্ছিল বউয়ের। ওই ষোলো টাকা না পেলে বংশের একমাত্র ছা'টা বাঁচত? কি করে সে বোঝায় এটা মানুষটাকে?

খানিক বসে নীরবে বিড়ি টানার পর এক সময় নিজের মনেই পুঁটুলিটা খোলে জটা। বউ ঠায় দাঁড়িয়েছিল পাশটিতে। আলগোছে চোখ পুরছিল পুঁটলিটার মধ্যে। বুকের মধ্যে কত আশা বাসা বাঁধছিল অজান্তে। উবুর-ডুবুর পানকৌড়ি।

পুঁটলি থেকে জিনিসগুলো বের করে একে একে সাজিয়ে রাখে জটা। একটা গামছা, বারারের চিরুনি, একটা তাঁতের শাড়ি, ছিটের জামা, গাঁজার কলকে, প্লাস্টিকের বিড়ি-কৌটা, তাসের প্যাকেট, মাটির ঘোড়া, পুতুল... আরো অনেক কিছু। জটার বউ ডাগর চোখে দেখছিল চিজগুলো। চোখের কোণে বোবা বিস্ময়।

লাল পুতুলটাকে হাতে তুলে নিয়ে জটা এদিক-ওদিক তাকায়। 'উটা কুথারে?'

বউয়ের বুকখানায় যেন হাওয়া করছিল কে। কান্নায়, লজ্জায় যেন ভেঙে পড়তে চায় এবার। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ঘরের ভেতরটা। 'নিদাল্ছে।'

জটা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে। ছেলেকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। বলে, 'ইস, ই যে চামচিকার পারা বদনটি রে।' পরক্ষণে বউয়ের দিকে তাকিয়ে তেলতেলে হাসি হাসে, 'ভাবিস লে, ইবার খাবায়ে দাবায়ে কোঁদলটি করে দুর এক্কেরে।' দাঁত বের করে হাসতে থাকে জটা।

বউ মৃদু গলায় বলে, 'লাডাচাড়া কোরো না উরে। কাঁচা লিদ ভাঙে গেলে আবের ভাতের তরে কাঁদন জুড়বে।'

ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে, খেলনাটাকে পাশে রেখে বাইরে আসে জটা। নিজের জিনিসগুলিকে ফের পুঁটলির মধ্যে পুরে ফেলে। বাকি জিনিসগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'এ' গুলান লিয়ে যা, ইখান থিকে।'

বুঁচি ফেরে বেশ খানিক বাদে। দূর থেকে বাপকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পলকহীন চোখে দেখতে থাকে। রুক্ষ চুলগুলি বাবুয়ের বাসার মতো ফুরফুরিয়ে উড়ছিল, এক চিলতে কপালের ওপর। সরু কাঠির মতো হাত-পা আর পিঁজরার মতো বুকখানা যেন নিজের অজান্তে কাঁপছিল তিরতিরিয়ে। জটা হাতের ইশারায় ডাকে। পায়ে পায়ে এসে পাশটিতে দাঁড়ায় বুঁচি।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট পাউরুটি বের করে জটা।

'এইনে।' জটা রুটিখানা এগিয়ে দেয় বুঁচির দিকে। বলে, 'লে। খা। ভাইকেও দিস।'

আহ্লাদে ডগোমগোটি হয়ে বুঁচি ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ঢুকে যায় ঘরে।

খানিকটে দেঁতো হাসি হাসে জটা। বলে, 'আসার সময় কাশের মিঞ্যা রুটিখান পুরে দিল পাকিটে। বলল, লে যা রে জটা। ঘরে ছা ছাওয়ালরে দিস।' পরক্ষণে গলার স্বরটা পালটে যায় জটার, 'শালা দাগী খুনি হলেও পেরাণে মায়াদযা আছে। অবিশ্যি, কম বিড়ি আর গ্যাঁজা তো খায়নি মুর থিকে। আসার টাইমে যা পালাম তার থিকে দশ ট্যাকা দিতে হল শালারে। কাড়েকুড়েই লিল। তেবে বাঁচায়ে দিত শালা, বেপদের টাইমে। ঘটির মুয়ে দুধ খাতে গে' যেদিন ধরা পড়ে গেলাম হাতেনাতে ছুটুবাবুর সুমুখে, সেদিন কাশের মিঞ্যা না থাইকলে হাড়ম্যাস এক হযে যাতো মুর।' জটা বলে, আর দাঁত ছিরকুটে হাসে।

বউয়ের সামনে জুত করে জেলের গল্প জোড়ে জটা। কত চুরি-জোচ্চুরির সাক্ষী ছিল সে জেলের ভেতরে। কত ন্যাক্কারজনক কাণ্ড-কারখানা না ঘটত 'ফিমিল ওয়াড়ে'। কি করে নেশা-পানি আনাগোনা করত জেলের মধ্যে, কেমন করে ভাগ-বাটোয়ারা হত। অবেলায় বসে বসে জটা খোলসা করতে থাকে চার দেওয়ালের মধ্যের সেই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী!

বউয়ের মুখটা ক্রমশ হাঁ হয়ে যাচ্ছিল, জটার কথাবার্তা শুনে। চোখ দুটোতে পলক পড়ে না!

জটার চোখদুটো নাচছিল। 'বড় আজব জাগারে বউ। গ্যালে বুঝতিস তু'ও।'

বউয়ের বুকখান কেঁপে কেঁপে উঠছিল জটার কথায়, হাসিতে। মানুষটার ভেতরে আর একটা মানুষ দেখতে পাচ্ছিল সে। একটা ভয় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছিল যেন।

একটু বাদে পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে চলে যায় বউ। জটার হালকা হালকা কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছিল না তার।

জটা আবার একটা বিড়ি ধরায়। আকাশের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গান ধরে গলা ছেড়ে, 'ইনরাজের গাড়িতে ম'র কিসের পেরজন। হায়রে ম'র অবোধ মন।'

ঘরের মধ্যে জটার বিকট গলা শুনতে শুনতে চোখ ছাপিয়ে জল আসে বউয়ের। তিন বছরে তিলে তিলে গড়ে তোলা বুকখানা ভেঙে চুরমার হতে থাকে অলক্ষে। ছেলেকে বুকে চেপে অনেকক্ষণ কাঁদে সে। কাঁদতে কাঁদতে ভাবে, জ্যাল কি এমনই থান?

সে ফেরেনি

তিনটে বছর তিল তিল করে জগতের সাথে লড়াই চালিয়ে সংসারটাকে টিকিয়ে রেখেছে সে। মানুষটা আসবে। খাটা-খাটা শুরু করবে ফের। দুজনে উদয়াস্ত খেটে, আবার খাড়া করবে মুখ থুবড়ে পড়া সংসারটাকে। এইটুকু আশা নিয়েই না!

প্রথমবারে মেয়ে হল বলে মানুষটার আক্ষেপ ছিল। সেই কাঁটা বুকে বিঁধিয়ে দিন কাটাচ্ছিল বউ। তারপর একদিন উথাল-পাথাল বর্ষার রাতে গোঙাতে গোঙাতে সে মানুষটার সাধ পূর্ণ করেছে, অঘ্রানের পাকা ধানের মতো সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দিয়েছে সংসারে। জটা তখন কত দূরে। কচি ছেলেকে আলের ওপর গাছতলায় শুইয়ে দিয়ে, কচি চারা রুইতে রুইতে, আকাশ-ভরা কালো মেঘের পানে তাকিয়ে আগল-বাগল হয়েছে মন। ধান কাটার ফাঁকে ফাঁকে বাচ্চার কান্না থামিয়ে এসেছে বুকের নিঃশেষিত রসটুকুর ছলনা দিয়ে। সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে কেবল একটি ভাবনাই সোনালি রোদ্দুরের মতো গাঢ় হয়েছে দিন দিন। সেই ভাবনায় কাটিয়ে দিয়েছে বিষণ্ণ প্রহরগুলি। রাতে কড়কড়ে ভাতের থালা সামনে রেখে চোখের জলে ভিজিয়েছে বুক।

সেই মানুষটা এমন অচেনা হয়ে ফিরে এল কেন? কেন অমন হাওয়ায় ভাসিয়ে কথা কয়? চোখ কেন থির থাকে না কোনখানে? ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে বুকে চেপে অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে বউ।

'ত্যাল ট্যাল দিবি, না বসে রইবো ঠায়?' দুয়োর থেকে কষকষে গলায় হাঁক পাড়ে জটা, 'এ ক্যামনধারা ব্যাভার ত'র?'

ছেলেটাকে সাত তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ায় বউ। কুলুঙ্গির দিকে হাত বাড়িয়েই সরিয়ে আনে হাত। মাখার জন্য তেল চাইছে মানুষটা। আহারে...সে কি করে জানবে, মাখার তেলের পাট করে উঠে গেছে এ সংসার থেকে। আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে কাঁদতে সাধ যাচ্ছিল বউয়ের। বুকের মাঝখানটা দলতে ইচ্ছে করছিল। বাঁশের আগড়ে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মতো।

খানিক বাদে উঁকি মেরে অবাক হয়ে যায় বউ। জটা কখন পোটলা-পুঁটলি নিয়ে চলে গেছে। দাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তারপর এক সময় ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে উনুন থেকে নামিয়ে দেয় জলভরা হাঁড়িটা। হাঁড়ির মধ্যে ফুটে ফুটে মরে এসেছে জল। কোলের ছেলেকে ভাতের লোভ দেখিয়ে ঘুম পাড়াবার আয়োজন চলছিল এতক্ষণ। বাচ্চার পেটের আগুন নেভাতে,উনুনের পেটে আগুন জ্বালানো।

ঘুমন্ত বাচ্চার কচি পেটটা ওঠা-নামা করছিল। শীর্ণ হাত-পাগুলো নিথর হয়ে পড়েছিল কাঠির মতো। তাই দেখে সহসা গুম মেরে যায় বউ। পায়ের তলায় শিকড় পুঁতে গাছ হয়ে যেতে চায়, যতক্ষণ না ঘুম আসে, চোখ জুড়ে...।

সন্ধের আগে আগে ঘরে ফিরল জটা। দাওয়ার ওপর নামিয়ে দিল দু-তিনটে পুঁটলি। 'এই লে। লে' যা সব।'

বউ অবাক চোখে তাকায়। বিস্ময়ের বাঁধ ভাঙে বুঝি দু-চোখে!

মুচকি মুচকি হাসছিল জটা। বলে, 'গোলপানা চোখ কর‍্যে কি দেকিস রে? চাউল, ডাল, আলু, পেঁজ—বাঁধ দিকি জুত কর‍্যে। পেট পুরে খাই।'

দাওয়ার ওপর বসে ঘসর ঘসর করে গা চুলকোতে থাকে জটা। বিষম শব্দ করে হাই তোলে বারকয়েক। তারপর নাকিসুরে গান ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে, 'ইন্‌রাজের গাড়িতে ম'র কিসের পেরজন। হায়রে ম'র অবোধ মন...।'

'শালা হাজরার পো' ভাবেছেল, ফকটে লিবার চাতিছি মাল।' দু-চোখ শানিয়ে

বলে জটা, 'কত্তা কানেই লেয় না শালা। বার করুনু দশ ট্যাকার লোট। শালার চোক এক্কেরে ট্যারা।'

খিক খিক করে হাসতে থাকে জটা বউয়ের দিকে তাকিয়ে।

ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে বউ। চোখ দুটোকে স্বাভাবিক রাখার জন্য ঢলঢলে চোখে তাকায় জটার পানে। তবুও বউয়ের ভাব-গতিকটা দৃষ্টি এড়ায় না জটার।

'এ র'ম প্যাঁচার পারা বদনটি করে রইচিস ক্যান্‌রে তুরা ?' ভুরু কুঁচকে শুধোয় জটা, 'মুই ঘরে আসতে বিপদ হল লাকি তুদের ?'

আচমকা বউয়ের মাথায় একখান পাথর খসে পড়ে বুঝি। কোনোরকমে নিজেকে সামলে, পুঁটলিগুলো তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ে রান্নাঘরে।

জটা নিজের মনে হুঙ্কার ছাড়ছিল দাওয়ায় বসে। 'সব শালাকে চিনা আছে ম'র। সব কুটুমকে দেখা সারা। পার্টির সাথে দাঙ্গা বাধাবার লেগে ডাকুক না আরেকবার ফের, মু'য়ের মতন জবাবটি দুবো সুমুন্দিদ্যার। শালা...জটা দন্‌পাটের জেবনটাকে আঁটকুড়ির বাত্তিক-বাড়ি ঠাউরেছে সব।'

কাঁটা-খোঁচাগুলো উনুনের পাশে ফেলে রেখে বাইরে আসে জটার বউ। চালের বাতা থেকে কয়েকটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে দেয় জটার দিকে।

'কি এ' গুলান ?' জটা নির্লিপ্ত মুখে শুধোয়।

'জেলারো আফিসের চিটি। লুনের নুটিশ।' জটার বউ বিড়বিড়িয়ে বলে।

কাগজগুলো উলটে-পালটে দেখছিল জটা। চোখের কোণে ঝিলিক মারছিল তাচ্ছিল্যের হাসি।

কাগজগুলোকে ফের চালের বাতায় গুঁজতে গুঁজতে হালকা গলায় বলে, 'লুন আর এ যুগে শোধ করে কেটা ? ফেলে দে' ইসব জঞ্জাল।' লুঙ্গিটা কোমরের সঙ্গে কষে বাঁধতে বাঁধতে জটা বলে, 'টাইম করে একটিবার ভেট করে আসা লাগবে আপিসের বড়বাবুর সাথে। চা-বিস্কোট খাবায়ে আসা লাগবে। উর পাশেই তো সব।'

ঘরের মধ্যে বসে বসে শুনছিল বউ সব কথা। লোকটার মুখে অমন কথা কে শুনেছে কবে ! কত বোকাসোকা ছিল ! কত না বাঁদর-লাচ লাচাতো পাঁচজনায় মিলে !

আষাঢ়-শ্রাবণে মাঠভরা থই থই জল। কচি ধানের চারা মনের আনন্দে দোল খায়। বেনা বনের চুড়োয় ফিরে বসে ন্যাজ দোলায়। ভিতরমাজনার উঁচু পাড়ে তালের সারি কালচে হয়ে ওঠে পেছনের মেঘের সাথে। জটা তখন মনের আনন্দে ঘাই বেঁধে চলেছে অন্যের জমির আলে। সন্ধের কালি গায়ে মেখে রাত নামে, তবুও মানুষটার ফেরার নাম নেই। বউ গঞ্জনা দিত, 'লিজের জমিনে কেউ থাকে লাকো ইখনতক্। তুমি কিনা পরের জমিনের ঘাই বাঁধতিছ সইনঝা-পহরে। বলি, মজ্‌রি কি কিছো বেশি মিলবে ?'

সরল মুখে আলগা হাসির ফুল ফুটিযে জটা মেয়েটাকে তুলে নিত কোলে। বলত, 'জলগুলান্ সব বারায়ে যাবে যে রে। চারাগুলান শুকায়ে মরবে দুদিনে।'

মানুষটা সারাক্ষণ ভাব করে থাকত যেন কি এক মহা দোষ করে ফেলেছে। মেলার থেকে দশ নয়ার ফুলুরি—তাই মেয়েকে কোলে বসিয়ে আদর করে খাওয়াত।

ঘুমের মধ্যে বউয়ের গায়ে আলতো হাত বুলনো জটার অনেক দিনের অভ্যেস। প্রথম প্রথম ভারি অস্বস্তি লাগত বউয়ের। সরিয়ে দিত হাত। খানিক বাদে বোকা বোকা মোলায়েম গলায় ফিসফিসিয়ে শুধোতো মানুষটা, 'রাগ করিছিস ম'র পরে ?'

শেষের দিকে হাত বোলানোটা বড় গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল বউয়ের।

শুধু একহাতে পাঁচটা আঙুল দিয়ে মানুষটা বুকের সব সোহাগ চারিয়ে দিতে পারত অন্যের শরীরে।

সবই ভালো, সবই সুখের। কেবল মানুষটা যদি একটু চালাক-চতুর হত! যদি নিজের ভালোটা বুঝত আগেভাগে। শুধু এটাই অষ্টপ্রহরের কামনা ছিল বউয়ের।

পুরোনো দিনের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে উনুন জ্বেলে ভাত চড়িয়ে দেয় বউ। মাপের চেয়ে কিছু বেশি চালই ঢেলে দেয় হাঁড়িতে। ছেলেটা জেগে ওঠার আগে কোনো গতিকে ফুটে গেলে হয়। গরমাগরম ফ্যানে-ভাতে ধরে দেবে সামনে। ভাত রাঁধার নামে শুধু হাঁড়িতে জল ফোটানোর দীর্ঘ ছলনাটা সত্যি হয়ে উঠবে ছেলের সামনে। ভাবতে গিয়ে বুকটা যেন ভরে যাচ্ছিল তার।

ঘসর ঘসর করে নখ দিয়ে গা আঁচড়াতে আঁচড়াতে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ায় জটা। চোখ পাকিয়ে বলে, জগা মিস্তিরির সাথে কথাবাত্তা পাকা করে আলাম। সামনে হপ্তায় আজ্জি পেশ হবে। রঘু ঘোষালের দেড় বিঘার ভাগ-রেকর্ডটা করতে হবে ইবার। কাঁচা গুটিটা ইবার পাকায়ে লিতে হবে যে কুনো গতিকে। জটার চোখদুটো লোভে চকচক করছিল। পায়ে পায়ে শোবার কুঠুরিতে ঢোকে সে। ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে তুলে নেয় কোলে। রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। রং-তামাসা জোড়ে বউয়ের সাথে।

'জ্যালের ফিমিল ওয়ার্ডে একটা মেয়া ছিল, এক্কেরে তু'র মতোনটি।' জটা দাঁত বের করে হাসে। 'দ্যাখতে দ্যাখতে মুই তো অবাক! এক্কেরে তু'র পারা গা'র রং, ত্যামনই হাঁটাচলা। ভাবি, বউ আবের কুন্ ক্যাসের আসামি হয়্যে আলো?'

বউ মুখ ফিরিয়ে একপলক দেখে নেয় জটাকে। তারপর কষে ফুঁ দিতে থাকে উনুনে।

খানিক চুপ করে থেকে জটা বলে, 'ভাবছেলাম ফিরে আসে তুরে দ্যাখতে পাবো কিনা।'

চেরা চোখে তাকায় বউ। 'ক্যানে?'

'আরে, বলাতো যায লাকো কিছো', রসিকের মতো হাসে জটা, 'হয়তো বা জটা দন্‌পাটের আশা ছাড়ে দিয়ে অন্য ঘাটে লা'খান্ বাঁধলি ফের।' হো হো করে হেসে ওঠে জটা, 'কতোই তো দেখলাম সিখানে, কতোই শুইনলাম।'

বুঁচি উনুনের পাশটিতে শুয়ে কাদা। ওর দিকে এক চিলতে দেখে নিয়ে বউ শক্ত চোখে তাকায় জটার দিকে।

জটা আবার হো হো করে হেসে ওঠে।

উনুনের পেটে কষে ফুঁ দিচ্ছিল বউ। ধোঁয়া লাগা লাল চোখে জল জমছিল ক্রমশ। হাঁড়ির উথলে ওঠা শাদা শাদা ফ্যান ভুরভুরে গন্ধ ছেড়েছে। গরম ভাতের গন্ধ! ছেলেটা দোল খাচ্ছে বাপের কোলে। পেটের মধ্যে বহু যুগের জমানো দুর্ভিক্ষের খিদে যেন আড় ভেঙে জেগে উঠছে।

একটা শক্তপোক্ত গাছ যেন ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে মাথার ওপর। তাই বেয়ে লতার মতো বেয়ে উঠতে চায় বউয়ের মনটা। শীর্ণ শরীরের খাঁজে খাঁজে পাঁচটা আঙুলের সোহাগের নরম অনুভূতি। শিউরে উঠতে চায় প্রতিটি লোমকূপ।

কিন্তু বুক জুড়ে কান্নাটাও জমছে। এই চালাকচতুর, রসে টইটম্বুর মানুষটা তার বড়ই অচেনা। জেলে যাওয়া মানুষটা ফিরে আসেনি।

এ এক অন্য চোখের মানুষ! মানুষটার সারা গায়ে একটা সোঁদাসোঁদা গন্ধ ছিল।

গন্ধটা বড় উত্তেজিত করত বউকে। সেটা বেমালুম হারিয়ে এসেছে কোথায়।

গরম ভাতের গন্ধটা ক্রমশ বিস্বাদ ঠেকছিল নাকে। রাতের আঁধারে এমন একটা চালাক মানুষের সঙ্গে লেপটে শুয়ে থাকতেও ভয়!

সেই ভয়টাই ক্রমশ সাপের মতো পাক দিয়ে উঠছিল বুকের দিকে।
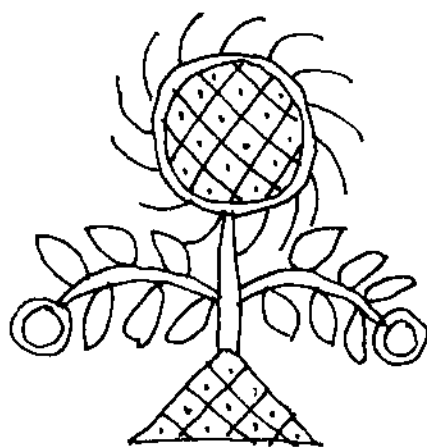
অন্য রূপকথা ॥ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিম কুয়াশা দুহাতে সরাতে সরাতে যেভাবে প্রতিদিন ভোর নেমে আসে পৃথিবীর মাটিতে, এদিনও ভোরের আবির্ভাব সেভাবেই। পলকা ভোর। তবু ভোরের আকাশে ছড়িয়েছিল একটা ঘোর, একটু বিষণ্ণতা। যেন আষাঢ়ের খিন্ন প্রথম দিবস। যেন একটু পরেই পুব-আকাশে ফিনকি দিয়ে বেরুবে রক্তের ধারা।

আজ তাই-ই ভোরের আগের মুহূর্তে ম্লান আভা দীর্ঘদেহী অর্জুনের মুখে। সুগঠিত দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, অনেক ভিড়ের মধ্যেও যাঁকে পলকে আবিষ্কার করা যায়, যাঁর উপস্থিতিতে একটা অন্য স্বাতন্ত্র্য, অনেক জলেঝড়েও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন যে বনস্পতি, সেই অর্জুন মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে জড়ানো গলায় বললেন, তাহলে আমি চললাম, স্বর্ণ। আমার সময় হয়ে এসেছে—

স্বর্ণলতা দাঁড়িয়েছিলেন অর্জুনের মাথার কাছেই। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং, নরম মাখনের মতো শরীর, তাতে এখনো যৌবন ঢলো-ঢলো, সে শরীরের পেলব সৌন্দর্য দু-মাইল দূর থেকেও নজর কাড়ে রসিক মানুষের। অর্জুনের কথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়েছে তাঁর মাথায়। কদিন ধরেই তিরতির করে কাঁপছিল বাঁ-চোখের পাতা। চারদিকে একটা অশুভ সংকেত চোখে পড়ছিল। এখন সহসা টাল খেয়ে গেল তাঁর গোটা অস্তিত্ব। অর্জুনের দীর্ঘশরীর আরো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, থরথর করে কেঁপে উঠে বললেন, তুমি যেয়ো না। তুমি চলে গেলে আমার কী হবে!

অর্জুনের তখন কীই-বা করার আছে! তাঁর কণ্ঠস্বরে গাঢ় বিষণ্ণতা, মুখে পাণ্ডুর হাসি। মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে উঠলে সবাই-ই বোধহয় এই মর্তের মায়ায় আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। শরীর জুড়ে চলকে ওঠে একটা নিঃশব্দ হাহাকার। তাই-ই ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে তাঁর দুই চোখ। ঘোর অন্ধকার চারপাশ। তাঁর এতকালের চেনা পৃথিবীটাকেও তখন মনে হচ্ছে কোনো অচিন ভিনদেশ। আফশোস হচ্ছে যে, একদল রাক্ষসের সীমাহীন লোভের বলি হতে হচ্ছে তাঁকে! তারা কেউই তাঁর অবদানের কথা মনে রাখল না।

পরক্ষণেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, হয়তো এরকমই ছিল তাঁর ভবিতব্য। আর শুধু তাঁর তো নয়। তাঁর ভবিতব্যের সঙ্গে আরো অনেকের নিয়তিও তো একই অঙ্কের নিয়মে লেখা। মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের কথাই আরো বেশি করে মনে পড়ছে তাঁর। সেই কচি কচি শিশুমুখগুলো।

আজ কতদিন হয়ে গেল এই পৃথিবীতে তাঁর বসবাসের কাল। মানুষের হিসেবে তা পঞ্চাশ বছর, না কি একশো, তাও জানেন না ঠিকঠাক। যখন প্রথম চোখ মেলেছিলেন, তখন যেন পৃথিবীর অন্য এক রূপ। সে রূপে জড়ানো ছিল এক নরম স্নিগ্ধতা। তাতে একটা মন-কেমন-করা গন্ধ। তার ভেতর ওতপ্রোত ছিল একটা অদ্ভুত মায়া। এক অন্যরকম ভালোবাসাও যেন তার পরতে পরতে। সেই রূপ, রস, গন্ধের

মধ্যেই এতগুলো বছর ! এহেন দীর্ঘ সময়ে এই বিশ্বপৃথিবীর বহু বিচিত্র ঘটনার, জীবনের অনেক ওঠাপড়ার তিনি সাক্ষী। বহুবিধ অভিজ্ঞতার ফলে আজ তিনি এক ত্রিকালদর্শী মহাজীবন। কতকাল হল তিনি দেখে চলেছেন পৃথিবীর দ্রুত বদলে যেতে থাকা ইতিহাস। প্রতি মুহূর্তেই তো ভাঙাগড়া চলছে জীবনের স্পন্দন বয়ে চলতে থাকা এই একমাত্র গ্রহে। কত না ওলোটপালোট হয়ে চলেছে এই যোজন যোজন বিশ্বচরাচরে। মানবসভ্যতা তখনো এত দূর এগোয়নি।

তারপর তাঁর চোখের সামনে দ্রুত এগুতে লাগল সভ্যতার আলো। সভ্যতার মশাল হাতে নিয়ে ক্রমে দৌড়ুতে লাগল একদল মানুষ। যেন সবার আগেই পৌঁছুতে হবে সামনের লক্ষ্যে, বিদ্ধ করতে হবে চাঁদমারি। তাদের দৌড়ের সঙ্গে দ্রুত বদলাতে লাগল তাঁর এতদিনের চেনা পৃথিবী। আরো আরো শিখরে ওঠার বাসনায় মশগুল হয়ে উঠল কত না মানুষ!

কিন্তু যত দ্রুত এগুতে চাইছিল তারা তার চেয়েও যে দ্রুতগতিতে পিছিয়ে যাচ্ছে, এটা কেন কেউ জানিয়ে দিল না ওদের!

সেই পরিণতির কথা ভেবেই আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অর্জুনের বুক থেকে। ম্লান হেসে বললেন, আমি কিন্তু মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেছি, স্বর্ণ। দীর্ঘজীবন বেঁচে থাকাটাও একটা বিড়ম্বনা। তাতে অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ। তার চেয়ে এই নিষ্ঠুর মৃত্যুও বোধহয় শ্রেয়। সবাইকেই তো এই পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নিতেই হবে।

—তাই বলে এভাবে! রাক্ষসদের ধারালো অস্ত্রের মুখে প্রাণ দিয়ে!

অর্জুন জানেন, তাঁর কোনো সান্ত্বনা বাক্যই এখন স্বর্ণর কাছে উপশম নয়। তবু সময় আসন্ন জেনে তাঁর ভেতর ক্রমশ ভর করছে এক অসীম বৈরাগ্য। প্রায় জোর করেই কাটাতে চাইছেন দীর্ঘজীবনের পিছুটান। শুধু একটাই ক্ষোভ, নিতে নয়, তিনি কিছু দিতেই চেয়েছিলেন পৃথিবীর মানুষকে। তাঁর সাধ্যমতো। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারলে হয়তো আরো কিছু সবুজ নিঃশ্বাস পৌঁছে দিতে পারতেন মানব সভ্যতাকে।

কিন্তু সে সময় আর নেই। এখন তাঁর শিয়রে শমন। শমন তার চিত্রগুপ্তের খাতা হাতে নিয়ে এসে দাগ দিয়ে গেছে তার দীর্ঘশরীরে। যেন চকখড়ি দিয়ে এলেক কেটে বলে গেল, তোমার যাত্রা শেষ। অতঃপর এই পৃথিবীতে তুমি একজন অতিরিক্ত কেউ। আর মাত্র কয়েকঘণ্টা তোমার আয়ু।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎই তাঁর চোখে পড়ল, রোদ ঝিনকি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ততক্ষণে তাঁকে ঘিরে ফেলতে আসছে যমদূতের দল। তাদের কাঁধে ধারালো অস্ত্র। এখনই শিরচ্ছেদ হবে তাঁর। তাতে তাঁর বুকে একটু কাঁপন ধরল বইকী, তবু শুকনো হাসি হেসে বললেন, নিয়তিকে বরণ করে নাও, স্বর্ণ। তাতে কষ্ট কম হবে।

একরাশ কোঁকড়াচুলে ভরা মাথা তুলে স্বর্ণলতাও তখন দেখতে পেয়েছেন তাদের। যমদূতদের চিনতে একটু কষ্ট হয় না। বুঝতে পেরেছেন অর্জুনকে ধরে রাখার আর কোনো উপায়ই নেই। শিউরে উঠে কাঁদতে লাগলেন ডুকরে ডুকরে। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, এ অন্যায়, ঘোর অন্যায়, আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না এই অকালমৃত্যু।

অর্জুন স্বর্ণের কোঁকড়াচুলে হাত রেখে বললেন, যেতে যখন হবেই, তখন হাসিমুখে চলে যওয়াই তো ভালো। শুধু আফশোস হচ্ছে যে, আমার সঙ্গে শেষ হয়ে

যাবে আরো অনেকগুলো জীবন, যেমন তুমি, যেমন আমার কাছেই নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুরা।

একটি শিশু পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিল, সেও ককিয়ে উঠে বলল, না, যেয়ো না। আমরা সবাই তো অনাথ হয়ে যাব। ততক্ষণে অর্জুনের চোখে পড়েছে রাক্ষসের দল অস্ত্র হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর একেবারে সামনে। তাদের চোখেমুখে উপচে উঠছে লালসা। গলায় খিক খিক হাসি। তারা অর্জুনের শরীরে এলেক চিহ্ন দেখে উদ্যত হল তাঁর শিরশ্চেদের আয়োজনে। অস্ত্রের আঁচড় পড়তেই যন্ত্রণায় বেঁকে গেল তাঁর শরীর।

অর্জুনের চলে যাওয়ার খবর তখন ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দূর। কাঁপন উঠেছে হাওয়ায়। এক হাওয়া থেকে আর এক হাওয়ায় ফিসফিসানি। কানাকানি। মরসুমি বাতাস ছুটে চলে যাচ্ছিল। কোথা থেকে কোথায়। হঠাৎ এসে থমকে দাঁড়াল অর্জুনের বিশাল শরীরটার কাছে। চমকে উঠে বলল, সে কী, তুমি চলে যাচ্ছ।

পাশেই দাঁড়িয়ে সেই শিরশ্চেদের দৃশ্য দেখছিল জঙ্গলের ফুল গুল্মলতা-বুনো চারার দল। মহান অর্জুনের মৃত্যুর কথা ভেবে তারা শিউরে উঠে রাক্ষসদের বলল, এমন নিষ্ঠুর কেন তোমরা।

আকাশের বুকে থম হয়েছিল কিছু কুচি-কুচি মেঘ। তারাও তাদের হাত নেড়ে বলল, থামাও, থামাও এ নিধন যজ্ঞ।

মৃত্যুর মুহূর্ত গুনতে থাকা অর্জুন এত সব না-না শুনে বিচলিত হচ্ছিলেন। কেই-বা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায়। কারই-বা ইচ্ছে করে রূপে-রসে-গন্ধে-ভরা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে অন্য এক অচিন ভুবনের দিকে। যন্ত্রণায় কাতর চোখ খুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশের দৃশ্যপট দেখে নিলেন কয়েকমুহূর্ত। তারপর আবার চোখের পাতা বুজলেন, যেন অনেক দেখার পর এবার নির্লিপ্ত হতে চান তিনি। অন্তরীণ হতে চান নিজের ভেতর। তাঁর এখন কারো আকুতিতেই আর সাড়া দেওয়ার শক্তি নেই। এখন তাঁর শরীরে সমন—

একটু পরে বিড়বিড় করে ঠোঁট নড়তে লাগল তাঁর, কিছু দুশ্চিন্তা কোরো না স্বর্ণ। কিছু ভাবিস নে, শিশু। এভাবেই একে-একে সবাইকেই যেতে হবে আমাদের। পৃথিবীর মানুষদের জন্য নিশ্বাসের শেষ বিন্দুটুকুও বোধহয় রেখে যেতে পারব না আমরা—

দুই

পৃথিবীর ছোট্ট একটি দেশে ফুটফুটে এক কোটালপুত্রের নরম ফুসফুস তখন উঠছে আর নামছে হাপরের মতো। সামান্য একটু বাতাসের জন্য তার ছোট্ট শরীরে প্রবল আকুতি। একমুঠো বাতাস, মাত্র একমুঠো, তাও তখন কেউ রেখে যায়নি তার জন্য। তার ফুসফুসে তখন তুল্যমূল্য লড়াই চলছে আরো একটু বেঁচে থাকার ইচ্ছেয়। বাতাস, শুধু একটু বাতাস—

কোটালের কুটিরটি বিশাল, পরিসরও কম নয়, তার ভেতরে প্রশস্ত চৌকিতে রুগ্‌ণ শীর্ণ শরীরে শুয়ে দুর্বল হাত পা ছুঁড়ছে কোটালের সেই আদরের শিশু। তার মুখ ফ্যাকাসে, কোটরে ঢুকে গেছে তার চোখদুটো, তার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখের মণি।

আর এই ভীষণ দৃশ্যের সামনে পাথর হয়ে বসে আছেন কোটালের স্ত্রী। একমাত্র

শিশুপুত্র এভাবে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আর অসহায়ের মতো তার শীর্ণ দুটো হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে মায়ের দিকে, আর বলছে, 'মা, জল—', এ দৃশ্য যে কী ভয়ংকর—

কাঁপা কাঁপা হাতে তার শুকনো জিবে একটু জল ঢেলে দিচ্ছেন, আর বলছেন, 'আর একটু ধৈর্য ধর, বাবা, এক্ষুণি সেরে যাবে।' বলছেন বটে কিন্তু তিনি জানেন এ কথা স্তোকবাক্য। জলের পাত্র রেখে ছেলের একমাথা ঝাঁকড়া চুলের ভেতর হাত গলিয়ে বিলি কাটছেন, আর প্রাণপণে থামাচ্ছেন উপচে ওঠা চোখের জল।

কুটিরের বাইরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পায়চারি করছেন কোটাল। কয়েকদিন ধরেই ভুগছিল ছেলেটা, আজ সকাল থেকেই হঠাৎ ভীষণ শ্বাসকষ্ট। যে অভিজ্ঞ বৈদ্য এ কদিন চিকিৎসা করছিলেন, তিনি আজ তাঁর পুত্রকে দেখে ভীষণ চমকে উঠে বললেন,'কী সর্বনাশ!' তারপর হাতের নাড়ি টিপে হতাশায় ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলেছেন, 'না, কোটাল, পুত্রের প্রাণের আর কোনো আশা নেই। যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে সে আক্রান্ত, তার কোনো নিদান জানা নেই আমার। এখন যে কোনো মুহূর্তেই তার প্রাণবায়ু উড়ে যাবে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে!'

বৃদ্ধ বৈদ্যের রায় শুনে তখন থেকে একনাগাড়ে কেঁদে চলেছেন কোটালের স্ত্রী। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে তাঁর। চোখের কোণে এখনো শুকিয়ে রয়েছে অশ্রুর ফোঁটা। আর কোটাল নিজেও কি ভেতরে ভেতরে কম কেঁদেছেন! এই একটি মাত্র পুত্রকে ঘিরে কত না স্বপ্ন ছিল তাঁর মনে। একমাথা কালো ঝাঁকড়া-চুল, টুকটুকে ফরশা রং, দু-চোখে মিষ্টি চাউনি, তার আধো-আধো কথার মায়াজালে এতদিন বুঁদ হয়ে থেকেছেন, আর ভেবেছেন একদিন তাঁর এই পুত্রই হবে এ দেশের অহংকার। মন্ত্রীটন্ত্রী না হলেও অন্তত দারোগা। অথচ সেই ফুটফুটে পুত্রই আজ একটুকরো বাতাসের জন্য—

বুকের কাছে হাতদুটো ন্যস্ত করে তিনি পায়চারি করছেন, আর আফশোস করছেন, এদেশের রাজা একবারও তাঁর পুত্রের খবর নিলেন না! তিনি ব্যস্ত আছেন তাঁর বিলাস-ব্যসন নিয়ে। অন্তত রাজবৈদ্যকেও যদি একবার পাঠাতেন তাঁর কুটিরে, তবু হয়তো একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যেত। কিন্তু রাজার তো এক বিন্দু লক্ষ নেই তাঁর প্রজাদের ওপর। না হয় এ-বছর একটু বেশিই উৎকোচ নিয়ে ফেলেছেন কোটাল—

রাজমন্ত্রীও খবর পেয়েছিলেন কোটালের এহেন দুঃসংবাদের। কিন্তু তিনিও তো সদাব্যস্ত, কীভাবে রাজকোষাগার থেকে ছলে-বলে-কৌশলে লুণ্ঠন করে বাড়াবেন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ। রাজা বিলাসব্যসনে ব্যাপৃত থাকায় রাজমন্ত্রীর এখন পোয়াবারো। কোনোরকমে তিনি একবার কোটালের কুটিরের বাইরে এসে দরজার ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে, মৃত্যু-পথযাত্রী কোটালপুত্রকে দেখে তাঁর দায় সেরে, পরক্ষণেই 'বহু কাজ পড়ে আছে' বলে চলে গেলেন অতিদ্রুত।

যে অভিজ্ঞ বৈদ্য কোটালপুত্রকে দেখে শুকনো মুখে জবাব দিয়ে গেছেন, তাঁকে কোটাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রুগিকে দেখে কিছুই কি আপনি বুঝতে পারছেন না, বৈদ্য? আপনার এত নামডাক, যশ—

বৈদ্য মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, না, কোটালমশাই, এ অতি দুরারোগ্য ব্যাধি। আর এ-ব্যাধি তো শুধু আপনার পুত্রের নয়, এ নগরের আরো অনেক শিশুরই তো এভাবেই জীবনান্ত হচ্ছে আজ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কোটাল, আপনার এবং আরো অনেক শিশুর জন্মমুহূর্তেই তাদের প্রাণভোমরা গচ্ছিত ছিল অর্জুনের কাছে। অর্জুন নিজেই এখন বিপন্ন। তিনি শেষ শয্যায় শয়ান। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিবে যাবে

এ-দেশের অনেক শিশুর জীবন যাদের তিনি বেঁচে থাকার রসদ জোগাচ্ছিলেন এতদিন।
কথাটা মনে পড়তেই তাঁর মাথার চুল ছিঁড়তে চাইলেন নগরের কোটাল।

তিন

সকাল থেকে একনাগাড়ে এতগুলি পঙ্ক্তি লেখার পর লেখক কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে তাঁর কলমটি তুললেন পৃষ্ঠা থেকে। দোমড হয়ে আসা আঙুল টেনেটেনে সিধে করার চেষ্টা করছেন, সেসময় হঠাৎই খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন তাঁর বৈজ্ঞানিক-বন্ধুটি। ঢুকেই চট করে টেবিলের ওপরে রাখা পৃষ্ঠাটিতে একবার চোখ বুলিয়ে মুচকি হাসলেন, ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, বেড়ে আছো হে, লেখক, ওদিকে পৃথিবী গোল্লায় যাচ্ছে, আর তুমি ঘরের ভেতর ধ্যানমগ্ন হয়ে রূপকথার গপ্পো লিখে যাচ্ছ! লেখা থামিয়ে এই কাগজটা পড়ো—

লেখকের এই বৈজ্ঞানিক-বন্ধুটি প্রায় আধ-পাগল গোছের। রোজই তাঁর লেখার মাঝখানে উসকোখুসকো চুলে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে, একটানা বক বক করে তাঁর সময় নষ্ট করে দেওয়াটা এখন রোজনামচার মতো। গলার শির ফুলিয়ে, চোখে আগুন ঝরাতে ঝরাতে বক্তৃতার ঢঙে আউড়ে যান তাঁর খটোমটো দিব্যবাণী। আজ অবশ্য মৃদু হেসে বাড়িয়ে দিলেন একটি ছাপানো কাগজ, তাতে লেখা :

'শেষের সেই ভয়ংকর দিনগুলোর খুব বেশি দেরি নেই আর। পৃথিবীর চারপাশে দুশো কিলোমিটার পর্যন্ত ঘিরে রয়েছে যে বায়ুমণ্ডল, সেই বায়বীয় সংসারে এখন এক দারুণ গোলযোগ। তার প্রথম দশ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ু অপেক্ষাকৃত ভারী, যা পৃথিবীর পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে প্রাকৃতিক নিয়মে। বাতাসে ভাসমান ছোট ছোট জলকণা দিয়ে তৈরি হয় যে মেঘ, তা বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসার আগে সঙ্গে জুটিয়ে নেয় বাতাসের সূক্ষ্ম ধূলিকণা। সেই সঙ্গে সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি অন্যান্য গ্যাস। এভাবেই নাইট্রোজেন, সালফার ও অন্যান্য মৌলগুলি প্রকৃতিতে চক্রাকারে আবর্তিত হয় মানুষের প্রয়োজন মেটাতে।

কিন্তু গত কয়েকদশকে শক্তির চাহিদা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পোড়াতে হচ্ছে কয়লা আর খনিজ তেল, তাতে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস যেমন বেড়ে যাচ্ছে, তেমনই বাতাসের নাইট্রোজেন পুড়ে তৈরি হচ্ছে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন অক্সাইড, ফলে বাতাসের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। যার অবশ্যম্ভাবী কারণে এই গ্যাসগুলি জলীয় বাষ্পে দ্রবীভূত হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে অ্যাসিড বৃষ্টির রূপ ধারণ করে। তাতে হ্রদ বা পুকুরগুলির জল অম্লধর্মী হয়ে অব্যবহার্য হয়ে পড়ছে মাছ বা অন্যান্য জলজপ্রাণীর পক্ষে। সেই সঙ্গে ধ্বংস হতে শুরু করেছে বনাঞ্চল।

তা ছাড়াও বায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, যা মূলত তৈরি হয় বিভিন্ন জ্বালানির দহনের সঙ্গে নানা প্রাকৃতিক দহনে, সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসকার্যের ফলেও বটে। এভাবে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড কিছুটা ব্যবহৃত হয় যাবতীয় উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়, কিছুটা সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত হয়ে সামুদ্রিক প্রাণীদের প্রয়োজনে লাগে। মানবসভ্যতার চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে সালফার ডাই-অক্সাইড বা নাইট্রোজেন অক্সাইডের মতো এভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও বেড়ে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত বিঘ্ন ঘটতে শুরু করেছে প্রাকৃতিক চক্রে।

আর তাতেই গোটা পৃথিবীই এখন একটা গ্রিনহাউস।'

গ্রিনহাউস ব্যাপারটা কী, তা জানার জন্য মুখ তুলতেই লেখক দেখলেন, তাঁর আধপাগল বৈজ্ঞানিক-বন্ধু ততক্ষণে তাঁর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত। অতএব নিশ্চিন্ত হয়ে আবার লিখতে শুরু করলেন সেই রূপকথার গল্পটা।

চার

অর্জুনের শিরশ্ছেদ পর্ব তখনো শেষ হয়নি, তার আগেই ধারালো অস্ত্রহাতে আর-একদল রাক্ষস ঘিরে ধরেছে পাশেই দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকা শিশুটির শরীর। রাক্ষসদের সমস্ত শরীর জুড়ে তখন প্রবল উল্লাস, উদ্যত কুঠার হাতে নিয়ে তারা তখনো বলাবলি করে চলেছে এর পর আর কার কার শিরশ্ছেদ করা হবে। এই ভয়াল নিধনযজ্ঞে তাদের লালসার সামনে বলি হবে আর কোন কোন মহীরুহ।

যন্ত্রণায় কাতর অর্জুন তখন শিউরে উঠছেন শিশুটির অসহায়তা দেখে। মাত্র কিছুকাল হল তার জন্ম হয়েছে, এই পৃথিবীর যাবতীয় রহস্যের কতটুকুই বা সে আর দেখেছে! তার সামনে এখনো দীর্ঘজীবন। তাবু তাকেও ওই রাক্ষসেরা—

প্রবল যন্ত্রণায় অর্জুন তখন প্রায় বাকরুদ্ধ, তবু বিড়বিড় করে বললেন, নিয়তিকে মেনে নে, শিশু। শুধু তোর নিয়তিই তো নয়, এর সঙ্গে ওতপ্রোত আরো বহু জীবনের নিয়তি। আমাদের প্রত্যেকেরই সীমাবদ্ধতা আছে, সে সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে আরো বেশি কিছু পাওয়ার লোভেই উপস্থিত হয় এরকম সংহার স্পৃহা।

শিশুটির সংজ্ঞা তখনো লুপ্ত হয়নি, অর্জুনের কথা তার কানে ঢুকল কি ঢুকল না কে জানে, শুধু তার ঘোলাটে, ধূসর চোখ মেলে অস্ফুটস্বরে বলল, যন্ত্রণা, খুব যন্ত্রণা, আর তো পারছি নে—

সেই নিদারুণ দৃশ্য দেখে চলতে চলতে হঠাৎ স্তম্ভিত হল মরসুমি হাওয়া, চেঁচিয়ে বলল, সে কী, তোমরা এই শিশুকেও—!

ফুল-গুল্মলতা বুনো চারার দল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সেই নিধনদৃশ্যের দিকে। ককিয়ে উঠে বলল, ওকে মেরো না, ও তো নিতান্তই শিশু।

আর কুচি-কুচি মেঘ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কেন মারছ ওকে! তোমাদের বোধবুদ্ধি সবই কি শেষ!

পাঁচ

দেশের মন্ত্রী তখন তাঁর মাথার টুপি সামলাতে সামলাতে ফন্দি আঁটছেন তাঁর নিজস্ব কোষাগারটির যে সামান্য অংশ তখনো ফাঁকা আছে, তা কীভাবে পূর্ণ করা যাবে! কত বণিকই তো ধূর্তচোখে ঘোরাফেরা করছে তাঁর অট্টালিকার আশেপাশে, তাদের কাউকে প্রার্থিত বরটি দিয়ে দিলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তাঁর। বর অর্থাৎ বরাত। কিন্তু দিনকাল তেমন ভালো নয়, এখন চারদিকে খুব ধরপাকড় চলছে বিচারালয়ের আদেশে। মন্ত্রীদের আর রাজপুরুষদের এখন ভারি দুর্যোগের দিন। আগে বরাত দিয়ে এখন ধরা পড়ছেন কত রথী-মহারথী, তাতে তাঁদের বরাত এখন একদম ফুটো। সেক্ষেত্রে মন্ত্রী আবার নতুন করে বরাত দিয়ে তাঁর বরাত ফুটো করার ঝুঁকি নেবেন কিনা—

ঠিক এরকম একটা ভাবনার মুহূর্তে হঠাৎ তাঁর এক দেহরক্ষী এসে খবর দিলেন, হুজুর, একবার অন্দরমহলে আসতে হয়। আপনার কন্যা কেমন যেন করছে!

মন্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন, কেমন করছে। আরে। দুখানা কেক খাইয়ে দাও।

—আজ্ঞে, কেক খাওয়াব মতো অবস্থা নেই। খাবি খাচ্ছে এখন।

মন্ত্রীব পাঁচ বছবেব কন্যাব তখন শ্বাসবুদ্ধ হয়ে ঠিকবে বেবুচ্ছে চোখ। কয়েকদিন ধবেই ঘ্যান ঘ্যান কবছিল, হঠাৎই বিকেলেব দিকে শুবু হয়েছে শ্বাসকষ্ট। গায়েব চামড়া কুঁচকে কালো ছোপ-ছোপ।

মন্ত্রীজায়া তখন শৌখিন আয়নাটি সামনে বেখে বেশ আনমনা হয়ে সাজগোজ কবছিলেন বকমাবি প্রসাধনসামগ্রী দিয়ে। বোজই নতুন প্রসাধনে নতুনভাবে সাজ কবাটা তাঁব অন্যতম নেশা। ঠিক সেই সময় পাঁচ বছবেব ছোট্ট মেয়ে ছটফট কবে উঠে বলল, মা—

—কী হয়েছে, মা ? মন্ত্রীজায়া ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তৎক্ষণাৎ। সঙ্গে সঙ্গে খববও চলে গেল বাজ্যেব সেবা বৈদ্যেব কাছে। অভিজ্ঞ বৈদ্য, চিকিৎসায় ধন্বন্তবি, কপালে ত্রিবলী, মাথাব পেছনদিকে মস্ত শিক্যা। কিন্তু তাঁব হাতযশ খুব। তিনি ছুটে এসে ঝুঁকে পড়লেন হাপবেব মতো শ্বাস নিতে থাকা পাঁচবছবেব কন্যাব দিকে। দেখলেন, আব অবাক হলেন, কেননা ক-দিন আগেও মেয়েটি বজনীগন্ধাব মতো ফুটফুটে, সুন্দব ছিল। এবই মধ্যে সে মিশে গেছে নবম বিছানাব ভেতব। হাঁপাচ্ছে আব কী যেন অস্ফুট কণ্ঠে বলছে তাব ছোট্ট হাত দুখানি নেড়ে, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্ববই বেবুচ্ছে না।

অভিজ্ঞ বৈদ্য তাঁব কপালে ভাঁজ ফেলে বহুক্ষণ পবীক্ষা কবলেন মেয়েটিকে। দীর্ঘসময় নাড়িতে আঙুল বেখেও বুঝে উঠতে পাবলেন না, কী নিদান দেবেন তাঁব বুগিকে। মনে হচ্ছে, তাঁব শাস্ত্রে যত ভেষজেব গুণাগুণ বর্ণনা কবা আছে, তাব কোনোটিই প্রযোজনে লাগবে না আজ। অনেকক্ষণ তাব নাড়ি ছেড়ে দিয়ে হতাশায় মাথা নিচু কবলেন, না, মন্ত্রীমশাই, আমাব কিছু কবাব নেই। আপনাব কন্যাব আয়ু ফুবিয়ে এসেছে। শুধু আপনাব নয়, আবো বহু ছোট ছোট প্রাণ একই সঙ্গে ফুবিয়ে ফেলেছে তাদেব যাত্রাপথ।

শুনে মন্ত্রীজায়া আছড়ে পড়লেন মাটিতে। মন্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে বইলেন এত দিনেব পুবোনো বৈদ্যেব দিকে। ভাবলেন, তাহলে তাঁব এতদিনেব উপার্জন কাব কাজে লাগবে ! আর্তনাদ কবে জিজ্ঞাসা কবলেন, কেন, বৈদ্যমশাই, কী হয়েছে আমাব মেয়েব !

বৈদ্য ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, আপনি তো জানেন মন্ত্রীমশাই, অর্জুনেব শিবশ্চেদেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁব ছায়ায় বড় হতে থাকা শিশুকেও সংহাব কবা হচ্ছে আজ। আপনাব কন্যাব এবং আবো অনেকেব পুত্রকন্যাব প্রাণভোমবাই তো জন্মমুহূর্তে গচ্ছিত ছিল ওই শিশুব শবীবেই।

বৈদ্য চলে যাওয়াব পব তখন মন্ত্রীব অট্টালিকায় শ্মশানেব স্তব্ধতা। বাজা খবব পেয়ে একবাব বাইবে থেকে মন্ত্রীকন্যাকে উঁকি দিয়ে দেখে, 'আমাব প্রচুব কাজ আছে' বলে নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়লেন তাঁব প্রাসাদে। এমনকী, বাজবৈদ্যকে একবাব পাঠাবাব প্রযোজনও বোধ কবলেন না। মন্ত্রী অসহায়েব মতো তাকিয়ে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকা তাঁব কন্যাব শীর্ণ শবীবেব দিকে।

ছয়

সন্ধেব একটু পবেই বৈজ্ঞানিক-বন্ধুটি আবাব এসে ঢুকলেন লেখকেব ঘবে। লেখক তখনো ভাবি নিবিষ্ট হয়ে একটা বস্তাপচা বূপকথা নতুন করে লিখে চলেছেন, সে-দৃশ্য দেখে মর্মাহত হয়ে বললেন, মানুষেব ঘাড়েব ওপব সর্বনাশেব খাঁড়া ঝুলে আছে,

আর তুমি তার দিক থেকে পিঠ ফিরিয়ে ছাইপাঁশ লিখছ সারাদিন ধরে! কী অন্যায়! তা পড়েছিলে সেই লেখাটা?

লেখক বিব্রতভাবে তুলে ধরলেন পাশেই জিরোতে থাকা কাগজটির পরবর্তী অংশ। বেশ ঝকঝকে অক্ষরে লেখাটা পিঁপড়ের মতো কিলবিল করে উঠল তাঁর চোখের সামনে।

'আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীটাই এখন পরিণত হতে চলেছে একটা মস্ত গ্রিনহাউসে। পুরোপুরি কাচ দিয়ে ঢাকা কোনো ঘরে সূর্যের বিকিরিত রশ্মি ঢুকে যেতে পারলেও, ঘরের ভেতর থেকে যে বিকিরিত রশ্মি নির্গত হবে, মাটির সংস্পর্শে এসে তা তপ্ত হয়ে ওঠার কারণ অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে যায় তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, ফলে বাইরে বেরুতে গিয়ে বাধা পায় আর তাতেই এত গরম হয় কাচের ঘর। পৃথিবীর চারপাশের বায়ুমণ্ডল অনেকটা কাচের ভূমিকা পালন করে বলেই পৃথিবীটাও অনেকটা গ্রিনহাউসের মতো।

পৃথিবীর চারপাশে প্রথম দশ কিলোমিটার পর্যন্ত সেই বায়ুমণ্ডল যেমন দূষিত হয়ে বিঘ্নিত করছে প্রাকৃতিক চক্র, তেমনই দশ কিলোমিটারের পর থেকে পরবর্তী দুশো কিলোমিটার পর্যন্ত যে বিস্তৃত বায়ুস্তর—স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার নামে পরিচিত সেই বায়ুমণ্ডলের ভেতর ওজোনগ্যাসের হালকা স্তব রয়েছে গোটা পৃথিবীটাকে ঘিরে। পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাপনের পক্ষে এই ওজোনস্তরের যে একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা হল, সূর্য রশ্মি থেকে নির্গত অতিবেগুনি রশ্মিকে প্রতিহত করা, যে অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের চামড়ার পক্ষে খুবই মারাত্মক।

মার্কিন দেশের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শেরি রাউল্যান্ড তাঁর ল্যাবরেটরিতে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চালাতে উনিশশো তিয়াত্তর সালে হঠাৎ মানবজাতির প্রতি এক সতর্কবাণী জারি করে জানান, ক্লোরোফ্লুরো-কার্বন নামে একটি রাসায়নিক যৌগ দ্রুত ধ্বংস করে দিচ্ছে বায়ুমণ্ডলের এই ওজোনস্তর। এই যৌগটি আসলে ব্যবহৃত হয় রেফ্রিজারেটর ও অন্যান্য শীততাপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রে, তা ছাড়া এক ধরনের প্লাস্টিকের বাক্সে ও নানা রকমের স্প্রে ও রং তৈরির ব্যাপারেও। এই ক্লোরোফ্লুরো-কার্বন খুব আস্তে আস্তে বায়ুমণ্ডলের ওপরে উঠে ওজোনস্তরে মিশে যাচ্ছে, ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ভেঙে তৈরি করছে অক্সিজেন। ওজোনস্তরের এই ভেঙে যাওয়াটাই হল সর্বনাশের মূল। ওজোনস্তর ফুটো হয়ে গেলে সূর্যরশ্মির সঙ্গে পৃথিবীর মাটিতে এসে পৌঁছবে অতিবেগুনি রশ্মি, যা চামড়ায় লেগে সৃষ্টি করে ক্যান্সারের।

তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে প্রাকৃতিক চক্র বিঘ্নিত হওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথিবীতে সৃষ্টি করছে গ্রিনহাউস এফেক্ট, তাতে ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী। তাতে দক্ষিণ মেরুর জমে থাকা বিপুল পরিমাণ বরফ গলে চলে আসবে সমুদ্রে, ফলে সমুদ্রের জলতল অপেক্ষাকৃত উঁচু হয়ে যাবে, এহেন জলস্ফীতির কারণে সমুদ্রোপকূলের এক অগণিত জনসংখ্যাকে চিরতরে সরে আসতে হবে তাদের জন্মভিটের বসবাস ছেড়ে। তাছাড়া, আরো সর্বনাশা হল সমুদ্রের নোনাজল ঢুকে আসবে নদীর ভেতর, তাতে সেচকার্য বন্ধ হবে, ধরিত্রী হয়ে পড়বে শস্যহীনা, সেইসঙ্গে ভূগর্ভে পানীয় জলের স্তরও অব্যবহার্য হয়ে পড়বে মানুষের পক্ষে।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের এই ক্রমবর্ধমানতা, সেইসঙ্গে প্রাকৃতিক চক্র বিঘ্নিত হওয়ার কুফল একমাত্র বুঝতে পারে বনাঞ্চল, কিন্তু সেই অরণ্যও তো এখন অর্থলোভী দৈত্যদের কুঠারের সামনে।'

এই পর্যন্ত পড়ে লেখক চোখ তুলে আবিষ্কার করলেন তাঁর অস্থিরমতি, ছটফটে বৈজ্ঞানিক-বন্ধুটি ইতিমধ্যে ঘর থেকে উধাও। হাঁফ ছেড়ে খটোমটো বক্তৃতাটি একপাশে সরিয়ে রেখে তিনি পুনর্বার নিবিষ্ট হলেন তাঁর লেখার পৃষ্ঠায়—

সাত

রাক্ষসদের কুঠারের সামনে অতঃপর যে মহীরুহ, তিনি সেগুন। সে দৃশ্য দেখে শেষবারের মতো অর্জুন তাঁর দীর্ঘ চোখের পলক বোজাতে বোজাতে শিউরে উঠে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, তাহলে তোমাকেও, সেগুন!

আট

রাজকার্যের চেয়ে এ-দেশের রাজার কাছে বিলাসব্যসনই ভারি প্রিয়। দেশজুড়ে যে কান্নার রোল ইনিয়েবিনিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাসে, ভারী করে তুলেছে গোটা রাজ্যপাট, তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই তাঁর। তিনি তখনো আলস্যে সময় কাটাচ্ছেন দাবার ঘুঁটি বিছিয়ে। মন্ত্রী, ঘোড়া, নৌকো, গজের দিকে আলতো করে নজর ছুঁয়ে এবার তাকালেন সামনে বসা বয়স্যের দিকে। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসিটি সেলোটেপ দিয়ে এঁটে একটা সামান্য বোড়ে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কিস্তি।

কপালে তিলককাটা বয়স্যও কিছু কম যান না, বোড়ের চালটি দেখে জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁর দুইচোখ, যেন চুকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন রাজার এই মোক্ষম ভুলটির জন্যে, তৎক্ষণাৎ রাজার মন্ত্রীটাই একটা ঘোড়ার আড়াই লাফে সংহার করে খুকখুক করে হাসলেন, কিস্তি, মহারাজ।

হতচকিত রাজা সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল তখন, তাঁর এই দুর্যোগের সুযোগে তাঁর একজন বলশালী দেহরক্ষী দরজার ওপাশ থেকে তৃতীয় বারের মতো মুখ বাড়িয়ে বলল, হুজুর, রাজপুত্র যে মারা যাচ্ছেন—

—যে যাচ্ছে তাকে যেতে দাও, এভাবেই অন্যমনস্কের মতো বলতে যাচ্ছিলেন রাজামশাই। সহসা তাঁর প্রসাদের ভেতর থেকেও কান্নার রোল শুনে সম্বিত ফিরল যেন, স্তম্ভিত হয়ে বললেন, কী বললে!

বয়স্যও এসময় আস্তে আস্তে বললেন, মহারাজ, আপনার বোধহয় এ সময়ে একটু অন্দরমহলের দিকে যাওয়া উচিত।

সাদা ধবধবে ফরাসের আরাম ছেড়ে রাজা যখন অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন, তখন রাজপুত্রের অন্তিমকাল। চার বছরের শিশুপুত্রের ক-দিন ধরেই অসুস্থতা চলছিল, রাজবৈদ্য দু-বেলাই তাকে পরীক্ষা ক'রে নিদান দিয়ে চলেছিলেন তাঁর সাধ্যমতো, এর মধ্যে কখন যে রাজপুত্রের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে তা জানতেও পারেননি রাজা, বা বলা ভালো তাঁর বিলাসব্যসনের ভেতর সে সংবাদ প্রবেশ করতেই পারেনি কোনোভাবে। এখন সম্বিত ফিরতে রাজপুত্রের ঘরে ঢুকে দেখলেন, দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় রাজপুত্রের ছোট্ট শরীরটা আরো ছোট্ট হয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানছে। কিন্তু শ্বাস যেন টানতেই পারছে না আর। তার পাণ্ডুর মুখেচোখে আসন্ন মৃত্যুর ঘোর প্রস্তুতি। সারা গায়ে কালো ছোপ ছোপ ঘা। দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে সেই ঘা থেকে।

ততক্ষণে ঘরের ভেতরে ও বাইরে মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছেন রাজবৈদ্য থেকে শুরু করে দেশের অন্য অন্য সেরা সব বৈদ্য, হেকিম, কবিরাজ। তাঁদের এতকাল ধরে শেখা সমস্ত বিদ্যে, অভিজ্ঞতা আজ ব্যর্থ। কোনো নিদানেই আর কাজ হচ্ছে না।

রাজপুত্র এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যে কাজে লাগছে না কোনো ভেষজবিদ্যাও।

রানী তখন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ গুঁজে ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছেন। কী ভযংকর সেই কান্না! সেই কান্নার দৃশ্য আর তাঁর শিশুপুত্রের মৃত্যুর প্রস্তুতি দেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন অসহায রাজা। যেন তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না তাঁর আদরের পুত্র এভাবে মারা যেতে পারে! তারপর হঠাৎ পাগলের মতো বলে উঠলেন রাজবৈদ্যকে, আপনারা যা হোক একটা কিছু করুন। আপনাদের চোখের সামনে এভাবে রাজপুত্র মারা যাবে—!

রাজার আকুতি শুনেও মাথা নিচু করে রইলেন রাজবৈদ্যসহ দেশের সমস্ত বৈদ্য, হেকিম, কবিরাজ! কী বলবেন রাজাকে। কীভাবে সান্ত্বনা দেবেন তাঁকে তা বুঝে উঠতে পারলেন না কেউ। আর শুধু তো রাজবাড়িতেই নয়, কান্নার রোল তখন ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশের এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়িতে। রাজ-অট্টালিকা থেকে দরিদ্রের পর্ণকুঠির, সর্বত্রই। একমুঠো বাতাসের জন্য তখন অসহায়ভাবে লড়াই করে যাচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের ফুসফুস।

নয়

বিশাল জঙ্গল ঘিরে ক্যাপ বসেছে। কদিন আগেই ফরেস্ট অফিসার এসে জঙ্গলের কোন কোন এরিয়ায় ক্যাপ হবে তার সীমানা নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন দাগ দিয়ে। ঠিকাদারের লোক এসে জড় হয়েছে সেই সীমানার ভেতর। মস্ত পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে ঠিকাদার গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর লেবারদের, হ্যাঁ, এবার ওই সেগুনটা।

জঙ্গলে ঢুকতেই যে বিশাল সেগুনগাছটা এতকাল দাঁড়িয়েছিল বুক চিতিয়ে, আর-একটু পরেই দেহান্ত হবে তার। একটু দূরেই সার সার শুয়ে আছে কটা শিরীষ, শাল আর শিশু। ওপাশে শুয়ে আছে বিশাল অর্জুন, তার ডালে, কাণ্ডে, পাতায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে একটি স্বর্ণলতা।

পৃথিবীর নরম মাটিতে তখন শেষ শয্যায় শুয়ে অর্জুন হাপ্‌সি কাটছেন, বিড়বিড় করে নড়ছে তাঁর পাণ্ডুর হয়ে আসা ঠোঁটদুটো। একটু কান করলেই শোনা যাবে ভেসে আসছে তাঁর অন্তিম কণ্ঠস্বর : হে ঈশ্বর, এরা জানে না এরা কী করছে। তুমি ওদের ক্ষমা কোরো।
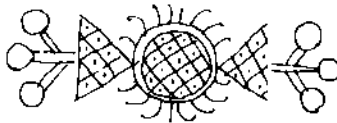
৪+১ ॥ নবারুণ ভট্টাচার্য

বৃষ্টি পড়েছিল সেদিন সারাদিন ধরে। যদিও জল জমার মতো জোরে নয়। ঠাণ্ডা হাওয়া। দিনের আলো ছিল কম। ট্রামের চালক খুব একটা সতর্ক না থাকলেও ব্রেক সে ঠিকই করেছিল। আর ট্রামটা তখন সদ্য মোড় ঘুরেছে বলে খুব একটা জোরেও চলছিল না। ঘষটে লাইন কামড়ে থেমে যাওয়ার আগেই ধাক্কাটা লেগে যায়। সামনের দুজনেরই অল্প চোট লাগে। পেছনের দুজনের লাগেনি। একজনের কপাল ফেটে গিয়েছিল। অন্যজনের নাকে লাগে। মাড়ি ও দাঁতেও। দুজনেরই রক্ত পড়ছিল। যারা দৌড়ে এসেছিল তাদের কাছে শোনা। ওদের চারজন বাদে আর একজন যে ছিল সে মৃত। খাটের সঙ্গে কালো প্লাস্টিক জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সচরাচর এরকম মৃতদেহের খাটে ধূপকাঠির গোছা, ফুল এসব থাকে। সেসব কিছুই ছিল না। পরে জানা গিয়েছিল যে মৃতদেহটির মাথার কাছে একটি ময়লা কাপড়ে জড়ানো একটা ভাঙা কালো চশমা, কয়েক টুকরো চকখড়ি, কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ ও আধখানা থিন এরারুট বিস্কুট ছিল। আশা করা গিয়েছিল যে ছেঁড়া কাগজের মধ্যে কোনো হদিশ হয়তো পাওয়া যাবে। যায়নি। কাগজে অর্থহীন কিছু আঁকিবুকি ছিল। কষ্ট কল্পনাতে হয়তো মানে একটা বের করা যায় কিন্তু তারও কোনো মানে হয় না।

সবচেয়ে ভয় পেয়েছিল ট্রামচালক। ভয় না পাওয়ারও কিছু নেই। কারণ মোড়টা ঘোরার পরেই সে দেখেছিল যে মুখোমুখি ওরা এগিয়ে আসছে। মৃতদেহ নিয়ে ওই চারজন। সরাসরি ট্রামের দিকে। হতভম্ব হয়ে সে তার খাঁচার মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল। রাস্তায় বেশি লোক ছিল না। তবুও ছোটখাটো একটা ভিড় জমে যায়। তারপর সকলেই ভয় পেয়ে যায়। ফোন করা হয়। পুলিস আসে।

ট্রামের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে চারজন শববাহক যে দাঁড়িয়ে যায় তারপর তারা আর নড়েনি। পুলিস এসে নিয়ে যাওয়া অবধি ট্রামকে রাস্তা ছাড়েনি। সামনের দুজনের মুখ বেয়ে রক্ত পড়ছিল। লোকে ওদের বলেছিল সরে যেতে। কয়েকজন উৎসাহী যুবক ভেবেছিল ওই চারজন এমনই নেশা করে আছে যে কোনো ওজরই তাদের কানে ঢুকছে না। একে মেঘলা, বৃষ্টি, আবছা তার ওপরে শহরের এই এলাকাটায় বাড়িগুলো পুরোনো দিনের হলেও বেশ উঁচু যদিও তলায় তাদের আলো ঝলমলে নতুন দোকান আছে। বিকেল গড়ালেই এখানে ছায়া ঘনিয়ে আসে। সে দিন ছায়া ছিল তার ঢের বেশি। বুদ্ধিমান নাগরিক, যারা খতিয়ে দেখে কিসের পেছনে কি তা আঁচ করতে পারে, তারা বলেছিল এটা একটা কেরামতি বা স্টান্ট। ওপরে যে লোকটার মৃতদেহ সে নাকি জ্যান্ত। এরাও এক একজন অভিনেতা। সবটাই এক ছক। হতে পারে কোনো নাটকের দলের বেয়াড়া বিজ্ঞাপন বা উটকো রসিকদের বোকা রগড়। পুলিস, মানে প্রথমে যারা এসেছিল তারাও ভেবেছিল তেমনই একটা কিছু। অথচ দোলের সময় মড়া সাজিয়ে যে চ্যাংড়ারা মজা পায় এদের সেরকম আদল নয়। হেরোইন খেয়ে বুঁদ

বা ওরকম কিছু হবে। সাধারণ লোক, সাধারণ পুলিস এইসবই ভাবে। এদের ওপরে ভাবে অসাধারণ লোক, অসাধারণ পুলিস। নতুন চাকরি পাওয়া যুবক আই পি এস অফিসারটিও তাই ভেবেছিল। গণ্ডগোল যে খুব একটা জমেছিল এমন নয়। পরপর কয়েকটা ট্রাম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একটা ভিড়, একটা জটলা, নির্বাক, নিরুত্তর চারজন শববাহক এবং কালো প্লাস্টিকের চাদর জড়ানো দড়িবাঁধা একটি মৃতদেহ, শীর্ণ একটি প্রৌঢ় মানুষের যার মাথার কাছে নোংরা কাপড়ে জড়ানো ছিল চশমার একটা ফাটা কালো কাচ, ডাঁটি সুতোয় বাঁধা কালো চশমার ফ্রেম, বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ক্যাম্পে যেরকম দেওয়া হয়, কয়েক টুকরো বলতে যখন আর লেখা যায় না সেরকম কয়েকটা চকখড়ির অবশেষ, কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ যাতে যোগচিহ্ন, ফুটকি ও '৫' লেখা ছিল বলে দাবি করা হয়েছে কিন্তু এ হল কয়েকটি অস্পষ্ট ও আনাড়ি পেন্সিলের দাগ নিয়ে গবেষণার ফল এবং এবড়োখেবড়োভাবে খাওয়া আধভেজা আধখানা থিন এরারুট বিস্কুট যা কে খেয়েছিল জানা যায়নি, অন্তত মৃত যে সে তো খায়ইনি কারণ ব্যবচ্ছেদের পর তেমন কিছু জানা যায়নি। পরপর কয়েকটা ট্রাম দাঁড়িয়ে গেলে মাছির মতোই উড়ে আসা ন্যাংটো, গায় ঘা ভিকিরির বাচ্চারা ওঠানামার খেলা করে। যাই হোক, সেই তরুণ আই পি এস অফিসারটি ঠাণ্ডা মাথায় আদেশ করলেন ওই চারজন শববাহককে শবসহ গ্রেপ্তার করতে। সবুজ বা নীল চ্যানেলের মাধ্যমে এমনও ব্যবস্থা করলেন যাতে এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃতদেহটিকে মৃতদেহ অবিকৃত রাখার কোনো শবাগারে পাঠিয়ে বরফ দিয়ে রাখা হয়। এবং মৃতদেহ ও বরফ ঘিরে বালির বস্তা। মৃতদেহটি বুবি ট্র্যাপ হতে পারে। ওই চারজন শববাহককে নিয়ে যাওয়া হল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। হাতকড়া পরিয়ে। পুলিসের প্রতিবেদনে জানা যায় যে শববাহী খাটের চারটি পায়া তারা যেমন কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল হাতে হাতকড়া পরাবার সময় তাদের হাতে সেই বেপরোয়াভাব ছিল না। ওরা চারজনেই সারাক্ষণ চোখ খুলে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। ওদের নাকি চোখের পলক পড়েনি। জিজ্ঞাসাবাদের সময়েও না।

আই পি এস অফিসারটি ভুল করেননি। বোম্বাই বিস্ফোরণ, কলকাতা বিস্ফোরণ, দক্ষিণ ভারতে বিস্ফোরণ, পাক মদতে আতঙ্কবাদ—এই ভয়াবহ সময়ে কি কেন্দ্র, কি রাজ্য, কেউই কোনো ঝুঁকি নিতে পারে না। লেনিন পড়ে তিনি জানেন যে অতি বাম ও অতি দক্ষিণ হাত মেলায়। এই হাভাতে চোয়াড়ে, পোড়খাওয়া চেহারার চারটি মানুষ যে কি তা জানা দরকার। 'কারলোস' ধরা পড়েছে ঠিকই। তাতে কি? টাইগার মেনন কোথায়? বহুতল বাড়ির জানলা থেকে উড়ে বেরোনো সেই চিত্র তারকার রহস্য! নার্গিসের ছেলে! আর ডি এক্স। এ কে-৫৬। ড্রাগ। ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম পাচার। ভারতের পরমাণু বোমা আছে না নেই? থাকুক আর না থাকুক এ অবস্থায় কোনো অসংগতিই উপেক্ষা করা যায় না। হয়ওনি। বাস্তব জীবনটা তো আর 'রোজা' বা '১৯৪২—একটি প্রেমের গল্প' নয়।

দুই

জিজ্ঞাসাবাদের পর্বের আগে মৃতদেহটি নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যা জানা গেল তা হল মৃতদেহটি এক শীর্ণ, বয়স্ক মানুষের যার মৃত হয়ে যাওয়া দেহটির মধ্যে দেহের মধ্যে যা যা থাকে সেগুলি 'অপমানিত' অবস্থায় থাকা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। দেহের কোনো অঙ্গ চোট পেলে বা ব্যাধিতে দুর্বল হলে ভালো ডাক্তাররা বলেন 'ইনসাল্ট'।

যেমন ধরা যায় যার দুবার ন্যাবা বা কামলা হয়েছে, তার লিভার দুবার 'ইনসাল্ট' সহ্য করে বলে ডাক্তাররা ভালো হলে বলে থাকেন। মৃত যে দেহটি খাটের ওপরে কালো প্লাস্টিকে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল সেই মৃতদেহটির বিভিন্ন অঙ্গ যেমন যকৃত, বৃক্ক, মূত্রাশয়, পাকস্থলী, শিশ্ন, অক্ষি, অণ্ডকোষ সবই দেখা গেল 'ইনসাল্ট' সহ্য করেছে একাধিকবার। অধুনা এমন বিষয় নিয়ে মার্কিন দেশে গবেষণালব্ধ ফল পাওয়া গেছে যে ধর্ম, কাব্য, প্রেম, হিংসা, ন্যায়, চুরি, ক্ষুধা, যৌনতা, বউ-বোধ, সন্তান সংজ্ঞা, ধর্ষণের ইচ্ছা, মৌনতা, সংগীতলিপ্সা এসবই মস্তিষ্কের বা তার মধ্যে যে অর্থাৎ করোটির প্রকোষ্ঠে যে ঘিলু থাকে তার এক এক অংশের গুণাবলী। সেই জ্ঞান অনুযায়ী ওই শীর্ণ মৃতদেহটির মস্তিষ্ক নিয়ে যদিও এখনো পর্যাপ্ত ঘাঁটাঘাঁটি হয়নি কিন্তু আশার কথা এই যে অতীব শীতল হিমঘরে এখনো মৃত ওই দেহটিকে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় খরচে। অর্থাৎ মৃতদেহটি গবেষণার জন্য অপেক্ষমাণ।

চারজন শববাহকের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছিল বেশ ভদ্রভাবে। তুতিয়ে পাতিয়ে কথা আদায়ের জন্য। কথার মারপ্যাঁচে এইভাবে যাকে জেরা করা হয় যে ফাঁপরের পর ফাঁপরে পড়ে। কিন্তু এদের বেলায় সেভাবে লাভ হয়নি কারণ তারা চারজন কোনো কথা বলেনি। সবাই, মানে জিজ্ঞাসাবাদ যারা করে থাকে তাদের সবাই কথার মারপ্যাঁচে রপ্ত নয়। ববং তারা মারধোর, ভয় দেখানো এবং কখনো কখনো এসপার ওসপার ঘটিয়ে ফেলে থাকে। কেউ বলে বুঝেশুঝেই ঘটানো হয়। আবার কেউ বলে রোখের মাথায় ঘটে যায়। যাই হোক, এই দ্বিতীয় ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ শুধু হয়েছিল সেই দুজনকে দিয়ে যাদের মুখে ট্রামের ধাক্কার চোট ছিল না। অর্থাৎ যে দুজন খাটের পেছনের দুটো পায়া ধরে কাঁধ দিয়েছিল। চড়চাপড়ে কাজ হল না। ঝুলিয়ে রেখে লাথি মারতেও নয়। এই সময় তরুণ সেই আই পি এস হস্তক্ষেপ না করলে হয়তো কিছু একটা খতরনাক ঘটেই যেত। তিনি জিজ্ঞাসাবাদের দ্বিতীয় ধবনটি বন্ধ করলেন। অল্পবিস্তর চিকিৎসায় দুচারদিনেই ওই দুজনে আবার উঠে বসল। তারপর একসঙ্গে চারজনকে পাঠানো হল ডাক্তারদের কাছে।

তিন

চোখে আলো ফেলা বা পায়ের তলায় বা হাঁটুতে টুংটাং বাড়ি মারা জাতীয় মামুলি ব্যাপারের বর্ণনায় গিয়ে লাভ নেই। চারজনেরই মাথায় খুলির মধ্যে একাধিক ইলেকট্রোড ঢোকানো হল। এখানে বলে নেওয়া দরকার যে পাঠক যেন এ ব্যাপারটি কোনোমতেই জিজ্ঞাসবাদের তৃতীয় এক ধরন বলে মনে না করেন। বিজ্ঞান অত্যাচার নয় যদিও অত্যাচারে বিজ্ঞান ব্যবহৃত হয়। মনিটরিং মেশিনে নানা রকম আলোরেখা ইত্যাদি দেখে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা একটি সভায় মিলিত হলেন। এরপর তাঁরা যে ইংরেজিতে লেখা বিশদ রিপোর্টটি পুলিসের বড় কর্তাকে দেন এবং তিনি যার একটি জেরক্স কপি নিজের কাছে রেখে মূলটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে দেন এবং সেখানে আবার যার জেরক্স কপি রেখে মূলটিকে উচ্চতর পদাধিকারীর কাছে দেওয়া হয় তার মধ্যে No evoked potential in auditory/visual cortex on peripheral sensory stimulation'... অথবা 'Sensory aphasia'... বা 'sensorineural deficit ইত্যাদি খটোমটো অনেক কথা আছে যার সহজ সরল মানে হল ওই চারজন শববাহকই অন্ধ, কালা ও বোবা। কেউ অন্ধ এবং কালা হলে সে বোবা হতে বাধ্য। এবং কোনো লোকের যদি এরকম হয় তাহলে তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব

নয়। করা যায়ওনি। খেতে দিলে মানে হাতে বাটি বা থালা ধরিয়ে দিলে এরা কিন্তু খায়। গন্ধ পায় কিনা বোঝা যায়নি। কখনোই কোনো ভাবের পরিবর্তন নেই। চোখের পলক পড়ে না। শোনে না। দেখে না। কিছু বলে না। কখনো শুনবেও না ও দেখবেও না। বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। এদের সম্বন্ধে কখনোই কিছু জানার সম্ভাবনা নেই। এদের একটি জায়গায় আটক করে রাখা হয়েছে। ওদিকে জেরক্স কপি রেখে মূলটি পরবর্তী ওপরওয়ালার কাছে চলেছে। কিন্তু সেটাও তো একসময় রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে থেমে যাবে। চারজন মূক, বধির ও অন্ধ শববাহকের সম্বন্ধে তাতেও কিছু জানতে পারার সম্ভাবনা নেই।

চার

মৃতদেহটি অত্যাধুনিক এক হিমঘরে রাখা আছে। এর থেকে অধিকতর অত্যাধুনিক হিমঘরে কতিপয় মার্কিন বিলিয়নেয়ার তাঁদের মৃতদেহ অবিকৃত রেখেছেন। তাঁরা এই আশায় এটা করেছেন বিজ্ঞান অদূর ভবিষ্যতে এমন সীমান্ত অতিক্রম করবে যখন তাঁদের আবার বাঁচিয়ে তোলা যাবে। কয়েকশো বছর পরে বেঁচে উঠে অনেকগুলি প্রজন্ম টপকে তাঁরা আবার ব্যবসাপাতি করবেন, আমোদপ্রমোদ করবেন। তাঁদের এই ধরনের ভাবনাচিন্তা ও বাসনা আমাদের এখানে সংরক্ষিত মৃত ব্যক্তিটির থাকার কথা নয়। অবশ্য পরে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে হয়তো রহস্যের সমাধান ঘটতে পারে। তরুণ আই পি এস অফিসারটি অবশ্য এই লাইনে কিছু ভাবেননি।

ওদিকে চারজন সম্বন্ধে তো আগেই বলা হয়েছে যে তাদের আটক রাখা হয়েছে। লোহার মোটা শিক বসানো দরজা। তালাবন্ধ। দিনে রাতে দফায় দফায় পাহারা। দেওয়ালের ওপরে জাল দিয়ে ঢাকা ছোট্ট একটা চৌখুপি। সেখান দিয়ে কখনো সূর্যের আলো, কখনো চাঁদের আভা তেরচা হয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে। তারপর সূর্য বা চাঁদ সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আলো মায়াবী বেড়ালের মতো একসময় পালিয়ে যায়। ওরা চুপ করে চারজন বসে থাকে। কখনো কখনো চৌখুপির জালে কোনো দলছুট চড়াই এসে ঠোকরায়। কখনো সামান্য হাওয়া ঢুকে ওদের দেখে থমকে যায়। ওদের চোখের পলক পড়ে না। ওরা চারজন মেঝের ওপর চুপ করে বসে থাকে। এখানে পাহারা দেওয়ার কাজটি সান্ত্রীদের পছন্দ নয়। বিশেষত রাতে তো নয়ই। তখন নাকি ওদের কেউ কেউ ফিসফিস কথা শুনেছে বা হাসির শব্দ পেয়েছে বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। সেই তরুণ আই পি এস অফিসার এখনো মাঝেমধ্যে আসেন। তবে আর বেশিদিন তাঁকে তরুণ বলা সঙ্গত হবে না কারণ সময় কেটে যাচ্ছে। শুধু ওই চারজন শববাহকের ঘরের ভেতরে মনে হয় সময় থমকে আছে।

ওই মৃতদেহটি কার ? তার নাম কি ? কিভাবে সে মারা গিয়েছিল ? ওই চারজন শববাহকের পরিচয় কি ? তারা সেদিন কোন শ্মশানে যাচ্ছিল ? কিভাবে পৌঁছত তারা ? এরকম একটা ঘটনা ঘটল কি করে ?

কেউ যদি এ সম্বন্ধে কোনো কিছু জানেন তাহলে তাঁর প্রতি অনুরোধ যে দয়া করে এগিয়ে এসে কর্তৃপক্ষকে জানান। কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা করে আছেন।

দাঙ্গার দিকে ॥ দীপঙ্কর দাস

—অ গোবিন্দ, বাড়ি আছিস নাকি রে।

রাতের বাসি অন্ধকার ফিকে হয়ে এলেও এখনো সূর্য ওঠেনি। পাখপাখালি সবে ডাকছে। সিসার বাষ্পের মতো রঙ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। অঘ্রানের শেষ। শীত পুরোপুরি আসার কথা নয়। তবে করিমগঞ্জের ভূগোলটাই এমন যে এখানে এর মধ্যেই শীতের রাজ্যপাট খানিকটা বিছিয়ে গেছে। রাতের বেলায় যে শিরশিরে উত্তুরে বাতাস বয়ে আসে করিমগঞ্জের দিকে সেই বাতাসের রেশ ভোর সকালেও রয়ে যায়। শিশিরে ভেজা থাকে ঘাস পাতা। নিসিন্দা আকন্দ কদম কলা গাছের পাতার গা চুইয়ে শিশির ঝরে পড়ে টুপটাপ।

—আরে অ্যাই গোবিন্দ, ঘুম ভাঙে নাই নাকি! আবার হাঁক ছাড়ল জয়নাল। জয়নালের গায়ে হাতাওয়ালা কটস্‌উলের গেঞ্জি। ঠিক কবে কোন হাট থেকে শীতবস্ত্র হিসেবে গেঞ্জিটাকে কত টাকার বিনিময়ে কিনেছিল—মনে নেই জয়নালের। তবে শখের এই শীতবস্ত্রটির বয়স যে নেই নেই করে আট-দশ বছর হয়ে গেছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই জয়নালের। শীতের শুরুতে গায়ে ওঠে গেঞ্জিটা। শরীর থেকে নামতে নামতে মাঘ পেরিয়ে ফাল্গুন। বয়সের চিহ্নও একেবারে অপ্রত্যক্ষ নয় গেঞ্জির শরীরে। দুই চার জায়গায় ফেঁসে যাওয়ার কারণে মোটা সুতির কাপড়ের তাপ্পি দিয়েছে হালিমা। হালিমার সেলাই-এর হাত এক সময় ভালই ছিল। বিয়ে-সাদির পর জয়নাল একবার পরিকল্পনা করেছিল হালিমাকে করিমগঞ্জের নতুন বাজারের কোনো দর্জির দোকানে লাগিয়ে দেবে। দৈনিক আয় খুব খারাপ হবে না। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পায়নি। হালিমার হাতে সেলাই মেশিন ওঠার বদলে উঠেছে লোহার গামলা, ওলোনদড়ি, কর্ণি। অর্থাৎ হালিমা জয়নালের জোগাড়ে হয়েছে। তাও মন্দ কী! এই মাগি-গণ্ডার বাজারে সব কিছুর দর হু হু করে বেড়েছে। ঠিক সেই হারে মানবশ্রমের মূল্য না বাড়লেও, একটু বেড়েছে। জোগাড়ের দৈনিক মজুরি এখন তিরিশ টাকা। সদরে সেই দর চল্লিশ।

অন্যদিন জয়নালের হাতে থাকে যন্ত্রপাতি। আজ কেবল আড়বাঁশের লাঠি। ভাবটা এমন যেন কোনো যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে জয়নাল। তার প্রথম কাজ করিমগঞ্জের কামিন পাড়ার সব রাজমিস্ত্রিদের সকাল সকাল জাগিয়ে দেওয়া। আসন্ন যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

মাটির ওপর হাতের লাঠিটাকে জোরে ঠুকল জয়নাল। হয়তো মাটির ঠিক নিচে কোন পাথরখণ্ড লুকিয়ে ছিল। ফলে তার গায়ে লাঠির আঘাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ বাজল—ঠঙ! শব্দটা যেন জয়নালের ভেতর আত্মবিশ্বাসকে আরো একটু উসকে দিল। আবার গলা চড়িয়ে হাঁক দিল জয়নাল—বিবির তাপ পরে নিও গোবিন্দ। এইবার চলো।

—আইতাসি মিঁয়া। চেঁচাইও না। ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল গোবিন্দ। রসিকতা করে বলল, আইজ কি ভাবী তোমার বিছানায় জল ঢাইলা দিসে! তুমি তাপ লও নাই!

—হ্‌ হ্‌। ব্যাজাল পারিস না। এইবারে বাইরে আয়। জয়নাল মাথা নাড়ল। মুখটাকে টেরচা করে তাকাল গোবিন্দর পেছনে উঁকি দেওয়া গোবিন্দর পরিবার সুবুচুনির দিকে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসির গমক সামাল দিচ্ছে গোবিন্দর পরিবার। গাটা অকারণে জ্বলে উঠল জয়নালের। —বলি ঘরের পোলাপানের প্যাটে ভাত নাই। সর্বক্ষণ খিদার আগুন জ্বলে। সেই জ্বালায় অস্থির। এরপর আবার বিবির তাপ!

দাওয়া ছাড়িয়ে বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গোবিন্দ। গোবিন্দের কোমরে লুঙ্গি। গায়ে হাতকাটা টেরিকটের বড় বড় চেকের জামা। রঙ জ্বলে গেছে। বহু ব্যবহারে কাঁধের কাছে পুট ফেঁসে গেছে। সেখান দিয়ে গোবিন্দর ডান কাঁধের মাংস চোখে পড়ছে। কাঁধের ফাঁসটা দিনদিন বেড়েই চলেছে। হুঁস নেই সেদিকে। গোবিন্দর পরিবার কী এমন রাজকর্ম করে যে ওটুকু জায়গা সেলাই করে দিতে পারে না? সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এটুকু কি বোঝে না সুবুচুনি?

কথাটা বলেছিল বসির মিঁয়া। পরপর সাতদিন নিষ্কর্ম হয়ে বসে থাকতে থাকতে যখন হাত পায়ে বাত ধরার দশা, তখনই করিমগঞ্জের নতুন হাটের বুড়ো বটতলার নিচে বসে কথাটা বলেছিল বসির। —শোন গো, বাংলায় প্রবচন আছে, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। অর্থাৎ কিনা সময় থাকতে থাকতে ব্যবস্থা না নিলে অসময়ে সেই সমস্যা দশগুণ বেড়ে হাতের বাইরে চলি যায়। এখন বুঝো তোমরা। সময় থাকতি থাকতি ব্যবস্থা নিবে, নাকি এই ভাবে হাত পা গুটাইয়ে বইসে থাকবা!

বোঝার কী আছে! এ তো আর ইস্কুল কলেজের জটিল কোনো অঙ্ক নয় যে মাথা ঘামিয়ে বুঝতে হবে। এ তো একেবার সাদাসাপটা পেট-ভাতের সমস্যা। একটা দিন কর্মহীন কাটলেই ঘরের বাচ্চা-কাচ্চার মুখে ভাতের জোগান দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সেখানে এক নাগাড়ে সাতদিন, এক সপ্তাহ উপার্জনহীন দিন চলে গেল। কাজ জোটেনি কপালে। পেটের ভেতর দাবানল। সমস্যার মূলটাকে ঘটা করে শনাক্ত করতে হয় না। আপনিই চিনিয়ে দেয়।

করিমগঞ্জ নামক জনপদে কয়েক বছর ধরে বাড়বাড়ন্তর ঢেউ আছড়ে পড়েছে। পররাষ্ট্রের সীমানা যেহেতু ঢিল ছোড়ার দূরত্বে, এবং সেই সীমান্ত যথেষ্ট সংরক্ষিত নয়, তাই 'চোরা কারবারিদের' প্রধান ফটক এই করিমগঞ্জ। তার ফলে মাত্র বছর কুড়ি আগে যে করিমগঞ্জ দেশের আর দশটা গ্রামের সঙ্গেই তুল্য ছিল, সেই করিমগঞ্জ এখন বর্ধিষ্ণু শহর। স্থানীয় মানুষের হাতেও যেমন টাকা এসেছে তেমনি টাকাওয়ালা বহু ধনী ব্যক্তিরাও করিমগঞ্জে স্থায়ী বাসভূমি গড়ে তুলেছে। জনপদের সম্প্রসারণ যেন থামতেই চায় না। ফলে আর দশটা শ্রমসাধ্য বৃত্তির মতো রাজমিস্ত্রি জোগাড়েদেরও কর্মসংস্থান প্রসারিত হয়েছে অনেকখানি। এর ওপর করিমগঞ্জের পশ্চিম প্রান্তে রামনগর অঞ্চল পঞ্চায়েতের ভেতর তৈরি হচ্ছে একের পর এক ফুড কর্পোরেশনের গোডাউন। আর উত্তরপূর্ব প্রান্তে প্রবাহিত জলঙ্গী নদীর দুই পাড় ধরে নির্মিত হচ্ছে বাঁধ এবং স্লুইস। ব্যক্তিগত কাজের সঙ্গে সরকারি উদ্যোগ যুক্ত হয়ে আরো বিস্তৃত হয়েছে মিস্ত্রি জোগাড়েদের উপার্জনের উৎস। ফলে যে করিমগঞ্জে একজন দক্ষ রাজমিস্ত্রির কপালে দৈনিক পঁচিশ-তিরিশ টাকার বিনিময়ে কাজ জোটা ছিল রীতিমতো অনিশ্চিত, সেই করিমগঞ্জে এখন রাজমিস্ত্রিদের দৈনিক মজুরি পঞ্চাশ। এবং জোগাড়ের রোজ তিরিশ। আর যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজমিস্ত্রি এবং জোগাড়ে একই পরিবারভুক্ত, তাই দিনান্তে ঘর পিছু আশি টাকা উপার্জন একেবারে নিশ্চিত, আর এই সুবাদে করিমগঞ্জের আশপাশ এলাকার গাঁগঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রাজমিস্ত্রি জোগাড়েদের বসতির গায়ে

নতুন প্রাণেব বঙ পডতে শুবু কবেছিল।

কিন্তু সেই বঙে হঠাৎ কবে ভুযোকালিব প্রলেপ পডতে শুবু কবেছে।

সমস্যাটা আগেও ছিল। কবিমগঞ্জেব চাবপাশেব—হাতালপাডা, চাষাপাডা, হাঁসমাবি, কৃষ্ণগঞ্জ, জংলাপুব নামক এলাকাব বাজমিস্ত্রিবা বোজ ভোব সকালে একে একে এসে জডো হয কবিমগঞ্জেব নতুনহাটেব বটতলাব নিচে। এই বটতলা থেকেই ঠিকাদাবেব লোক থেকে শুবু কবে গৃহস্থ—মিস্ত্রি-মজুব সংগ্রহ কবে নিযে যায। এই প্রথা আজকেব নয। তিন পুবুষ ধবেই চলে আসছে এই পদ্ধতি।

এই জটলাব মধ্যে প্রায প্রতিদিনই একটা দুটো কবে নতুন মুখেব আমদানি ঘটেছিল। এবং বসিব, গোবিন্দ, জযনাল, জযদেব, হালিমা, বাসন্তীদেব অভিজ্ঞ চোখে ধবা পডেও যাচ্ছিল নতুন মুখগুলি। নতুন মুখগুলিব পুবুষ-নাবী—সকলেব ত্রস্ত ইতিউতি চাউনি বলে দিত—এবা 'বর্ডাব ক্রশ' কবা অনুপ্রবেশকাবী। স্থানীয ভাষায ওপাবেব মানুষ। এবাও গোবিন্দ, জযনাল, বসিব, জযদেবেব সঙ্গে মিস্ত্রিব কাজেব সন্ধানে এসে দাঁডাত বটতলায।

তখন তেমন গা কবত না বসিববা। কাজ তো কম নেই। চাবদিকে কাজেব জোযাব বইছে। নিজেদেব ভাগেব কাজেব পবেও যে পবিমাণ কাজেব অংশ পডে থাকত—তাব সীমাও কম ছিল না। তাই সীমানা অতিক্রম কবে আসা 'ওপাবেব মানুযগুলি'ব শঙ্কিত এবং সঙ্কুচিত অবস্থান দেখে একবকম মজা পেত। সেই সঙ্গে কৌতূহলও জাগত 'ওপাবেব মানুষগুলি'ব প্রতি।

—ঘব কোথায গো মিঁযা! বিডি ধবিযে গত বাতেব ঘুমেব আলস্য ছাডাতে ছাডাতে জিজ্ঞেস কবে বসিব।

সহজে কি সত্যি কথাটা বেব কবা যেত ওপাবেব সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষগুলিব মুখ থেকে। একে তো বে আইনি অনুপ্রবেশ। বর্ডাবেব দুই পক্ষেব আডকাঠিদেব পাওনা মিটিযে ওপাব থেকে এপাবে আসা। হাতে না আছে পাশপোর্ট, না আছে ভিসা। এমনকি দুই দেশেব পববাষ্ট্র মন্ত্রকেব কেনো সুপাবিশও নেই। থাকাব মধ্যে আছে তো কেবল পেটভর্তি ক্ষিদে আব দুই চোখ ভর্তি আশঙ্কা। তাই একটু সাবধানী হতেই হতো।

কোনোবকমে জডানো গলায নিকটবর্তী কোনো গাঁযেব নাম বলত ওপাবেব মেযে-পুবুষগুলি—আডংঘাটা। আডংঘাটায ঘব আমাগো।

—ক্যান্ মিথ্যা কথা কও মিঁযা! জযদেব বিডিব ধোঁযা গিলে সেই ধোঁযা নাক দিযে ছাডতে ছাডতে বলত—মুখ দেইখাই মালুম হয ওপাবেব মানুষ। বর্ডাব ক্রশ কইবা আসা হইসে।

এব পব আব আডাল কবাব কিছুই ছিল না। একে তো নতুন ভূমি , মানুষজনও নতুন। পাযেব তলায দাঁডানোব মতো একখণ্ড মাটি পর্যন্ত নিশ্চিত নয। ফলে আত্মসমর্পণ কবত মানুষগুলো—তা বটে। ঐ পাব থিকা আইসি। কুষ্টিযা জেলা, চটকাতলি গাঁ। বর্ডাবেব লাগোযা। দ্যাশে কাম কাজ নেই। অথচ ভাত কাপডেব দাম আকাশ ছুঁইসে। আব ছুঁইবো না ক্যান? দ্যাশ তো এখন দুই বেগমেব কাজিযা লইযাই ব্যস্ত। তাই চইলা আইসি। এখন আপনাবা যদি দযা কবেন!

হাঁ হাঁ কবে উঠত জযনাল—ঐ কথা কও ক্যানে মিঁযা। খোদাব দুনিযা। খোদাব সন্তান সব। হাত আছে, পা আছে—নাইডা ভাতেব ব্যবস্থা কববা সেইখানে আমাগোব দযাব কথা আসে ক্যামনে। লাগো, লাগো, কামে লাইগা যাও!

এক সঙ্গে দল বেঁধে ফুড কর্পোরেশনের গো-ডাউনের কন্ট্রাক্ট পাওয়া ঠিকাদারের লোকের সঙ্গে কাজে লেগে যেত সবাই।

সে এক অভিজ্ঞতা। ওপারের মানুষগুলির কাজকর্মের ছিরি দেখে হেসে পেটে খিল ধরার উপক্রম হতো জয়নালের, গোবিন্দর।

—ও মিঁয়া, বলি কয়পুরুষ ধইরা রাজমিস্ত্রির কাম কর ? জয়নাল হাসির কুলকুচি সেরে জিজ্ঞেস করত।

—ক্যান্, ভুল হইতাসে নাকি ? ওপারের মানুষগুলির মুখচোখে অনিশ্চয়তা ফুটে উঠত।

—না, ভুল হইব ক্যান্ ! গোবিন্দ আরো এক ধাপ এগিয়ে যেত। বলত—ইটের গাঁথুনি তুলতাসো নাকি উঠানে গোবর ল্যাপতাসো ? দেইখা তো মনে হয় জীবনে কর্ণি হাতে লও নাই। আর বিবিজানগো কই, ঐ ভাবে সিমেন্ট-বালির মশলা মাখে না। এ যেন পিঠা-পাটিসাপটার জন্য চালগুড়া আর গুড় মিশানো হইতাসে। বলতে বলতে গোবিন্দ গামলা থেকে সিমেন্ট-বালির মিশ্রণ থেকে কর্ণির ওপর কিছুটা মশলা নিয়ে বলত, দ্যাখো মিঁয়া, ভাল কইরা চাইয়া দ্যাখো ! এই ভাবে ইটের উপর মশলা লাগাইতে হয়। বলে গোবিন্দ কর্ণি ধরা ডানহাতটাকে কব্জির কাছে অদ্ভুত এক মোচড় দিত। তারপর কর্ণির টানে ইটের ওপর সমান করে ছড়িয়ে দিত মশলাটা। দুই ইটের ফাঁকে মশলার প্রলেপের স্তর একেবারে সমান। উনিশ-বিশটুকুও ঘটে না। এ যেন নিছকই ইটের গাঁথুনি তোলা নয়। কোনো দক্ষ সেতার শিল্পীর আঙুলের সাবলীল সঞ্চালন। প্রতিটি আঙুল সেতারের তারে সুশৃঙ্খল ভাবে সুর তুলছে।

দেখত ওপারের মানুষগুলি। তাদের চোখ দুটো আগ্রাসী খিদে নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত কর্ণির সঞ্চালন। দেখত বাঁ হাতে গোটা ইট নিয়ে ডান হাতে বাসুলির নিখুঁত আঘাতে কেমন করে দুখণ্ড হয়ে যায় গোটা ইট। এবং খণ্ড দুটিকে কেমন করে গাঁথুনির প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়।

—বলি, যে পূজার যা মন্ত্র। জয়দেব হাঁটু ভেঙে বসে শ্বাস নিত টেনে টেনে।—যে কাজের যেমন তালিম। তার উপর রাজমিস্ত্রির কাজ। মুখের কথা তো নয়। কথায় বলে মিস্ত্রির যে রাজা, সেই কিনা রাজমিস্ত্রি। তালিম না নিলে এত বড় কাজটা শিখবা ক্যামন কইরা !...একটু থামত জয়দেব। তারপর স্মৃতিচারণের মধ্যে যেত।—হ্যাঁ, মিস্ত্রি ছিল আলাউদ্দিন মিস্ত্রি। ঐ আমাদের আঁদুলি গায়ের লোক। কর্ণির মশলার গায়ে যেন মন্ত্র জড়ানো ছিল। এক ফোঁটা মশলা নিচে পড়ত না। আর ইটের গাঁথুনি ? চোখের পলক পড়ার আগেই পাঁচ-সাত ফুট দেওয়াল গাঁথা হয়ে যেত। ওলোনের দরকার পড়ত না। এমনই হাতের গুণ ছিল যে ওলোন ছাড়াই দেওয়াল একেবারে সিধা। একচুল এদিকে সেদিকে হেইলা যাইব না। শেষ কথাটা উচ্চারণের সময় জয়দেবের বুক আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হয়ে উঠত।

সায় দিত বসির, জয়নাল, গোবিন্দ। বলত—বটেই তো। আলাউদ্দিন মিস্ত্রির কাছে তালিম নিছিলাম বলেই তো আজ পেটের ভাত জোগাড় করতে পারছি।

সেই শুরু। একজন দুজন তিনজন করে 'ওপারের মানুষে'র ভিড় বাড়তে লাগল করিমগঞ্জের নতুনবাজারের বটতলায়। জয়দেব বসির গোবিন্দ জয়নালের ভুরু কুঁচকে গেল।—এযে দেখি শেষ নাই। জয়নালের চাপা গলায় অজানা আশঙ্কা উঁকি দেয়।—অরা যে আসতাসেই। এভাবে ওপারের মানুষের ঢল নামলে আমরা যামু কোথায় ?

আশঙ্কা অমূলক ছিল না। দুশ্চিন্তায় কপালে নদীনালা জেগে ওঠার মতো পর্যাপ্ত

কারণও ছিল। করিমগঞ্জকে কেন্দ্র করে নির্মাণকাজের পরিধি যতই সম্প্রসারিত হোক না কেন, পরিমাণে এতটা তো নয় যে অকাতরে দানছত্র করা যায়। বহিরাগত মানুষের, বিশেষ করে পররাষ্ট্র থেকে অনুপ্রবেশকারীদের প্রবাহ যদি এভাবে বাড়তে শুরু করে তাহলে যে করিমগঞ্জের মিস্ত্রি-মজুরদের কর্মসংস্থান সঙ্কুচিত হতে হতে একেবারে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

তবু আশার কথা শুনিয়েছিল বসির।— আমরা হইলাম গিয়া আলাউদ্দিন মিস্ত্রির হাতে গড়া রাজমিস্ত্রি। আর অ'রা আনাড়ি। কোনোকালে কর্ণিই হাতে নেয় নাই। বাবুরা ঠিকই বুঝব আমাগো কামকাজের গুণ। ভিনদেশি আনাড়িগুলিরে ঠিক বাতিল কইরা দিব।

দক্ষতা, কোনো সন্দেহ নেই, গোবিন্দ, জয়নাল, বসিরদের সর্বশেষ এবং একমাত্র পুঁজি। দক্ষতার কারণেই ভিনদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অনেকটা পিছনে ফেলে রেখেছিল। অবশেষে সেখানেও হেরে গেল বসির জয়নালরা।

আঘাতটা যে এদিক থেকে আসতে পারে টের পায়নি করিমগঞ্জের বংশানুক্রমে কাজ করে আসা রাজমিস্ত্রি জোগাড়েরা।

অবিশ্বাস্য কম মজুরিতে কাজে লেগে গেল 'বর্ডার ক্রশ' করা মানুষগুলি। যেখানে বসিরদের প্রাপ্য হার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজমিস্ত্রি পিছু দৈনিক পঞ্চাশ টাকা এবং জোগাড়ে পিছু তিরিশ টাকা, সেখানে ভিনদেশিরা পঁচিশ-ত্রিশ টাকা রোজে কাজ শুরু করল।

ঠিকাদারের লোকেরাও সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে শুরু করল। তাদের লোক চাই। সস্তায় শ্রম কিনতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। মিস্ত্রির গুণাগুণ নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। গুণাগুণ নিয়ে যাতে কোনো প্রশ্ন না ওঠে তার জন্যে তাদের পক্ষে আছেন ইঞ্জিনিয়ারবাবুরা। আর ইঞ্জিনিয়ারবাবুদের কী করে সন্তুষ্ট রাখা যায় সেটুকু জ্ঞানের অভাব নেই ঠিকাদারবাবুদের।

বসির জয়নাল, গোবিন্দ জয়দেবরা নতুন হাটের বটতলায় উবু হয়ে বসে বসে দেখল কেমন করে তারা নিষ্কর্মা হয়ে যাচ্ছে। দেখল কেমন করে পরিত্যাজ্য হয়ে যাচ্ছে বটতলা। ওপারের মানুষরা জলঙ্গীর পাড় ধরে অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে ফেলেছে। জলঙ্গীর উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে মাথায় ঝুড়ি কোদাল বেলচা কর্ণি বাসুলি নিয়ে ঠিকাদারের লোকের পিছু পিছু কাজে চলে যায় ও-পারের মানুষজন। আর বসির জয়নাল, গোবিন্দ জয়দেবের ফ্যাকাশে দৃষ্টির সামনে সকালের পৃথিবী বয়স্ক হয়। বটগাছের ছায়া ক্রমশ ছোট হতে থাকে। রোদের উত্তাপ বাড়ে। আরো একটি কর্মহীন দিনের যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে তারা।

—আর তো সয় না ভাই। বটতলার নিচে গুটিয়ে আসা ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলে গোবিন্দ।—ঐ শালা বর্ডার ক্রশ করা ওপারের মানুষগুলো চোখের উপর দিয়া কাজে লাইগা যাইব, আর আমরা বউ-বাচ্চা নিয়া খিদায় জলুম, এ তো চলতে দেওয়া যায় না।

—না সইয়া করবিটা কী ? জয়নাল মাটিতে ডান হাতের থাবা মারে। ধুলো ওড়ে। গুমরে ওঠে জয়নাল—পারবি অ'গো মতো তিরিশটাকা রোজে কাম হাতে নিতে।

—পঞ্চাশ থেকে তিরিশ। আমাগো মজুরি এত নিচে নামাইল কারা ? হিসহিস করে সাড়া দেয় জয়দেব।

—কারা নামাইসে বুঝো নাই! বসিরের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে।

—তাইলে ? কে যেন আকাশের দিকে মুখ করে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল।

—তাইলে কী? কার কণ্ঠস্বর বাতাসে ভর দিয়ে মিলিয়ে গেল।

—সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। দমচাপা গলায় বলল বসির। ঘরে বিবিবাচ্চা মরব অনাহারে, আব আমরা বইসা বইসা আঙ্গুল চুষুম—তা হয় না।

না, হয় না, তবু হয়ে চলছিল। কেবল করিমগঞ্জের আশপাশের এলাকাতেই নয়, সীমান্তবর্তী খানপুব, অন্তস্থলি, সাহারা আমডাঙা প্রভৃতি স্থানে একই ঘটনা ঘটে চলল। পঞ্চাননতলার মোফিদ কানাই রেজিনা বাতাসীরা সরকার বাড়ির সম্প্রসারিত অংশের কাজে নিযুক্ত রাজমিস্ত্রি জোগাড়েদের সঙ্গে একরকম খণ্ডযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। নিহত হয়নি কেউ, তবে রক্তপাত ঘটল। সরকার বাড়ির যাবতীয় কাজে—সে বৎসরান্তের সংস্কারের কাজই হোক কিংবা নতুন কোনো অংশের নির্মাণের কাজই হোক—সরকার বাড়ির জন্মকাল থেকেই পঞ্চাননতলার মিস্ত্রিরাই করে এসেছে। এবার সরকার বাড়ির বার-মহল নতুন করে সম্প্রসারিত হচ্ছে। নতুন বাড়ির 'নির্মাণ কাজের' ওপর পঞ্চাননতলার মিস্ত্রিদেরই অলিখিত অধিকার জন্মেছিল। কিন্তু কলকাতা ফেরত সরকার বাড়ির মেজোবাবু 'ভিনদেশি' 'ওপারের মানুষদের' সঙ্গে চুক্তি করে নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করে দিলেন।

মোফিদ কানাইরা ব্যাপার-স্যাপার দেখে সরকার বাড়ির মেজোবাবুর কাছে গিয়েছিল মনের ক্ষোভ জানাতে।—এইটা কেমন বিবেচনা হইল বাবু! এই বাড়ির কাজ আমরা তিনপুরুষ ধইরা কইরে আসছি। হঠাৎ করে আমাগো ভাতে মারনের ব্যবস্থা ক্যান করলেন?

মেজোবাবু মোফিদ কানাইদের কথার সরাসরি উত্তর দেননি। ঘুরিয়ে বলেছেন, আচ্ছা মোফিদ, ধর তুমি বাজারে গেছ আলু কিনবে বলে। বাজারে গিয়ে দেখলে রামের আলুর দর পাঁচ টাকা কেজি, আর শ্যামের কাছে তিন টাকা কেজি। তুমি কার কাছ থেকে আলু কিনবে?

ঘুরিয়ে বললেও মোফিদ কানাইরা কলকাতা ফেরত মেজোবাবুর কথার মর্মার্থ বুঝতে পারবে না, তেমন অশিক্ষিত নয় তারা। তাই গলা নামিয়ে বলেছিল,—রামের আলুর গুণ আর শ্যামের আলুর গুণ একবার যাচাই কইরে দেখবেন না বাবু?

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন মেজোবাবু। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন,—ভারি তো মিস্ত্রির কাজ। তার আবার গুণাগুণ। তোমরা কি নিজেদের শিল্পী-টিল্পী ভাব নাকি যে তোমাদের হাতে যে সুর বাজবে, সেই সুর ওদের হাতে বাজবে না?

বড় তীক্ষ্ণ, আত্মমর্যাদায় আঘাত করার মতো কথা। শিল্পের অতশত জানে না মোফিদ কানাইরা। জানে না হাতের কাজ ঠিক কোন মানে পৌঁছুলে সেটি শিল্প হয়। আর ঠিক কোন কোন কাজ শিল্পের বিভাগে পড়ে, কিংবা পড়ে না। তবে এটা দীর্ঘদিনের তালিম এবং অধ্যাবসাযের মাধ্যমে আজ তারা রাজমিস্ত্রির স্তরে পৌঁছাতে পেরেছে। যখন হাতে কর্ণি নিয়ে বালি সিমেন্টের পাঁচ একের মিশেলের মশলা সহযোগে একটির পর একটি ইঁট গাঁথে তারা, তখন তাদের মনে থাকে না যে, তারা দৈনিক মজুরির চুক্তিতে কোনো ধনী মালিকের গৃহের দেওয়াল গাঁথছে। তখন নিজের কাজে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ে যে, মনে হয় ইঁটের দেওয়াল নয়, হয়তো বা তাদের কোনো সন্তানের শরীরই গড়ে তুলছে।... এই প্রক্রিয়ার নাম কী? শিল্পের গূঢ় কথা তারা ঠিক বোঝে না।

হঠাৎ করে মাথায় রক্ত লাফিয়ে উঠেছিল মোফিদ কানাইদের। সব জ্বালা, সব অপমানের উৎস তো ঐ 'বর্ডার ক্রশ' করে আসা মানুষগুলি। ফলে তাদের ওপর

মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পঞ্চাননতলার রাজমিস্ত্রি জোগাড়ে, কর্মচ্যুত ঘরামির দল। সরকার বাড়ির মেজোবাবু তার পারিবারিক বন্দুক থেকে আকাশে গুলি ছুঁড়েছিলেন দাঙ্গা থামাতে। থানায় ডায়েরিও করেছিলেন। তারই জোরে মোফিদ কানাইরা এখন জেলহাজতে।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর এল করিমগঞ্জের বাসস্ট্যান্ড থেকে। সেখানে বাসে বাসে ঘুরে যাত্রীদের কাছ থেকে অন্ধ কানা খোঁড়া ভিখারির দল ভিক্ষা চেয়ে আসছে সেই কোন কাল থেকে। তাদের বাজারও নিরাপদ রইল না। অনুপ্রবেশ ঘটল ঝাঁক-ঝাঁক ভিখারির। যারা সকলেই 'বর্ডার ক্রশ' করা। ফলে ভিখারিদের মধ্যে শুরু হলো বচসা। হাতাহাতি। তারপর এল লাঠি। বাসস্ট্যান্ডের ড্রাইভার হেলপার কন্ডাক্টর হকাররা ঠিক সময় হস্তক্ষেপ না করলে নাকি দু-চারটে লাশ পড়ে যেত সেদিন।

অঘ্রানের হালকা কুয়াশায় পর্দা একটু একটু করে পাতলা হচ্ছে। আকাশে আবির গোলা রঙ। করিমগঞ্জের হাটের পশ্চিম দিকের বটতলায় একে একে এসে জমা হচ্ছে সবাই। বসির এল। এল গোবিন্দ। জয়নাল জয়দেবরাও এল পেছন পেছন।

চাপা উত্তেজনায় হিমজড়ানো সকালেও সকলের শরীরের রক্ত গরম হয়ে আছে। গায়ে শীতবস্ত্রের করুণ স্বল্পতা কিংবা সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি যাবতীয় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। পায়ের নিচে শিশির জড়ানো ধুলো। পায়ের ঘর্ষণে সেই আর্দ্রধুলো শুকিয়ে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে ; করিমগঞ্জের নতুন বাজারের বটতলায় আজ ভোর সকালে এক অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি হলো।

একটা হেস্তনেস্ত আজই করে ফেলতে হবে। জলঙ্গীর পাড় বরাবর যে ভিনদেশিদের অস্থায়ী বাসভূমি গড়ে উঠেছে, তাকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলতে হবে। হুকুম জারি করতে হবে—হয় বর্ডার পেরিয়ে নিজের নিজের ভূমিতে ফিরে যাও, না হয় এক মজুরিতে কাজ কর। তখন দেখি মালিকরা কাকে ছেড়ে কাকে কাজে নিয়ে যায়। বেইমানী আর সহ্য করব না।

এত সকালে করিমগঞ্জের নতুন হাটের দোকানপসার খোলে না। ব্যাপারিদেরও আনাগোনা শুরু হয় না। তারওপর এখন অঘ্রানের শেষ। মাঠ থেকে সবে ধান উঠেছে। গোলাজাত হচ্ছে ধনী চাষীর ঘরে। তারপর ধানঝাড়া, ধানসেদ্ধ—অনেক কাজ। সেসব সারতে সারতে পৌষ এসে জোঁকের মতো হিম কামড় বসিয়ে দেবে করিমগঞ্জের শরীরে। তারপর প্রাণ ফিরবে করিমগঞ্জের নতুন হাটে। বস্তাবন্দি চাল ধান বয়ে নিয়ে আসবে লরি, টেম্পো, চার চাকার ম্যাটাডোর, ভ্যান রিকশা, গরুর গাড়ি। সারাদিন দর হাঁকাহাঁকি। মহাজনদের গুদামে ধানচালের বস্তা নিয়ে আসা, টাকা-পয়সার খসখস ঝনঝন আর মুটে মজুরদের হাঁকাহাঁকি—সব মিলিয়ে নতুন বাজার গমগম করবে। ততদিন একটু মন্দা চলে নতুন বাজারে।

তবু যে দু-চারজন বাজার পাহারাদার জেগেছিল, তারা দেখছিল বটতলার নিচের ভিড়কে।

—এইবার চলছে। বেলা যায়। উ' শালারা আবার না ফাঁক বুঝে ঠিকাদারের লোকের সঙ্গে কামকাজে বেরিয়ে যায়।... জটলার মধ্যে থেকে কে যেন হাঁক দিল।

জটলাটা এতক্ষণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কোনোরকম জ্যামিতিক আকার নিতে পারছিল না। অথচ আকার নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। এবার একটার পর

একটা জ্যামিতিক আকার এবং আকৃতি নিতে নিতে এবং পরক্ষণে ভাঙতে ভাঙতে পুনরায় সংগঠিত হতে হতে একটি দীর্ঘ, সরলরেখায় পরিণত হলো। এবং প্রাগৈতিহাসিক কোনো সরীসৃপের মতোই হিসহিস শব্দে শ্বাস ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলল জলঙ্গীর দিকে।

রোদ এখন আংশিক উজ্জ্বল। কুয়াশা এবং ধুলোর মিশ্রণে চারপাশে যে পর্দা তৈরি হয়েছিল, তা অপসৃত। বাতাসেও হিমের দংশনবিষ ঝরে গেছে। ঝলমলিয়ে উঠেছে গাছগাছালির মাথা। তবু প্রকৃতির এমন স্নিগ্ধ দৃশ্যের প্রতি কারুর হুঁশ ছিল না। পেটের আগুন তখন মাথায় চড়ে গেছে। তাদের চোখে-মুখে জেগে উঠেছে আদিম প্রতিহিংসা। শরীরের ভাষায় প্রতিবাদের গর্জন। অঘ্রানের সকালে বনবাদাড়ে যে ভুলো বাতাস বয়, যে দিক-কানা পাখপাখালির ঝাঁক বিচিত্র স্বরে ডাকতে ডাকতে মাঠঘাটের ওপরকার আকাশে অযথা পাক খায়—এমন সব তুচ্ছ ঘটনাবলী থেকে যেন দীর্ঘ মিছিলের মানুষগুলো সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে পড়েছে।

—উঁ'রা যদি পাল্টা মার দেয় ? মিছিলের ভেতর থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—আমরাও মায়ের দুধ খাইসি। সাড়া দিল কেউ একজন।

—যদি দাঙ্গা বাধে।

—বাধুক।

জলঙ্গীর পাড় বরাবর যে অস্থায়ী বাসভূমি জেগে উঠেছে গত কয়েক বছরে. সেই বাসভূমির মানুষও বাতাসে বয়ে আনা সংবাদে তৈরি হয়ে নিয়েছে।—দ্যাখো হে, খুন দিতে তৈরি হও সবাই।... জলঙ্গীর তরঙ্গহীন শীতল জলে আছড়ে পড়ল হুঙ্কার।

তৈরি। দুই পক্ষ তৈরি। মুখোমুখি দুই পক্ষ। মাঝখানে মাত্র এক মাঠ দূরত্ব। অনাবাদী পতিত জমি। আকন্দ, বাবলা, বৈঁচি, নিসিন্দার ঝোপঝাড়ে আকীর্ণ মাঠ।

একটু একটু করে নিকটবর্তী হতে থাকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোষ্ঠী। সংক্ষিপ্ত হতে থাকে দুই গোষ্ঠীর মাঝখানের পতিত জমি। অদূরে স্থির হয়ে যায় জলস্রোত। বাতাসে অকস্মাৎ গতিহীন হয়ে পড়ে। আকণ্ঠ কৌতূহল নিয়ে ভোর সকালের সূর্য বেশ কয়েকটা লাফ দিয়ে উঠে আসে পুব আকাশে। শেষ অঘ্রানের সকালটা গুমোট তপ্ত হয়ে যায়। সবাই শ্বাসরুদ্ধ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, সব জড়িয়ে আসন্ন এক দাঙ্গার উৎকণ্ঠা!

একপা একপা করে এগুচ্ছে এপারের গোবিন্দ সাহা, জয়নালরা। অন্য দিক থেকে এগিয়ে আসছে হামিদ শেখ, মৃত্যুঞ্জয় বসাকরা। সকলের হাতে উদ্ধত লাঠি। লাঠির গায়ে তেলের মতো জড়িয়ে থাকে শেষ অঘ্রানের কাঁচাহলুদ রোদ। সেই একই রোদ—যে রোদ বর্ডার মানে না। এপার ওপার বলে বিকিরণে পক্ষপাতিত্ব করে না কখনো। দুই পক্ষের নিশ্বাস দ্রুত হয়। শ্বাসপ্রক্রিয়া দ্রুততর হতে থাকে। লম্বা শ্বাস গ্রহণের ফলে দুই পক্ষের বুকের ফুসফুস ভরে ওঠে হেমন্তের নরম বাতাসে। সেই একই বাতাসে—যা সীমানা অতিক্রম করে বয়ে যায়। বয়ে আসে। সঙ্গে করে বয়ে বেড়ায় আত্মীয়তার ঘ্রাণ।

মানবগোষ্ঠী নিজের তাগিদে এঁকে নেয় ভূমির সীমানা। সভ্যতার পরম্পরাতেই বার বার খণ্ডিত হয়েছে ভূমির খণ্ডচিত্র। সভ্যতার অনিবার্য উপসর্গ হয়ে জন্ম নিয়েছে রাষ্ট্র এবং তার সীমা। আবার এই সভ্যতাই প্ররোচিত করেছে রাষ্ট্রসীমা লঙ্ঘনের আগ্রাসী প্রবণতা। তেমন কোনো আক্রোশের তাড়নাতেই যেন এখন গোবিন্দ সাহা, জয়নালদের

দুই চোখে আগুন জ্বলছে। প্রতিহিংসার রক্ত দাপাচ্ছে হামিদ শেখ মৃত্যুঞ্জয় বসাকদের মাথায়। তাদের উদ্ধত লাঠি ভাল করেই জানে কোন কৌশলে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে পরস্পরের মাথায় নির্ভুল ভাবে আছড়ে পড়বে। চৌচির করে দেবে মাথার খুলি।

ঠিক সেই সময় দূরে, বাঁধের ওপর নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠিকাদাররা তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ বেষ্টিত হয়ে দেখছিল এক অভিনব দৃশ্য। আর গভীর প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল তাদের মুখ।—ভিনদেশি বলে বর্ডার ডিঙিয়ে আসা মানুষগুলি যে চিরকাল অনুগত থাকবে, উচ্চহারের মজুরির জন্য দাবি তুলবে না—এমন নিশ্চয়তা কোথায়! তার আগেই মীমাংসাটা হয়ে যাওয়া জরুরি। একটা দাঙ্গা—সামান্য একটা দাঙ্গা—গোটা কয়েক মৃত্যু, কিছু ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, কিছু রক্তস্রোত—কী এমন বিরল ঘটনা?

দাঙ্গায় শাসকরাও খুশি। আর ইতিহাস ঠিকাদারকেও শিক্ষিত করে তোলে!
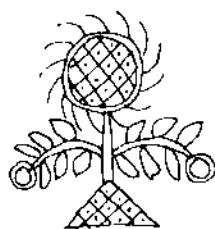
জলের আয়না ॥ ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ভোরবেলা

যেহেতু কাছাকাছি ডেরা, আঙরি ভোর ফুটলেই বেরিয়ে পড়ে। ফ্যাকাশে ভোর। তেমন করে নিজের ছায়া কাটে না পাশাপাশি। সুতরাং নোনা পথে একা হাঁটে। ফুড ফর ওয়ার্ক স্কীমে মাটির কাজ। এবড়ো-খেবড়ো, ভালো করে ড্রেসিং হয়নি। পঞ্চায়েত বাবুদের টাকা বন্ধ হয়ে গেছে।

পায়ের গোড়ালিতে ধুলো ছিটিয়ে আঙরি এগোয়। সোজা পুবমুখো চোখে লাগে লাইন ধরে তাল খেজুর গাছ। মেঘ ফুঁড়ে পাতানাতায় বাতাসের হিলমিলি। আঙরি থমকে দাঁড়ায়। একবার সামনে তাকায়, কাউকে দেখছে না। পিছনে, একদম ফাঁকা। বাঁয়ে শুধু বরফি কাটা মাঠঘাট। আবাদি জমি। ডাইনে ঝলমলে ওপাড। গাঙ টপকিয়ে দু-চোখ এক-ঠে। এখনও আলো জ্বলছে। কত খুঁটি-খাটায় পিলার-পোস্টে আলোর বান। আকাশ ছোঁয়া চিমনি। ধোঁয়ার বমি। আগুনের হল্‌কা।

আঙরি ঘাড় ফিরিয়ে সোজা গাঙমুখো। গাঙ ডিঙিয়ে মনটা থুপ করে ওপারে শিকড় চালায়। মাথার মধ্যে আঁকজোক কাটে, অত বড় হলদিয়া! কত ঘড়বাড়ি, কলকারখানা! কত লোকের হাজারো কাজকম্ম গোটা বচ্ছর ধরে...কথাটা আন্‌কা মনে হতেই ছটফটিয়ে অস্থির। আঙরি এপাশ-ওপাশ চারদিকে তাকায়। চোখে পড়ে তাল খেজুরের সারি। খড় ছাউনি ঘরটাও।

আবছা ভোর ঢালছে এখন সূর্য। রোদ্দুর আশপাশ শুষে নিচ্ছে। অতএব চোখের সীমানায় সব পরিস্কার।

আঙরি দেখতে পায় খড়-ছাউনি ঘরটার পাশে আরও ঘরদোর। নির্জনতা জাগিয়ে ঢিবি ঢাবা, নতুন খড়ের গন্ধ। ছাউনি ছপ্পরে কাঁচা রোদ চিকচিকিয়ে সোনা। আঙরির বুকের মধ্যে তোলপাড়। একটু থিতিয়ে গেলে ভাবে—আর কটা দিন! বড়জোর এক মাস। তারপর...! জো ফুরোলে একদম বসতি। দু-চোখের মণিতে আর ওপারের হলদিয়া গাঁথছে না, এলোমেলো চুলে আঙরি, বাতাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কালচে মুখে ভরাট মাংস, রঙচটা লাল শাড়িতে সাপটানো দেহটা তকতকে পাথর। দু-বুক খালি করে ছোট্ট নিঃশ্বাস। নোনা বাতাস আর একটু ভারী।

ঘেরিতে মীন ভেটকি

দেখা হতেই লিজবাবু বললো, কি রে আঙুর, কালও যে এলিনি? রাত দশটা অব্দি ঠায় বসে।

আঙরি কোন কথা না বলে চুপচাপ দেখে ঘেরি লিজ-হোল্ডারকে। পেটানো শরীর। দু-চোয়াল বসা। খাড়া নাক। চোখ দুটো অসম্ভব বড় বড়। কবজি বেয়ে শিরার দড়ি। নোনা হাওয়ায় ফরসা রঙে তামাটে ছোপ ছাপ।

আঙরি কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে লিজবাবু আবার বললো—তোদের বোঝা দায়। দেমাক হয়েছে।

আঙরি খুব ছোট্ট করে ক্ষীণ হাসে। নিজের থেকে বলে—দেমাক কিসের। আসতে পারিনি...আসতে যেন ভালো লাগছিলোনি কদিন—শেষ কথাটা উচ্চারণ না করে নিজের মধ্যে ঢালাঢালি করে। শুনতে পায় না লিজবাবু। শুনিয়ে লাভও নেই। তাই আঙরি তেমন খোলামেলা হতে পারল না। বরং গলায় একটু জোর এনে বললো—আমি তাহলে জাল বাই ? হাঁড়িটা কোথায় ?

লিজবাবুর চটকা ভাঙে।

সারা শরীরে শিকড়-বাকড়ে স্রোত। বার কয়েক চলকায়। রোদ্দুরে তাত বাড়ছে। সামনে মস্ত জলবন্দি ঘেরি। প্রায় আড়াইশ বিঘে জমির পিঠে নোনা জল। বাতাসে তির তির করে নাচছে। রোদ্দুর মেখে ঝিলিমিলি। সুতরাং লিজবাবু বন্দোবস্ত মূলে নিজের দখলে গোটা ভূগোলটা চোখ বুলিযে আস্তে আস্তে বললো—শোন্—

আঙরি কাঠ হযে দাঁড়ায়।

—কাছে আয়। আসতেই পিঠে হাত রেখে ফিসফিসিয়ে জানায়—দেখ আঙরি, ব্যাপারিরা একশ আশি টাকা হাজার মীন ভেটকি পাইকের নিচ্ছে। তাহলে তো আর ঘেরিতে সাতটাকা শ মীন বেচা লোকসান।

আঙরি কেঁপে ওঠে। লিজবাবুর হাতের চামড়ায় সে কাঁপ ধরা পড়ে। তখনই খামচা মেরে আঙরিকে বাগে আনে। অন্য মেছোনীকে একদম জানাবি না। তুই শ'য়ে সাতটাকা দিস কিন্তু আর কাউরে আট টাকার কম বেচবুনি। আঙরি খুশিতে দম ফেলে। বুকের নরম ঢিবি বার দুয়েক ওঠে নামে। ছাই মাজা সাদা দাঁতে হাসে। চব্বিশের কালো মুখ এ মুহূর্তে সকালের চেয়েও উজ্জ্বল। দো-ফ্যাকড়া কচি বাইন গাছ। ঝোপঝাপে একদম বব ছাঁট চুল। পাশে রোগা কলকে ফুলের গাছ। চেরাপাতায় রোদ্দুর হড়কায়। জায়গাটা আঙরির পছন্দসই এবং পয়া। ওখানে দাঁড়িয়ে কাপড় আলগা করে হাফশায়া ছাড়ে। পাছা বেড় দিয়ে টানটান কাপড ফেত্তা। লালচে ব্লাউজটা খুলে আঁচল সাপটে খুঁট গোঁজে কোমরে। হাঁটুর উপর থেকে পায়ের গোছ পাতা উদোম। এলোচুল খোঁপা বেঁধে চুড়ো। কাপড-চোপড় বাবলার ডালে গুছিয়ে নাইলন সুতোর ঠাস বুননের ছাঁকনি জাল বাঁ কাঁধে গলিয়ে নেয়। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই বুকের পাহাড় টলমলে।

লিজবাবুর পাঁজরায় চৌকির দাড়া ফোটে। হাঁপিয়ে আকুতি রাখে—আজ আসিস আঙরি। তোর একশখানা মীন ফিরি।

ফিক করে হেসে ভারী পাছার খাঁজে দুলকি দেয়। এক টাকার ভরতুকি শোধ পায় লিজবাবু। হুড়মুড়িয়ে জলে নামে। বুক ডুবিয়ে জাল বাইতেই লিজবাবু হারা নস্কর চেঁচিয়ে বললো—কথার খেলাপ করিসনি মাগি। চোট খেয়ে, আঙরি সোজা দাঁড়ায় বুক চিতিয়ে।

লিজবাবুর গোটা দেহে হাজার সুচ। বাসী রক্তে জল কাটে।

জলে শুধু হাবসানির শব্দ। একটু একটু করে তোলপাড়। জাল বাইতে মাছের ছিরিক ছিরিক লাফানি। আঁশ বেয়ে চকচকে রুপো।

ঘেরি বৃত্তান্ত

ঝকঝকে রোদ্দুরে জলবন্দি জায়গাটা বিশাল আয়না। সরকারি বাঁধের অফ-সাইডে। চোত-বোশেখের ভরা জোয়ার। গাঙে ঘোর অমাবস্যায় জলের টানে পলিমাটির তেজ।

ঘিরেঘারে মাটি চাপিয়ে জোয়ার আটক। চাষীরা ভাগজোক করে উঁচু মাটিতে চাষবাসে ধান ফলায়। বিঘে ভুঁই চোদ্দ পনের মন। রায়চৌধুরীরা রেকর্ড দলিল বুঝিয়ে বললো—এ জমি আমাদের অংশ। ভাগ দাও।

—তাই সই।

রাত ফুরিয়ে দিন গড়াচ্ছিল এমনভাবে।

সালটা ১৯৬৭। ফ্রন্ট আমল।

কৃষক নেতা বললো—কাগজ কলমে ভাগ রেকর্ড করলে ভালো হয়নে ?

কথাটা মনে ধরেছিলো সবাইয়ের। ভাগচাষ কোর্টে চাষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে দরখাস্ত। প্রায় পঞ্চাশজন চাষী।

কোর্টকাছারি। চোদ্দ দিনের ইনজাংশন রায়চৌধুরীর পক্ষে। রায়চৌধুরীর দু-ভাইই হাইকোর্টের উকিল।

উদোম হাওয়ায় রোয়া নাচছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। প্রতিদিন চেহারায় তাগদ রোয়া ধানের। চাষীরা থালা ঘটি বন্ধকে চাঁদা জোগায়। কালো কোট-পরা বাবুর পকেট মোটা। খাস কলকাতায় মামলা। রাহা খরচে নাস্তানাবুদ। চাষীবাসী, কাগজপত্তরে একদম মুখ্যু।

গম্বুজওয়ালা লাল বাড়িতে তে-তালায় বেশ হাঁকার দিয়ে রায়চৌধুরীবাবু বললো, রেকর্ডেড ভাগচাষী হবার শখ। দাঁড়াও আশ মেটাচ্ছি—

ফ্রন্টবাবুদের চেয়ার ভেঙে গেল। দুরাত কাটেনি। থানাবাবুদের সন্তুষ্ট করে হিজিবিজি অনেক ইংরিজি কাগজপত্তর দেখিয়ে মুখে ইংরিজির খই ফুটিয়ে রায়চৌধুরী হাজির, একবারে গাঙ পাড়ে। রায়চৌধুরীকে দেখে গায়ে-গতরে ঘন সবুজ রোয়া বাতাসের ঝাপটায় উল্টো দিকে মুখ ঘোরায়।

রায়চৌধুরী পাঁজিপুঁথি দেখে গাঙ মাপে—জমির বাঁধ থেকে গাঙ কতটা দূর। গভীর রাত। দুটো তিরিশ মিনিট গতে ভরা জোয়ার, তিন দেড়া রোজে ভাড়া করা পঁচিশ জন লোক। মুরগির মাংস আর মদে পেট ভরতি। রায়চৌধুরী অর্ডার দিলেন—লে শালা কোদাল চালা।

মাত্র পাঁচ মিনিট। বাঁধ ধসে ফাঁক। আর একটুতে দো-ফাল। হু-হু শব্দে নোনা জল ঢোকে। তোড়ের মুখে পেটে গর্ভ থোড় নিয়ে ধান চারাগুলোর নাকানিচোবানি। পাক মেরে ফেনা কাটে নোনাজল। একফোঁটা জিভে পড়লেই টাকরা পুড়ে ছাই। বঙ্গোপসাগর আর কতদূর! বড় জোর পনের বিশ মাইল। দরাজ হাতে ঠেলে দিচ্ছে নোনাজল।

কাছারি বাড়িতে পাঁচজোড়া ডবকা হিন্দুস্থানী ছুঁড়ি। জাঙ্গিয়া পরে ব্রেসিয়ার টাইট। খিদিরপুর থেকে চালান। ছোকরারা ফিরলেই আর একপ্রস্ত মদ মাংস। ফূর্তিফার্তা। লরি দাঁড়িয়ে করঙ্গলি মোড়ে। ভোরের আগে থানা ডিঙোতে হবে।

তারপর! বাঁধা অঙ্ক। হেজেপচে খড়। নুন ফুটে তিন বছর চাষ বন্ধ। ছন্নছাড়া চাষীবাসী। রায়চৌধুরীর হাতে ধরে মোকদ্দমা রেহাই। সাদা কাগজে ইস্তফা, ওই দাগ খতিয়ানে আমার কোন দাবিদাওয়া ছিল না এবং নাই।

এরপর ? বউরা গেল কলকাতায় ঝি খাটতে। আইবুড়ো মেয়েরা গেল বেশ্যা হতে। এখন, এখন তো চকচকে জল। জলের নিচে পঞ্চাশটা পরিবারের চাষের জমি গলে কাদা। বাঁধের কাটা মুখে হিউম পাইপ বসিয়ে কাঠের দরজা। খানিকটা লকগেটের মতো। ঘেরির পয়না মুখের সামনে বড় বাতা বুনে পাটার বেড়া। ভেতরের মাছ

বেরোনোর পথ জব্দ। প্রমাণ সাইজের ঘুনি মুগরি বসিয়ে যন্তরপাতি। চৈত্র-বৈশাখের কোটালে বাগদার বাচ্চা ভেটকির মীন ফ্যাসা পার্সের গিজগিজ। ড্রেন কাটিয়ে জল চলাচলের বড় বড় ঝালা। ঝালা টইটই মাছ। উঁচু মাটিতে আল বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জলবন্দি। ধানচাষের নিখুঁত ব্যবস্থা। বছর বছর ডাক ওঠে বিশ-বাইশ হাজার টাকা। নগদ পেমেন্ট। শুধু রায়চৌধুরীবাবুকে লেভিবাবদ একশ মন ধান বাড়তি। বাকি ধান মাছ সব লিজবাবুর। বছর পাঁচেক একদম হাতছাড়া করেনি সোনারপুরের হারান নস্কর। গরু ছাগল হাঁস মুরগি পুষে বেচে একদম মাটির সন্তান।

লিজবাবু হারান নস্কর খড়ছাউনি অফিস ঘরে বসে বকেয়া হিসেব কষছিলেন। লাল খেরো খাতা। সামনে ছোট্ট চৌকি। পাশে ছাগল-দুধ ফুটিয়ে এক গেলাস। ধান খেকো মুরগির লাল-কুসুম ডিম সিদ্ধ দু-খানা। ঠিক সামনে ছোট্ট চালা। ঠাকুর থান। বাঘের পিঠে বন বিশালাক্ষ্মী। তবে গা ঘেঁষে মকরবাহী গঙ্গা দেবী। ঠাকুর উদ্দেশে কপালে হাত ছুঁয়ে ডিম কটা সাবড়ে দেয়। পরে সুরুত সুরুত শব্দে ছাগল-দুধ খায়। এটি লিজবাবুর চা-পর্ব।

এক ঝাঁক পাখির কিচিরমিচির শব্দ। লিজবাবু কান খাড়া করে শোনে। শুনে বাছতে থাকে কি জাতের পাখি। পরে সিদ্ধান্ত নেয়—ও, তাহলে ওরা এসে গেছে। সুতরাং ঘরের বাইরে আসে।

একদল ছেলেমেয়ে। বারো-চোদ্দ থেকে বাইশ-চব্বিশ মায় পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশের বুড়ি। কাছে আসতেই লিজবাবু বেশ জোরে দাবড়ি দেয়—হেই চুপ যা সকলা—

চিৎকারটা ঝিমিয়ে যায়। সবাই থমকে দাঁড়ায়।

লিজবাবু শুরু করে, শোন সকলে। আজ থেকে কিন্তু একশ মীন ভেটকিতে আট টাকা রেট দিতে হবে—

—সে কি!

বর্গাদার প্রমাণপত্র

প্রাইমারি স্কুলের দেওয়ালে হুক মেরে ব্ল্যাকবোর্ডে সাঁটা 'অপারেশন বর্গা' এই শিরোনামায় নোটিশ। সান্ধ্য সভা করে স্থান তারিখ ঠিকঠাক। পঞ্চায়েত অফিস, মোড়ের মাথায়, হাটের পোস্টঅফিসেও ঝুলছে নোটিশগুলো।

বেঞ্চ ক্লার্ক আমিন ফোরথ গ্রেড বাবুদের নিয়ে ঝকঝকে প্যান্ট-শার্টে গোলগাল কে জি ও সাহেব, নড়বড়ে টেবিলের ওপাশে একখানা চেয়ার।

মৌজা জমাবন্দি দাগ নম্বর মূল মালিক দখলিকার চাষীর নাম ঠিকানায় ঠাসা খাতা, কাগজপত্র। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ শোনার পর কে জি ও সাহেব দিয়েছিলেন বর্গা সার্টিফিকেট বিষ্ণুপদ সরদারকে।

বর্গা সার্টিফিকেট পেয়ে বিষ্ণুপদ সোজা পোঁটলা-পুঁটলিতে বেঁধে বুকে জাপটে কে জি ও সাহেবকে হেঁকে বলে—বাবু গো পেন্নাম হই।

কে জি ও তৃপ্ত হাসি হাসেন। মাস্টারির অনিয়ম বেতন এড়াতে কে জি ও'র চাকরি। বিষ্ণুপদ সিধে ঘরমুখো। বাড়ির উঠোনে হাঁসটা বারবার প্যাঁক প্যাঁক শব্দে এমুড়ো থেকে ওমুড়ো চষে ফেলছিলো। হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে চেঁচায়, ধরতো ওটাকে আগুরি, আজ ভাগাই। জমিয়ে রান্না কর। কদ্দিন মাংসের ঝোলে ভাত মাখাইনি—।

মাঠঘাটে রোদ বিছিয়ে বেশ শুকনো। বোশেখের গোড়ামুখে এক পশলা বৃষ্টি। লাঙ্গল কুপিয়ে ঝুরঝুরে মাটি বানিয়ে নিড়েন মেরে রোদ খাওয়ালে কাকড়ি বীজ চারা।

এবারে আর কোন ঝক্‌কি নেই। একেবারে কাগজ কলমে হিসেব। ফসল ভাগ বারো আনা বিষ্ণুর চার আনা মালিকের।

মাঝ বোশেখের বেলা আটটার সূর্য। আগুন ছড়াচ্ছে দমকে দমকে। সারা গায়ে দরদরে ঘাম। বিষ্ণুপদ হেলে গবু দুটোকে জপায়—নে না বাপ, আর ঘণ্টা দুয়েক টান, তোদের ছুটি, বলে ল্যাজ মোড়া দিতেই গা ঝাড়া দেয় বলদ দুটো।

সুরথ মৌলে লোকজন নিয়ে ছুটে আসে। চেঁচায়—এই বিষ্টু লাঙ্গল গবু তোল--

কেন ?

—বাপের জমিন পেয়েছিস।

—না। আমার নাম বরাবর রেকড জমি।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে অশ্লীল গালাগালি দেয়। তার মানে দাঁড়ায় চুল। বিষ্ণুপদ হকচকিয়ে চুপচাপ।

সুরথ মৌলে এক বাণ্ডিল কাগজপত্র সামনে মেলে ধরে বলে, দেখ বেটা। হাইকোর্টের জজ সাহেবের রায়—বর্গাফর্গা বাতিল।

বিষ্ণুপদ চমকে ওঠে। বুক খালি। একটু থিতিয়ে বললো—এসব ইঞ্জিরি ফিঞ্জিরি বুঝিনি। পঞ্চায়েতের বাবুদের কাছে চলো—

আবার পঞ্চায়েত মারাচ্ছে। চল হাইকোর্টের উপর কে কত আছে দেখে আসি—।

সামনে ভিতরে দু-খানা বেঞ্চ। বাতিল ডিঙির কাঠকুঠোয় তৈরি। এখনও ঘন আলকাতরার দাগ। ছাঁচ তলায় বোর্ড :

১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। প্রধানবাবু থাকলেও তার ডান হাত রামপদ বিড়ি ফুকোচ্ছিলো। প্রাইমারি টিচার। প্রধান বললো—রামপদো দেখতো, কী ব্যাপার। কাগজপত্র ঘেঁটেঘুঁটে একমনে দেখতে থাকে রামপদ।

যতই মুখ ভাঁজ কাটে ততই বুক শুকিয়ে কাঠ। শেষে গম্ভীর মুখে রামপদ জানায়—মিস্টার জাস্টিস মুখার্জির রায় মূলে সুরথ মৌলে ভার্সেস বিষ্ণুপদ ও অন্যান্য এই অপারেশন বর্গা কেসটা বাতিল। মালিককে নোটিশ করে হেয়ারিং নিয়ে গরমেন্ট ফারদার প্রসিডিং নিতে পারে। বর্তমানে মালিকের পিসফুল দখলে যেন কোন ডিস্টার্ব করা না হয়।

বিষ্ণুপদর টাকরা শুকনো। তবুও একটু ঢোক গিলে ভিজিয়ে নিয়ে বললো—মানে বুঝলুমনি। খোলসা করে বলো তো—

রামপদ বলে—কি আর মানে। তুই এখন থেকে ওই দাগের জমিনে চাষী নেই—

মাথায় রক্ত চড়ে যায়। হড়বড়িয়ে বলে—সে কি ! আমি আজ বারোবচ্ছর ওনার বাপের আমল থেকে ওজমি চাষ করি—সুরথবাবু বলুক—।

রামপদ ক্ষীণ হাসে।—রসিদ নিতিস ?

দু চোখের মণি স্থির। চুপচাপ দেখে। শোনে।

তবে। ভাগ—রামপদ কড়া চোখে সুরথের দিকে তাকিয়ে বেশ ঝাঁঝিয়ে বলে—এটা কি ধরনের জোচ্চুরি। ভাগে চাষ করাবেন, রসিদ দেবেন না, আবার মামলা জুড়তে ওস্তাদ—

সুরথ হেসে ওঠে—তাই যদি বলেন আপনারা, তাহলে যেসব লোক জমিজমা বেচে শহরে দু-তিন তলা পাকাঘর তুলে ভাড়ায় দিচ্ছে তাদের ঘরগুলো ভাড়াটেদের নাম বরাবর রেকর্ড করে দিন।

রামপদ দাবড়ি দেয়—বেশি বকবেন না। অতো আইনের কচকচানি ছাড়ুন তো—।

বিষ্ণুপদ সোজা বাড়ি।

খড়ছাউনি ঘরদোর। উঁচু দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি চকপকে। বারান্দার অনেকখানি ভিজে স্যাঁতসেঁতে। একটু জিরোবে কিনা ঠিক করতে পারে না। বুকের ভিতরে টিপটিপ শব্দে কলকব্জা বাজে। স্থির হয়ে কিছু ভেবে না পেয়ে একদম ঘরের ভিতর। হুড়মুড় করে পুরোনো পোটবেনের ডালা খোলে। খুলতেই পুঁটলিটা পেয়ে যায়।

ঝটপট গিঁট খুলে কাগজটা হাতের মুঠোয়। রঙ ভাঁজ স্মৃতিতে নড়েচড়ে ওঠে। দোরগোড়ায় আলো। কাগজটা দ্রুত মেলে ধরে। অক্ষর পরিচয় না থাকলেও অক্ষরের আদল গেঁথে গেছে সাব্যস্ত করে—এটাই সার্টিফেট—।

পুঁটলিটা বগলদাবায় নিয়ে পিটপিট করে তাকায় বিষ্ণু। গোটা ঘরটায় চোখ বুলোয়। কিছুই চোখ ছোঁয় না। বরং কী যে খুঁজছে সেটা ধরতে পারে না। ঘরের খাঁজে খাঁজে অন্ধকার। একটু বাইরে আসতেই বাতাস। আলো। খানিক দম নেয়।

উঠোনে পা ফেলে দৌড়োয়। দ্রুত একটানা অনেকটা। নোনামাটির বাঁধ। এলোমেলো বাতাস। একটু থমকে দাঁড়ায়। গা জুড়োয়। আবার ছোটে। ডাইনে বাঁয়ে রাস্তা। কোনটা ধরবে ঠিক করতে না পেরে সিধে পুবমুখো। মাটি কাটিয়ে ছোট ছোট বাঁধ। বাঁধ বন্দি জল। রোদ্দুরে চিকমিকোয়। এক দঙ্গল মেয়ে বাচ্চা ছাঁকনি জাল টানা দিচ্ছে। ভেটকি মাছের কুঁচো মীন। জল শুষি মেরে টাকরি খায়।

কোমড়ে দড়ি বেঁধে সিলভারের হাঁড়ি। দ্বীপের মতো ভাসে। মীন ভেটকি ছিরিক-ছাবুক লাফায় হাঁড়ির পেটে। উদোম পিঠে জল ডুবো বুক। দু-হাতের জোরে এগিয়ে যায় জল কেটে। অনেক ধকল।

হারা নস্কর মাঝে মাঝে চারদিক ঘুরে টহল দিচ্ছে। জল ঘুলিয়ে থমকে দাঁড়ায়। আঙরির গায়ে শাড়ি লেপটে সব খাঁজ ভাঁজ স্পষ্ট। আর একটু হাঁটতেই বটকেষ্ট দাঁড়ির বিধবা বউ। মধু ভাঙতে গিয়ে বটকেষ্ট আর ফেরেনি। ডাক দেয় হারা—কি রে কেষ্টোর বউ—মীন কেমন পাচ্ছিস ?

বটকেষ্টর বউ গা-বুক একদম না গুছিয়ে সোজা দাঁড়ায়। গায়ে-গতরে থলথলে। থুতনি বুক থেকে টুপটাপ জল খসে। হাসি টেনে বলে—মাছ মারতে ভালো লাগে না ঠাকুরপো। শুধু কষ্ট, আরাম নেই—

—তবে আর কি করবি—

—শালার শৌর-শাউড়ি বড্ড জ্বালায়।

—বেড়া ডিঙোতে না পারলে আর ঘাস খাবি কি করে ?

—তোমার ঘেরিতে রান্নাবাড়ির কাজ দাও না—

—কত মাইনে ?

—একদম লাগবেনি—

—কদ্দিন ?

—যদ্দিন কাছে পিঠে রাখবে—

'হারাবাবু আছো গো'—চিৎকারটা ক্রমশ এগিয়ে আসে। উৎস খুঁজে পায় না। খানিক দাঁড়াতেই দেহটা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসে। বটকেষ্টর বউ বুঝতে পারে বিষ্ণুপদ শ্বশুর গাঁয়ের লোক। সুতরাং টুপুস করে গা-বুক লুকোয় জলের মধ্যে।

বিষ্ণুপদ এসেই হাঁপায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—জমি নেবে, জমি ? ঝট করে হারান নস্করের হাতে গছিয়ে আরও ছোটে। বাঁধের ঢালু বেয়ে হুড়মুড়িয়ে জলে ঝাঁপায়। ঘেরির জল, জলে হরেক মাছের আনাগোনায় তিরতিরে ঝলমল। অনেকটা সাঁতরে

যায। এক গলা জলে পা গেঁথে গেঁথে হদিশ খোঁজে।—না এটা নয। আব একটু এগোয। এবাব চেঁচিযে জানান দেয—পেযেছি। এই তো আমাব বাপেব জমিন। দুপুবে ভাতেব আশায হা-পিত্যেশ দাঁডিযে থাকতো। বাপেব তবে বযে আনতুম পানতা পেঁযাজ। এক ঘটি জল। ঠিক এখানটায।

চাবদিকে টইটম্বুব জল। অতোগুলো মেযে বাচ্চা জাল থামিযে ঠায চুপচাপ। হাবান নস্কব অবাক হয না। ববং ভাবতে থাকে, এত জলকাদায বিষ্ণু জমিটা চিনলো কী কবে।

ঝাঁপাঝাঁপিতে জল দুলে দুলে বুকে লাগে। একদম শেষে বটকেষ্টব বউ বললো—আঙবিবে তোব বাপেব মাথা বিগডেছে—

মীন ব্যাপাবি

পিচ ঢালাই পাকা বাস্তা। তে-মাথানি মোড। কাকদ্বীপগামী বাস লবি। দোকানপাট এখন ঝিমিযে। ভব দুপুব। বটতলায জটলা। লাইন ধবে সিলভাবেব হাঁডি। হাঁডিতে জল। জলেব মধ্যে মীন ভেটকি।

পাঁচটা মীন মিলিযে এক একটা খেপ। সুব টেনে টেনে হিসেব বাখে একে-এক একে-এক। দুযে-দুই তিনে-তিন...

আঙবি এখনও হাঁডি ছোঁযনি। চাবপাশে আঁতিপাতি খোঁজে। এখান থেকে বসেই দোকানপাট সিধে লক্ষ বাখে। তবুও পাত্তা পাচ্ছে না। একবাব ভাবলো—ভিন ব্যাপাবিকে দে-দিই।

সিদ্ধান্তটা বুকেব মধ্যে পাক মাবে। উবুথুবু বসে থাকতে অস্বস্তি। নতুন এক ব্যাপাবি আঠাবো টাকা শ'যে মাছ কুডিযে নিচ্ছে। উশখুশ কবে নিজেব মধ্যে। ভাবে, বাঁধা ব্যাপাবি ছেডে নতুন লোককে দেওযাটা কি ভালো হবে। মাঝে মাঝে দু-দশ টাকা দাদন নিই যে—। অতশত ভেবে আঙবিব বুকেব মধ্যে আই-ঢাই কবে।

ভ্যান-বিকশায হাঁডিব ঠনঠন বাজনা। বাঁকেব দডি জডিযে সাবধান তবুও বাগে আসে না। ভ্যান থেকে লাফ মেবে পলাশ বললো—আঙবিবে বড্ড দেবি হযে গেল। পলাশেব দু-চোখে লাল কবমচা।

আঙবি গুম মেবে চুপচাপ। পবে মুখ খোলে—শুনি তো তুমি অনেক লেখাপডা জানা ছেলে। এত গাঁজা খাও কেন?

—দূব। লেখাপডা। জঙ্গলে চুট্টা খাওযা অভ্যেস হযে গেছিলো। বামলাল আমাব গুবু। সেবাব পুলিসে তাডা কবতে ও ব্যাটা ঠাঁই না দিলে সেদিনই খেল খতম—।

—অতো তাডামাডা খেযে কবলেটা কি?

পলাশ চোট খায। চুপচাপ চাবপাশ দেখে আঙবিব দিকে ভাল কবে তাকায। কঠিন প্রশ্নেব মুখোমুখি। শুধু কি নষ্ট। শুধু কি ভেডাব পালেব মতো ঘাড গুঁজে পিছু পিছু যাওযা। নাকি একটু কিছু কাজ হযেছে। সমস্ত ব্যাপাবি মীন মেছোনিদেব দিকে তাকিযে ভাবে উনসত্তব-সত্তব আব এখন আশি-একাশি। একটা দশক। একটা কতখানি সময!—কত কী যে কবা যেত—! কিংবা হযে উঠতো! কিন্তু হ'লোটা কোথায! যে যেমন ছিলো তেমন আছে। ববং গাযেব চামডায ভাঁজ পডেছে। গাছপালাব ডাল শুকিযেছে।

পকেট হাতডে বিডি ধবায।

পলাশেব দু-চোখে ভুতুডে ঘোব। আঙবি তাকিযে কিছু বলতে পাবে না। ছেলেটা ব্যাপাবি হলেও মাছওলাব গন্ধ একটুও নেই এখন। তাই খানিক চুপচাপ থাকে। তাব

বড়সড় চুল, ঢলঢলে প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটু অব্দি সব দেখে। থুতনির কাছে কাটা দাগ। হাতের তেলোয় নখের ডগায় পোড়া ছাল-চামড়াও।

রেশনের মালভর্তি একটা হেভি লরি বেরিয়ে গেল দু-পাশ দাপিয়ে। পায়ের নিচে রাস্তার মাটি থরথর কাঁপে। তখনই পলাশের চটকা ভাঙে। ঝটপট বলে—যাহ্ ! আবার দেরি—। সাইজ কর—

ডিশে গামছা পেতে জল। মীন ভেটকি ঢালতেই ঝিনুক ডুবিয়ে পাঁচটা করে ভাগ। গুনতি আরম্ভ—একে-এক দুইয়ে-দুই—

আঙরির কোন দায়িত্ব নেই। নির্দ্বিধায় তাকিয়ে দেখে। ওপাশে একটা ম্যাটাডরে ব্যাপারিরা মাল তুলছে। যাবে ক্যানিং ভাঙড় তপসের ভেড়িতে মীন চালান নিয়ে।

হিসেব-নিকেশের পর পলাশ খুব শান্ত গলায় বলে—টাকা পয়সা কাকে দিস ?

—বাপকে।

—আর কেউ নেই ?

—মা ভাই বোন আছে—

—বর ?

খিলখিল করে হাসে। হাসিটা কানে বাজতে লাগাম টানে। থমথমে মুখে বলে—বর জিনিসটা কী বলো তো ! যার কাছে খাই, খাওয়ায়, থাকি, শুই সে তো— ?

পলাশ হকচকিয়ে কথাটার মর্মে সেঁধোয়। আঙরির কথার ধরনটা আঁচ করে। গলায় শিরায় দাগ দেখে। কোন উত্তর করে না।

আঙরি আর একটু নিজেকে মেলে ধরে—সে তো ছ'মাস ঘর করে দেড বচ্ছর হল পালিয়েছে—

পলাশ আচমকা আঙরির কপাল দেখে। সিঁথির চুলের গোড়ায় রঙ খোঁজে। কবজির চেহারাটা দেখে। বরং ভাবে, দু-হাত দু-পা গোটা শরীরটা ছাড়া আঙরির সঙ্গে তো আর কিছু নেই। কোন কালে অতিরিক্ত কেউ ছিল বলে তো মনে হয় না !

আঙরি হঠাৎ মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো—চলো। চা খাওয়াবে নে আজ ?

—শেষে যে ডেলি খেতে ইচ্ছে করবে রে—

চট করে কিছু না বলতে পেরে একটু সময় নেয়। পরে বলে—সে আর ক'দিন। মীন ভেটকির সিজিন ফুরোলে হাওয়া—

—তবু যে ক'টা দিন...

—তারপর...

'ট্রেন টাইম লক্ষীকান্তপুর'—রিকশা ভ্যানটার এক নাগাড়ে চিৎকার। পলাশের কানে পৌঁছতে গা ঝাড়া দেয়। সব এখন ধুয়েমুছে পরিষ্কার। মীন ভেটকির হাঁড়িটা ভ্যান রিকশার উপর। গোছগাছ করে বসে কবজি উল্টে ঘড়িটা দেখে। আঙরি গায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

প্যাডেলে চাপ দিতেই ভ্যান গড়ায়। মাথার উপর চব্বিশ বছর ধরে চেনা সূর্য। চকচকে দু-চোখ নাচিয়ে আঙরি খুব ছোট্ট করে বলে—অতো গাঁজাটাজা নাইবা খেলে...

মাঠের মধ্যে

উল্টোপাল্টা বাতাস, আঙরির বুকের মধ্যে অ্যালমা- ছ্যালমা টানাপোড়েন। মাঝে মাঝে পায়ের গতি দমে যায়। ডেরাঠাঁই এখনও অনেকটা দূর। চারপাশে তাকাতেই দেখে সূর্য প্রায় আধ ঘণ্টা আগে নিবে গেছে। অন্ধকারে একটু একটু করে সর বসছে। চারপাশ

দেখতে দেখতে মাথার যন্ত্রপাতি সেঁতিয়ে যায়। ভাবতে থাকে... আচ্ছা... একটানা বরাবর তো শুধু দিনের পর দিন থাকে নে... ! বরং খানিক পরে রাত আসে...আবার ভোর হয় ! এমন ভাবনায় বুঁদ থেকে একটা সিদ্ধান্ত টানে—আদতে একটানা বরাবর বলে কিছু নেই। এই কথাটা নেড়েচেড়ে দেখতেই মাথার ভার ফর্সা। তখন আর কোন দায় নেই। অনেক হালকা। ফুরফুরে হাওয়ায় একদম পাখির পালক।

জোরে জোরে পা ফেলে।

আল বাঁধ জল চলাচলের নালা ডিঙিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে আঙরি। বাতাসে মাথার চুল এলোমেলো। বুকের কাপড় খসিয়ে বাতাস মাখছে গায়ে। গলায় একটু একটু ঘাম হলেও জুড়িয়ে যায়। প্রতিদিনের ডেরা টান আজ আলগা। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। মাঠের মধ্যে চিমনি আলো। রঙটা মরা। তবুও চেনা চেনা লাগে।

দাঁড়িয়ে আঙরি। অন্ধকার চিরে চোখ চালায়। আলোটা ঠায়। একদম নড়ছে না। শুধু বাতাসের দমক। মাঝে মাঝে শিখা কেঁপে ওঠে। বুকটা তখনই তছনছ।

একজন মানুষ কাপড় সেঁটে কোদাল চালাচ্ছে। এক নাগাড়ে বার পাঁচেক কোদাল মেরে জিরোয়। আবার কোদাল চালায়।

বুকের মধ্যে টান। আলপথ ডিঙিয়ে আলোমুখো।

বড়সড় গর্ত। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাটির চাপ। একটা ছাপ-ছপ্পর কাগজ গেঁট থেকে বের করে। গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মাটি চাপায়। আপ্রাণ কোদাল টানে। কপাল বুক বেয়ে দরদরে ঘাম। চিমনির আলোয় চকমকি।

—এই বাপ

ঘাড় না ফিরিয়ে উত্তর দেয়—সময় নেই। শব্দ কটা গুহা চিরে কানে আসে।

—কি করতেছো...

—জমির সার্টিফেট জমিতে গেঁথে দখল রাখতেছি...

—তাতে হবেটা কি ?

এক ঝলকে কোদালটা কাঁধে রাগিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করে—তা জানিনি। কোপাতে কোপাতে মনে হল, মালিক বদলায়, আইন বদলায়, মাটি কিন্তু এক থাকে।

একটা শ্বাস ছেড়ে খানিক দম নেয় বিষ্ণুপদ। বলে, জজবাবুরা যদি মাটিকে জিগাস করতো...মাটি তুমি কাকে বেশি চেনো ?

মাটির ঢিবি। ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে মানুষটা। অনেকক্ষণ কোদালখানা হাতে ঝুলছে। এক নিমেষে কোদালটা অন্ধকারে ছুঁড়ে দেয়। বাতাস কেটে চারপাশ দুলিয়ে একটাই শব্দ আসে,...ঠং...।

বুক চিতিয়ে সোজা দাঁড়ায় বিষ্ণু। দমকা বাতাসে চিমনি নিবে অন্ধকার। চারপাশ জুড়ে আরও ঘন অন্ধকার। একপা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়ায়। দু-চোখ চালিয়ে পথ খোঁজে।

অন্ধকার চিরে আঙরি খুঁজতে চেষ্টা করে, মানুষটা কোথায় ! কাছাকাছি আসতেই আচমকা মনে হল, মানুষটা যেন আর বাবা নেই।

অন্ধকারে কয়েকটা মুখ ॥ অমিতাভ দত্ত

শব্দটা এখন আর নেই। একটু আগেও ছিল টের পাচ্ছিলাম। ঘুমের মধ্যেও কানের রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করে শ্রবণেন্দ্রিয়তে গিয়ে ধাক্কা মারছিল। মৃদুভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। যদিও শব্দটা এইরকম : ঘড়-ঘড়, ঘড-ঘড। কিন্তু ঘুমেব মধ্যে মনে হচ্ছিল যেন কোনো দেশি মেঠো বাজনা একটানা সুরেলাভাবে বেজে যাচ্ছে। এবং সেই মায়াবী বাজনা আমার মস্তিস্ক এবং বোধবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। অথচ, ভাবলে অবাক লাগে, আশ্চর্য হতে হয় এই শব্দটার সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র পাঁচ দিনের। দশবেলার।

মনে পড়ে মৃণাল সেন তাঁর 'ইন্টারভিউ' ছবিতে এমন একটা পাখা ব্যবহার করেছিলেন। সে পাখাটাও অবিকল এই পাখাটার মত দেখতে। অবিকল একরকম। সাইজ এক। রঙ এক। এমনকি ঘুরবার ধরনটা পর্যন্ত একরকম। আব বলাবাহুল্য ঘুরবার সময় এইরকম ঘড-ঘড, ঘড়-ঘড শব্দ। আর অবাক কাণ্ড শব্দটা প্রথমে বিরক্তিকর মনে হলেও একটু পরে ভাল লেগে যায়। ওই পাখাটার বেলাযও সেরকম মনে হয়েছিল। মজার ব্যাপার। স্বীকার করতেও বাধা নেই। এ যেন সেই ভাঙা বেহালায় সুর খুঁজে পাওয়ার মত ঘটনা।

সাদা ফুটফুটে বেডে শুয়ে আছি। চিৎ হয়ে। হাতদুটো শরীরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে রয়েছে। যেনবা ও-দুটো অসাড। এইভাবে। পা-দুখানা বিছানার উপর ছড়ানো। রিল্যাক্স করার ভঙ্গিতে। চোখ মাথার উপর স্থির অনড় পাখাটার দিকে। মনে মনে এক, দুই, তিন, চার...পরপর গুনে যাই। গুনে যাই আর পাখার দিকে তাকিয়ে থাকি। যদি পাখাটা ঘোরে। হঠাৎ, অন্যমনস্কতায়, সামান্য একটু নড়তেই যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে দম বন্ধ করে যন্ত্রণাটাকে ডিঙিয়ে আসার চেষ্টা করি। এইভাবে, গত চারদিন ধরে শরীরের নানারকম যন্ত্রণাকে বুখবার চেষ্টা করছি। তাতে অবশ্য কিছুটা সফলও হচ্ছি।

আমার পেটের ডানদিকে, অনেকটা নিচে... যাকে তলপেট বলে তার ঠিক পাশে অসম্ভব ব্যথা। ওখানে ইঞ্চি তিনেক কাটা হয়েছে। কেটে সেলাই করা হয়েছে। সে কারণে বাঁ-হাতে সেলাইনের সূচ ফুঁড়ে শরীরে নুন ঢোকানো হয়েছে। ডান হাতে এবং কোমরে সকাল সন্ধে এবং রাতে এখনো পালা করে ইঞ্জেকসান দেওয়া হচ্ছে। সেজন্যে জায়গাগুলো টাটিয়ে আছে। ফোঁড়া হলে যেমন হয়, সেইরকম। আমি যেখানে রয়েছি সেটা এক নম্বর কেবিন। মুখোমুখি দু-নম্বর কেবিন। মাঝে একটা হাত দশ-বারোর প্যাসেজ। সেটা দিয়ে পুরুষদের ওয়ার্ডে ঢুকতে হয়। পেছন দিকটায় মেয়েদের কেবিন ও ওয়ার্ড। উলটো দিকে অপারেশন থিয়েটার। এসবের পেছনে এক্স-রে ঘর। ওষুধ ঘর। আউট-ডোর পেসেন্ট দেখার ঘর। এস ডি এম ও-র চেম্বার এবং অফিস ঘরগুলো বাদে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আরো গোটা চারেক ঘর রয়েছে। এই ঘরগুলো আউটডোর এবং ওষুধ-ঘরের লাগোয়া। রোজ সকালে ওই দিকটায় ভিড় লেগে যায়।

আশপাশের গ্রামের গরিব মানুষদের ভিড়। আইসোলেশন ওয়ার্ড পুবে। দেড়শো গজ দূরে। জেনারেল ওয়ার্ড এবং আইসোলেশন ওয়ার্ডের মধ্যিখানে একটা বড়সড় ঝিল। মফস্বল শহরে এতবড় হাসপাতাল সচরাচর দেখা যায় না। আমি এখন চোখ বুজে গোটা হাসপাতালটাকে যেন দেখতে পাচ্ছি। ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আরও দেখতে পাচ্ছি—হাসপাতাল কম্পাউন্ডের মধ্যে, উত্তর এবং পূর্বদিকের একাংশে ডাক্তারবাবুদের এবং স্টাফদের জন্য আকাশচুম্বী চারতলা তিন-তিনটে কোয়াটার্স। স্টাফদের দুটো কোয়াটার্সের সামনে দুটো বড় খেলার মাঠ। কোয়াটার্সের ছেলেমেয়েরা এবং আশপাশের ছেলেরা এই দুটো মাঠে খেলে। আমি যেহেতু এই মফস্বল শহরের মানুষ সেকারণে এসব জিনিস আমার আগে থেকেই জানা।

কেবিনটায় এখন আলো-আঁধারির খেলা। আবছা অন্ধকার। ভিতরে যা যা আছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মেয়েদের ওয়ার্ড থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মোমের আলো এই কেবিনে ঢুকছে। মাথার দিকের কাচের জানালায় নরম মৃদু আলো তিরতির করে কাঁপছে। অন্য ওয়ার্ড থেকে ওষুধের গন্ধ নাকে এলে খারাপ লাগে এখন আলোটা কিন্তু ভালই লাগছে। যদিও এত অল্প আলোয় চোখ চলে না ভাল। এই যে আমার ডানদিকে এটাচড বাথরুম। বাথরুমের গায়ে ড্রেসিং টেবিল। ড্রেসিং টেবিলের উপর কাচের গ্লাসে খানিকটা দুধ ঢাকা দেওয়া রয়েছে। রাতে, দশটা নাগাদ ফ্লাস্ক থেকে দুধ ঢেলে হরিপদ আমায় খেতে দিয়েছিল। সবটা খেতে পারিনি। হরিপদ এই হাসপাতালের পুরুষ আয়া। কালো গায়ের রঙ। রোগা লম্বাটে চেহারা। বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ হবে। হাসপাতালের পেছনে হরিণডাঙা বলে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামের বাসিন্দা ও। আজ বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে রীতা আর রন্টু আসতে হরিপদ রীতার হাত থেকে ফ্লাস্ক এবং সন্দেশের প্যাকেট ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল কেবিন থেকে। কেননা, হাসপাতালে রুগীদের আত্মীয়পরিজন এলে আয়ারা সেইসময় রুগীর কাছে থাকে না। ওরা সেই টাইমটায় আড্ডা দিতে বেরয়। বাইরের চায়ের দোকানে বসে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করে। আজ কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়েও ফিরে আসে হরিপদ। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, দাদাবাবু সিপাই বিদ্রোহ কত সালে হয়েছিল ? আমি ইতিহাস পড়াই বলে কিনা জানি না,প্রশ্নটা করে ও আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। আমি উত্তর দিতে হরিপদ বলে, বড় মেয়েটা ক্লাস ফোরে উঠেছে। ক-দিন ধরে প্রশ্নটা করছে আমায় উত্তর দিতে পারিনি। কথাটা বলে মৃদু হেসে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায় সে।

পুরুষ আয়া সংখ্যায় কম বলে হরিপদ একাই দু-বেলা আমার সেবা করে। সেবার মূল্য প্রতি বেলার জন্য চোদ্দ টাকা। হরিপদ বেডের পাশে একটা বেঞ্চ লাগিয়ে শোয় রাতে। দশটা নাগাদ আমায় দুধ বিস্কুট খাইয়ে নিজে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়েই ঘুম। পাঁচ মিনিটও লাগে না, নাক ডাকতে থাকে ওর। আমার চোখে কিন্তু ঘুম আসে না। ঘুমের ওষুধ খেলেও কাজ হয় না। কিন্তু হরিপদ রোজ রোজ এরকম বউ বাচ্চাদের ছেড়ে রুগীদের কাছে থাকে কি করে ? ঘুম আসে কি করে ওর। আমার তো রীতা রন্টুকে ছেড়ে এখানে এক মিনিটও থাকতে ইচ্ছা করে না।

এখন কটা বাজে বুঝতে পারছি না। হাতে ঘড়ি নেই। অবশ্য ঘড়ি থাকলেও সুবিধে হত না। কেননা আমার ঘড়িতে রেডিয়াম দেওয়া নেই। এই আবছা অন্ধকারে রেডিয়াম-হীন ঘড়ি থাকা না থাকা দুই সমান। সময় বোঝা যেত না। এখন কি মাঝরাত ? নাকি ভোর হবো-হবো সময়, চারটে সাড়ে-চারটে বাজে। আর একটু পরেই কাছে বা দূরে কোনো বাড়িতে মোরগ ডেকে উঠবে। আকাশে আলো ফুটবে। পাখিরা

কিচির-মিচির ডেকে উঠবে। এবং এসব পরপর হতে থাকলে আমার নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ব দূর হবে। আমাকে একা থাকতে হবে না।

শব্দটা কতক্ষণ বন্ধ হয়েছে জানি না। হয়ত একটু আগে। কিংবা তা নয়, অনেকক্ষণ আগে বন্ধ হয়েছে পাখাটা। এক-দেড় ঘণ্টা আগে। সেকারণে আমার কপালে গলায় বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। খুব গরম লাগছে। শরীর থেকে সব জামা-কাপড় খুলে ফেলতে পারলে যেন শান্তি পেতাম। অবশ্য, শরীরে আমার কিইবা জামা-কাপড় আছে এখন। পরনে একটা পাজামা। গায়ে একটা পাতলা সাদা চাদর। চাদরটা বুক থেকে নামাতে পারলে যেন ভাল হত। কিন্তু সে উপায় নেই। চাদরের খানিকটা পিঠের নিচে চলে গেছে। টেনে বের করতে গেলে পেটে লাগবে।

কেবিনের দরজা এখন বন্ধ। ভেজানো রয়েছে। একটুও বাতাস ঢুকছে না কেবিনে। বাতাস ঢুকলে গরমে এত কষ্ট হত না। ঘাম জমত না গায়ে। অবশ্য জ্যৈষ্ঠের দিনে বাতাস বড় অপ্রতুল। শুধু গরম উগরোয় প্রকৃতি। এসময় নির্দয় সে। সূর্যদেবের রক্তচক্ষু যেনবা আগুনের গোলা। হঠাৎ খুট করে শব্দ হল দরজায়। কে যেন বাইরে থেকে ধাক্কা মারল। আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দরজাটা আমার পায়ের দিকে। কিন্তু অনেকটা বাঁয়ে। মাথা ঘুরিয়ে দেখা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু দরজা ঠেলে, পা টিপেটিপে যে ঘরে ঢুকল, তাকে একটু পরেই দেখতে পাই। সে একটা বেড়াল। বেড়ালটাকে আমি চিনি। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। চোখ জ্বলছে। বেড়ালটা সকালে চুরি করে বিস্কুট খেয়ে গেছে আমার। এখনো এসেছে কিছু চুরি করবে বলে। তাড়িয়ে না দিলে এখুনি ড্রেসিং টেবিলের উপর যে দুধটুকু ঢাকা দেওয়া রয়েছে সেটা খেয়ে পালাবে। শুধু খাবে না, কাচের গ্লাসটা ভেঙেও দেবে। আমি মুখ দিয়ে 'এই যা' বলি। হিস-হিস শব্দ করি। বেড়ালটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। যাবার আগে আমার দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায়। হয়ত ওদের ভাষায় মনে মনে গালাগাল দেয়। অভিশাপও দিতে পারে।

একটু জল খেতে পারলে ভাল হত। গলাটা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু হরিপদ যেভাবে অসহায়ের মত ঘুমোচ্ছে, ওকে ডাকতে ইচ্ছে করে না। মরুভূমির কথা ভেবে কয়েক ঘণ্টা না হয় জল না খেয়েই কাটালাম। মরুভূমির মানুষরা তো দিনের পর দিন জল না খেয়ে কাটায়। আমি কযেক ঘণ্টা জল না খেয়ে থাকতে পারব না!

সোমবার দিন এখানে এসেছি। সঙ্গে এসেছিল রীতা আর আমাদের চার বছরের ছেলে রন্টু। এসব হাসপাতালে কেবিন পাওয়া বড় মুশকিলের ব্যাপার। কত রুগী তো পেয়িংবেড বা ফ্রি-বেডেও জোগাড় করতে পারে না। মেঝেতে শুয়ে থাকতে হয় তাদের। আমার ভাগ্য সেদিক থেকে ভালই বলতে হবে। এই কেবিনটা পেয়েছি। আমি এখানে আসার ঘণ্টাখানেক আগে কেবিনটা ফাঁকা হয়েছে। এখানে যে রুগী ছিল তাকে যে ডাক্তারবাবু দেখছিলেন তিনি ঐ রুগীকে হঠাৎ ছুটি দিয়ে দেন। অবশ্য কেবিনটার আরো একজন দাবিদার ছিল। সে একজন গ্রাম্য মানুষ। জমিজিরেত করা লোক। বাড়িও দূরে। বাসে করে এসেছিল। সে গ্যাস্ট্রিক আলসারের রুগী। দুজনে প্রায় একই সঙ্গে ওয়ার্ড মাস্টারের ঘরে গিয়ে হাজির হই। ওয়ার্ড মাস্টার দুজনের পরিচয় এবং রোগের বিবরণ জেনে আমাকেই কেবিনটা দেয়। সে লোকটির মেঝেতে ঠাঁই হয়। লোকটির কাল অপারেশন হয়েছে। ভালই আছে। হরিপদ বিকেলে খবর এনে দিয়েছে। লোকটার কথা মনে হলে অপরাধী মনে হয় নিজেকে। স্বার্থপর লাগে...

এখানে ভর্তি হবার এক ঘণ্টার মধ্যে দু-নম্বর কেবিনের সাধনবাবুর সঙ্গে আলাপ।

রীতা আর রন্টু বাড়ি ফিরে যেতেই সাধনবাবু এই কেবিনে এসে ঢুকলেন। মাঝারি হাইট, রোগা কালো চেহারা। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটেন। বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন হবে। মুখে দীর্ঘদিনের রোগ ভোগের চিহ্ন। চোখের নিচে কালি। কিডনিতে স্টোন। হলে কি হবে খুব হুল্লোড়ে মানুষ। আলাপীও বটে। আমার কেবিনে ঢুকেই আড্ডা জুড়ে দিলেন। আমার সম্পর্কে সব খোঁজখবর নিলেন। কোথায় থাকি বা কী করি সব বৃত্তান্ত। সাধনবাবু সরকারি অফিসে চাকরি করেন। আমি যেদিন হাসপাতালে ভর্তি হই তার আগের দিন ভর্তি হয়েছেন। ডাক্তার তালুকদারের রুগী। পরের দিন অপারেশন অথচ ওঁর মুখে একটুও ভয় ছিল না।

দুপুর একটা পর্যন্ত আড্ডা দিলেন আমার কেবিনে। যাবার আগে আমায় উৎসাহ দিয়ে বললেন, একদম ভয় পাবেন না। কাল দেখবেন আমি গটগট করে হেঁটে অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে ঢুকব। আপনার আগে বাড়ি ফিরে যাব। তারপর হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসির দমকে ওঁর পাতলা শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠল। তারপরই হঠাৎ ওই হুল্লোড়ে মানুষটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন। একটা বিড়ি ধরালেন তারপর। পরপর কয়েকটা টান মারলেন, নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর নিজের পারিবারিক জীবনের করুণ কাহিনী শোনালেন। ওঁর স্ত্রী পাগল। দিনরাত চেঁচামেচি করে। কাঁদে। জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভাঙে। বারণ করলে বা বাধা দিতে গেলে কামড়ে আঁচড়ে শরীর রক্তাক্ত করে দেয়। ভাল চিকিৎসা করাতে পারেন না ওর। সামান্য চাকরি করেন। দুই ছেলে এক মেয়ে। সবাই পড়াশোনা করে। ছেলে দুজন কলেজে, মেয়ে স্কুলের নিচু ক্লাসে। সিক্সে পড়ে ও। সুতরাং সংসার চালাতেই হিমসিম খেয়ে যান।

পেছনে ফিরে কেবিনের দরজা দিয়ে বাইরেটা একনজর দেখে ফিসফিস করে বললেন, জানেন ডাক্তার তালুকদারকে দু হাজার টাকা দিতে হয়েছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ? হাসপাতালে পয়সা লাগবে কেন চিকিৎসা করাতে—

সাধনবাবু বিমর্ষভাবে হাসলেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিতে বাধ্য হয়েছি। টাকা না দিলে ডাক্তার ছুরি কাঁচিতে হাত দেবে না বলেছে।

কথাটা আমাকে এমন আঘাত করল যে সাময়িক বাকরুদ্ধ হয়ে গেল আমার।

পরের দিন অপারেশন থিয়েটারে যাবার আগে সাধনবাবু আমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করে গেলেন। যেন ফোঁড়া বা ঐ জাতীয় কিছু তুচ্ছ জিনিস কাটতে যাচ্ছেন। একটু পরেই ফিরে আসবেন। সাধনবাবু সকাল দশটায় অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেছেন। আমি এগারোটা নাগাদ বাড়ির পাঠানো (আমার কলেজের একজন ডি-গ্রুপ স্টাফ দিয়ে গেছে) ভাত দ্রুত খেয়ে নিয়ে সাধনবাবুর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সারা দুপুর দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কিন্তু সাধনবাবু আমার দুশ্চিন্তা, শুভ কামনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অপারেশন টেবিলেই মারা গেলেন। খবরটা পেতে আমার দেরি হয়েছিল। তিনটে নাগাদ একজন রুগী আমাকে খবরটা শুনিয়ে যায়। হরিপদ জানত কিন্তু আমায় বলেনি। বলেনি এজন্য যে আমিও অপারেশনের রুগী, যদি শুনে ভয় পাই। সেদিন শুধু শুয়ে শুয়ে সাধনবাবুর কথা ভেবেছি। ওঁর অসহায় ছেলেমেয়ে এবং পাগল স্ত্রীর কথা মনে হয়েছে। বিকেলে রীতা এসেছে রন্টু এসেছে তাদের সঙ্গেও মন খুলে কথা বলতে পারিনি। বারবার একটা কথা মনে হচ্ছিল, ডাক্তার তালুকদারকে বললে ঐ দু-হাজার টাকা ফেরৎ দেবে না ?

সাধনবাবুর হাসি-হাসি মুখটা মনে পড়তে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

একটু জল খেতে পারলে খুব ভাল হত এখন। গলাটা বড় শুকনো লাগছে। কাঠ-কাঠ। কিন্তু কে এখন জল দেবে আমায়? হরিপদ? ও এখন আমার দিকে ফিরে নাক ডাকছে। কী সরল মুখ। মুখে কোনো চিন্তা বা কষ্টের দাগ নেই। এমন নির্মল-ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে হল না।

হরিপদ হঠাৎ ঘুমের মধ্যে হাসল। বিড়বিড় করে কী যেন বলল। ঘুমের মধ্যে ও কি ওর বউ বা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলছে? তাই ওর মুখে হাসি ফুটেছে। ঘুমের মধ্যে অনেক মানুষই কথা বলে, হাসে। আমি এসব করি কিনা রীতা বলতে পারে।

দু-নম্বর কেবিনে গতকাল একজন অল্পবয়েসী ছেলে ভর্তি হয়েছে। ছেলেটার নাকি (নাকি বললাম কেননা এসব সংবাদ হরিপদর মারফত জেনেছি) খুব খারাপ ধরনের জন্ডিস হয়েছে। গোটা শরীর হলুদ হয়ে গেছে। আলাপ না হলেও ছেলেটির কাশির শব্দ আমি এখান থেকে শুনতে পাই। রোজ শুনি। একটু আগেও কাশছিল ও।

কিন্তু পাখার শব্দটা নেই। কেবিনে একটুও বাতাস নেই। খুব গরম লাগছে। গায়ে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। মুছতে পারছি না। নড়লে-চড়লে পেটে খচখচ করে লাগে। ডাক্তার সাহা বলেছেন, একটু নড়া-চড়া করবেন। হাঁটবেন। তাহলে দেখবেন চটপট সেরে উঠেছেন। কাশিটাই যত নষ্টের গোড়া। গলার কাছে, বুকে ঘড়ঘড়ে কফ জমে আছে। গলা খুশ-খুশ করে। কাশি উঠলে সেলাইতে চাপ পড়ে। যন্ত্রণায় গোটা শরীর কুঁকড়ে যায়। সেইজন্য কাশির দমক এলে পেটের কাটা জায়গাটা চেপে ধরি। সাবধানে কেশে কফ তুলে প্যানে ফেলি। ডাক্তার সাহা রোজ সকাল বিকেল আমায় দেখে যান। ছোটখাটো মানুষ। হাসিখুশি। কর্তব্যপরায়ণ। ভদ্রলোক। আমায় খুব যত্ন নিয়ে দেখেন। কেবিনে ঢুকে কাটা জায়গাটা প্রতিদিনই দেখে বলেন, কী মশাই কেমন আছেন? তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন ছেড়ে দেব। বলে মুচকি একটু হাসেন। তারপর দু-একটা শরীর-সম্পর্কে প্রশ্ন করে কেবিন থেকে বেরিয়ে যান। পুরুষদের ওয়ার্ডে ঢুকে পড়েন। ডাক্তার তালুকদারও একজন ডাক্তার। উনিও একজন ডাক্তার। কিন্তু দুজনের আকাশ পাতাল তফাত।

হঠাৎ একটা কথা মনে হয়। মনে হয় এইজন্য যে কথাটা কদিন ধরে মনের মধ্যে পাক মারছে। আর সেই ইস্তক মনটা তেতে আছে। রাগে ফুটছে। আমি মনে মনে ঠিক করি—ডাক্তার তালুকদারকে একবার সাধনবাবুর পারিবারিক দুরবস্থার কথা বলব। তারপর ওঁকে সাধনবাবুর দু-হাজার টাকা ফেরত দিতে অনুরোধ করব। যদি উনি ভাল কথায় ফেরত দেন তো ভাল। না দিলে আমার কলেজের ছাত্রদের দিয়ে ওঁকে অপমান করাব। মুখোশ খুলে দেবো ওঁর। টাকাটা ফেরত করাবই।

মেয়েদের ওয়ার্ডের বাইরে প্যাসেজ দিয়ে একটা ট্রলি কে যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ঘটাং-ঘটাং একটা বিচ্ছিরি শব্দ হচ্ছে। হয়ত কাউকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখুনি অপারেশন করতে হবে। কিংবা তা নয়,নতুন কেউ ভর্তি হল হাসপাতালে। তাকে ট্রলিতে শুইয়ে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদি তাই হয়, তাহলে হাসপাতালে আর একজন মানুষ বাড়ল। হাসপাতালের বাঁধানো খাতায় আর একটা নাম উঠল। শ্রীমতী অমুক...সাকিন...। কে যেন তখনি অশ্লীল ভাষায় কাকে একটা গালাগাল দিয়ে বলল, মাগী বিয়োবার আর সময় পেল না! কর্কশ বিচ্ছিরি গলা। গলাটা একজন মহিলার। গলাটা চেনা ঠেকছে যেন। রাতের সেই রোগা ফর্সা নার্স না? মহিলা সব সময় খিটখিট করেন। একটুতেই রেগে ওঠেন। এখন জোরে চিৎকার

করছেন কেন উনি ? ওঁর চিৎকারে রুগীদের ঘুম ভেঙে যেতে পারে। হার্টের রুগী থাকলে হার্ট ফেল করতে পারে। হাসপাতালে, এত জোরে কেউ চেঁচায় নাকি ? এটা কি একটা সেবা প্রতিষ্ঠান, না রেলওয়ে স্টেশন ? অপারেশন থিয়েটারের সামনে (সেইরকমই মনে হচ্ছে) কে যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গলা শুনে মনে হচ্ছে দশ-বারো বছরের ছেলে। আহা ! ওর কোনো নিকট আত্মীয় মারা গেছে নিশ্চয়ই। সেজন্যে কাঁদছে। কিন্তু ওর সঙ্গে কি এমন কেউ নেই যে ওকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে ?

শব্দটা নেই। বাতাস নেই। জ্যৈষ্ঠের রাত যেন গরম উগরে দিচ্ছে। রাত এখন কত জানি না। আকাশ দেখতে পেলে খানিকটা আঁচ পাওয়া যেত। কিন্তু সে উপায় নেই। বড় বড় দেয়াল আকাশকে আড়াল করে রেখেছে। আমার এবং আকাশের মাঝখানে তারা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে। তবে এখন অন্ধকার যেন কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে। একটু আগের জমাট গাঢ়-ভাব নেই। সূচ ফোটালে অন্ধকার ফুটো হয় না। হলে দেখতাম অন্ধকারের কত পর্দা নিচে আলো থাকে। কখন ভোর হবে কে জানে ! হলে বাঁচি। আর ঘুম হবে না বুঝতে পারছি। ভোর হলে তবু কিছু মানুষ দেখতে পেতাম। চেনা—অল্প চেনা—অচেনা—কত রকমের মানুষ যে আসে এই কেবিনে। তারা আপনজনের মত কত কথা বলে। সত্য হোক মিথ্যে হোক কথাগুলো শুনতে ভাল লাগে।

ছেলেবেলায় একবার পায়ে পেরেক ফুটে ঘা হয়েছিল আমার, পুঁজ জমেছিল। ছুরি দিয়ে কেটে সেই পুঁজ বের করেছিলেন একজন ডাক্তারবাবু। বাপরে ! সে কী কষ্ট ! চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল। অথচ ডাক্তার সাহা কুচ করে ছুরি চালিয়ে পেটটা তিন ইঞ্চি চেলা করে ফেললেন, টেরও পেলাম না ! একে কি বিজ্ঞানের অগ্রগতি বলব ? না কি ডাক্তারি হাতযশ বলব ?

খুট করে একটা শব্দ হয। তাকিয়ে দেখি সেই অলুক্ষণে বেড়ালটা আবার দরজা ঠেলে কেবিনে ঢুকল। অসীম সাহস ওর। ধৈর্যও বটে ! যেভাবে হোক ও টের পেয়ে গেছে আমি এই মুহূর্তে শক্তিহীন। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। ওকে মারতে পারব না। তাড়া করে কেবিন থেকে বের করে দিতে পারব না। সেজন্যে ও এখন আমাকে গ্রাহ্য না করে গুটিগুটি পায়ে ড্রেসিং-টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দে। বেড়ালের পায়ের তলায় প্যাড থাকে। চলাফেরা করলে শব্দ হয় না। ড্রেসিং-টেবিলের কাছে গিয়ে তড়াক করে লাফ মেরে উপরে ওঠে। তারপর নিখুঁত ধাক্কা মেরে দুধের গ্লাসের উপর চাপানো স্টিলের ঢাকনাটা ফেলে দেয় প্রথমে। সেটা ড্রেসিং-টেবিলের সস্তা কাঠে ড্রপ খেয়ে আছড়ে পড়ে। ঠং করে ধাতব শব্দ হয়। পরক্ষণেই কাচের গ্লাস উলটে দেবার ঝনন-ঝনন শব্দ ধাতব শব্দটাকে গিলে নেয়। ওদিকে চেয়ে থাকি...এবং দেখি ড্রেসিং-টেবিলের গা বেয়ে দুধ গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে। আর বেড়ালটা সেই দুধ চুক-চুক করে খাচ্ছে। নির্ভয়ে। বেড়ালটা কি খুব ক্ষুধার্ত। সে কারণে ওর ভয় উবে গেছে। ক্ষুধা মানুষকে অসাধু করে সাহসী করে। বেড়ালটার মধ্যে সেরকম কোনো ব্যাপার ঘটেছে। তাই ওর এত সাহস। আমার কদিন একদম খিদে নেই। সকাল সাতটা নাগাত হরিপদ একগ্লাস হরলিক্স করে দেয়। সঙ্গে দুটো ব্রিটানিয়া বিস্কুট। নাইস। এগারোটার মধ্যে বাড়ি থেকে ভাত আসে। রীতা মাগুর বা সিং মাছের ঝোল রেঁধে পাঠায়। জিরে এবং হলুদ দিয়ে টলটলে ঝোল। রাতে একপো দুধ। সঙ্গে কিছুটা ছানা। চিনি ছাড়া। এসবের কিছুই আমার খেতে ইচ্ছে করে না। মুখ তেতো। অরুচি। সামান্য খেয়ে রেখে দেই। বেড়ালটা এই যে দুধ খাচ্ছে এটা আমার রাতের না-খাওয়া দুধ। আমার ফেলে

দেওয়া খাবার খেয়ে যদি কোনো জীবের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় হোক না। তাতে আমার আপত্তি থাকবে কেন! চেয়ে চেয়ে ওর খাওয়া দেখি।

একটা সিগারেট খেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। ডাক্তার সাহা দিনে দু-তিনটে সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়েছেন। হরিপদকে ডাকলে ও এখুনি সিগারেট এনে দেবে। মুখে লাগিয়ে আগুনটুকু পর্যন্ত দিয়ে দেবে। ছাইও ঝেড়ে দেয়। হরিপদ যেন সাক্ষাৎ কল্পতরু। যখন যা চাই এনে দেয়, যা হুকুম করি করে। মাত্র কয়েক টাকার বিনিময়ে ও আমার জন্য প্রাণপাত করে। আট ঘন্টা সেবা করে চোদ্দ টাকা পায়। ওরা সরকারের কাছ থেকে কোনো বেতন পায় না। যেদিন রুগী জোটে না সেদিন ওদের রোজগার বন্ধ। একদিন হরিপদ আমাকে নিজের গল্প বলেছে। বুড়ো বাবা-মাকে নিয়ে তার পরিবারে সাতটা মানুষ। রোজ কাজ পেলে সংসার চালাতে অসুবিধে হয় না। অসুবিধে হয় কাজ না জুটলে। তখন বড্ড কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। কেবিনের রুগীরা সাধারণত বাবু ক্লাসের হয়। হাসপাতালের খাবার ছোঁয় না। ভাত খায় না। টিফিন খায় না। সেজন্যে আয়ারা কেবিনের রুগী পেলে খুশি হয়। রুগীর খাবারগুলো নিজেরা খায়, বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা ভালমন্দ খাবার পেলে বড্ড খুশি হয়। হরিপদই এসব কথা আমায় বলেছে।

বেড়ালটা দুধটাকে চেটেপুটে খেয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়। বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছে ওকে। শ্লথ-পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার থামে বেড়ালটা, বড় হাঁ করে একটা হাই তোলে। তারপর বসে পড়ে সামনের ডান পা দিয়ে গলা চুলকোয়। জিভ দিয়ে পা চাটে। এসব করে ও অনায়াস-ভঙ্গিতে। নির্ভয়ে। দরজা ঠেলে বেরবার সময় আমাব দিকে ফিরে 'ম্যাও' করে একবার ডাকে। একটু লেজ নেড়ে দেয়। আমি ওর কৃতজ্ঞতা-বোধ দেখে কৃতার্থ হই। কেননা, জ্ঞান হওয়া ইস্তক শুনে আসছি জীব-জন্তুদের মধ্যে বেড়াল নাকি এক নম্বরের অকৃতজ্ঞ। সব সময় গৃহস্থের অমঙ্গল কামনা করে। আজ সে ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করল এই বেড়ালটা। গোটা বেড়াল জাতটাকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাল যেন ও। এরকমই মনে হয় আমার।

তখনই, অপারেশন থিয়েটার থেকে সদ্যোজাত শিশুর কান্নার শব্দ কানে আসে। ওর কান্নার তীক্ষ্ণতা অন্য শব্দকে ছাপিয়ে গেছে। কচি গলায় কী জোর। ডাক্তারবাবুরা বলেন, জন্মের পর শিশুরা যত কাঁদে তত ভাল। হার্ট মজবুত হয়। আমি কিন্তু এব্যাপারে অন্য মত পোষণ করি। আমি মনে করি মানুষ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ওঠে কেননা প্রথমদিন থেকেই তারা কান্নার অভ্যেসটা তৈরি করে নেয়। পরে, বৃহত্তর জীবনে ঢুকে যাতে অসুবিধায় না পড়তে হয়।

এ্যাই পান্তি বাচ্চাটাকে কেবিনে দিয়ে আয়...। কোনো এক মহিলা আর এক মহিলাকে ডেকে কথাটা বলল। যাকে বলল সে বোধহয় জি ডি এ বা আয়া। যে বলল সে নার্স। নার্স না হলে এমন বাজখাঁই গলা কার হবে! কিন্তু তা বলে সব নার্সের ব্যবহারই যে খারাপ এমন কথা বলা যাবে না। সেটা বললে মিথ্যে বলা হবে। সকালে যে শ্যামবর্ণ রোগা মাঝারী হাইটের যুবতী নার্স আমায় ইঞ্জেকশন দিতে আসে সে সুন্দরী বলে নয়,তার মিষ্টি ব্যবহার আমায় বেশি আকর্ষণ করে। তার ডিমালো মুখে মায়াবী দুটো চোখ। ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ ধুতে ধুতে মুচকি হেসে রোজ আমায় জিগ্যেস করে, ভাল আছেন তো? আমিও হাসতে হাসতে উত্তর দিই, ভাল আছি। কিন্তু মনে মনে বলি, তুমি কৃষ্ণা (ওই নামটা আমিই ওকে দিয়েছি) কেবিনে ঢুকলে আমার সব রোগ সেরে যায়। আমার শরীরে কোনো কষ্ট থাকে না। তোমার চোখ দুটোর সঙ্গে পাখির

নীড়ের তুলনা করা চলে কিনা বলতে পারব না, তবে তোমার চোখের মত এমন স্নিগ্ধ শীতল চোখ আমি জীবনে দেখিনি। ও কেবিন থেকে চলে গেলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিছু ভাল লাগে না। যা হরবকত বলতে ইচ্ছে করে, এমন গোটাকতক কথা এখন খুব দ্রুত কৃষ্ণার সঙ্গে মনে মনে সেরে নিই।

কৃষ্ণা তুমি আমার বাড়ি একদিন যাবে ?

যাব।

না-না, বাড়িতে না। রীতা তাহলে ভুল বুঝবে ? তুমি আমার কলেজে যেও।

যাব। তুমি যেখানে যেতে বলবে যাব।

কৃষ্ণা তুমি আমায় খারাপ ভাবছ না তো ?

খারাপ ভাবব কেন !

অনেকের কত কি থাকে। আমার অতিরিক্ত বলতে তুমি থাকবে...

কৃষ্ণাকে মনে মনে ধ্যান করার জন্য কিনা কে জানে, মাথাটা হঠাৎ আমার অসাড় হয়ে যায়। মস্তিষ্কে আচ্ছন্নতা। মস্তিষ্ক হঠাৎ , হঠাৎ-ই শূন্য হযে যায়। খাঁ খাঁ করে। কেবিনের অন্ধকার সেই সুযোগে অতর্কিতে ওখানে ঢুকে পড়ে। ঢুকে ভাবনাগুলোকে তালগোল পাকিয়ে দেয়। কিছুই মনে পড়ে না। একটা জড় মানুষের মত পড়ে থাকি বেডে। বুদ্ধাঙ্ক বুঝি বা একশোর নিচে... অনেক নিচে। আশপাশের নানারকম শব্দ, টুকরো টুকরো কথা, এসব কিছুই এখন কর্ণগোচর হয় না। শরীরের কোষে কোষে ক্লান্তির বীজ কে যেন নিপুণ হাতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠছে ক্রমশ। শ্বাসপ্রশ্বাস ঢিমেতালে চলছে। লম্বা লম্বা শ্বাস পড়ে। নিশ্বাসের তালে তালে বুক ওঠে নামে। আমার কি ঘুম আসছে। এসব কি তারই লক্ষণ ?

অবসাদ কাটাতে—নাকি ঘুম ছাড়াতে, হঠাৎ বেশ জোরে, নিজেকে চমকে দিয়ে, হরিপদকে ডাকি। ডেকে ওর কাছে একটা সিগারেট চাই। সিগারেট টানতে টানতে এখন আমার একটা কথাই মনে হয—কখন ভোর হবে।
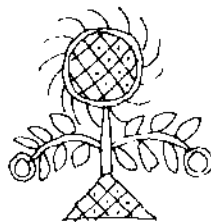
একজন সি আর পি এবং একটি নকশাল ভূত ॥ জয়ন্ত জোয়ারদার

—ডবল আপ!

পুরো কোম্পানি মাথার ওপর হাত তুলে পিঠ্ঠু প্যারেড করছে। নায়েকের বাজখাঁই গলা আবার হাঁকে—ডবল মার্চ টাইম!

গ্রীষ্মকালের দুপুর রোদে গলগল করে ঘামছে পুরো কোম্পানি। আপ্রাণ চেষ্টা করেও মাটি থেকে পা আর তুলতে পারছে না। শরীরগুলো সামনে ঝুঁকে পড়ছে।

কোম্পানির জওয়ানেরা শাস্তি খাটছে। অপরাধ—সি কে মেনন নামে এক জওয়ান জ্বর হওয়ায় সুবেদার সাহেবের বাংলোয় আর্দালির কাজে না গিয়ে সিক-প্যারেডে ফল ইন করেছিল। তাতে সুবেদার মেমসাহেব চটে যায়, সুবেদার সাহেব ঘাড় ধরে মেননকে নিয়ে যেতে গেলে কোম্পানির ছেলেরা প্রতিবাদ জানায়। তারই শাস্তি।

সি আর পি জওয়ান রঘুবন্ত পেছনের ব্যারাকের শেষ ঘরটায় ঘুমোচ্ছে। আর ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে কদিন আগের ঘটনাটা দেখছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে ওর গায়ে, ব্যারাকের টিনের ছাউনির বদ্ধ গুমোটে। কদিন ধরেই ওদের এত মানসিক চাপ যাচ্ছে যে আজ একদম গা ছেড়ে দিয়েছে। যদিও গত দুদিন পি টি করতে হচ্ছে না বা অফিসারদের ফার্মে গিয়ে ক্ষেতের কাজ করতে হচ্ছে না। আজ ওদের স্ট্রাইকের তৃতীয় দিন।

আন্দোলনে সক্রিয় বাইশজনকে রামকৃষ্ণপুরমের সিগন্যাল সেন্টারে পাঠিয়েছে ক'দিন আগে। তাদের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত ধরনের সি আর পি কমিউনিকেশন ব্লক করা হয়েছে। বোকারো থেকে সি আই এস এফ-এর যে প্রতিনিধিরা হোম মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিল, তাদের নন-বেইলেবল ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ত্রিবেন্দ্রাম, ভুবনেশ্বর, শিলং, রামপুর, শিলচর, কোচিন, হায়দ্রাবাদ, আমেদাবাদ, জম্মু—দিকে দিকে সি আর পি ও সি আই এস এফ-এর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে।

রঘুবন্ত ঘুমোচ্ছে। কোয়ার্টার গার্ডের পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজল। রঘুবন্তর সুগঠিত হাতে একটা মশা কামড়াতে পেশীটা একটু নড়ে উঠল।

—দেখো শালা ঘুমোচ্ছে। এই, এই ব্যাটা, ওঠ্, ওঠ্!

উঁ—উঁ করে পাশ ফিরে শোয় রঘুবন্ত। পিঠের ডানদিকে ঠিক বগলের নিচে একটা কাটা দাগ দেখা যায়। এটা বোধহয় সেই খাম্মামের ঘটনার। বেটা যেবার তির খেয়ে বেঁচে গেল।—এই, এই! ধাক্কাই দিতে হল শেষ অব্দি।

—কে? কে? ধড়ফড় করে উঠে বসে রঘুবন্ত।

—আস্তে, আস্তে। আর্মি ঢোকেনি এখনো ক্যাম্পে?

—না না। আর্মি ঢুকবে কেন?

আসলে রঘুবন্তদের নার্ভ বড্ড স্ট্রেইনড হয়ে আছে।—কিন্তু তুমি কে? কোথায়?

চোখ কচলায় রঘুবন্ত, চারপাশে তাকায়। কাউকে দেখতে পায় না। তার কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে—আমি ভূত।

—ভূত ! ভূত কেন ?

—ন্যাকা। ভূত কেন ? অপঘাতে মরলে ভূত হব না তো কি স্বগ্‌গে যাবো ?

—অপঘাত কেন ?

ভূত স্বগতোক্তি করে—নাঃ, একে আবার সব পুরোনো কথা মনে করাতে হবে দেখছি। ও, বাপধন আমাকে চিনতে পারছো না ? এই যে এদিকে দেখো, বেশ একটু ভাল করে ঠাওর করো। এই যে, তোমার সামনের খাটের পেছনে। আরেকটু ওপরে তাকাও। ঘুলঘুলিটার নিচে। হ্যাঁ, এবার দেখো দিকিনি।

রঘুবন্ত দেখে—শূন্যে পা ঝুলিয়ে বসে, বেঁটে রোগা অপরিপুষ্ট, শিশু নয় অথচ প্রায় শিশুর মতই ছোট শরীর, বিশ বাইশ বছরের একটা জোয়ান ছেলের মুখ--মিটিমিটি হাসছে ?

—কি হল ? এবার মনে পড়েছে ? তুমি আমাকে হত্যা করেছিলে।

—সে তো অনেককেই...। তুমি কোন জন ?

—সেই মেদিনীপুর জেলে, ১৯৭২ সালের ১৬ই জুন। সন্ধ্যেবেলা। সবে গুনতি শেষ হয়েছিল। তোমরা ঢুকলে ঝড়ের বেগে। আমরা কয়েদিরা ঊর্ধ্বশ্বাসে যে যেদিকে পারছি, ছুটছি। বেরোবার কোনো উপায় নেই। বন্ধ খাঁচার মধ্যে বন্দুকের বাঁট, সঙ্গীন আর মশাল দিয়ে খুঁচিয়ে মারলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেদিন তো বোধহয় দুতিনটে মরেছিল আমার হাতে। তুমি কোন জন ?

—মনে পড়ছে, ওয়ার্ডের মাঝের দিকে একটা সেলে আমরা ছ-সাত জন ছুটে গিয়ে ঢুকে গেটটা বন্ধ করে দিই। গরাদের মধ্যে দিয়ে তোমরা ফায়ার করলে। আমরা দু-তিন জন এক কোণে ছিলাম। তোমরা ঢুকতে সাহস করছিলে না।

—ওহ, এতক্ষণে বুঝেছি, তুমি নকশাল। তোমাদের কাছে বোমা ছুরি সব ছিল।

—ছিল কি ?

—আমাদের সেই রকমই বলেছিল।

—কে ?

—অফিসাররা। তোমাদের জেল ভাঙার প্ল্যান ছিল।

—আচ্ছা ! মিটিমিটি হাসে ভূতটা।

আর, পঁচাত্তরটা লাশ ফেলে দিয়ে ফেরার সময় তোমাদের একবারও মনে হল না—জেল ভাঙার জন্য বোমা বা অন্য কোনো হাতিয়ার কেন পেলে না ?

—না, সেকথা ভাবা আমাদের কাজ নয়। কেমন যেন অস্বস্তি লাগে রঘুবন্তের।

—যাকগে, পুরোনো কথা।

—হঠাৎ আজ আমার কথা কেন মনে পড়ল ? একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করল রঘুবন্ত। কারণ ভূত বলে কথা, তার ওপর আবার নকশাল ভূত। ভূতের ওপর তো আর লাঠি-গুলিতে কাজ হবে না। যদি আবার ঘাড়ে চেপে বসে।

—বেশ প্রশ্ন। কেন জানো ? আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম বাঁচার মতো করে। বাইশ বছর বয়সে তুমি আমাকে মেরে ফেললে। আজ তোমরা বাঁচতে চাইছো, তাই না এসে থাকতে পারলাম না। তোমাদের আন্দোলনের খবর কি ?

—এই ক্যাম্পে স্ট্রাইকের আজ তৃতীয় দিন। দিল্লির অন্যান্য ক্যাম্পেও আজ থেকে স্ট্রাইক শুরু হয়েছে।

রঘুবন্ত মনে মনে একটু ভেবে নেয়—নকশাল ভূতটাকে এখন বিশ্বাস করা যায়।

—কাউকে বোলো না। কাল সকাল দশটায় দিল্লির সব সি আর পি ইউনিটের জওয়ানেরা বোট ক্লাবে জমায়েত হবে। তারপর ডাইরেক্টর জেনারেলের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে।

—বেশ আমি কাউকে না হয় নাই বললাম। কত্তাদের কাছে কি আর খবর পৌঁছোয়নি ? আজকের রাত পোহাবে তো ? কাল হাতিয়ার নিয়েই মিছিলের পরিকল্পনা তো ?

—না না, আমরা শান্তিপূর্ণ পথে আন্দোলন করবো।

—কিন্তু সরকার যদি আর্মি বা বি এস এফ নামায় ?

—না, না ! সরকার সহৃদয়তার সঙ্গেই আমাদের দাবি বিচার করবেন। আমাদের মত সিনসিয়ার সারভিস সরকারকে আর কে দেয় ? এইতো পাঞ্জাব-হরিয়ানা-মধ্যপ্রদেশে পুলিস বিদ্রোহ হল। সরকারের হয়ে কে তা দমন করলো ? আমরাই তো। আমাদের দাবি সরকার ঠিকই মেনে নেবে।

—ধন্য আশা ! জনগণ বিদ্রোহ করলে তোমরা বা পুলিস ঠ্যাঙাবে। পুলিস করলে তোমরা বা বি এস এফ। তোমরা করলে বি এস এফ বা আর্মি। সুপিরিয়র ফায়ার পাওয়ার ! ডিভাইড অ্যান্ড রুল, বুঝেছো ?

—না, না। জনগণকে আমরা মারবো কেন ?

—তো কাদের ঠ্যাঙাও বাবা ?

—দেশদ্রোহীদের, সমাজবিরোধীদের, আইন শৃংখলা ভাঙে যারা...

—ও ! তোমাদের দাবিতে আছে না, আট ঘণ্টার বেশি কাজ করানো চলবে না ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে লোকো রানিং স্টাফেরা কি দোষ করেছিল ? একটানা ১৬/১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয় বলে তারা ধর্মঘট করেছিল। তখন তাদের কলোনিগুলোতে ঢুকে বাড়ির লোকগুলোর ওপর অব্দি অত্যাচার কেন করেছিলে ?

—রেলে ধর্মঘট করে দেশের উন্নতিতে, উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল।

—তা যা বলেছো ! তোমার ওই কাটা দাগটাতো সেই খাম্মামের, না ?

রঘুবন্তের হাতটা অজান্তেই কাটা দাগটার ওপর চলে যায়।

—হ্যাঁ।

—জোতদারদের চাষ না করে ফেলে রাখা জমি দখল করে ওরা চাষ করেছিল। তারপর সেই ফসল তুলতে গেলে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়লে। সেখানকার চাষীরা তো ফসল উৎপাদন বাড়াতেই চেয়েছিল। জোতদাররাই তো কম ফসল ফলিয়ে বেশি লাভের জন্য বহু জমি বাঁজা করে রেখেছিল।

—কিন্তু ওরা আইন নিজের হাতে নিয়েছিল।

—তাই নাকি ! তোমার ঘর তো উত্তর ভাগলপুরে, না ? তোমার পরিবারে কত জমি আছে ?

—হুঁ ! পাঁচ বিঘে।

—কুর্সেলার মহারাজের জমি কত ?

—হবে হাজার চারেক বিঘে।

—আইন কি বলে ?

—পঁচাত্তর বিঘে।

—তো কুর্সেলার মহারাজ বে-আইনী কাজ করছে কি ওখানকার চাষীরা ? ধরো, তোমার ভাই বেরাদররা তার জমির দখল নিলে বে-আইনী কাজ হবে ?

—কিন্তু পঁচাত্তর বিঘের বেশি তো আর মহারাজের নামে নাই।

—না, তা নিশ্চয়ই নেই। হাতি, গরু, দেবোত্তর, চাকর-বাকর—সকলের নামেই ভাগ-বাঁটোয়ারা করা আছে। কিন্তু ফসল ওঠে কার গোলায ?

রঘুবন্ত পিঠ্‌ঠু প্যারেডের সময়ের মত গলগল করে ঘামতে থাকে। পিঠের নিচে বিছানার চাদর ভিজে যায়। ভূতেব প্রশ্নবাণে কোণঠাসা হয়ে মরিয়া হয়েই বলে—দু-দশজন কিসান কি করবে ? পুলিস বা সি আর পি গেলেই তো লড়াই খতম।

—আর তোমাদের লড়াই ?

—আর, আমাদের আটান্নোটা ব্যাটেলিয়ান আছে, পঁচাত্তর হাজার জওয়ান।

—হ্যাঁ, সতেরোটা গ্রুপ সেন্টার আর ট্রেনিং সেন্টারে তোমাদের শক্তি বিভক্ত। আর্মির সংখ্যা কয়েক লক্ষ। খেয়াল করেছো, সেভাবে কোন দাবি না জানাতেই গত সপ্তাহে আর্মির জন্য অনেক কনশেসন ঘোষণা করেছে সরকার। অনেক লোয়ার র‍্যাঙ্কের অফিসার পোস্ট তৈরি করছে, যাতে বহু জওয়ানই কিছুদিন কাজের পর প্রমোশন পায়। চাকরির মেয়াদ বাড়াচ্ছে, যাতে বেশি টাকা পেনশন পেতে পারে। এই সময়েই এতসব কেন দিল বলতো ?

রঘুবন্তের নড়াচড়ায় ব্রিটিশ আমলের লোহার খাটে ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ হয়। একটা অজানা ভয় ওর শিরদাঁড়ায় শিরশির করে ওঠানামা করে। ঠিক বুঝতে পারে না ভয়টা ভূতের না অন্য কিছুর।

—কেন ?

—টোপ দিল, ওরা গিলল। এবার ওদের দিযে তোমাদের শায়েস্তা করবে বলে।

—বারবার আমাদের শায়েস্তা করবে, একথাই বলছো কেন ?

—আরে ভাই, শাসক শ্রেণীর চোখ দিয়ে দেখো—টু রেবেল ইজ আনজাস্টিফায়েড।

—কিন্তু আমরা তো ঠিক তোমাদের মত বিদ্রোহ করিনি। সরকারকে উৎখাত করতে চাইনি।

—হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ...

বেঁটে ভূত কিম্ভূতভাবে ডিগবাজি খায় আর অদ্ভুতভাবে হাসে। রঘুবন্ত এমন প্রাণখোলা অমানুষী হাসি শোনেনি কোনোদিন। গাটা ছমছম করে ওঠে। ভূতটা কথা বলছে বেশ ! অন্য ভূতেদের কথা শুনেছে—ইঁলিশ মাঁছ দেঁ, বা ঐজাতীয় কিছু বলে। এটাতো নকশাল, তাই শুধু বিদ্রোহেব কথা বলে। অন্য কোনো মতলব নেই। কিন্তু ভূত তো, হাজার হলেও। যদি ঘাড়ে ভরটর করে বসে। এমনি ভূতেই লোকের দফা রফা হয়, তার ওপর আবার নকশাল। হাত বাড়িয়ে লোহার খাটটাকেই ধরে রঘুবন্ত আর ছোটবেলার কি যেন এক ভূত দূর করা মন্ত্র মনে করতে চেষ্টা করে—ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি...রাম লক্ষ্মণ সাথে আছে, করবি আমার কি। কিন্তু তবু ভরসা পায় না। এই ছেলেটাকে রঘুবন্তই যখন মেরেছিল, এখন ভূত হয়ে এসে তো ঘাড় মটকাতেই পারে। রঘুবন্তের হাত পা অবশ হয়ে আসে। মাথার কাছে বন্দুকটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। কিন্তু অতটা হাত ওঠে না। রঘুবন্তের ঠোঁটের কোণ দিয়ে গাঁজলা বেরোয়।

—হোঃ—হোঃ—হোঃ। ইউনিয়ন করার অধিকার চাইছো, অথচ বিদ্রোহ করোনি, না ? খেয়ে পরে বাঁচার মত মাইনে চাইছো ? দুশো দশ টাকায় খুশি থাকতে পারছো

না ? কানপুর-বাইলাডিলার শ্রমিকরা এর চেয়ে বড় কিছু চেয়েছিল ? তাহলে ওদের ওপর কেন গুলি চলেছিল ?

--কিন্তু আমাদের জোরেই তো সরকার চলে, আইনের শাসন চলে। আমাদের দাবি তবে কেন মানবে না ?

—কার সরকার, কার আইন ? তোমার এই অফিসারদের সরকার, জোতদার মিল-মালিকদের সরকার। তাদেরই স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন। তুমি তার তল্পিবাহক মাত্র। বিদেশি প্রভুদের লুটের পর যা পড়ে থাকে, তা দেশি প্রভুরা চাটবে। তারপর তোমাদের মত পাহারাদারকে দেবার জন্য যে আর বিশেষ কিছু থাকে না বাছাধন !

—এসব রাজনীতির কথা। আমি শুনবো না।

--ওরে, বাঁচতে হলে একথা শুনতেই হবে। সবাই একসঙ্গে হয়ে এই মালিকদের বিরুদ্ধে একবার লড়তে হবে। জানো নিমুচে তোমাদের বন্ধুরা কি করেছে ? আর্মি ক্যাম্প দখল নেবার আগেই নয়শো বন্দুক নিয়ে আশপাশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানেও আর্মি আসছে হামলা করতে, এতদিন মানুষ মেরেছো, এবার তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন্দুক ঘুরিয়ে ধর।

—না, না। তুমি নকশাল। তাই এসব বদ বুদ্ধি দিচ্ছো। সরকার আমাদের দাবি মেনে নেবে। আর্মি আসবে না।

উর্দি উর্দি ভাই ভাই,
আদায় করবো পাই পাই।

হঠাৎ সি আর পি ক্যাম্প ও সংলগ্ন এলাকায় সমস্ত আলো নিভে যায়। রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। কোয়ার্টার গার্ডের পেটা ঘড়িতে আর সাড়ে বারোটা বাজে না। অন্ধকারের মধ্যে সর্পিল মিলিটারি কনভয় বারোদা কালান সি আর পি ক্যাম্প ঘিরে ধরে। কাঁটাতারের বেড়া কেটে আর্মি ভেতরে ঢুকে পড়ে। গেট পাহারার বেটনধারী দুজন সি আর পি'কে গ্রেপ্তার করে।

নিঝুম রাতের অন্ধকারে উর্দি উর্দি ভাই ভাই ভাবতে ভাবতে রঘুবন্তের মত সি আর পি জওয়ানেরা তখন ঘুমে মগ্ন। রিকয়েললেস-গানগুলো আর্মার্ড কারের মাথায় প্রস্তুত থাকে। একটা শক্তিমান ট্রাক গেট ভেঙে ঢোকে, তার পেছনে পুরো যুদ্ধসাজে কনভয়। আর্মি-আর্মারি দখল করে পজিশন নেবার পর মাইকে অমোঘ নির্দেশ ঘোষিত হয়—ইউ আর গিভেন টেন মিনিটস টাইম, সারেন্ডার।

পাঁচ মিনিটও পুরো হয়েছিল কিনা কেউ ঘড়িতে দেখেনি। হঠাৎ হট্টগোল, গুলির আওয়াজ, আর্ত চিৎকার, কান্না আর ভারী বুটের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় রঘুবন্তের। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারে না ব্যাপারটা কি। সদ্য ঘুমভাঙা ঘোরে শুধু মনে পড়ে কিসব আজেবাজে স্বপ্ন দেখছিল। এক ঝলক বাড়ির কথা মনে পড়ে। মেহেরপুরের মাটির নিকোনো বারান্দা আর টালির ছাদ। সামনে এক ফালি মকাইয়ের ক্ষেত। মকাইয়ের কোঁড়ে দুধ জমে দানা হচ্ছে। আর মাথা উঁচু গাছগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছে।

—সারেন্ডার !

হঠাৎ তীব্র সার্চ লাইট জ্বলে ওঠে আর গুলির সুতীক্ষ্ণ শব্দ সমস্ত অস্তিত্বের ওপর চেপে বসে। আর্মি, আর্মি ঢুকে পড়েছে ব্যারাকে। যন্ত্রচালিতের মত হাত তুলে দাঁড়ায় রঘুবন্ত আর মনে করতে চেষ্টা করে কে যেন বলেছিল—বন্দুক ঘুরিয়ে ধরো, বন্দুক ঘুরিয়ে ধরো।

অংশগ্রহণ ॥ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

১. আমি লিখতে বসেছি আমার এবং আমার চারপাশের কথা, চারপাশ এভাবে সাপ্টে নিতে গিয়ে চরিত্র / পাত্রপাত্রীর মধ্যে আমার অস্তিত্ব থেকেই যাচ্ছে, যেমন আমার মধ্যে তারা, ভুলচুক-তুচ্ছতা ও মহত্ত্ব সমেত রক্ত-মাংসে। যা থেকে এই লেখার একটি অক্ষরকেও বিচ্ছিন্ন করতে চাই না, এগিয়ে-পিছিয়ে, আছাড় খেয়ে, গায়ের ধুলো ঝেড়ে আবার হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত হতে হতে, হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে 'আহ্ বন্ধু' বলে একজন মানুষকে কাছে টানায় যে জীবন, লেখাটি ব্লটিং পেপারের মত সেসব শুষে নিক....

একদেশে, একজন ছিল...এরকম ভাবে শুরু করাটা কোনদিনই পচে যায় না। দেশ এবং মানুষ থাকে, শুধু এখন তার বদলে আমরা একটি শহরের কথা বলব। আর যেহেতু এই শহরটি আমাদের দেখার চোখ, অভিজ্ঞতার শ্রম, নিষ্ঠা আর মগজের জোরে বদলে যেতে পারে, সেজন্য শিল্পে শহরটি নতুনভাবে, মৌলিক হয়ে আসে, প্রায় আরেকটি নগরস্থাপত্য হয়ে ওঠে সেজন্য আমাদের ভূমিকা হোক ভ্রমণকারীর।

২. এমনটা হওয়া খুব অসম্ভব নয় যে আপনি একজন সুখী ভ্রমণকারী আর থাকতে পারছেন না। কিছু বাস্তব অসুবিধে এত প্রকট হয়ে উঠল যে নিরাপত্তা নিয়ে টানাটানি লেগে গেল। প্রকৃতি হয়ত প্রাকৃতিক দৃশ্যেই আপনার কাছে উপস্থিত হয়, আপনি দৃশ্যের স্মৃতি জমিয়ে রাখতে ভালবাসেন এবং কখনোই মনে হয়নি এ জিনিসটার সঙ্গে ডাকটিকিট সংগ্রহের বাতিকের কোন ঘনিষ্ঠতা থাকতে পারে। এখন হল কি, একটি শহরের মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়ে আপনি ভয় পেলেন, কারণ কিছুতেই একটা ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না যা দিয়ে শহরটির লোকজনকে বোঝাতে পারেন যে আপনি আশ্রয় খুঁজছেন। বা খুব খিদে পেয়েছে, খেতে চান। এইরকম স্থূল প্রয়োজন মেটাতে না পেরে আপনি বিমর্ষ হতে থাকলেন। হতাশ হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি ছেড়ে দেবেন না। বরং দেখা যাবে নিরাপত্তার কাল ঘুম ভেঙে আপনি আশ্চর্যরকম জ্যান্ত হয়ে উঠলেন। সেখানকার মানুষজন ও শহরটি সম্পর্কে বেশ উত্তেজক অভিজ্ঞতা হল আপনার। এখন এ জিনিসটা ধরে রাখতে পারবেন কি-না, ঘরে ফিরে আসার পর আবার নেতিয়ে যাবেন কি-না, তা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবং এই ব্যক্তিগত ব্যাপারটি গড়ে উঠেছে আপনার বিশ্বাস, চেষ্টা, আগ্রহ এইরকম অনেক কিছুর ওপর। নিজের মনে কথা বলার সময় আপনি ঠিক কীভাবে চলেন, নিজেকে টের পাওয়ার চেষ্টা করেন, না-কি রক্ত আর মাংসের মধ্যে ডুবে যান এ সবই ভাবতে হবে। এভাবে যদি মাথা, হৃদয় আর শরীর এই তিনটে জিনিসকেই বেশ আঁকড়ে ধরি তাহলে ঐ রকম সৃষ্টিকারী, আলস্যহীন, রোমাঞ্চকর ভ্রমণ, এমন কি, এই কলকাতা শহরেও সম্ভব। এবং এর জন্য কোন গাইডের দরকার হয় না, শুরু করা যায় যে কোন অবস্থা থেকে এবং এর শেষ বলে কিছু নেই। সময় এবং ক্ষেত্র, মানুষজন, আপাত বিষয়, সমস্তই বদলে যেতে পারে মুহুর্মুহু। শুধু যা বদলাবে না, তা হল ঐ গতি, হাঁটা, জিরিয়ে

নেওয়া এবং আবার হাঁটা। যা কখনোই ছেড়ে যাবে না, আবার কখনোই আপনার চাকর হয়ে যাবে না, এরকম মানুষজন আপনি পেতেই থাকবেন।

৩. টাকাপয়সা, খাওযাপরার ব্যাপার নিয়ে প্রথম জীবনে যদিবা কিছুটা ঝুঁকি থাকে, পরে চেষ্টা ও অভ্যাসে বিষযটি নিরাপদ ও চূড়ান্ত হয়ে ওঠে বেশির ভাগের ক্ষেত্রে। তবে শুধু যে এইটুকুই ঘটে এমন নয়, সবকিছুই কেমন চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। একজন নারী, একজন পুরুষ, একটি বাড়ি, জীবনেব দু-তিনটি দশক নিষ্ঠুরভাবে খেযে ফেলে এমন বিবর্ণ এক বন্ধুত্ব এবং অভিজ্ঞতায় মিথ্যে প্রমাণিত হওয়া একটি বিশ্বাস-ও অনেক সময় আলগাভাবে লেগে থাকে, যেন তা টুপির পালক। আবার বিশ্বাসের ধ্বংসস্তূপে বসে বা শুয়ে কেউ-কেউ শুধু দেখে যায়, যেন দেখাটাই সব।

এই একদিকে, আরেকদিকে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণের ঘটনাটি প্রধানত দুজনের মধ্যে, এমন একজন পুরুষ বা নারীকে খুঁজে নেওয়া হয যার জন্য বেঁচে থাকাটা যথেষ্ট বলে মনে করে। অপরিচিত যে শহরটির কথা বলা হয়েছে শুরুতে, সেই শহরটি আপনার আমার অস্তিত্বকে সোজা খারিজ করেছে। এ জিনিসটা আপনি আমি কী করে মেনে নেব। প্রকৃতপ্রস্তাবে ধোঁয়া-ধুলোয় এই শহরই রামাশ্যামা, তথা আমাদের জন্মস্থান সেজন্য প্রণাম, আবার সে ঠেলছে, দূরে ঠেলে দিচ্ছে, ক্রমাগত, হযে উঠছে অজানা-অচেনা উদ্ভট এক জ্যামিতিক নকশা ; এই জন্মস্থানে যেভাবে আমরা বেঁচে আছি তাতে কোন স্বীকৃতি আদায করা, সকলে মিলে নিজস্ব বিশিষ্টতায় শহরটিকে দখল করা এসব ঘটেনি। জঘন্য অপমান, গোপন ঘেন্না ও বিচিত্র কুণ্ঠা প্রচ্ছন্ন রাখা হযেছে উদাসীনতার মোড়কে, নিষ্প্রাণ শিষ্টাচারে। লেখাটি শুরু হচ্ছে এরকম একটি জায়গা থেকে, ফলে এই অবযবহীন ব্যাপারটা, এই মৃত্যুকে আমরা ছেড়ে দেব না ঠিকই, কিন্তু একটি বাহ্যিক কাঠামোয় বানানো গল্পের রাস্তা আমাদের জন্য নয়। বরং খোলাখুলি সবাইকে আহ্বান করব, ভাষা ও কল্পনা দিয়ে গড়ে নেব এমন একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র, বাস্তব যেখানে শিকড় খেলাতে পারবে। কোন চূড়ান্ত ব্যাপার, অমোঘ কিছু থাকবে না, সম্ভাবনা হটিযে দেবে অনিশ্চয়, দুর্জ্ঞেয়...প্রভৃতি কঠিন পাথর। বলে নেওয়া ভাল, এই সম্ভাবনা ধরে নেওয়ার ব্যাপার নয়, বরং তা গড়ে উঠছে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। নিজের-নিজের অস্তিত্বের যে বাস্তবভূমিতে নোঙর ফেললে তা সম্ভব হয়ে ওঠে, সেই একাগ্রতা থেকে আমরা সরে যাব না।

৪. 'দাদা যে কোলে বসে পড়ছেন', 'জেগে ঘুমোচ্ছেন', 'না-না কুপন দেবেন না', 'আরে ভাই গোরুর গাড়িও এর থেকে জোরে চলে'—এইসব বাসে ; 'ফাইলটা পেলেন', 'বড়বাবু আজও নেই', 'এই অফিসে ঘোরাঘুরি করেই তো মশাই আমার জীবন কেটে যাবে', 'তা যান না অন্য অফিসে', 'হোয়াট ডু য়ূ মিন', 'নাথিং', 'নাথিং ?' 'ইয়েস, নাথিং' 'আজ আমাদের কলম বন্ধ', 'সে আবার কি', 'পেন ডাউন,' 'কেন ?', 'মুভমেন্ট ?', 'হোয়াই মুভমেন্ট ?' 'হোয়াই নট' এইসব অফিসে, দপ্তর ও কাঠের পার্টিশনের মধ্যে তারা ছিল ১ম জন, ২য় জন, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৭০০, ৮০০, ৮০০০০ এবং ০০০০০০০০ মানুষ।

'লোকটা টাকা ছাড়া কিছু চেনে না,', 'মাথায় কিছু নেই', 'পচে গেছে', 'এদের এই মুভমেন্ট ব্যাপারটা অতি জঘন্য' 'কুড়ে', 'ধান্দাবাজ' এভাবে তারা মনে-মনে কথা বলছিল, বা একে অন্যকে এভাবে চিনছিল, এভাবে তারা প্রতিদিন মানুষকে চেনে, আলাপ হয়, আলাপ চলতে থাকে সঙ্গে এরকম মতামত। এখন অসুবিধে হল, ঘুমভাঙার পর থেকে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত গোটা জাগরণ এরকম কথাবার্তায় কেটে যায়, ফলে জেগে থাকার সময়ে যেটুকু নির্জনতা পাওয়া যায় তা ছাড়া সবটাই বেশ

জঘন্য, বাতিল করার মত। আবার এই জঘন্য নির্জনতায়ও যে ছুরি শানিয়ে বসে থাকবে না তার নিশ্চয়তা কি। তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে রক্তমাংসে, সচিত্র জীবনে, চারপাশ যে রকম নরক হয়ে আছে তারা সেই নরক থেকে প্রত্যেকে একা-একা বেরিয়ে আসতে চাইবে। নরকের অন্ধকার, ভ্যাপসা গহ্বরটি থেকে বেরিয়ে আসার পথে একটা ছোট্ট ছ্যাঁদা, সকলে পরস্পরের গায়ে পাছায়-মুখে, লালায়-থুথুতে মাখামাখি হয়ে লড়ে যাচ্ছে, কেননা একা বেরিয়ে আসতে হবে। আর নরকটি তাতেও উপচে উঠছে।

৫. মনে মনে বলা কথাবার্তা আমরা জানতে পারি না, তা ছাড়া এখানে-সেখানে প্রকাশ্যে মানুষ যা-যা বলে চলে, শোনে, সেসব মাথার মধ্যে মুদ্রিত হয়ে চলেছে। একসময় কথার পিছনের রোগা-মোটা-ফ্যাকাসে মানুষ পাতলা ঠোঁট ও ভারী নিতম্বের মেয়েরা হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু যা তারা ছেড়ে গেছে, যা পরিত্যক্ত হয়েছে, সেসব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোন কোন বন্ধুত্ব ভেঙে যাওয়ার ঘটনায় যেমন গূঢ় অর্থ থাকে। বাইরে তেমন কিছুই ঘটেনি, প্রকাশ্যে ঝগড়া হয়নি, তবু দুজন একা-একা পরস্পরের সঙ্গে নিজের মনে কথা বলে বুঝেছে অধ্যায়টি এবার শেষ হল।

আমি মরে গেছি এটা তো আর মানা সম্ভব নয়।

ধ্যাত্তেরি !

তোর এই হালকা চালটা মাঝে-মাঝে বিচ্ছিরি লাগে।

তোর এই অতি সিরিয়াসপানা ? কথায় কথায় জীবন-মৃত্যু,

যেন এছাড়া আর কিছু নেই।

দেন, প্লিজ টেল মি, বল এছাড়া কী আছে।

শিল্প-সাহিত্য-নাটক

হবে না বুঝলি...

কী করে হবে তুই কুমিরের মত একটা পয়েন্ট কামড়ে যদি পড়ে থাকিস।

এরপর তারা বাস পেয়ে যায়, শেডের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মাঝবয়সী মানুষ তার মোটা বৌ-কে হেসে কী যেন বলল, বৌটিও চোখ টিপে হাসে, ভদ্রলোক এই টুকরো দৃশ্যটির একটি নাম দিলেন 'ফার্স্ট ইয়ারের ইন্টেলেকচুয়ালিজম।' এবং বেশ প্রীত হয়ে উঠলেন, এজন্য যে ঐ যুবকদের তুলনায় তিনি অতি জীবিত আর শুধু সে কারণেই লাভ করেছেন বিশাল একটি জীবনের ধারণা, যেখানে এইসব যুবক তাদের কথাবার্তা বিন্দু হতে-হতে মিলিয়ে যায়, কিছুই থাকে না, এক ঐ বিশাল জীবনের ধারণা ছাড়া।

৬. শিল্পের নান্দনিকতায় বেশ সুস্পষ্ট দূরত্ব আছে, মৃত্যু পেরিয়ে জীবন পেরিয়ে সে যে কী ভাবে টিঁকে থাকে (বলতেই হয় ঈশ্বর জানেন) ! কীভাবে মৃত্যু পেরিয়ে যায় ? একজন শিল্পীর জীবনেও ম্যাড়মেড়ে সকাল, হাবিজাবি কথা, নোংরা চাকরি, কদর্য যৌন বিশ্বস্ততা, ব্যাঙ্ক এইসব আছে। উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে বিদ্রোহী যারা তারাও এইসব করে যাচ্ছেন, শিল্পীর মধ্যযুগীয় সেই তেজ ও শক্তির সবটাই নিভে এসেছে আজ। এবং সলতে পুড়তে পুড়তে প্রায় আর কিছুই নেই। এতটাই নেই যে জিনিসটা এখন আরেক ধরনের চাকরি হয়ে উঠেছে।

বাসস্টপের যুবকটি-কে হাত নেড়ে বিদায় দেওয়াটা, বা হাসি-হাসি মুখে তার কথা শুনে যাওয়া এখন অসম্ভব। বরং লাফিয়ে উঠে পড়তে হয় চলন্ত বাসে, একগাদা মাংসের ভিতর থেকে ঝাঁকড়া চুলো ছেলেটিকে খুঁজে নিতে হয় এমনভাবে যেন মর্গের মধ্যে একজন আহত মানুষকে খুঁজছি।

নামুন !

কেন ?

আরে নামুন না।

আচ্ছা জ্বালা হল।

৭. বৃহৎ উপন্যাস না লিখে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত লেখার দিকে আজকাল মানুষের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এইসব সংক্ষিপ্ত লেখায় আধুনিক রূপকথা গড়ে তোলার চেষ্টা যথেষ্টই আন্তরিক। শিল্পের চেনা-পরিচয়, পুরনো সম্পর্ক, অনেক কিছু সেখানে বদলে যাচ্ছে, মানুষ-মানুষ হয়ে উঠছে। যেভাবে তাল-তাল মাংসের নিচে, কয়েকশ বছরের সময়ের লাশের নিচে সবকিছু হেজে যাচ্ছে তাতে পুনরুদ্ধার বা পুনরুত্থানের ইচ্ছে-ই একমাত্র জীবন্ত ব্যাপার বলে গণনা করা যেতে পারে। এজন্য প্রথম আক্রমণ দরকার পাহারাওয়ালাদের ওপর, যারা এ ধরনের জিনিস দেখামাত্র 'গেল-গেল' বলে চিৎকার করে উঠবে এবং দুর্গন্ধযুক্ত, পচা শব্দ ছুঁড়তে শুরু করবে। 'ফালতু বিনয় অনেক হয়েছে, যেন মানুষের শরীর নয়, সামান্য কাঠিন্য নেই কোথাও, সবটাই গলা ব্যাপার তরল পদার্থ শুধু, এই হল আমার সাফ কথা।'

৮. যুবক খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসে ভদ্র ভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, দরকার হলে সে নরকের ভাষা ব্যবহার করতেও দ্বিধা করে না। সত্যি তার এত কথা জমে আছে, যে ভাষায় না কুলোলে সে হাত-পা ছুঁড়ে, অঙ্গভঙ্গি করে, যেভাবে হোক নিজের কথা বলবেই, 'অবশ্যি গাণ্ডুদের কাছে নয়।'

৯. মাকড়সার মত নিজের মন, অভিজ্ঞতা হাতড়ে-হাটকে ভাষা বুনে যাওয়াটা আদপে প্রতিদিনের কাজকর্মের মত-ই স্বাভাবিক। এর মধ্যে বসবাস করছে একজন কারিগর, সে যা গড়ে তুলেছে তা বেজায় মূর্ত। বাস্তব। ধরাছোঁয়া যায় এমন কিছু। এই অস্তিত্বটুকুর যৌবন থাকা-ও সেজন্য আরো স্বাভাবিক। যেমন আবার তা হতে পারে ঝোলা চামড়ার, অজস্র আঁকি-বুকির স্থবিরতা। মূর্তিটি সেক্ষেত্রে পচে-গেলে না গিয়ে পাথুরের মৃত্যু পেল এই যা। কল্পনার যুবক ও বাস্তবের যুবকে ঐ রকম দুস্তর ফাঁক রাখা এমন কি জরুরি, বরং ভাষা বুনে চলার নির্জনতা, স্তব্ধতা, এসবও নিশ্চয় আরেকজনের উদ্দেশে, সেই একজনের ঠিকানাটা কিম্ভুত লম্বা ভোটার লিস্ট, চাকরির প্যানেল, রাজনৈতিক বন্দিদের নামের তালিকা ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠাদের পে-রোল অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেটের অজস্র নামের মধ্যেই কোথাও, না কোথাও আছে, আমাকে শুধু খুঁজে নিতে হবে।

'অবশ্যি গাণ্ডুদের কাছে নয়' এই কথাটি কী মারাত্মক ! কী ভয়াবহ। 'গাণ্ডু' শব্দটা অভিধানে নেই চারপাশে ছড়ানো সবজির মত ঠাণ্ডা বরফের ছুরির মত হিংস্র এই শহরটায় আছে। নির্বোধ' বোকা' গাড়ল' এই সবকিছুর সঙ্গে গাধামির সঙ্গে হাত পা পেটের ভেতর ঢোকা-ভয়ের যোগফল যেন শব্দটা। আর তা উঠে আসছে মানুষের মুখ থেকে ততটা নয় যতখানি নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাঙা একটা কুয়োর ভেতর থেকে। যুবকের সঙ্গে কুয়োর কোন সম্পর্ক নেই, কুয়ো এখানে স্বপ্ন, তবে স্বপ্নের সুতোগুলো সরিয়ে ফেলায় জিনিসটা সংগীত হয়ে উঠতে পারে। অনেক দূর থেকে ভেসে এসে সে আমাদের জড়িয়ে ধরছে শরীরে-মনে ঘটিয়ে দিচ্ছে পরিবর্তন। বাস্তব এখানে স্বপ্নকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে আনছে। এ-কুয়োয় আত্মঘাতী হওয়ার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই, যখন কুয়োটি হয়ে উঠছে কণ্ঠনালী।

১০. ব্যাঙের কেত্তনে আমাদের কোন আকর্ষণ নেই আমাদের চারপাশে শুধু ব্যাঙের কেত্তন আছে।

জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, যা লোকে বলে, 'সবকিছু আগুন হয়ে আছে...হাত দেওয়ার জো নেই' এই আগুন কী দেখা যায়! তারা তো বলে হাত দিতে পারছি না অর্থাৎ হাতে ফোস্কা পড়ছে। এটা কী ভাবে সম্ভব!

পৃথিবীর সব থেকে বড় সমস্যাগুলো আসলে রাস্তাঘাটেই রয়েছে। কোন একজন দার্শনিক বলেছিলেন। তারপর আরো কতজন মানুষ রাস্তাটি লক্ষ করলেন। বললেন, একটি শহরের মানুষজন তাদের যথার্থ মুখের আদলটি দেখিয়ে ফেলে পথ-দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলে। আসলে তখন কী হয়—রক্তের দাগ দেখেই কেউ কেউ আড়াল খোঁজে, তাবা রক্ত সহ্য করতে পারে না, বা শরীরে ছলাৎ-ছলাৎ রক্ত হঠাৎ বাইরে আছড়ে পড়ুক তা তারা সহ্য করতে পারে না। কিংবা এমনও হতে পারে প্রতিদিনের টিক মারা জীবনে এই রক্তপাত, এই মৃত্যুকে জায়গা করে দিলে, তারা আঁতকে ওঠে। অর্থহীন সংখ্যা ও বর্ণমালা চারপাশের এক চূড়ান্ত পৃথিবী তার রুক্ষতা কাঠিন্য ও অপরিবর্তনীয়তা যে স্থবিরতা এনেছিল, যা তারা বিশ্বাস বলে মনে করে, হঠাৎ তা আক্রান্ত হচ্ছে। এবং পিঁপড়ের সারি ভেঙে যাওয়ার ভয় তাদের গিলতে আসে। দু'চারজন জরুরি ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করে, তারা হয়ত তখন এই আত্মপ্রসাদটুকুও পায়, যে তারা ভীতু নয়, আরেকজন পথচারীকে কুকুর বেড়ালের মত মরতে দিচ্ছে না এর মধ্যে কী কোন মহত্ত্ব নেই! অন্য কয়েকজন ডিনামাইটের মত ফেটে যায়। 'বা-ঞ্চোৎ', তারা গিলোটিন যন্ত্র বানিয়ে ফেলে ড্রাইভারের কুঠরিটিকে, এমনভাবে তার কলার ধরে টানে যে বেচারা একটি কাঠের চৌকাঠে গলা রেখে মাথাটা ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য হয। যখন আক্রমণকারীদের স্বাস্থ্য ও তাদের শরীর ছাপিয়ে, ভেঙে, দুর্ঘটনার বৃত্তটিতে সৃষ্টি করেছে এক ভয়াবহ জীবন, পাশেই পড়ে আছে মৃত পথচারী।

এভাবে একটি ঘটনা, পরবর্তী ঘটনা এবং তার পরের অনিবার্য ঘটনাবলী প্রায় একটা অঙ্কের মত স্থান কাল পাত্রপাত্রীতে কিছু রদবদল ঘটিয়ে, পুলিস, ডাক্তার হাসপাতাল, আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। যদিও সেসব এমন এক দুঃসহ স্বাভাবিকতা যে মনে হতে পারে, ঐ যে যারা টিক মারার জন্য অফিসে যাচ্ছিল, বাড়তি কমিশনের জন্য যে চালক ঠাসা একবাস মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সামান্য ব্যাপার নিয়ে যারা তর্ক করছিল, সেইসব স্বাভাবিক ঘটনা একটু বেশি সহনীয়।

ফলে রোগ নির্ণয় ও পরে প্রেসক্রিপশন লেখা, ঠিক এরকম কোন ব্যাপার নেই। যেমন বিদ্রোহও নেই। কারণ বিদ্রোহ এই গোটা জিনিসটা থেকে আলাদা। সকাল সন্ধ্যার ব্যাপার নয় তা। সে একটি বদ্ধ গৃহের সাময়িক জানলা হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

১১. দ্যাখো এইসব জিনিসে আমি ডুবে আছি না বললেও, জড়িয়ে আছি নিশ্চয় বলা যায়। এ অবস্থায় আমি তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারছি না, তুমিও পারবে না আমাকে পুরোপুরি ভুলে যেতে। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত বোঝা গেল, কিন্তু তারপর।

'এই যে!', 'বল', 'কতক্ষণ', 'তুই'?', 'আর বলিস না', 'চ',—তারা স্বস্তি বোধ করছে, শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে আসছে। অথচ একটু আগে বিপুল ভিড়ের মধ্যে ভেসে-ডুবে খাবি খাচ্ছিল। সিচুয়েশন-টার কোন ব্যাখ্যা তারা খুঁজছে না। প্রয়োজন এখানে সবকিছু ছাপিয়ে উঠছে। নাহলে ফিরে যাওয়া যেত সেই অচেনা শহরের গল্পে, যা আবার প্রতিটি শহরের গল্প। কবরখানা, ঘোড়ার উপর চেপে বসা এক বীরের মূর্তি, মিউজিয়ামের ঠিকানা ও গলি-ঘুঁজির হদিশ জানলেই একজন মানুষ শহরের অ-পরিচয় পেরিয়ে যেতে পারে না। বরং বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে একটি বিশেষ শহরে বসবাস করেও সে আঁতকে ওঠে অ-পরিচয়ের ভয়ে। এরকম সম্বোধন তাকে ঘায়েল করে,

'দাদা !', 'এই যে, !', 'আপনাকে বলছি' সে নিঃসংশয় হতে চায়, বুকে একটি আঙুল রাখে, 'আমাকে !' আরেকজন অপরিচিত, থেকে যেতে চায় অ-পরিচয়েই, বা সেসব জরুরি নয়, সে একটি পথের নির্দেশ পেতে চায়, যা প্রথম অপরিচিত যদি দিতে পারল তো ভাল নাহলে জিনিসটা বেশ রূপকধর্মী হল এবং ততটাই বিরক্তিকর।

১২. এইবার মোড় ফেরা যাক, ঐ কানাগলিটায় খামোকা নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই। বরং আমরা চেষ্টা কবব, একটু জিরিয়ে নিতে অসুবিধে নেই, তবে তা আরেকবার চেষ্টা করবার জন্য।

লাস্ট বাস কি চলে গেছে ?

কি জানি আমি-ও তো অপেক্ষা করছি।

এখানে কিন্তু দুজন নয়, ছাড়া ছাড়া আট দশজন মানুষ যার মধ্যে একটি দম্পতিও আছে। স্বামী-টি ট্যাক্সির প্রস্তাব রাখায় স্ত্রী মারমুখো হল, বলল 'বেরোনর দরকার ছিল কী !', একটু হাঁফ নিল (টান আছে মনে হয়), 'আমি তো তখন-ই বলেছিলাম ফালতু টাকা খরচা হবে, কোন মানে হয়, উহ ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে।' দম্পতি-টির কথাবার্তা যত ঝগড়ার দিকে এগোতে লাগল ততই বোঝা যাচ্ছিল ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তারা কেউ-ই সুনিশ্চিত নয়, 'এখন থাক সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে।'

১৩. কিছু একটা গোলমাল পাকিয়েছে, বেশ বড় ধরনের গোলমাল। এবং তা ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। নাহলে মানুষের প্রতিদিনের মামুলি কথাবার্তা ও আচরণ কেন বারবার এরকম হতাশাব্যঞ্জক, ইঙ্গিতধর্মী হয়ে উঠছে। আর এই যে মনে হচ্ছে নির্বিঘ্নে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কেউ যাচ্ছেও না, এই যে পারমাণবিক যুদ্ধে ভয় ও সে সম্পর্কিত দস্তখত সংগ্রহের অভিযানটিও খুবই ফালতু ব্যাপার মনে হচ্ছে আর রাস্তায় জড়ো হওয়া রোগা-মোটা, শিশু-বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষদের দেখতে পাচ্ছি, তাদের আলগা সামাজিকতা ও শরীরভর্তি শূন্যতা, এসব কী করে সহ্য করা যায়।

আচ্ছা সত্যি কি যুদ্ধ লাগবে !

কী করে পারমাণবিক বোমা নষ্ট কবা হবে !

চাঁদে জমি বিক্রি হচ্ছে না-কি, শুনেছেন...

এখন আমরা এই পৃথিবীটির থেকে চাঁদ সম্পর্কে অনেক বেশি জেনে ফেলেছি। আর আগ্রহ ? তা-ও কি এখন চাঁদ সম্পর্কেই অনেক বেশি, তা নয়, মানে সেভাবে দেখা, অর্থাৎ প্রশ্নটাই ভুল। এরপর একটি বক্তৃতা ছিল, বক্তৃতা ঠিক কথা বলা নয়, কারণ কথায় মানুষ সত্যিটাকে খোঁজে, বক্তৃতায় সত্য আগে থেকেই উপস্থিত। যাই হোক ভদ্রলোক সৌরজগৎ থেকে প্রকৃতি, ইউনিফর্মিটি এইসব বলে গেলেন।

বিশাল ঢেউ খেলানো একটি কারখানার শেড তখন বিকট গর্জনে উৎপাদন করে চলেছে, মেশিনের তেল-কালি-ধোঁয়ায় সম্পূর্ণ ডুবে যেতে-যেতে, তেল ঘামে মাখামাখি হয়ে, বেরিয়ে এসেছিল স্বাস্থ্যবান কিছু মানুষ, তাদের গায়ে শিল্প বিপ্লবের উর্দি।

গোটা জিনিসটার পর্যালোচনা এখন এভাবে চিত্রিত করা চলে, আবার একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ, তার দুটি হাত উঁচুতে এবং পরস্পরের থেকে অনেক দূরে রয়েছে, এক হাতে কারখানা এবং যন্ত্রপাতির একটি মডেল, আরেক হাতে রয়েছে প্রকৃতির মডেল : পাহাড়, সমুদ্র, বনভূমি ও আকাশ। মানুষের বিমূর্ত চাঁদ থেকে, বেজায় মূর্ত বাস্তবের চাঁদ এই দুটি হাতের মাঝখানে চুম্বকের মত রয়েছে।

বুড়ি চাঁদ বেনো জলে ভেসে যাওয়ার পর এই ঘটনা, এই ঘটনায় বীরের আখ্যা এখন একমাত্র মহাকাশচারীর প্রাপ্য।

১৪. বলাবাহুল্য রাস্তার লোকেরা তা নয়, বিশেষ করে কুসংস্কার, অস্বাস্থ্য ও দারিদ্রের শাসনে থাকা এই দেশটির রাস্তার তো কথাই নেই। তার লোকজন-ও অদ্ভুত, বলা যেতে পারে ভয়, অনিশ্চয়তা তাদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে একটি দিশেহারা ভাবের। তারা 'উদ্বাস্তু', 'শরণার্থী' এইসব শব্দের সঙ্গে যতখানি পরিচিত বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে ততখানি নয়। বরং মনে করে ঐ জিনিসটি সুবিধেভোগীদের একচেটে। অথচ এ-থেকে প্রমাণ করা যাবে না যে তারা খুব যূথবদ্ধ, প্রমাণ করা যাবে না যে এক ধরনের ছিঁচকাঁদুনে একাকীত্ব তাদের পা ধরে টানছে না। আবার প্রমাণ করার প্রশ্নটিও কেমন অবান্তর মনে হয়। নিজের কথা যখন ভাবি, যখন নিজে এরকম গোলমেলে ব্যাপারে ঢুকে পড়ি তখন কোন প্রমাণের দরকার হয় না।

১৫. মাঝে মাঝে আকাশ থেকে কিছু কাগজ ছুঁড়ে দেয় একটি হেলিকপ্টার (অতিকায় মাকড়সা একটি) কাগজগুলো আমাদের ঢেকে ফেলে, কোনদিন ভাবিনি এরকম সমস্যা আমাদের ঢেকে ফেলে, যেমন : পারমাণবিক বোমা ও বিশ্বশান্তির ব্যাপারটি।

১৬. একটি নির্দিষ্ট স্থানে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, পৃথিবীর এই নির্দিষ্ট স্থানটি যেসব বিক্ষুব্ধ দিনে 'দেশ' হয়ে উঠেছিল আমি তখন মাতৃগর্ভেও ছিলাম না। তবে আমার সম্ভাবনা, যে আমি জন্মাতে পারি সেটুকু ছিল। আর , কেন পরে চারপাশ জড়িয়ে বেঁচে থাকার স্লোগান, এক ধরনের বামপন্থায় আমাকে আকর্ষণ করেছিল, পরে স্লোগানগুলো একের পর এক খারিজ হয়ে যেতে থাকল ও বামপন্থা একদিকে তখ্‌ত পেল অন্যদিকে বন্দুকের এবং বন্দুকের পিছনে মানুষের খোঁজ চলল। আমি একথা বলতে পারব না সেই খোঁজ থেমে গেছে, যেমন বলতে পারব না আমার বিচার বুদ্ধিতে সে জিনিসটাও কিছুটা সংশয়াত্মক ঠেকেছে বলেই তার কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তবে এসবই কিছুটা সতর্ক থেকে নিরাপদ কথা বলা। তার বেশি কিছু নয়। নিজের সম্পর্কে এটুকু বলা বরং বেশি দরকার, যে রোমন্থন করার মত খুব মহার্ঘ স্মৃতি আমার বিশেষ নেই, কিছু-কিছু ঝুঁকি আমি নিয়ে থাকি, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারি না। মাঝরাস্তায় এসে আর তেমন আগহ্ থাকে না।

১৭. অনেকের মত আমারও মনে নিজের সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্বের একটি অনুভূতি কাজ করে, কেউ-কেউ এই অনুভূতিটা চেপে রেখে লোকের সঙ্গে মিশতে পারে। ইদানীং দেখছি আমিও তা খানিকটা পারছি, মনে হচ্ছে বয়স হচ্ছে, নষ্ট করার মত সময় আর আমার হাতে বেশি নেই। যেজন্য শিশুটির গলা টিপে অভিভাবক হয়ে উঠছি আর ভাবছি তা নয় বেশ পরিণত হওয়া গেল, সাবালক হয়ে উঠছি।

মনে হচ্ছে, আর পারা যাবে না, এই মনে হওয়াটা মেনে নিতে পারছি না, তাই এ পর্যন্ত যা হয়েছে, যতটুকু হয়েছে, পিছন ফিরে, সেসব খুঁটিয়ে দেখব ; দরকার হলে আবার এক অর্থহীনতা থেকে কুচ্ছিত, অসহ্য ব্যাপার থেকে-ই শুরু করব। এবং এতবার শুরু করা, এবং ফিরে-ফিরে শুরু করায় শেষটা আর-ও অনিশ্চিত হয়ে উঠলেও এটুকু ঝুঁকি আমরা নিতে পারি। এমনকি তার ফলে যদি কোন সিদ্ধান্তে, কোন শেষে আমরা না পৌঁছতে পারি তাতেই বা কি। বরং সেক্ষেত্রে আমরা এই পরিশ্রমটুকু উন্মুক্ত রেখে দিতে পারব, পাঠকের জন্য মার্জিন রাখার মত নয়, সম্ভাবনার জন্য জায়গা নিশ্চিত করে রাখা।

১৬. পিছন ফিরে গোনা, এক জীবনে দুবার বাঁচা কতখানি সম্ভব। এভাবে হয়ত প্রশ্নটি তোলাই যায় না, কারণ তা হয়ে যাচ্ছে এক নদীতে দুবার স্নানের গল্প। যে

সময়ে আমি বেঁচেছি, বেঁচে আছি, সেই সময়ে বেঁচে থাকা অজস্র মানুষের অস্তিত্বও একটি বাস্তব ঘটনার হাজার এক গোলকধাঁধা, কাঁচা আত্মপ্রীতি এই বাস্তবটিকে অস্বীকারের দিকে ঠেলে দেয়, অন্যদিকে অস্বীকারটি যেরকম বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে, নিজেকেই আঘাত করে, লাশ ফেলে দেয়, তাতে সংশয় হতে পারে সত্যি সেইসব দিনে বেঁচে ছিলাম কিনা।

স্তব্ধতার মধ্যে পড়ে আছি আর এইসব ভাবছি। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে, ডানদিকের জানলার ফ্রেম জুড়ে আছে বাংলাদেশের আম, জাম, লিচু গাছে। গাছগুলো ক্ষেপে গেছে যেন। তবু এরা জানে স্তব্ধতা কাকে বলে। আর আমি জানি স্তব্ধতা-নির্জনতা কোথায় এসে ফুরিয়ে যায়। কোথায়! কোথায়! বাজারের কাছাকাছি কোনদিন দেখা যায়নি তাদের। বাজারের কাছাকাছি কী আছে? লম্বাটানা, খাড়া ও পিলারে গড়া কিছু বড়বড় বাড়ি...শিক্ষা, সংস্কৃতি; গণতন্ত্র, বিচারবিভাগ ও কয়েদখানা। এখানে মানুষ গিজগিজ করছে, তবে তাদের মানুষ বলে চেনা যাবে না, নামও বদলে গেছে, এখানে তারা জনতা। যাদের সম্পর্কে বলা হয় 'জনতার রোষ', 'জনতার সমর্থন' 'জনতার আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি কথা।

খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে এবার, আমি চলে এসেছি খাদের কাছে, কারণ নিজেকে বাদ দিয়ে অসংখ্য মানুষকেও আমি নিজে এছাড়া অন্যকিছু ভাবিনি। এভাবে একটা সম্পর্ক আমি স্থির করেছিলাম তা খানিকটা রাজা-প্রজা সম্পর্ক। যখন বিপরীতভাবে অন্য কেউ নিজেকে ভেবেছে রাজা এবং আর সবাইকে (যার মধ্যে আমিও আছি) ভেবেছে প্রজা। এভাবে 'জনতা' শব্দটি চূড়ান্ত হয়ে উঠছে। এমন একটি বিধান, এমন ভাগ্যতাড়িত অবস্থা, আগেকার অপরিচয়, সব মিলে আমি নিরর্থক হয়ে যেতে থাকি। পে রোল, ভোটারলিস্ট ও দপ্তরের কবরভূমি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারছি না, যখন ঐগুলোই আবার আমার নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তার কয়েদখানা থেকে মাঝে-মাঝে প্যারোলে ছুটি পেলেই অস্থির হয়ে উঠি, নিজের সম্পর্কে তখন মনোরোগীর ভয় পেয়ে বসে।

১৫. এমন কোন নদীর কথা আমরা জানি না যা আবার উৎসের দিকে ফিরে গেছে যদিও এরকম নদী কল্পনা করেছি অনেকবার। এক্ষেত্রে কল্পনা ধাপে ধাপে এগোয়নি বলে দুপাড়ের দৃশ্য—ঘরবাড়ি, গাছ ও কুটির, কাঠুরে ও পাহাড়ের কথা ভাবতে হয়নি। ভাবলে হয়ত দেখতাম নদীটি ফিরতিপথ হারিয়ে ফেলেছে, সে কিছুই চিনতে পারছে না। ছেলেবেলায় দেশলাই-বাক্সো দিয়ে ঘরবাড়ি বানাতাম, রেলগাড়ি বানাতাম। পাহাড়ের গায়ে দেশলাই বাক্সো দিয়ে বানানো, বা দেশলাই বাক্সের মত বাড়িতে তারা থাকে...এরকম একটা গানের লাইন মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল দোতলার ছোট মেয়ে বুড়ির কথা। বুড়ি কী যত্ন করে পুতুলগুলোকে স্নান করাত, সাজাত, খাওয়াত, পড়তে বসাত, অফিস করতে পাঠাত, অসুখে ফেলত, ডাক্তার পুতুলকে ডেকে আনত এবং ঘুম পাড়াত।

বুড়ির বিয়ে হয়েছে জামসেদপুরে, তিনটে বাচ্চা, পেটে চর্বি, গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে-ঠুলে কথা বলেছিল শেষবার। আমার সন্তান হয়নি শুনে খুব ইয়ার্কি মেরেছিল (যন্ত্রটা ডাক্তারকে দেখাস)। বুড়ি দুপুরে নভেল পড়ে, দেখলাম সে এখনকার সব লেখকের বই পড়েছে, যদিও কোন লেখক তার কাছে বিশেষভাবে হাজির নয়, সবই শুধু লেখা গল্প! ঐ সব গল্প একরকম তার ছেলেবেলার পুতুলখেলা—। বুড়ি কি একথা বলেছিল?

এরকম পাঠক-পাঠিকাকে সামনে বসিয়ে রেখে এবং টেবিলের অপরপ্রান্তে নিজে বসে থেকে যেরকম লেখা ও পড়া তার থেকে নীতিহীন যৌন আচরণ অনেক সমর্থনযোগ্য। 'আ মিডসামার নাইট'স ড্রিম' ঘটছে না, আমার মাথা কেটে ফেলে গাধার মুণ্ড জুড়ে দেওয়া হচ্ছে না। এই গল্পটা, লেখা-পড়ার গল্পটা এখন রাজনীতি পাম্প করা লেখার ঘটনা পর্যন্ত টেনে আনা সম্ভব (কারণ সেখানে পাঠক যা চান তা-ই পাবেন, লেখক তাই লিখবেন যা পাঠক চান)। আঘাতহীন, আক্রমণহীন এক অতি কোমল ব্যাপার, এই কোমলতা কী বিশ্বাসযোগ্য ? সত্যি এই নরম ভাবটি আমাদের জীবনে কি আছে। এইরকম সবুজ কচি পাতার বিষয়টি এমন এক সরলতা যেখানে সরলতার কোন প্রশ্ন ওঠে না এজন্য কোন গোপন কথা ফাঁস করা হয়নি, জটিল বিষয়কে অনুধাবন করা হয়নি মাথা ও হৃদয় খাটিয়ে, যা থেকে প্রকৃত সরলতা আসতে পারে।

১৪. মা আমি কবে বড হব।

একদিন ঠিক বড হয়ে যাবি দেখিস।

তখন সম্ভবত আমার বারো/তেরো বছর বয়স। ছোটবেলা থেকে একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে চাবকাত। চারপাশের তুলনায় নিজের আকৃতি, শক্তি, বুদ্ধি এত কম মনে হত, সব ব্যাপারে এত বেশি অন্যের উপর নির্ভর করতে হত, মনে হত যেন শুধু দয়ায় বেঁচে আছি। বারো/তেরো বছর বয়সে এই অনুভূতি-টা অসহ্য হয়ে উঠল, ক্লাসের বন্ধুরা সবাই আমার থেকে লম্বায় বড আর আমি যেন থেমে গিয়েছিলাম, এক চুল-ও লম্বা হচ্ছিলাম না। মা জানত আমার কষ্টের কথা, এই কষ্ট লাঘবের জন্য মা আমাকে প্রার্থনা লেখা শেখায়। রোজ রাতে বালিশে লিখতে শুরু করলাম 'ভগবান আমাকে লম্বা করে দাও', পরের দিন দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে মাপ নিতাম 'না এক চুল-ও লম্বা হইনি'। এই জিনিসটা আমাকে ঘায়েল করেছিল খুব, প্রার্থনা ব্যাপারটা ভিক্ষের মত মনে হতে লাগল। ভগবান সম্পর্কে আমার মধ্যে এক স্বাভাবিক উদাসীনতা কাজ করত, কিন্তু প্রার্থনার ব্যাপারটি খুব-ই বাস্তব ছিল, আমি সত্যি প্রার্থনা করতাম।

শরীরে পরিবর্তন ঘটেছিল অনিবার্যভাবেই এবং একবার তা ঘটতে শুরু করলে প্রার্থনার বিষয়টি অনায়াসে ভুলে গেলাম। শরীরের সন্ধিস্থানগুলিতে লালচে চুল দেখা দিল, বুঝতে পারলাম আমি বড় হচ্ছি, বাঁশির মত স্বর ছাপিয়ে একটি হেঁড়ে গলা যেন আমার ভিতর থেকে উঠে এসে আমাকে বলতে লাগল, 'কী হে চিনতে পারছ'। এই সময় বুড়ি আমার গা ঘেঁষে বসত, গায়ের গন্ধ শুঁকত আর বিচ্ছিরিভাবে হাসত। বুঝতে পারতাম বুড়ি কিছু একটা জেনে ফেলেছে যা আমি জানি না।

বয়ঃসন্ধিকালের যৌনতা এ লেখার বিষয় নয়, পরিবর্তন সম্পর্কেই ভাবতে চাইছি এবং এ-প্রসঙ্গে নিজের শরীরের কথাটা আমার মনে দেগে বসে আছে। আমার যা ছিল না সে-ই শরীর, দৈর্ঘ্য, শক্তি, আকার খুব জরুরি প্রয়োজন মনে হত, একদিন এই পরিবর্তনের অস্তিত্ব টের পেলাম আর অচিরেই ফুরিয়ে গেল প্রয়োজনের ঐ তীব্রতা, ক্ষ্যাপামো। কেমন শান্ত হয়ে এলাম। প্রয়োজন বেশ রাক্ষুসে, সে তবু থেমে থাকল না, শরীর-মন ওপছানো এই প্রয়োজনকে আমি বুঝে উঠতে পারিনি, কেমন খাঁ খাঁ করত, একদিন, কবে ঠিক মনে নেই, বুঝলাম : বন্ধু চাই।

১৩. বেশ অস্থির হয়ে ওঠা গেল, কী যেন সবসময় তাড়া করত। আজ বুঝি, তখন চিনতে পারিনি যে একজন আদিম অভিযাত্রী, ভবঘুরে ও হার্মাদ মানুষ আমার পেটের মধ্যে লাফাচ্ছিল। এখন সমস্যা হল শুধু নিজেকে নিয়ে, নিজের সম্পর্কে কৌতূহল ও অভিজ্ঞতার নেশা যে কেবল মারাত্মক তা-ই নয়, এভাবে আমার ঐ তীব্র

প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয় : আমি বন্ধু পাব না কোথাও। অন্যদিকে তারা, মানুষজন (যাদের মধ্যে আমার সম্ভাব্য বন্ধু রয়েছে) আমার সম্পর্কে কী মনে করে, নিশ্চয় তা-ও আমার এক মূল্যবান পরিচিতি, নিজের চরিত্র বুঝতে গেলে তাদের কাছ থেকে পাঠ নেওয়া জরুরি ছিল। আবার এই পাঠ নেওয়া আর আত্মসমর্পণ এক জিনিস নয়, সেজন্য জিনিসটা খুব জটিল, এই জটিলতার জাল আমি ছিঁড়ে ফেলতে পারিনি। এবং কোনো ক্ষুদ্র ইঁদুরের প্রাণ রক্ষা করিনি কোনদিন, ফলে সে তার ধারাল দাঁত দিয়ে জালটা কেটে দেবে এমন আশা ছিল না।

দূরে একটি নক্ষত্র থাকে। মানুষের বুকে নক্ষত্রের আলো ঠিকরে পড়ে কি-না আমার জানা নেই। তবে নক্ষত্রটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলে রাস্তা হারিয়ে যায়। কেমন মনে হয় রাস্তা যে হারিয়েছি তা নিজের-ই পায়ের ছাপে। নিজেকে এত বেশি রেহাই দিয়েছি, এতখানি প্রশ্রয় পেয়েছে সে যে 'নিজে' গিলেছে আমাকে। কুয়োর ব্যাঙ বাস্তবে কীভাবে হওয়া যায়, কী তার অভিজ্ঞতা হতে পারে, সেসব আমি সত্যি জেনেছি।

১২. 'গর্তের ইঁদুর'/'কুয়োর ব্যাঙ'/'পারিবারিক জীব'/'বইয়ের পোকা'/'বাতেলাবাজ'/'ভীতু আরশোলা'...এভাবে জন্তু আর মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কিম্ভুত জীবের দেশ যেন রূপকথার জগৎ থেকে বাস্তবে চোলাই হয়ে এসেছে।

১১. জীনযাপন শুরু হয়েছিল একরকম অজ্ঞতায়, তবে শরীর পুষ্ট হওয়া, লম্বায় বেড়ে যাওয়া, প্রভৃতি দিনে এবং তারও পরে বেশ কিছুকাল শরীরের প্রয়োজন ও অনুভবের এমন এক উচ্ছ্বাস ছিল যে তাতে ঐ যাপন করার ব্যাপারটি মাথা তুলতে পারেনি। তখনকার বন্ধুদের এখন খোঁজ করি না, তারাও আমাকে নির্বাসন দিয়েছে, এই শাস্তির ঘটনায় তবু কোন নির্দয়তা ছিল ভাবিনি। এমন নয় যে সত্যি আমরা পরস্পরকে জমাট বরফের দেশে নির্বাসনে পাঠাচ্ছি, বরফে আমাদের হাত, পা কেটে যাচ্ছে, জুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে, আঙুল ফেটে যাচ্ছে। বরং বেশ চটপট, অনেক স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক ধরনের মানবিক উষ্ণতা নিয়ে অন্য কেউ এসে যেত। এতে করে বন্ধুত্ব যেন এমন একটি ক্ষেত্র যা কোনদিন শূন্য থাকে না, কোনদিন ভিড় সহ্য করতে পারে না।

কদিন খুব উন্মাদের মত বাতাস, ক্ষ্যাপা বাতাস ছুটে আসছে। এই বাতাসে পড়ে থেকে নেশা হয়ে যাচ্ছে, জানলার ফ্রেম ভেঙে আমাকে বাইরে নিয়ে যাবে মনে হচ্ছে। যত পাতা ও সরু ডাল, ছেঁড়া কাগজ সে উড়িয়ে নিচ্ছে, তাকে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়াও যেন অসম্ভব নয়। এই ছুঁড়ে ফেলার ব্যাপারটি সম্পর্কে কোনদিন ভেবে দেখিনি। কীভাবে আমাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল জীবনে, অসম্ভব এক রুক্ষতায়। মরুভূমিতে আমি কোনদিন যাইনি, তবু যেন একদিন অনুভব করেছিলাম ঐ জ্বলন্ত নির্জনতা। যদিও বলতে পারব না তখন আমি জ্বলে যাচ্ছিলাম। অবশ্য একথা নিশ্চিত বলা যায় এখন, এরকম অনেক যন্ত্রণা ও কষ্ট আসলে একটি কাঁটার মুকুট, হাতে-পায়ে পেরেক ঠোকার আগে এই পর্ব সম্পন্ন করতেই হয়। আর এই অনিবার্যটুকুর নিয়তি-ভূমিকা নাটকে চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে পারে কিন্তু জীবন সেরকম নয়, এ দুয়ের মাঝে সাত সমুদ্র টের পাই। ফলে এ নিয়ে কাব্যি করা, বিষণ্ণ-বিষণ্ণ-ভাব আমদানি করা কেমন চ্যাটচেটে মনে হয়ে।

১০. 'তোর উপলব্ধি নিয়ে তুই থাক'/ 'নিজেই নিজের তারিফ কর'/ 'যা, উচ্ছন্নে যা'! আমার এক ডাক্তার বন্ধু যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে এক বিদ্রোহীর শরীর থেকে বের করে এনেছিল একটি সীসের গুলি। এজন্য ঐ বিদ্রোহী তাকে যে খুব প্রশংসা করেছিল এমন

নয়। সে এটাকে খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিল। আমার বন্ধুও বিদ্রোহীর নীরবতাটুকু পছন্দ করে। কিন্তু এক বছর পরে যখন বিদ্রোহী আরও স্বাভাবিকভাবে রোগের কবলে পড়ল এবং ভুগেভুগে তার শরীর ছোট হয়ে এল, সে ছোট হতে-হতে মারা গেল, তাতে ডাক্তারের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায়। কেননা এবারও সে তার চিকিৎসা করছিল, অসুখটিও এমন কিছু নিরাময়ের অতীত ছিল না, ঝুলিয়ে দিল বিদ্রোহীর শরীর, সে বুঝতে পারল না।

এই ঘটনাটির ওপর প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত চলল, বেশ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি চামড়ার মধ্যে ঢুকে যেতে চাইল। বিদ্রোহী নয়, একজন রোগাক্রান্ত, মৃত মানুষকে পুড়িয়ে আমরা ফিরে আসছিলাম। প্রবল বৃষ্টি ভিজিয়ে দিল আমাদের শরীরের গোপন জায়গাগুলো পর্যন্ত।

ওর মধ্যে ভালবাসা ছিল।

কিন্তু বেশ চাপা ভাবে।

ঠিক এই জন্যেই ও বিদ্রোহী হয়ে যায়।

অসুখটা বড় নয় শরীরটাকে বড্ড হেলাফেলা করেছিল।

আমরা আসলে বিদ্রোহীর সমালোচনা করছিলাম, একজন মৃত মানুষের মারাত্মক একটা ত্রুটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। সে বাস্তবকে একেবারে পাত্তা দেয়নি, এই পাত্তা না দেওয়াটা চলে আসে শরীর পর্যন্ত। অসুখটা হল ঐ ত্রুটি, যা শেষ পর্যন্ত হিংস্র জন্তুর মত তার গলা পা দিয়ে চেপে ধরল। খাবি খেতে খেতে চোখের মণি ঘোরাতে-ঘোরাতে সে মারা গেল।

৯. জেলখানায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে সরিয়ে রাখা হয়, তাকে আলাদা করে ফেলা হয়। ছোট একটা খুপরিতে সে কখনও হাঁটু মুড়ে বসে থাকে, কখনও শুয়ে থাকে। আর সবসময়-ই সে দিন গুনে যাচ্ছে।

মানবিক অধিকার রক্ষা সমিতি থেকে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রতিবাদ করা হচ্ছে বছরের পর বছর। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারটি বেশ দক্ষতার সঙ্গে আত্মগোপন করেছে—এ জিনিসটাও ঐ পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে টিক মারার মত একটি কাজেই পরিণত হয়েছে। এই 'হচ্ছে', 'করেছে' ও 'হয়েছে' তে লক্ষ করি চূড়ান্ত পরিণতি একটি শেষ-কে, নরম লোমের একটি জন্তু যার সাদা বা ধূসর রঙ ফেটে কিছুটা রক্ত বেরিয়ে আসবে এবং সে চলে এসেছে বিপদসীমার মধ্যে।

বাস্তবে সকলের থেকে সকলে আলাদা হতে হতে, সরে যেতে-যেতে, বাধ্যতামূলক কাজ যন্ত্রের নৈপুণ্যে সেরে ফেলার পর যে স্তব্ধতা, এখন এই স্তব্ধতার কোন মহান ব্যাপার টের পাই না। বরং সেক্ষেত্রে লক্ষ করি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত একজন আসামীকে, যে জানে না সে কী অপরাধ করেছে, কিন্তু জানে মাথার ওপর মৃত্যুর খড়্গ ঝুলছে। আর দিন গুনে যাই।

এর মূল্য এত বেশি, এর থেকে বেশি কিছু, চূড়ান্ত ও গভীর মূল্য কল্পনাও করতে পারি না। এ নিয়ে গবেষণা করার স্থৈর্য, শ্রম ও ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে জিনিসটার বিপরীতে পৌঁছনো সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ ঐ ক্ষ্যাপা বাতাসে মূর্চ্ছার বীজ লুকিয়ে আছে, নির্ঘাত কেউ ক্লোরোফর্ম ছড়িয়ে দিয়েছে।

৮. বাণ্ডোত-কে আমি চিনি না।

৭. একবার রাস্তা খুলে দিলে যা হয়, প্রায় জ্যামে আটকে থাকা, জমাট গাড়ির একটা স্রোত আমাকে গুঁড়িয়ে, বুকের ওপর দিয়ে চলে গেল। একসঙ্গে অতজন মানুষ মার্চ করে এলে ভয় লাগার-ই কথা। দশ, বিশ, ত্রিশ বা তারও বেশি মানুষ একসঙ্গে

ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হঠাৎ মনে হল সত্যি এই এতজন মানুষ, এ তো শুধু সংখ্যা নয়, রক্ত মাংসে পেশীতে মানুষের একটা পাহাড় ভেঙে পড়ছে আমার বুকের ওপর।

কী করে সামলাই, কথা বলি, বা গোটা জিনিসটা ঠিক কী ভাবে নেব।

চল্লিশ বছর বেঁচে থাকা, তার রোঁয়া, শিকড় ইত্যাদির অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি, জড়িয়ে ধরেছিল একে-তাকে-তোমাকে। কেউ রেহাই পাচ্ছিল না তার আগ্রাসী বৃদ্ধি ও বিস্তৃতির হাত থেকে। এর মধ্যে কিছু ব্যবহারিক ব্যাপারও ছিল। এই ব্যবহারিক দিকটা সম্পর্কে এখন নিরাপদ দূরত্ব থেকে ভাবলে মনে হয় তার অনেকটাই স্থূল প্রয়োজন—কেবল শরীরের ব্যাপার। সভ্য মানুষের কোন শত্রু থাকে না এবং শুধু সেই কারণেই সকলে বন্ধু হয়ে যাচ্ছে এমন সরলীকরণে আমার বিশ্বাস নেই। আর ব্যবহারিক দিক থেকে, বিভিন্ন তারিখে বিনিময়ের ঘটনাগুলিকে একটি কালপঞ্জিতে সাজিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। যদিও তা হবে বেশ যান্ত্রিক, অর্থাৎ যন্ত্রের মত তা করা হয়েছে। নাট-বল্টু-স্ক্রু হয়ে গিয়েছে তখন মানুষের শরীর। তার অঙ্গ সংস্থান, শরীরের উপকরণ বদলে গিয়েছে, শুকনো প্রয়োগগত দিক ছাড়া এতে আর কিছু নেই। ভাবাবেগ বলে কিছু নেই। 'যান্ত্রিক' শব্দটি যন্ত্র সম্পর্কে ইদানীং যত না ব্যবহার করা হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি তার প্রযোগ ঘটছে মানুষ সম্পর্কে। চ্যাপলিনের ছবির নায়কের দশা ব্যক্তিগত জীবনে ঘটছে না, ঘটলে রেহাই পাওয়া যেত। বরং যা ঘটছে তা হল নিয়ম শৃঙ্খলার যন্ত্রের ঠিকঠাক ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার পর, জিনিসটাও চেষ্টা করেছে আমাদের হাত-পা বেয়ে শরীরে ছড়িয়ে পড়তে।

যন্ত্রের বিকল হওয়া আমাকে বেশ কয়েকবার দেখতে হয়েছিল, তার মধ্যে দুটি ঘটনা কোনদিনই হয়ত ভুলতে পারব না।

প্রথম ঘটনাটির সঙ্গে ইতিহাসের কিছু সম্পর্ক আছে, ইতিহাস সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল শুধু এইটুকু যে তা শ্রেণী-সংঘর্ষেরই বিস্তৃত বিবরণ। এক তো বিস্তৃত বিবরণ অচিরে ভুলে যাওয়া হয়, দুই মানুষের পরিচয় শত্রু-মিত্র, যোদ্ধা ও ঘাতকে সাজিয়ে নেওয়া হল। ভাবা হয়েছিল যে এরপর দাঁতে-দাঁত লড়াই গভীর এক স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলবে, যাবতীয় সুন্দর সুন্দর কল্পনা তখন এই গ্রহটিতে রচনা করবে প্রকৃত স্বর্গ। মানুষের হাড়গোর রক্ত মাংস দিয়ে গড়া একটি সংগঠন শহরটিতে কাজ করছিল। নির্দেশ, আদেশ ও সমস্যা ঠিকঠাক যাতায়াত করছিল তাদের শরীরে টিউব বেয়ে। ক্ষমতার যে মানমন্দিরটি শহরে ছিল সেখানে চোরাগোপ্তা আক্রমণ ও অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় আত্মরক্ষা করা, দুটি জিনিসই বেশ সাফল্যের সঙ্গে চলতে থাকে।

ক্রমশ ঐ টিউবের ফাঁক দিয়ে কিছু বাতাস বুদবুদের মত ঢুকে পড়তে থাকে, ভারী ও ঠাণ্ডা সময় ধারাল নখের থাবা মেলে দেয় এবং ঘটনাটির নিজের মধ্যেই ঘটায় এক প্রবল বিস্ফোরণ।

আমরা পরিণত ছিলাম না।

আমরা শিশু।

আমরা শিশুর মত সরল ছিলাম।

স্বাভাবিক হতে চাই আমরা। চাই ঘরে ফিরতে।

এই যে কান্না, আর্তনাদ, তাতে আকাশ ভেঙে পড়েছিল। শান্তি কমিটি, আইনের ধারা, সংবাদপত্র, বাবা, কাকা, মামারা এই বিস্ফোরণ, এই বিকলাঙ্গ হওয়ার ঘটনাটি, এমন শান্তভাবে গ্রহণ করেছিল যে তারা যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দেশজ বীভৎসতারই একটি জের টেনে চলেছে।

৬. দ্বিতীয় রটনাটি-তে দেখা যাচ্ছে আমি বসে আছি একটি রিকশার সিটে, এই বসে থাকাটা বড় অদ্ভুত। রিকশার ঝাঁকুনিতে আমার রোগাটে শরীর হাড়ে হাড়ে ঠুকে যাচ্ছিল। শরীরটা কোন মোটা মানুষের হলে তা থল-থল করত, আমার ক্ষেত্রে উরু থেকে পা পর্যন্ত ছিল এক রকমের আরামের অনুভূতি। আর ঊর্ধদেশে বেশ অস্বস্তি ছিল, অনুভূতিব দিক থেকে শরীরটা সত্যি যেন দু-টুকরো হয়ে পড়ছিল।

এভাবে আমি আসলে স্থানান্তরিত হচ্ছিলাম, এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদায়, দু কি. মি দূরত্ব। প্রতিদিন এভাবে দুই, তিন, চার, আট-দশ কি. মি. বা তারও বেশি রাস্তা আমরা প্রত্যেকে সাপ্টে নিই। অর্থাৎ ঐ দূরত্বটুকুর মধ্য দিয়ে যাই, যদিও অনেকের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা হল আরোহণ ও অবতরণ। রিকশা নামক যান-টি যানবাহনের এক স্থূল উদাহরণ, এই স্থূল উদাহরণটি একটা কিছুর দগদগে চিহ্ন। যন্ত্র সভ্যতার প্রগতির মধ্যে তা বেশ বেখাপ্পাও বটে, যেন হঠাৎ ঢুকে পড়েছে, চালক চেষ্টা করছে বন্য ঘোড়ার গতি পেতে। অথচ কোন মুহূর্তেই সে নির্ভেজাল জন্তু হতে পারে না, চালক থেকে যায়, 'রিকশা চালক', 'রিকশাওয়ালা' দুটি শব্দই তার পরিচয় তুলে ধরতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ।

আমি চারপাশে এই জান্তব শ্রম দেখে আঁতকে উঠি না। 'কাজের মেয়েটা', 'ছেলেটা', 'মুটে', 'রিকশাওয়ালার' এক বাধ্যতামূলক শ্রম-শিবির যেভাবে ঢুকে পড়েছে শহরটির মধ্যে বারবার তা নজর এড়িয়ে যায়। এবং আদতে এই শ্রম-শিবিরের ভিত্তির উপর তৈরি করা অফিস-কাছারি-বিদ্যালয়ের মসৃণ স্বাধীনতা এবং তা থেকে মত প্রকাশ, চিন্তা ও শিল্পীর স্বাধীনতা এমন কৌশলে, আমাকে ফাঁসানো যায় এমন একটি ভাষায়, প্রলুব্ধ করতে থাকে। আর আমি যান্ত্রিক থেকে ছুটিয়ে পেয়ে এসে দাঁড়াই শহরের কৃত্রিম হ্রদ, একটি ফোয়ারা ও কালো পরী-টির কাছে।

৫. ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিদের কখনো না দেখলেও, ছোট একটি বিছানা উষ্ণ করে তোলার দিনে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগেনি। ঐ রকম অসাড় ঘুমেব কিছু স্মৃতি সকলেরই আছে। আর সে সম্পর্কে ভাবতে হয়নি ঘুমের জীবন, স্বপ্ন, অবচেতনের জেগে ওঠা ইত্যাদি। পরিণত বয়সে কেউ কেউ তা ভাবতে পারে, কেউ কেউ মনস্তত্ত্বের বই পড়েছে বলে ভাবতে বাধ্য হয়। এক্ষুণি আমার যে কথাটা মনে পড়ছে তা হল এমন কিছু ঘুমের স্মৃতি যার মধ্যে বিশ্রাম ব্যাপারটি ছিল শরীর রহস্যের অন্তর্গত। এভাবে আমি মানুষকে ঘুমোতেও দেখেছি, মাটিতে তারা পড়ে আছে, শরীর নড়ছে খুব মৃদু গতিতে এবং শরীরের সমস্ত আকারটির মধ্যে ঐ স্পন্দন এমন ডুবে আছে যে তাদের পাথর ভাবাও অসম্ভব নয়। আবার এর মধ্যে জীবনের বিস্তৃত মাপটি-কেও অবহেলা করা হয়নি, যেজন্য ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর মানুষটির মেজাজ সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা থাকে না, আমাদের অপেক্ষা করতে হয়।

৪. জেলখানার সঙ্গে স্তব্ধতার সম্পর্ক আছে ; অত্যাচার, আঘাত এখানে খুবই হিসেবমাফিক ঠান্ডা মাথায় যেমন নেমে আসতে পারে, তেমনি তা সবসময় হাজির নেই। এমনিতে সর্বদা যা আছে তা হল স্তব্ধতা, যেজন্য পাঁচিলটি অবান্তর মনে হতে পারে। এই পাঁচিলের দিকে তাকালে, গাঁথনির প্রতিটি ইট-কে দেখলে মানুষের হাতেব কথা মনে হওয়া অসম্ভব নয়। সেইসব মানুষ দল বেঁধে লিভার ও পিস্টনের মত শরীরকে ব্যবহার করে পাঁচিলটি তুলেছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজ শেষে ফিরতি পথে, তারা গান গেয়েছে, বাংলা মদ খেয়েছে, ছেলেপুলের জন্য মিষ্টি কিনে নিয়ে গেছে। এমনকি হয়ত তাদের গল্পও বলেছে, 'লাল কমলের আগে নীল কমল জাগে /

নীলকমলের আগে, লাল কমল জাগে।' শিশুরা যারপর পরম নিশ্চয়তার ঘুমিয়ে পড়েছে শুধু নয়, উত্তেজক, রোমাঞ্চকর স্বপ্ন-ও দেখেছে ঘুমের মধ্যে।

জীবনের এতখানি আকারের মধ্যে বসে থেকে, জেলখানার স্তব্ধতা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে, হয়ত ভাবতে হয়েছে 'আজ নিশ্চয়ই কেউ আসবে। ফুল অথবা কোন ভালো খবর নিয়ে।'

বাস্তবে দেখি আমার অনেকদিনের কিছু বন্ধু এসেছে। তাদের মুখ চোখ হাত-পা-বুকে পোড়া দাগ। ভুল করে কেউ কি তাদের চিতায় তুলেছিল, তারপর যখন দেখল যে না ওরা সম্পূর্ণ মরেনি তখন বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে ফেলে দিয়েছিল! তারা কি এখানে আশ্রয়ের খোঁজে এসেছে?

বেঁচে থাকা ব্যাপারটার মধ্যে-ই এমন ভায়োলেন্স আছে।

কী? ভায়োলেন্স?

বেঁচে থাকা একটি হিংসাত্মক ঘটনা।

জীবনের ওপারে কোন জীবন নেই, প্রতিদিনের বাইরে কোন দিন নেই, তারিখ নেই। জীবন নেই অথচ প্রতিদিন কী অসম্ভব এক কয়েদখানার ঘণ্টা। ঘণ্টার ঢং ঢং ধ্বনির ফাঁকে লটকে দেওয়া মৃত্যুর মত স্তব্ধতা।

৩. 'তুই দুঃস্বপ্ন দেখছিস', 'এখন-ও', 'হ্যাঁ, এখন-ও তুই ছেলেবেলার মত-ই দুঃস্বপ্ন দেখছিস, রূপকথার কিম্ভুত প্রাণীদের দেখছিস।'

এভাবে তারা আসলে সরে আসছিল স্বপ্নের দিকে, খুবই আস্তে আস্তে। তবে যথেষ্ট বিশ্বস্তভাবে।

ক্ষ্যাপা বাতাস এখন সূচের মুখ, আবিষ্কার করেছে হাবিজাবি ভাবনা, শূন্য নিয়ে ভাবনা, এইসব স্বর্গীয় জাল সে ছিঁড়ে ফেলছে। মানুষজনের ঘরগেরস্থি ও টুকটাক-ছিমছাম জিনিসের মধ্যে সে ঢুকে পড়েছে। তছনছ হয়ে যাওয়ার অনুভূতি, জোর, ভেঙে ফেলছে ঠুনকো জিনিসপত্র। টেবিলের ওপর থেকে কাচের গ্লাস-টা সে আছড়ে ভাঙল।

এরকম অবস্থায় কথা বলা, কথা বলায় জিভ, ঠোঁট, চোখ ও গালের চামড়া এবং পেশীতে যে ঝড় আছড়ে পড়ে তা মন্দ লাগছে না। এবং বুড়ির কথা মনে হচ্ছে, যেন ঐটুকু-ই গল্প, কে দিয়েছিল বুড়ি নামটা, বুড়ি নামের কত মেয়েকেই না আমরা চিনি। সমস্ত বুড়ি-ই কি জামসেদপুরের শিল্পনগরী থেকে ঐ রকম চর্বি সংগ্রহ করেছে।

'বড্ডো বকিস', 'কথা আর কথা', 'আর রিয়েলি এত লাউড', 'ধ্যাত', 'হয় নাকি', 'এভাবে হয় না', 'ঘষে-ঘষে একটু হয়ত এগিয়েছিস', 'স্টিল ইউ হ্যাভ টু কভার এ লং রুট', 'লং...রুট', 'কতখানি লং', 'আর কভার, মানে অতদিন বাঁচা, গুটি-গুটি এগিয়ে যাওয়া', 'বলছিস মাঝরাস্তায় মরে পড়ে থাকতে পারিস', 'নাথিং আনলাইকলি'।

গুটিগুটি এগিয়ে যাওয়া এভাবে নিজেই এতখানি গুটিয়ে আসতে থাকে, তুচ্ছ হয়ে যায়, যে ঐ শরীর, প্রবল ব্যক্তিত্বময় শরীর থেকে মুছে যেতে থাকে সেইসব ঐতিহাসিকতা যার মধ্যে মানুষের বিজয় উল্লাস ছিল। ড্রাম আর বাজছে না, হরিবোল অতিক্রম করা শঙ্খধ্বনি আর শোনা যাচ্ছে না। পিচের রাস্তা, ওভারহেড তার, কংক্রিটের সমাধিক্ষেত্রের কোথাও একবিন্দু মহান কিছু-নেই!

দোতলার বুড়ির পুতুলরা এখানে সেখানে যেভাবে পড়ে থাকত সেই দৃশ্যটা এখন দেখতে পাচ্ছি। মনে পড়ে যাচ্ছে এক পাতালপুরীর উপাখ্যান যেখানে মানুষজন একটি বিশেষ মুহূর্তে পাথর হয়ে গিয়েছিল। জীবনের মধ্যে, চলাফেরা, কাজকর্ম, মিথুন ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে, হঠাৎ, একমুহূর্তে তারা পাথর হয়ে যায় বলে, টুকরো-টুকরো দৃশ্যগুলি

দূর থেকে দেখলে মনে হত নগরী-টি প্রাণচঞ্চল, সেখানে জীবনের প্রকাশ সুচিত্রিত। সেই জাদুপ্রভাব তারা কাটিয়ে উঠেছিল একদিন, এই উপাখ্যানটি এত প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে, সেজন্য এরকম আশা-ও করতে চাইছি, একদিন আমরাও মুক্ত হব জাদুপ্রভাব থেকে। টুকরো দৃশ্যগুলিতে ছড়িয়ে থাকা আমাদের শরীর ও মন, মাথা ও ধড় একদিন জুড়ে নিতে পারব।

২. মন্দির ভাস্কর্য নিয়ে মানুষের গবেষণার কথা আমি শুনেছি, কোনার্ক ও খাজুরাহের মন্দির ঘিরে গড়ে তোলা নর-নারীদের আমি দেখতে পাই। কম পয়সা সম্বল করে সেই কষ্টের ঘোরাঘুরি এখনও আমার জীবনে নানাভাবে ফুলফল প্রসব করে চলেছে, যার খুব সামান্যই আমি ধরে রাখতে পারি।

যেমন পুনরাবৃত্তির বদলে পরিবর্তনের ব্যাপারটি...একটি শূন্যস্থান বা ক্ষেত্র ছিল, ঐ ক্ষেত্রটির শূন্যতা তারা অনুভব করেছিল। বুঝেছিল ঘোর বিস্মৃতিকে এবং সমস্ত শরীরকে ব্যবহার করে এমন কিছু সৃষ্টি করল, অস্তিত্ব দিল, আগে যার অস্তিত্ব ছিল না। এই সম্ভাবনায় মানুষ ল্যাংটো হয়ে নাচতে পারে, ভবিষ্যৎ তখন-ই ঘটে যায়নি, বর্তমানে দেয়াল তুলে দিতে পারেনি। অতীতের মানুষ, তাদের আঙুলের এই সূক্ষ্ম ও জটিল ব্যবহার, এই রহস্য বর্তমান পর্যন্ত ছুটে আসছে উন্মত্ত বাতাসে। বাতাস পেড়ে ফেলছে আমাদের।

যুদ্ধ, মিথুন ও উৎপাদনের মধ্যেই পাথরের পুতুলরা ফুরিয়ে যাচ্ছে না, তাদের কথা শেষ হয়ে যাচ্ছে না, তারা আর-ও কিছু বলে। ব্যাখ্যা করে। আর যেহেতু সেইসব কথা স্তব্ধতা গিলে ফেলেছে, আমরা শুধু ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই ঢং, ঢং, ঢং।

১. সংযোজন

'ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি...', 'আর', 'অপেক্ষা করি', 'আর', 'আর-ও ?' 'হ্যাঁ আর-ও', 'কী'...শহরটি রোদে ঝলসে যাচ্ছিল, ভ্রমণকারীদের কপালে মুখে ঘাম জন্মাচ্ছে, এইরকম কথা বলতে-বলতে তাদের মাথা শহরের ভিড়ে আন্দোলিত হচ্ছে। এই আন্দোলন, যেভাবে তাদের হাত নড়ছিল ডানার মত, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ঝড়ের উৎসে পৌঁছে গিয়েছি। বলতে লজ্জা হচ্ছে না যে কিছুটা আশা তলানির মত পেটের মধ্যে নড়ছে। আবার ভয় হচ্ছিল 'সম্ভাবনা' ও 'চেষ্টা' এই দুটি শব্দকে এতখানি টেনেছি, ছড়িয়ে দিয়েছি, আজ সমেত গত পনের কুড়ি দিন ধরে এই চলেছে, এরপর আর টিঁকে থাকা সম্ভব কি-না, ওরা ধকল সামলাতে পারবে তো। আবার এই কুড়িটা দিন পেরিয়ে যাওয়া, বেঁচে থাকা ও ঐ কুড়িদিন সময় লেখাটার মধ্যে ঢুকে পড়লেও, বেঁচে থাকা এবং লেখা, ভয়ঙ্কর-ভাবে লিখে চলা যদি 'নিজেকে' উসকে দিয়ে একজন যোদ্ধার স্মৃতি টেনে আনে, আবার পুরাণ গড়ে তোলে, তার থেকে হাস্যকর আর কী হতে পারে। পুরাণের ভূত ঘাড় থেকে নামানো কঠিন। রাস্তায় বাসের জন্য অপেক্ষা করা, মানুষের মুখ দেখা, আবেগে ভেঙে পড়া ও জুড়ে নেওয়া সম্ভব হবে কি-না, 'যাহোক', 'যাই হোক না কেন' বলে একবার ঝাঁপ দেওয়ার ইচ্ছে থাবা ছড়িয়ে দেয় ; সঙ্গে-সঙ্গে মনে হতে পারে, না এ হল মরণ ঝাঁপ। কে চায় মৃত্যুকূপ !

০. স্তব্ধতায় ফিরে আসি।

ওরা ফিরে এল ॥ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

সুরজিতের কথা

আমরা ফিরে এসেছি। বেশিদিন নয়। মাসখানেক হলো। ফিরে আসার স্বাদ কেমন, এখনো যেন ভালো করে বুঝতে পারছি না।

কখনো কখনো স্বপ্ন দেখছি। আবার জেলের দেওয়াল চারদিকে ঘিরে ধরছে। ঘুম ভেঙে দেখেছি, নিজের ঘরে পরিচিত বিছানায় শুয়ে আছি। পিতলের নটরাজের মূর্তি—কবে যেন দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়ে কেনা হয়েছিল—অপলক চোখ মেলে রাতের অন্ধকারকে দেখছে।

নতুন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগত বই কী। এমনও মনে হতো, আমি আসলে জেলে শুয়ে বাড়ির স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন ভাঙলে আবার সেই লৌহ কপাট। মনে পড়ত সেই চিনা দার্শনিকের কথা। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি একটি প্রজাপতি। পরে তাঁর সন্দেহ হতো, তিনি একজন প্রজাপতি, মানব জীবনের স্বপ্ন দেখছেন।

যা বলছিলাম। সব কিছুই কেমন অবাস্তব মনে হতো। আরো একটা কথা মনে হতো, আমি প্রায় পাঁচ বছর আকাশের মুখ দেখিনি। এর মধ্যে আমার চেনা পৃথিবী কতটা বদলে গেছে, হিসেব করার চেষ্টা করতাম। কেউ যদি মহাশূন্য থেকে ফিরে এসে দেখে মানুষের হিসেব অনুযায়ী হাজার হাজার বছর কেটে গেছে...

মন্টু সে কথাই বলছিল। সুরজিৎদা, মরা মানুষ যে আর ফিরে আসে না। এটা ভগবান ভালো বিধান দিয়েছেন।

আমি হেসে বলেছিলাম, তাহলে আজকাল ভগবান মানিস।

ভগবান না শয়তান, কে জানে। তবে নিয়মটা মন্দ নয়।

লোকে না মরলে পৃথিবীতে নতুন মানুষের আর জায়গা হবে না বলে।

সে তো আছেই। তাছাড়া মরা মানুষ ফিরে এলে দেখত সব আগের মতো চলছে। তার অভাবে কেউ বা কিছু বসে নেই।

আমি মন্টুর মনের কথা বুঝলাম। আমার নিজেরও কি একটু এ রকম মনে হয়নি! আমি কি আশা করেছিলাম, আমার বিহনে বাড়ির লোক কেঁদেকেটে অন্ধ হয়ে যাবে? মা'র কয়েকটা চুল পেকেছে। বাবার চোখের পাওয়ার বেড়েছে। এ ছাড়া খুব একটা বদল তো দেখতে পাচ্ছি না।

মোহানা অবশ্য বদলেছে। মোহানা, আমার ছোট বোন। কিন্তু ওর কথা ভাবব না, অন্তত এখন নয়। অথচ ওর কথাই সব চেয়ে আগে ভাবা দরকার।

মোহানা। আমার বুকের কাঁটা। দুঃখ, লজ্জা, অনুতাপ। না, অনুতাপ কেন। আমি কি ভুল করেছিলাম? আর কিছু করা কি সম্ভব ছিল?

কথা ঘোরাবার জন্য আমি বললাম, ও সব কথা ছেড়ে দাও। কয়েকদিন ভালো

করে খাও দাও, বিশ্রাম কর। তারপর কাজ শুরু করতে হবে।

কী কাজ করব ? বি এ-টা তো দেওয়া হলো না। বাবা বলছেন, ফের চেষ্টা করতে। এই বয়সে আবার শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে ইচ্ছা হয় না।

মন্টুর বয়স এখন তেইশের বেশি নয়। ও আমার সঙ্গে পাঁচ বছর সরকারের অতিথি হয়েছিল।

বেশ তো প্রাইভেটে পড়।

না, ইচ্ছে করে না। মেসোর একটা ভাল দোকান আছে। সেখানে বসতে বলছে। টয়লেট গুডসের দোকান।

তাই কর না।

শেষে সেন্ট পাউডার বেচব ?

আপাতত তাই কর না। বাড়িতে কিছু টাকা দেওয়াও দরকার। তারপর অন্য কাজ, সেতো আছেই।

কী কাজ ?

আমি একটু ভাবলাম। নতুন নয়। গত পাঁচ বছরের দীর্ঘ অবসরে সে কথাই ভেবেছি। আজ সাতাত্তরের মাঝামাঝি উত্তর যেন কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্তত আবছা রূপরেখা দেখা যাচ্ছে।

যে-দশককে মুক্তির দশক মনে করা হয়েছিল তা শেষ হতে বছর তিনেক বাকি। অত তাড়াহুড়ো করা যাবে না, বোঝাই যাচ্ছে। তা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যে মাটিতে লোকে পড়ে, ওঠে তাই ধরে।

মন্টু অপেক্ষা করছে। যথাসাধ্য ওর প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

নেতারা অনেকেই ছাড়া পেয়েছেন। অন্যরাও বোধ হয় পাবেন। বন্দিমুক্তি আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

তারপর ?

সবাই বার হলে একসঙ্গে বসতে হবে। নতুন করে দল গড়তে হবে।

তারপর ?

নতুন প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে।

একটা কাজের কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ।

কী ?

মন্টু আমার খুব কাছে এল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, অবনী গুহকে শেষ করতে হবে না !

আমি চমকে উঠলাম, যেন ভূত দেখে। এ ভূত আমার নিজেরই মনের। এই পাঁচ বছর ধরে বার বার আমিই কি এ স্বপ্ন দেখিনি ! লাল চোখে পাগলের মতো নিজের মনে বিড়বিড় করিনি ! অবনী গুহকে শেষ করতে হবে। শেষ করতে হবে। শেষ—

কিন্তু স্বপ্ন এক আর বাস্তব জীবন আলাদা। এখন মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে। নিজেকে সামলে নিয়ে দশ দিক ভাবতে হবে। একবার হঠকারিতা করে, বাম বিচ্যুতির ফাঁদে পড়ে আমরা অনেক মূল্য দিয়েছি। হয়ত আর একবার সুযোগ পেয়েছি। দ্বিতীয়বার এ ভুল করলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

এ সব যুক্তির কথা, তত্ত্বের কথা। বুকের ভেতরে একটা নেকড়ে ক্রমাগত আঁচড়ে যায়, যুক্তি দিয়ে তাকে বশ মানানো যায় না। অবনী গুহকে শেষ করতে হবে, শেষ—

আমার নিজের মনের ভূত মন্টুর মধ্যে দেখে আমি চমকে উঠলাম। ভয় পেলাম।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম পুলিসি অত্যাচারের পূর্ণ তদন্ত আর দোষীদের শাস্তি আমরা দাবি করব। সে নিয়ে আন্দোলন চালাব।

তুমি হাসালে, সুরজিৎদা। আন্দোলনে কিছু হবে? কোনোদিন হয়েছে? ব্রিটিশ আমল থেকে পুলিসের গায়ে কেউ আঁচড় দিয়েছে? না কি বামফ্রন্ট-রাজ এসেছে বলে তুমি হাতে স্বর্গ পেয়েছ?

না না, তা নয়। তবে গণ আন্দোলনের চাপ—

রেখে দাও তোমার গণ আন্দোলন। ওরা কী বলছে, কী বলবে জান না? আমরাও লোক মেরেছি। পুলিস মিলিটারির বিচার করতে গেলে আমাদেরও করতে হয়। ছাড়া পেয়েছি এই ঢের। যেন বেশি হৈ চৈ না করি।

আমরা কখনো কোনো মেয়েকে—

সে কথা ওরা শুনবে না। খুনের কথাটাই তুলবে।

আমরা ভুল করেছিলাম। তবু আমাদের ফেলা রক্ত আর ওদের হাতের রক্ত এক নয়। সে কথা সাধারণ মানুষ বুঝবে।

বুঝবে এমন লক্ষণ তো কই দেখা যাচ্ছে না। এই পাঁচ বছর সাধারণ মানুষ, তোমার আদরের জনগণ, কি করছে? খেয়েছে, ঘুমিয়েছে, হিন্দি সিনেমা দেখেছে, পুজোর মার্কেটিং করেছে। এখন আবার কলকাতায় নতুন টিভি হয়েছে, কয়েকটা বাড়িতে এসেছে, তা নিয়ে কী মাতামাতি। আমাদের নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। যদি আমরা সিনেমার হিরো হতাম, এক গুলিতে সব দুর্বৃত্ত মেরে রামরাজ্য কায়েম করতাম, তাহলে অন্যরকম হতো।

সত্যিকারের বিপ্লব সে রকম নয়। তাই সত্যিকারের বিপ্লবীর চেয়ে অমিতাভ-শত্রুঘন্ ওদের বেশি প্রিয়।

কথাটার মধ্যে একটা সত্যি আছে। যেটা অস্বীকার করা মানে চোখ বুজে থাকা। কিন্তু আর একটা সত্যিও তো আছে। মন্টু তা বুঝছে না কেন?

মন্টু, প্রেমচাঁদের কোনো লেখা পড়েছ?

আমি অত হিন্দি জানি না।

অনুবাদে?

বলছি তো, না। কেন, হঠাৎ প্রেমচাঁদ নিয়ে পড়লে কেন?

ওঁর একটা গল্প আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। ব্রিটিশ আমলের কথা। একজন স্বদেশি করে জেলে গেছে। তার স্ত্রী অনেক দুঃখকষ্ট সয়ে অপেক্ষা করে আছে। কবে তার স্বামী ফিরবে, লোকে তাকে শ্রদ্ধা, সম্মান জানাবে। যে দিন লোকটি বাড়ি ফিরল, সব ফাঁকা, একটা কাকও তাকে দেখতে আসেনি।

সুরজিৎদা, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না। বা ইচ্ছে করে বুঝছ না। আমি কি ফুলের মালা, হাততালি চেয়েছি? মন্ত্রী বা নেতা হব বলেছি? ও সব আমার ধাতে সয় না। পায়ে ধরলেও হতাম না। আমার নাম কেউ না জানুক, সেটাই ভালো। কিন্তু আমরা যা করেছি, করতে চেয়েছি, তার তো দাম দেবে। কালোবাজারে টাকা করলে এর চেয়ে বেশি কদর হতো।

দাম দেয়নি, বলছ কেন? লোকের সহানুভূতি না থাকলে আমরা ছাড়া পেতাম না। এখনো দেখ, বন্দিমুক্তির মিটিং মিছিলে কত লোক হয়।

ছাই হয়। ও যেন ভিখারিকে এক মুঠো ভাত ছুঁড়ে দেওয়া।

—তুমি কী আশা করেছিলে, জনগণ বাস্তিলের মতো জেল ভেঙে আমাদের

ছাড়িয়ে আনবে। আমরা ওদের এতটা জাগাতে পারিনি। সে আমাদেরই দোষ। এখন নতুন করে—

রেখে দাও ও সব বড় বড কথা। আমি জানতে চাই, অবনী গুহকে কবে শেষ করবে?

একা ওকে শেষ করলে হবে?

না, আরো অনেকে আছে। তবে ওকে দিয়ে শুভ কাজ শুরু হোক।

মন্টুর সঙ্গে এখন তর্ক করা বৃথা। একটু শান্ত হোক। আর আমিও বেশিক্ষণ হয়তো মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারব না। বুকের মধ্যে সেই নেকড়েটা আঁচড়াচ্ছে। 'অবনী গুহকে শেষ—'

—মন্টু এখন বাড়ি যাও। বেলা হলো। পরে এ নিয়ে কথা হবে।

মন্টু চলে গেল। গুনগুন করতে করতে গেল, 'বল রে হিংস্র বন্য বীর, দুঃশাসনের চাই রুধির।'

বাবা বসার ঘরে বসে আছেন। নিজের মনে বই পড়ছেন। আমি এখন কিছুক্ষণ ওঁর কাছে বসতে পারি, দুটো কথা বলতে পারি। ফেরার পর বাবার সঙ্গে কটা কথা বলেছি? আগেই বা কটা বলতাম?

আশ্চর্য আমার বাবা। এক মনে কাজ করে গেছেন। অবসর সময় বই পড়েছেন। মাস মাইনেটা আমার মার হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া সংসারের কোনো ব্যাপারে মাথা গলাননি। যেন পেয়িং গেস্ট। মা দুঃখ করে বলতেন, সংসারের দিকে একটু নজর নেই। মায়া নেই। এমন মানুষের বিয়ে-থা করা কেন?

বলতেন, কিন্তু খুব মন থেকে বলতেন না। সেটা আমরা একটু বড় হয়েই বুঝেছিলাম। বাবা পুরোপুরি কর্তা হয়ে উঠলে স্ত্রীর গৃহিণীত্ব খর্ব হতো। তার চেয়ে এই ভালো। অনেকটা সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির মতো বাবা-মার ছত্রছায়ায় মানুষ হয়েছি আমি আর মোহানা। কে জানে, আমাদের চরিত্রে এব ছাপ পড়েছে কি না। আমি হাই স্কুলে আর্টস নিয়েছিলাম, কলেজে ইতিহাসে অনার্স। বাবা কিছুই বলেননি। মা গায়ে পড়ে বাবাকে বলেছিলেন, মন খারাপ কর না।

মন খারাপ করব কেন?

মানে, আজকাল তো সব ভালো ছেলে সায়েন্সের দিকে যায়। তেমন কোনো—

তাতে কী হয়েছে?

খোকা পরে আই, এ, এস, কিংবা ব্যাঙ্ক অফিসার হতে পারে। আর যদি পড়াতে চায়—মনে হয় ওর সে দিকে ঝোঁক—আজকাল কলেজ-টিচাররা মন্দ মাইনে পায় না।

দেখা যাক।

বাবা আর কিছু বলেননি। মার কথা ফলে গেছে। ভাগ্যক্রমে—তখন অবশ্য সে সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি—জোয়ারে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে এম. এ.-টা পাশ করেছিলাম আর খুব খারাপও করিনি। বেরিয়ে এসে পাড়ারই একটা কলেজে কাজ পেয়ে গেছি। আরো অনেকের মতো একেবারে ছিন্নমূল হইনি।

আমি কি মোহানার কথা ভাবছি না। মোহানা বেঁচে আছে। হাত-পা কিছুই ভাঙেনি। বরং এই পাঁচ বছরে আরো সুন্দরী হয়েছে। কিন্তু ও কি আগের মতো আছে?

বাবার কথায় ফিরে আসি। আরো পরে আমি যে পথ ধরলাম, যে ঝড়ের সওয়ার হলাম (নাকি খড়কুটোর মতো উড়ে গেলাম) তার বিষয়ে বাবা সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন।

বাধাও দেননি। উৎসাহও না। কোনো প্রশ্ন করেননি। ভাবখানা যেন, তোমার ব্যাপার তুমি বোঝ। আমি নাক গলানোর কে!

আমি ধরা পড়ার পর মার মতো বাবা হৈ চৈ কান্নাকাটি করেননি। যা করা দরকার বা সম্ভব, তা সবই করেছেন। জেলে নিয়মিত দেখতে গেছেন। দু'একটি কুশল প্রশ্ন করে চলে এসেছেন।

মোহানা? না, মোহানা সম্বন্ধেও বাবা আমাকে কিছু বলেননি। অভিযোগ বা সান্ত্বনা, কিছুই না। মোহানা যে বাবার মেয়ে, আমার বোন, তার জীবনে একটা বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আর সে জন্য পরোক্ষে আমিই দায়ী—এ সব যেন বাবার চেতনার উপর কোনো ছাপই ফেলেনি।

বাবা আমার বিষয় কি ভাবেন, বা আদৌ কিছু ভাবেন কি না, আমি জানি না। আমার এক বন্ধুর জন্মের কয়েক মাস আগে তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। ও মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলত, আমার বাবাকে কখনো চিনলাম না। আমিও সে কথা বলতে পারি।

মোহানা কি ভাবে? মোহানা কি আমাকে দোষ দেয়?

বাড়িতে বসে থাকলে এ সব এলোমেলো চিন্তা মাথায় চেপে বসবে। অতনুদার ওখান থেকে ঘুরে আসি। কাজও আছে।

মোহানার কথা

আমি জানি, দাদা আমার কথা ভাবছে। আমি বুঝতে পারি। কেউ আমাকে নিয়ে ভাবলে আমার মনে বেজায় ঘা লাগে। জেলের পাগলা ঘন্টির মতো ঘণ্টা বেজে ওঠে।

এটাই আমার সব চেয়ে খারাপ লাগে। ইচ্ছে করে দুনিয়াসুদ্ধ লোককে ডেকে বলি, দোহাই তোমাদের, নিজেদের চরকায় তেল দাও। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি মরে যাইনি, পাগল হয়ে যাইনি, কেরোসিন ঢেলে, জলে ডুবে বা বিষ খেয়ে, নীরস বা শীতল কোনো ভাবে, লজ্জার চিহ্ন এই দেহটাকে শেষ করে দিইনি। বেশ খাওয়া-দাওয়া করছি। ভালোই আছি। রাতেও ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

মাঝে মাঝে হয়তো স্বপ্নে দেখে চমকে উঠি। শিউরে উঠে জাগি। তাতে কি? স্বপ্নের জন্য কারোকে কৈফিয়ত দিতে হয় না। স্বপ্ন কে-ই বা দেখে না।

আমি ভালোই আছি, বেশ আছি। আমাকে নিয়ে না ভাবলেই আমি বেঁচে যাই। বাবা, মা, দাদা, গণতান্ত্রিক অধিকার সমিতি, নারী মুক্তি সমিতি কেউ যেন আমাকে ভাবনার তির দিয়ে না বেঁধে। তাহলেই পাখির মতো আমি ডানা মেলে উড়ে যেতে পারব অনেক উপরে।

তবে একজন আমার বিষয় ভাবলে কি আমার খুব খারাপ লাগবে? পুলিস অফিসার, সাব ইনস্পেক্টর, কিন্তু চেহারা আর নাম ভারি মিষ্টি। পুলিসের মতো মনে হয় না। নাম—

সে কি আমার কথা ভাবছে? কে জানে? কিন্তু আমি তার কথা ভাবছি। চুপচাপ ভাবছি অবশ্য—জোরে জোরে ভাবার উপায় নেই।

অনেকে আমাকে নিয়ে ভাবছে। তবে সবার ভাবনা এক নয়। বাবা কি ভাবছেন, জানি না। বাবার ভাবনা আমরা কখনো আন্দাজ করতে পারি না। পারবও না। মা প্রথম প্রথম কাঁদতেন, হাহুতাশ করতেন। তবে জোরে নয়। আমার যা হয়েছিল, কোনো মেয়ের তা হলে বাড়ির লোক হৈ চৈ করে না। দোষীকে সাজা দেওয়ার চেষ্টা করে। সম্ভব হলে, ব্যাপারটা গোপন রাখে। আমার বেলায় গোপন রাখা সম্ভব হয়নি।

বাবাকে মা চুপি চুপি বলেছিলেন, আমি পাশের ঘর থেকে শুনেছিলাম, এ নিয়ে পাঁচ কান কোর না।

বাবাকে এ কথা অবশ্য বলা বাহুল্য। বাবা কখনো বিশেষ কারণ ছাড়া কথা বলেন না। একটা কথায় কাজ চললে দুটো কথা বলতে ভালোবাসেন না। সেই বাবা নিজের মেয়ের এই ব্যাপার নিয়ে জনে জনে বলে বেড়াবেন, এমন ভাবার কারণ নেই।

বাবা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, 'না।'

—বোঝ তো, কুমারী মেয়ে। এমন হলে বাড়ির লোক পুলিসে খবর দেয় না।

—আমরা অবশ্য এমনিতেও পুলিসে খবর দিতাম না।

মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, তা বটে। রক্ষকই ভক্ষক হয়েছে। কী যে দিনকাল পড়ল। খোকারই বা কী দরকার পড়েছিল ঐ সর্বনেশে দলে যাওয়ার।

বাবা কিছু বললেন না। মাও একটু পরে থেমে গেলেন। পুরো ঘটনাটা যেন ভুলে যেতে চাইলেন। বৃষ্টিতে বড়ি শুকোবে না, ঠিকে ঝি কামাই করছে, এই সব নিয়ে বেশি চিন্তা শুরু করলেন।

আশ্চর্য! কী তুচ্ছ, কী সামান্য কথা নিয়ে মানুষ সময় নষ্ট করে। হয়ত বড় জিনিসের মুখোমুখি হতে ভয় পায় বলেই।

যা বলছিলাম, আমার ঘটনাটা পুরোপুরি গোপন রাখা যায়নি। কাগজে বেরিয়েছিল, পুলিস যথারীতি প্রতিবাদ করেছিল। তবে সত্যি কথা বলতে কী, খুব একটা হৈ চৈ হয়নি। সারা দেশে যখন আগুন জ্বলছে তখন এক টুকরো ছাই নিয়ে কে মাথা ঘামায়। যেটুকু সহানুভূতি ছিল, তা লাভ করেছিল ওপার বাংলার খান সেনাদের হাতে নিগৃহীতা মেয়েরা।

বছর পাঁচেক বেশ চুপচাপ ছিলাম। আগুন ক্রমে নিভে গেল। দাদা জেলে। আমি বাড়িতে বসে বি এ ও বি এড, ইত্যাদি পরীক্ষা পাস করলাম। বিশেষ বেরোই না। কারোর সঙ্গে খুব একটা মিশি না। ইচ্ছা আছে কোনো স্কুলে চাকরি নেব, কিন্তু তেমন চেষ্টা করি না। ভয় করে। যদি ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। আমাকে দেখিয়ে ফিসফিস করে বলে, জানিস, অমুক মিস—

হয়ত কয়েকজন সরল, সুকুমারমতি বালিকা বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করবে, অমুক মিসের কি হয়েছে।

মা মুখ ঘুরিয়ে বলবেন, কিছু হয়নি। এ সব বাজে কথা ছেড়ে পড়াশোনা কর।

মেয়ে অন্য ঘরে গেছে নিচু গলায় মেয়ের বাবাকে বলবেন, অমুককে স্কুলে না দিলেই হতো। জানি, বেচারার দোষ নেই। তবু ছোট মেয়েদের ব্যাপার—

হয়ত আমি বেশি কল্পনা করছি। এত সব হবে না। মানুষ বেশি সভ্য, বেশি ভালো। তাদের বিবেচনা আছে, দয়া-মায়া আছে। তবু আমি সাহস পাই না। বাবা, মা, দাদা, এই রকম একেবারে কয়েকজন আপন জনকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতে বাধে। মানুষকে আমার বড় ভয়।

হবেই বা না কেন? সে সময়ে কে আমাকে বাঁচিয়েছিল? তবে একজন—তাকে আমি পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারি না। কেন পারি না? তার চেহারা মিষ্টি, নাম মিষ্টি বলে? না কি সে আমাকে বাঁচিয়েছিল বলে? অবশ্য একেবারে বাঁচাতে পারেনি, যাকে চরম সর্বনাশ বলা হয়, তা আগেই হয়ে গিয়েছিল। তবু তো সে কিছুটা করেছিল। না হলে আরো কি হতো কে জানে।

তাছাড়া যেটুকু যা করেছিল, ঝুঁকি নিয়ে করেছিল। অবনী গুহ ওর উর্ধ্বতন।

তবু ঐ শান্ত নম্র তরুণটির মধ্যে কি এক জাদু ছিল। অবনী মাথা নুইয়েছিল শিকড ছোঁয়ানো সাপের মতো।

দাদা অবশ্য এ সব বিশ্বাস করে না। তার মতে এ সব পুলিসি চাল। ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসছে। একজন অত্যাচার করে, আর একজন বিপদভঞ্জন মধুসূদন সেজে বন্দিকে বাঁচায়, তারপর তার বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা কাজে লাগায়। কেবল গায়ের জোরে সব হয় না। একটু-আধটু বুদ্ধি চাই। আমার মতো বোকারা এমন ফাঁদে পড়ে।

কিন্তু আমি কি সত্যি ফাঁদে পড়েছি ? পরাগ—ওর নাম পরাগ, মেয়েদের মতো, পুলিস অফিসার মনে হয় না, আমাকে কি ভাবে কাজে লাগিয়েছে ? আমি কোন প্রশ্নের জবাব দিইনি। আগেও না, পরেও না। আর তেমন কিছু জানতামও না। পুলিস বাড়ি তছনছ করে দাদাকে না পেয়ে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, নিছক আক্রোশের বশে বা খবরের আশায়। কিন্তু আমি তেমন কিছুই জানতাম না। দাদা কোথায়, তাও না। প্রায় ছ মাস দাদা বাড়ি আসেনি, খবরও পাঠায়নি।

জানলে কি আমি বলতাম ? কে জানে। নিজের উপর আমার বিশ্বাস নেই। আমি ঝাঁসির রানি নই। অন্ধ্রের শহিদ, কমরেড নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি বা কেরলের অজিতার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। কেউ কেউ আমাকে বীরাঙ্গনা বা শহিদ বলে। শুনে হাসি পায়। দুঃখও হয়। আসলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। আমার তাই হয়েছিল। আমার নিজের ভূমিকা না বলারই মতো।

পরাগ আমাকে কাজে লাগায়নি। তখনো না, পরেও না। ওই ঘটনার কদিন পরে (আশ্চর্য! ঘটনাটা আমার এখন ভালো করে মনে নেই। অন্যরা দিনরাত এ নিয়ে না ভাবলে আমি হয়ত ভুলেই যেতাম) আমাকে কেন জানি না ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বিনা শর্তে। পরাগ আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। কালো ভ্যানে নয়, নিজের দুধ রঙা অ্যামব্যাসাডর গাড়িতে। পরে শুনেছিলাম, পরাগ বেশ বড়লোকের ছেলে। অনেকটা শখ করে পুলিসের চাকরিতে এসেছে।

বাবা দরজা খুলেছিলেন। মা আমাকে টেনে ভেতরে নিযে গিয়েছিলেন। কাঁদতে গিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়েছিলেন। পরাগকে কেউ বসতে বলেনি—তা সম্ভব ছিল না। বরং আশঙ্কার দৃষ্টিতে আমরা ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। আবার কি হবে!

পরাগ কী যেন বলতে গিয়ে বলেনি। একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। চলে গিয়েছিল মাথা হেঁট করে।

তারপর বছর পাঁচেক হযে গেছে। পরাগ আর আমার সঙ্গে দেখা করেনি। তবে চিঠি লিখেছে। অজস্র চিঠি। ঠিক প্রেমপত্র বলা যায় কি না জানি না। শ্রদ্ধা, সান্ত্বনা, দুঃখের চিঠি। আমি একটারও জাবাব দিইনি। দেখাও করিনি পরাগের সঙ্গে। আহত জন্তু গুহা থেকে বার হয় না।

কিন্তু পরাগ যে আমার কথা ভাবে, এটা কি খুব খারাপ লাগে আমার ? ওর চিঠি না-ছিড়ে পড়ি কেন ? পরাগ যদি আজ বিয়ে করে, চিঠি বন্ধ হয়ে যায়, আমার কেমন লাগবে ?

দাদা ফিরে এসেছে। দেশেও জমানা বদল হয়েছে। একটা নতুন কিছু বোধ হয় আমার জীবনেও ঘটবে। পরাগ কি আর উত্তর না পাওয়া চিঠি লিখে যাবে ?

সুরজিতের কথা

অতনুদা আর আমি একসঙ্গেই জেলে গিয়েছিলাম। তবে ও আমার বছর তিনেক আগেই

ছাড়া পেয়েছিল। কলেজে পড়ানোর পুরনো কাজ ফিরে পেতে অসুবিধা হয়নি অতনুদার। তারপর থেকে সংগঠন ও পড়াশোনা নিয়ে আছে। মানে সে অবস্থায় যতটা কাজ সম্ভব ছিল।

অতনুদার বাড়ি গিয়ে দেখলাম, ও চান করছে। সুতপাদি আমাকে বসতে বলল। চা দিল। সুতপাদি অতনুদার স্ত্রী : বিয়ের আগে থেকে দিদি বলে আর বৌদিতে প্রমোশন দিইনি। সুতপাদি স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছিল, তবে ওর মুখ একটু ভার মনে হলো। কেমন যেন অন্যমনস্কও।

আমি কারণ আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। রাজনীতির ক্ষেত্রে জোয়ার আসবে, অতনুদা আরো ব্যস্ত হয়ে উঠবে, বাড়িতে অত সময় দিতে পারবে না—এই জন্যই কি? না, তা নয়। খুব সক্রিয় কর্মী না হলেও সুতপাদি চিরকাল আমাদেরই দিকে।

সুতপাদি অবশ্য কোনোদিনই খুব হাসিখুশি হৈ চৈ করা মেয়ে নয়। শান্ত, একটু গম্ভীর, নিজের মধ্যে ডুবে থাকা মানুষ। আড্ডার চেয়ে সিরিয়াস আলোচনা বেশি পছন্দ করে। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করে না, তবে দূরত্বের আড়ালে একটা সহজ আন্তরিকতা আছে যা মন টানে।

আমি দুএকবার ভেবেছি, সুতপাদিকে মোহানার কথা বলব। ওর পারমর্শ নেব। এমন কি মোহানাকে সুতপাদির কাছে নিয়ে আসতে পারি। মেয়েদের ব্যাপারে মেয়েরা ভালো বোঝে। বিশেষ করে সুতপাদির মতো ধীর স্থির বিচক্ষণ অভিজ্ঞ মহিলা। কিন্তু বলিনি। কেমন যেন সঙ্কোচ হয়েছে। অনেকটা জামার নিচে দগদগে ঘা লুকিয়ে রাখবার মতো।

মন্টু ওই দুর্ঘটনার একটা দিক ভাবছে। আমার বুকের ভেতর ভূতটাও সেই তালে রণদামামা বাজাচ্ছে। অবনী গুহকে শেষ কর। শেষ কর। আমি জোর করে, যুক্তি দিয়ে, তাকে দমিয়ে রেখেছি। এতদিন প্রতিশোধ নেওয়ার পথ কী, সে কথাই ভেবেছি। সাধারণ মানুষের দরবারে দাবি রাখা, সবার সামনে বিচার আর শাস্তি, না একটা জন্তুর কালো রক্তে নিজের হাত রাঙানো। এখন আর একটা দিক ভাবছি। মোহানার দিকটা। দুঃশাসনের রক্তে বেণী বাঁধলেই কি ও সুস্থ হবে, স্বাভাবিক হবে। সুখের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, সুখের পাখি কজনের খাঁচায় ধরা দেয়!

মোহানাকে নিয়েও আমি কতটুকুই বা ভেবেছি। ও আমার ছোট বোন, ছেলেবেলার সাথী, অনুগত ছাত্রী। বলতে গেলে, আমারই হাতে গড়ে তোলা। এখন পর্যন্ত তার আলাদা জীবন হয়নি। এমন কি পাঁচ বছর জেলে থেকেও আমি ওকে ঘিরে রেখেছিলাম। আমিও কাউকে ওর চেয়ে বেশি ভালোবাসি না। ওকে নিজের থেকে আলাদা করে দেখতাম না। এখন যেন দেখছি। ওর ভেতরকার জ্বালার ভাগ আমি নিতে পারি না। পুরোপুরি বুঝতেও পারি না। এই ক্ষত মোহানার একান্ত আপন জিনিস। সাপের মাথার মণি।

অতনুদা বোধ হয় চান শেষ করে শেভ করছে। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে ওর গুনগুন করে গান। 'মরিয়া হইব নন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা।'

অতনুদা বৈষ্ণব বাড়ির ছেলে। ধর্ম না মানলেও বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রতি ওর গভীর আকর্ষণ। গঙ্গা যমুনার মতো রসের নদী বয়ে গেছে এ দেশের প্রাণের মধ্যে দিয়ে, দেবদ্রোহী কালা পাহাড়রাও তাকে অস্বীকার করতে পারে না। পুরনোর মধ্যে দিয়ে আমরা নতুনকে ভালবাসি।

কিন্তু অতনুদার রাধা কে? সুতপাদি। না।

অতনুদা বেরিয়ে এল, এই যে, সুরজিৎ। অনেকক্ষণ বসে আছ না কী ?

না, না। এই এখনি এলাম।

আর তোমাদের অপেক্ষা করবার অভ্যাস আছে। এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি, নিশ্চয়।

আমি হাসলাম। অতনুদা আমার বছর তিনেক আগে ছাড়া পেয়েছিল। সেই ইঙ্গিতই কি করছে ? কিন্তু অতনুদার লজ্জা পাওয়ার কী আছে। ওকে আগে ছেড়েছিল নেহাত ঘটনাচক্রে। কোনো শর্ত মেনে তো অতনুদা মুক্তি পায়নি।

আর মুক্তি কি এমনই লোভনীয় ? চার দেওয়ালের মধ্যে ছটফট করতে করতে আমি তাই-ই ভাবতাম। মুক্তির জন্য আমি একটা হাত, পা, চোখ বা জীবনের পাঁচ বছর দিতে রাজি ছিলাম। কিন্তু মুক্তির অনেক দায়িত্ব।

শেষ কথাটা জোরে বলে ফেলেছিলাম। অতনুদা হাসল।

তা বটে। শ্বশুরবাড়িতে একরকম আরামে ছিলাম। কিছু করার নেই, সিদ্ধান্ত নেবার নেই। পথ বেছে নিতে হয় না, কারণ সব পথ বন্ধ।

এবার তো একটা কিছু করতে হবে।

হ্যাঁ আস্তে আস্তে কথাবার্তা শুরু হবে। ইউনিটি গড়া এখন প্রথম কাজ।

কী হবে মনে হয় ?

খুব একটা তো বাধা দেখছি না। বড় রকম ইডিওলজিকাল ডিফারেন্স নেই। কয়েকটা ট্যাকটিকাল প্রশ্নে পার্থক্য অতীতের স্মৃতি, পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ, এই সব। কাটিয়ে ওঠা যাবে, বোধ হয়।

গেলেই ভালো। সাধারণ মানুষ তাই চায়।

ঠিক বলেছ। পশ্চিমবঙ্গে একটা লেফট ওয়েভ এসেছে। সম্ভবত বিহার আর অন্ধ্রেও। বামফ্রন্ট এখানে সেই জোরে জিতেছে। কিন্তু ঝড়ের সওয়ার হতে পারবে না। মাঝপথে উড়ে যাবে ঝরা পাতার মতো। তার সুযোগ নিতে পারবে তৃতীয় শিবির, যদি অবশ্য একজোট হয়। আমরা আলোচনা করছি। কালই দুজন অন্ধ্রের কমরেডের সঙ্গে দেখা হবার কথা। আর বন্দিমুক্তি আন্দোলন, পুলিসি অত্যাচারের তদন্ত দাবি, এ সব তো আছেই।

শেষ কথাতে আমি কেমন চমকে উঠলাম। আমার মধ্যে সেই নেকড়েটা ফের আঁচড়াতে লাগল। মন্টুকে বলা কথার প্রতিধ্বনি করলাম।

তাকে কিছু লাভ হবে ?

অতনুদা একটু আশ্চর্য হলো।

কী ? পার্টির ঐক্য ?

না, আমি বলছিলাম পুলিসের বিরুদ্ধে সত্যিই ওরা কিছু করবে ? আমাদের এই বামফ্রন্ট ?

নাও করতে পারে। জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। তবে সাধারণ মানুষ সচেতন হবে। সেটাই বড় লাভ।

আমি চুপ করে রইলাম। আমি নিজেও মন্টুকে এ কথা বলেছিলাম। কিন্তু এখন আমার বুকের নেকড়েটা শান্ত হবে না। অবনী গুহ যদি বহাল তবিয়তে থাকে, চাকরি করে, তবে জনচেতনা কী ফানুস ওড়াবে ?

অতনুদা বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝতে পারল। একটু চুপ করে বলল, মোহানাকে কেমন দেখছ ?

বাইবে থেকে তো কিছু বোঝা যায না। কিন্তু সব সময যেন ভযে ভযে থাকে। বাইবে বেবোয না, প্রায কাবোব সঙ্গে মেশে না। কেবল পড়ে আব প্রাইভেটে পবীক্ষা দেয। সে সবে অবশ্য ভালোই কবেছে। কিন্তু এ ভাবে কত দিন চলবে।

হুঁ, চিন্তাব কথা। একটা শক্ত মানসিক অসুখ হযে থাকা অসম্ভব নয। অনেক সময বাইবে থেকে বোঝা যায না, সাইকিযাট্রিস্ট দেখাবে? বল তো ব্যবস্থা কবি।

বলেছিলাম। মোহানা নাবাজ।

কী বলল?

দুব, আমাব কিছু হযনি। জোব কবতেও সাহস হয না।

খানিকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে বইলাম। কাজেব কথা বলতে এসেছিলাম, কিন্তু দানা বাঁধছে না। অতনুদাব মনও যেন কোন সুদূব পুবীতে পাড়ি দিযেছে। খানিকক্ষণ পব সেই প্রথম কথা বলল।

লড়াইযেব জন্য অনেক দাম দিতে হয। অঙ্ক কষে সব বোঝা যায না। জীবন দিযেও নয। আমি একটু আগে ঝড়েব কথা বলছিলাম। কিন্তু সবাই ঝড়েব বেগ সইতে পাবে না, বেসামাল এলোমেলো হযে যায।

আমি বুঝতে পাবলাম। অতনুদা কাব কথা বলছে। কিছু বললাম না। আগে কখনো এ নিযে ওকে কথা বলতে শুনিনি। আমাব পক্ষে মোহানা যেমন এক গোপন জ্বালা, বুক আঁচড়ানো খাঁচা বন্ধ নেকড়ে, তেমনি অতনুদাব পক্ষেও। যদিও দুটো ব্যাপাব ঠিক তুলনীয নয। বেশমিদি .

একসময ঠিক ছিল সুতপাদি নয, বেশমিদি অতনুদাব জীবনসঙ্গিনী হবে। বেশমিদি। কত দিন ওকে দেখিনি, তবে ও ভোলাব মতো মেযে নয। আমাদেব সেইসব দিনেব ঝড়েব আকাশে বেশমিদি ছিল বিদ্যুৎবেখা। সুতপাদিব আমি কম ভক্ত নই, কিন্তু বেশমিদি ছিল অন্যবকম। সুতপাদি পুকুবেব জল, শান্ত, গভীব। বেশমিদি ছিল উজ্জ্বল, প্রাণ মাতানো ঝর্না, তাব উপব বোদ ঝলমল গতিব ছন্দে বেজে উঠত সুব।

না, বেশমিদিকে পুলিস মিলিটাবি ধবে নিযে যাযনি। তা হলেও একবকম সান্ত্বনা ছিল। বিপ্লবী জীবনে এসব ঝুঁকি আসবেই। এ ক্ষেত্রে নিজেব ঘবেব ঢেঁকি কুমিব হযে কামড়েছিল। গলাব মালা পবিণত হযেছিল কালসাপে। কিছুদিন আমাদেব আব এক কমবেড, অতনুদাব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তবুণদা বেশিমদিব সঙ্গে এক শেলটাবে ছিল। সেই ছিনিযে নিযেছিল বেশমিকে। কে জানে, কতটা জোব কবে আব কতটা মোহেব জাল বুনে, দুর্বলতাব সুযোগ নিযে। দুটোব মধ্যে সীমাবেখাই বা কোথায।

যাই হোক, বেশমিদি আব ফিবে আসেনি বা আসতে পাবেনি। তবুণদাকেই বিযে কবেছিল। আমাদেব সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই অনেকদিন। তবে খবব পেযেছি, সে বিযে সুখেব হযনি।

অতনুদা সুতপাদিকে বিযে কবে সুখী হযেছে, কিন্তু সে সুখেব গোলাপে কি কোনো কাঁটা নেই? আব সুতপাদিব কি দুঃখ নেই সে দিনেব অতনুদাব জন্য, যে অতনুদা তাব ছিল না কখনো তাব হবে না? অতীতকে ফিবে পাওযা যায না, মুছে ফেলাও নয।

আমবা অনেকক্ষণ চুপ কবে বসে বইলাম। না-বলা কথাব ঝাঁক কালো প্রজাপতিব মতো উড়তে লাগল চাবদিকে। আমবা নতুন পথে যাত্রাব-কথা ভাবছি। কিন্তু পুবনোব মাশুল শেষ হতে চায না।

মোহানার কথা

দাদা আমাকে বাইরে না বের করে ছাড়ল না। ধমক দিয়ে বলল, দিনরাত অন্ধকারে বসে থাকলে পেঁচা বা বাদুড় হয়ে যাবি। একটু চোখ মেলে পৃথিবীর দিকে তাকা।

মাকেও অনুযোগ করে বলল, তুমিও তো ওকে একটু বলতে পার। বাড়ির মধ্যে বন্ধ করে মেরে ফেলবে নাকি মেয়েটাকে।

মাকেই বলেছিল। বাবাকে কিছু বলা, সংসারের কোনো কিছুর জন্য দায়ী করা বৃথা। তা আমরা জানি।

মা বিরস মুখে বললেন, আমি কী ওকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছি? আমার কথা কে শোনে। শুনলে সংসারের এই দশা হয়?

এ কথা সত্যি, মা আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেননি। বরং ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে আমার ব্যাপারে অনেকটা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আগে বেশ কড়া নজর রাখতেন। বাবাকে একবার বলেছিলেন, যাই বল বাপু, হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পরই আমি মনুর বিয়ে দেব। হাজার হোক, ও মেয়ে। কখন কি করে বসে ঠিক নেই। ওর সিঁথিতে সিঁদুর না দিয়ে আমার শান্তি নেই।

বাবা বিশেষ কিছু বলেননি। কখনো বলেন না। কেবল মৃদু আপত্তি করেছিলেন, মনু তো লেখাপড়ায় ভালো।

বিয়ের পর পড়া যায় না? আর শেষে তো সেই বিয়েই দিতে হবে।

আমার অবশ্য বিয়ে হয়নি। দাদার প্রবল আপত্তি ছিল। তা ছাড়া অন্তত গ্র্যাজুয়েট না হলে যে আজকাল ভালো পাত্র পাওয়া যায় না, তা মাও স্বীকার করেছিলেন। পরে দুঃখ করে বলেন, তখন আমার কথা শুনলে এই সর্বনাশ হতো না।

মা সবসময় বলেন, তাঁর কথা শুনে চললে সংসার সোনায় বাঁধানো হতো। আমরা উত্তর দিই না। ঐ ঘটনার পর মা আর বিয়ের কথা তুলতে সাহস করেননি। কেবল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর একবার বলেছিলেন, শুনছি, ওপার বাংলায় খান সেনাদের হাতে নষ্ট হয়ে যাওয়া মেয়েদের অনেকে বিয়ে করছে। যদি—

বাবা উত্তর দেননি। কথাটা সেখানেই চাপা পড়ে গিয়েছিল। আমার মনে কোথায় যেন ভুলে যাওয়া সুর বেজে উঠেছিল। অনেকদিন আগে, এ সবের আগে, আমার এক মাসতুতো দিদির বিয়েতে গিয়েছিলাম। এখন কি আর কোনো বিয়েতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব। শুভ কাজে না কি বিধবার মুখ দেখা অলক্ষণ। আমার মুখ তাহলে কি। আমি কুমারী, সধবা, বিধবা কোনটাই নই। আমি কি?

তবু সে দিনের সেই বিয়ের কথা মনে পড়ল। পুরুত মশাই বেশ আধুনিক ছিলেন। পণ্ডিত বটে। সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন, শ্রোতাদের সুবিধার জন্য। মাঝে মাঝে টিকা টিপ্পনীও দিচ্ছিলেন।—শুনুন, বর কনেকে কি বলছে। তোমার কুমারী জীবনের সব লজ্জা, গ্লানি, পাপ আমি দূর করলাম। সব আমি নিজে গ্রহণ করলাম। এই ছিল সে যুগের আদর্শ। আর এখন? বউ খালি বরকে বলে আমাকে গয়না দাও, সিনেমা দেখাও।

আমরা হেসে উঠেছিলাম। দুই যুগের তুলনায় মুখর হয়েছিলাম। আহা, সে যুগে যেন গয়না ছিল না। সিনেমা না থাক, আমোদ-প্রমোদ ছিল না। সবাই দিনরাত তপস্যা করত।

এখন আমার সে কথা মনে পড়ছে। সত্যিই কি কেউ তেমন ভাবে আমার কাছে আসবে? তার আলোর দীপ্তিতে আমার অপরাজিতা আবরণ ঝরিয়ে সূর্যমুখীর সোনা

ফলাবে। সে কি আমার হাত ধরে বলবে, তোমার কুমারী জীবনের সব গ্লানি, লজ্জা, পাপ, তাপ আমি দূর করলাম। তুমি আজ মুক্ত, পূর্ণ, পবিত্র। তুমি মুখ তোলো, নির্ভয়ে ফুটে ওঠো।

এমন করে কে বলতে পারে। একজন পাঁচ বছর অপেক্ষা করছে হয়ত এই কথা বলার জন্য। কিন্তু—

যা বলছিলাম, মা আর এখন আমার সম্বন্ধে খুব একটা কড়াকড়ি করেন না। যা হবার হয়েই গেছে। মরার বাড়া গাল নেই। মা বললেন, পচা মাছ কাকে নিলে ক্ষতি কী। আমার বিষয় মা বোধহয় তাই ভাবেন।

না, আমি অন্যায় করছি। আমাকে মা খুবই ভালোবাসেন। আমার জন্য তাঁর মুখে অন্ন রোচে না, রাতে ঘুম নেই। তবে ঠিক যেন নিজের লোক ভাবতে পারেন না। একটু অন্যরকম। অন্য জাতের। সতী আর নষ্ট মেয়ের মাঝামাঝি কিছু।

তা আমি এতদিন নিজের তাগিদেই গুহার অন্ধকারে লুকিয়েছিলাম। দাদা এসে টেনে বার করেছে। যেমন আজ সকালে নারীমুক্তি সমিতির দুজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে কথা বলতে বাড়িতে এসেছিলেন। আমার দেখা করার ইচ্ছা ছিল না। দাদাই জোর করলো।

কী হবে। ওদের কথায় কি অবনী গুহের সাজা হবে না দুনিয়াটা পাল্টে যাবে?

হয়ত কিছুই হবে না। তবু কচ্ছপের মতো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করা ভালো।

মহিলা দুজন তাই বললেন। বললেন আরো অনেক কথা। যা মেয়েদের চরম অপমান, সর্বনাশ, মনে করা হয় তা যেন মেয়েদেরই অপরাধ। তারা অভিযোগ করা দূরে থাক, লজ্জায় লুকিয়ে থাকে। ফলে দোষীরা পার পেয়ে যায়। এখন নতুন জমানা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রে ও রাজ্যেও। এই সুযোগে মেয়েদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন শুরু করতে হবে।

অবনী গুহের মতো একজন জাঁদরেল আর দুশ্চরিত্র পুলিস অফিসারের শাস্তি হলে তার ফল বহু দূর ছড়াবে। অন্যরা ভয় পাবে।

এ কথা মন্টুও বলেছিল, তবে মন্টুর নীতি আলাদা। ও সরাসরি নিজের হাতে বদলা নিতে চায়। আমারই প্রতিশোধ স্পৃহা সবচেয়ে বেশি হবার কথা, হিসেব মতো। কিন্তু আশ্চর্য বুকের মধ্যে সে রকম আগুন—রাগ, ঘৃণা, হিংস্র প্রতিশোধ—খুঁজে পাচ্ছি না। সব কি ছাই হয়ে গেছে? আমি নিজেও!

তবে কি আমি উদার, মহান ভাবে ওকে ক্ষমা করেছি? তাও নয়। আসলে অবনী গুহ আর আমার কাছে স্পষ্ট নয়। ওর মুখ আমি ভালো করে মনে করতে পারি না। সেই ঝড়ের রাতের সঙ্গে, প্রাকৃতির দুর্যোগ আর দুঃস্বপ্নের সঙ্গে অবনী মিশে গেছে। অবনী গুহ কি এখনো আছে? ও কি কখনো ছিল?

এটা প্রতিশোধের প্রশ্ন নয়, নীতির প্রশ্ন। আমরা মেয়েরা কেন মুখ বুজে সয়ে যাব। যে অপরাধ আমাদের নয়, তার বোঝা বইব। প্রাচীন ভারতের নারীর আদর্শ তা নয়। সীতাকে স্পর্শ করে রাবণ স্বয়ং মরেছিল। পাঞ্চালীর অপমানের মাশুল দিতে কুরুবংশ ধ্বংস হলো। আমরা কি তেমন জ্বলে উঠতে, জ্বালাতে পারি না। কেবল কাঁদতে পারি!

চশমা পরা ভদ্রমহিলা বলছিলেন, বেশ ভালো বলেন, কেমন যেন মঞ্চে বক্তৃতার ঢঙে। আমার অস্বস্তি লাগল। এর সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায় না। আমরা অন্য

গ্রহের জীব। এই ভদ্রমহিলার ধবধবে সাদা আঁচলে কখনো কালির দাগ লাগেনি। চুলের খোঁপা, হাতের ব্যাগ বা চশমা বেসামাল হয়নি। আমাকে ইনি বুঝবেন না, বরং অবনী গুহের সঙ্গে আমার বেশি মিল হবে। কথাটা ভেবেই চমকে উঠলাম। ভদ্রমহিলা তখনো কথা বলে যাচ্ছিলেন।

আপনাদের মতো রাজনীতি সচেতন মহিলারা যদি নেতৃত্ব না দেন, তবে অন্যরা যায় কোথায় ?

আমি কি রাজনৈতিক ভাবে খুব সচেতন, কে জানে। এ নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। ছোটবেলা থেকে আমি দাদার অন্ধ ভক্ত। ও যা বলে তাই করি। একবার আমরা ঠিক করেছিলাম, সবুজ মানুষের দেশে যাব। সেখানে সব সবুজ। আমি সবুজ মানুষদের রানি হবো, দাদা প্রধান সেনাপতি। এমনি কত কী। বড় হয়ে দাদা যখন আর এক পথ ধরল, অন্য এক স্বপ্নের দেশে যাত্রা করল, আমি ওর সঙ্গ নিলাম। আর আমি কী বা করেছি। নিজের ইচ্ছায় কতটুকু দিয়েছি। পথ চলতি কারোর মাথায় হঠাৎ যদি পাথর এসে পড়ে তাকে কি শহিদ বলা যাবে।

শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলারা বিদায় নিলেন। বোধ হয় খুব খুশি হননি। বিকেলে আর এক ব্যাপার । বন্দিমুক্তির দাবিতে মিছিল। অনেকে মুক্তি পেলেও আরো অনেক রাজবন্দি আজো পাঁচিলের আড়ালে। যেখানে দাদা এতদিন ছিল যেখানে আমি ছিলাম, সেই দুঃস্বপ্নের রাতে।

দাদা মিছিলে যেতে বলল, না করতে পারলাম না। রাস্তার মোড়ে গানের সুরে আমিও গলা মেলালাম।

ওরা ক্ষুদিরামের ভাই।
ওরা ভগত সিংয়ের ভাই।
ওরা সিধু কানুর ভাই।
ওরা তিতুমীরের ভাই।
ওরা দেশের কাজে জেলে গেছে
নিজের কাজে নয়।
ওরা আজো জেলের মাঝে বসে
দেশের কথা কয়।

অনেক লোক হয়েছিল। অফিস ফেরতা ভিড়ের অনেকে এসে আবেদনপত্রে সই করছিলেন। কিন্তু আমি অস্বস্তি কাটাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। টিকিট কেটে দেখলেই পারে। আরো বিপদ, দাদা আমার সঙ্গে আসেনি। কি একটা জরুরি কাজে কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

হঠাৎ একটা দুধ-রঙা-অ্যাম্বাসাডর আমার সামনে দাঁড়ালো। একজন ঝকঝকে সুশ্রী যুবক নামল, চিনতে পারছেন ?

পারছি। সেই মুখটা আমার স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। পাঁচ বছর আগে দেখা সেই মুখ। এর মধ্যে কি তাকে আবার দেখেছি কখনো কখনো রাস্তায়, আমার জানলা দিয়ে। দরজা তো বন্ধ ছিল, ঠিক মনে পড়ে না।

—আমি পুলিসের চাকরি অনেকদিন হলো ছেড়ে দিয়েছি। আমার কাকার কাঠের ব্যবসা দেখি জানেন তো ?

জানি। চিঠিতে সব লেখা ছিল। চিঠির তো বিরাম ছিল না এই পাঁচ বছর।

লোকটা অনেকটা আপন মনে বলে চলেছে, ছোটবেলা থেকে গোয়েন্দার গল্প

পড়ার শখ ছিল। ছিল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। অনেকটা সেই ঝোঁকে পুলিসে ঢুকলাম। ভেবেছিলাম, বেশ হিরো হব। ডাকাতের দল ধরব, সুন্দরীদের উদ্ধার করব। তারপর—যাক। পিটিশনটা দিন।

কেন?

এই আমি লোকটার সঙ্গে প্রথম কথা বললাম। পাঁচ বছর আগে সে রাতেও কথা হয়নি।

সই করব।

প্রায়শ্চিত্ত করতে চান?

আমার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। আমি কি ডুবে যাচ্ছি। এই মুখটার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সেই অন্য মুখটা। দুঃস্বপ্নের মুখটা। অবনী গুহ আর পরাগ। অন্ধকারের বৃন্তে আলোর ফুল। না কি পরাগ আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু কেন।

পরাগ হাসল, তা বলতে পারেন। আর আপনার সময় থাকলে কোথাও যদি একটু বসা যেত।

সেটাও কি প্রায়শ্চিত্তের অংশ?

পরাগের কণ্ঠস্বর এবার খুব নিচু হয়ে এল। যেন আমাকে হালকা ভাবে স্পর্শ করল—না, পাঁচ বছর ধরে যে স্বপ্ন দেখেছি তাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা যায় কী করে।

পরাগ আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে কি না জানি না, তবে সে বিপদ এড়ানোর সাধ্য আমার নেই। আমার ভয় করছে। তবে সে ভয় অন্যরকম, সে ভয়ে বসন্তের কচি পাতার শিহরণ।

আমি কি পাঁচ বছর এই জন্যই অপেক্ষা করে ছিলাম?

বিশ্বজিতের কথা

নিচু গাছে বাজ পড়ে না, এ কথা বোধ হয় ঠিক নয়। নইলে বেছে বেছে আমার বাড়িতে এমন বিপর্যয় হবে কেন। অথবা ব্যাপারটা উল্টো ভাবেও দেখা যেতে পারে। চারদিকে যখন ঝড় উঠেছে, তখন বালির নিচে মুখ গুঁজে নিজেকে বাঁচানো যায় না। নগর পুড়লে দেবালয়ও পোড়ে।

খোকার মা অবশ্য অত বড় বড় কথার ধার ধারে না। তাঁর ধারণা, সব কিছুর জন্য আমিই দায়ী। আমি অত রাশ আলগা না করলে ছেলে-মেয়ে বিপথে যেত না। খোকা পাঁচ বছর লৌহ কপাটের আড়ালে নষ্ট করত না। মনুর হয়ত পুরো জীবনটা বরবাদ হতো না।

আমি কখনো তর্ক করি না। এ নিয়েও করিনি। তবে মন থেকে আমার সহধর্মিনীর যুক্তি মেনে নিতে পারিনি। যা ঘটেছে সে কি আমার একার ঘরে। হাজার হাজার বাড়ির কর্তা কি ঠিক আমার মতো। আমার অফিসের রজনীবাবু তো চব্বিশ ঘণ্টা নিজের ছেলের পেছনে লেগে থাকতেন। ছেলেকে আমেরিকা ফেরত ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট করবেন, এই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ফল কী হলো। মেদিনীপুরের কোন এক অখ্যাত গ্রামের মাটি ছেলেটির রক্তে লাল ও সবুজ হয়ে উঠেছিল।

তবে আর একদিক থেকে আমার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমি কখনো সমাজ সংসার রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কোনো আন্দোলনে যোগ দিইনি। এমন কী অফিসের ট্রেড ইউনিয়নেও না। এক মনে নিজের কাজ করে গেছি। সরকারি অফিসে মাঝারি স্তরের অফিসার হয়েছি। বাড়িতে বই আর খবরের

কাগজ পড়েছি। এই পর্যন্ত।

নিস্পৃহতা ? ঔদাসীন্য ? ঘরে বাইরে সবাই তাই বলে। আসলে আমার মধ্যে কাজ করেছে এক ধরনের ভয়। বিপদের ভয় নয়, ভুল করার ভয়। যে মাঝি হাল ধরতে পারে না তার সরে থাকাই ভাল। কে জানে, আমি ভালো করতে গিয়ে মন্দ করব কি না। আমার উপর নাই ভুবনের ভার সে কথা আমি ভালোই জানি।

খোকা বা মনুকে (মনু অবশ্য অনেকটা খোকার ছায়া ছিল) ঠেকাতে চেষ্টা করিনি। কোন অধিকারে করব। ওদের পথ যে বিপথ তাই বা বলব কী করে। আমি নিজে তো কোনো পথেই চলিনি। আমি বললেই যে শুনত, তা নয়। তবে আমি বলিওনি।

এই পাঁচ বছর আমি অনেক ভেবেছি। বিশেষ করে সেই দুঃস্বপ্নের রাতের পর থেকে। যেদিন আমার মেয়েকে ওরা—যাক। বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীদের সহানুভূতি অসহ্য মনে হয়েছে। ওদের প্রশ্নের, সান্ত্বনার, শুভেচ্ছার তিরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। মাঝে মাঝে ভেবেছি, চেঁচিয়ে উঠব অথবা একটা সাইন বোর্ড টাঙিয়ে দেব—আমার ধর্ষিতা কন্যা ভালোই আছে। দয়া করিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে বিব্রত করিবেন না।

এই পর্যন্ত। কিন্তু প্রতিবাদে প্রতিরোধে কী কেউ এগিয়ে এসেছে। কেউ না। আমার অফিসের ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারি, পুরনো পার্টি করা, পোড় খাওয়া বিনোদবাবু পর্যন্ত বলেছিলেন, চেপে যান, মশাই। দিনকাল ভালো নয়। যদি আমরা সরকার গড়তে পারি তখন—

আমি কাকে দোষ দেব। আমি নিজে কার জন্য কী করেছি। আজো যদি নিজের মেয়ে না হয়ে পরের মেয়ের ব্যাপার হতো, নিশ্চয় তেমনি করে মাথা ঘামাতাম না। এই সব নির্লিপ্ত মানুষদের মুখের আয়নায় নিজের মুখ দেখে বার বার চমকে উঠেছি।

এসব কথা কারোর কাছে বলা চলে না। মনু বা তার মার কাছেও নয়। মনু কোনো কথাই বলে না আর তার মা বড বেশি কথা বলেন। একজনের নীরবতা, আর একজনের কথার বন্যা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। খোকা পাঁচ বছর ঘর ছাড়া। ঘরে থাকতেই বা আমার সঙ্গে কটা কথা হতো। ফিরে আসার পরেই বা কটা হয়।

আমি একাই ভেবেছি। পাঁচ বছর ধরে ভেবেছি। এখন নাকি নতুন জামানা শুরু হয়েছে। দিল্লিতে। কলকাতাতেও। খোকা ফিরে এসেছে। আরো অনেকে। আমি কি এত দিনের ভাবনা-চিন্তা ভুলে আবার কচ্ছপের মতো খোলসের আড়ালে মুখ লুকোবো। আবার সর্বনাশের ঢেউ আমার উপর, আমার সংসারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে দোষ দেব কাকে।

সত্যি বলতে কি, অবনী গুহকে আমি ততটা ঘৃণা করি না। ঘৃণা করি নিজেকে। আমার নিজের মতো হাজার হাজার মানুষকে, যাদের নির্লিপ্ততা, ঔদাসীন্য দেশের অবনীদের টিকিয়ে রেখেছে। আবার কি আমি সেই সিকি মানুষদের দলে যোগ দেব।

এতসব কথা এই মুহূর্তে মাথায় আসার আর একটা কারণ আছে। পুলিসের এক বড় কর্তা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। কারণটা আন্দাজ করতে পারি। আমার দেখা করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু না বলতে পারিনি। আমার অফিসের বস নিজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। পুলিসের এই কর্তাটি নাকি ওনার বন্ধু।

—চমৎকার মানুষ এই সোম। ব্রিলিয়ান্ট, কালচার্ড, অমায়িক। আমাদের পুলিসের যে ইমেজ আছে, একেবারেই তার সঙ্গে খাপ খায় না। আলাপ করে দেখুন। ভালো লাগবে।

বলা বাহুল্য, এই গুণগানে আমি মুগ্ধ হইনি। রোম সম্রাট নিরো খুব কালচার্ড

মানুষ ছিলেন। নিজের রাজধানীতে আগুন লাগিয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করতে করতে বেহালা বাজিয়েছিলেন এমন জনশ্রুতি আছে। হিটলারের কিছু অধিনায়ক বিটোফেনে পারদর্শী ছিলেন। শেকস্‌পিয়ার, গ্যেটে, শিলার নিয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করতে পারতেন। তাতে কী হয়েছিল ?

তবু না করতে পারিনি। বসের অনুরোধ। তাছাড়া একটা কৌতূহলও ছিল, কি বলতে চান, শোনাই যাক।

দরজার বেল বাজল। আমি নিজেই খুলে দিলাম। ঘরে ঢুকলেন এক দীর্ঘাঙ্গ, বলিষ্ঠ, সুদর্শন ভদ্রলোক। বয়স বেশি নয়। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। ইনি যদি পুলিসের এক বড় কর্তা হন (ঠিক কি পোস্ট আমি জানি না) তাহলে নিশ্চয় তাড়াতাড়ি প্রমোশন পেয়েছেন। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে ওঠেননি। যোগ্য ব্যক্তি, সন্দেহ নেই। পরনে ইউনিফর্ম না থাকলেও কর্তৃত্বের ছাপ স্পষ্ট।

বসতে পারি ?

নিশ্চয় ? চা আনাব ?

আমি চেষ্টা করে কথা বলছিলাম। কিন্তু সোমকে মনে হচ্ছিল বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ। যেন বন্ধুর বাড়িতে গল্প করতে এসেছেন।

—আনলে খুশি হব। অবশ্য আপনার কাছে যে অপ্রিয় কাজে এসেছি, তাতে মিষ্টিমুখ আশা করতে পারি না। এটাই আমাদের দেশের পুলিসি কাজকর্মের বড় দুর্বলতা। কমিউনিটি রিলেসনসের কোনো ব্যবস্থা নেই। পুলিসকে সাধারণ মানুষ মনে করে বাইরের লোক, শত্রু। অন্য অনেক দেশে পুলিস আর সিটিজেনদের মধ্যে যোগাযোগের রেগুলার চ্যানেল আছে।

আমি কি উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক দেখলাম জনসংযোগ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন। ভেতরে গিয়ে চায়ের আবেদন জানালাম। জানি খোকার মা কোনো অতিথিকে শুধু চা পাঠাবেন না। তাকে বিষ চোখে দেখলেও নয়। সেটা তাঁর নিয়মের বাইরে। কাজেই মিষ্টিমুখও বাদ যাবে না।

ভদ্রলোক আবার শুরু করলেন। কি জন্য এসেছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়।

আমি মাথা নাড়লাম।

তাহলে বেড়ালটাকে ঝোলা থেকে বার করেই ফেলি। গত সাত আট বছরে নানা ধরনের পুলিস আট্রসিটি কেস নিয়ে তদন্ত কমিশন বসার কথা হচ্ছে। আপনার মেয়ের কেস তাতে প্রমিনেন্টলি ফিগার করবে। বিশেষ করে যদি আপনারা কো-অপারেট করেন।

আমি চুপ করে রইলাম।

দেখুন। ভাববেন না, আমি পুলিসকে ডিফেন্ড করছি। কিন্তু সে সময়কার কথা ভেবে দেখুন। চারদিকে আগুন জ্বলছে। উই ডিড নট হ্যাড এনাফ মিনস অ্যান্ড মেন। এক হাতে দশটা প্রবলেম সামলাতে হচ্ছে। এ অবস্থার সাম অফ দ্য মেন লস্ট দেয়ার হেডস। অমার্জনীয় কাজকর্ম করেছে। যেমন মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার।

সোম একটু থামলেন। নিজের আন্তরিকতায় নিজেই মুগ্ধ।

পাশবিক অত্যাচারই বা বলি কেন। দ্যাট ইজ অ্যান ইনসাল্ট টু বিস্টস। অ্যানিমাল কিংডমে কোনো মেল ফিমেলের কনসেন্ট এবং উৎসাহ ছাড়া তার কাছেও যাবে না। এমন জঘন্য অপরাধ একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব। ওয়ার্স দ্যান বিস্টস। কিন্তু আপনার দিক থেকে ভেবে দেখুন। এমনিতেই আপনার মেয়ে অনেক সাফার করেছেন।

এই পাবলিসিটি কি ওঁর আরো ক্ষতি করবে না?

আমাদের নতুন করে কিছু হারাবার নেই। ব্যাপারটা গোড়া থেকেই জানাজানি হয়ে গেছে।

তবু এতদিনে তো অনেকটা থিতিয়ে গেছে। লোকে ভুলেও গেছে। পিপল ফরগেট ফাস্ট। আপনার মেয়ের সুযোগ আছে, নতুন করে জীবন শুরু করার। নিবে যাওয়া আগুন খুঁচিয়ে তোলা কি ভালো।

সেটা আমরা বুঝব।

কিন্তু ভেবে দেখুন, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোতে পাবে।

সাপ আগেই বেরিয়েছে। আমার মেয়েকে কামড়েছে। তাকেই শেষ করতে চাই।

আমি এ ভাবে কখনো কথা বলিনি। বোধহয় সোম একটু অবাক হলেন। নিশ্চয়ই আমার বসের কাছে আমার অন্যরকম ছবি পেয়েছিলেন।

দেখুন, রেপ জিনিসটার লিগাল ডেফিনিশন দেওয়া শক্ত। সেকস ইজ এ কমপ্লেক্স থিং, এসপেশালি ইন দ্য কেস অফ উমেন। কে বলতে পারে, হোয়ার ফোর্স এন্ডস অ্যান্ড কনসেন্ট বিগিনস। ধরুন যদি আমরা দাবি করি, আপনাব মেয়ে স্বেচ্ছায় অবনী গুহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। আফটার অল হি ওয়াজ এ হ্যান্ডসাম ডেভিল।

কী বললেন। আমার মেয়ে ঐ পশুটাকে—

আহা, অত উত্তেজিত হবেন না। আপনার মেয়ে বলে ব্যাপারটা ডেলিকেট। তবু অবজেকটিভলি বিচার করে দেখুন। হিস্ট্রিতে এমন নজির আছে। মেরি, কুইন অফ স্কটসের নাম শুনেছেন?

বোধহয়। কেন?

সোম কালচার্ড লোক, সন্দেহ নেই। রীতিমত পণ্ডিত। আমি ইতিহাস বেশি জানি না। কিছু কিছু পড়েছি। খোকা ইতিহাসের ছাত্র ছিল, এখন অধ্যাপক। আর এক ধরনের ইতিহাসেও ওর হাতেখড়ি হয়েছিল—যে ইতিহাস মানুষ সৃষ্টি করে আর যা সৃষ্টি করে মানুষকে।

মেরি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে স্কটল্যান্ডের রানি। এ কনটেমপোরারি, রেলেটিভ অ্যান্ড রাইভাল অফ এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট অফ ইংল্যান্ড। মেরি সে যুগের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী গণ্য হতেন। মানুষকে জাদু করার তাঁর ছিল অসামান্য ক্ষমতা। অনেক পুরুষ তাঁর জন্য পাগল হয়েছিল। চোখের জল ফেলেছিল।

আমি তন্ময় হয়ে শুনছি। সোমের বলার ক্ষমতা আছে। উনি কেবল কালচার্ড নন, বোধহয় সাহিত্য চর্চার শখ আছে। কিন্তু এসব কিসের ভূমিকা!

একজন ছিলেন অন্য ধাতুর মানুষ। ঐ দেশেরই এক প্রবল পরাক্রান্ত সামন্ত প্রভু, অর্থাৎ কিনা ফিউডাল লর্ড। বথওয়েল। তিনিও অপরূপা রানিকে কামনা করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস, বা চোখের জল ফেলার পাত্র ছিলেন না। বথওয়েল একদিন রানিকে অপহরণ করলেন অ্যান্ড র‍্যাভিশড্ হার; ইন বোথ সেন্সেস অফ দ্য ওয়ার্ড।

কিন্তু রানির প্রতিক্রিয়া দেখুন। যে প্রজা তাঁকে চরম অপমান করল, তাঁর অপূর্ব দেহ জোর করে ভোগ করল, তাঁকেই মেরি হৃদয় দান করলেন। নিজের স্বামীকে গোপনে হত্যা করিয়ে বিধবা রানি বথওয়েলকে বিয়ে করলেন। পরে অবশ্য তাঁকেও জীবন দিতে হয়েছিল। শি পেড ফর দিস ম্যাডনেস উইথ হার লাইফ। সে আর এক ইতিহাস।

আপনি বলতে চাইছেন, আমার মেয়ে—

আমি কিছুই বলছি না। কিন্তু কেসটা ডেলিকেট। কত কী হতে পারে। লেট স্লিপিং ডগস লাই।

সোমের সিগারেটের আগুনের বিন্দু যেন সাপের চোখ। আমাকে আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

সুরজিতের কথা

মন্টুকে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছি। খবর পেয়েছি, অবনী গুহ আর ঐ রকম কয়েকজনকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। যোগাযোগ করছে অ্যান্টিসোশালদের সঙ্গে। এর শেষ কোথায়। আবার কি আমরা ব্যক্তিহত্যার চোরাগলিতে পড়ব। নতুন লাইন খুঁজবো না!

মন্টুকে কিছু বলা বৃথা। ঠিক জবাব দেবে, ও সব লাইন-ফাইন বুঝি না। কটা শয়তানকে শেষ না করে ছাড়ব না।

তবু একটা সুস্থ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে হয়তো মন্টুর মতো ছেলেরা এ পথে যাবে না। কয়েকটা গ্রুপের জন্য ঐক্যের কথাবার্তা কিছুটা এগিয়েছে। অন্ধ্রের কমরেড নাগেশ্বর রাও সদ্য কলকাতার এক জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আজ অনেকক্ষণ কথা হলো।

বাড়িতে এসে মনুর কাছে যা শুনলাম তাতে আর সব মাথা থেকে বেরিয়ে গেল। বিশ্বাস করতেই অনেক সময় লাগল। খুশি হব না বুক চাপড়াব, সে পরের কথা। তবে একটা কথা ঠিক বুঝলাম, মনুকে ফেরানো যাবে না। আজকের দিন সেই রাতটার মতই অমোঘ।

বাবার কাছে বলার ভার আমিই নিলাম। মনু মাকে বলবে। বাবা বসার ঘরে বসে আছেন, রেডিওর উপরে রাখা পাথরের বুদ্ধের মতো স্থাণু হয়ে। সদর দরজা খোলা। কেউ বোধহয় একটু আগে বেরিয়ে গেছে।

আমি সোজাসুজি বললাম, মনু পরাগ বোসকে বিয়ে করবে। সেই যে পুলিস অফিসার যে ওকে সে রাতে বাড়ি এনেছিল।

বাবা মুখে তুললেন না। যেন মনু বা মোহানা নামে কারুকে চেনেন না। আমি আবার বললাম, ব্যাপারটা আচমকা মনে হতে পারে। কিন্তু পরাগ না কি পাঁচ বছর ধরে মনুকে চিঠিপত্র লিখেছে। আজ হঠাৎ দেখা করে ওরা ঠিক করল যে--

বাবা শোনার কোনো লক্ষণ দেখালেন না। আমি মনুর কাছে যা শুনেছি তা অনেকটা মুখস্থ বলে যেতে লাগলাম। ভেতরে ভেতরে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

পরাগ অনেক দিন পুলিসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ওর কাকার কাঠের ব্যবসায় দেখাশোনা করে। এম এ পাস, বড়লোকের ছেলে। দেখতে শুনতে বেশ—

আমি থেমে গেলাম। কেমন যেন ঘটকের মতো শোনাচ্ছে। নিজের কানেই লাগছে। বাবা তেমনি চুপ।

আমি এবার অন্যদিক থেকে শুরু করলাম। পরাগের বাড়ির লোক সব জানে। ওরা মোটামুটি রাজি। তবে এ বিষয়ে তদন্ত বা ওসব কিছু না হলেই ভালো। মানে, মানে ও আর কি বলছিল, যে বাড়ির বউ হবে তাকে নিয়ে আবার... পরাগের চাকরির রেকর্ড... এমনিতে লোকে ভুলে যাবে। পরাগ অবশ্য কিছুই বলেনি, ও ব্যাপারটা মনুর উপর ছেড়ে দিয়েছে। পারগ মন্দ ছেলে নয়, মনে হয়।

এতক্ষণে বাবা কথা বললেন। খুব ঠাণ্ডা গলার স্বর, কিন্তু পাথরের মতো দৃঢ়।

থাক ফিরিস্তি দিতে হবে না। মনু যাকে বিয়ে করতে চায় করুক। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তদন্ত হবে।

আমি বাবার চোখের দিকে তাকালাম। জীবনে এই প্রথমবার।
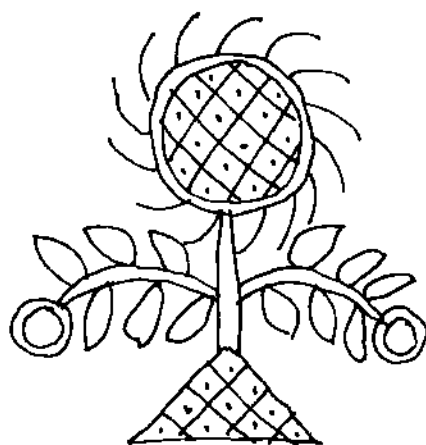
কিছু মানুষ, কিছু গোরু-ছাগল ॥ শিবতোষ ঘোষ

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এসেছেন টাকা আদায় করতে পুলিস নিয়ে। এইট্টি পারসেন্ট চাষী টাকা শোধ দিচ্ছে না, ওপর থেকে কড়া নোট, যে করেই হোক টাকা আদায় করুন। লাটুর বউ ধান বস্তা নামিয়ে, বসতে টুল দিল। পুলিসগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যানেজার জিগ্যেস করলেন—লাটুবাবু কোথায়, একটু ডেকে দিন!

সঙ্গে একজন অ্যাসিস্টেন্ট আছেন, তিনি খাতাপত্র সব এনে রাখলেন ম্যানেজারের সামনে। ম্যানেজার জিপ নিয়ে এসেছেন। জিপ ইট ভাটার কাছে। ভাটা থেকে এদিকটায় আল রাস্তা। ম্যানেজারের পায়ে ভারী বুট, আলে হাঁটা অভ্যেস নেই, তিন-চার বার পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছেন। গাড়ি চালক হিন্দুস্থানি ড্রাইভার। গাড়ির সামনের নেংটো ছেলেগুলোকে ক্রমাগতই সরিয়ে যাচ্ছে—এই হঠ যাও, হঠ যাও! তালি বলে বারো বছরের একটি মেয়ে, একটা গামছা পরা, একটা গামছা গায়ে—সেই প্রথম দেখল ভুঁড়িওয়ালা-টাকমাথা লোকটা পড়তে পড়তে কোনোরকমে বেঁচে যাচ্ছে। সকলে মিলে চুপ-চুপ হাসল, সঙ্গে পুলিস আছে বলে জোরে হাসতে পারল না। লাটুর ওপরে এই সময় থেকে রেগে লাল হয়ে আছেন ম্যানেজার।

লাটুর বউ বীণা, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। সে বলল—কিন্তু ও তো ঘরে নেই, বাজারে গেছে।

সে মিথ্যে বলল। লাটু লুকিয়ে আছে। ব্যাঙ্কের লোন নিয়ে চাষের কি সব করেছে, একটাও কিস্তি দেয়নি। বহুবার নোটিশ করা হয়েছে।

—কখন ফিরবেন লাটুবাবু?

—বাজারের ব্যাপার, বিক্রি না হলে...

—কী নিয়ে গেছেন?

—কী আর আছে, দু'আঁটি মরা বৈতাল খাড়া, পোয়া পাঁচেক ঝিঙে। বাড়ি-ঘরে এখন আর কিছু নেই।

একটু বেশি বাড়িয়ে দুঃখুটা দেখাতে চাইল লাটুর বউ। কিন্তু ম্যানেজার বললেন—এতো আনাজ-তরকারি বিক্রি করছেন, আর ওই কটা টাকা শোধ দিতে পারছেন না!

লাটুর বউ মুখে ঘোমটা দেয়নি। লাটুবাবু-লাটুবাবু করে যখন ডাকছিল তখন একবার মনে করেছিল ঘোমটা দিই। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেয়নি—ইস, ওরা কি ভাশুর-শ্বশুর নাকি!

লাটুর বউ এককালে ভীষণ ফর্সা ছিল, এখনও চট করে তার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। বলল—কটা টাকা কি, দশ হাজার টাকা! দেবো কি করে?

ম্যানেজার আরও চটলেন। চাষীরা বাড়ির মেয়েদেরও এ ভাবে সেয়ানা করে তুলেছে। গাঁয়ের মেয়েদের মুখে এরকম ফড়ফড় কথা তিনি পাঁচ বছর আগেও শোনেননি।

লাটু এদের কথাবার্তা সব শুনতে পাচ্ছে। ছাদের নিচে যেদিকটায় হাঁড়ি-কলসি থাকে তারই মধ্যে সে লুকিয়ে বসে আছে। লাটুর মাঝে-মাঝে প্রচণ্ড ভয় করছে যদি পুলিস পাঠিয়ে ম্যানেজার বলে—দ্যাখ্‌কে আয়ী তো, ঘরমে হ্যায় কি নেহী। তাহলে আর পালানোর পথ নেই। এর চেয়ে ছাদে উঠে বসা ভালো ছিল। ওপরে চালের একটা দিকে টালি আছে, টালি খুলে পালাতে পারত।

—দেখুন কি করে দেবেন তা আমরা কি করে বলব! এখন এগারোটা বাজে, বারোটার মধ্যে কি লাটুবাবু আসবেন?

লাটুর বউ কিছু বলল না, বাইরে নেমে বেলার দিকে তাকালো।

—যাকগে, আপনি নিশ্চয় শুনছেন আজ টাকা না পেলে আপনাদের অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হবে। এখানকার চৌকিদারকে ডাকতে পাঠিয়েছি, আপনাদের পঞ্চায়েতকেও ডাকতে পাঠিয়েছি।

লাটুর বউ কেন যে এখনও যুক্তি দেখাচ্ছে। লাটু ভেতর ঘরের কোণে বসে বসে প্রচণ্ড রেগে যায়। পায়ে পড়ে যাবি তো, আহম্মক কোথাকার!

—প্রথম বছর গেল বানে, তার পর বছর খরা, সংসারে বাড়-বাড়ন্ত, সব ধুয়ে-মুছে গেল।

ম্যানেজার বললেন, ধান-চাল, থালা-বাসন, কপাট-জানালা, গয়নাগাঁটি—এইসব। মোটকথা জমি ছাড়া ঘরে আর যা আছে।

ছোটো ছেলেটা কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে এল। লাটুর বউ তাকে নেংটো দেখে ছিটকে দিল, যাঃ! লাটু ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু কাঁদতে শুরু করেছে দেখে ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেটাকে প্যান্ট পরানোর কথা মনে হয়নি। এছাড়া কোনো কাপড়-চোপড়ও নেই এ ঘরে। অনন্যোপায় হয়ে লাটুর বউ ছেলেকে কোলে তুলেছে, আঁচলের খুঁট দিয়ে ছেলের আধখানা ঢেকে ম্যানেজারের কথা শুনছে।

পঞ্চায়েত এলেন। তাঁকে দেখে ম্যানেজার কৃত্রিম রাগে বললেন—মশায়, আপনার এই লোকটি কিছুতেই টাকা আদায় দিচ্ছে না। কি করি বলুন তো!

—দেখছেন তো অবস্থা। চালে ভালো করে খড় নেই!

—তা বললে তো আমাদের চলবে না।

—হ্যাঁ, আপনারা তো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ফোর পারসেন্টে টাকা নিয়ে পাঁচজনকে দিচ্ছেন।

—তাহলে বলুন।

—তা আপনাদের অন্যান্য আদায় কি রকম?

—সেন্ট পারসেন্ট! এই দেখনু না আপনাদের শ্রীরাজবল্লভ মহাপাত্র দিয়ে দিয়েছেন, কেশবচন্দ্র পাল ফুল পেমেন্ট, শুধু এই লাটুবাবু...

—এক পক্ষে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। ব্যাঙ্কের টাকা শোধ যখন করতেই হবে, তখন কিছু কিছু করে...

ম্যানেজার লুফে নিলেন কথাটা।

—তবে, ইচ্ছে করে মশাই, ইচ্ছে করে! আসলে সরকারি টাকা—ভেবেছে, শোধ দেব না। আমি তো প্রত্যেক লোনীকে বলি, আজ আপনারা সমস্ত শোধ করে দিন, কালকে আপনারা আবার টাকা নিন, দু'হাজার, তিন হাজার, যার যা দরকার।

পঞ্চায়েত লাটুর বউকে বললেন—যাও, ভেতরে গিয়ে দেখো, কতোটা কি টাকা-

পয়সা আছে!

বাক্সে আছে ষাট পয়সা। লাটুর বউ ম্যানেজারকে যা বলেছিল তার সঙ্গে দু'ফেনা কাঁচকলা, সাত আঁটি সজনে ডাঁটা—এই দুটো জিনিস সে চেপে গিয়েছিল। এমনিতে ম্যানেজার লাফিয়ে উঠেছিলেন—ঝিঙে ফলছে আপনাদের, তাহলে তো আপনারা বড়োলোক! ঝিঙে কতো করে কিলো জানেন, আমি আজকেই বাজার করেছি, দু' টাকা পঁচাত্তর!—লাটু আজ সকালে ওইসব কুড়িয়ে-গুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে চাল-তেল-নুন এরকম খুব দরকারি জিনিস ক'টা কিনে এনেছে। বাজার থেকে ষাট পয়সা বেঁচেছিল, লাটু বউকে বলল—রাখো! সে বাক্সে ফেলে দিয়েছে। বাক্সে কোনো চাবি-তালা নেই। ম্যানেজার গয়নার কথা বললেন, কিন্তু তার কোনো গয়নাই নেই। কানে দুল করবে বলে নিজের শুশনি শাক বিক্রি করা পয়সায় একটা খাসি বাচ্চা পুষেছিল, চাষ রোয়ার সময় সেটাও খরচ হয়ে গেছে।

লাটুর বউ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। দেখল অন্ধকার ঘরের একটা কোণে বিড়ির আগুন জ্বলছে। খুব রাগ হয়ে গেল। ওদিকে পুলিস হাঁকডাচ্ছে আর এদিকে উনি বসে বসে মজায় বিড়ি টানছেন। বীণা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল—কি হবে বলো? আমি তখন বলেছিলাম না, শ্যালো-মেসিনে আমার কাজ নেই। মা-বেটা বুদ্ধি করে কিনে ফেললো!

কথায়-কথায় মাকে টেনে আনা, এ একটা দোষ লাটুর বউয়ের। কিন্তু চেপে গেল লাটু। ফিসফিস করে জিগ্যেস করল—মা কোথা?

—মা তো গোরু-ছাগলের কাছে।

বাতে কোমর বেঁকে গেছে লাটুর মা'র। কোমর ঠেলে ঠেলে গোরু-ছাগল বাগালি করে। মাকে ওই অবস্থায় দেখলে খুব কষ্ট হয়। লাটু খুব দুখী-দুখী হয়ে পড়ল মনে মনে।—তবু শালারা বলছে, লাটু ইচ্ছে করে টাকা দিচ্ছে না!

লাটু বউকে বলল—পঞ্চায়েতদাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলো না, বলো একমাস সময় করে দিন, সব একসঙ্গে পারব না, যতটা পারি দিয়ে আসব।

বীণা আছড়ে ফেরত দিল কোলের ছেলেটাকে।—নাও এটাকে ধরো। লোকের কাছে-কাছে নেংটো পোঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে; একটা প্যান্ট পরাও তো। হ্যাঁ গো, ওদেরকে একটু চা করে দেব?

—দাও! আগে আমাকে সদর থেকে এর প্যান্টটা দিয়ে যাও।

লাটুর বউ গিয়ে বলল—আমাদের আর একটা মাস সময় দিন, যতটা পারি, যে করেই হোক দিয়ে দেব!

—এখন আর কোনো উপায় নেই। আপনার বাড়িতে এর আগে বহুবার ওভারসিয়ার এসেছেন, ডেপুটি ম্যানেজার এসেছেন। লাটুবাবু সকলকে ধাপ্পা দিয়েছেন।

লাটুর বউ পঞ্চায়েতকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল, বলল, আপনার কথা শুনবে, আপনি একটু বলে-কয়ে...

—আমি তো বলছি, কিন্তু আইনের ঘরে হাত-পা বাঁধা ওদের। কতো পাবে তোমাদের কাছে?

—দশ হাজার, আর তার সুদ।

—এক পয়সাও দাওনি? সুদটা মিটিয়ে দিয়ে থাকলে একটা জোর পাওয়া যেতো।

—বান-বন্যা-খরা, চাষবাস কি হয়েছে?

—দেখো, যদি হাজার পাঁচেক দিয়েও ম্যানেজারের হাতে-পায়ে ধরে...আমিও বলব।

বীণা সেখানেই কাঠ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের একটু কাঁদালের দিক, রোদ কম পড়ে বলে জায়গাটা সবদিন খুব ঠাণ্ডা। নিচে খুব লম্বা-লম্বা দুব্বো ঘাস। বীণা অত্যন্ত সবুজ টকটকে ঘাসগুলো পায়ের বুড়ো আঙুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। যেন একটা মজার খেলায় পেয়েছে তাকে।

পঞ্চায়েত ডাকলেন—বউমা ?

বীণা পা-পা করে গেল।

—ম্যানেজারবাবু বলছেন, বারোটা বেজে গেল, লাটু তো ফিরল না।

—উনি আর ফিরবেন বলে মনে হয় না! কাবুর মুখে শুনতে পেয়ে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছেন। আমি কিন্তু আজ ছাড়ছি না!

পঞ্চায়েত জিগ্যেস করলেন—পিসিমা কোথায় ?

—সে যেমন গোরু-ছাগল নিয়ে যায়, তেমনই নিয়ে গেছে।

—তা দু' চারটা গোরু-বাছুর বেচেও তো কিস্তিটা দিয়ে দিতে পারতে!

চারা কাঁঠাল গাছটায় মুখটা আড়াল করল লাটুর বউ। পুরো আড়াল হলো না—রাগে, অপমানে এখন তার বিরাট হাঁড়ির মতো মুখ। কেউ অবশ্য দেখল না। সে কি করে বোঝাবে যে আজ তিনমাস তারা একটা গোটা দশ টাকার নোটও চোখে দেখেনি।

ম্যানেজার বললেন—তাড়াতাড়ি যাই হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করুন, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না।

বীণা ঘরের মধ্যে যাওয়ার সময় শাড়ির খুঁটটা পেছন দিকে টেনে ধরলো। পাতলা কনট্রোলের কাপড়! দিন পনেরো হলো বীণার সেই কাজকরা তোলা সায়াটাও ছিঁড়ে গেছে। সেটাই সে গিঁট দিয়ে লোকজন এলে কিংবা ডাক্তারখানায় যেতে হলে পরে যেত।

বীণা এসে দেখল ছেঁড়া থলে ঢাকা দিয়ে লাটু তারই কোণায় ব্যাঙের মতো চুপ করে বসে আছে। কান পেতে সবই শুনেছে; তবু বীণা আসতে জিগ্যেস করল—কী বলছে ?

—না, সময় দিতে পারবে না।

—শালারা আইন দেখাচ্ছে। পঞ্চায়েতদা কী বলল ?

—সে বলল, অর্ধেকটা অন্তত দিয়ে দাও, আমি বলে-কয়ে একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—হুঁ। মা কোথা ?

—আচ্ছা শুধু মা কোথা, মা কোথা করছ কেন ? মার কাছে কি টাকার হুণ্ডি বসানো আছে!

—ক্রোক করলে তো শালার গোরু-বাছুর আগে নেবে, ঘরে কোনো শালা ঢুকবে না। মাকে খবর দিয়ে বড়ো হেলে দুটো আর গাইটা যদি পার করে দিতে পারতে....নিবুরা স্কুল থেকে টিফিনে খেতে আসেনি ?

—ওদের টিফিন হবে সেই একটায়।

—একটা তো বাজতে যাচ্ছে। তুমি বরং আমাকে খোঁজার নাম করে একটু দেখো। নিবু যদি আসে, তার বইগুলো তুমি প্রভাতকে দিয়ে দেবে, আর নিবুকে সোজা পাঠিয়ে দেবে মার কাছে—বলবে, ওই তিনটে গোরু ইট ভাটার কোনো একটা খাদালে যেন লুকিয়ে বেঁধে রাখে।

গাঁয়ের অনেকে খবরটা শুনে, কি হলো দেখতে এল। বিজয়, নিতাই, শ্যামাপদ, ভূপতিকাকু। ভূপতিকাকু এসেই বললেন—ম্যানেজারবাবু, জল নেই খালে-বিলে, জল আছে সেই গাছের ডালে, এর ভাঙানি কি হবে বলতে পারেন ?

সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। ম্যানেজারবাবুও হাসলেন। বললেন—কেন, নারকোল।

—হলো না ম্যানেজারবাবু, হলো না! সরকার আমাদের বললেন—থাক্ বিম্নি মোর আশে, ভাত দেব তোকে পোষ মাসে। আমরা আশায় আশায় বসে আছি, কথায় বলে না আশায মরে চাষা! সরকার এই দেবে, ওই দেবে—ছাড় দেবে। তারপর দেখা গেল, কোথাও কিছু নেই। সব ফল্‌অস্!

আবার সকলে হেসে উঠল।

ম্যানেজারবাবু বোঝালেন—ওই শুনে আপনারা তো ভুল করেছেন, সরকার কুয়ো-মেসিনের টাকা কি করে ছাড় দেবেন, ওসব টাকা তো দিয়েছে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের টাকা মানে তো পাবলিকের টাকা না!

—সে তো একশোবার সত্যি, আপনাদের কি আর টাকার খনি আছে!

নিতাই বলল—আমি বোকাটাকে বললাম, ও শালা লোন-টোন লিসনি। বাপ-ঠাকুর্দার চাষ বেগুন-মুলা-বিলাতি আমার অনেক ভালো।

ম্যানেজারবাবু বললেন—যাই বলুন, আলু-কপি-গম এর চেয়ে প্রফিট আর কোনো চাষে নেই।

—ওই তো আলু-কপি চাষ করতে গিয়ে হাতে ঘটি।

ভূপতিকাকু রেগে গেলেন—তা বলে লোনের টাকা শোধ করতে হবে না! আমি শোধ করতে পারব না, সেজন্য ছেলেকে বললাম—না বাবা ওসব কল-মেসিন লিতে হবেনি।

পঞ্চায়েত বললেন—এজন্যই তো আমরা ব্লক অফিস থেকে একটা মেসিন অনেক ধরে-করে জোগাড় করে এনেছি, কিনতে হলে পারতাম নাকি!

বীণা শিরীষ তলায দাঁড়িয়ে আছে। এখন তার ঘরে থাকতেই ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে সর্বস্ব দিয়ে হলেও লোকগুলোকে যদি তাড়াতে পারত! রামপদর বউ দেখতে পেয়ে কাছে এল।

—কে লোকগুলা তোমাদের ওদিকে গেল বউমা ?

সব জানে তবু চালাকি করছে।

—ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। এখনও স্কুল ছুটি হয়নি ?

—পুলিস দেখে ভয়ে মরি। ভাবছি কি করেছে রে বাবা লাটু! হ্যাঁ গো বউমা, তোমাদের নাকি কোরক হবে ?

—এখনও টিফিন দিল না, ছোট-ছোট ছেলেরা খাবে কখন ?

—ও বউমা, গোরু-বাছুর-ছাগল তোমার শাউড়িকে বলে একটু সরে দাও না। যদি কোরক করে ; তাহলে তো ওগুলাই আগে লিবে।

লাটুর বউ বলব না বলব করেও ফস করে বলে ফেলল, পিসি, তুমি গিয়ে আমার শাশুড়িকে একটু খবর দেবে ?

—কোথায গোরু-বাছুর নিয়ে গেছে!

—ঐ ইট ভাটার দিকে গেছে। তোমার মা-বাপকে গড় করি, যাও না একটু!

—ও মা, ওখানে গেলে তো কাপড় কাচতে হবে। আমার একটিই কাপড়, কেচে

দিলে আর পরতে পাব না।

রামপদর বউ ঘরের দিকে যেতে যেতে ডাকে—তালি, তালি গো—মরতে গেছে, জিপ গাড়ি দেখতে গেছে!

ম্যানেজারবাবু অস্থির হতে পঞ্চায়েত চৌকিদারকে পাঠালেন।—যা ডেকে দিবি যা! ভদ্রলোকেরা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন!

—লাটুবাবুর মতো উনিও না কোথাও লুকিয়ে পড়েন।

লাটু চমকে উঠল ভেতরে, একটা ছেঁড়া থলে টেনে নিয়ে আরও আড়াল করল নিজেকে। বাজার থেকে সে যখন ফিরে এল তখন অনেকে দেখেছে। খল মামী জিগ্যেস করল—কি রে লাটু, আজ বেগুন কতো?

লাটু বলল—আজ বেগুন নাই গো মামী!

সে যদি বলে দেয় লাটু বাজার থেকে ফিরে এসেছে, দেখো কোথায় লুকিয়ে আছে! ঘেমে যাচ্ছে লাটু, ভয় কাটানোর জন্য তার এক্ষুণি আর একটা বিড়ি খাওয়া দরকার। কিন্তু জামাটা বাজার থেকে এসেই খুলে সদর ঘরে রেখে দিয়েছে, জামার পকেটে বিড়ি। ওখানে গেলে কেউ না কেউ দেখতে পেয়ে যাবে।

ওখানে এখন ভূপতিকাকু আর পঞ্চায়েতদার গল্প শোনা যাচ্ছে। ম্যানেজারবাবু হয়তো কাগজপত্র লেখালেখি করছেন। ভূপতিকাকু বললেন—টিউবওয়েলটার জল উঠছে না পঞ্চায়েতবাবু। একটু ব্যবস্থা করে দেন।

—একটা দরখাস্ত করুন। আপনাদের গোষ্ঠবাবুকে বলবেন একটা লিখে দেবে।

—কিন্তু কি-কি যন্ত্র খারাপ হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করা যাবে কি করে?

—ও সেলেন্ডার, চেকভালব যা-যা আছে সবই এক পিস করে লিখে দেবেন। আপনাদের যা লাগবে, লাগবে, বাকিগুলো আমি রেখে দেব—মানুষ জল খেতে পাবে না, এটা আমি সকলের আগে দেখব। কি বলেন ম্যানেজারবাবু? জলই তো হলো জীবন।

লাটু শেষ পর্যন্ত বিড়ির অভাবে একটা চটা বানিয়ে ধরিয়েছে। তার মায়ের ভাজা দোক্তার কৌটো এইখানেই ছিল, লাটু একটা শালপাতা চিরে দোক্তাটা মুড়ে নিয়েছে। দেশলাই জ্বালিয়েছে আদৌ যেন না শব্দ হয় এরকম ঘষে-ঘষে। একসঙ্গে মুখভর্তি-মুখভর্তি অনেকখানি ধোঁয়া গেলার পর একটু স্বস্তি বোধ করছে লাটু।

নিতাই বড় কট-কট করে কথা বলে। সে বলল—সরকারের টাকা, শালা ফাটে কি ফুটে! কিন্তু এ হলো ব্যাঙ্কের টাকা। শালাকে এত করে বারণ করলাম, ব্যাঙ্কের টাকা লিয়ে শ্যালো-মেসিন লিসনি, শালা ডুমরা-ফুটা হয়ে যাবি!

নিতাই একটু জংলি টাইপের বলে তার কথায় কেউ কোনোদিন গুরুত্ব দেয়নি। সবদিনের রগচটা, ছোটোলোকের মতো মুখে বাছবিচার নেই, যা আসে তাই বলে ফেলে। টাউন স্কুলে পড়তে যেত, ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিল। তার নিরু ফোর-এ পড়ে, ফাইভ-সিক্স-সেভেন, আর তিন বছর গেলে তার মেয়ে তাকে পড়ায় পেরিয়ে যাবে। মা যদি তাকে আর তিনটে ক্লাস পড়াত...। চাষবাসে বড় ঝামেলা—আজ ডিজেল নেই, কাল ইউরিয়া নেই, যে ভালো করে ছোট্ দিয়ে কাপড় পরতে শেখেনি এখন তারও বেতন দশ টাকা! কেঁদে ফেলল লাটু। চোখের কোণায় থিক-থিক করে উঠছে জলের ফোঁটা।—বউয়ের একটা সায়া নেই, আমার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেছে, খালি পায়ে বাজার যাই—এমনি শখ করে না। মদ খাই না, জুয়া খেলি না, নেশার মধ্যে

সারাদিনে আট-দশটা বিড়ি এক-একদিন তাও থাকে না, শালপাতার চটা খাই। এখনও ক'টা বই কিনতে পারিনি ছেলে-মেয়েদের।

বীণা ফিরে আসছে, তার হাতে এক গোছা প্যাঁকাটি।

ভূপতিকাকু জিগ্যেস করলেন—প্যাকাটি কি হবে বউমা ?

—একটু চা করি।

—হ্যাঁ, করো-করো।

ম্যানেজারবাবু বললেন—আপনারা এতে সকলে সিগনেচার করুন, যে আপনাদের সকলের সামনে লাটুবাবুর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হচ্ছে।

একজন-একজন করে সই করছে। নিতাই বলল—না শালা, আমি সই-টই করব না, কোথায় আবার ফেঁসে যাব।

ম্যানেজার বললেন—তাহলে চৌকিদার আর পুলিসকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক, গোরু-ছাগলগুলো ধরে নিয়ে আসুক, আপনাদের কেউ একজন ওদের সঙ্গে গেলে ভালো হয়। পাড়ার লোক, আপনারা লাটুবাবুর গোরু-বাছুরগুলো চেনেন।

পঞ্চায়েত বিজয়কে বলল—যান না বিজযবাবু। আপনি তো ভালো চিনবেন।

—আমি কারুর সাক্ষী দিতে পারব না। মাসি ডেলি বেটার মাথা কেটে বাখান দিবে।

ভূপতিকাকু বললেন—বচা যা না রে, তুই তো শুধু আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিবি।

নিতাই আবার মুখ খুলল—না বে, শালা যাসনি!

সে উঠে আড়মোড়া ভেঙে চলে যাবে ভাবছিল, লাটুর বউ ডাকলো।

—ঠাকুরপো, তুমি একটু উনানে জ্বাল দেবে এসো তো! আমাকে কি জিগ্যেস করছেন...

কি জানি কেন, নিতাইকেই তার কিছুটা নিজের লোক বলে মনে হলো। আর কারুর দিকে তাকালেই তার গা ঘিনঘিন করে উঠছে।

ভূপতিকাকু বললেন—কি বলছো বউমা বলো, ম্যানেজারবাবু কোরক করার জন্য সব রেডি করে ফেলেছেন, পুলিস-চৌকিদারকে পাঠাচ্ছেন তোমাদের গোরু-ছাগল মাঠ থেকে ধরে আনতে। আমি বলি কি, ম্যানেজারবাবু, আজ লাটু বাড়িতে নেই, আজ আপনারা ছেড়ে দেন, আমরা গ্রামের লোক ওর ঘাড়ে ধরে আগামীকাল আপনার কাছে পাঠাব। বাড়িতে একটা মেয়েছেলে রেখে তুই কি করে বাজারে বসে রইলি!

—শুনুন, অন্তত পাঁচ হাজার টাকা আজ দিতেই হবে, নইলে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হবে। ক্রোকের পর নীলাম হবে আপনাদের গোরু-বাছুর-ছাগল, ভেবে দেখুন কী করবেন ?

লাটুর বউ বলল—আমাদের টাকা নেই।

বলে আবার পেছন দিকে কাপড় টেনে সদর দরজা পেরিয়ে গেল। ফ্যাকাশে হলদে পাড়, শাড়ি বলে মনে হয় না। লাল একটা ব্লাউজ। এই ব্লাউজের ম্যাচে একটা লাল শাড়ি ছিল, বোনঝির বিয়েতে গিয়ে চুরি যায়। কুটুম ঘরে কি আর শাড়ি ফেরত চাইবে ? সেই নতুন শাড়ির ব্লাউজটা থেকে গেছে, শাড়ি আর কেনা হয়নি।

ছোট ঘর, উনুন জ্বালতেই ভর্তি হয়ে গেছে ধোঁয়ায়। ঘরে ঢুকতেই চোখ জ্বালা করে উঠল বীণার। নিতাই জিগ্যেস করল—এতো চা, ছাঁকবো কিসে ?

বীণা বাইরের এগারোজন গুনে বারো কাপ জল নিয়েছে। এক কাপ লাটুর।

কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠলো সে। নিতাই বুঝতে পেরে বলল—তুমি চুপ করো তো, দেখা যাক না শালার কী করে?

নিতাই কাপ-গ্লাসে করে চা নিয়ে গেল থালায় সাজিয়ে। ভালো কাপ-প্লেটটা ম্যানেজারবাবুর। ভূপতিকাকুই থালা থেকে তুলে সবাইকে এগিয়ে দিচ্ছেন। সবশেষে কাপটা নিয়ে এবং জোরে চুমুক দিয়ে শব্দ করলেন—আঃ!

লাটুর মা কোমর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে তালতলা থেকে বাছুর ঘুরিয়ে আনছে, ওদিকে চারটে ছাগল ইটভাটার ঝামা-চাঁড়ের ওপর উঠে শ্যামালতা খাচ্ছে। হঠাৎ দেখল পুলিস এসে তার গোবু-ছাগল সব তাড়া করে তাদের ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বুড়ি কিছু বুঝতে না পেরে কাঠ হয়ে দাড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চেঁচিয়ে বলল—ওগুলো যে আমাদের গোবু।

চৌকিদার বলল—লাটুবাবুর গোবু তো?

লাটুর মা বললো—হ্যাঁ।

—তোমাদের বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছি। তুমি বুড়ো মানুষ, তুমি আর কেন কষ্ট করবে!

কোমর বাঁকিয়ে থুক-থুক করে আসছে। পুলিস গোবু-বাছুর নিয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। গ্রামের সমস্ত ছেলে-পুলে-লোক পুলিসের গোবু-তাড়ানো দেখে তাদের বাড়িতে এসে জড়ো হলো। বুড়ি এসে দেখল তাদের বাড়িতে একটা জাত বসে গেছে।

ডাল-কাটা শিরীষ পোয়াটার ঠেস দিয়ে আছে রেবা, খল'র জামাই দোসাটা মইটার ওপরে, সে আর আর-একজন কে তার সঙ্গে বসে কথা বলছে। বেশিরভাগ লোক তাদের গোবু-বাছুর-ছাগল এগুলো ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বুড়ি আরও একটু কোমর ঠেলে ঠেলে এল লোক-ঘেরা গোবু-বাছুরগুলোর দিকে। ম্যানেজারের সঙ্গের কর্মী ডাক দিয়ে জিগ্যেস করছেন—বলুন কালো দামড়াটা কারা নিতে চান?

লাটু বীণাকে বলছে—তুমি দেখো না, আমার জিনিস, ও কেউ ডাকবে না। একই গ্রামের লোক, আমি তো কারো ক্ষতি করিনি!

প্রভাত কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে ঘরের দিকে আর নিবু কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যাচ্ছে ঠাকুমার দিকে।

বুড়ি জিগ্যেস করছে—কি হয়েছে রে নিবু?

—আমাদের গোবু-বাছুর নাকি সব কোরক হবে? হ্যাঁ ঠাকুমা কোরক কি? নাকি আমাদের গোবু-বাছুর সব অন্য লোককে বিচে দেবে? আমাদের ঘরের নাকি চৌকাঠ তুলে নিবে, থালা-বাসন সব নিয়ে চলে যাবে!

লাটুর মায়ের মনে পড়ল—ও, তখন তাহলে এদেরই মোটর গাড়ি অত প্যাঁক-প্যাঁক করছিল, গোবু-বাছুরগুলো কি তড়কে উঠেছিল। ছেবকি তো লেজ তুলে ছুটতে শুরু করে দিল। তখন রামপদর ঝি দৌড়ে এসে তাকে বলল বটে—ও বুড়ি দি, তোমাদের ঘরের দিকে পুলিস কেন গো, লালটুপি পরা!

শ্যামা ভাবছে ছ' দাঁতের দামড়া বাছুর, সস্তায় পেলে যা ভাববে-ভাববে, কিনে ফেললেও হয়। হাটে দাঁড় করালে সাত-আটশ টাকা, দেড়শো-দুশো দেব, দেবে তো দাও! শ্যামাই দো-সাটা মইয়ের ওপরে বসে খল'র জামাইয়ের সঙ্গে গল্প করছে। গল্প হচ্ছে গোবু-ছাগল নিয়ে। খল'র জামাই বলল লাটুর হালসাটটা বড় জুতের।

—জুতের মানে! শুধু বোঁটা জাঁকতে পারলে হয়। মনে মনে আড়াইশো পর্যন্ত

দরে উঠে গেল শ্যামা, কিন্তু কাউকে বলল না।

লাটুর মা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুকুর পাড়ে। এখন তার কি করণীয় সে জানে না। নিরু তার বেঁকে যাওয়া কোমর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময় সবাই দেখছে টিট দুপুরের রোদটা পুকুরের জলে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। লাটুর মা দেখছে করুণ-বিষণ্ণ একটা আলো।

লাটুর বাড়িটা এখন রীতিমতো উৎসব-মুখর হয়ে উঠেছে। মেলার দোকানের সামনের মতো, যেখানে-সেখানে জটলা। এই আনন্দ-উৎসবে হঠাৎ দুজন বাচ্চাকে কাঁদতে দেখা গেল। দুজনের কাছেই বই-খাতা। তাদের বাড়িতে ক্রোক না নীলাম হচ্ছে বলে টিফিনেই তাদের ছুটি দিয়ে দিয়েছে। প্রধান শিক্ষক জিগ্যেস করলেন—তোমার বাবা কোথায় লোন নিয়েছিলেন ?

নিরু বলল—ব্যাঙ্কে।

—ব্যাঙ্কে তো অন্তত সুদটা দিয়ে দিলেও তারা কিছু বলে না ! লাটুবাবু সুদটাও দেননি ?

নিরু স্কুল থেকেই কাঁদতে শুরু করেছে। প্রধান শিক্ষকের ভয়ে এতক্ষণ কম-কম ছিল, এখন কাঠের মতো ঠাকুমাকে জড়িয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। আর প্রভাত কাঁদছে লুকিয়ে গোয়ালের খুঁটি ধরে। যখন ম্যানেজারের সেই লোকটা জোর করে টাকার অঙ্ক ডেকে ওঠে—দু'শো সাতান্ন...দু'শো সাতান্ন....তখন আরও জোর করে কেঁদে ওঠে প্রভাত।

লাটু সব শুনতে পাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল বীণার গলা, তারপর শুনল, না—বীণা সদর থেকে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছে—আমার গোরু-ছাগলে হাত দেবেন না, আমাকে আটটা দিন সময় দিন ! লাটু শুনল, বীণা নিতাইকে ডেকে এনে বলছে—ঠাকুরপো, আমাকে আটদিন অন্তত সময় দিতে বলো ! আমি যে করেই হোক ওদের শোধ করে দেব।

নিতাই গিয়ে পঞ্চায়েতকে ডেকে আনল, পঞ্চায়েতের সঙ্গে ভূপতিকাকুও এলেন। বীণা বোধহয় শেষ কথা কিছু একটা বলবে বলে ডেকেছিল, কিন্তু এমন কান্না ঠেলে আসছে যে বলতে পারছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিতাই সামাল দেয়, সে-ই জিগ্যেস করে, তাহলে এখন কী করা যায় ?

ভূপতিকাকু হাতের ওপর হাত আছড়ে বললেন—আমি একটা কথা বলব শুনবে বউমা ? তাহলে এক্ষুণি কোরক-টোরক বন্ধ হয়ে যাবে।

বীণা তাকাল, সবাই তাকাল। লাটুও উদগ্রীব হলো শোনার জন্য।

ভূপতিকাকু বললেন, ভাটার বড়বাবু, ভাটায় এখনও আছে, তুমি গিয়ে তাকে ধরো, হাতে-পায়ে ধরলে দু'টো হাজার টাকা ঠিক দেবে। আমরা বরং ম্যানেজারবাবুকে বলে-কয়ে ওতেই রাজি করাব।

লাটুর বউ চমকে উঠল। আরও চমকে উঠল লাটু। সে শ্যালো-মেসিন বসিয়েছে, এ বছর সাত ঝাড় কাঁঠাল লাগিয়েছে, কলা লাগিয়েছে, ছোট্ট একটা চাষঘর করেছে, দুয়োরের সামনে তুলসী গাছ লাগিয়েছে। ওই জমিটা তাকে ইটভাটার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। লাটু ভেতর থেকে গর্জে ওঠে—আরে বলছে কি, তিনটে ফসল হয় !

ভূপতিকাকু বললেন—আর ভেবো না, লাটুকে আমরা সবাই মিলে বুঝিয়ে বলব। ভাটার বড়বাবু তোমাদের জমি পাবে জানলে যেখান থেকে হোক টাকা জোগাড় করে দেবে।

লাটু ঘরের কোণে বসে-বসে তখন বুক চাপড়াচ্ছে—না, ভাটায় আমি জমি দেবো

না!

পঞ্চায়েত বললেন—হ্যাঁ, মন্দ বলেননি! ওরা তো পাঁচ বছরের লিজ নেবে, পাঁচ বছরের পর তোমাদের জমি ফেরত পাবে।

—তুমি মনকে বুঝে দেখ বউমা!

নিতাই পঞ্চায়েত-কে বলল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, সব হবে, আগে শালার নীলামটাকে বন্ধ করুন তাড়াতাড়ি গিয়ে, নইলে তো কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

মনু বলছে—লাটুর পুকুরে মাছ আছে, মাছগুলো তুলে বেচলেও কিছু—

—কি আর মাছ আছে, মোরলা—দেঁড়ে...

—আরে তারও কি আজকাল কম দাম!

—আসলে তোমরা যাই বলো, লাটু একটু কুঁড়ে! ভরত জানার সঙ্গেই বেশি আড্ডা দেয়।

—সংসারে সবই তো দেখে বউ।

—মা তো সারাদিন বাঁকা কোমর নিয়ে গোরু বাগালি করে মরছে।

—গোরু-ছাগল নীলাম হলে আগে ওই বুড়িটাই হার্টফেল করবে।

মনু বলল—কিন্তু আমার কথা হলো, তুই যদি খাটতে পারবি না তাহলে তুই অত টাকা লোন করবি কেন?

—আলুটায় মার খেয়ে গেলো বেচারা। তিরিশ টাকা কুইন্টাল আলু গেল বন্যার পর বছর।

—সে তো হরিও লাগিয়েছিল তিন বিঘা।

—হরি আর লাটু! হরির কত হিসেবের চাষ।

মনু বলল—যা শালা, খাসি জোড়াটা পঁয়তাল্লিশ টাকায় পেয়ে গেল নিয়ে নেব—দুটোয় সাত কিলো মাংস তো হবেই।

লাটুর বউ টুক করে ঢুকে গেল, এখন সদর দিয়ে এত লোকজন যাওয়া-আসা করছে যে ভয়ে লাটুর ঘরে অনেকক্ষণ ঢুকতে পারছে না।

লাটু আগের মতো সেরকমই বুকে কিল মেরে যাচ্ছে—না ভাটায় জমি দেব না।

আজ সাত বছর ধরে ভাটাওয়ালা টোপ দিয়ে যাচ্ছে। তার পোয়ানের একেবারে সামনের জমি। পাশাপাশি জমির চাইতে ভালো মাটি। ভালো দাম দিতেও চেয়েছে কিন্তু লাটু রাজি হয়নি। সে সেখানে একটা বাগান করবে, নারকেল-সুপারি...লাটুর মা মারা গেলে মাঝখানে একটা চাতাল করে সমাধি করবে, গায়ে তার মা'র নাম লেখা থাকবে—শ্রীমত্যা গুণীবালা দাসী।

লাটু সকাল-সন্ধ্যা মাঠে যেত আর এই সব ভাবতো।

বীণা কাছে আসতে লাটু মুখের ঢাকাটা খুলল। গরমে ঘেমে গেছে।

বীণা ডাকলো—শুনছো!

লাটু চাপা গলায় যতটা জোরে বলা যায়, বলল—ভাটায় জমি দিয়ে দিলে আনাজ-তরকারির চাষ করব কোথায়? তাহলে শ্যালো-মেসিন কী হবে? বলে দাও, শ্যালো-মেসিন চাই না, আপনারা ফেরত নিয়ে যান।

লাটু শেষকালে ভেঙে পড়ে—এই তিন বছর জাতপাত লড়ে চাষ করেছি কিন্তু কিচ্ছু হয়নি, ব্যাঙ্কের সুদটাও দিতে পারিনি।

—তাহলে চাষ করে কী হবে ? যেদিন হোক জমি বেচে তো লোন শোধ করতে হবে, তার চেয়ে ভাটায় দেওয়া ভালো, পাঁচ বছর পর ফেরত পাব !

—তারপর খাব কি ?

—মুনিস খেটে !

—আমি বড়োবাবুর কাছে যাচ্ছি, দেখি যদি পাওয়া যায়।

ভূপতিকাকু ম্যানেজারবাবুকে আবার একটা গল্প বলছেন।

—জানলেন ম্যানেজারবাবু, যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম একবার প্রশ্ন করেছিল যে, পৃথিবীতে সুখী কে ? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, যে অঋণী। অঋণী হয়ে দুবেলা যদি শাকান্ন খেয়েও থাকা যায় সেই হলো সুখী।

নিতাই বলল—থামুন তো ! লোকে শাক-অন্ন জুটাতে পারছে না, লাটু কি আর দশটা নাড় রেখেছে যে ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙে ফেলেছে ?

বচা বলল—কী যা-তা ভাযা বলছো ! তাদের আইনে যা আছে করবে, আমরা কে কী বলব।

পঞ্চায়েত বললেন—নিতাইবাবু, আইন আপনারা দেখেননি, আপনারা তখন ছোটো। আপনার কাকার সঙ্গে রাজবল্লভ ঘোষের যখন মামলা হয় তখন হঠাৎ একদিন শোনা গেল বৃন্দাবন দাস মার্ডার হয়েছে, ব্যাস। তখন দেখেছিলাম আইন, পেছনের কাপড় তুলে-তুলে ফাটিয়েছে পুলিস। তখন শুধু পুলিস দেখলে কে কোনদিকে যে ছুটতো তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এখন আইন কোথায় ? আমরা পঞ্চায়েত কিন্তু আমাদের হাতে সেরকম ক্ষমতা কোথায ? এই যে ম্যানেজারবাবু, একটা অত বড় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ওঁর কতোটুকু ক্ষমতা আছে !

ভূপতিকাকু বললেন—বললাম না হাত-পা বাঁধা !

সুধার বউ ভাঙা কাঁথের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে, অত লোকজন দেখে। মাঠ থেকে এসে খেয়ে-দেয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে সুধা। তার মা-বাবা ঘরগুষ্টি গেছে লাটুদের গণ্ডগোল শুনে। সুধা ক্রোক জিনিসটা কি রকম দেখেনি। কি নাকি ভিটেয ডুগডুগি বাজানো আছে। একবার তার ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু সকলে চলে যাচ্ছে দেখে তার তখন অন্য উৎসাহ জাগলো।

সুধার বউ কিরণ, কিরণকে ডাকল—এই শালাইটা একটু দিয়ে যাও তো।

আটমাস হলো বিয়ে হয়েছে, কিরণকে সব সময় সুধার দারুণ লাগে। বিড়ি ধরাবে বলে দেশলাইটা চাইল, কিন্তু কেউ শুনছে বলে মনে হলো না। ঘাড় তুলে জানালা দিয়ে দেখল একটা কলাপাতার ছায়া নড়ছে।

—লাটুর ঘরে নাকি পুলিসও এসেছে ?

সুধার মা বলল—সরকারি টাকা, ব্যাঙ্কের টাকা, এসব না দিলে কোরক হয়। আমাদের একবার কোরক হয়েছিল—পঞ্চাশ টাকার গ্রুপ লোন লিয়েছিল তোর বাবু শোধ দেয়নি, হেডম্যান ছিল ইন্দ্রা। সে একদিন এসে আমাদের এত বড় দুশো টাকা দামের গাভীন ধাড়িকে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। বলতে বলল, কোরক এসেছে, আজকেই টাকা দিতে হবে, টাকা আর টাকার সুদ আনো, তবে ছাগল ছাড়বো।

সুধার বাবা শ্যামাপদ লাটুর গোরু-বাছুর-ছাগল নীলাম হবে শুনে সুধার মাকেও ডেকে নিয়ে গেল, যদি সস্তায় উঠে তাহলে দৌড়ে টাকা নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেবে। শ্যামাপদর বন্ধু খল'র জামাই। যাওয়ার পথে তাকেও সঙ্গে নিল ; বন্ধু, চলো দেখি, নীলামে একটা-দুটা কিছু তুলতে পারি কিনা !

—সত্যি নীলাম হবে?

—খবর শুনে তো যাচ্ছি।

সুধার বাবা ভাত খেয়ে হাত ধুয়ে না ধুয়েই বেরিয়ে পড়েছে। হাত ধুতে গিয়ে সেও একবার ওই ভাঙা দেওয়ালটায় উঠেছিল। তারপর সে সুধার মাকে খেতেও দিল না ; যাবে তো চলো, নীলাম হয়ে গেলে গিয়ে আর কী হবে? দেখা-জানা গোরু, আর ক'জনার ঘরে টাকা বাঁধা আছে!

খল'র জামাই বলল—তাহলে আমিও গোটা পঞ্চাশেক টাকা লিয়ে লি, দেখি যদি চোখে লাগার মতো কিছু, তাহলে কাজে লেগে যাবে।

সুধা ডাকল কিরণকে—কিরণ।

নিজেই উঠে বিড়ি ধরাল। কাপড় কাচতে গেল?

সুধা বাইরে এসে খুঁজল কিরণকে। দেখল ভাঙা কাঁথড়ার দেয়ালে উঠে দেখছে। সেও উঠে গিয়ে দাঁড়াল একপাশে।

কিরণ বলল—যাবে কোরক দেখতে? চলো না!

তারা ঘরে তালা বন্ধ করে দিয়ে এল ক্রোক দেখতে। নবীনের বউ, বচার বউ, এরাও এসে দাঁড়িয়েছে কলতলায়।

—দিদি কী হলো গো, গোরু-বাছুর বিক্রি হয়ে গেল?

কলতলার পাথরের ওপর উঠল নবীনের বউ।

—দূর কিছুছু দেখা যাচ্ছে না। উমা যা না গো, দেখে আসবি কি হলো।

—না বাবা পুলিস আছে।

—পুলিস কি খেয়ে ফেলবে নাকি? তোরা ছোট বলে বলছি!

—আমি যাব না।

রাজলক্ষ্মী পিসি নিতাইদের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। লাটুর সবচেয়ে কাছের বাড়ি নিতাইদের। এখান থেকে গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রাজলক্ষ্মী পিসি সামনে যে আসছে তাকেই বলছে—দেখ বাপু চাষ করতে পার আর না পার লোন লিবিনি! আমার আলু-গমে দরকার নাই বাবা!

চা খাওয়ার পর বিজয়ের অনেকক্ষণ থেকে খইনি খেতে ইচ্ছে করছিল। ক্রোকের ব্যাপারটা ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না, আবার লাটুর স্ত্রী মামীকেও চাইতে কেমন লাগছে। এ রকম সময়—মামী একটু খইনি দাও তো, বলা খুব খারাপ হবে, এরকম একটা শোকের সময়! ওদের ছেলে-পুলে কাউকে দেখলে চাইত। বিজয় তখন থেকে মনে মনে নিরু কিংবা প্রভাতকে খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে গোয়ালের পাশের দিকে এল। হঠাৎ শুনতে পেল, কে একটা বাচ্চা গোয়ালের ভেতরে আস্তে-আস্তে কাঁদছে। বিজয় গোয়ালে ঢুকে দেখল, প্রভাত।

কাছে গিয়ে জিগ্যেস করল—কে রে, কাঁদছু কেন রে? চুপ কর! যা দেখি তো ঠাকুমার পানের বাটা থেকে একটু খইনি-দোক্তা আনবি—যাঃ!

কিন্তু কি হলো, প্রভাত আরও জোরে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেল গোয়াল থেকে। বিজয় দেখল, সে ঘরের দিকে গেল না, সার ডোবার আমগাছেব দিকে ছুটে পালাল।

বিজয় ফিরে এল, মুখটা তার ভীষণ টক-টক লাগছে। চা না খেলেই হতো। এমনিতে সে দোক্তা পান সঙ্গে না নিয়ে কোথাও বেরোয় না। তাড়াহুড়োয় চলে এসেছে।

চা দিলি, একটু মুখশুদ্ধি দিবি না। লাটুর বউ মামীর ওপর একটু চটে গেল বিজয়। অ-বনেদি বাড়ির ঝি হলে যা হয়!

বিজয় ঠিক করল—এদের ঘর-দুয়ার তো এখন হাট করে খোলা, লোকে ঢুকছে-বেরুচ্ছে। সেও সকলের মতো ঢুকে গিয়ে একটু খইনি খেয়ে আসবে। দেখতে পেলে বলবে—মামী গো, তোমার শাউড়ির একটু খইনি খাচ্ছি গো! কি আর বলবে, হাজার টাকার মাল লযছয় হতে যাচ্ছে, আর এতো একটু খইনি।

কিন্তু ভেতরে ঢুকে শুনল, লাটুর বউ মাথা আঁচড়াতে-আঁচড়াতে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে আকুলি-বিকুলি হয়ে কাঁদছে। কান্নার সুরটাও এখন অন্যরকম। বিজয় বুঝতে পারে একটা চরম সর্বনাশের মুখোমুখি সে এসে দাঁড়িয়েছে। তার খইনির নেশা কখন উবে যায় সে বুঝতে পারে না।

শ্যামল দেখল অঞ্জনা জবা গাছটার আড়ালে ভাইপো না ভাইঝিকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বাড়ির সকলেই এখানে চলে এসেছে কী হচ্ছে দেখতে। শ্যামল একটা জবাফুল তুলবার নাম করে গেল। বুকের ভেতরটায় টিপ-টিপ করছে, তবু সে গিয়ে সত্যি সত্যি লাফিয়ে একটা ফুল তুলল। ফুলটা অঞ্জনার কোলের বাচ্চাটার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, অঞ্জনা ঘরের দিকে একটু এসো তো, দরকার আছে। শ্যামল আগে-আগে যাচ্ছে, অঞ্জনা পেছনে পেছনে। হঠাৎ দুজনেরই একসঙ্গে মনে হচ্ছে তাদের ভীষণ সাহস এখন। এখন তারা যা খুশি করতে পারে, সকলে মন-প্রাণ দিয়ে ক্রোক দেখছে।

কোলে ভাইঝি ছিল, তাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে এল। বউদিকে বলে এল, আমি যাচ্ছি, ওই যে শ্যামলদা যাচ্ছে, সে নাকি দেশলাই নেবে।

সত্যিই কারুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। অঞ্জনার বউদি বাচ্চার হাতটায় ধরল, এইটুকু পর্যন্ত, তারপর কে কি বলল সে শোনেনি।

সুধা, সুধার বউ এসে দাঁড়িয়েছে লাটুদের তেঁতুল তলায়। ওদিকটায় বেশির ভাগ মেয়েদের ভিড়। ক্রোক জিনিসটা কী, মুখে শুনে জিনিসটা ঠিক বোঝা যায় না। তারা দেখছে সাতটা গোরু বাঁধা আছে পর পর। বোঝার সুবিধার জন্য প্রত্যেকটায় একটা করে নাম্বার ঝুলিয়ে দিয়েছেন ম্যানেজার। ডান দিকের কালো হেলে এক নাম্বার। ওটার দিকেই সুধাদের সকলের লোভ। বাঁয়ের সাদা হেলে দুই, বড় শিঙ ভাঙা লাল গাই তিন, বড় বকনা চার—। ছাগলের ক্ষেত্রেও খাসি এক, খাসি দুই...—।

ম্যানেজারের অ্যাসিস্টেন্ট ডাক দিচ্ছেন—দুশো পঞ্চান্ন...দুশো পঞ্চান্ন।

শ্যামাপদ দুম করে বলে বসল—দুশো ষাট।—ডেকে দিয়েই খল'র জামাইকে বলছে—বন্ধু দশ-বিশ টাকা যদি লাগে দিও।

খল'র জামাই বলল—কিন্তু আমার কাছে মোটে তো পঞ্চাশ আছে, আমি ছাগল ধরব। দেখো তুমি নীলাম ধরছ ধরো, আমি কোনো টাকা-পয়সা দিতে পারব না।

সুধার মা বলল—পালিয়ে চলো তো, এ সব লোকের কতো কষ্টের জিনিস, আমার ঘরে দেখবে আর হা-নিঃশ্বাস ফেলবে। টাকা দিয়ে কিনব তো হাটে কিনে লিব।

শ্যামাপদ ডানদিকের কালো হেলেটাকে ভুলতে পারছে না। গোরুটার ঠাট-বাট সবই মন কেড়ে নেয়। সে ফিসফিস করে সুধার মাকে ডাকল ; শোন, বউমার কানের জোড়াটা অর্জুনের কাছে রেখে...সস্তায় এরকম গোরু মরে গেলেও পাবিনি।

—কিন্তু কানপাশা তো বউয়ের কানে আছে।

—আমার নাম করে বলবি যা, তোমার শ্বশুর বলেছে, বললে খুলে দিবে।

একশো-দুশো যা দেয় নিয়ে আসবি....দৌড়ে যাবি—আসবি।

সুধার মা তেঁতুল তলার দিকে একটু এগোতেই দেখতে পেল সুধা আর বউমা দাঁড়িয়ে আছে। সে তক্ষুণি ফিরে এল শ্যামাপদর কাছে। সে নিজেও বেশ একটা উত্তেজনা পাচ্ছে। কাপড়টা পরেছে হাঁটু থেকে এক চাক্কর নিচে, নীল দাঁত পাড়, সাদা জমি। বাকিটা বুকের দিকে ফেলে গায়ে ঢাকা নিয়েছে। তার এখানেই জন্ম, সুধার বাপ বাইরে থেকে এসে এখানে সংসার করছে। গাঁয়ের মেয়ে বলে সুধার মা কখনও মাথায় কাপড় দেয়নি।

শ্যামাপদকে ডেকে বলল—বউমা তো কোরক দেখতে এসেছে, এখানে এত লোকের সামনে কানপাশা খোলার কথা তাকে বলব কি করে?

—শালা বুদ্ধি তো নয়, একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে যাবি তো! যা চট্ করে যা...!

শ্যামল অঞ্জনাকে বলল—দাও আগে এক গ্লাস জল দাও তো!

—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কি বলো?

সত্যি সত্যি গ্লাস নিয়ে জল গড়াতে যাচ্ছিল অঞ্জনা, শ্যামল তার শাড়ির পেছনটায় ধরে ফেলল। অঞ্জনা বলল—আঃ কেউ এসে পড়বে যে!

শ্যামল দেশলাই নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। অঞ্জনা জিগ্যেস করলো—সত্যি লাটুদা'দের গোরু-বাছুর সব বিক্রি হবে?

—বিক্রি কি, নীলাম! ডাক হচ্ছে। তবে লাটুদা'র বউ নাকি বলেছে তাকে আরও একঘণ্টা সময় দিতে।

—যে লোক আজ পাঁচ বছরে টাকা জোগাড় করতে পারেনি সে একঘণ্টায় জোগা করে ফেলবে?

—ইটভাটার বড়োবাবু নাকি দেবে বলেছে।

—হ্যাঁ, টাকা তো ওর জন্য লোক বেঁধে রেখেছে, শুধু গেলেই হলো! বড়োবাবু সে সময় লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে লবাইলটা হয়ে গেল, লাটুদা না ছাড়া হ্যাঁ করল না!

হঠাৎ অঞ্জনা নিজেই একেবারে কাছে সরে এল শ্যামলের। ঝাঁ করে অঞ্জনার একটা ঝাঁজ লাগল গায়ে। শ্যামল সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরল দুহাত দিয়ে। কিন্তু অঞ্জনা বলছে—শ্যামলদা, তোমার কাছে টাকা আছে? তাহলে ওদের ছ্যাব্কা বক্না বাছুরটা নীলামে ধরতাম। তার কাছে বারো টাকা কত পয়সা যেন আছে, কিন্তু ওতে কি আর অত বড় বাছুরটা দিয়ে দেবে? সকলে তো হাঁ করে আছে। সে বারো টাকা চল্লিশ পয়সা বললে, কত লোক আছে সঙ্গে সঙ্গে তের টাকা বলবে। আরে দাম তো দুশো-আড়াইশো। এবার একটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরল শ্যামল, অঞ্জনাও বাঁ হাতটা তার পিঠে ফেলল শক্ত করে।

শ্যামল সিগারেটটা আবার জ্বালল, কখন নিভে গেছল, বলল—দেখি কারো কাছে পঞ্চাশ একশো ধার পাই কিনা! সময় থাকলে শালা দু' চার মন ধান বিক্রি করে দিতাম! আমি সাইকেলটা নিয়ে যাচ্ছি।

শ্যামল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে অঞ্জনা নিজেই দু' পা ঘুরে দু'বার নেচে নিল। হাত দুটো মুঠো করা, মুঠোয় যেন খুশি ধরে রাখছে!

দ্রুত ঘরে ঢুকে শাড়িটা বদলে নিল অঞ্জনা, ম্যাচ করে ব্লাউজ পরল। যেন সে মহারানী হতে চলেছে এরকম ভঙ্গিতে বড়ো বউদিকে গিয়ে বলল—ঘর আলগা রইল,

আমি নীলাম ডাকতে যাচ্ছি। তার টিনের বাক্সে লুকানো কটা টাকা ছিল, আঁচলে বেঁধে নিয়েছে! সেও এসে দেখল লাটুদা'র বউ বীণা কপালে টিপ পরছে আর কাঁদছে।

দুটো পা-ই পেছন দিকে মুড়ে বসেছে, সামনে ছোট আয়না। ছোট ছেলেটা হাতের মধ্যে গলে গিয়ে জামা তুলে মাই খাবে বলে ভীষণ তেড়ে-ফুটে উঠেছে। চোখের জল আর কপালে একটা ধাবড়া সিঁদুরের টিপ, ঝড়ে সব মুকুল খসে পড়া মরা আমগাছের মতো মনে হচ্ছিল অঞ্জনার।

অঞ্জনার দুই দাদা এসেছে, বচা-নবীন। তারা কেউ ডাকবে না। অঞ্জনা রেবার কাছে গেল, সে তখন থেকেই শিরীষ পোয়ায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ আরাম করে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ানোর জায়গা পেয়ে গেছে। সে আর কোথাও সরেনি। অঞ্জনা গিয়ে তাকে জিগ্যেস করল—রেবা, তুই কিছু ডাকবি নাকি ?

--না।

--কেন, ওরা কিছু বলবে ?

--কে কী বলবে ? সরকারের লোক, যে কিনবে তাকেই বেচবে।

--তাহলে তুই ডাকবিনি কেন ?

—আমার টাকা নাই। আর শালা আমারও তো লোন আছে, একশো টাকার সার লিয়েছি গত বছর।

--আরে এ বাজারে কার ধার নাই, সকলের আছে। টুকু পল্ম অতো বড়ো চাষী, বাজরে তারও নাকি যাট হাজার টাকা দেনা।

—কিন্তু ওদের তো কান্নুর কোরক আসেনি!

—আসবে কেন, লাটু যে রোগা, তারা যে এরকম...

মনটা খারাপ করে দিল অঞ্জনার। সে একবার গোরুবাছুরগুলোর দিকে গেল। বক্‌না বাছুরটার গা'র তিনটে রঙ—লাল-সাদা-কালো, সূর্যের তেজটা কমে এসে ঠিক বিকেলের দিকে, যা সুন্দর দেখায় না!

ম্যানেজার বলছেন—পঞ্চায়েতবাবু আপনিও ডাকুন!

—না, উনি সরকারি লোক, উনি আর কী করে ডাকবেন!

—আরে বাবা উনি তো আপনাদের গাঁয়ের লোক। ওঁরও তো গাইয়ের দুধ দরকার, সেজন্য গাই চাই, মাটি কর্ষণ করার জন্য বলদ চাই। কি, এসব ওঁরও চাই তো ? তাহলে আপনাদের সকলের মতো উনিও একজন ক্রেতা। ব্যাঙ্ক নীলাম ডাকছে, সে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত ক্রেতা হতে পারেন। গোরু নিয়ে কে কী করবে, আমাদের তাও জানার দরকার নেই, তবে নিয়ম হচ্ছে মালটা যেন হাইয়েস্ট দামে সেল হয়।

—হ্যাঁ সে তো বটেই।

—তার আগে আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ঠিক করে নিতে হবে। অর্থাৎ কোন্ গোরুটার কী দাম, কোন্ ছাগলের কী দাম ? আমি তো লোক্যাল প্রাইস সম্পর্কে সঠিক ওয়াকিবহাল নই, তাই আপনারা পাঁচজনে ঠিক করুন কোনটার কী দাম হবে।

ম্যানেজার অ্যাসিস্টেন্টকে ডাকলেন। বললেন, কোন্‌টার কী দাম ঠিক হচ্ছে এক-দুই করে লিখে রাখুন।

এক নাম্বার ডান দিকের কালো—

ভূপতিকাকু বললেন—এই গোরুটারই সবচেয়ে ভালো দাম হবে, আমার তো মনে হয়—

—মনে হয়-টয় কেন, যা দাম হবে বলে আপনার ধারণা, আপনি সেটাই বলুন।

পঞ্চায়েতবাবু আছেন, বচাবাবু, নিতাইবাবু, নবীনবাবু আপনারা বলুন দামটা ঠিক হলো কি হলো না।

--আমার তো মনে হয় হাটে দুশো টাকার ওপর বিক্রি হবে।

—হ্যাঁ, সেই ওপরটা কত খুলে বলুন। দশ না বিশ না পঞ্চাশ!

—না, পঞ্চাশ অত যাবে না, কিরে ফকির, দুশো দশ-বিশ—

দামটা যত কম থাকে ততো যেন সকলের লাভ। ব্যাপারটা বোধহয় বুঝে ফেলেছেন ম্যানেজারবাবু। সেজন্য তিনি বড় খাসিটায় কত কিলো মাংস হবে তুলে দেখতে গেলেন। সে সময় ভূপতিকাকু পঞ্চায়েতকে-বিজয়কে, তখন অঞ্জনাও এসে গেছে, বলল—বুঝলে না, দেশের জিনিস আর এক ভাই কিনবে, বেশি টাকা দিতে যাব কেন? প্রত্যেকেই খুশি, আরও চাইছে প্রত্যেক জিনিসের দাম যেন আরও কম-কম থাকে। ডানদিকের কালো হেলেটা যদি এক পয়সার লটারির মতো পেয়ে যেত, এ রকমই অদ্ভুত-অদ্ভুত বিশ্বাস এসে যাচ্ছে সকলের মনের মধ্যে।

অঞ্জনা জিগ্যেস করল—ছ্যাবকা বাছুরটার দাম কত হয়েছে?

ওটার প্রতি কারুর তেমন লোভ নেই। বাছুরটা ভালো, বড় জাতের। কিন্তু অনেকদিন পালন করতে হবে, সেজন্য সকলের লক্ষ দুধেল গাই, হেলে-বলদ, জোড়া খাসি, গাভীন ধাড়ি।

ভূপতিকাকু বচাকে জিগ্যেস করলেন—কত রে?

—কি জানি, ওটা ঠিক মনে করতে পারছি না।

—পঞ্চাশ টাকার বেশি?

পঞ্চায়েতবাবু হাত নাড়লেন।—না-না, ওই রকম বাছুরের অত দাম একটারও ধরা হয়নি। অনেক কম।

—তিরিশ টাকার চেয়েও কম?

বচা বলল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই বড়জোর আঠাশ-তিরিশ টাকা হবে। লিবি তো টাকা জোগাড় করবি যা!

—আমি লিব।

সুধার বউকে সুধার মা আলাদা করে ডেকে নিয়ে গেল। মাকে দেখেই সুধা জিগ্যেস করল—বাবা কোন্‌টা ধরেছে?

—ডানদিকের কালোটা।

—খুব ভালো গোরু। হালে-মইয়ে দেখতে হবে না। আমাদের সাদাটার সঙ্গে খুব ভালো জোড়া হবে।

সুধার বউ যেতে যেতে জিগ্যেস করল—মা, গোরুটা কত টাকায় হলো?

—হয়নি, টাকা কম পড়েছে। সেজন্য তোমার শ্বশুর কানপাশা জোড়াটা চাইছে। বন্ধক দিয়ে একশো-দুশো যা দেয়—।

কানে হাত দিয়ে একটু থমকে গেল সুধার বউ। খুলতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু ভেতরের ইচ্ছেটা বাইরে একটা জোর এনে দিল, তার মনে হলো এরকম পবিত্র কাজে সোনা-দানা যদি না কাজে লাগে, তবে আর কখন লাগবে!

চটপট করে কান থেকে খুলে দিয়ে বলল—মা, বাবাকে বলো না, কালো বড় ছাগলটাও যেন ডাকে!

—অত টাকা কোথা?

সুধার মা কানপাশাটা নিয়েই একরকম দৌড়ে চলে গেল। অর্জুনের দেখা না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সুধার বউ সুধাকে জিগেস্য করছে :

—কি ?

—একটা কিছু ডাকো না, আমার কাছে পাঁচসিকা-দেড় টাকার মতো আছে।

—ওতে কী হবে ?

—আমি বরং এক দৌড়ে লিয়ে আসি। যদি কিছু হয়ে যায়! শুনলে তো ডানদিকের কালো হেলেটা...নাকি হাটে সাত-আটশো টাকা দাম হবে!

সুধার বউ শাড়িটা ঝুলিয়ে পরেছিল, বেশ খানিকটা ওপরে তুলে গুটিয়ে নেয়। ছাগলটার ওপরেই তার বেশি নজর, বিয়েনে তিনটে করে বাচ্চা হয়।

ম্যানেজারের সঙ্গের কর্মচারী ডেকে যাচ্ছেন—এক নাম্বার কালো হেলে দুশো ষাট...দুশো ষাট!

ম্যানেজার বলছেন—উনি বললেন তো একঘন্টা সময় দিতে, কিন্তু যদি টাকা না পান তখন এতোগুলো গোরু-বাছুর-ছাগল নীলাম করতে তো রাত দশটা বেজে যাবে।

বচা বলল—না-না আপনারা চালিয়ে যান, ও টাকা পাবে বলে মনে হয় না।

ভূপতিকাকু সেরকমই হাতের ওপর আর একটা হাতের উল্টোদিকের চড় বসিয়ে বললেন— আমার মনে হচ্ছে পেয়ে যাবে। লাটুর জমিটা না পেলে আগের দিকে ভাটা বাড়তে পারছে না ; সেজন্য সে সময় লাটুকে দু'তিনশো টাকা বিঘা প্রতি বেশিও দিবে বলছিল।

—সেদিন আর নেই। বড়োবাবু কুলিদের পেমেন্ট দিতে পারছে না। ইট তো গত বছর থেকে রাশি হয়ে পড়ে আছে। বাজারে বাহাত্তর টাকা ব্যাগ সিমেন্ট, লোকে বাড়ি-ঘর করবে কি ?

কেউ বলল, বিল আটকে গেছে ভাটার মালিকের। কোথাকার হুড্ডা কোম্পানিকে সত্তর হাজার টাকার ইট সাপ্লাই দিয়েছিল, তার একটা কানা পয়সাও আদায় হয়নি। কেউ বলল, বড়োবাবুর মেয়ের দেখাশোনা চলছে, পাকা হয়ে গেলে এ মাসেই বিয়ে। বৈশাখ নাকি মল মাস।

বিজয় বলল, আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, মামীকে কখনও টাকাপয়সা দিবেনি। শুধু বললে হলো, মেয়েমানুষের মুখের কথায় বড়োবাবু অতগুলা টাকা দিয়ে দিবে ?

মনু জিগ্যেস করল, কি, ডাক হবে, না হবে না বলুন ?

সকলে বলল—ডাক হোক!

বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সকলে। দুশো ষাট—দুশো ষাট...

—দুশো সত্তর।

রক্তের মধ্যে একটা দোলা লাগছে, ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। পঞ্চায়েত, ভূপতিকাকুও বললেন—চালিয়ে যান ম্যানেজারবাবু।

ভূপতিকাকু নিজেই হাঁকলেন, যা হবে-হবে, জানা গোরু দুশো পঞ্চাশে হলে আমি নিতে পারি। শ্যামাপদ ডেকেছিল দুশো ষাট, ভূপতিকাকু লাফ দিয়ে উঠলেন, একি এক ধাপে দশ টাকা! পঞ্চায়েতবাবু এই প্রথম মুখ খুললেন, বললেন—আমার দুশো সত্তর রইল।

এক-দুই বলা হয়ে গেছে, এরপর তিন বলে একটু সময় দেবে, ওই সময়ে যে ডাকবে, হবে। এর পরে ডাকা চলবে না। সকলকে ভালোভাবে নিয়মকানুন জানিয়ে

দেওয়া হয়েছে, যে নতুন আসছে তাকে তার পাশের লোক বলে দিচ্ছে—এক-দুই-তিন-এর মধ্যে ডাকতে হবে আর নগদ টাকা চাই, বাকি রাখা চলবে না।

নিতাইয়ের ডাকাডাকিতে কোনো ইচ্ছে ছিল না, লাটুর বউ আজ তার সঙ্গে কি জানি কেন খুব ভালো ব্যবহার করছে। অনেক আগে, একটু একটু দুর্বলতা ছিল লাটুর বউয়ের ওপর, আর কিছু না হোক দেখতে ফর্সা মেম সাহেবের মতো ছিল। এখন খেটে-খেটে গার রঙটা বসে গেছে। একদিন সে লাটুর বউকে গা খুলে লাইতে দেখেছিল পুকুরে, পিঠ না সূর্যের আলো, সেদিন প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে সন্দেহ ছিল। কিন্তু সে হঠাৎ রেগে গিয়ে যা তা বলল, তাদেব ভিটে আসাই বন্ধ হয়ে গেল দুমাস-আড়াই মাস। আবার আস্তে-আস্তে যখন মিল হয়েছে তখন আরও দুতিন মাস কেটে গেছে। এমনি করে চলেছে, দু-তিন মাস ঝগড়া, দু-তিন মাস মিল। এখন সেই জমে আসছিল, লাটুর বউ সেদিন বলছে—ঠাকুর পো যা হাসাতে পারো না!

—যতি বিশ্বাস তাস খেলতে বসলে বসবে সকলের পিছনে। সকলের হাত তোলা হয়ে গেলে তারপর আস্তে আস্তে নিজের হাত তুলবে। নিজের তাস তুলছে, কিন্তু তাকিয়ে আছে অন্য লোকের হাতের দিকে। পাশের খেলুড়ে তখন নিজের মনে ডাকের কথা চিন্তা করছে—ষোলো ডাকবে না একেবারে আঠারো বলবে, কিন্তু বুড়া শালা তো তখন কি আছে না আছে সব দেখে নিয়েছে।

লাটু, নিতাই, বীণা শীতকালে উনুনের ধারে বসে-বসে গল্প করছে। লাটু বলল—শুধু আমরা দু বন্ধু বসলে আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলতে পারে না।

কিন্তু নিতাই পরের দিনই কুড়ালের প্রসঙ্গ নিয়ে রেগে গেল। নিতাই কাঠ কাটবে বলে কুড়াল খুঁজছে, শুনতে পেল লাটুর ঘরে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে গালাগালি—শালারা জিনিস লিয়ে যাবে, কাজের সময় দিয়ে যেতে জানে না!

লাটু শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এল কুড়াল নিয়ে।

—কেন, তোরা কোনো কিছু লিস না?

—ঢের শালা দেয়!

—বেইমান! এক পো করে দুধ দিয়েছি একমাস, মনে নেই?

—আর জরিপে যে আমিন আনা হয়েছিল তার টাকা যে আমি একলা দিয়েছি।

ব্যাস, তারপর প্রায় ফাটাফাটি হতে যায়, সেই থেকে কথা বন্ধ!

অনেকদিন পর লাটুর বউ আজ তাকে খাতির করছে। একদিন বলেছিল—ঠাকুরপো তুমি বড় ছোটলোক, তোমার মুখ ভীষণ কাঁচা! কথাটা সেদিন সে খুব মিথ্যা বলেনি। নিতাই মনে মনে উৎসাহিত হলো যদি সে নীলামে একটা কিছু ধরতে পারে তাহলে লাটুর বউকে ডেকে ফেরত দিয়ে দেবে। বলবে, কি আমি খুব ছোটলোক যে, নীলামের টাকাটা ধীরে-সুস্থে ফেরত দিও, তাহলেই হবে! এখন তার শুধু একটাই স্বার্থ, লাটুর বউ তাকে যেন এরকম একটু বরাবর পছন্দ করে।

ম্যানেজারবাবুর অ্যাসিস্টেন্ট তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে নিতাই দান ধরল, একেবারে লাফ দিয়ে বলল, তিনশো।

নিতাইয়ের ডাক শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠেছে। ভূপতিকাকু বললেন—কি ছেলেমানুষী করছিস! সকল কাজে কি ইয়ার্কি চলে?

—ইয়ার্কি কিসের, আমি কিনব।

—কিন্তু গোরুটার দামই তো অত হবে না!

ম্যানেজারবাবু বললেন—সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। সর্বোচ্চ মূল্য যাচাই

করে আমাদের সেল করতে হবে।

অ্যাসিস্টেন্ট প্রথমে লিখলেন, তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন—তিনশো...তিনশো...

লাটুর বউ গিয়ে ডাকছে—শুনছো ?

লাটু শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু কোনো সাড়া দিচ্ছে না। বীণা দেখল, কোণে চটমুড়ি নিয়ে বসে আছে। অন্য লোকেব পায়ের শব্দ ভেবে মুখ খুলছে না, বলল—আমি-আমি।

লাটু তবুও খুলছে না। —লোকটা কি পৃথিবীকে মুখ দেখাবে না বলে ঠিক করল নাকি ! বীণা এখন আর কাঁদছে না। একবার সে সত্যি কাঁদতে-কাঁদতে ম্যানেজারবাবুর পা জড়িয়ে ধরেছিল। লাটু যখন তাকে বারবার বলল—আঃ একেবারে পায়ে পড়ে যাবে, সেই টাক মতন বুড়ো ভদ্রলোক এসেছে তো ! লোক খুব ভালো, যে কোনো উপায়ে বিপদ থেকে উদ্ধার হতে হবে এখন !

পিঠে হাত রেখেছিল লাটু। যেন তার সঙ্গে সেও আছে, ভালোবাসা দেখিয়ে বীণাকে সে সে-রকমই বোঝাল। ম্যানেজারবাবুর পায়ে ধরার পর কিন্তু তার মনে হয়েছে লাটু ভীষণ চালাক, ভীষণ স্বার্থপর ! লোকটা অযোগ্য। মুখ ঢাকা নিয়ে সে বোধহয় কোনো এক ফাঁকে নিজের লজ্জা ঢাকতে বসেছিল।

পায়ে ধরতে ম্যানেজার উঠে পড়লেন।

—ছিঃ ছিঃ একি করছেন !

ভূপতিকাকু বললেন—তুমি কাজটা ভালো করলে না বউমা ! তুমি লাটুর মুখে চুনকালি দিলে। ঘরের বউ হয়ে তুমি বাইরের ভদ্রলোকের পায়ে ধরছো।

পঞ্চায়েত বললেন—উনি ভাবছেন আমাদের গ্রামের মেয়েরা সব এই রকম। টাকা ধার করবে আর চাইতে এলে মেয়েছেলে এসে পায়ে পড়ে যাবে ! যাও, উঠে ঘরে যাও !

বচা বলল—শুধু লাটুদা'র মুখে নয়, গ্রামের সকলের মুখে চুনকালি দেওয়া হলো।

চারদিক থেকে সকলের এখন শুধু পায়ে পড়ার কথা।

কাছে বসল বীণা। দরজাটা আধ ভেজানো অবস্থায়। এমনিতে অন্ধকার ঘর, দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিতে আরও অন্ধকার। বীণা থলের গায়ে হাত লাগিয়েছে কি লাগায়নি, হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল লাটু। হঠাৎ বীণার ঘাড়ে মুখ গুঁজে এমন জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করল যে সে সময় কেউ যদি ভেতরে ঢুকত সেই বুঝতে পারত নিঃশেষ হওয়া জীবন বলতে সত্যি সত্যি কী বোঝায়।

বীণা মুখ চেপে ধরল। বলল—চুপ-চুপ, শুনতে পাবে ! আমি বড়ো-বাবুর কাছে যাচ্ছি ! মাকে নিয়ে যাচ্ছি, সম্পত্তি তো এখনও মায়েরই নামে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড হৈ-হট্টগোল। অনেক সময় ডাক শোনা যাচ্ছে না, ম্যানেজার রেগে যাচ্ছেন।—আপনারা এরকম চিৎকার-চেঁচামেচি করলে আমরা লিখব কি করে ?

ভূপতিকাকু বললেন—ও হরি, চুপ কর না ! এই যে এঁরা শুনতে পাচ্ছেন না।

বীণা সামনে দিয়ে না বেরিয়ে ঘরের পেছন দিক দিয়ে বেরুচ্ছে। যত কম লোকে এখন তাকে দেখতে পায় ! চোখের জল শুকনো হলে গোটা শরীরটা কিরকম একটা বিস্বাদ লাগে। বীণা তার শরীরে দেখল আর কোনো স্বাদ নেই। কি অসহ্য !

হঠাৎ নিতাই ছুটে এল : শোনো-শোনো !

নিতাই হাঁপাচ্ছে। বীণাকে বলল—আমি তোমাদের ডান দিকের কালো গোরুটা চারশো টাকায় হলেও ডাকব। কালকেই তোমাকে ফেরত দিয়ে দেব।

বীণা একটু থমকে দেখল নিতাইকে। তারপর বলল—ঘর আলগা রইল, একটু দেখবে।

নিতাই দাঁড়িয়ে দেখছে লাটুর মা কোমর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে যাচ্ছে। তার একদিকে নিরু, একদিকে প্রভাত। পেছনে বীণা কোলের ছোটোটাকে বাঁহাতে চেপে হাঁটছে।

নীলামের আসরে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা, ভূপতিকাকু চিৎকার করে বলছেন—টাকার গরম দেখাসনি নিতাই, হুড-হুড় করে দাম বাড়িয়ে যাচ্ছিস, এতে কার কি লাভটা হচ্ছে শুনি ?

পঞ্চায়েত বললেন—নিতাইবাবু কার ঘরে কত টাকা বাঁধা আছে, শান্তিপূর্ণভাবে আসুন সকলে দু-একটা করে--

—আরে টাকা পেয়ে গেলে তো সব ফলঅস্...কি বলেন ম্যানেজারবাবু !

লাটুর বউ যাচ্ছে সব নিয়ে দেশান্তরী হয়ে যাওয়ার মতন। তাদের ঘরে ঢুকে কে কী করছে পেছন ঘুরে একবার দেখতেও ইচ্ছে করছে না। ঘর-বাড়ি, গোরু-ছাগল এমন কি লাটুর ওপরেও এখন তার প্রচণ্ড ঘৃণা হতে লাগল। এখন সূর্যের সেই রোদটা ছ্যাব্‌কা বকনা বাছুরটার ওপর পড়েছে--

দুই

বীণা ডাকছে—এই নিরু উঠে আয়, পড়তে হবে না, এখুনি গয়লা আসবে, গাই লিয়ে আসবি যা।

—আমার এখনও অঙ্ক হয়নি।

--মাগী অঙ্ক করছে, আগে গাই আনবি যা বলে দিচ্ছি !

নিরু উঠে পড়ল, আজকাল তার মা ভীষণ খিটখিটে হয়ে গেছে। শুধু মা নয়, তাদের বাড়ির সকলে, প্রভাতটা পর্যন্ত যখন-তখন আগুনের মতো রেগে যায়। এটা হয়েছে সেই ক্রোকের দিন থেকে। ইট ভাটায় জমি দিয়ে ব্যাঙ্কের টাকা দিতে হয়েছে, এখন তাদের জমিতে ইট হচ্ছে।

একদিন বীণা ভোরে উঠে ধান সেদ্ধ করছিল বাইরের দো-পাখা উনুনে। হঠাৎ সে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল—এই তোমরা দেখবে এসো ! বীণা দেখছে ইট পোড়ানো কালো ধোঁয়া গলগল করে বেরুচ্ছে চিমনির মুখ দিয়ে, উঠে যাচ্ছে প্রায় আকাশ পর্যন্ত।

নিরু প্রথমে অতসব জানে না, ঘুম চোখে উঠে এসেছে। ধোঁয়া-ধোঁয়া করে সবাই চেঁচাচ্ছে, সে দেখল তার মা যে ধান সেদ্ধ করছে, তার একটা ধোঁয়া বেরুচ্ছে ধান-হাঁড়ির মুখ দিয়ে। একেই বলে ভাপা-হাঁড়ি। ভাপা-হাঁড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে নেই। কিন্তু তার মা তাকে দেখাল, এদিকে কি, ওই দেখ !—উঃ কি কালো-কালো ধোঁয়া ! ধান-ভাপের ধোঁয়া, চিমনির ধোঁয়ার কাছে একেবারে কিছু না।

সে ওই চিমনির ধোঁয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল। মা'র হাতে উনুন ঠেলার লাঠি, অতদূরে ধোঁয়া, তবু তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে।

লাটু পিঁয়াজ বীজ পাড়ছিল। চালে দড়ি বেঁধে অনেক যত্ন করে ঝুলিয়ে রেখেছিল বীজগুলো। আর তো বীজ-টিজের দরকার নেই। আলতি বীজ রেখেছিল আধ মন। লাটু এখন যত রকমের বীজ রাখা ছিল সব বেচতে শুরু করেছে। ইটের ভাটায় জমি

দেওয়ার পর আর তার চাষ করার মতো জমি নেই।

বীণা ম্যানেজারের হাতে টাকা গুনে দিতে দিতে জিগ্যেস করেছিল—এবার আমরা শ্যালো-মেসিন কী করব? ওগুলো আপনারা নিয়ে যান!

—আমরা ব্যাঙ্কের লোক, আমরা নিয়ে কী করব। আপনারা পঞ্চায়েতবাবু, ভূপতিবাবু এঁদেরকে বলুন—নিশ্চয় ওঁরা একটা খদ্দের ঠিক করে দেবেন। আপনাদের একমাস সময় দিয়ে যাচ্ছি, ধীরে-সুস্থে বেচুন, বেচে টাকা দেবেন।

ভূপতিকাকু বললেন—হ্যাঁ বউমা, খদ্দের একজন আছে, তবে বাপু আমাকেও তোমার বেটাকে কিছু দিতে হবে। শুধু হাতে কি ঘোল যায়, হাতটা একটু পোসো করতে হবে।—বলে খুব হেসেছিলেন ভূপতিকাকু।

লাটু নিবুকে বলল—যা না মা, গাইটা এনে দিবি। গয়লার আসবার সময় হলো।

বীজগুলো শেষ হতে বেশি সময় লাগলো না। ধান বীজ, গম বীজ, সরষে বীজ, পিঁয়াজ বীজ, আলতি বীজ এক-এক করে সব শেষ হতে সময় লাগল চার থেকে পাঁচ মাস। সামনে একটা পুকুর ছিল, গত বছর পোনা-ডিম ছাড়তে পারেনি টাকার জন্যে, যে কটা চুনো মাছ ছিল খুঁটে বেচলো, কয়েকটা হাঁস-মুরগি ছিল সেগুলো বেচলো, এক কুঁদো পাকা তেঁতুল ছিল, একদিন ঝুড়িতে সাজিয়ে সেগুলোও বেচতে নিয়ে গেল লাটু। তার চাষের জমিতে অট্টালিকার ইট তৈরি হচ্ছে, কিন্তু চার-পাঁচ মাস পর তাদের গোটা ঘর ঝাঁটিয়ে আর কেউ একটা খুদও খুঁজে পেল না।

যেদিন সব কিছু একেবারে নিঃশেষ হলো ঠিক সেইদিন লাটুদের সংসারে আবার একটা গোলমাল দেখা দিল। লাটুর বউ বীণা গলায় দড়ি দিতে গেছল, নিবু দেখে ফেলেছে। গোয়ালের কাঁচি-বাঁশে দড়ি বেঁধে ফেলেছিল, গলায় ফাঁস গলিয়ে ওপরে উঠেও পড়েছিল।

ঘরের লাগোয়া পেছন দিকে গোয়ালঘর, নিবুর সে সময় গোয়ালে যাওয়ারই কথা নয়। গোরু-বাছুর আর একটাও নেই। শেষ পর্যন্ত নিতাই-ই কিনেছে সেই কালো হেলেটা। ঠাকুরপো বলেছিল, নীলামে ডাকছি বটে, তোমাকে ফেরত দিয়ে দেবো। কিন্তু ফেরত নিতে গেলেও তো আসল টাকা দিতে হবে। আর হাল খুঁড়বে কোথায়, কাঠা-পোদকাও চাষের জমি নেই। পাঁচ বছরের লিজ, লিখে দিতে হয়েছে—আমার উঁচু-নিচু চাষের অযোগ্য জমিকে সমতল করিয়া চাষযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে ইটভাটা করিতে পাঁচ বছরের জন্য জমিটি লিজ প্রদান করিতেছি। ইতি—লাটু...সাকিন...পোস্ট...জিলা...। গোয়ালের ফাঁকা গোঁজগুলো দেখে বীণা বোধহয় আর সহ্য করতে পারেনি, আত্মহত্যার সংকল্প নেয়।

নিবুকে যেন ভগবানই টেনে নিয়ে এল গোয়ালঘরে। আজ তার পড়ার বইগুলো গৌরাঙ্গকে বেচে দিল সাত টাকায়। সেই টাকাটা নিয়ে লাটু গেছে দোকানে। লাটু চাল নিয়ে ঘরে ঢুকল আর নিবু বুক চাপড়ে ছুটে এল গোয়ালঘরের দিকে। লাটু পেছনে পেছনে তখনও জিগ্যেস করে যাচ্ছে—কি হলো রে, কি হলো রে?

নিবু এসে দেখে তার মা দড়ি-গলায় ঝুলতে যাচ্ছে। নিজের কাঁদা হলো না, আ-আ করে চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে ছুটে এল লাটু, লাটুর মা, প্রভাত...বিরাট কান্নাকাটি হৈচৈ শুনে নিতাই-বিজয়-তারিণী-বচা-ভূপতিকাকু—পাড়ার আরও অনেকে ছুটে এল।

বচা শুনে বলল—শালা মেয়েমানুষের বুদ্ধি! আরে লাটুদাকে জেল খাটাতে যে!

ভূপতিকাকু বললেন—ছি ছি বউমা, তোমার খুব বোকামি! অভাব মানুষের হবে না তো কি গাছপালার হবে! মানুষকে কত সইতে হয়। তবে বলছে কেন মানহুস!

—ও কি বলছ, সারাদিনে ছেলেপুলের মুখে দুটো দিতে না পারলে মা-বাপ জীবনটা ধরে কী করে ?

তারিণী ঘোমটা টেনে বীণার হাত ধরল, বলল—বউদি আমার সঙ্গে এসো। ঘরে নিয়ে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিল তারিণী। বাটিতে করে মুড়ি বেড়ে খেতে দিল। বীণাকে বলছে—নাও খাও!

বীণার শুধু চোখের পাতা পড়ছে। খুব সূক্ষ্ম-সরু একটা শ্বাস-প্রশ্বাস বইছিল, যা বীণাও টের পাচ্ছে না।

তার হাত ধরে যখন টানল তারিণী তখন বীণার যেন প্রথম জ্ঞান ফিরে এল। তখন সে মনে মনে ভীষণভাবে চাইছে তারিণী তাকে একটু ঠেলে দিক, একটু জোর করে ধাক্কা দিয়ে পেছন দিকে ঠেলে দিক, সে আর পারছে না!

তখন গোয়ালঘরের সামনে লাটু আর লাটুর মা মাথা কুটছে। লাটুর মা যেদিক দিয়ে জিপ গাড়ি এসেছিল সেদিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে গাল দিচ্ছে, প্রভাত ফোঁস ফোঁস করে দুহাতে চোখ মুছছে, তার পেটটা তখন উঠছিল-পড়ছিল। শুধু নিবু কাঁদেনি, সে পেয়ারা গাছটাকে ডানপায়ে জড়িয়ে নিজেকে গাছের মতো অতি দ্রুত অসাড় করে তুলছিল। তাকে এখন কারুর নজরে নেই।

নিতাই রেগে গেল লাটুর মাথাকুটে কাঁদা দেখে।

—শালা পুরুষ-বেটাছেলে, শালা কাঁদবি কি ? রাজমিস্ত্রির জোগাড় দিয়ে লোকে আট-দশটা পেট চালাচ্ছে। তুই আর ছটা পেট চালাতে পারবি না।

ভূপতিকাকু বললেন—এক কাজ কর, সেদিন বড়বাবু বলছিল লোক পাচ্ছে না, আরে তুই তো পানী পাঁড়ের কাজটাও করতে পারবি। আমি বলে-কয়ে তোর রোজ দশ টাকা করে দেওয়া করাব, ন' টাকা করে চলছে।

—না, বাবু সেরকম লোক নয়! লাটুদার জমির ওপরে লাখ লাখ টাকা কামাবে আর ডেলি দশটা টাকা দেবে না ?

নিতাই বলল—আরে বউ চার-পাঁচ ঘরের মুড়ি ভাজবে। মুড়ি ভাজলে, কাপড়-চোপড় হয়ে যাবে। আমি মুড়ি ভাজাবো, আমাদের সেই তো নাপিতদিদি ভাজে। আরও অনেকে ভাজাবে। আমি কথা দিচ্ছি পুজোর সময় বউকে ভালো কাপড় দেব।

বচা বলল—আরে ছেলেটাকে কারোর ঘরে রেখে দাও, গোরু-ছাগলটা তো বাগালি করতে পারবে। সে নিজে যদি নিজের পেটটা চালিয়ে নিতে পারে মন্দ কি। আমরা রাখব।

পাড়ার সকলে যখন এইসব বলছে তখন হন্তদন্ত হয়ে পঞ্চায়েতবাবু এলেন।

বচা বলল—এই যে পঞ্চায়েতদা আসুন-আসুন!

—আসুন-আসুন! লাটুর এই তো বিপদ!

—হ্যাঁ, শুনেই তো ছুটে এলাম। চৌকিদারকেও বলে এলাম। তা এখন খবর কি ?

—আর এক মিনিট পঞ্চায়েতবাবু, সেই গলায় দড়ি পরে ঝুলতে যাচ্ছিল, দেখবেন আসুন, কি সাহস আজকালকার মেয়েমানুষের, কাঁচি বাঁশে ঝুলে উঠেও গেছল। হঠাৎ লাটুর মেয়েটা দেখতে পেয়ে...

বিজয় ডাকল নিরুকে। কোথা রে নিরু! তোকে পঞ্চায়েতবাবু ডাকছে, এদিকে আয়!

—আসলে ভগবান টেনে নিয়ে গেছে, নইলে যাওয়ার কথা নয়।

ভূপতিকাকু ছড়া কাটলেন—কথায় আছে, রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে ?

পঞ্চায়েত বললেন—দেখুন হাসপাতালে-টাতালে নিয়ে যেতে হবে না তো ! গলায় দাগ দেখলে তাহলে পুলিস কেস হয়ে যাবে।

ভূপতিকাকু লাটুর মাকে ডাকলেন।—লাটুর মা, যাও না দেখে এসো, বউমা কেমন আছে। পঞ্চায়েতবাবু আছেন, দরকার হলে লেখালেখি করে দিবে। আজকাল আপনাদের লেখা ছাড়া কোথাও কোনো কাজই হবে না।

পঞ্চায়েত জিগ্যেস করলেন—গলায় দাগ-টাগ কিছু পড়েছে কিনা কেউ ভালো করে দেখেছো ?

লাটু কাঁদতে-কাঁদতে বলল—না, কোনো দাগ-টাগ নেই !

—ঝুলে পড়েনি তো !

—না সেই ঝুলতে যাচ্ছিল।

তবু বামুন ডাক্তারের কাছ থেকে দু' পুরিয়া আর্নিকা এনে দাও। বলা যায় না গলার ব্যাপার।

বচা জিগ্যেস করল—তাহলে ছেলেটাকে রাখবে কি না বলো ? পঞ্চায়েতদা আছেন, পাড়ার সকলে আছে। পঞ্চায়েতদা, আমি বলেছিলাম ওদের প্রভাতটাকে আমাদের ঘরে রেখে দিক, খাবে-পরবে গোরু-ছাগলগুলো দেখবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রেখে দাও লাটু, বচাবাবু ভালোই বলেছে। যার যেমন ক্ষমতা। আপনারা একটু দেখুন, পাঁচ বছরের লিজও দেখতে দেখতে চলে যাবে, তারপর তোমার জমি তুমি ফিরে পাবে...

বচা বলল—আর তখন তোমাদের ছেলেও বড় হয়ে যাবে।

বীণাকে তারিণীই পৌঁছে দিয়ে গেল। খুব শান্ত পায়ে ঘরে এল বীণা। ছোট ছেলেটা কান্নাকাটি দেখে ভয়ে ঠাকুরমা'র কোলে গোঁজা হয়েছিল, মাকে দেখতে পেয়ে অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল। লাটু একটা আসন পেতে দিল, বীণা বসল।

তার মা রান্না করছে। নিতাই বলছিল, চাল নেই তো নিয়ে যা !

লাটু বলল—না, আমি তো চাল-ডাল, আলু-তেল-নুন-লঙ্কা সবই বাজার করে এনেছি, তবু—শালা কার যেন কখন কী বিপদ হয় !

ভূপতিকাকু বলে গেছেন—তুই কাল আমার সঙ্গে সকালে চল ! বড়বাবুর সঙ্গে কথা হয়ে যাবে। বললে কাল থেকেই জয়েন হয়ে যাবে।

ডাল-আলুভাতে, একটু পিঁয়াজ লঙ্কা চটকে নিয়েছে। বীণাকেও আজ ভাত বেড়ে সকলের সঙ্গে খেতে দিল লাটুর মা। তার জীবনে এই প্রথম সে ছেলেমেয়ে-স্বামী সকলের সঙ্গে খেতে বসেছে।

মুখে হাত উঠতে চায় না। লাটু বলছে—খাও ! লাটুর মা বলছে—যা হবার হয়ে গেছে, খেয়ে নাও ! ভেবে কী আর হবে ! লাটু হাতটা ধরে তুলে দিল মুখের কাছে।

বীণা মুখে ভাত নাড়ছে, নেড়েই যাচ্ছে, গিলতে পারছে না। লাটু জিগ্যেস করল—গলায় কি ব্যথা নাকি ?

বীণা ঘাড় নাড়ল।

তিন-চার গাল খেয়েই উঠে পড়ল বীণা, না, তার পেটে এখন আর কিছুই যাবে না। গোটা শরীর যেন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, সকালে একমুঠো খুদভাজা খেয়েছিল, এখন পর্যন্ত কোনো খিদে নেই।

লাটুও ভালো করে খেল না। নিরু-প্রভাত কারুর খেতে আর ইচ্ছে করল না। সকলের মনে হচ্ছে শুয়ে পড়লে যেন বাঁচি। প্রত্যেকেরই খুব লজ্জা হচ্ছে। তারা যে খেতে পায়নি, তাদের ঘরে যে প্রচণ্ড অশান্তি, এই কথাটা আজ থেকে সকলে জেনে গেল। এই লজ্জা ঢাকার জন্য সকলে তাড়াতাড়ি বিছানায় ঘুমের ভান করে মুখ লুকোতে চাইছে।

লাটু তার মাকে বলল, তুমি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়বে, আমরা শুয়ে পড়ছি।

নিরু-প্রভাত ঠাকুরমার কাছে শোয়। লাটু বলল—তোরা ঝাঁট দিয়ে বিছানাটা করে ফেল। কিছু ভয় নেই, ঠাকুমার এখুনি খাওয়া হয়ে যাবে।

আজকে তাদের বিছানাটা লাটুই করতে চাইল। সেও ঝাঁটিয়ে মেঝে পরিস্কার করছে বিছানা পাতবার জন্য। বীণা আর থাকতে পারল না, সে ছুটে গিয়ে লাটুর হাতের ঝাঁটা ছাড়িয়ে নেয়।

—না আমাকে দাও।

—আমি ঝাঁট দিয়ে দিচ্ছি।

—তুমি বরং জিতমোহনকে তুলে নিয়ে এস।

জিতমোহন মাঝখানে শুয়েছে, তারা দুজন দুদিকে। লাটু ছেলের মাথায় হাত বোলাচ্ছে। বলছে—এরা সব বড় হবে, তবে, আমাদের দুঃখ ঘুচবে।

বীণা এতক্ষণ চেপে-চেপে ছিল। এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। লাটু উঠে গেলে বীণার কাছে। বীণাকে কাছে টেনে নিল। তার বুকের ভেতরে মুখ রেখে বীণার আরও কান্না। লাটু চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে। বুড়ো আঙুলের দিকের লম্বা দুটো আঙুল দিয়ে সে বীণার চোখ মুছে দিতে থাকে।

লাটু বোঝাচ্ছে—ইট ভাটায় কাজ করলে চলে যাবে। প্রভাতকে কারো ঘরে রাখতে পারব না। ওরা লোকের ঘরে গিয়ে গোরু-ছাগল বাগালি করবে, লোক লাথ-ঝাঁটা মেরে দুমুঠো এঁটো ভাত ফেলে দেবে, ও আমাদের সহ্য হবে না! এক কাজ করি, নিরু-প্রভাত এদেরকেও সঙ্গে-সাথে নিয়ে যাই। ওই বয়সের ছেলে-মেয়েরা সপ্তায় কুড়ি-বাইশটাকার কাজ করে।

—ওরা কি পারবে? দুধের ছেলে—

—প্রথম প্রথম কম কম বইবে, এই তিনটে-চারটে, তাপর অভ্যাস হয়ে গেলে—

—তোমাকে সপ্তায় কত দিবে?

—সাত দশে সত্তর টাকা। তারপর নিরুর কুড়ি, প্রভাতের কুড়ি, আমি কথায় ধরলাম, তাহলে আশি-নব্বই-একশো-একশো দশ—খুব চলে যাবে! জিতমোহনের গায়ে আবার হাত বুলোয়। বলল—মশা কামড়াচ্ছে নাকি, একটু দেখো না!

এ ছেলেটাও বড় হলে—লাটু আর ও কুড়ি টাকার জন্য স্বপ্ন দেখতে থাকে। লাটু স্বপ্নের ঘোরে বীণাকে জড়িয়ে তার গালে গাল রাখে।

দূরবীনে দু-দিক দিয়ে দেখা যায় ॥ জয়া মিত্র

ঋষি উদ্দালকের পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। বালককালে একদা তিনি মাতৃস্তন্যের জন্য ক্ষুৎপিপাসাকাতর ছিলেন। সেইকালে সে স্থলে এক মুনির আগমন হয়। তিনি নিজের যৌন প্রয়োজন নিবারনার্থ শ্বেতকেতুর মাতাকে লইয়া বিরলে যান।

উত্তরকালে শ্বেতকেতু একপতি-পত্নী প্রথার প্রবর্তক হন।

এইসব বিষয়ে শ্বেতকেতুর মাতার মতামত অজিজ্ঞাসিত ছিল।

হলটা খুব বড় নয়। তবু অর্ধেকের বেশি ভরে যাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণই বলতে হবে। এই ছুটির দিনের দুপুর। সকালে গড়িমসি করে চা খেয়ে বাজার করে খেতে খেতে বেলা হবারই কথা। তারপর আরাম করে একটু গড়ানো বা আয়েস করে টিভি দেখার বদলে আগস্ট মাসের এই রোদে বেলা দুটোর সময়ে এই এতগুলো লোক কী এক পরিবেশ নিয়ে সেমিনার শুনতে এসেছে। বাঙালি পারেও বটে ! অবশ্য যারা আয়োজন করেছে সে ছেলেগুলো এসব নিয়ে খাটে খুব। জানাশোনাও আছে ভালো ভালো লেভেলে দেখা যাচ্ছে। না হলে একটা আলোচনা সভায় এতগুলো নামকরা লোককে জড়ো করেছে কী করে ! বক্তাদের মধ্যে জাতীয় লেভেলের দু'চারজন কেষ্টবিষ্টুরও নাম আছে। সাজসজ্জায় হলের চেহারাও বেশ একটা অন্যরকম অন্যরকম। দেওয়ালে কাপড় লাগিয়ে নানা রকম ছবি, চার্ট আটকানো। ডায়াসের সামনের দিকে হিরোশিমা এক্সপ্লোশনের ব্লো-আপ ছবির ওপর কোনাকুনি আঁটা লাল দাগ, তাতে লেখা 'নো মোর'। হলের বাইরেও বোর্ডে বড় বড় ছবি, পোস্টার সাঁটা—একটা যুদ্ধজাহাজের দামে ক'টা গ্রামে পানীয়জলের ব্যবস্থা হতে পারে, একটা সাবমেরিনের দামে বছরে কত লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, এটা সেটা। সব জায়গায় ছোটবড় ব্যানারে পোস্টারে এমনকি অনেকের জামার বুকে বা হাতায় লাগানো ব্যাজে অ্যাটমিক পাওয়ার বিরোধী নানা রকম কথা লেখা।

ঠিক দুটোয় ডায়াস থেকে একটি ছেলে 'অনুষ্ঠান এখুনি শুরু হবে' বলে ঘোষণা করল। ছিপ্‌ছিপে লম্বা চেহারার শাড়ি পরা এক মহিলা ডক্টর সুরঞ্জন খাসনবিশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হলে ঢুকছেন। চেহারায় দক্ষিণ ভারতীয় ছাপ। তুখোর ইংরেজি বলছেন। পাশের জটলা থেকে কে বলল, বিশাখা অ্যাডাম্‌স, কেরালা থেকে এসেছেন।

দেখে তো বিজ্ঞানী মনেই হয় না। এমন চমৎকার ফিগার যে, বরং ভারতনাট্যমের শিল্পী ভাবা যেতে পারে। লম্বা, দারুণ একখানা বেণী পিঠের ওপর। ড. খাসনবিশ বেশ খাতির করে হাত সামনে বাড়িয়ে ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন একেবারে সামনের সারিতে রাখা চেয়ারগুলোর দিকে। মহিলা এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে এগোচ্ছিলেন,

শেষ পর্যন্ত আসনের কাছাকাছি দাঁড়ানো একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করে ফেললেন, দময়ন্তীকে দেখছি না — সে কোথায় ? তারপরই খাসনবিশের দিকে ফিরে — আমার জানেন এমন প্যাক্‌ড শিডিউল যে আসা সম্ভবই ছিল না। কিন্তু দময়ন্তী ! ও হো, ওকে তো জানেনই, রিফিউজ করা কীরকম অসম্ভব—

ঠিকই — খাসনবিশ মাথা নেড়ে একমত হন, ওঁর একটা নিজের ধরন আছে কাজ করার। যেটা ঠিক করেন, সেটা করেই ছাড়বেন।

তারপর কোনো অসুবিধে মানবেন না...

ছেলেটি হেসে বিশাখা অ্যাডাম্‌সকে বলে এক্ষুণি এসে পড়বেন, উনি ওপাশের ঘরে একটু প্রেসের সঙ্গে কথা বলছেন।

অডিটোরিয়ামে সবাই প্রায় বসে বা দাঁড়িয়ে ছোট ছোট দলে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। আয়োজক সংস্থার কর্মীরাও এতক্ষণ ব্যস্ততার পর খানিকটা ঘোরাঘুরি কমিয়ে সভা শুরু হলে পুরো প্রোগ্রামটা যাতে শুনতে পায় সেরকম এক একটা পোজিশনে দু-তিনজন করে করে জটলা হয়ে আছে। বসেও বোধহয় পড়েছে কেউ কেউ।

সামনের দিকে একটা ছোট টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে জন তিনেক মেয়ে কী একটা করছিল, তারা সরে যেতে দেখা গেল একটা স্লাইড প্রজেক্টার। সেটা অ্যাডজাস্ট করছিল ওরা।

হলের দরজার বাইরে লাউঞ্জে একটা টেবিল ঘিরে গোটা তিন-চার ছেলেমেয়ে। তারা বাইরেই রয়েছে, কুপন সই করবার খাতা আরও কী টুকি-টাকি নিয়ে। সেখানেই পাশে একটা টেবিলে রাখা কিছু বইপত্র। সেখানেও একটি মেয়ে বসে আছে।

দু-চারজন তার সামনে দাঁড়িয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে, দুএকটা বই বোধহয় বিক্রিও হচ্ছে। সই করার খাতা দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছিল কত রকম পেশার লোক এসেছে— ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, গৃহবধূ, অ্যাকটিভিস্ট, লেখক, ছবি আঁকিয়ে। এছাড়া সাংবাদিকরা তো আছেই। সেইসব লোকেরা যারা ঠিক পেশা দিয়ে নয়, অন্যভাবে পরিচিত এখানে, সবাই শ্রোতা হয়ে বসেছে। নিজেদের আসনে বসেই এখনও একে অন্যের সঙ্গে হাসি বা কুশল বিনিময় করছে। নতুন কেউ দরজা ঠেলে ঢুকলেই অন্তত দু'জারজন হলের বিভিন্ন জায়গা থেকে হাত তুলেছে। বিভিন্ন কাজকর্ম বা এ ধরনের জমায়েতের সূত্রে বেশির ভাগ জনই বোধহয় পরস্পরের পরিচিত। এই হাত তোলাটার মানে কী ? 'আমি এখানে আছি' এই কথাটা জানান দেওয়া না একধরনের সম্ভাষণ জানানো ? 'হ্যালো' বলা ? আমরা কি পশ্চিমী লোকেদের তুলনায় শব্দ ব্যবহার কম করি ? হ্যালো, গুডমর্নিং, বাই, থ্যাংক্‌স, প্লিজ কোনো কথাটারই ঠিক চালু বাংলা নেই, ইংরেজি শব্দগুলোই ব্যবহার হয়। হিন্দিতে বরং কিছু শব্দ আছে। আমাদের শব্দ কম, নাকি ফর্মালিটির শব্দ কম ? কেন ? বাঙালিরা কি কম — মানে ওই যাকে বলে সফিস্টিকেটেড ? অথচ সভা-সমিতিতে সামাজিকতায় তো ফর্মালিটি বা রেসিপ্রোকেশনের কমতি থাকে না। অবশ্য তার বেশ কিছুটা বোধহয় হাসি দিয়ে ভঙ্গি দিয়ে বোঝানো যায়।

একটু আগে যখন সবাই হলের ভেতরে চলে আসেনি, অনেকেই বাইরে খোলা চত্বরে কিংবা লাউঞ্জে ছিল, সময় সময় নিজেদের কথাবার্তার ফাঁকে এক-আধজনকে কারো সঙ্গে পরিচিত করানোও চলছিল। তখনই আন্দাজ করা গেল যে হিরোশিমা দিবসের নামে হলেও আসলে মোটামুটি পরিবেশ নিয়ে নানারকম সমস্যারই আলোচনা হবে সেমিনারে। সবটা আজই শেষ হবে না, চলবে কাল পর্যন্ত।

একেবারে কমবয়সী ছেলেও আছে দু'চারজন। তারা অন্যদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলছিল না, এক জায়গায় জটলা করে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে নিজেদের মধ্যেই

যেন আলোচনায় ব্যস্ত। একটু নজর করলে দেখা যাবে তাদের চোখ কৌতূহলী, এদিক-ওদিক ঘুরছে। বোঝাই যায় এরা নতুন, অপরিচিত। কারো কথায় বা নিজেদের কৌতূহলে চলে এসে একটু অস্বস্তিবোধ করছে অচেনা লোকজনের মধ্যে। সেটা ঢাকা দেবার জন্যই নিজেদের মধ্যে অত মগ্নতা দেখাচ্ছে। পুরো জমায়েতটার মধ্যে মেয়েদের, নানা বয়েসের মেয়েদের সংখ্যাধিক্য চোখে না পড়ে উপায় নেই। এই ব্যাপারটা নীরেনের কাছে আকর্ষক ও অদ্ভুত মনে হয়েছে। এই নীরস খটমটে ব্যাপারে এতগুলো মেয়ের উপস্থিতিটাই অদ্ভুত। আর একটা ব্যাপারও—নীরেনের ধারণা ছিল এসব সভা-সমিতি করা মেয়েরা সাধারণত বাজে দেখতে হয়, মানে ওই আর কি, যাদের আর কিছু হবার চান্স-টান্স নেই তারাই এসব করে। দেখা যাচ্ছে মোটেই তা নয়।

এ ধরনের সভায় নীরেনের এই প্রথম আসা। সে এসেছে কিছুটা পেশাগত কারণে, মাঝারি একটা কাগজের সাংবাদিক সে। কিছুটা বন্ধুকৃত্য করতেও আসা। বিজন ওর অনুরোধে বহুবার বহু কাজ করে দিয়েছে, দারুণ সব কানেকশন আছে ছেলেটার। যদিও ওর ব্যাংকের ক্যান্টিনে বা অন্য কোনো আড্ডায় বিজন যখন মাঝে মাঝে এসব বিষয়ে কথা তোলে নীরেন মন দিয়ে শোনবার কিছুমাত্র কোনো উৎসাহই খুঁজে পায় না। পরিবেশ নিয়ে সে বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামায় না। একমাত্র স্কুটারে বসে সামনের গাড়ির একজস্ট পাইপ থেকে বেরোনো ধোঁয়া গিলতে হলে 'শালা আমাদেরও কিছু দিন পর থেকে জাপানিদের মতো গ্যাস মাস্ক পরে রাস্তায় বেরোতে হবে' ছাড়া। এই পরিবেশ-ফরিবেশ পুরো ব্যাপারটাকে তার স্রেফ হুজুগে ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। আজ এখানে বিজনের অনুরোধে নিজেদের কাগজের হয়ে কভার করতে আসার পেছনে অতি নিজস্ব একটা কৌতূহলও কাজ করেছে তার মধ্যে। সেটা দময়ন্তী সিংহালকে কাছ থেকে দেখবার ইচ্ছে। তেমন হলে পরে কোনোদিন একটা ফাটাফাটি ইন্টারভিউ নেবার রাস্তাও হয়ে যেতে পারে আজ।

এই মহিলার নাম সে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হতে শুনেছে। বিজনের মতো কিছু ছেলেমেয়ের মুখে নামটা এমন শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয় যেন, ওটা ভগবানের নাম। কাগজপত্রেও মাঝেমাঝে বেশ গুরুত্ব পেতেই দেখেছে। সবারই, বা অনেকেরই ভাবটা এমন যেন দময়ন্তী সিংহাল কোনো মেয়ের, থুড়ি--মহিলার নাম নয়, একটা বইয়ের কি প্রতিষ্ঠানের নাম। অথচ আবার প্রেস ক্লাবে কিংবা অন্য দু'একজনের মুখে তো—

সভা শুরু হয়ে গিয়েছে। যাদবপুরের ড. সুবীর বসু প্রেসিডেন্ট, বিশাখা অ্যাডাম্স্ চিফ গেস্ট। একটি ছেলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একটু খেলিয়ে বলল, কেন হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে তারা পরিবেশ নিয়ে সেমিনার করছে, আণবিক যুদ্ধের সঙ্গে কী সম্পর্ক অন্য সময়ের পরিবেশ দূষণের—এইসব। তারপর অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা কৃষ্ণা গুলাটি বলছেন কোন এক রঙের কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে ঢেলে দেবার ফলে গোদাবরীর ধারে কোনো কোনো জায়গায় ফসল খেত কী ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কী ভাবে বারে বারে আবেদন করা সত্ত্বেও কারখানা কর্তৃপক্ষ সেই রাসায়নিক আবর্জনা নিষ্ক্রিয় করার কাজে কোনো টাকা খরচ করতে রাজি হচ্ছে না। সমস্ত 'হল' মনোযোগ দিয়ে শুনছে। নীরেন নিজেও একসময়ে কখন একটু মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণা গুলাটির কথা বলবার ধরনটি বেশ। এক একটা শব্দে দক্ষিণ ভারতীয় ঝোঁক দিয়ে বলা ইংরেজি। বয়স যথেষ্টই বেশি, সাদাকালো মেশানো চুল পেছনে ছোট একটু খোপা পাকানো, কপালে বড়ো টিপ, ছোটখাটো চেহারা। গলার আওয়াজটি কিন্তু সুন্দর।

এই জমায়েতের মন দিয়ে শোনবার বিশেষ ধরনটাও খেয়াল করে নীরেন। শ্রোতারা ঠিক প্যাসিভ — নীরব শ্রোতা নন, বক্তার বিষয়বস্তুর প্রতি সমর্থন বা মতানৈক্য প্রায় সর্বদাই বোঝা যাচ্ছে ফিসফিস করে মতপ্রকাশে, কখনও একটা টুকরো মন্তব্যে। শ্রোতাদের সঙ্গে বক্তার এক ধরনের একটা জ্যান্ত সম্পর্ক রয়েছে। সরাসরি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার টের পাওয়া যাচ্ছে। কিছু কিছু লোক যাঁরা একেবারে চুপ করে শুনছেন তাঁরাও এমন কি আশপাশের এই অল্পসল্প চঞ্চলতায় বিরক্ত হবার কোনো ভঙ্গি দেখাচ্ছেন না।

কৃষ্ণা গুলাটির বক্তব্য শেষ হবার পর অন্যরা তাঁকে প্রশ্ন করছিলেন। জানা গেল অন্যান্য অনেক কারখানাতেও কী ভাবে নানারকম বিষাক্ত রাসায়নিক নিয়ে কাজ করতে করতে শ্রমিকদের শারীরিক ক্ষতি হয়, কী ভাবে বিভিন্ন পরিবেশবাদী কিংবা মানবাধিকারেব দাবি তোলা ফোরামগুলো চেষ্টাচরিত্র করে, কখনও কখনও মালিক পক্ষকে চাপ দিয়ে কোথায় সেগুলো বন্ধ করা গেছে।

অপেক্ষাকৃত তরুণ কয়েকজন নীরেনের পিছনে বসে উত্তেজিত ভাবে বলাবলি করছিল কাছাকাছির মধ্যে কোথায় ছোট ছোট কারখানা শ্রমিক স্বাস্থ্যের কিংবা এনভায়ার্নমেন্টাল হ্যাজার্ডসের তোয়াক্কা না করে দিনের পর দিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দামোদরের জল বিষাক্ত হয়ে যাবার খবর, পুরো ব্যাপারটাকে সরকারি তরফে স্রেফ উড়িয়ে দেওয়া নিয়ে বলতে উঠে একটা ফর্সা দোহারা-চেহারার মেয়ে চোখমুখ একেবারে লাল করে ফেলল। রীতিমতো সিরিয়াস এরা এসব ব্যাপারে। এনভায়ার্নমেন্ট নিয়ে আইনকানুন, গ্রিনবেঞ্চ, সরকারি পলিসি এসব নিয়ে আলোচনা করতে উঠলেন এক ভদ্রলোক, বোধহয় কৃষ্ণা গুলাটিকে সাহায্য করার জন্য।

দময়ন্তীকে দেখে নীরেন খানিকটা হতাশ হয়েছে। তামাটে রঙের রোগা লম্বা শান্তশিষ্ট চেহারা, কোনো রকমেই আলাদা করে চোখে পড়বার মতো নয়। সুন্দরী তো বলাই যাবে না, পোশাক-আশাকও যেন কেমন। এলোমেলো নয়, বরং বেশ পরিপাটি কিন্তু একেবারে সাদামাঠা, বৈশিষ্ট্যহীন। প্রায় ছেলেদের মতো করে ছাঁটা নুন মরিচ চুল। খেয়াল করলে হয়তো একটা জিনিসই চোখে পড়তে পারে—মহিলা সমস্তক্ষণ হাসছে। ভূদেব জানার মতো খিটখিটে মেজাজের গোমড়া লোকের সঙ্গেও এমন হেসে হেসে কথা বলছিল। কিন্তু কমবয়সী ছাত্রীগোছের মেয়েদের কথা ছেড়ে দিলেও অন্য যে মহিলারা আছে ওর তুলনায় তারা বরং—। বিশাখা অ্যাডাম্‌সকে তো রীতিমতো আকর্ষণীয় বলা যায়। আলাপ করতে পারলে মন্দ হত না। পাশে বসা ভদ্রলোককে কী বলছে অত মুখের কাছে মুখ নিয়ে? আচ্ছা, সন্ধেটা কাটাবে কী করে—জিজ্ঞেস করা যায়? কিছু না, একটু খোলামেলা একটা সাক্ষাৎকারই নেওয়া যেত না হয়।

গুলাটির পেপার নিয়ে আলোচনা শেষ হয়ে গিয়েছে। ভূপাল শহরে সেই ইউনিয়ান কারবাইডের গ্যাস ভিকটিমদের এখনকার অবস্থা নিয়ে বলছেন এক ভদ্রলোক। এর চেহারাটা নীরেনের পরিচিত বিভিন্ন জায়গায় দেখেছে। লোকটি বাঙালি কিন্তু নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এত বছর পরে হঠাৎ খুঁচিয়ে ভূপালের ঘা বের করার মানে কী? কী লাভ এসবে! সেই যে বছর কতক তখন ভূপাল-ভূপাল করে সব এত অস্থির হল। মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ, ধরনা—একটা এভারেডিও কি কম বিকিয়েছে বাজারে? আর এখন তো কথাই নেই, কারখানা-টারখানা বেচে দিয়ে কেটে পড়েছে ইউনিয়ান কারবাইড। আস্তে বাইরে বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরায় নীরেন।

আরও দু'চারজনও আছে এখানে, এই হলের বাইরে, দরজার কাছাকাছি। কেউ

কেউ সিগারেট হাতে একেবারে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, শুনছে। দু'একজন একটু আড়ালে সরে বা বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে টুকটাক কথা বলছে, সিগারেট হাতে। অনেকেই মুখচেনা। অতনুকে দেখে নীরেন এগিয়ে যায়। অতনুর এসব ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে জানত না।

এসব ব্যাপারে নয় হে, আমি এসেছি শিপ্রার সঙ্গে।

শিপ্রা! আরে—এখানেও লাইন মারছ!

কী করব! কোথায় আর যাব গুরু— দিনরাত হাজার বখেড়া। লাইফটা শালা একেবারে হেল হয়ে গেল। মাঝেমাঝে মনে হয় এরা এসব আদর্শ টাদর্শ নিয়ে বেশ আছে। আমরা সব পাপী হয়ে গেছি—

ওঃ তুমি শালা এক মিটিংয়ে আদর্শবাদী হয়ে উঠেছ!

না না, আপন গড্ ; এ তো আসলে শিপ্রাকে একটু ইম্প্রেস করার জন্য—দ্যাখো না কত কষ্টে একটা দুপুর ম্যানেজ করেছিলাম, দিলো ঝুলিয়ে। এখন এসব করে দেখি সন্ধেটা ফাঁকা করা যায় যদি — আরে বাবা, এসব খুব ভালো কাজ সে তো আমিও বুঝি কিন্তু তার জন্য গোটা দিন ধরে এই ভ্যাজর ভ্যাজর, কোনো মানে হয় ? একদিন মিছিল-ফিছিলে যেতে বল — হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু দিস ইজ টু মাচ—

আচ্ছা, এই দময়ন্তী সিংহাল তো আদতে বাঙালি, না ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যারিস্টার ছিল—মনে নেই সেই যে প্রস্টিট্যুটদের কেসটা—অতনু চোখ টেপে।

হ্যাঁ, সে জানি। ওর তো স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ?

সেরকমই তো শুনেছি।

একটা সাউথ ইন্ডিয়ান আর্টিস্টের সঙ্গে নাকি থাকে আজকাল—

কে জানে —এদের সব ব্যাপার-স্যাপার, বয়সও তো একেবারে যায়নি এখনও— অতনু হাসে।

ডিভোর্স হয়নি তো ?

না মনে হয়। সিংহালই লেখে যখন—

কী ব্যাপার গুরু—তোমার যেন কেমন কেমন—চিনতে আগে ?

আরে না না সেসব কিছু নয়। আসলে ওর ব্যাপারে কিছু রিভিলিং ইনফরমেশন ছিল আমার কাছে।

আচ্ছা আচ্ছা—

অন্য একটি ছেলের সঙ্গে বিজন বেরিয়ে আসছিল। নীরেনকে দেখে হাসে—

বোর হচ্ছেন নাকি ?

না না এই জাস্ট একা সিগারেট—

রামানুজবাবু খুব খেটে ফিল্ড ওয়ার্ক করছেন ভূপালে গিয়ে—বিজনও পকেট থেকে সিগারেট বার করে, নীরেন লাইটার এগিয়ে দেয়। মনে পড়েছে নামটা।

এরপর টি-ব্রেক। তারপর বিশাখা অ্যাডাম্‌স বলবেন রেডিও অ্যাকটিভ ফল আউট নিয়ে। তার সঙ্গে দারুণ একটা স্লাইড-শো আছে। শান্তিনিকেতনের এক মহিলা রাজস্থানে সেই পোখরান ব্লাস্টিং-এর কাছাকাছি কয়েকটা গ্রাম থেকে তুলে এনেছেন। তারপর দময়ন্তীদি। শেষ বাদল সরকারের গ্রুপের 'ত্রিংশ-শতাব্দী' আছে। পারলে থেকে যাবেন, বাদলদার নাটকটা একটা এক্সপিরিয়েন্স—

আচ্ছা বিজন, দময়ন্তী সিংহাল কি কলকাতাতেই থাকেন ?

বাড়ি কলকাতাতেই অবশ্য, কিন্তু ক'দিনই বা থাকেন। একটি মেয়ে, সেও তো দিল্লিতে পড়ে।

দিল্লিতেও তাঁর নিজের একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, না ?

তা আমি ঠিক জানি না। কেন বুলন তো ?

না কিছু নয়, এমনি। বেশ ইন্টারেস্টিং ভদ্রমহিলা—

ইন্টারেস্টিং ! এঃ, আপনাদের সাংবাদিকদের ভোকাবুলারিটাই অদ্ভুত ! বিজন হেসে ফেলে — ইন্টারেস্টিং ! এটা একটা টার্ম হল দময়ন্তীদি সম্পর্কে।

কিছু মনে কোরো না বিজন—আমি কিছু মিন করিনি—

আরে না না—কী আবার মিন করবেন !

আসলে ভদ্রমহিলা সম্পর্কে আমার খুব জানবার ইচ্ছে। মানে মেয়েদের মধ্যে এরকম বিশেষ দেখি না তো—কিছুদিন আগে তো কী একটা ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কারও পেলেন— !

হ্যাঁ, রাইট লাইভ্‌লিহুড, খুব প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড। দময়ন্তীদিকে অবশ্য আমরা সেভাবে ঠিক মেয়ে বলে ধরি না, ছেলে কি মেয়ে ব্যাপারটা ওঁর ক্ষেত্রে ইমমেটিরিয়াল। তবে প্রচুর মেয়েকে আপনি দেখবেন এখানে—ওদের মধ্যে অনেকেই খুব সিরিয়াস, খুব ভালো কাজ করে। ওই যে দেখছেন মৈত্রেয়ীদি, স্বাতী, মন্দিরা, শর্বাণী—আর সেকেন্ড রোয়ে দেখবেন কালোমতো স্কার্ট পরা একটি মেয়ে, মণিমালা, ও তো আপনাদের লাইনের লোক—টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়ায় আছে। কেবল এই সেমিনারটা কভার করতে ও পাটনা থেকে এসেছে।

তাই দেখছি। এরা কি ম্যারেড ?

কেউ কেউ ম্যারেড, কেউ নয়—কেন ?

না, মানে ঘর-সংসার করতে হলে কি আর এত সময় পেত ?

সে ওরা ম্যানেজ করে। অনেকেই তো রেসপন্সিব্‌ল পোজিশানে চাকরি করে, অনেকেরই ছেলেমেয়ে আছে—আসলে ইস্যুটার সিরিয়াসনেস বুঝলে—ওই যে টি ব্রেক হয়ে গেল—চলুন আপনারা—আমি আসছি এক্ষুণি।

লাউঞ্জে দুটো টেবিলে রাখা চায়ের কনটেনার, কাগজের কাপ, কেক। সেদিকে এগোতে এগোতে নীরেন বিজনকে আর একটু আটকায়।

আচ্ছা, তোমাদের দময়ন্তীদি তো ছাত্রজীবনে ভালো স্কাল্পচারিং করতেন, তাই না ?

বিজন নীরেনের আশানুযায়ী অবাক হয়।

তাই নাকি ? জানতাম না তো ! উনি তো ব্যারিস্টার ছিলেন, ভালো প্র্যাকটিস ছিল—

হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু আর্টিস্ট সিংহালের সঙ্গে তো ওঁর লাভ ম্যারেজ হয়—

বিজন কেমন একটু অদ্ভুত চোখে তাকায়,—অত পুরনো কথা জানি না। দময়ন্তীকে আমরা চিনি ওঁর কাজকর্ম দিয়ে। আমার একটু তাড়া আছে, পরে দেখা হবে, কেমন ?

ব্যারিস্টার ছিল দময়ন্তী সিংহাল— সেকথা নীরেন কেন অনেকেই জানে। অল্পদিন প্র্যাকটিস করে, সেনসেশনাল কয়েকটা কেস করে নাম করে ফেলে। একটি বেশ্যার কেস নিয়ে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়েছিল। তার আগে যা ছিল, ছিল—এই কেসটা নিয়ে বিরাট হল্লা হয় কাগজপত্রে। আর এখন তো এইসব মানবাধিকার, তেজস্ক্রিয়তা,

পরিবেশ দূষণ এসব করে নিজের চারদিকে বেশ একটা 'অরা' বানিয়ে ফেলেছে।

কেসটা এখনও অনেকের মনে থাকতে পারে। বিশেষ পুরনোও হয়নি, বছর পাঁচ-সাত হবে হয়তো। আসানসোল না ওদিকের কোথাকার যেন ব্যাপার ছিল। দুই পুলিস কনস্টেবল একটি বেশ্যার যোনিতে হাতের বেটন ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বিশ্রী ব্যাপার। তাতেও হয়তো অত হইহল্লা হত না, যদি না তারা কিঞ্চিৎ বেশি বাড়াবাড়ি করত আর মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাতে না হত। বর্ধমানে সেশনস্ কোর্টে মেয়েটা হেরেছিল। এই দময়ন্তী সেই মেয়ের পক্ষ নিয়ে লড়ে হাইকোর্টে। তখন আরও অনেক কথা বেরোয়। মেয়েটার নাকি জ্বর হয়েছিল—সেই কারণেই হতে পারে যে, রমণ-উৎসাহী দুই বিনেপয়সার খদ্দেরকে অত রাতে ঘরে বসাতে রাজি হয়নি। তো সেই বীর পুঙ্গবরা তাকে ঘরের, মানে তার সেই ঝুপড়ির বাইরে টেনে এনে মাটিতে ফেলেছিল। এঃ ভাবা যায় না। তারপর মেয়েটার আর তার ছেলের চিৎকারে আশপাশের মেয়েরা, তাদের দালাল-টালাল জড়ো হয়।

মেয়েটার পেলভিসের হাড়ে নাকি চোট লেগেছিল। সে যা হোক, কিন্তু মামলা চলাকালীন হাইকোর্টে আসামিদের, মানে সেই পুলিসদের আর কি, পক্ষের দুঁদে ব্যারিস্টারদের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে যে সব সওয়ালের জবাব দিয়েছিল এই মহিলা! সে ক'দিন প্রচুর ভিড় হত ওই ঘরটায়।

কেসটার শেষ পর্যন্ত কী যে হয়েছিল এখন আর ঠিক মনে নেই কিন্তু দময়ন্তী সিংহাল সম্পর্কে এটাই শোনা যায়, যে তারপর আস্তে আস্তে পেশা ছেড়ে দেবার আগে পর্যন্ত নাকি বেছে বেছে এ ধরনের কেসই লড়ত। কোর্ট প্র্যাকটিস ছেড়ে দেবার পর থেকে তো — রাইট লাইভ্লিহুড—আচ্ছা!

সুবীর বসুর কথার মধ্যে মধ্যে কিছু স্লাইড দেখানো হল প্রজেক্টারে! এ জন্যই প্রজেক্টার অ্যাডজাস্ট করছিল মেয়েগুলো। বীভৎস সব ছবি—নিউ বর্ন সব বাচ্চা, কোনোটার হাত নেই, কোনোটার পায়ের আঙুল নেই, অদ্ভুত সব ছাপা শাড়ি পরা মা। চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, মাছি ভনভন করছে চারদিকে। এরা নাকি কোটার 'ভারীজল' প্রজেক্টের কাছাকাছি থাকে, যে নদীর জল খায় তাতে কারখানার ওয়েস্টেজ মেশে। পাশে ইংরেজিতে লেখা বোর্ড অবশ্য আছে, কিন্তু ওই গণ্ডগ্রামে সেটা পড়বে কে? আর তার সঙ্গে ওরকম ভয়ঙ্কর একটা ভবিষ্যতের বর্ণনা দিয়ে সুবীর বোসের বক্তৃতা। আউটরেজাস। এই ভদ্রলোক তো বেশ নাম করা বিজ্ঞানী। হয়তো ঠিকই বলছে, না কি কে জানে! এত কথা জানবার দরকার কী! যা হবার হবে। সত্যিই কখনো হবে নাকি এসব? আর যদি বা হয় সে কি আটকানো যাবে! মরবিড হয়ে লাভ কী!

যে ভদ্রলোক, নাকি ছেলেটিই বলা চলে এত কমবয়সী দেখতে, এতক্ষণ মাইক ধরে, প্রোগ্রাম পরিচালনা করছিল সে এবার হাত তুলে সকলকে বসে পড়তে ইঙ্গিত করে। একই সঙ্গে বাঁ হাতে মাইকটা টেনে নিয়ে যেন সকলকে জরুরি কথা শেষ করে নেবার সামান্য একটু অবসর দেয়। 'হল' একটু সচেতন হয়ে চুপ করে যায়। এই সামান্য ও মৃদু নাটকীয়তার পরই মাইকে দময়ন্তীর নাম ঘোষিত হয়।

দময়ন্তীর গলার আওয়াজটি ভাল। বাঁকুড়া না কোথায় অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টর বসানোর একটা কথা উঠেছে, সেই সম্পর্কে বলছে। খুব থেমে থেমে যেন শব্দগুলিকে স্পষ্ট প্লেসিং করে করে বসাচ্ছে। কেউ আর বাইরে নেই। এমন কি লাউঞ্জে যে ছেলেমেয়ে কটি কুপন কার্ড বইটই নিয়ে রিসেপশনের টেবিলে বসেছিল তারাও উঠে

চলে এসেছে। এটাই বোধহয় আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেপার। স্টেজে বসা বক্তারারও খুব মন দিয়ে প্রতিটি শব্দ শুনছেন—তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কোনো নিরাপদ মাত্রা নেই, সামান্যতম বিকিরণ সহ্য করা থেকেও ভয়ঙ্করতম বিপদ হতে পারে। রাশিয়ার মতো উন্নত দেশেও যেখানে চেরনোবিলের মতো ঘটনা ঘটে যায়, সেখানে আমাদের দেশের নিরাপত্তা কোথায় ? তেজস্ক্রিয় রশ্মি শুধু যে শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করে তাই নয়, তা মানুষের 'জিন'-এর বিকৃতি ঘটায়। আজকে আমাদের গুরুত্ব বোঝবার অক্ষমতা, আমাদের আজকের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিকলাঙ্গ পঙ্গু করে দেবে। বলুন তাহলে আমরা কি—

শুনতে শুনতে নীরেন ভাবে বিজয়রত্নে রাও তো সিংহালের বন্ধু ছিলেন, সমসাময়িক শিল্পী তো বটেই। আচ্ছা, সত্যিই কি রাওয়ের সঙ্গে দময়ন্তী শুয়েছিল ?
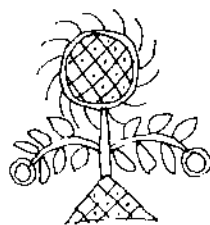
যে দেশেতে রজনী নাই ॥ সুব্রত মুখোপাধ্যায়

এগারশ ছিয়াত্তর বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মকালের এক ব্রাহ্মমুহূর্ত। আর কয়দিন পরেই আষাঢ়ের প্রথম দিবস। কিন্তু আজ অবধি আকাশের হৃদয় বিদীর্ণ হয়নি। কালবৈশাখীহীন বিগত মাসটি বুঝি যথার্থই ছিল কাল বৈশাখ। নির্জলা আকাশ আর বাতাস শূন্য খাঁ খাঁ সংসার— এই ছিল নূতন বৎসরের উপহার। এরই মাঝে আকাশ ছিল মেঘগম্ভীর, নিরেট বিষণ্ণ কালো পাথরের মতন। তবুও সংসার প্রার্থনা করেছে, মাতৃজঠরের অন্ধকারে হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ ভ্রূণের মতন, এক বিন্দু আলোর জন্য কিংবা কয়েক ফোঁটা জলের আশায়। কিন্তু সে অনুনয় নিস্প্রাণ পাথরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ফিরে এসেছে। পাথরের বুকে প্রাণ আসেনি।

কুমারহট্ট-হালিসহরের গঙ্গাতীরে এমনি এক নিষ্ঠুর রাত্রি শেষ হবার মুখে এসে অপেক্ষা করছে আর একটি নিদারুণ দিনের জন্য। গঙ্গার ঐ পারে বংশবাটী এখনো স্থির অন্ধকারে। অন্ধকার গভীর হয়তোবা ঘন গাছপালার কারণে। তারই মাঝে কয়েকটি বনস্পতির ইঙ্গিত বলে দেয় ঐখানে আকাশের সূত্রপাত। কৃষ্ণপক্ষের দিন-রাত্রির সংগমে বিহ্বল আকাশে যে তারার আলো এখন মরতে বসেছে তার ছটায় মনে হয় ঐ বনস্পতিশ্রেণী বুঝি প্রাচীন ঋষিবর্গ। সূর্যবন্দনার পূর্বমুহূর্তে কি আশ্চর্য সমাহিত। প্রাণহীন জগৎ-সংসারে একমাত্র সতেজ প্রাণ। এ পারে কুমারহট্ট এখনো গভীর নিদ্রায়। সে নিদ্রা হয়তো পরবর্তী দীর্ঘ জাগরণের তিল তিল প্রস্তুত হওয়া। কেন না ইতিমধ্যে পলাশীর যুদ্ধের পর এক যুগ পার হয়েছে। সদাশয় বানিয়া ইংরাজ এখন দেশের ভাগ্যবিধাতা। আর ঠিক এক যুগ পরেই শুরু হয়েছে মানুষের বিড়ম্বনা প্রকৃতির প্রতিশোধে। প্রকৃতি এখন নির্বিকার নির্বিচার।

নিদ্রিত কুমারহট্টের পথে সদ্য নিষ্ক্রান্ত একটি বলদগাড়ির ঘণ্টাধ্বনি একটি মাত্র জাগরণের সমাচার জানিয়ে এইমাত্র দূরে গেল। আর তারই রেশ ধরে নির্জন গঙ্গাতীরে এক যুগল মানুষের পদশব্দ বেজে উঠল অস্পষ্ট অন্ধকারে। আগের জন দীর্ঘদেহী সেনজ রামপ্রসাদ, বৈদ্যকুলোদ্ভব রামরাম সেনের তৃতীয় সন্তান। অপরজন মধ্যমাকৃতি— গোস্বামী অযোধ্যানাথ। উভয়েরই আস্কন্ধ কেশগুচ্ছ। কেবল অযোধ্যানাথ শ্মশ্রুবর্জিত। রামপ্রসাদ-অযোধ্যানাথ দুটি ভিন্ন মেরুর মানুষ হলেও কোথাও কোথাওবা বড়ো অভিন্ন স্বভাব। রামপ্রসাদ শক্তি উপসাক, অযোধ্যানাথ কৃষ্ণপ্রেমী। কিন্তু হৃদয়ের একটি কুঞ্জে দুইজনের আনন্দ বিচরণ। বিচরণ কথাটি না বলে হয়তো বললে ভালো রামপ্রসাদ সরস্বতীর কাব্যনিকুঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা আর অযোধ্যানাথ প্রায়ই সেখানে ভ্রমণে যান— প্রসাদী সংগীত কাব্যের মধুপানের লোভে। কবিতার নিরুপদ্রব জলাশয়ে প্রায়ই তিনি ঢেলা নিক্ষেপ করেন রামপ্রসাদের প্রতিবাদী কাব্য মুখে মুখে রচনা করে। প্রসাদের সারল্যকে অযোধ্যা ভণিতার ছলে ভিন্নরূপ দেন। সময়ে সময়ে তিনি রামপ্রসাদকে এই

বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েন না যে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের উপরোধে অশ্লীল-আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর রচনা তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান অপকর্ম, বিশুদ্ধ সফেন দুগ্ধপাত্রে এক বিন্দু গো-মূত্র। আর সে কারণেই রাজ প্রশস্তিতে তিনি 'কবিরঞ্জন'। অযোধ্যা এ কথা ভাল করেই জানেন যে প্রসাদের হৃদয়ের এ এক দুর্বলতম প্রদেশ। স্নিগ্ধ মানুষটি অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে ওঠেন যখন তিনি শোনেন তাঁর এ রাজসম্মান অর্জন একমাত্র বিদ্যাসুন্দরের কারণে। তাহলে কি অবশিষ্ট যাবতীয় কাব্য ও গীতিকা সবই অন্তঃসারশূন্য! এই পঞ্চাশবৎসর জীবনের কতো বিনিদ্র রাত্রি এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন দিন জুড়ে রয়েছে অনন্ত কাব্যভাবনা। যার ফসল তাঁর নিজের উপমাতেই—লাখ উকিল করেছি খাড়া, সে সবই কি নগণ্য! এ প্রশ্নে পৌঁছে রামপ্রসাদ বিহ্বল হয়ে পড়েন। তখন অযোধ্যানাথের রহস্য বোঝবার মতন মন আর থাকে না। কখনো কখনো ক্রোধান্ধ রামপ্রসাদকে দেখে অযোধ্যানাথ প্রকাশ্যেই উল্লসিত হন তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধর আনন্দ-প্রসাদে। কবির সারল্য আর একবার বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ বিপর্যয় নিত্য ঘটে না। যা ঘটে তা শুধু উভয়ের কাছে কেন সমস্ত রসিকজনের পরম আদরের। ভাবীর কাছে শেখা ভাবে কখনোবা স্ব-ভাবে একের সঙ্গে অপরের নিত্য নূতন পরিচয়, শুধুমাত্র মধুপাত্র বিনিময়। এ সমাচার মহারাজারও অজানা নয়। প্রায়ই তিনি অসি ও বাঁশীর এই সূক্ষ্ম রসালাপ উপভোগ করতে সুদূর কৃষ্ণনগর থেকে জলপথে ছুটে আসেন এই কুমারহট্টে। তথাকথিত তরজাগানে পরিশ্রান্ত মহারাজ স্নিগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করেন এই সম্মুখসমরে একে অপরের প্রতি কটু হুল প্রয়োগ করছেন না কখনো! তীক্ষ্ণ শলাকার শীর্ষবিন্দুতে মাখানো রয়েছে যে প্রলেপ তার অপর নাম বুঝি একান্তই ভালবাসা। সেই ভালাবাসার প্রতি পরতে পরতে মিশে আছে জীবনের সরলীকৃত গূঢ় রহস্য। যদি প্রসাদ বলেন—মুক্ত কর মা মুক্তকেশী, তো গোস্বামী তৎক্ষণাৎ খণ্ডন করেন—বদ্ধ কর মা খেপলা জালে, যাতে চুনোপুঁটি পালাবে না মজা মারবো ঝোলেঝালে...

বিগত শীতের পর থেকে দীর্ঘ কয়েকটি মাস চলে গেছে। হিমের দিন শেষ হয়েছে, মাঝখানে কখন যে বসন্ত ঋতু আসা-যাওয়া করেছে তার সমাচার নেবার সময় মানুষ কেন জীবজগতের কারোরই বুঝি হয়নি। কোকিলের কুহুধ্বনি পেঁচার কর্কশ স্বরে চাপা পড়ে গেছে। শৃগালের অসময় আর্তনাদের সঙ্গে শকুনের উল্লাস যথাসময়ে এসে মিলেছে। পাপহারিণী গঙ্গার দুইকূলে পণ্ডিতের বন্দনা গান, মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি, বানিয়ার দরাদরি, সাধারণের কুশল বিনিময় এ সবেরই কণ্ঠ ডুবে গেছে সহস্র মানুষের অবিরাম পদযাত্রায় আর হায় হায় আর্তস্বরে। মানুষ চলেছে অবিরল, অনর্গল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগর থেকে নগরীতে! পলায়ন করছে নিজবাস থেকে অনিশ্চিত পরবাসে—দিনের আলোয় অথবা গভীর নিশীথে। পিছনে ধেয়ে আসছে উন্মত্ত ঐরাবতের কালোপাহাড় আর সম্মুখে গর্জমান গরলসিন্ধু লক্ষ হাত তুলে আলিঙ্গন করতে চাইছে। মানুষের সংকটের এ এক অপরূপ চলচ্চিত্র।

বিগত শীতের পর থেকেই সংসার থেকে যেমন লক্ষ্মী বিদায় নিয়েছেন তেমনি রামপ্রসাদের প্রাণবায়ু স্বরূপিনী দেবী সরস্বতীও তাঁর কাছ থেকে এখন বহুদূরে। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সর্বজনবিদিত বিবাদ এই প্রথম পরিত্যক্ত হল। দুই সহোদরা এখন নিশ্চিন্ত সন্ধিতে জোটবদ্ধ হয়ে প্রসাদের সংসারকে দূরে পরিহার করেছেন। কে জানে, হয়তো প্রকৃতির উন্মাদনায় তাঁরাও বিহ্বল। তাই রামপ্রসাদ বুঝতে পারেননি কখন শীত অবসানে বসন্ত এল। বিদ্যাসুন্দরের সেই মালঞ্চ বৃত্তান্ত মনে পড়ে—'নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক, দেখি মনে বড় দুষ্ক।' সত্যই মালঞ্চ আজ মৃত্যু পথপ্রবাসী। মালিনীবিহীন পুষ্পবনে

পুষ্প নেই, নিষ্পত্র বৃক্ষ-লতায় নূতন করে পত্র সঞ্চার পুষ্পোদগম হয় না। মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে না, আনন্দিত সৌরভ ছোটে না। কাঞ্চন কস্তুরী অপরাজিতা চম্পক আর নাগকেশরের বনে আজ ভ্রমর গুঞ্জনের দিন ফুরিয়েছে। আনন্দিত নিকুঞ্জবনে এক অপার্থিব নীরবতা। বিষাদগাথা রচনা করবারও বুঝি অবসর নেই। রামপ্রসাদ আজ দীর্ঘ কয়মাস প্রকৃত অর্থে বাণীহারা। যে কবি তাঁর কাব্য ভোলেন তাঁকে এ ছাড়া আর কিবা বলা যেতে পারে। এর উৎসস্বরূপা তো ঐ মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির মুখমণ্ডল আবৃত করে থাকা কৃষ্ণছায়া।। ছায়া অপসৃত হয় না। বরং দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতর, সূচ্যগ্রাসী থেকে ক্রমশ সর্বগ্রাসী। রামপ্রসাদ মনে ভাবেন তিনি তো কেবল স্থূল হর্ষ বা সাধন সংগীত রচনা করতে চাননি কখনো। তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনার অন্তরালে একটি বিষণ্ণ অন্তঃকরণ জেগে থাকে। তিনি চিত্রের পদ্মে মজে থাকা ভ্রমর তো নন কদাপি বরং—'ভাসিতেছি দুঃখনীরে, স্রোতের শেহালার মত।' শিলাখণ্ড দুঃখ স্রোতে ডোবে আর শেহালা স্রোতের অভিমুখে ভাসতে ভাসতে সংসারের যাবতীয় ক্লেদ, বেদনা, আনন্দকে প্রত্যক্ষ করে যায়। প্রতিটি পল জেগে থাকে সে সংসারের পাশাপাশি আর একটি সংসারেরই ছায়া হয়ে। তাই তো রামপ্রসাদ জীবনের প্রতি এমনকি জীবনদেবীর প্রতি এতো অকপট স্পর্ধাশীল। তাঁর জগন্মাতা আপন জীবনের নির্যাস কবিতারই এক প্রতিমূর্তি। এ সংসারে জননীই তো একমাত্র বিশ্বস্ত অবলম্বন, অতি আপনার জন নিজের আত্মজা এই কবিতার মতন। কবিতা বিশ্বজননী। হয়তোবা নিজের দ্বিতীয় এক হৃদয়। কখনো তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা আবার কখনো যোগিনী, ব্রাহ্মণী, মেঘবর্ণা শ্যামা রমণী। গর্ভাজাত সন্তানের জন্য জননী একটি গর্ভযাতনা রচনা করে রেখেছেন। সে যন্ত্রণার নিরসন হয় না কখনো, তবে মোচন হয় ক্বচিৎ। সেই মোচনের ক্ষেত্রভূমি একটি চিরবিরহী অন্তঃকরণ। গর্ভধারিণীর দেওয়া যন্ত্রণার আর এক নাম বুঝি বিরহ। ভালবাসার সঙ্গে ওতপ্রোত বিজড়িত সেই মা-হারা সন্তানের বিরহবেদনা বুকে করে তাই রামপ্রসাদ বারে বারে অভিমান করেন, অভিশাপ করেন এবং অবশেষে আত্মসমর্পণের ভণিতা। নিবেদনে আপত্তি নেই কিন্তু সমর্পণ রাখলেই তো যাবতীয় যাতনায় জলসিঞ্চন হয়ে যায়। তাই কবির জন্য ষড়ঋতু-ভরই বিরহের ঘরে সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ রাখা থাকে।

কিন্তু আজ কয় মাস বুঝি সে নিমন্ত্রণের দরজা বন্ধ। বন্ধ দুয়ারে করাঘাত-ক্লান্ত কবি আজ প্রকৃতই বিপর্যস্ত হৃদয়। হৃদয়ে রক্তস্রাব হয় না কতকাল। বদলে কেবলি দেহনির্গত স্বেদবিন্দু, এই নিদারুণ শ্বাসহীন গ্রীষ্মে হয়তো রক্তকণিকায় অশ্রুমোচনের আর এক রূপ। রামপ্রসাদের এই মনোব্যথা আর কেউ না বুঝলেও খানিকটা অন্তত বোঝেন তাঁর সহমর্মী অযোধ্যানাথ এবং অধিকাংশই সহধর্মিণী সর্বাণী যাঁর সঙ্গে জীবনের প্রত্যুষকাল থেকে এই মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত সময় পর্যন্ত দীর্ঘ সহযাত্রা। সর্বাণী অনুভব করেন কবির মানসপটে এখন ঐ বৃষ্টিবিহীন নিরন্ধ্র আকাশটি আঁকা হয়ে আছে। যার সম্মুখ পট জুড়ে রয়েছে রুক্ষ মাটির হৃদয়বিদারি শত-সহস্র দীর্ঘ ফাটল। একটি বিধ্বস্ত মানচিত্র, অগণিত আঁকাবাঁকা রেখাসংকুল বিড়ম্বিত ভাগ্যের প্রসারিত করতল। স্বর্ণপ্রসূ কবিতার জমিনে প্রচণ্ড খরার দাহ। প্রকৃতির বুকে আজ কয়মাস যে তাণ্ডব চলেছে গত কয়েকটি দিন তা রূপ নিয়েছে বিভীষিকায়। শীতকালের স্বল্প ফলন ও শস্যমূল্য বৃদ্ধি, দীর্ঘ অনাবৃষ্টি, সদাশয় সরকারের অস্বাভাবিক রাজস্ব বৃদ্ধি—এ সবই শ্যামলী প্রকৃতিকে করে তুলেছে সংহারময়ী। প্রসন্নাদেবী এখন রুদ্ররূপা চামুণ্ডা। যিনি পালন

করেন তিনি এখন চতুর্গুণ উদ্যমে হরণ করছেন। দীঘল কেশ হয়েছে আকাশে উড্ডীন জটাজাল। স্নিগ্ধ আয়ত চোখে কোটরাগত আগুন। হাসছেন খলখল, সঙ্গে বমবম গালবাদ্য, খটমট নরশিরোহারের কণ্ঠমালা। রজনীরূপিনী বিবস্ত্রা অসুরী। মোহিনীর আজ একটিই রূপ।

এই গ্রীষ্মে পদার্পণ করে দুর্ভিক্ষ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। শুরু হয়েছে বল্‌গাহীন গণমড়ক। কুমারহট্টের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে মানুষ মরছে কীটের মতন। প্রতিবেশি মুরশিদাবাদ এবং সংলগ্ন গ্রামদেশে যে প্রতিদিন পাঁচ-ছয় শত মানুষ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করছে এ সমাচার নদীপথে পলাতক মাঝিমাল্লা আর ভাগ্যবান মানুষজন তীরবর্তী জীবিতদের জানিয়ে দিয়ে যায়। জানিয়ে যায় কেমন করে বহুদিন অন্নের স্বাদহীন মানুষ পরম উপাদেয় ভোজ্যবস্তুর মতন তারিয়ে তারিয়ে মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করছে। ক্ষুধার্ত মানুষ অবশেষে স্বয়ং মৃত্যুকেই ভক্ষণ করছে গো-গ্রাসে।

অনুসরণকারী অযোধ্যানাথের খড়মের চাপা শব্দে রামপ্রসাদ ফিরে তাকালেন। অযোধ্যাকেও বাধ্য হয়েই থামতে হল। এই অবসরে এ হাতের ঘটি অপর হাতে বদল করে নিলেন। প্রসাদ কপট বিরক্তির ভঙ্গিতে বলে উঠলেন—নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না আজু।

অযোধ্যাও খানিক বিস্ময়ের ভান করে প্রসাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে উঠলেন—বাঁচা গেল এতক্ষণে। দম একেবারে আটকে ছিল।

—কেন! কে তোমার গলা টিপে রেখেছিল!

—তুমি ছাড়া আর কে আমার এমন সুহৃদ আছে বলো।

রামপ্রসাদ গলা নামিয়ে বলেন—তুমি কি আজকাল গাঁয়ের পণ্ডিতদের সঙ্গ বেশি করে করছো আজু?

—কেন, কেন! পণ্ডিতদের কথা আসছে কেন!

—তাঁরা তো আমায় দেখলে নাকে উত্তরীয় চাপা দেন। আমি নাকি দিবারাত্র সুরাপান করে থাকি। তা বেশিক্ষণ নাকে-মুখে চাপা দিয়ে থাকলে তো দম আটকাবারই কথা।

অযোধ্যা হেসে ওঠেন। হ্যাঁ, কতক কতক ঠিকই ধরেছো। তবে সুরার গন্ধে নয় তোমার বাক্য বন্ধে।

—সে আবার কি!

—এতটা পথ একসঙ্গে এলাম অথচ তোমার মুখে একেবারে কুলুপ। বলি চাবিকাঠি কি বউঠানের আঁচলে বেঁধে রেখে এসেছো। কি জানি বাপু, থেকে থেকে কি যে হয় তোমার।

অন্যমনস্ক রামপ্রসাদ কতকটা স্বগতোক্তির মতন বলেন—সে কি!

অযোধ্যা গুটিগুটি প্রসাদের দিকে এগিয়ে এলেন। প্রায় মুছে যাওয়া রসকলি আঁকা নাসিকা টেনে টেনে গন্ধ অনুভবের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন—মহাশয়ের কি এখনো খোয়ারি কাটেনি?

প্রসাদ বিন্দুমাত্র দেরি না করে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, কর্মের ঘাট, তেলের কাট আর পাগলের ছাট মোলেও যায় না।

প্রতিজবাবে পটু অযোধ্যানাথ ঝড়ের গতিতে কটাক্ষ ফিরিয়ে দিলেন—হুঁ, আবার এও জানি যে কর্মভোর, স্বভাব চোর আর মদের ঘোর মোলেও যায় না। অবশ্যি

নিন্দুকের রটনা বাদ দাও। তুমি তো নাকি সুধাপান করো।

রামপ্রসাদ আর না হেসে পারলেন না। মেঘাবৃত আকাশের অন্ধকারে সে হাসি উচ্চগ্রামে না বাজলেও একটি চকিত বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। সমঝদারের তারিফের মতন সেই হাসিটুকুই গ্রহণ করে অযোধ্যা বললেন—যাক্, তবু খানিক মেঘ কাটলো। কিন্তু কোন ভাবে ছিলে এতক্ষণ যে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করার কথাটিও হজম করে বসে আছো!

রামপ্রসাদ কথারম্ভের জের টেনে বললেন—সে কথা পরে হবে। কিন্তু আমি ভাবছি তুমিও বড় কম আশ্চর্য মানুষ না।

—সেকি! আমি যে একটা মানুষ, এইটাই তো পরম আশ্চর্যের।

—তুমি কিন্তু বুঝতে পারছো না আমি কি বলতে চাই।

—খুব বুঝেছি। নিত্যি নিত্যি তো বুঝি।

—কি বোঝ?

—কি আবার। বিষয়টি আমার এই খড়ম সংক্রান্ত। এর শব্দে তোমার খোয়ারি কেটে যায়।

—তুমি তো জানো আজু, ব্রাহ্ম মুহূর্তে প্রকৃতি ধ্যানে থাকেন। এ সময় অকারণে শব্দ করে তাঁকে আঘাত করতে নেই।

—বেশ, কাল থেকে আমি খালি পায়েই আসবো। কাল থেকে তুমি আমায় বরং খালিপদ বলে ডেকো। না হলে তোমার সঙ্গে মিলবে কেন। যতো সব চাষাড়ে কাণ্ড।

—এতে আবার মেলামেলির কি আছে?

তুমি তো কালীপদ আছোই। এতদিন আমি ছিলাম কৃষ্ণপদ। কিন্তু বিষয়টা মিলছিল না। কালীর সঙ্গে কি আর কৃষ্ণ মেলে বাপু। কালীপদ আর খালিপদ—বাঃ বাঃ।

অযোধ্যানাথের সরল রসিকতা এখনকার ভারী পরিমণ্ডলকে কিছু লঘু করবার চেষ্টা করলেও রামপ্রসাদ কেবলি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। মনশূন্য মনের নিবাস। কিন্তু কোথাও তো সে বসত করে। যতক্ষণ জীবদেহ ততক্ষণই তো মন। দেহের অভ্যন্তরে একটি সূক্ষ্ম গেহ যেন। সে কি কোন অবলম্বন ছাড়া থাকতে পারে! কিন্তু সে মনের অঙ্গে যে এখন শত কাঁটার লাঞ্ছনা। রসকথার তরল প্রলেপে সে যাতনা দূর হবার নয়। বিশেষ করে যেন বিষকাঁটার তাড়সে একটি স্ফোটক পূর্ণ পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। সে কথা রামপ্রসাদ পরম সুহৃদ অযোধ্যাকেও বলতে পারেননি। বলতে পারেননি তাঁর সহধর্মিণী সর্বাণী আবার গর্ভ ধারণ করেছেন। দুই কন্যা ও এক পুত্রের জননী আর একবার বৃকোদরা হয়েছেন। অর্ধশত বর্ষের প্রৌঢ় রামপ্রসাদ পুনরায় একটি নূতন জীবন রচনা করতে চলেছেন: সর্বাণীর গর্ভ দশ মাস পার হয়ে আজ পরিপূর্ণ। গতরাত্রি থেকেই দেহে অস্বস্তি এবং নানাবিধ উপসর্গ দেখা দিয়েছে। বৈদ্য-সন্তান রামপ্রসাদ পিতৃ অভিজ্ঞতার ধারায় বুঝতে পারেন সর্বাণীর জঠর-রহস্য হয়তো আজ অথবা কাল উন্মোচিত হবে। আর একটি ক্ষুধার্ত জীব নিরন্ন সংসারে অন্নের জন্য হাঁ করে কেঁদে উঠবে। কিন্তু আকাশ যে এখনো ভারগ্রস্ত বিস্ফোটক। দীর্ঘ কয়মাসের বেদনার জ্বলন্ত অন্ধকার কি নির্বাপিত হবে না! মেঘের অন্তরালে লুকানো আলোর গর্ভবাসের সাধনা কি শেষ হবে না! কবে, কোন মুখে আলো আসবে। কোন পথে পলাতকা সরস্বতী আবার ফিরে আসবেন পরিত্যক্ত মরকতকুঞ্জে, লেখনীর মসীধারায় সহস্র মুখে। এ সব সত্ত্বেও রামপ্রসাদ আজ অতিরিক্ত চিন্তিত। তাঁর ভাবনার একটি

নূতন বাঁক জন্ম নিয়েছে। কেন না সকল গর্ভিনী নারীরই এ এক চরম সঙ্কটের সময়। বিশেষত সর্বাণীর আর একটি উপসর্গ যখন অস্বাভাবিক রক্তাল্পতা, অতিমাত্রায় বলহীনতা। সেই চিন্তার মুখ থেকে মাথা তুলে প্রসাদ আকাশের উজ্জ্বল অন্ধকারে হাত তুলে বলেন—ঐখানে কি দেখছো আজু ?

গঙ্গার নিবিড় স্রোতঃপুঞ্জের ছলচ্ছল শব্দের উপর আর একটি নিঃশব্দ স্থির জলধি। সমাহিত জলরাশি চেয়ে আছে অপলকে, তার নিজেরই অস্থির প্রতিবিম্বের প্রতি। এই উভয়ের মাঝখানের জাগ্রত শূন্যতায় রামপ্রসাদের তর্জনী সংকেত। অযোধ্যা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন—তোমাকে দেখছি।

ত্বরিতে ফিরে তাকালেন প্রসাদ।—ঠিকই বলেছো বন্ধু। আমার মন আজ যন্ত্রণায় অসাড়। সে কথা কাউকে বলে বোঝাতে পারি না।

—সবটুকু না বুঝলেও কতক কতক বুঝতে পারি।

—হ্যাঁ, যেটুকু জানো সে পর্যন্ত পারো। আর যা জানো না—

কথা শেষ করেন না রামপ্রসাদ। কতকটা অস্ফুট উচ্চারণেব আত্মগত স্বরে তিনি গুনগুন করে চলেন—জমার খাতে শূন্য দিয়ে খরচে দাখিল করেছি, এবার আমি সার ভেবেছি...

প্রসাদ নিচু কণ্ঠে সুর আলাপ করলেও অযোধ্যার কান এড়ায় না। তিনি বাধা দিযে বলে ওঠেন—ও সব তো পুরনো কাসুন্দি। কেবল হা হুতাশ। হল না, পেলাম না—যতো সব পোড়াকপালে আফসোস। বলি নতুন কিছু বলো।

—কি বলবো আজু।

—কি আবার, একটু আশার কথা। আরে বাপু নদীতে কি কেবল ভাটা আসে ? জোযারও তো হয় না কি।

—হ্যাঁ, জোয়ারই বুঝি আসছে।

অযোধ্যা রামপ্রসাদের আর একটু নিকটে সরে আসেন। তাঁর মতন হেঁয়ালিপটুও ধন্ধে পড়েছেন। প্রসাদের চোখের গভীরে দৃষ্টি রেখে অযোধ্যা বলেন—কি ব্যাপার একটু ভেঙে বলো তো। তোমার প্যাঁচ-পয়জার আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

রামপ্রসাদ মাথা হেঁট করে পায়ের নিচে মাটি দেখেন।—বলতে দ্বিধা হচ্ছে।

প্রসাদের কাঁধে একটি হাত রেখে অযোধ্যা বলেন—আমি তোমার বন্ধু না হতে পারি প্রসাদ কিন্তু মানুষ তো বটি।

গঙ্গার কলকল স্রোতের থেকেও কিছু মৃদু স্বরে রামপ্রসাদ বলে যান—তোমার বন্ধু-পত্নী আর একটি সন্তানের জননী হতে চলেছেন। হয়তো আজ অথবা কাল—

রামপ্রসাদের অসম্পূর্ণ কণ্ঠস্বর নদীর স্রোতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সেই পলাতক স্রোতের বুকে আছড়ে পড়া আর একটি বিস্মিত জলরাশির মতন অযোধ্যা বলে উঠলেন—সে কি !

—না না, আমি ভয় পাইনি। কেবল একটু ভাবনা হচ্ছে সর্বাণীর রক্তশূন্য দেহের কারণে। দেহের ধারণ ক্ষমতা বড় কম।

—আর কোনো কারণে বুঝি ভাবনা হচ্ছে না!

রামপ্রসাদ কোনো উত্তর খুঁজে পান না। অযোধ্যার এই প্রশ্নটি তাঁকে অপর এক উত্তরহীনতার কাছে উপস্থিত করে। সেখানে নির্বাক থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। অযোধ্যা হাসলেন দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে অনেকটা অপরিচিতের মতন। সে হাসি রাত্রির অন্ধকারে দূর হতে দেখা অচেনা কোন আলোকবিন্দু কিংবা হয়তো নিছক

আলেয়া। অযোধ্যা রামপ্রসাদের সুর অনুকরণ করে গেয়ে ওঠেন—রমণীরে বিষ ভেবেছো তাতেও তো দেখি না ত্রুটি, তুমি ইচ্ছা সুখে খেলে পাশা কাঁচিয়েছো পাকা ঘুঁটি। পাকা খেলুড়ে তুমি।

রামপ্রসাদ নিমেষে উল্লসিত হয়ে ওঠেন—বলো বলো। প্রথম আখরটি বলো।

অযোধ্যার হাসির আলেয়া হারিয়ে যায় অপ্রসন্ন অন্ধকারে। তিনি গম্ভীর স্বরে বলে ওঠেন—তুমি যে এতো আত্মসর্বস্ব তা আমার জানা ছিল না প্রসাদ।

ব্যাকুল রামপ্রসাদ অযোধ্যার দুটি হাত চেপে ধরে বলেন—তোমার প্রথম আখরটি শুনে যদি একটি ছত্রও রচনা করতে পারতাম।

—কিন্তু চিরকাল তো উল্টো হয়ে এসেছে। তোমার কথায় আমি কথা চড়িয়েছি। আজ তোমার এ কি হাল!

অস্থির ঝাপটে রুক্ষ কেশ কাঁধে আছড়ে পড়ে বারবার। রামপ্রসাদ বিহ্বলের মতন আচরণ করতে থাকেন। তাঁর ব্যাকুল হাতদুখানি ফিরিয়ে দিয়ে অযোধ্যা বলেন—জানি তুমি জবাব দিতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি তোমার কি হাল।

—কি আজু?

—মতিচ্ছন্ন, মতিচ্ছন্ন।

—হ্যাঁ, আমি এক বর্ণও রচনা করতে পারছি না।

—পারবে কি করে। বৃদ্ধকালে রমণীতে মজে থাকলে কি আর কলাবিদ্যা বশে থাকে। আসলে তোমার ভেতরে সৃষ্টির প্রথম রসটিই প্রবল। এখন বুঝতে পারি বিদ্যাসুন্দরের শৃঙ্গার বিহারের দৃশ্যগুলো অমন নিখুঁতভাবে আঁকলে কি করে।

—তুমি কি রসিকতা করছো আজু, না কি—

— আমার রসিকতার কণ্ঠস্বর তো তোমার অপরিচিত নয় প্রসাদ। আমি কেবল ভাবছি মানুষ কতো স্বার্থপর হতে পারে।

কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা নেমে আসে দুই জনের মাঝখানে। প্রাচীন বটগাছের পাতার আড়াল থেকে একটি গম্ভীর পাখি কেবল সেই নির্বাক অবসরটিকে পূর্ণ করে। একটি সর্পসন্ধানী নেউল চকিতে অন্যত্র পালায়। ঝোপের আড়ালে শব্দ ওঠে সরসর। অযোধ্যা শূন্যে হাত তুলে বলেন—তুমি তো ঐখানে নেই প্রসাদ। আমি ভুল বলেছিলাম। কে বলে সংসারের এই দুর্দিনে তোমার মনে ভার জমেছে। ওসব আসলে হল ভণ্ডামি। তোমার আসল রূপ হল বিদ্যাসুন্দর। কামকলার একেবারে হদ্দমুদ্দ।

এতোগুলি কথা একসঙ্গে উচ্চারণ করে অযোধ্যানাথ দম নিতে থাকেন। রামপ্রসাদকে আর বলে দিতে হয় না অযোধ্যার ইঙ্গিত কোথায়। আর তখনি ভিতরে ভিতরে একটি চাপা অস্বস্তির পুঞ্জীভূত বাষ্প অন্ধকারকে আরো তীব্র করে তোলে। হায়, সর্বাণীর জঠরের অন্ধকার বারিধি পার হয়ে যে অভিযাত্রী এখন প্রায় কূলের সমীপবর্তী সে যদি শুনতে পেতো এই আত্মলাঞ্ছনার বিবরণ তাহলে কি আর তীরের প্রতি তার তিলমাত্র ব্যাকুলতা থাকতো। অপমানিত মানব নিশ্চয়ই মুখ ফেরাতো আবার—বিপরীত অন্ধকারে। রামপ্রসাদ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন—তোমার মতন আমিও যে মানুষ আজু।

—কিন্তু লোকে তো বলে অন্যকথা। বলে তুমি নাকি সাধক।

অযোধ্যার মুখের বাক্য ছিনিয়ে নিয়ে প্রসাদ বলে ওঠেন—আমি মানুষ আজু।

—লোকে বলে তুমি নাকি কবি।

রামপ্রসাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিষণ্ণ ভার চেপে বসে। তিনি আত্মগত স্বরে বিড়বিড়

করেন—মানুষ মানুষ। আমি মানুষ চাই আজু।

রামপ্রসাদের মানুষ শব্দটি চরাচরের গুমোট পরিমণ্ডলে সামান্য আলোড়ন তোলে। যে নদীতে বাতাস ছিল না তার বুকে সহসা একটি সংক্ষিপ্ত বাতাসের আবর্ত জেগে ওঠে। পরপারে শিব মন্দিরে দেবতার প্রাতঃস্নানের ঘণ্টাধ্বনি জলের বুকে একটি চপল কঙ্কণের মতন গড়িয়ে যায়। অযোধ্যা বলে যান—সামনে যে আরো আকাল প্রসাদ। তুমি কি জানো না ফসলের মাঠ শুকিয়ে গেছে। মানুষের খাদ্য গো-খাদ্য হয়েছে। ধানের খেত হয়েছে খড়-বিচালি।

—কিন্তু ফসল মরে গেলেও মাটি তো কখনো মরে না আজু। সে তো আবার ফসলে ভরে ওঠে একদিন।

—তুমি তো জানো প্রসাদ গ্রামে গ্রামে কোথাও-বা ক্ষুধার্ত মানুষ মহামাংস ভক্ষণ করছে।

—তবুও তো মানুষ বাঁচবার চেষ্টা করছে আজু।

—উন্মাদ কিংবা অকৃতজ্ঞ না হলে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। তুমি কি ভুলে গেলে সেই দিনটির কথা। যেদিন একটি মাত্র শকুন আকাশে ভাসতে দেখে তুমি চমকে উঠেছিলে।

না, ভোলেননি রামপ্রসাদ সেই দিনটির কথা। এই গ্রীষ্মের ব্রাহ্মমুহূর্তের আকাশে প্রথম একটি শকুন উড়ে এসেছিল উত্তরদিক থেকে। সেই প্রথম মূর্তিমান বিভীষিকার ভগ্নদূত। দেখতে দেখতে পঙ্গপালের মতন শকুনের পাল আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আর ঠিক তারই অনুসরণে গঙ্গার বুকে ভেসে এসেছিল কতোশত নারী, পুরুষ আর শিশুর জড় শবদেহ উত্তর থেকে দক্ষিণে। আবছা অন্ধকারে হঠাৎ মনে হয়েছিল ঐগুলি বুঝি ভাটার টানে ভেসে আসা কচুরিপানার দঙ্গল। আলো ফুটলে বোঝা গিয়েছিল অন্ধকারে যা মনে হয়েছিল কচুরিপানার দল আসলে তা দলবদ্ধ মৃতদেহ। যা দেখে মনে হয়ছিল পানার চিকন শিকড়বাকড় তা হল রমণীর রুক্ষ এলানো কেশ। আর ঐগুলি নীলাভ ফুল নয় অগণিত মৃতের ক্ষুধার্ত চক্ষু। নদীপথে ভেসে চলেছে মানুষেরই প্রতিমূর্তি। জড় মহাকাল, মহাকালী—নিষ্প্রাণ অসংখ্য শিলাখণ্ড। আর দুই তীর ধরে ছুটে চলেছে বাস্তুত্যাগী, সংসারত্যাগী সন্ত্রস্ত অগণিত নর-নারী। জলবিহারীদের চেয়ে আগে যেতে চায় স্থলপথবাহী মানুষ। তাই তো জলস্রোতের চেয়েও দ্রুতগামী ঐ জনস্রোত। তীরের মানুষ আর্তনাদ করতে করতে ছোটে, জলের আশ্রিতজনেরা সে স্বর শোনে নীরবে। এক দল যায় সাগরে অপর পক্ষ যাত্রা করে অনির্দিষ্ট অন্ধকারে। অযোধ্যার কথায় প্রসাদের সম্বিত ফেরে।

—যে মন্বন্তরে মানুষ মরছে, গ্রাম জনশূন্য হচ্ছে, তার মাঝখানে তুমি আর এক জনকে ডেকে আনছো কোন অধিকারে!

—সংসার যে মানুষ চায় আজু।

—হুঁ, এখন বুঝতে পারছি তোমার মন কোথায় ছিল এতোদিন। তুমি বরং আর একটি বিদ্যাসুন্দর রচনা করো। দেখবে কি রকম তরতর করে লেখা হচ্ছে।

আকাশ কিঞ্চিৎ তরল হয়েছে। চাপা আলো ধীরে ধীরে পক্ষবিস্তার করছে জলে ও স্থলে। কিন্তু অন্তরীক্ষের যে কি উদ্দেশ্য তা অনুমানের উপায় নেই। আকাশ যথারীতি আত্মমুখী, গম্ভীর। রামপ্রসাদ এখনো স্নানের উদ্‌যোগ করেননি। বট-গাছটির শিকড়ে বসে নিত্যকার দেখা দৃশ্য অনুভব করছিলেন। দেখছিলেন কেমন করে রাত্রি অবসানে

পৃথিবীতে দিন আসে। কেমন করে রাত্রির প্রহরী তারাদল আকাশে হারায়। কেমন করে প্রভাতী বাতাসে মুখ তুলে প্রথম পাখিটি ডেকে ওঠে।

অদূরে ক্রমশ স্পষ্ট অযোধ্যানাথ তৈল মর্দন শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। দুই-এক পা অগ্রসরও হয়েছেন। ঠিক তখনি গঙ্গার আঘাটায় একটি আলোড়ন উঠল। একটি সংক্ষিপ্ত জলস্তম্ভ মাটিতে আছড়ে পড়ল আর তার ভিতর থেকে এক বলিষ্ঠ শৃগাল ভীত শশকের মতন ছুটে এল এইদিকে। মৃদু আলোতেও বোঝা যায় মাংসাশী প্রাণীটির দুই চক্ষু জুড়ে রয়েছে এক নিদারুণ ত্রাস। জিহ্বা ঝুলে পড়েছে, লালা ঝরছে, শ্বাস নিচ্ছে ঘনঘন। প্রসাদ বুঝতে পারেন পশুটি মানুষ দেখে বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি। বরং কি অসীম ভরসা' পা মুড়ে বসে পালিত কুকুরের মতন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

অযোধ্যা জলের দিকে অগ্রসর হয়েও ফিরে আসেন দ্রুতপদে-- অনেকটা ঐ ভীত শৃগালের মতন। তাঁর তৈলাক্ত কাঠামোয় বিন্দু বিন্দু স্বেদ।

রামপ্রাসাদ উঠে দাঁড়ান।—কি দেখলে আজু ?

অযোধ্যা বহতা জলস্রোতের দিকে হাত তুলে স্খলিত স্বরে উচ্চারণ করেন—বিদ্যাসুন্দর।

হ্যাঁ, অযোধ্যা ঠিকই বলেছে। চোখ আছে গোস্বামীর। জলের কিনারে দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ দেখতে পান জোয়ারে ভেসে আসা সেই যুথবদ্ধ শবদেহ দুটিকে। নিচে নগ্নিকা নারী, উপরে দিগম্বর কালপুরুষ। কংকালসার দেহদুটি বজ্র আলিঙ্গনে ভেসে রয়েছে তীরের কাছে, ভেসে এসেছে কোন গ্রামান্তর থেকে। রমণী যে সদ্য প্রসূতি এ লক্ষণ সর্বাঙ্গে প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ সন্তান নেই। তার বদলে জননীর গর্ভবাস কালে যে সহস্রদল রক্তপদ্মটি তার নিত্য সঙ্গী ছিল সেটি নিশ্চিন্তে আন্দোলিত হচ্ছে ঢেউয়ের ক্রমাগত করাঘাতে। অভিযাত্রী হয়তো আলোয় এসে পথভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু তার অবতরণের নিদর্শন হিসাবে রেখে গেছে ঐ পুষ্পাঞ্জলি—সৃষ্টির পদপ্রান্তে। রামপ্রসাদ হেঁট হন আর তখনি বুঝতে পারেন শিশুটির জন্য যে স্তনদুগ্ধ নির্ধারিত ছিল তা ছিনিয়ে নিয়েছে তার পিতা—নাকি ঐ উন্মত্ত রাক্ষস। শীর্ণা রমণীর মাতৃত্বের একমাত্র উপচার—বিশুষ্ক দুগ্ধকুম্ভে তৃষিত পুরুষ আমূল বসিয়ে দিয়েছে তার খরধার দন্তপংক্তি। স্নিগ্ধ ক্ষীরের বদলে উত্তপ্ত শোণিতে তার জীবনতৃষ্ণা নির্বাপিত হয়েছে। বহুকাল পূর্বে আস্বাদিত অমৃত স্বাদ থেকে মানবপুত্র বুঝি বঞ্চিত হল এইবার। বিকৃত যন্ত্রণার মধ্যে নারী চেতনা হারায়নি। মৃত্যুর অতলে তলিয়ে যেতে যেতে সে ঐ পুরুষের কণ্ঠনালী আঁকড়ে ধরেছে—হয়তো বা ভ্রমে পড়ে। নির্বোধ জননী তার সন্তানের হৃদয় খুঁজে পায়নি। হয়তো চারিদিকের অন্ধকার লেলিহান বলেই।

হ্যাঁ, অযোধ্যা যথার্থই বলেছে। 'যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে'। বিদ্যা ও সুন্দরের সেই বিহ্বল বিহার দৃশ্যটি মনে পড়ে রামপ্রসাদের। আপাতত সে বিহারে আনন্দ নেই। তার বদলে আছে বিহ্বল যন্ত্রণা সৃষ্টির অপূর্ব উদাহরণ। পার্থিব সুখের অতীত অকপট বেদনার একটি মহিমান্বিত বিবরণ। একই সঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টি গলাগলি সহাবস্থান করে রয়েছে। মহাকালীর কোলে জাগ্রত মহাকাল। প্রকৃতির বক্ষলগ্ন সনাতন আদিপুরুষ। মহাশ্মশানের সংসারে দুটি আত্মসুখ বর্জিত প্রাণ, মৃত্যু-পাথারের অনির্বচনীয় শূন্যতার মাঝখানে একটি নূতন জীবনের ডালি সাজিয়ে রেখে চলে গেছে সংসারেরই উর্ধ্বে। কতো প্রাণের পরিত্যক্ত পূর্ণঘট এমনি করে পূর্ণ করছে কতোশত নবীন প্রাণ। প্রাচীন জলস্রোতের অনুসরণে নদীতে ছুটে এসেছে নূতন স্রোতঃপুঞ্জ।

সংসার কিন্তু তেমনি অবিচলিত থেকেছে। সে এক হাতে বিসর্জন করেছে আর অপর হাতে গ্রহণ। এ সময় তার বাক্য কিন্তু একটিই। উভয়কে সে বলেছে এসো।

অন্ধকার দ্রবীভূত হয়েছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলেও তারই ফাঁকে সূর্য উঠেছে। প্রভাতের সেই প্রথম আলোয় রামপ্রসাদ দেখতে পান ঐ সদ্য-প্রসূতির মুখের বিকার গঙ্গার জলে সম্পূর্ণ ধুয়ে গেছে। ক্ষত-বিক্ষত মুখে যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই। তার বদলে ফুটে উঠেছে জননীর সীমাহীন করুণা। নবাগতের জন্য অনন্ত প্রার্থনা। শিহরিত রামপ্রসাদ অনুভব করেন বিশ্ব-সংসারে তো এমনি করেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট কবিতার জন্ম হচ্ছে অহরহ। প্রসাদ দুই হাতে স্পর্শ করেন সেই অঞ্জলিবদ্ধ নিবেদনের পাত্রটিকে। মৃদু হাতের ঠেলায় তারা ভেসে চলে স্রোতের অনুকূলে।

আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ অনুভব করেন তাঁর ভিতরেও নদীর স্রোত বেজে উঠেছে দ্রিমিদ্রিমি। বাজছে শত শত করতালি। অগণিত শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি। নবজাতকের আগমন-বার্তাবাহী দূরাগত দুন্দুভি-নিনাদ। কে বলে সংসার মহাশ্মশান, মানবজমিন পতিত নিস্ফলা। বিগলিত প্রবল জলস্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবিরঞ্জন বুঝতে পারেন নদীতে জীবন বেজে উঠেছে। সংসারের আর আনন্দের সীমা নেই। শিবা শকুনের বিলাপ ছাপিয়ে উঠেছে মর্তলোকের অপরূপ জীবন-সংগীত। তাঁর আত্মজা নবতম কবিতার একটি অস্ফুট আখর। অদূরে স্নানরত অযোধ্যাকে ডেকে বলেন কবি—আজু, বলি ও আজু।

অযোধ্যা ফিরে তাকান—বলো বন্ধু।

—আমি মানুষ পেয়েছি, আজু, মানুষ!

চোখের আনন্দ দমন করে অযোধ্যা বলেন—সে আবার কোন দেশের গো?

রামপ্রসাদ গঙ্গার বুকে হাতের চাপড় মেরে সুর ধরেন—যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি...
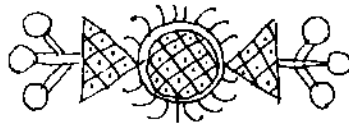
আটঘরার মহিম হালদার ॥ রাধানাথ মণ্ডল

মহিম হালদারের এখন আর সেই ভাবনাটা নেই। যখন লোহার দোকানে খাতা-লেখার কাজ করত তখন প্রায়ই মাথা-চাড়া দিত ভাবনাটা। দেবে নাকি দু-চারটে অন্য কথা ঢুকিয়ে। সেন কোম্পানিকে দু কুইন্টল আড়াই ইঞ্চি রডের পাশে লিখে দেবে, কাল সকালে কলকাতা আসতে একেবারে ভালো লাগেনি ? কিন্তু মহিম তা করে না। সে জানে, তাহলে আঢ্য মশাই পান-খাওয়া দাঁত দুপাশে লম্বা করে বলবেন, রামপেরসাদ নাকি হে ? গান লিখে রেখেছ ?

না, মহিম রামপ্রসাদ নয়। যতই তার খারাপ লাগুক না কেন সে শুধু হিসেবটাই লিখবে খাতায়। কিন্তু চাকরিটা তবু রাখতে পারল না মহিম। একদিন সে ন'শো আশি টাকা হিসেবের জায়গায় নশো চল্লিশ লিখেছিল, মালিক শুধু পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, হালদার, দেখেশুনে হিসেব লেখো, তোমার ভুলের জন্যে আমি না হয় এবার চল্লিশ টাকা লোকসান দিলুম, দেখো আর যেন না দিতে হয়।

মাথা চুলকেছিল মহিম। কোনও জবাব দেয়নি। কী করে যে সে ইংরেজি আর বাংলার মধ্যে মিশিয়ে ফেলেছিল। বাংলার আশি লিখতে গিয়ে কেন যে সে ইংরেজির আশি লিখে ফেলল।

বড্ড অন্যমনস্ক, তুমি হালদার। দশবার ডাকলে তবে সাড়া পাওয়া যায়। আঢ্য মশাই প্রায়ই বলতেন।

কেন যে অন্যমনস্ক মহিম তা কী করে বলবে। ঠিক যে মুহূর্তে তার সামনে কালো কালো লোহার রড, পায়ের কাছে পড়ে আছে হলঘরের এদিক থেকে ওদিক ধাতব পাত, স্তূপীকৃত ইস্পাতের খণ্ড, তখন মহিম চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তাদের গ্রামের বটতলা, বাঁশবন, পুকুরের এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে তার বউ রমলা অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। বলছে, এবছর পুজোর সময় কলকাতা চলে যাবে, আর ফিরে আসবে না।

কিন্তু তবু চাকরিটা গেল। মহিম ভেবেছিল এইখানে কাজ করতে করতেই সে জীবনে উন্নতি করবে। কত লোক তো আসে আঢ্য মশাইয়ের কাছে, তাদের কারও সঙ্গে কি সেরকম আলাপ হয়ে যাবে না, যে মহিমকে একটা ভালো চাকরি দিতে পারে। অথবা তার কাজে খুশি হয়ে আঢ্য মশাইও তো কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারেন চিঠি দিয়ে! তাই সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ডুব দিতে চাইত হিসেবে, দেড় ইঞ্চি রড এক কুইন্টালে কতগুলো ধরে, আড়াই ইঞ্চি ক'খানা, সে মুখস্থ করে রাখত, লোহা-লক্কড়ের ভিতর থেকে যতটুকু সম্ভব রস পেতে চেষ্টা করত।

তবু ভুল হয়ে গেল। লম্বা একটা হিসেব করতে গিয়ে আঢ্য অ্যান্ড সন্সের এক হাজার টাকা লোকসান করিয়ে দিল মহিম। ব্যাপারটা ধরা পড়ল বেশ পরে, যখন টাকাটা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা চলে গেছে। আর তো রাখা যায় না! আঢ্য মশাই

কিছু বলার আগেই মহিলা কলমের খাপ বন্ধ করে নিজের পকেটে পুরল। চটিজোড়া পায়ে গলাল, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে পিছন ফিরে বলল, আমি চলে যাচ্ছি। তবু আদ্য মশাই ডাকলেন, শোনো হে ছোকরা, অন্য কোথাও কাজ করার আগে যোগ অঙ্কটা ভালো করে শিখে নিও।

এখন মহিম জানলা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে হ্যারিসন রোডে ট্রামের লাইন, উলটোদিকে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকা একটা-দুটো সুন্দরী মেয়ে, রাস্তার বাঁদিকে পর পর তিনটে গলি। মহিম এখান থেকে দেখতে পায় বই, বইয়ের বান্ডিল, বইয়ের থলি হাতে বর্ধমান বা মেদিনীপুর, হাওড়া বা পশ্চিম দিনাজপুরের লোক। মহিম মায়াভরা চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে ভাবে এই সেই ভুবনবিখ্যাত কলেজ স্ট্রিট, এই সেই বইপাড়া ; আটঘরার মহিম হালদার এখন এখানে। মহিমের সামনের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, পাঁচখানা বইয়ের মলাট পিন দিয়ে আটকানো, ডানদিকে বাঁদিকে এপাশে ওপাশে শুধু বই আর বই। যে-টেবিলের উপর হাতে ভর দিয়ে বসে আছে মহিম, তারও আধখানা ঢেকে আছে বই, এপাশে এক চিলতে জায়গায় গোল করে পাকানো প্রুফ। মহিম একটু পরে সেই প্রুফ খুলে মেলে ধরবে, পাশে কপি রাখবে, তারপর কপি মিলিয়ে মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আদি পর্বের প্রুফ পড়তে থাকবে।

এটা কি উন্নতি ? মাঝে মাঝে ভাবে মহিম। সবই তো ছিল তার। একটা ছোট মাঠ, মাঠের পাশে তার বাড়ি। অ্যাসবেসটাসের ছাউনির নিচে তার সুখী পৃথিবী, রমলার চুড়ির শব্দে প্রদক্ষিণ করত তার দিনরাত। একটা চাকরি ছিল। চাকরি নয়, মাস্টারি। প্রতিদিন ঘণ্টার মাপে মাপে ছাত্রদের সামনে কথা বলা। সকালে সাঁতার কেটে স্নান করত, বিকেলে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াত। প্রায় দিনই ঈশানের জমিতে ধানের ফলন দেখে খুশি হয়ে উঠত। তবু সেই সব ছেড়ে একদিন সকালে কলকাতায় চলে আসতে হল তাকে।

আটচল্লিশ আর সাতান্নয় কত ? একশো পাঁচ ? আর তার সঙ্গে সাতষট্টি যোগ করলে ? একশো বাহাত্তর। মহিম এখন প্রায়ই মনে মনে অঙ্ক কষে। তবে কি ফাঁকি ছিল কোনও ? কাঁধের উপর বইয়ের ব্যাগ খুব ভারী লাগত বলে স্কুলে যেতে খুব কষ্ট হত। তবু সেই নব ধারাপাত তার সবচেয়ে প্রিয় বই, সে যত্নে ব্যাগে ঢোকাত, বের করত। মাত্র চার বছর বয়সে সে সাতের ঘরের নামতা গড়গড় করে বলে দিত পারত। তারপর সরল গণিত শিক্ষা কিংবা আদর্শ পাটিগণিত। রামের যতগুলি টাকা ছিল শ্যামের তাহার অর্ধেকের চেয়ে দশ টাকা কম ছিল। শ্যামের কুড়ি টাকা থাকিলে উভয়ের মোট টাকার পরিমাণ কত ? এরকম কত অঙ্ক যে সে মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলেছে। কিন্তু তবু ভুল হয়ে গেল কেন ? লোহার দামের চার অঙ্কের সহজ হিসাব থেকে একটা এক কিভাবে যে সে হারিয়ে ফেলল।

কিন্তু মহিম হালদারের এখন আর সেই ভাবনাটা নেই। লোহার দোকানে হিসেব লেখার সময় নিজের দু-একটা কথা ঢুকিয়ে দেবে ভাবত। এখন আর তা ভাবে না। তাছাড়া লিখে ফেলার মতো নিজের কী কথাইবা তার আছে ?

তার নাম মহিম হালদার। বয়স চৌত্রিশ। রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এক সময় মাস্টারি করত। ছোট্ট মাঠের ধারে তার বাড়ি। চোরকাঁটায় ভর্তি রাস্তায় ধুতি তুলে তুলে হেঁটে স্কুলে যেত আর ফিরে আসত। বাড়িতে তার স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী রমলা। কিন্তু একদিন সকালে সেই সব ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছে। ঠিক কিসের জন্যে তা সে

জানে না। স্কুলের চাকরি অস্থায়ী ছিল শুধু এই কারণে? নাকি গ্রামের শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন তার ভালো লাগেনি? তার মনে হয়েছিল অন্য কোথাও তার জন্যে যাবতীয় সুখ, সমস্ত ভালোলাগা অপেক্ষা করে আছে? পঁচিশ বছর বয়সে আটঘরা আদর্শ বিদ্যায়তনে অ্যাসিসট্যান্ট টিচারের টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্ট লেটার আর রমলার হাত ধরে সে যদি তার আগের জীবন শুরু করে থাকে, তাহলে শিয়ালদার এক অন্ধকার ঘরে নিজের হাতে ভাতের ফ্যান-গালা অভ্যাস করতে করতে লোহার দোকানে তার দ্বিতীয় জীবন।

বত্রিশ বছরটা খুব বেশি বয়স—মাঝে মাঝে সে ভেবেছে। তবুও তো দু বছর বেশ কেটে গেল। প্রতি সপ্তাহে বাড়ি চলে যায়। বড্ড খরচ, তবুও। বাড়ি গেলে সোমবার পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর দিন বলে মনে হয়। কিছুতেই আসতে ইচ্ছে করে না। মাকে প্রণাম করে রমলার ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাগ হাতে যখন সে রাস্তার দিকে এগোয়, তখন সে মনে-প্রাণে কামনা করে আজ বাস বন্ধ থাকুক। সারা পশ্চিমবঙ্গে বাস ধর্মঘট বলে খবর বেরোক আজকের কাগজে। সেই কাগজ পড়ুক শরৎ বুক হাউসের রজনী সেন। সোমবারটা সে বাড়িতে থাকবে। শনি আর রবি সেই সঙ্গে সোমবার। দুদিন এবং তিন রাত্রি। কী যে সাংঘাতিক কষ্টকর রমলাকে ছেড়ে থাকা—প্রতি সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে মহিম বুঝতে পারে তীব্রভাবে। ঝুল-ধরা কড়িকাঠের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একলা তক্তপোশ তার কাছে বড়ো শক্ত মনে হয়। ঘুম আসে না, কিছুতেই দু চোখের পাতা বুজতে পারে না।

একটু যদি উন্নতি করতে পারে। বেশি না, শ তিনেট টাকাও যদি পেত। তাহলে সত্তর আশি টাকায় একখানা ঘর, কিছু জিনিসপত্র, এই স্টোভটায় বড়ো ধোঁয়া ওঠে, একটা ভালো দেখে স্টোভ, রমলাকে নিয়ে সংসার পাততে পারত। তাহলে সে আর এমন শনিবারের জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকত না। এমন খারাপ লাগত না সোমবার কলকাতা আসতে। কিন্তু তা আর হয় না। শরৎ বুক হাউসের রজনীবাবু লোক ভালো। কিন্তু একজন প্রুফ রিডারের মাইনে দুশ-র বেশি বাড়িয়ে কলেজ স্ট্রিটে রেকর্ড স্থাপন করার ব্যাপারে একটুও আগ্রহী নন।

ফলে একইভাবে দিন যায়। জানলার বাইরে তাকালে লম্বা হ্যারিসন রোড, ট্রামলাইন, মানুষজন, রিকশা-ঠেলা, হুড়োহুড়ি, আর জানালার এপারে সারি সারি শব্দ, বর্ণমালার সব কটি বর্ণ একসঙ্গে ভিড় করে মাথা তুলে থাকে। মহিম একে একে তাদের সনাক্ত করে, তাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, তাদের অর্থ নিয়ে ভাবে, ভুল শব্দটির গায়ে খুব সাবধানে তার কলমের ডগা চেপে ধরে। বড়ো কঠিন কাজ—মহিম সব সময় ভাবে—এভাবে একটির পর একটি শব্দের উপর চোখ বুলিয়ে যাওয়া। এদের একসঙ্গে কখনও সে দেখে না। প্রতিটি স্বতন্ত্র শব্দ। প্রতিটির গন্ধ আলাদা, প্রতিটির রঙ অন্য রকম। ফলে তার সামনে কখনও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটা পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে না, তার বদলে কিছু শব্দ, ছোটবেলায় বাড়ির পিছনের খামারে গর্ত খুঁড়ে মারবেল খেলার মতো তার চোখের সামনে ঝনঝন করতে করতে গড়িয়ে যায় মুঠো মুঠো শব্দ। অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে মহিম। আমি কি এদের চিনতে পারব? কে ভুল আর কে ঠিক আমি কি জানি? ইউ, লাস্ট বেনচার উঠে দাঁড়াও তো, তোমাকে দেখি, তুমি তো ক্লাস এইটের শওকত, এখানে, ক্লাস সেভেনের লাস্ট বেনচে বসে আছ চুপচাপ, ওহো, উঠে দাঁড়াও। মাঝের সারিতে এ কে—এতো খ, আমি কেমন ঋ বলে

ভ্রম করেছি, য-এর জায়গায় এ তো ষ, পেটটা কাটা আছে, আমি ঠিক খেয়াল করিনি। আমি একা কি পারি এত সব ? মহিম ভাবে, এত অজস্র ঠিক শব্দের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বেঠিক মানুষটিকে টেনে বের করে আনা কি আমার পক্ষে সম্ভব ? তাছাড়া তার বড়ো মায়া হয়। এমন নিষ্পাপ বর্ণের গায়ে ছুঁচোলো কলমের ডগা চেপে ধরলে সে আশঙ্কা করে এই বুঝি রক্তপাত হবে, পাশের এ-কারের কাছে মাঝের এ-কার—মহিমের মনে হয়, কোনও পাখির ডানায় কোপ মারছে, এত নিষ্ঠুরতা ভালো নয়। পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ থমকে থামে মহিম। এত সুন্দর পিঠ খুলে এক কোমর জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ও কে ? আটঘরা ইস্কুলের অ্যাসিসট্যান্ট টিচারের পক্ষে বেমানান কৌতূহল। তবু দাঁড়ায়, মুখ ফেরাতে দেখে এ কী, এতো রমলা, রমলার পিঠ, অমি ঠিক বুঝতে পারিনি। মহিম টেবিলের উপর থেকে মুখ তোলে। সামনে রবীন্দ্রনাথের ছবি, পর পর পাঁচখানা বইয়ের মলাট, রজনীবাবুর গলা শোনা যায়। খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছেন, কোন লাইব্রেরি ? না, টোয়েন্টি পারসেন্টের বেশি কিছুতেই দিতে পারব না।

মহিম জানে, এর মধ্যে তার নিজের কথার কোনও স্থান নেই। চর্যাপদের পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তার কিছু পরে অনুবাদ সাহিত্য। কৃত্তিবাস কিংবা মালাধর বসু। ফুলিয়া গ্রামে এক কবির জন্ম, কিন্তু ঠিক কত সালে জানা যায় না। আটঘরার মহিম হালদার কোনও কবির নাম নয়। চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যে এক কঠিন সমস্যা। মহিম হালদারের সমস্যা অবশ্য তার চেয়ে কিছু বেশি। সে তিনশো টাকা মাইনে চায়, একটা ভালো স্টোভ চায় আর রমলাকে নিয়ে এই শহরে থাকতে চায়। কিন্তু তার এই চাওয়াকে সরিয়ে রাখে এই শহর, কলেজ স্ট্রিটের নির্ধারিত রেট, তার সামনে কেবল সত্য হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্য আদিপর্ব, থার্ড ফর্মার প্রিন্ট অর্ডার।

দিন যায়। মহিমের ছ'দিনের নাগরিক জীবন জুড়ে এক অদ্ভুত শব্দ-সভ্যতা গড়ে ওঠে। ঘুম ভাঙলে মহিমের মনে পড়ে যায় তৎসম আর তদ্ভব শব্দের ফারাক, স্নান করতে করতে ভেবে নেয় ণত্ব বিধি ষত্ব বিধির নিয়মগুলো, আলুসেদ্ধ ভাত খাওয়ার সময় সে প্রায় দশটা কঠিন বানান নিজেকে জিজ্ঞেস করে। মহিমের ড্রয়ারে বাঁধানো চলন্তিকা, যে-কোনও সময় একবার করে খুলে দেখে নেয়। বিকেলে পঞ্চাশ গ্রাম মুড়ি বাদাম দিয়ে খাওয়ার সময় বাঁ হাতে অভিধানের পাতা উলটে যায়। কখনও সে আ বর্ণের পৃষ্ঠা খুললেই তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে আটঘরা গ্রাম, তার মাটির রাস্তা, দুধারে বাঁশগাছ, গাছের উপরে পাতায় পাতায় শিরশির শব্দ। বাস রাস্তা থেকে গ্রামে পৌঁছোনোর প্রায় দু-মাইল মেঠো রাস্তা, শনিবার সন্ধ্যায় একজনকে প্রায় দৌড়ে পেরিয়ে যেতে দেখে মহিম। র-বর্ণের পাতা খুললেই সমস্ত শব্দজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে রমলা, ঠোঁট চেপে তার হাসি, কপালের মাঝখানে বড করে পরা সিঁদুরের টিপ। বড্ড কম বয়স রমলার। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় এক যুগের ব্যবধান। কলকাতায় কেউ যদি শোনে হাসবে বোধ হয়। মনে আছে বিয়ের সেই প্রথম দিনগুলোর কথা। বাপের বাড়ি থেকে আসার কথা হলে গোটা দুদিন দুরাত জুড়ে কাঁদত রমলা। এখনও মনে পড়লে মহিমের বেশ হাসি পায়।

থার্ড ফর্মার পর ফোর্থ ফর্মা, ফাস্ট প্রুফের পর সেকেন্ড প্রুফ। সেকেন্ড বিডিং-এর পর মহিম পাঞ্জাবির পকেটে গোল করে প্রুফ ঢুকিয়ে নিয়ে অথারের বাড়িতে যায়। বেহালা ট্রাম ডিপোর কাছে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপকের বাড়ি। দরজায় কলিং বেল বাজলে ছোট একটি কাজের ছেলে দরজা খুলে দেয়, মহিম কোনও দিন নিজের

নাম বলে না, বলে শরৎ বুক হাউস থেকে লোক এসেছে বলো। বেশির ভাগ দিনই গেট থেকে ঘুরে আসে মহিম। এক এক দিন শুধু তাকে ভিতরে যেতে দেওয়া হয়, চটি খুলে খুব সংকোচের সঙ্গে সোফার উপরে সে বসে। তার জন্যে সেদিন এক কাপ চায়ের অর্ডার দেন অধ্যাপক। তারপর সামনের সোফায় পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সুন্দর চেহারার অধ্যাপক মন দিয়ে কী যেন ভাবেন, আর অকস্মাৎ ভারী ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে দুই তীক্ষ্ণ চোখ মহিমের উপর রেখে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কেমন লাগছে, পড়তে ? এই প্রশ্নে মহিম ধন্য হয়ে যায়। আটঘরা স্কুলের অ্যাসিসট্যান্ট টিচারের বিজ্ঞতা তার মুখে এসে জমা হয়। একটু সমালোচনা করার লোভ কিছুতেই সে জয় করতে পারে না, বলে ,অন্য বিষয় নিয়ে আমার কিচ্ছু বলার নেই, শুধু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চ্যাপটারটা আর একটু প্রাঞ্জল করতে পারতেন। আসলে এই কাব্যটা তো সাধারণ গ্রাম্য ছেলের গল্প। আপনি শ্রীকৃষ্ণকে খুব ঈশ্বর করে দিয়েছেন। ফলে বড়ো বেশি দার্শনিক কচকচি হয়ে গেছে।

বলে ফেলেই মহিমের মনে হয়, কথাটা বলা তার উচিত হয়নি। সে একটু মাথা নিচু করে, অধ্যাপক আর একবার তার দিকে সরাসরি তাকান, তাঁর ফরসা গালের উপর সামান্য কুঞ্চন পড়ে, মহিম বুঝতে পারে না উনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা, সে খুব লজ্জিত বোধ করে। অধ্যাপক হঠাৎ উঠে দাঁড়ান, ঠিক আছে, আমি দেখে রাখব, কাল এসে আপনি নিয়ে যাবেন। মহিমের চা তখনও খাওয়া হয়নি, খুব তাড়াতাড়ি গরম চা এক চুমুকে খেয়ে ফেলে, জিভ পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তবু সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে দাঁড়ায়, বলে, আচ্ছা আমি কাল আসব। এ রকম সময় তো ? শেষ প্রশ্নের জবাব দেন না অধ্যাপক, দোতলার সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে যান। মহিম বাড়ির বাইরে আসে।

কোনও কোনও দিন প্রেসের ছেলেটি প্রুফ আনতে দেরি করে। রজনীবাবু মহিমকে প্রেসে যেতে বলেন। মহিম যায়। বউবাজার স্ট্রিট পেরিয়ে মদন মিত্র লেন, সেখানে থেকে হিদারাম ব্যানার্জি লেন দিয়ে নেবুতলা পার্কের দিকে একটু এগোলে একটা অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে বাড়ির মধ্যে প্রেস। ভিতরে কোনও বসার জায়গা নেই বলে দরজার এপাশ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহিম কথা বলে প্রেসের মালিকের সঙ্গে। ওপাশে সাজানো কাঠের খোপে খোপে খুদে খুদে টাইপ দেখা যায়, একটার পর একটা তুলে সাজানো হচ্ছে। মহিম ভাবে, এভাবেই দ্বিতীয়বার রচিত হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। মালিক মেদিনীপুরের লোক, তাকে বেশ খাতির করে কথা বলেন। মহিম দাঁড়িয়ে থাকে। প্রুফ তোলার ছেলেটি এসে জানায়, আমিই যাচ্ছিলুম স্যার, আপনি আবার কষ্ট করে এলেন। 'স্যার' সম্বোধনে আটঘরা হাইস্কুলের ছবিটা চকিতে মহিমের সামনে ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়, সে বলে, না ঠিক আছে, তুমি দাও। একটু ভিজে আছে স্যার দেখবেন, বলে ছেলেটি তার হাতে প্রুফের বান্ডিল গুঁজে দেয়, মহিম যেতে যেতে অন্যমনস্কভাবে নিজের ডান হাতের তালু দেখে, এখানে কালো কালো অক্ষরের ছাপ ফুটে উঠবে বুঝতে পারে।

এক সোমবার মহিম এসে পৌঁছতেই রজনীবাবু বললেন, মহিমবাবু আপনি এক্ষুণি একবার অথারের বাড়ি যান। বিশেষ দরকার।

আজ ট্রেন লেট করেছে আসতে। হাওড়ার একটু আগে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল খড়গপুর লোকাল। ঘড়ি দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে উঠেছিল মহিম। আজ তার খাওয়া হয়নি। প্রতি সোমবার সে হাওড়া স্টেশন থেকেই বাস ধরে গিয়ে নামে কলেজ স্ট্রিটের

মুখে। নেমেই কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ভিতর একটা হোটেলে যায়। হোটেলের বেসিনে সাবান দিয়ে হাতমুখ ধোয়, একটু ইতস্তত করে বেসিনের কলে নিজের মাথাটাও এগিয়ে দেয়। তারপর রুমাল দিয়ে মাথা মুছে চুলটা আঁচড়ে নেয়। সোমবার এ-ই তার স্নান। আজ ট্রেন লেট করেছে বলে তার স্নান-খাওয়া কোনোটাই হয়ে ওঠেনি। বাস থেকে নেমেই দৌড়ে উঠে এসেছে শরৎ বুক হাউসের সিঁড়ি। তার হাতে একটা ব্যাগ, ব্যাগের ভিতর কেজি তিনেক চাল আর কিছু বেগুন, মটরশুঁটি, টমেটো। প্রতিবার সঙ্গে মা দিয়ে দেয়। মহিম ব্যাগটা নামিয়ে রাখে। এখন ধর্মতলায় গিয়ে বেহালার ট্রাম ধরতে হবে। ট্রামডিপোয় নেমে হেঁটে প্রায় পাঁচ মিনিট। তারপর সেই কলিং বেল। সেই কাজের ছেলেটি।

বেরোতে যাবে, রজনীবাবু বলেন, আর হ্যাঁ, ফিফথ আর সেভেনথ ফর্মার প্রিন্ট অর্ডারের প্রুফ দুটো প্রেস থেকে চেয়ে নিয়ে যাবেন।

মহিম একটু অবাক হয়। কিন্তু সে তো ছাপা হয়ে গেছে।

জানি। রজনীবাবুর গলা একটু গম্ভীর শোনায়। যে-প্রুফে আপনি প্রিন্ট অর্ডার দিয়েছিলেন, সেগুলো উনি দেখতে চেয়েছেন।

মহিমের বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। আবার কি ভুল হল কিছু? সে রজনীবাবুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। রজনীবাবু কিছুই বলেন না আর। তিনি ক্যাশবাক্স খুলে টাকা মেলাতে থাকেন, মহিম সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে নেমে আসে।

পুরানো ফর্মার প্রিন্ট অর্ডারের প্রুফ চাইতে প্রেসের মালিক একটু আশ্চর্য হন। কেন, আমাদের কি কিছু ভুল হয়েছে? মহিম বলে, জানি না। অথার দেখতে চেয়েছেন।

ট্রামে চড়ে মহিম প্রুফ দুটো তন্নতন্ন করে মেলাতে থাকে। কী ভুল? এ প্রুফ তো লেখক নিজেও দেখেছেন। তাঁরও কি চোখে পড়েনি? মহিম অস্থির হয়। তাদের গ্রামের উত্তর পাড়ায় একবার চুরি হয়েছিল। রাত্রে নয়, দিনের বেলা পুকুরঘাট থেকে ভিজিয়ে রাখা বাসন তুলে নিয়ে গিয়েছিল কেউ। নিশ্চয়ই পাড়ার লোক। খুব গালমন্দ করার পর বাসনের মালিক বলল নলচালা করা হবে। সন্ধেবেলা পাড়ার লোকেরা জমায়েত হল এক জায়গায়। দূর গ্রাম থেকে ওঝা এল, সঙ্গে বাঁশের নল। দুজন লোকের হাতে নল তুলে দেওয়া হল। এবার নল চোরের গলা চেপে ধরবে। এত লোকের মধ্যে আসল অপরাধীকে শনাক্ত করবে নল। মহিমের দু চোখ তন্নতন্ন করে খুঁজে গেল...কোথায় আছে সেই কালপিট, এত শব্দের মধ্যে সেই অপরাধী লুকিয়ে আছে কোথায়—

ট্রাম থেকে নেমে বাকি রাস্তা পা আর চলে না মহিমের। কী বলবেন অধ্যাপক? তাকে অশিক্ষিত বলবেন? সে বানান জানে না? নাকি সে অন্যমনস্ক বড্ড? মন দিয়ে প্রুফ পড়তে পারে না?

খুব দ্বিধার সঙ্গে সে কলিং বেল-এ হাত রাখে। চুপচাপ দরজা খুলে দেয় সেই ছেলেটি। সে ভিতরে ঢোকে। বসে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে, অন্য দিনের মতো সমস্ত কিছু। পায়ের তলায় সবুজ কারপেট, ডানদিকে বুক সেলফে সেই সব পরিচিত বই। বাঁকুড়ার ঘোড়ার মুখ তার দিকে ফেরানো।

একটু পরে মহিম চটির শব্দ পায়। অধ্যাপক নেমে আসেন সিঁড়ি দিয়ে। মহিম উঠে দাঁড়ায়। অধ্যাপক তার সামনে এসে দেখি বলে প্রুফ দুটো চেয়ে নেন। মহিম দেখে তাঁর হাতে দুটো ফর্মার ফাইল কপি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি ফরফর করে প্রুফগুলো খুলে ফেলেন। এ পাতা থেকে ও পাতা চোখ বুলিয়ে যান। মহিম চুপচাপ

কারপেটের রঙ দেখে, বুক সেলফে বই, দেয়ালে ছৌ নাচের মুখোশ, বালবের উপর অদ্ভুত কারুকার্যময় ঢাকনা। গোটা সময়কে তার অনন্তকাল বলে মনে হয়। একটু পরে অধ্যাপক বসেন। তাকে বসতে বলেন। ভারী ফ্রেমের ভিতরে ভয়ঙ্কর দুটি চোখ মহিমকে বিদ্ধ করে। অধ্যাপক বলেন, আপিনি দন্ত্য-স লিখতে জানেন না, আপনার সব দন্ত্য-স-কে প্রেস 'ম' করে দিয়েছে।

মহিম অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সে চোখের সামনে দেখে এক জোড়া গোঁফ, পান-খাওয়া দাঁত, একটা উচুঁ বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকা একজন লোক। চারদিকে লোহার স্তূপ। মহিমের কানে এসে বাজে—কোথাও কাজ করার আগে যোগ অঙ্কটা ভালো করে শিখে নেবেন।

মহিম মাথা নিচু করে বসে থাকে। সে বুঝতে পারে না এর পর কী ঘটবে। উনি কি শরৎ বুক হাউসে এখন টেলিফোন করে বলবেন মহিমকে ছাড়িয়ে দিতে? আবার এই দুটো ফর্মা ছাপতে বলবেন, তার খরচ মহিমের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে? নাকি অন্য কোন শাস্তি অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে!

মহিম অপেক্ষা করে। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট। অধ্যাপক নিজের মনে বলেন, এই দুটো ফর্মা ফের ছাপাতে হবে। তারপর আবার চুপচাপ।

অনেক পরে অধ্যাপকের গলা শোনা যায়। আসুন, আপনাকে দন্ত্য-স লেখা শিখিয়ে দিই। মহিম দেখে অধ্যাপক তার একেবারে কাছে এসে বসেছেন। সামনের সেন্টার টেবিল থেকে তুলে নিয়েছেন একটা প্যাড। হাতে তাঁর একটা কলম। কাগজের উপরে কলমের আঁচড় দিচ্ছেন।

খুব দ্রুত মহিমের সামনে দৃশ্য বদল হয়ে যায়। আজ শ্রীপঞ্চমী। সকাল থেকে ব্যস্ততা বাড়িতে। পুরুত আসবে পুজো হবে। সরস্বতীর পটের সামনে অনেকটা জায়গা পরিস্কার করে রাখা হয়েছে। তার দুদিকে দুটো পিঁড়ি। পুজো হওয়ার পর পাশের গ্রাম থেকে আসবেন পটল মাস্টার। এই এলাকার একমাত্র পন্ডিত। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শাঁখ বাজল বাড়িতে। স্নান করে চন্দনের ফোঁটা প'রে পাঁচ বছরে পা-দেওয়া মহিম এসে বসল একটা পিঁড়িতে। চারদিকে পাড়ার লোকেরা ঘিরে ধরেছে। অন্য পিঁড়িতে পটল মাস্টার। তাঁর খালি গায়ে সাদা ধপধপ করছে পৈতে। মহিমকে তিনি আশীর্বাদ করলেন প্রথমে। তারপর একটা পেতলের রেকাব থেকে তুলে নিলেন মোটা চকখড়ি। ঝকঝকে মেঝের উপর দাগ কাটলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। মহিমের হাতে চকখড়ি দিলেন। তারপর নিজে মহিমের হাতটা ধরে মেঝেতে লিখলেন আর মুখে বললেন, বাবা, বলো—অ। মহিম বলল অ। বলো আ। মহিম বলল আ।

বুঝতে পেরেছেন?

মহিম ঘাড় নাড়ে। হ্যাঁ, পেরেছি। যান, বাড়িতে প্র্যাকটিস করুন কয়েক দিন।

মহিম উঠে দাঁড়ায়। চটি গলায় পায়ে। দরজা খুলে বাইরে আসে। অন্য দিনের মতো পরিচিত রাস্তা, রাস্তায় লোকজন। বড় রাস্তায় মুখে একটা ষাঁড় দাঁড়িয়ে, একটু পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে পথচারী। মহিম এগোয়। রাস্তার পাশে একটা বোর্ড, তাতে লেখা, সামনে স্কুল—আস্তে চালান। তাতে আঁকা ব্যাগ কাঁধে একটি ছেলের ছবি। মহিম পেরিয়ে যায়। বাজার বসেছে ফুটপাতে। কড়াইশুঁটির দর করছে একজন লোক। তিন টাকা? এখনও তিন টাকা? একটা ঠেলার পিছনে আটকে আছে বাস, হর্ন বাজছে জোরে। বাসের গায়ে লেখা ডায়মন্ড হারবার হইতে এসপ্ল্যানেড। এসপ্ল্যানেডের দন্ত্য-স-এ বারবার চোখ আটকে যায়।

স্নান হয়নি আজ। রুখু চুলের ভিতরে আপনা-আপনি চলে যায় আঙুল। কাল রাত্রে রমলাকে বলেছিল, আর কিছুদিন, মাত্র কিছুদিন অপেক্ষা করো, আমি একটা বাসা ঠিক জোগাড় করে ফেলব। তার বুকের কাছে মুখ এনে রমলা বলেছিল, তোমাকে ছেড়ে একদিনও থাকতে ইচ্ছে করে না।

প্রথম ট্রামটায় চড়ে না মহিম। ভর্তি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে জানালার ধারে বসে। ইলেকট্রিক পোস্টের উপরে একটা কাকের বাসা। অজস্র শব্দ হচ্ছে চারদিকে। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ট্রামে উঠল একদল মেয়ে-পুরুষ।

মহিম অন্যমনস্কভাবে অভিশপ্ত ফর্মা দুটো দেখে। ম কেটে দন্ত্য-স করেছেন অধ্যাপক। তার চোখে পড়ে বেশ কিছুটা অংশ অ্যাডও করেছেন। দুটো লাইন পড়ে ফেলে মহিম—শ্রীকৃষ্ণ নামে এক বালক ছিল। গোপপাড়ায় দুর্দান্ত বলিয়া তাহার বদনাম ছিল প্রচুর। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে মহিমের। সে পাতাটা বন্ধ করে দেয়।

ট্রামটা চলতে শুরু করলে মহিম নিজেকে প্রশ্ন করল, কত বয়স হল মহিম? হিসেব করে উত্তর দিল নিজেই—পঁয়ত্রিশ।

মাঝেরহাট ব্রিজের নিচে দিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। জোরে হুইস্‌ল বেজে উঠল। দুদিক দিয়ে দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে মোটরগাড়ি। খিদিরপুর মোড়ের কাছে গিজগিজ করছে মানুষ। এরা সবাই কলকাতার লোক। এদের প্রত্যেকের একটা ঠিকানা আছে। যারা মেদিনীপুর কিংবা বর্ধমান, হাওড়া কিংবা পশ্চিম দিনাজপুর থেকে আসে তারা সবাই ফিরে যায়, কিন্তু কলকাতার যারা, তারা থাকে।

রেসকোর্সের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ট্রামের গতি খুব বেড়ে যায়। আটঘরার আকাশে সূর্য কি ঢলে পড়েছে এখনই? হাইস্কুলে কি ছুটির ঘণ্টা বাজল? কী করছে এখন রমলা? মহিমকে এখন যদি কেউ তার নিজের কথাটা লিখতে বলে, কী লিখবে সে? এই মুহূর্তে তার বলার কথা কী?

আটচল্লিশ আর সাতান্নয় কি সত্যিসত্যি একশো পাঁচ হয়? লোহার দোকানে তিন অঙ্কের হিসেব থেকে কী করে টুক করে পড়ে যায় একটা এক? শরৎ বুক হাউসের সিঁড়ি এত খাড়া, এমন আকাশপ্রমাণ উঁচু হয়ে গেল কী করে?

ম-এর নিচে একটা পাগড়ি থাকে, দন্ত্য-স-এ থাকে না। ম-এর আঁকড়ি শুরু হয় ডানদিকে কিন্তু দন্ত্য-স-এর বাঁদিক থেকে।

ট্রাম যখন রেড রোড পাশে ফেলে এসপ্ল্যানেডে ঢুকছে, মহিম আর একবার জিজ্ঞেস করে নিজেকে,

—কত বয়স হল মহিম?

—পঁয়ত্রিশ।

—এই বয়সে আর একবার কি নতুন করে শুরু করা যায়?

কী উত্তর দেবে তা-ই ভাবতে থাকে মহিম।

প্লাবনকাল ॥ সুচিত্রা ভট্টাচার্য

পদ্মবুড়ির রোজনামচা

গাজনপুরের পদ্মবুড়ি এবার যেন কিভাবে জেনে ফেলেছিল আকাশমাটির গোপন খবর। জেনেছিল ! নাকি সে এই ধরিত্রীটারই গন্ধ পাচ্ছে আজকাল ! কে জানে ! কে আর তেমন খোঁজ রাখে তার। একা বুড়ি একলা মনেই থাকে দিনভোর। কবেকার সেই আদ্যিকালের শরীর। বয়সের কোন মাপজোকই নেই তার। সত্তর, আশি, নব্বই কি একশ'ও হতে পারে। কিংবা তারও বেশি। গাজনপুর আসার পথে, বুড়ো মাঠের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে যে প্রাচীন বটগাছটা, বুড়ি বুঝি তারও আগের কালের। চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতম, দাঁড়া গেছে, কোমর অবশ, কান দুখানাও বুজে এসেছে প্রায় ; আছে শুধু এক জরতী কণ্ঠ। তাই কাঁপিয়ে দিনরাত বিনবিন করে চলেছে পদ্মবুড়ি। তিন মাথা এক করে কখনও বা বসে আছে মাটির দাওয়ায়, কখনও বা ডেলামতন শরীরখানা আঙিনার কোলে, রাঙচিতার বেড়ার ধারে। সারা সকালটা বসে বসে মানুষের ছায়া খোঁজে বুড়ি, 'কে যাস রে ? হরির ব্যাটা নিকি ? হ্যাঁ রে, কী ধান এবার রুইলি বাপ ? পাটনাই ?'

কখনও ডাকে, 'বেন্দাবনের বউ নিকি লো ? তোর মেয়ে যেন ছেলে বিয়োতে কবে আসছে এখেনে ?'

একজন সাড়া করে তো দশ জন পাশ কাটিয়ে যায়। সাতকেলে বয়রা বুড়ির সঙ্গে অহেতুক বকে মরার সময় কোথায় মানুষের ? বুড়ি শেষে একা একাই প্রলাপ বকতে শুরু করে দোরগোড়ার কাঁঠাল গাছটার সঙ্গে। গরু-ছাগল সামনে এলে ফিকফিক হেসে গল্প জমায়, 'বলি ও ছাগলি, কার খেতে অমন ডগ্‌ডগে পালং পেলি রে অ্যাঁ ? চিবো, ভাল্ল করে চিবো।'

বকম বকম আর বকম বকম। বসে বসে শুধুই কথার চরকা কেটে চলা। তারপর কথায় কথায় বেলা বাড়লে বাবলা ডালের লাঠিখানায় ভর দিয়ে বুড়ি কষ্টেশিষ্টে উঠে দাঁড়ায়। ঠুকুর-ঠুকুর নাতবৌদের উঠোনে গিয়ে গন্ধ খোঁজে। গরম ভাতের গন্ধ। লোভী কাকের মত উঁকি দেয় ঘরের ভেতর। তোষামোদের গলায় বড় নাতবউকে ডাকে—'ও রাঙাবউ, কাশিটা তোর এট্টু নরম হল ?' কোনদিন গলায় নির্ভেজাল উৎকণ্ঠা, 'তোর কচিটার জ্বর নাকি আর কমে না ? ও রাঙাবউ, ওষুধপালা করেচিস কিচু ?'

সোহাগবালা ভেতর থেকে ঝনঝনিয়ে ওঠে, 'তার খোঁজে তোর কি দরকার ? ফের বুঝি এ ঘরে বিষনজর ঢালতে এসেছিস ?'

পদ্মবুড়ি ঝামটাটুকু বোঝে, কথাকটা শুনতে পায় না। দু হাতে লাঠি চেপে পেঁপেতলায় উবু হয়ে বসে। ঘোলা চোখে পিটপিট তাকায়, 'রেগে যাস কেন ? ছেলেপুলের ব্যারামে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এইবেলা তুলসীপাতা কখান ছেঁচে, আদা দিয়ে খাইয়ে দে দিকিনি।'

'তুলসী গঙ্গাজল তোর মুখে পড়ুক। ডাইনি, রাক্কুসী বুড়ি, খবরদার যদি কুছায়া ফেলিস আর...দুনিয়াসুদ্দু মানুষ খেয়েও আশ মেটেনি না ? মরণখাকি, যমের অরুচি...

সোহাগবালার চিৎকার শব্দ হয়ে টুকরো টুকরো কানে ঢোকে যেন। পদ্মবুড়ি বোঝে আজ এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। রাঙাবউ-এর মেজাজ আজ তাতল আঁচ। তবু বসে থাকে কিছুক্ষণ। গত সনের আগের সনে বড় নাতিটা হঠাৎ একদিন ধড়ফড়িয়ে মরে গেল। সেই থেকে রাঙাবউ এমন পাগলপারা। পদ্মবুড়িই নাকি গিলে নিয়েছে বড় নাতিকে। তা বলুক যা মন বলে, পদ্ম তাকে মাপ করে দেয়। কচি বয়সের বিধবার রাগ গায়ে মাখতে নেই। শাপ দিক, গাল পাড়ুক, মাঝেসাঝে তবু দুটো ভাতপান্তা তাকে দেয়ও বটে রাঙাবউ। ভাবতে গিয়ে সোহাগবালার দুঃখে হৃদয় কাঁদে। শক্তিমানটা তারও কি কম আদরের ছিল ? ছেলের ঘরের প্রথম নাতি বলে কথা। যেমন তার নাম, তেমনি রূপের জুলস। এই সাজোয়ান চেহারা, এতখানি বুকের পাটা। ঠাক্মা বলে সামনে এসে দাঁড়ালে আরেকটা কার শরীর যেন মনে পড়ে যেত। কাকে যে মনে পড়ত, ছেলে ? না ছেলের বাপ ? পুরোনো মুখগুলো ঠিক ঠিক আর মনে পড়ে না এখন। পদ্মবুড়ি ময়লা ছেঁড়া কানিমতন আঁচলখানা তুলে চোখের পিচুটি আর কষ মোছে। সোহাগবালা দাপদুপ ঘরে ঢুকে যায়। আরও খানিক বসে থেকে পদ্মবুড়ি ওঠে। এবার মেজর দোরে যাওয়ার পালা।

—'ও সত্য, সত্য ঘরে আচিস নিকি ?'

বারকয়েক ডাকার পর হেঁসেলঘর থেকে সত্যবানের ডাগর মেয়ে সুন্দরী ভারি তাচ্ছিল্যে জবাব দেয়—'বাবা ঘরে নেই। বাঁধের কাজে গেছে। কেন ? তার সঙ্গে কি দরকার ?'

বুড়ি শুনতে পায় না। ফের গলা কাঁপায়, 'ও বউমা, ও সত্য, গেলি কোথায় সব ?'

ডুরে আঁচলে হলুদহাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে সুন্দরী, 'হলটা কি ? অত চিল্লাও কেন ?'

—'তোর মা-বাপ ঘরে নেই ?'

—'কেন ? কি চাই তোমার ?'

উঠোনটাতে পা দিয়েই গন্ধ পেয়ে গেছে পদ্মবুড়ি। কান যাক, চোখ যাক, নাকটা এখনও ভালই আছে। বরং দিন দিন সরেস হচ্ছে আরও। সেই নাকে ঠিকই ঝাঁপ কেটেছে সত্যবানের ঘরে সেদ্ধ চাল ফোটার গন্ধ। মরে যাই। কী মধুর ঘ্রাণ। মুখের লালা টপাটপ গিলে নেয় পদ্মবুড়ি। চাইবে কি চাইবে না ভাবতে সময় নেয় দু দণ্ড। না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু বলে ফেলে, 'তোদের ঘরে বুঝি এত বেলায় ভাত নামল ?'

সুন্দরী মাচা থেকে কুমড়োফুল ছিঁড়ছে। পদ্মবুড়ির ফোকলা গালে হাসি ছড়ায়—'ফুল ছিঁড়িস কেন ? ভাজবি বুঝি ?'

'ভাজি না ভাজি তোমার কি ?'

—'এক মুঠ ভাতের সঙ্গে দুটো গরম ভাজা যদি দিস...'

—'এহ্, বড় নোলা যে।' সুন্দরী অবিকল তার মায়ের গলায় কথা বলে, 'কেন, তোমার পিরীতের ছোট নাতি খেতে দেয়নি ?'

—'দিছিল।' হাতের কাঠি কাঠি পাঁচটা আঙুল জড়ো করে দেখায় পদ্ম, 'পান্তা। এই এত্তটুকুন। তাতে মোটে পেট ভরেনি রে মা...'

—'ভরবে কি করে ? পেট তো তোমার পেট নয় ; জালা।' সুন্দরী দাওয়ায় ঝোলানো দড়ির দোলনা থেকে কাঁথাসুদ্ধ ছোট ভাইটাকে কোলে তুলে নেয়। ঘুরিয়ে শোওয়ায়। তারপর পদ্মবুড়ির পাশ দিয়ে বেড়ার ধারে এসে গলা চড়ায়, 'ও নুড়ো, ও হেরো, সাবিত্তির রে, ভাত খাবি আয়।'

পদ্মবুড়ির ছানিচোখে ভাতের লোভ ক্রমশ হলুদবরণ ধারণ করতে থাকে, 'ভাইবোনদের খেতে ডাকিস বুঝি ? আহা, বাছাদের খাওয়া হয়নি এখনও, তবে আমি এট্টু বসি...'

—'না, না, যাও তো এখন। ভাগো এখান থেকে। মা গেছে শেতলামন্দিরে পুজো দিতে। এসে পড়ল বলে। সেদিনের মত আবার এমন ঝ্যাঁটার তাড়া দেবে...'

সুন্দরী এত কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে যে শুনতে কষ্ট হয় না পদ্মবুড়ির। কষ্ট আসে অন্যত্র। দলা বেঁধে। গলার কাছে। তাড়া খাওয়া ল্যাংচা কুকুরের মত বাইরে ছিটকে আসে। বিড়বিড় করে কি যেন বকে খানিক। তারপর কাশবন মুণ্ডুখানা প্রায় মাটিতে ঝুলিয়ে বেড়ার গা বেয়ে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে পেছন দিকের পুকুরধারে চলে আসে। শ্যাওলা আর কচুরিপানায় পুকুরটার জল বারো মাসই গাঢ় সবুজ। আশপাশে তেলাকুচো, বাসকপাতার জঙ্গল। সুশুনি, হেলেঞ্চা, কাঁটানটেও হামা টেনেছে কোথাও। পুকুর পেরিয়ে পদ্মবুড়ি আরও কিছু দূরের শিরীষ গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে বহু দূর অবধি দেখা যায় উদাস ধানভূমি। বুক থেকে অভিমান ঠোঁটে এসে রাগ হয়ে যায়। ঝুলন্ত চামড়া কাঁপিয়ে শিরা-উপশিরারা দপদপ করে। রাগ যত বাড়ে, পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়িগুলো তত লাফালাফি করে। ছোট নাতিটা আজকাল বড়ই কম খোরাকি দেয়। নিষ্ফল রাগে বুনো ঘাসে লাঠি আছড়ায় বুড়ি। শাপমন্যি করে ধানভূমিকে, 'মর মর, মরে যা সব। শুকিয়ে মর।' বাতাসে থুতু ছিটিয়ে ধুলোর সঙ্গে ঝগড়া করে। শেষে কোমর যখন টাটিয়ে আসে, শিরদাঁড়ায় যন্ত্রণা নামে, তখন ধুলোমাটিতে থেবড়ে বসে। ভরদুপুরে খুনখুন সুর তুলে কেঁদে যায়, 'আমারে কেউ দু গাল ভাত দেয় না গো। ওগো আমারে কেউ ভাত দেয় না...'

এরকমই চলে প্রায়দিন। এরকমই খোলা রোদে রোজ কেঁদে চলে পদ্মবুড়ি। কেঁদে কেঁদে নালিশ জানায় ধরিত্রীকে। কোনদিন কোন দয়ালু পড়শি ডেকে দুমুঠো খেতে দেয়ও বা। নরম মনের নাতিপুতিও কেউ ঘরে দিয়ে আসে। নইলে বুড়ি ওমনি পড়ে থাকে আকাশের তলায়। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঝিমিয়ে পড়ে। কালোকুলো পোঁটলামতন দেহটাকে তখন দেখায় ঠিক মাটির ঢিবির মত। তবে বুঝি এভাবেই মাটি হতে হতে একদিন মাটির ঘ্রাণ পেয়ে যায় পদ্মবুড়ি। আকাশের মতলব জেনে যায়। বাতাসের মতিগতি আগাম বুঝে ফেলে।

সুখের মুখে কিসের গন্ধ।

এবার ভাদ্রমাস যেতে না যেতে কেমন যেন এলোমেলো কান্না ধরেছিল পদ্মবুড়ি। সময় অসময় নেই, যাকে পায় ডেকে মনের শঙ্কা জানাতে চায়। ছোট নাতিকে রোজ বলে, 'ও রুপো, কাল রাতে আকাশটাকে দেকেছিলি ? কেমন যেন রঙঢঙ করছিল না ?'

রূপবানের হয়ত খুব তাড়া। চটপট কাজে বেরোতে হবে। রেল স্টেশনের বড় মিষ্টিদোকানের হেডকর্মচারী সে। কাঁধে হাজার দায়দায়িত্ব। নেহাত চায়ের সময়টুকু ছাড়া গাঁয়ে থাকার ফুরসত নেই বড়। ভোর না হতে বেরিয়ে পড়ে। ফেরে সন্ধের মুখে, ডুমুরমণির সঙ্গে। একঝলক প্রেমালাপ সারার পর। সকালবেলা বাসি পান্তা বেড়ে রেখে

যায় ঠাকুমাবুড়ির জন্য। বহুকাল ধরে এ এক বাঁধাধরা ব্যবস্থা। যেদিন থেকে জমি-ভিটে পৃথক করেছে তিন ভাই, সেইদিন থেকেই।

হাওয়াই শার্ট গায়ে গলিয়ে রূপবান ঠাকুমাকে ধমকায়, 'কদিন ধরে কী এক কথা ঘ্যান ঘ্যান করে চলেছ বলো তো? চুপ থাকো একটু।'

—'চুপ কি করে থাকি বাপ? মনে যে বড় ধন্দ...'

—'হয়েছেটা কি?'

—'আকাশ এত গুমসুম কেন লাগে রে ভাই? বাতাস যেন টেরা দিকে বয়...'

—'কচু বয়।' রূপবান ভাবে বুড়ির মাথাটা তবে পুরোপুরি যেতে বসেছে। একেই বলে ভীমরতির শেষ দশা। দিব্যি হালকা বাতাস বইছে চারদিকে। আকাশ জুড়ে সাঁতার কাটছে পালক পালক মেঘ। এরপরই তো রঙ আসবে ধানের বুকে। রূপবান হিসেব করে দেখেছে এবার তার ফসল মন্দ উঠবে না। ঠাকুমা যতদিন তার কাছে, জমির দু'দুটো ভাগ তারই। বাকি দু'ভাগ বড় মেজর। তবে কি না পরের সনে বুড়িকে আর রাখা যায় কিনা যায় না। ডুমুর সাফ সাফ বলে দিয়েছে, 'কোন বুড়ি-ঝুড়ি নিয়ে আমি ঘর করতে পারবনি বলে দিলুম।' আরে বাবা, আখেরে যে ক্ষতিটা তোরই সে কে বোঝে। পদ্মবুড়ির পরমায়ু সহজে ফুরোবার নয়। তো ডুমুর কোন কথাই শুনতে চায় না। কাঁচা বয়সের মেয়েরা এরকমই অবুঝ হয়। রূপবানও বেশি ঘাঁটায় না। দরকার কি বাবা। ডুমুরকে পাওয়ার জন্য সে এখন সব ছাড়তে রাজি। এমনকি জমির একটা গোটা ভাগও। ঠাকুমার ভাগের ধান বেচে আগেই বুলি গড়িয়ে ফেলতে হবে একজোড়া আর পায়ের মল, নাকের নখ। অঘ্রানেই বিয়েটা সেরে ফেলবে। কতদিন আর নিজের ভাত নিজে ফোটানো যায়। ভাবতে ভাবতে ডুমুরের ধ্যানে ভারি বিভোর হয়ে যায় রূপবান। সেই ফাঁকে পদ্মবুড়ি কখন বেরিয়ে যায় বাইরে। মেজ নাতির ভিটের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকে, 'ও সত্য, সত্য রে, জেগেচিস নিকি? একবার বাইরে আয় তো। বাতাস শুঁকে দ্যাক দিকি কেমন সোঁদা সোঁদা বাস পাস না?'

সত্যর বউ পারুল চা ছাঁকতে ছাঁকতে মুখে আঁচল চাপে, 'ওই আবার দিন না ফুটতে ভুল বকা শুরু হল বুড়ির। তা যাও না গো মেজ নাতি, এত করে বলে যখন একবার নয় বাতাস শুঁকে এস।'

সত্যবান সুখটান দেয় বিড়িতে, 'এবার মনে হয় বুড়ি মরবে।'

—'সে গুড়ে বালি। আরও হাজার বছর বাঁচবে ওই বুড়ি। তোমার চতুর ছোট ভাই ঠিক কল করে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে।'

সোহাগবালার বড় ছেলেও একই কথা বলে মাকে, 'ও বুড়ির মরণ নেই রে মা। তুই যা ভাবিস...'

সোহাগবালা ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলে। দাওয়া থেকেই দেখা যায় পদ্মবুড়িকে। লাঠি হাতে টলমল এগিয়ে চলেছে। দিনভোর এখন ঘুরবে পড়শিদের দোরে। পথ আটকাবে মানুষজনের, 'ও আমার চাঁদ, আকাশটাকে ভাল করে দ্যাক না রে ভাই...'

বাঁধনভাঙা ঝড় এল

ঝড়টা উঠেছিল ঠিক বিকেলের মুখে। আশ্বিনের ধান তখন দিব্যি নওজোয়ান। যেদিকে তাকাও উপচে পড়ছে ভরাট পৃথিবী। ঘরে ফেরার মুখে গুনগুন গান ধরেছিল রূপবান। কদিন ধরে আকাশ যেন একটু থমকে আছে। তা থাক। অকালের মেঘে কত আর জল থাকে। বুড়ো মাঠ ভেঙে কাঁচা রাস্তায় উঠেছে কি ওঠেনি, একটা দমকা বাতাস

এল উত্তরদিক থেকে। আকাশপারের নিরীহ মেঘগুলো চমকে উঠছে সঙ্গে সঙ্গে। রূপবান ঢোলকলমির ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা কি বোঝার আগেই আরেক প্রস্থ বাতাস দৌড়ে এসেছে। ঝামর ঝামর নেচে উঠল ধুলোবালি। উত্তরকে বুখতে দ্যাখ না দ্যাখ তেজী হাওয়া ছেড়ে দিয়েছে দখিন। বাতাসে বাতাসে যুদ্ধ বেধে গেল। অট্টহাসিতে ফাটছে বাতাস, গাছগুলির ঝুঁটি চেপে উন্মাদ নাচ নাচছে। রূপবান তাড়াতাড়ি পা চালাতে চাইল। হঠাৎ কী আজব ঝড় উঠল রে বাবা। ঝড় নয় যেন লক্ষ লক্ষ ঘোড়সৈন্য দাপাদাপি শুরু করেছে। তুফানী ঝাপটায় গোটা একটা নারকেল গাছ শুয়ে পড়ল ভুঁয়ে। আকাশও সেই তালে ক্রমে খেপছে। পাগলা ষাঁড়ের মত বারকয়েক হুঙ্কার ছাড়ল। মেঘ ঝলসে ফুঁসে উঠল বিদ্যুৎ। রূপবান ছুটতে শুরু করল। ছুট ছুট। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে ঝড়। আছড়ে কামড়ে ফেলে দিতে চাইছে মাটিতে। ধুলোবালির ঝাপটে চোখ কানা হবার জোগাড়। ঘরে পৌঁছানোর আগেই গলগলিয়ে বৃষ্টি নেমে গেল। দশদিক আঁধারে আঁধার। কাদের যেন ছাড়া ছাগল প্রাণভয়ে কাঁদছে। পাশ দিয়ে ফকির মণ্ডল দৌড়ে গেল, 'পালা রে রূপো, আকাশ মাতাল হয়ে গেছে।' মাতাল বলে মাতাল! অমন ভয়ানক মাতাল বাপের জন্মে দেখেনি কেউ। গোটা রাত অন্ধকারের ঘাড়ে চেপে ঝড়বৃষ্টির সে কী তাণ্ডব খেলা। গাছ ভাঙছে, চাল উড়ছে, কান ফাটিয়ে ধুম ধুম ডাক ছাড়ছে বৃষ্টি। শেষে ভোর এলে পরে একটু যেন শান্ত হল পৃথিবী। আর তখনই মূল দুঃসংবাদটা এসে পৌঁছল গাজনপুরে। সারা রাতের বর্গী ঝড়ে ভেঙে গেছে দক্ষিণের অনেকগুলো সরকারি ভেড়ির বাঁধ। কতগুলো ভেঙেছে হে? পাঁচ? দশ? কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারে না, সর্বনাশের আতঙ্কে কাঁপছে মানুষ। গ্রামের পর গ্রাম ডুবিয়ে ছুটে আসছে মুক্ত জলের স্রোত। আসছে গাজনপুরের দিকেই। গভীর রাতে কখন গাজনপুরে ঝড় গিয়ে হামা দিয়েছিল ভেড়িগুলোর বাঁধে। ঘাড় ধরে টেনে তুলেছিল বন্দি জলরাশিকে। তারপর ধাক্কা মেরে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে গাজনপুরের দিকেই। যে পথ দিয়ে সে আসে, থাবা মেরে ভেঙে দেয় ঘরবাড়ি, ডুবিয়ে দেয় সদ্যযুবতী ধানগাছ, ভাসিয়ে নিয়ে চলে গরু, ছাগল, ভেড়া কিংবা অসাবধানী কোন মানুষজন। মাকালতলা ডুবে গেছে, নবীন পুকুর ডুবুডুবু, গাজনপুর ভাসলো বলে। দিশেহারা মানুষগুলো এলোপাথাড়ি আশ্রয় খুঁজছে। মেয়েবউদের কান্না আর শিশুদের ভয়ার্ত চিৎকারে জল আসার আগেই বানভাসি হল গাজনপুরের মানুষ।

ধানের বদলে মাছ, টাকডুমাডুম ডুম

সাতদিন পর, রাস্তার জল কোমর ছেড়ে যখন হাঁটুতে, রেললাইনের উঁচু পাড় থেকে একে একে ঘরে ফিরল সকলে। সত্যবানের ঘর মুখ থুবড়ে পড়েছিল ঝড়ের রাতেই। কিছু বাসনকোসন, বিছানা কাপড়, আর গোপন কটা টাকা নিয়ে সে সদলবলে চলে গিয়েছিল রেললাইনে। সোহাগবালারা উঠেছিল বামুনবাড়ির পাকা দালানে। ঠাকুমাকেও সেখানে তুলে দিয়ে এসেছিল রূপবান। ঝড়ের রাতেই একদিকের চাল উড়ে হা হা করছে তার ঘর। তাই দেখে মড়াকান্না আর থামে না পদ্মবুড়ির, 'ওরে, আমি এখন কোন ঠাঁয়ে ঘুমুবো রে? আমার ঘর নাই রে...কোথায় বসে তবে পান্তা খাই...'

তো বুড়ির কান্না তখন আর কে শোনে। জল নামার পর গাজনপুরের মানুষ তখন বেজায় ব্যস্ত। সরকারি ফিশারির বাঁধভাঙা জল নতুন আশার হাত বোলাতে শুরু করেছে যে। ধানের জন্য কাঁদার সময় পেল না মানুষ। ঘরের দিকে তাকানোর সময় নেই। সময় কোথায় গরু-ছাগলই বা খোঁজার। রূপোলি রাজকন্যার মত ঝাঁক

ঝাঁক মাছ চিকমিক নেচে বেড়াচ্ছে সর্বনাশা বেনোজলে। যেদিকে তাকাও শুধু মাছ আর মাছ। পথের ওপর যেখান সেখান বড় বড় তক্তা চৌকি পেতে জাল ফেলতে বসে গেছে গাজনপুরবাসী। এক এক জালে উঠে আসে ইয়া ইয়া রুই, কাতলা, তেলাপিয়া, পাবদা।

—'আরও আসত গো। শালা নবীনপুকুর সব আগে ধরে নিচ্ছে...'

মাকালতলা বলল, 'তিনবিবিতে জল আগে ঢুকেছিল। ওরাই শালা বেশির ভাগটা নিল...'

রূপবান, সত্যবান, এমনকি সোহাগবালার কিশোর ছেলেটাও জলে ছুটছে মাছ শিকারে। বামুনবাড়ির উঠোনেও জলকন্যের দল তিরতির সাঁতার কাটছে। কচিকাঁচারা জলপোকার মত গোটা দিন ঘুরতে লাগল জলে। মাটিকাদা মাখামাখি হারানের ছেলে ডুব দিয়েই লাফিয়ে উঠল, 'এই দ্যাখ, আরেকটা ধরলাম।'

দেখাদেখি সোহাগবালার রোগা ছেলেটাও হাত নাচাল, 'আমিও পেয়েছি। সিলভার কাপ।'

পদ্মবুড়ি স্যাঁতানো দালান থেকে শিশুর মত হেসে উঠল, 'আমায় দে। আমার দে এট্টা।'

সোহাগবালার ছোটছেলে এইটুকুনি এক পুঁটিমাছ দিয়েছে বুড়ির হাতে। তাই পেয়ে বুড়ি আহ্লাদে ডগমগ, 'ধান পচছে, ঘর ভেঙেছে, এখন উপায় কি ?

আর কটা দিন সবুর করো,

পুকুর চষেছি।'

কার পুকুর কে এসে কখন ভরে দিয়ে যায়। জল সরার পর গাজনপুরের সব পুকুরে মাছে মাছে থৈ থৈ। ধানের বদলে মাছ এসেছে ঘরে। মাছ সামলাতে গাজনপুরের মানুষ ছুটছে যে-যার পুকুর বাঁধতে। পুকুর বাঁধো হে, আগে নিজের পুকুর বাঁধো। পাঁচজনের মত পদ্মবুড়ির নাতিগুলোও হাত লাগাল পেছনবাগের পুকুরটাকে বেঁধে ফেলতে।

কার মাছ কে খায়

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে চুপড়ি জালটা খপাত জল থেকে তুলল পারুল। এবার কয়েকটা সরপুঁটি আর মৌরালা উঠেছে। আগের খেপে উঠেছিল গোটাকয়েক চারা পোনা। মোট আজ মন্দ উঠল না। খুশি খুশি মনে সজনেতলায় পাহারারত মেয়েকে ইশারায় ডাকল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিসনি। এগুলোকেও তাড়াতাড়ি গামছায় বেঁধে ফ্যাল। হেঁসেল নয়, একেবারে ঘরে তুলে রাখবি।'

বাস রে বাস, পাঁচটা মাত্র জালে কত্তগুলো মাছ উঠেছে। সুন্দরীর চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল।

'তবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে! চটপট নিয়ে যা। আমি একটা ডুব দিয়ে আসছি।'

—'সব মাছ বেচে দিবি মা ?'

—'দুটো দোব অখন তোদের।' পারুল জলের ভেতর জালসুদ্ধ হাত ডুবিয়ে রাখল। আরেকবার মাঝপুকুরে গেলে হয়। আরও কিছু ওঠে। বিকেলবেলা স্টেশনে বেচে এলে কটা টাকা হাতে আসবে। বড়ই অভাবে দিন কাটছে এখন। রোজকার রোজ জনমজুর খেটে ঘরে চাল আনে সত্যবান। কোনদিন দুকিলো, কোনদিন চারকিলো। তারপর হয়ত তিনদিন বসেই রইল। কাজ নেই। থাকবে কোথ্থেকে ?

পাঁচগাঁয়ের মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরছে কাজের জন্য। একদিন জুটল তো দুদিন বেকার। নিরুপায় হযে তবেই না পারুল মাছ চুরিতে নেমেছে। তা এ চুরি বোধহয় পুরোপুরি চুরি নয়। মাছ যদি হয় পুকুরের, তবে সে পুকুরে এখন পারুলদের ভাগ পাক্কা পাঁচ আনা। তাও এই ভাগাভাগিতে রূপবান কি সহজে রাজি হয়। তার দাবি জমির মত পুকুরেরও হিসেব হক। ঠাকুমার চার আনা, তার চার আনা, পুরো আটআনাই তাকে দিতে হবে।

সত্যবান বললে, 'তা কি করে হয় ? পুকুর ভাগের কথা আগে কখনও ওঠেনি। মজা পুকুর নিজের মনেই মজেছিল। তুইও কোনদিন দাবি তুলিসনি।'

—'এখন তুলছি। ন্যায্য ভাগ হক সব কিছুর।' শেযে কয়েক দফা মিটিং, ঝগড়া-বিবাদের পর গাঁয়ের মাথাদের কথামত রূপবান ছ আনায় রাজি হয়েছে। হুঃ, তাও যদি বুঝতাম বুড়িটাকে ঠিকমত দেখিস। আপন মনে গজগজ করতে করতে জল থেকে উঠল পারুল। ছপাৎ ছপাৎ জল ছড়িয়ে ঘরে ফিরছে। ঝোপ পেরোবার সময় দুটো হিংচে শাকও ছিঁড়ে নিল। কি ভাবে কচু ঘেঁচু খাইয়ে অতগুলো পেটকে ঠাণ্ডা রাখতে হয় ভগবানই জানে। তারপর কাঁধের কাছে লকলক করছে ভরাবয়সের মেয়ে। মেয়ের বাপ বলে, 'ভাবো কেন ? মাছ যা এসেছে, ঠিকমত বাড়লে পরে, চোত-বোশেখে থোক্ টাকা ঘরে আসবে। কম করে দু-হাজার টাকার মাছ যদি ওঠে তো আমাদের থাকে ছ' সাতশ। তাই দিয়ে এই বোশেখেই সোঁদরীর বর এনে দেব।'

'আর ভিটে বাঁধার কি হবে ? ঠেক্‌না দিয়ে শীতটুকুন নয় পার হল, বর্ষা এলে কচিকাঁচা নিয়ে দাঁড়াব কোথায় ?'

ভাঙা বেড়ার সামনে এসে আবার একটা বড়সড শ্বাস ছাড়ল পারুল। কত কষ্টে না মাথাটুকু ঢাকার ব্যবস্থা করা গেছে। মহাজনের কাছে ধার হয়েছে মেলা। কোন্ দিক রেখে এখন কোন্ দিক দেখা যায়! ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকে কাপড বদলালো। তিনটে মাত্র শাড়ি মায়ে-ঝিয়ে পালা করে পরতে হয়। তাও সব শতেক ফাটা।

সুন্দরী ঘরের আবছায়াতে বসে মাছ গুনতে। সিঁথিতে এক টিপ সিঁদুর ছুঁইয়ে পারুল তার পাশে এসে বসল, 'এই কটা মৌরালা নুন-হলুদ ফুটিয়ে ঝোল করে ফ্যাল। ভাজাভাজি যেন করতে যাসনি। গন্ধ ছডাবে।'

মৌরলার সঙ্গে একটা সরপুঁটিও নিয়ে সুন্দরী ঘর থেকে বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, উঠোনে ভাঙা কাঁসি বেজে উঠল, 'ও পারুলবউ, আমারে এট্টা মাছ দিবিনি ?'

হায় রে মা। পারুল কপাল চাপডাল। শয়তান বুড়ি ঠিক তক্কে তক্কে থেকেছে দ্যাখো। এত কড়া নজরদারির পরও পদ্মবুড়ি মাছের হদিশ পায় কি ভাবে ?

সুন্দরী চকিতে মাছটাকে ছুঁড়ে দিয়েছে চৌকির নিচে। পারুল ঠেলে ঠেলে আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো পোঁটলাটা। বুড়িকে বিশ্বাস নেই। হামলে হুমলে ঢুকে পডতে পারে ঘরে।

—'ও বউমা, এট্টু মাছ দে না রে।'

গলা নয়, যেন শাঁকচুন্নি কাঁদছে। পারুল কোমর বেঁধে বেরিয়ে এল দাওয়ায়, 'ফের আমার উঠোনে পা রেখেছিস অলুক্ষুণে পেত্নী ? যা বেরো, বেরো বলছি।'

পদ্মবুড়ি দু পা পিছোল। ঘাড় কাত করে বুঝি শোনার চেষ্টা করল পারুলবউ কি বলে।

পারুলের গলা আরেক পর্দা উঠল, 'খবরদার যদি তোকে এ উঠোনে দেখি কোনদিন...'

'মাছ একটা পেলেই চলে যাই।'

—'মাছ পাবো কোত্থেকে ? বিয়োব ?'

—'বিয়োবি কি লো ?' পদ্মবুড়ির গলাও উঁচু হল, 'মাছ তো তোর ঘরেই রে।'

পারুল থমকে গেল। বুড়ি আজকাল খুব জেরা করতে শিখেছে। শেখায়টা কে ? রূপবান ? না বুড়ির আদরের নাতবউ সোহাগবালা ? কত শত্তুর যে আছে পেছনে। পদ্মবুড়িকে ঘাবড়ে দিয়ে পারুল হঠাৎ ভেউভেউ করে কেঁদে উঠল, 'আমি বলে পেটেরগুলোকে দুগাল মুড়িও দিতে পারি না...আমার ঘরে শত্তুরেরা মাছ খুঁজতে আসে গো...ও হো হো হো....'

এমন গলা ফাটিয়ে কাঁদছে পারুল যে পদ্মবুড়ির ঝাপসা কানেও হাহাকারগুলো পরিষ্কার পৌঁছে গেল। কয়েক পলক হতবাক দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বাইরে। সোহাগবালাও সেদিন এমন ধারা কেঁদে উঠেছিল। দিব্যি মাছের গন্ধ পেয়ে পদ্ম ঢুকেছিল তার হেঁসেলে। সে এই মারে, সেই মারে, 'আমি বলে কতদিন পর দুটো মাত্র চারাপোনা কিনে আনলুম বাজার থেকে....'

—কিনলি কি রে ? আমি যে তখন নেতাইকেই জলে নামতে দেখলুম।'

—'মরণদশা। কি দেখতে কি দেখেছে। চোখ বলে কিছু আছে তোমার ?'

—'তবে বুঝি ওটা নেতাই নয়।' বুড়ি অমায়িক হেসেছিল, 'মরুক গে যাক্। তুই আমারে এক টুকরো মাছ দে না রে মা। দিবি ?'

'দোব। মাছ নয়, মুখে নুড়ো জ্বেলে দোব তোর। মিথ্যেবাদী, কুচুটিবুড়ি, পেটে তোর এত সন্দেহ ? আমার নেতাই বলে শুধু একটা ডুব দিতে গেছিল পুকুরে...'

কি আর বলে পদ্মবুড়ি। তোরা যেমন খুশি পুকুর থেকে মাছ তুলে খাবি আমি একটু চাইলেই দোষ ? হাঁটিতে হাঁটিতে পদ্মবুড়ি নিজেই নিজেকে নালিশ জানাতে থাকে। রূপবানটা পর্যন্ত তার চোখে ধুলো দিতে চায়। তা কানার চোখে ধুলো দিবি না, তার নাকটাকে ঠকাবি কিভাবে ? পর পর কদিন আলো ফোটার আগেই ঝাপুর-ঝুপুর আঁশগন্ধ। শুঁকে শুঁকে পদ্ম একদিন বলেছিল, 'ও রূপো, রোজ রোজ কার জন্য মাছ তুলিস রে ? একদিন দুটো রাঁদ্ না ভাল করে খাই।' সঙ্গে সঙ্গে রূপবানের সে কী হুংকার, 'খবরদার। মাছের কথা কাকপক্ষী যেন টের না পায়।'

পদ্ম গলা নামিয়েছিল, 'কি করিস তুই মাছ নিয়ে ?'

—'বেচি।' রূপবানের সটান জবাব, 'টাকার দরকার, বুঝলি। ধান কটাকে তো বাণ মেরে শেষ করেছিস...'

পদ্মবুড়িও রেগে উঠেছিল ঝপ করে, 'তবে আমার এক আনা আমারে দিয়ে যা।'

হাইরে বাপ। শুনে নাতির কী তড়পানি। আশ্বিনের আকাশও বুঝি অমন ধারা লাফালাফি করেনি এবার। ভয়ে চুপ মেরেছে পদ্মবুড়ি। শুধু ভরদুপুরে একলা বসে পেটের কথা গলগল উগরে দেয় গাছ-মাটির কাছে। চিরকালের হেলাফেলার পুকুরটায় তখন ছলছল ঢেউ দোলে। চঞ্চল মাছ লাফায় ঘূর্ণি দিয়ে। পদ্মবুড়ির দৃষ্টি অতদূরে পৌঁছয় না। কান্নার মনে সে কেঁদে যায়, 'আমারে কেউ এট্টা মাছ দেয় নাগো। ওগো আমার হাত গিয়েচে, চোখ গিয়েচে, কে আমারে মাছ রেঁদে খাওয়াবে গো... ।' কাঁদতে কাঁদতে বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

বুড়িকে ঘুমোতে দেখলে সোহাগবালা পা টিপে পুকুরে আসে। এসময় জলের বুক বড় শীতল। পা ছোঁয়ালেই শরীর শিউরে ওঠে। তবে এখন ছাড়া সুযোগ কোথায় ?

মেজবউ মেয়েকে নিয়ে স্টেশন গেছে। দেখে নিয়েছে সোহাগবালা। ছেলেমেয়ের দল সব খেলতে গেছে বুড়োর মাঠে। সোহাগবালা বড় সাবধানে জল সরায়। শব্দ হলেই ডুব দেয় গভীরে। জল থেকে ঘুমন্ত বুড়িকে দেখতে দেখতে একবার বুঝি মায়া হয়। শেষ কার্তিকের দুর্বল রোদে গাছের পাশে আগাছা হয়ে গেছে। ডেকে তুলে একটুকরো মাছ খাওয়াতে সাধ হয়। পরক্ষণে মন পাল্টায়। পাগল নাকি ? একবার দিলেই বুড়ির নোলা বাড়বে। তারওপর যা পেট-আলগা। ভ্যাক ভ্যাক করে চাউর করে দেবে দশদিকে। তখন সোহাগের মুখ থাকে কোথায় ? সোহাগই না বড গলায় দেওরদের বলেছে, 'পুকুরের মাছ পুকুরে বাড়তে দিতে হবে। কেউ চুরি করতে পারবেনি। চোত-বোশেখে পুকুর ছেঁচা হলে...'

'হক কথা।' সায় দিয়েছিল সকলেই, 'বাড়তে দিলে মাছ কালে সোনা হবে।'

সোহাগবালা আলতো জল ছড়িয়ে একচোট হাসল মনে মনে। কে কাকে পাহারা দেয়, কে করে চুরি। গাজনপুরের ঘরে ঘরে পুকুর নিয়ে দাঙ্গা লেগে গেছে। মণ্ডলদের ঘরে ভাইয়ে ভাইয়ে হাতাহাতি হয়ে গেল পরশুদিন। সর্দারদের তো মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ধান ডুবিয়ে এবার মজার কল করেছে বসুমতী। মাকালতলায় কাদের পুকুরে যেন রাতারাতি জাল ফেলে মাছ উঠিয়ে নিয়ে গেছে ডাকাতের দল। সোহাগবালার দুই ভুরু জড়ো হল। তবে তাদের গাঁয়েও কি ডাকাত ঢুকছে আজকাল ! গহীন রাতে মাঝে মাঝেই ছপাৎ ছপাৎ জাল ফেলার শব্দ হয় যেন ! মাছ লুটতে ডাকাত আসে, না অন্য কেউ ! রূপবানটাই কি কম বড ডাকাত নাকি ! সোহাগবালা পেছনের জানালা থেকে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছে। আওয়াজ পেলেই সব চুপ হয়ে যায়। সাহস করে লম্প হাতে একদিন বেরিয়েও ছিল। বোঝার আগে সুড়ুৎ সরে গেল তিন তিনটে বড় ছায়া। তিন জন কেন ! তবে তো রূপবান নয় ! সত্যবান তো নয়ই। সে ভারি ভীরু প্রকৃতির।

ভালমানুষ মতন। অনেকটা সোহাগবালার স্বামী যেমন ছিল।

শক্তিমানকে মনে পড়তে জলের কোলে পাথর হয়ে গেল সোহাগ। জাল পাততে ভুলল।

সেই লোকটা পাশে থাকলে আজ এই দশা হয় ? নিজেরই ভাগের পুকুরে আসতে হয় সিঁধেল চোরের মত ? নাকি একফোঁটা ছেলে নিতাইকে পাঠাতে হয় পরের দ্বারে কাজ করতে ?

বেলার মনে বেলা নামছে। অবশ শরীরে সোহাগবালা দাঁড়িয়েই আছে হিম হিম জলে। কার্তিকের সূর্য একটু পরেই ডুব দেবে রেললাইনের ওপারে। পুবের ধানবাদা বেয়ে, পাড়াপড়শির ভিটে মাড়িয়ে থোক থোক কুয়াশা তখন জড়ো হবে গাজনপুরের বুকে। সে কুয়াশায় এক হাত দূরের কিছু দেখা যায় কি যায় না। সোহাগবালার শরীরটা সিরসিরিয়ে উঠল। সময় এখন বড় নির্জন। জল থেকে উঠে পড়ল সোহাগ। থাক্, আজ আর মাছ তুলে কাজ নেই। বরং দেওর দুজন ঘরে ফিরলে কথা বলতে হবে। রাতের বেলা কারা আসে পুকুরে ? সত্যি কি তবে ডাকাত তারা ?

গা মুছে পদ্মবুড়িকে গিয়ে ঠেলা দিল সোহাগ। কি জানি কি ভেবে ডাকল জোরে জোরে, 'ও ঠাক্‌মা, খুব ঘুমিয়েছিস। ওঠ দিকি এবার। ঘরে চল্।'

পদ্মবুড়ি চোখ খুলেই বুজে ফেলল। আবার খুলল। এ কে আজ তাকে ঘরে তুলতে এসেছে। চেনা চেনা ! তবু বড দূরের যেন !

—'আমি রাঙাবউ রে। চিনতে পারছিসনি ? ওঠ্, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

কত যুগ পরে সোহাগ বুঝি নরম করে কথা বলছে। পদ্মবুড়ি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল, —'আমারে কেউ দেখে না রে রাঙাবউ। ভাত দেয় না, মাছ দেয় না...'

অনেক দূরের আকাশ ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে সারসের দল। সেদিকে তাকিয়ে সোহাগবালা ভারি মধুরভাবে ঠোঁট ছড়াল, 'কাল তোকে গোটা একটা মাছ রেঁধে দেবোখন।'

—'কোথ্থেকে পাবি ?' পেছনে হাঁটতে হাঁটতে জেরা শুরু করে দিয়েছে পদ্মবুড়ি, 'এখন বুঝি চুরি করলি পুকুর থেকে ?'

—'দূর কানা বুড়ি।' সোহাগবালা আগের দিনের মত করে ভেংচি কাটল দিদিশাশুড়িকে, 'বাজার থেকে শোল মাছ এনে খাওয়াব তোকে। খলবল করবি জ্যান্ত শোলের মত....'বলতে বলতে গলা নামাল, 'ও বুড়ি, তুই আমার কাছে এসে থাকবি ? কালীর দিব্যি, আমি কাউকে ঠকাই না। তাছাডা রূপবানও তো বিয়ে করলে তোকে তাডিয়ে দেবে।'

পদ্মবুডি ফালফ্যাল তাকিয়ে আছে। রাঙাবউ-এর হঠাৎ এ কী পরিবর্তন ? মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো ?

কাঁঠালগাছের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে হেমন্তের কাঁচা রোদ। একটু পরেই গলে গলে মিশে যাবে আঁধারে। তারপর আঁধার না নামতেই চারদিক নিকষ কালো। শেষ রোদটুকুর দিকে তাকিয়ে পদ্মবুডি ভাবছে কার কাছে থাকলে লাভ বেশি। রূপবান, না সোহাগবালা ? সোহাগ হিসেব করে দেখেছে বুড়ি যদি আরও কটা বছর বাঁচে...ছেলেটা যদি তার মধ্যে আরেকটু ডাগর হয়ে যায়...

ভাবতে ভাবতে দুজনেই হিসেব গুলিয়ে ফেলল। অসম বয়সের দুই বিধবা অসহায় তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

সালতামামি

সকাল থেকেই আয়োজন শুরু হযে গেছে। আজ সত্যবানদের পুকুর ছ্যাঁচা হবে। পাম্প নিয়ে লোক আসছে গঞ্জের বাজার থেকে। তার আগেই রূপবান টাকা চাইল দাদাদের কাছে, 'তিনঘণ্টা মেশিন চললে লাগবে তিন কুড়ি যাট টাকা। তা বাদে কিছু রাহা খরচ। আমি আগাম কুড়ি টাকা দিয়েছি। তোমাদেরটা দাও এবার।'

সত্যবান বলল,—'এর বেলা সমান ভাগ কেন ? পাঁচআনা ছআনা হোক।'

রূপবান ঝাপটে উঠল। হিসেবি মানুষদের ন্যায্য কথায় চিরকালই বিরাগ, 'অত করলে নিজেরাই সব ব্যবস্থা কর গিয়ে। কাজের বেলায় আমি...'

—'আহা হা হা, তেতে ওঠ কেন ?' এক জোড়া মাছরাঙা উড়ছে পুকুরের মাথায়, সোহাগ তাদের তাড়াতে চেষ্টা করল, 'টাকা আমরা কেউ মারব না...'

—'তবে ছাড় দিকিনি।'

—'দোব, দোব, হাতে এলেই দোব।' পারুল ঠোঁট বেঁকাল, 'তোমার মত তো আমাদের মিষ্টির দোকান নেই ভাই।'

পুরনো খোঁচা। রূপবান গায়ে মাখল না। সকাল থেকে সে শুধুই হিসেবের নেশায় মশগুল। প্রথমেই ডুমুরের জন্য সিল্কের শাড়ি কিনতে হবে একটা। তারপর আর যা চাই। এখন তো মাত্র চৈত্রটুকু পার হওয়ারই অপেক্ষা।

গাঁয়ের উৎসাহী লোকজন এসে গেছে পুকুরপাড়ে। সত্যবান ছুটল হরিজ্যাঠাকে ডাকতে। হারান সর্দার, বৃন্দাবন আর হরিসাধন এই তিনজন আজ জলযজ্ঞের প্রধান

তিন সাক্ষী। আগে কযেক বাড়িতে জল ছেঁচার কাজে দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে। সুবোধ দাস তো এখনও পড়ে আছে গঞ্জের হাসপাতালে। পুলিস কেস হয়ে গেছে ভাইয়ের নামে। নবীনপুকুরে লাশও পড়েছে তিনটে পরিবারের। শেষে পার্টির লোক ফয়সালা ফরমান জারি করে গেছে, যার ঘরে পুকুর ছেঁচা হক না কেন, কম করে গাঁয়ের তিনটি মাথাকে সাক্ষী রাখতে হবে। ভাগবাঁটোয়ারার সময় আর যেন না লড়াই বাধে। তবে সাক্ষ্য তো আর কেউ শুধু মুখে দেবে না। তার ব্যবস্থাও করতে হয় পুকুর মালিকদের। সাক্ষী পিছু পাঁচটাকা ধার্য হয়ে আছে। মাছ ভাল উঠলে পার্টির কমিশন আলাদা। ভোর থেকে সজনেতলায় শরীর গুটিয়ে নীরবে বসে আছে পদ্মবুড়ি। তার দিকে ফিরে দেখছে না কেউই। কচিকাঁচারা তার গায়ের ওপর দিয়েই ছুটছে, নাচছে। কেউ যেন একবার মাড়িয়েও গেল। আশ্চর্য! তবু বাক্যি নেই বুড়ির ঠোঁটে। বকবকে বুড়ি অদ্ভুত রকমের শান্ত আজ। জুলজুল চোখে শুধু তাকিয়ে আছে টিলটিলে পুকুরটার দিকে।

প্রথম গ্রীষ্মের নবীন তাপ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। চৈত্রের দামাল ধুলো উড়ছে যেমন তেমন। বড় নিঃশব্দে ঘন হচ্ছে রোদ। শেষে আরও বেলায়, সকলে যখন অধৈর্যপ্রায় তখন এল মেশিন। চোঙা প্যান্ট পরা, টেরিবাগানো মেশিন চালক এসেই জায়গামত বসিয়ে দিল পাম্পসেট, জেনারেটার। যান্ত্রিকভাবে তাকাল সবার দিকে, 'জল ক ভাগ হবে?'

—'মোট তিন ভাগ। প্রথম ঘণ্টা জল যাবে বড়র জমিতে, দ্বিতীয় ঘণ্টা মেজর, বাকিটা...'

—'তা কি করে হয়?' রূপবান আপত্তি জানাল, 'তিন ঘণ্টা পাম্প চললে বেশি সময় আমার জমিতে দিতে হবে।'

বিজ্ঞ মেশিনচালক ঘাড় ঝাঁকালো। জলভাগ নিয়েই যে প্রথম বিবাদের সূচনা হয়, তা সে হামেশাই দেখেছে।

—'তিন ঘণ্টার বেশিও চলতে পারে পাম্প। যেমন জল থাকবে।'

'ঠিক আছে। তবে না হয় শেষের ভাগটাই আমার।'

—'তা কেন?' সোহাগবালার ঘাড় শক্ত হল, 'ঠাক্‌মাকে সে যদি আর নাই রাখে'...

—'রাখব কি না এখন তার বিচার হবে কেন?'

'আরে বাবা থামো দিকি তোমরা।' সাক্ষীদের মধ্যস্থতায় দ্বিতীয় দফার ঝগড়া শুরুতে থামল, 'ঠাক্‌মাকে নিয়ে পরে নিকেশ কোরো বসে।'

পারুল, সত্যবান, কোনদিনই পদ্মবুড়ির দায়িত্ব নিতে চায় না। তারাও আগ্রহ দেখাল না বিশেষ, 'মেশিন চালু করে দাও হে। বেলা যায়।'

ভটভট্ মেশিন ডাকতে শুরু করেছে। জল উঠে আসছে বানের স্রোতের মত। পাইপ থেকে ছিটকে যাচ্ছে সোহাগবালার জমিতে। ভিজে উঠছে মাটির শরীর।

জল কিছুটা নামতে ইয়া বড় এক খ্যাপলা জাল পড়ল পুকুরে। মাকালতলার ইয়াসিন জেলে চার চারটে লোক জাল নিয়ে জলে নেমেছে। তাদের দিতে হবে মোট চার দশ চল্লিশ টাকা। হেঁইও হেঁইও, এবার জাল গোটাচ্ছে জেলেরা। পাড়ে উঠল। কাঁটা আগেই টাঙিয়ে রেখেছিল ইয়াসিন। খোল, শামুক, ঝাঁঝি আর কচুরিপানা বেছে ফেলে মাছ চড়ল পাল্লায়। মাঝারি কাতল দু কিলো। কুড়ি টাকা করে মোট দাম চল্লিশ। কালবোস দেড় কিলো, খলসে এক কিলো আড়াই শো, সিলভার কাপ এক কিলো তিনশ, শোল সাড়ে আটশ গ্রাম, প্রথম দফায় মাছ উঠল একশ তিপ্পান্ন টাকার।

—'প্রথম ঝাঁকে মাছ কমই ওঠে হে। জল বেশি...'

—'তা বলে এত কম ?' রূপবানের অবিশ্বাসী চোখ দাঁড়িপাল্লা ঘুরে জলের দিকে স্থির।

দ্বিতীয় দফায় বড় মাছ তিনশ বারো টাকার। এবার একটু বেশি। জল ক্রমশ কমছে। পাইপের মুখ শক্তিমানের জমি ঘুরে সত্যবানের খেতে। মাছ দেখতে হুড়মুড়িয়ে ভিড় করেছে বাচ্চারা। রূপবান খেঁকিয়ে উঠল, 'এখানে এখন গোল করিস না তো। ভাগ্ সব, সরে যা।'

পুরুষরা উবু হয়ে বসল পুকুরপাড়ে। সোহাগবালা পারুলদের দৃষ্টি ঝুলন্ত কাঁটার দিকে পলকহীন।

—'এ খেপে আরও যেন মাছ ওঠার কথা ছিল ?'

—'যেমন আছে তেমনই তো উঠবে বাপু।' তৃতীয় দফায় চুনোজালে মৌরলা দুকিলো একশ, চুনোপুঁটি দেড়কিলো, কই-তেলাপিয়া তিন কিলো চারশ, ছোট ট্যাংরা এক কিলো ছ'শ।...

পাইপ ঘুরেছে রূপবানের ক্ষেতে। জলের টানে ছিটকে আসছে কিছু বেওয়ারিশ কুঁচো চিংড়ি। তিড়িং বিড়িং লাফ কাটছে ভেজা মাটিতে। কুঁচোকাঁচার দল দৌড়ল সেদিকে।

চতুর্থ দফায় জালে কটা মাত্র মাছ। বাকি শুধু কাদা শামুক, জলঝোপ, ঝিনুকের খোল। কী কাণ্ড, অত মাছ তবে গেল কোথায় ? কম করেও যে দুহাজার টাকা...

ইয়াসিন দাঁত বার করে হাসছে, 'সব পুকুরেই এক দশা গো। কার মাছ কে খেয়েছে ঠিক কি তার ?'

কথা নয়, যেন ফুটন্ত তেলে জলের ছিটে। যেন এই বাক্যটুকুরই অপেক্ষায় ছিল হতাশ মুখগুলো। সোহাগবালা ডুকরে উঠল, 'এমন হবে আমি জানতুম গো...ওগো, এ কী সব্বোনাশ হল গো-ও-ও...

পারুল চিল চিৎকার জুড়ল, 'চোর চোর, চোরের ব্যাটা চোর..

রূপবান গর্জে উঠল, 'কাউকে ছাড়ব না শালা। সব জানি কারা মাছ তুলেছে। জানতে বাকি নেই।'

হিংস্র চোখ জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে পরস্পরের দিকে। পড়শিরা একে একে সরে পড়তে লাগল। রূপবান কখন কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ! তবে গাজনপুরের কে কোন্ রাতে কার পুকুরে জাল ফেলেছে তার দলিল কোথাও নেই। সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া ধরা যায় না কাউকেই। পদ্মবুড়ির নাতি নাতবৌ আর কচিকাঁচা বাদে পুকুর ধারে আছে আর মাত্র তিনজন। তিন সাক্ষী। জোট বেঁধে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তারা। কথার লড়াই মারপিটে পৌঁছলে তবে নাক গলাবে। এইরকম নিয়ম। পুকুরের জল একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। আঁশটে গন্ধে ঝমঝম চতুর্দিক। মেশিনচালক পাততাড়ি গোটাচ্ছে। ইয়াসিন ঝটপট মাছ ভরতে লাগল ঝুড়িতে, 'নাও গো, কাঁদাকাটি পরে হবে, হিসেবটা বুঝে নাও।'

রূপবান গটগট এগিয়ে এল, 'যা টাকা হবে সব আমি নেব শালা। কাউকে এক পয়সা দেব না।'

—'কেন মানিক ? মগের মুলুক পেয়েছ নাকি ?'

—'মুলুক-ফুলুক বুঝি না। যারা শালা মাছ ঝেঁপেছে তাদের এক পয়সাও ভাগ নেই।'

—'তবে তো তুইই আগে বাদ যাস্ রে হারামজাদা। নিত্যদিন অন্ধকার

থাকতে...আমরা কিছু দেখিনি ভেবেছিস ?'

—'দেখলেই হল ? প্রমাণ কি ?'

—'প্রমাণ লাগে না রে শালা। কোন্ মেয়েছেলের গভ্‌ভে সব ঢেলে আসিস...'

—'বাজে কথা বললে মুখ ছিঁড়ে নেব।'

—'নে না দেখি।' সত্যবান ব্যাঙের মত দু ধাপ লাফাল।

—'মাছ যদি ঘরের কেউ চুরি করে থাকে তো সে হল তুই আর ওই নেতাই-এর মা...'

—'ইঁইঁইঁহ্' সোহাগবালার মুখ ভেঙে-চুরে গেল, 'আমার নাম মোটে নেবেনি বলে দিলুম। খপরদার।'

—'ক্যান রে ? তুই কোন মহাজনের বিটি ?' পারুলের চোখ দপ্‌দপ্ জ্বলছে, 'হাতে নাতে পাঁচবার আমি ধরেছি তোকে...'

—'সে তো তুইও কতবার ধরা পড়েছিস। জলে নামার নামে চুপড়ি ফেলে...'

—'আহাহা, চোরের মায়ের বড় গলা রে...'

—'আরে থাম্।'

নিদাঘবেলার সূর্য যত প্রকট হয়, বিবাদ উঁচুতে ওঠে। উঠতেই থাকে। ফাঁকা পুকুরের ঘোলা জলে ছটফট করে পাঁকাল মাছের দল। ছোটরা উদোম দেহে ঝাঁপ দেয় সেই জলে। পিছলে পিছলে মাছ ধরতে যায়। মাগুর, শিঙি, চ্যাং, চিংড়ি। সজনেতলা থেকে লোলচর্ম বুড়িটা তাই দেখে বসে বসে। পেটে তার বড় চনচন ক্ষিধে। বুঝতে পারে এ ক্ষিধে আজও মিটল না। বাবলাডালে ভর দিয়ে জীর্ণ শরীর উঠে দাঁড়ায়। পৌঁছে যায় বুড়ো শিরীষ গাছের কাছে। খাঁ খাঁ ধানভূমির দিকে তাকিয়ে ক্ষুধার্ত ঠোঁটদুটো নড়েচড়ে, 'ওরে ভাত বড় মিঠে রেএএএ...মাছে বড় সোয়াদ'—বলতে বলতে ঘন ঘন ঢোক গেলে। কান্নার দমকে চামড়া ঢাকা হাড়ের খাঁচাটা ধুপধুপ কাঁপে। ছাইরঙ চোখ আকাশে তুলে জোরে জোরে শ্বাস টানে। চৈত্রশেষে আবার নতুন কোন গন্ধ পায় কি গাজনপুরের পদ্মবুড়ি ! ভাত বা মাছের ! জল বা মাটির ! বা আকাশের ! কে জানে !
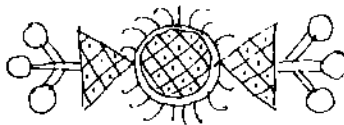
বরফপড়া দিনগুলোয় ।। নলিনী বেরা

এবছর ডিসেম্বরের গোড়ায় এদেশে খুব বরফ পড়ল। তার সঙ্গে হাঁড়-কাঁপুনে শীত।

মেদিনীপুরের মাঠে মাঠে ধানকাটা শুরু হয়েছিল, থেমে গেল। আর কাটা যাচ্ছে না, ধানের শীষে দা-এর বাঁটে বরফ জমে যাচ্ছে। গত দুদিন যারা ধান কাটতে মাঠে নেমেছিল—কাদুবার মা, কামারবুড়ি, সামাই সাঁওতাল, বিপ্রপদ– বরফে জমে গিয়ে তারা সব স্ট্যাচু। সঙ্গে সামাই সাঁওতালের একটা কুকুর ছিল, জল খাবার একটা এনামেলের ঘটি ছিল, মাথায় পাগড়ি বাঁধার লাল ডুরে একটা গামছা ছিল। নেই। সব বরফ। ধানের আঁটি বোঝাই গরুর গাড়িটা মাঝরাস্তায় আটকে আছে। বলদজোড়ার খুরে গায়ে-গতরে চাঁই চাঁই বরফ। ল্যাজুড় মুচড়ে অনেক ঠেলা মেরেও গরু দুটোকে নড়ানো গেল না। ডানদিকের গরুটা তার একটা পা একটু শূন্যে তুলেছিল—সেই পা-তোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেল। শীতকালটায় শুঁটকিমাছের রমরমা বিক্রি। বেগুন পোড়ায় শুঁটকি গুঁজে এদেশের মানুষ খুব খায়। মনা বিশুইয়ের মা মাথায় শুঁটকিমাছের ঝুড়িসুদ্ধ থ। চিংড়ি, বাঁশপতরি, খলসা শুকামাছগুলোয় ধুলধুল বরফ জমে গেল। লোকে শুঁটকি কিনবে না বরফ কিনবে। দাড়ি চাঁছতে বসেছিল মনোহর পরামানিক। দাড়ি ভিজানোর উদ্দেশ্যে জলের বাটিতে হাতমুঠ চুবিয়েছে আর জমে গেল! মানুষ তো মানুষ, চারধারের বাঁশ কুসুম চল্লা চাঁপার গাছগুলোও বরফ জমে হয়ে উঠল বরফের পাহাড়। কাক, চড়ুই, শালিক—আসন্ন সন্ধ্যার পূর্বাহ্ণে চির-চার কিচির-মিচির কলরব করতে করতে বাসায় ফিরছিল। নিদারুণ শৈত্যে জমাট বেঁধে আকাশেই ঝুলে থাকল।

৭ তারিখ বুধবার ভোরে হু-হু হাওয়া দিল। সারারাত অবিশ্রান্ত বরফ বর্ষণে রাস্তাঘাট বরফচাপা। ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে।

গায়ের কাপড়টা কানে-মাথায় আরেকটু জড়িয়ে সুরথের মা বলল—সাবধানে যাস, সুরথ।

ভাঁড়টার গায়ে জমে থাকা বরফ কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছিল সুরথ। খুঁচিয়ে বরফ সরিয়ে ভাঁড়ের মুখটায় শালপাতা মুড়ে শণের দড়ি বাঁধতে বাঁধতে সুরথ বলল—এই কি প্রথম যাচ্ছি মা? কতবার গেলাম-এলাম!

—তা হোক, তবু।

—কি?

–চারধারে বরফ পড়ছে, না পাহাড় না পর্বত শুকনো ডাঙায় বরফ—বাপের জন্মে এমন কখনো শুনিনি বাছা, আর কী শীত! সুধন্যকে বলিস সুরথ, বউমাকে সঙ্গে নিয়ে কাজের দিনতিনেক আগে ভালোয় ভালোয় চলে আসতে।

নিচু হয়ে দড়ি বাঁধতে বাঁধতে সুরথ বলল—সে তোমার শিক্ষিত চাকুরিয়া ছেলের ব্যাপার মা। পর তো নয় আপন কাকা বলে কথা। টেলিগ্রাম গেছে, আমি আর অধিকন্তু কী বলব!

—সেই তোর বাঁকা বাঁকা কথা সুরথ। গোঁয়ারতুমি ছাড়।

ভাঁড়ের মুখ বাঁধা সেরে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে সুরথ বলল—আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তোমার ছেলে আর তার মেমবউকে অনুনয়-বিনয় করে বলব—কাজঘরে আসতে আজ্ঞা হোক—হল তো ? বলেই দুহাতের বরফ ঝেড়ে ভাঁড়হাতে বেরিয়ে পড়ল।

গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে বড়রাস্তায় যেতে গিয়ে দেখল—কে যেন সরে যাচ্ছে সাঁত করে। থান পরা। কে আবার—সদ্য বিধবা হওয়া সুরথের সেজোকাকি। সেজোকাকি এতক্ষণ গোয়ালঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে হাওয়ায় উড়ে আসা বরফের কুচি সরাচ্ছিল। এই পোশাকে সুরথের সামনে দাঁড়াতে লজ্জা—তাই সরে গেল, সরে গেল।

ভোর হচ্ছিল—যেমন হয়। পুবদিকের বাঁশঝাঁড়, কুসুম গাছের মাথা বরফে বরফ। তুলোর পেঁজার মতো পুঞ্জ পুঞ্জ, সাদা। আরেকটু বাদেই বরফ ফুঁড়ে পাখিরাও ঠোঁট ফাঁক করে কূজন করবে—যেমন প্রতিদিন করে। নাবালকের হাতে আঁকা ছবির মতো সূর্যও উঠবে—যেমন রোজদিন ওঠে আর কি। বরফচাপা ঘাস পাতা একটু-একটু করে খাড়া হয়ে তাদের পুরোনো অবস্থা ফিরে পাবে। সবকিছুই ঠিকঠাক হবে, চলবে সেই আগের মতো। মাঝখান থেকে কেন যে শুধু শুধু মরে গেল সেজোকাকা!

—চললে সুরথ ?

রাস্তায় শ্রীনিবাসজেঠুর সঙ্গে দেখা।

—হুঁ, না গিয়ে আর উপায় কি জেঠাবাবু ?

—সেই তো! তুমি না গেলে আর কেই-বা যাবে, সুধন্যটাও বাইরে। কিন্তু—

—কি ?

—নদীর জল যে বরফ হয়ে গেছে বাবা, যেতে পারবে ?

—চেষ্টা করে তো দেখি।

নদীর পাড়ে এসে সুরথের মনে হল—চেষ্টা করা বৃথা। যেদিকে তাকায় শুধু বরফ আর বরফ। মেদিনীপুরের এদিকটায় ডাঙা-ডুঙোর বলে সবাই জানে। মাঠঘাট বুগড়ি আর মাকড়া পাথরে ভরা। ফসল হয় না। লাঙলের ফলা ডোবাতে একহাত জিভ বেরিয়ে যায় তাগড়াই বলদের। এমন উদমা নিস্ফলা উদার ডাঙায় এত বরফ পড়ল কোত্থেকে! তার উপর হু-হু হাওয়া। শিরশির করে উঠছে গা-গতর। নদীর বুকে কুঁড়োবক, শামখোল—সব এখন পাথরের মূর্তি। স্তব্ধ। চরাচর স্তব্ধ। নদী বালিতে আকন্দ ফুলের গাছগুলো সব বরফচাপা। বিরি-বেগুনের কাঁটায় ভরা গাছগুলো সব উধাও। নিশ্চিহ্ন।

দড়িবাঁধা মাটির ভাঁড়টাকে হাতউঁচু করে দেখল সুরথ। এর মধ্যেই ভাঁড়টার গায়ে বরফ জমতে শুরু করেছে। হাতের লোমেও ধুলধুল বরফ। মাটির ভাঁড়টাকে দেখছিল সুরথ—নিরীহ, গোবেচারা, নির্দোষ ভাঁড় একটা। সোনারও নয়, রুপোরও নয়। স্রেফ কুমোরের হাতেগড়া মাটির ভাঁড়। তার ভিতর একটা জিনিস আছে। জিনিসটা তার খুব কাছের মানুষের। খুব প্রিয়জনের। আর তার জন্য সুরথের আজ বিদেশ যাত্রা। কখনো খুব দূরদেশে যায়নি সুরথ। আজও যাচ্ছে না, সে যাচ্ছে বড়জোর হাওড়া-ইস্টিশান পেরিয়ে গঙ্গার ঘাট অবদি। তারপর বাহান্ন কি আঠান্ন নম্বর বাস ধরে কাসুন্দিয়া শিবতলা, হাওড়া। মেজদার বাড়ি। খবর আছে।

ভাঁড়টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুরথ আচমকা একটা ডায়লগ দিল—'বল, বলরে পিতার অস্থি দিয়ে গড়া মোর রক্তপাশা বল—'

বলেই বরফের ভিতর দিয়ে হুড়মুড় করে নদীতে নেমে এল সুরথ।

নদী পেরিয়ে খুন্দুপাড়ের চরে উঠে একজনের সঙ্গে দেখা। তার সর্বাঙ্গে বরফের আস্তরণ গলার স্বরটাও ভাঙা। সুরথেরও তদ্রূপ অবস্থা। তারও সারা গায়ে বরফের পলেস্তরা। সুরথ হাত লাগিয়ে আগন্তুকের সারা দেহের চাগড়া চাগড়া বরফগুলো ছাড়াতে লাগল। লোকটাও নখ দিয়ে সুরথের গায়ের বরফ খুলে নিচ্ছিল।

পরিশেষে লোকটাকে চিনতে পারে। —আরে আমাদের মনোরঞ্জন নয়?

—আর বলিস না সুরথ? কী বরফ কী বরফ। কাল রাতে বাস থেকে নেমে আর হাঁটিতে পারি না, এক পা এগোই বরফের চাঙড় পায়ের উপর এসে জমে যায়। কী আর করি—এক-পা তুলে একজায়গায় স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। সারারাত।

বলেই হাসতে লাগল মনোরঞ্জন।

হাসত হাসতে সুরথও জিগ্যেস করে বাস তা হলে চলছে?

চলছে বই কী। তবে খুব কম। কোথাও যাচ্ছ নাকি সুরথ?

হুঁ, গঙ্গায়।

—ও হো, তোমার সেই কাকার ব্যাপারটা? কিন্তু···

—কি?

—শুকনো ডাঙায় কোত্থেকে যে এত বরফ পড়ল। ঝরাপাতার মতো উড়ে উড়ে এসে চুল-মাথায় জড়িয়ে গেল। আর কী শীত। আর কী হু-হু হাওয়া। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চুল থেকে গা থেকে বরফের কুচি ঝাড়তে ঝাড়তে মনোরঞ্জন এগিয়ে গেল। কে জানে কখন আবার কী ভঙ্গিমায় কোথায় তাকে দাঁড়াতে হবে।

বাস স্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছে সুরথ দেখল—দু চারজন বরফঢাকা মানুষ 'লক্ষ্মী জনার্দন' বাসটার কাছে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে। একজন আরেকজনের সঙ্গে দেখা হলেই শিরদাঁড়া সামান্য বেঁকিয়ে হাত কচলে বলছে—আঃ কী শীত। উঃ কী শীত। মরে গেলাম, জমে গেলাম। বাসের হেলপার ছোকরাটি তেলচিটে ন্যাকড়ায় মুহুর্মুহু হাত ঘষছে। মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের কাছে উঠে গিয়ে বাজাচ্ছে হর্ন। ড্রাইভার কন্ডাক্টর চায়ের দোকানে কেটলি বসানো উনুনের পাশটায় দু-হাতের চেটো মেলে ধরে পোহাচ্ছে তাপ। একটা কুকুরের লেজের ডগায় সামান্য বরফ জমেছিল সে তার ঘাড় বেঁকিয়ে পিঠের উপর দিয়ে মুখ নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলল। চায়ের দোকানের মালিক পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বলছে—এ কী দেখছ বরফপড়া, কলকাতা-হাওড়ায় এর দশগুণ বেশি পড়ছে।

শুনল সুরথ। তার মাটির ভাঁড়টায় বরফ জমেছিল আবার। একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাসে ওঠার আগেই বেশটি করে ঝেড়ে নিল। কে জানে বরফসুদ্ধ মাটির ভাঁড়টাকে বাসে তুলতে দেবে কিনা বাস কন্ডাক্টর। ভাঁড়টা হাতে নিয়ে সে মনে মনে পুনরায় বলল—'বল, বলরে বক্তপাশা—'

তারপর বাসের সিটে বসে নির্ধুমসে ঘুমিয়ে গেল।

দুই

আর তারপর ঘুম ভেঙে ট্রেনের কামরায় উঠে শালপাতায় মোড়া মাটির ভাঁড়টাকে বসবার সিটের নিচে যত্ন করে রেখে দিল সুরথ।

হ্যাঁ, ওর নাম সুরথ। তার মাটির ভাঁড়ে একটা জিনিস আছে। জিনিসটা তার খুব কাছের মানুষের। একান্ত প্রিয়জনের। জুলুজুলু চোখে চারপাশটা দেখে নিচ্ছিল

সুরথ। জংশন ইস্টিশান। খড়গপুর খড়গপুর। কোথাও একটানা জলপড়া আর ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস আওয়াজ। আর শুধু বরফ। কালিঝুলিমাখা গাছগাছালির মাথায় সাদাসাদা বরফ। তার ভিতরও ঠোঁট বের করা, ডানা-উঁচানো কয়েকটা উল্লসিত পাখপাখালি—কাক, চড়ুই, শালিক।

হাতের তালু ঘষে ঘষে দেহে-মনে উত্তাপ আনছিল সুরথ। জানলার ধারেই সে বসেছিল। কামরায় যাত্রী বিশেষ নেই। প্লাটফর্মের উপর মাফলার জড়ানো মাঙ্কিক্যাপপরা দু-চারজন লোক বড় দ্রুতগতিতে হাঁটছিল। কেউ কেউ ছুটে এসে জানলার ধারে বসা সুরথকেই ধরেবেঁধে জিগ্যেস করে বসে—ট্রেন আজ আবার ছাড়বে তো! মহাফাঁপরে পড়ে সুরথ। উলটে তাকেই আবার জানতে চায়—কেন? ছাড়বে না কেন? লোকটা বলতে বলতে যায়—নাটবল্টু ঢিলে হয়ে গেছে ট্রেনটাব। দেখছেন না—চারধারে এত বরফ পড়ছে?

—ও বরফ। বলেই অন্যমনস্ক সুরথ জানলা টপকে প্লাটফর্মের উপর মিষ্টির দোকানটার দিকে চোখ রেখে বসে থাকল। লবঙ্গলতিকা, বালুসাই, লাড্ডু, সিঙাড়া, প্যাটিস—সব থাক থাক। খদ্দের নেই। মিষ্টিগুলোর উপর পরতের পর পরত বরফ জমছিল। দাম দিয়ে কে আবার বরফ খাবে! একটা যা কুকুর কাচের শো-কেসের উপর জিভ বুলোচ্ছিল। দোকানিটা ঘুরে এসে তার পেটেই একটা লাথি মারল—কুকুরটা ছিটকে উঠে শেডের বাইরে পড়ে জমাট বেঁধে এক লহমায় হয়ে গেল বরফ—

ট্রেন ছেড়ে দিল।

ঘাড় নিচু করে সিটের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে ভাঁড়টা নিয়ে এল সুরথ। কোলের উপর রেখে হাতে ধরে বসল। মুখে বাঁধা শালপাতার উপর হাত বোলাল ধীরে ধীরে। মনে মনে আবার ডায়লগ—'বল, বলরে পিতার অস্থি দিয়ে গড়া মোর রক্তপাশা—'

বরফের ভিতর দিয়েও ট্রেনটা ছুটছিল বেশ। ট্রেন চললে ট্রেনলাইনের দুধারের গাছপালাকেও মনে হবে ছুটন্ত—বিজ্ঞানের বইয়ে এরকমই উল্লেখ আছে। কিন্তু আজ রেললাইনের দুধারে গাছপালা-ই নেই—সব তো বরফ, বরফের চাঁই, বরফের স্থির মেঘ। তার ফলে সুরথের মনে হচ্ছিল—ট্রেনটাই, দুরন্ত গতিতে ট্রেনটাই ছুটে চলছিল। অথচ দুধারে কত রকম গাছ ছিল, কত প্রকার ধানখেত ছিল। মাঠ ছিল, মাঠে গরু চরে বেড়াত, ছাগল চরত। দুধারে গভীর নয়ানজুলি ছিল—তাতে নলখাগড়ার দঁক ছিল, সে-দঁকে পানিফল জন্মাত। মাছের চাষ হত, ঝুলি-জাল পেতে মাছ ধরত, শাকপাতা তুলত। যত্রতত্র শরগাছ—তাতে মাছরাঙা বসে থাকত। শুধু ট্রেনটাই ছুটছে, আর দুধারের কোনোকিছুই ছুটছে না। কোথাও কোথাও শুধু যা দুটো-একটা কুকুর—তাও শরীর নয়, শুধু মুখটুকু কি লেজটুকু। ইস্টিশান পেরিয়ে টিকিটঘরের গলিঘুঁজি দিয়ে চায়ের স্টলটাকে বাঁয়ে কি ডাইনে রেখে খেতি-খামারের দিকে নেমে যাচ্ছিল, কিংবা প্রাত্যহিক বরাদ্দ একটা ল্যাড়ো বিস্কুটের আশায় আশায় সুঁই সুঁই করে উঠে আসছিল যে কুকুরটা—তার লেজ কিংবা মুখটুকুই দেখা যাচ্ছিল। বাকি সব বরফচাপা।

ঘোড়াঘাটা, আবাদা পেরিয়ে গেল।

এত বরফের ভিতর দিয়েও একটা ঘুঙুরের আওয়াজ—তাই ঘুনাঘুন—ক্রমশ এগিয়ে আসছে দেখে বেশ রোমাঞ্চ বোধ করল সুরথ। একটা অন্ধ, বুড়োলোক—'গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা দুইধারে দুই জলের ধারা মেঘনা-যমুনা'—গাইতে গাইতে একটা মেয়ের হাত ধরে এগিয়ে এল। ঘুঙুরের ফুটোয় বরফের কুচি জমে যাচ্ছিল, মেয়েটি তৎক্ষণাৎ নিচু হয়ে একা সন্না দিয়ে মাঝে মাঝেই বরফের কুচি তুলে ফেলছিল—

ঘুঙুর থেমে গেলে তারা খাবে কি ? লোকটির বিচিত্র ড্রেস। জাতে মুসলমান হলেও আজ তার মুসলমানী লুঙি নেই, কাছা মেরে ধুতি পরেছে সে। তেলচিটে ধুতি—কে জানে কার সঙ্গে বদলা-বদলি করে নিয়েছে সে! হিন্ডোলিয়ামের বাটিতে আজ আর তেমন পয়সা জমেনি। ট্রেনে তেমন লোক নেই—ভিক্ষা দেবে কে ? চেনালোক বলে সুরথ একটা আটআনি দিল। মেয়েটি ফ্রকের ঘাঘরায় ঘষে ঘষে দেখল—না, সচল আটআনিই বটে।

ট্রেনটি পুরোপুরি আটকে গেল রাজারামতলা ইস্টিশানে।

আর যেতে পারছে না। সামনে বোধহয় বরফ জমেছে খুব। যে কজন যাত্রী এখনো অবশিষ্ট আছে তারা ট্রেনের জানলায় সামনের দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখল—না, কোনো আশাই নেই! এই যে থামল এখন কতদিন থেমে থাকে দ্যাখো! সুরথ পড়ল মুশকিলে—গঙ্গা এখনো অনেকটা দূর। তবে রাজারামতলা ইস্টিশান থেকে হেঁটে কিংবা রিকশায় মেজদা সুধন্যর বাড়ি খুব দূরে নয়। ট্রেন না গেলে অগত্যা দাদার বাড়ি-ই যেতে হবে। সে তো সুরথ যেতই, তবে আগে নয় পরে।

নামতেই হল। সন্ধেও নেমে গেল। এখনই না নামলে আর কিছুক্ষণ বাদে কামরায় দরজায় বরফ জমে স্তূপাকার হয়ে যাবে—তখন বরফ কেটে বের হওয়াই মুশকিল। রাজারামতলা ইস্টিশান থেকে ডানদিকে গাড়ুহাতে নেমে গিয়ে সুরথ দেখল—সার সার রিকশা চেইন দিয়ে বাঁধা। বরফপড়ার ভয়ে যে যার রিকশা জমা করে কেটে পড়েছে রিকশাঅলারা। আলো জ্বলছে বটে, তবে খুব ম্লান। চারধারে বরফের ধোঁয়া, আর ধোঁয়াশা। আচ্ছা, এরকম পরিস্থিতিতে রাজারামতলার বানরগুলো এখন কী করছে ? নিশ্চয় তাদের লাঙুলেও খুব জমে আছে বরফ। বিরক্তিতে দাঁতমুখ খিঁচোচ্ছে বাঁদরগুলো। এ রাস্তায় আগেও হেঁটেছে সুরথ, অন্যমনস্ক হাঁটছিল সে।

আচমকা থথিয়ে গেল, একেবারে থ!

মোড়ে মোড়ে বন্দুক হাতে এ-কারা দাঁড়িয়ে আছে ? রাস্তার কুকুরগুলোও লেজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না আর—ঠাণ্ডায় বরফে কোথায় জমে যাবে তার নেই ঠিক। হয়তো রিকশার তলায় পানগুমটির তলায় গুম মেরে লেজ গুটিয়ে শুয়ে আছে চুপ। যে দুটো-একটা ভুলবশত গলির মুখে এসে পড়েছিল—বন্দুক হাতে বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকা ফৌজীলোকগুলোকে আচমকা দেখতে পেয়ে মনে করেছিল ডেকেও উঠবে ঘেউ ঘেউ, চেষ্টাও করেছিল—কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বর-ই বেরুল না। হাঁ করেছিল একবার—সেই ফাঁকে কখন বরফের কুচি ঢুকে গলা বুজিয়ে দিল!

—হল্ট—

বলামাত্র চলমান লোকগুলো দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল। দেখাদেখি সুরথও তার ভাঁড়সুদ্ধ হাতদুটো তুলেছিল উপরে—কিন্তু অতর্কিতে ভয়ে আকস্মিকতায় হতচকিত সে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার কাঁপা কাঁপা হাত থেকে অত যত্নে এতদূর বয়ে নিয়ে আসা মাটির ভাঁড়টা হাত ফসকে পড়ে কোথায় গড়িয়ে গেল! হাত তোলাই ছিল, নামাবার কোনো উপায় ছিল না।

তিন

দরজা খুলে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল সুধন্য। বরফে বরফে একেবারে সাদা, পাংশুটে। মুখ দেখে চিনবার উপায় নেই।

—কে ?

—আমি মেজদা, আমি সুরথ—

ঝটপট শরীরে লেগে থাকা বরফের চাগড়াগুলো ঝেড়েঝুড়ে সুধন্য হ্যাৎ করে গোঁয়ার-গোবিন্দ ছোটভাইকে ঘরের ভিতর টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিল মুহূর্তে।

বলল—তুই ? চারধারে প্রচণ্ড বরফ পড়ছে, রাস্তায় একটা জনপ্রাণীও নেই, বাস চলাচল বন্ধ—এর মধ্যে তুই এলি কি করে ? কিসের জন্য ?

—কেন টেলিগ্রাম পাওনি ? তখনো তাড়া-খাওয়া পাখির মতো দুরুদুরু বুক কাঁপছে সুরথের। সে-না হয় পেয়েছি, তা বলে তুই—

খানিকটা ধাতস্থ হল সুরথ। যাক—উড়ে আসতে গিয়ে টেলিগ্রাম তাহলে বরফে জমে গিয়ে মাঝপথে কোথাও আটকে যায়নি।

সুধন্যর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সুধন্যর বউও। এতক্ষণ দুজনে টিভি-র খবর শুনছিল—মুখস্থ করছিল কোথায় কোথায় বরফ পড়ল, বরফে জমে গেল কতজন মানুষ। ঘর-বাড়ি মন্দির-মসজিদ—সব একাকার। বরফ হাতড়ে হাতড়ে নিজের বাড়ির দরজা খুঁজতে হচ্ছে লোককে, ভুল করে মন্দিরের লোক ঢুকে পড়ছে মসজিদে, মসজিদের লোক ঢুকে আসছে মন্দিরে। চিনে ওঠার কোনো উপয় নেই—মন্দিরের চূড়া, মসজিদের টোম্ব, মিনার সব তো বরফে ঢাকা! সব তো একাকার।

তবু বাড়ি চিনে এসে পড়েছে সুরথ।

দাদা-বউদির পা ছুঁয়ে ঝকঝকে মেঝের উপর থুপ করে বসে হাপুস নয়নে হুড়হুড় কাঁদতে লাগল সে।

এ্যাই দ্যাক—কাঁদিস কেন পাগলা ?

কাঁদতে কাঁদতে সুরথ বলল—ভাঁড়টা ফেলে এলাম যে।

—কি ভাঁড় ? কিসের ভাঁড় ?

বাড়ি থেকে জাগর-প্রদীপের মতো সাবধানে এতদূর নিয়ে এসেছিল ভাঁড়টা, মাঝে মাঝে কাঠি দিয়ে জাগর-প্রদীপের সল্‌তে উসকে দেওয়ার মতো মনে মনে—'বল, বলরে পিতার অস্থি দিয়ে গড়া মোর রক্তপাশা'—বলে আওয়াজ দিয়ে আগলে রেখেছিল সুরথ—তা কিনা 'হল্‌ট' বলার ঔদ্ধত্যে হাত তুলতে গিয়ে হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেল নর্দমায়! কে জানে ভেঙে গেল কি না, কে জানে কুকুরে-বিড়ালে এতক্ষণে টানাটানি শুরু করল কি না—

সব খুলে বলল সুরথ, সব। জায়গাটার বিবরণ দিল দু-তিনবার। কে জানে হয়তো এখনো সেখানেই পড়ে আছে জিনিসটা—

সব শুনে সুধন্য ও সুধন্যর বউ আঁতকে উঠল। সুধন্যর বউ বলল—গেছে গেছে, ভাঁড়টা রাস্তায় দৈবাৎ পড়ে গিয়ে ভালোই হয়েছে। তার জন্য আফশোস করো না। এখানে নিয়ে এল কোথায় রাখতে ? একটা মরামানুষের হাড় ?

সুধন্য বলল—ছেড়ে দে, না হয় গঙ্গায় না ফেলে রাস্তায় ফেলেছিস—তাতে কি, মৃত মানুষের হাড় তো মৃতই—

চমকে উঠল সুরথ। এ কী বলছে তার মেজদাও! একেবারে ম্লেচ্ছ! আর কারো নয় স্বয়ং সেজোকাকার হাড—তাও বলছে কি না রাস্তায় ফেলে এসে ভালোই করেছিস সুরথ ? একবারও বলছে না—আচ্ছা, চ, দুভাইয়েতে একবার খুঁজে দেখে আসি ? না হয় রাস্তায় প্রচণ্ড বরফ পড়ছে, রাস্তার ধূলিকণা পর্যন্ত জমে গিয়ে বরফ, না হয় রাস্তায় বরফ-পুলিস বন্দুক হাতে টহল দিচ্ছে—কিন্তু এতদূর কষ্ট করে বরফ ভেঙে ভেঙে ভাঁড় হাতে সুরথ যে এসে পড়ল, তার বেলা ?

—ওই ওই, আবাব একবাব—

দাদা-বউদি দৌড়ুল টিভি-ব কাছে। কে যেন ববাভয দিযে বলছে—মেঘ কেটে গিযে বোদ ওঠাব মতো ববফপড়া একদিন থামবেই থাকবে। তবু এখন এই মুহূর্তে বাস্তায বাস্তায মযদানে পার্কেব বেঞ্চিতে যে ধুন্দুমাব ববফ পড়ছে—একথা অস্বীকাব কবাব কোনো উপায নেই। তাই একান্ত অনুবোধ কবছি—জীবনেব ঝুঁকি নিযে আপনাবা বাস্তায বেবোবেন না। আমবা বলছি দেখামাত্র গুলি কবতে—

সুধন্য বলল—শুনলি তো সুবথ?

চার

ঘুম আসছিল না সুবথেব।

দাদা-বউদি বোধ কবি ঘুমিযে পড়ল। শোবাব ঘব থেকে দুজনেব চাপা গুঞ্জন সে এতক্ষণ শুনছিল। —যাক বাবা, বাম-বাঁচা বাঁচিযে দিযেছে সুবথ, হাড়টাকে ঘবেব ভিতব না এনে ভালোই কবেছে সে। নতুন বাড়ি, এই তো মোটে কবছব হল—এব মধ্যেই একটা অশুভ জিনিস ভিটেব ভিতব ঢুকে পড়লে কী যে অমঙ্গল হত বলা যায না—আহা, ভিতবে কেন—দড়িবাঁধা ভাঁড়টাকে সুবথ না হয বাইবেই ঝুলিযে বাখত স্থলপদ্ম গাছটাব ডালে। —হুঁ, কী কথাব ছিবি। স্থলপদ্মেব গাছটা ভিটেমাটিব বাইবে না কি? —তাও বটে, তবে না হয ভাঁড়টাকে সে গচ্ছিত বেখে আসত দূবে অন্যেব ভিটেয। —আ-হা তাই তো বেখে এল—বাজাবামতলাব বাস্তা কি আব আমাদেব ভিটে? দুজনেই হাসল, হাসতে হাসতে একজন বলল—সুবথটা সেই বকমই গোঁযাব একগুঁযে নাবালক থেকে গেল, মানুষ হল না—

মানুষ—

আচ্ছা দাদা, তোব কি এখনো মনে পড়ে—সেজোকাকাব সঙ্গে বুড়বুড়ি ঝবনাব ধাবে সেই আমাদেব কুমাবডুবি জলাব ধানখেত থেকে মাথায কবে গাঁদা ফুল গোঁজা ধানগাছেব ঠাকুব নিযে আসাব কথা? তোব মনে পড়ে—সেজোকাকাব সঙ্গে চৈত্রেব শেষদিনে না খেযে সাবাদিন উপোস থেকে নদীতে আম-ভাসান দিতে যাবাব কথা? আম-ভাসান না দিযে আমাদেব খেতে নেই আম, অসমযে আম খেলে ঘবে সাপ বেবোয, লুকিযে তুই সেবাব আম ভাসানোব আগে আগেই খেযে ফেললি, আব ঘবে সাপ বেবোল, আব সাপে কাটল সেজোকাকাকে—তোব কী কান্নাবে দাদা! নাকি তোব পাপেই কাকাকে সাপে কাটল! মনে পড়ে, তোব মনে পড়ে? সেজোকাকাব কুলটিকুবীব হাট থেকে তোব জন্য জিওগ্রাফিব-ব বই আনাব কথা—

ঘুম আসছিল না সুবথেব।

এইমাত্র তাব চোখেব সামনে সদ্য থানপবা সেজোকাকি গোযালঘব থেকে সবে গেল ছাঁত কবে। দাঁড়াও, যেও না সেজোকাকি—বাজাবামতলাব বাস্তা, আব কতদূব, বড়জোব আমাদেব গাঁযেব বাড়ি থেকে কদমডাঙাব খুকড়া-লড়াইযেব মাঠ অবদি, একছুটে এই যাব আব আসব।—না না, ভযেব কিছু নেই, ভাঁড়টা অক্ষতই আছে সেজোকাকি—হাত ফসকে মাটিতে পড়বাব আগেই তো ববফে জমে গেল, ভাঙল কখন? মুখটায শালপাতা মুড়ে শক্ত দড়ি দিযে বাঁধা—উলটে গেলেও সেজোকাকা পড়বে না—

আব দেবি কবল না সুবথ। ধীবে ধীবে বিছানা ছেড়ে সন্তর্পণে সদব দবজাব খিলটা খুলে ফেলল। ববফেব গুঁড়ো জমে গিযেছিল খিলটায—এতটুকু আওযাজ হল

না। বাইবে শাদাশুভ্র পৃথিবী—এত সাদা যে বাতটাকেও মনে হচ্ছিল দিন। প্রচণ্ড ববফ পড়ছিল, সঙ্গে হু-হু হাওযা। বাইবে স্থলপদ্মেব গাছটাকে আব চেনা যাচ্ছিল না—যেন একখানা স্তূপীকৃত ববফেব পাহাড়। ভাঁড়টা আনলেও সুবথ ঝুলিযে বাখাব জন্য স্থলপদ্মেব ডাল পেত কোথায়। ববফ খুবতে শুবু কবল সে। একটা গাঁইতি পেলে বেশ হত—পাহাড়ে ওঠাব মতো সে ববফ কেটে কেটে এগিযে যেত। সাদা বাত, সাদা বাস্তা—সাদামাঠা হাতেই ববফ কেটে কেটে এগোতে লাগল সুবথ।

কে জানে কবে সে পৌঁছুবে বাজাবামতলা।

পাঁচ

দশ তাবিখেব ভোব, ডিসেম্বব উনিশশো বিবানব্বই, ঘুম ভেঙে সুধন্যবা স্বামীস্ত্রী চোখ খুলে দেখল—বিছানায সুবথ নেই, হাটখোলা দবজাব ফাঁক দিযে বাইবেব ববফ ঘবেব ভিতব ঢুকে আসছে। তাবা পবস্পব মুখ চাওযা চাওযি কবল। তাবপব হাঁটুমুড়ে বসে প্রাণপণে সবাতে লাগল ববফ
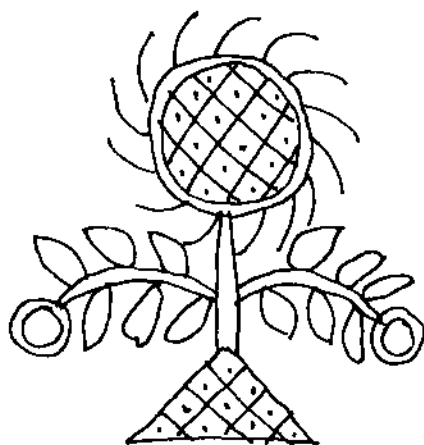
মা ॥ মানব চক্রবর্তী

আকাশের চাঁদি ফুঁড়ে আগুন, নীলদহা পাহাড় পেরিয়ে আসা বাতাসে ছোবল। গায়ে জিল্‌কি দেয়, চামড়ায় টান ধরে। দূরে, যতটা চোখ চলে, বাঁজা, ঢেউখেলানো মাঠ। ঘাসের রং মেটে-খরিশের পিঠ, ধূসরে-পাটকিলে ছোপ্‌দার। ঢেউখেলানো ওই মাঠের দিকে চাইলে মনে হয়, কিছু ওপরে কেঁপে চলেছে এক অনিঃশেষ বায়বীয় পর্দা। ভাপের হল্‌কা কাঁপে থিরিথিরি—কিচরি-তেলের মিরগি-লাগা আলো যেন বা।

এ পাশে খড়কাই টিলা-টিব্বার মাঝে কিছু দলছুট তাল-খেজুরের সারি, নাটকিলা, গোঁড়া ধুমসো : মাথায় খাটো। পাথুরে মাটির বুকছেনে অমন যে পরাক্রমী গাছ, তাল-খেজুর, যা কিনা পাথর ছাইছ্যাঁদড়া করে রসের চালান দেয় মাটির গভীর থেকে, সেও যেন হার মেনেছে।

সামনে বিস্তীর্ণ জলরাশি। ডি. ভি. সি.-র ড্যাম। অনেক দূরের আবছা শ্লেটরঙা জুজুপাহাড় দৃশ্যমান।

জলে গলা ডুবিয়ে বাইশা।

ফের ডুব দিল সে। মুখ তুলল। কঠিন মাটির বুকে হর-জিদ্দি বালকের তিথিন্‌ মেজাজে, ক্ষিধে-কান্নার ধাম্‌সা-মাদলে দোল খাওয়া ক'টি গ্রাম। মুগাড়ি, তালবেরিয়া, সিংদোয়ারি, বাদুরমারা।

বাইশা উঠব-উঠব করছিল। তখনই নজরে পড়ল, বাদুরমারার একটা ছোঁড়া—ছেঁড়া প্যান্টুলে রশি বাঁধা, কোমরে তাগা-তাবিজের গেরোগিরস্তি, হাতে শিরীষের ত্রিভঙ্গ ডাল ; জলার পারে গুটিগুটি আসছে।

আর ওঠা হল না বাইশার। হলই বা বাচ্চা! একগলা জলে দাঁড়ানো সে কিভাবে ওর সামনে উঠে আসে! বিশেষত, শরীরে যখন তার সুতোটি নেই! সুতরাং যেমন ছিল, তেমনই রইল সে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও বাইশা যখন দেখল ছোঁড়াটার চলে যাবার নামগন্ধ নেই উল্টে আতুপাতু-চোখে এদিক-ওদিক চায়, দু-কদম এগোয় তো চার-কদম পেছোয়, ল্যাবাধাবা-চোখ চরকি মারে এধার-ওধার, বাধ্য হয়ে বাইশার গলা খিড়িণ্ডে বাঁশ ফাঁড়ে কর্কশ, তু কে বটি রে, এই দুকুরে জলার ধারকে আলি! যা পালা—উঠে দু'ঘা দুবো তুর পিঠে শালো লচ্ছাড, মজাল টের পাবিক—

ছোঁড়াটার গলা কাঁদোকাঁদো, ছাগলবাচ্চাট কুথা ছুঁপাই গেল মাসি, কুথ্‌কে পেছি নাই...

বাইশার ফেরার তাড়া। কোলের নুনাকে বহুক্ষণ দুধ দেয়নি। তাই সে অবলীলায় আঙুল তুলে মিথ্যে বলল, হুই যে...একটু আগুতে দেইখলম, হুই...ই ধারকে ছুটলেক...

ছোঁড়াটা চলে যেতে আরও কিছুক্ষণ বাইশা খরচোখে চারপাশ জরিপ করে যখন নিঃসংশয় হল এই মধ্যদুপুরে মানুষ নেই তার ত্রি-সীমানায় তখন ধীরে ধীরে উঠতে

লাগল। পঁচিশ ফাগুনের বাইশার শরীর জেগে উঠছে। তার কাঁধ ও বিসদৃশভাবে চাগানো কণ্ঠার কোল ঘেঁষে যেন দুটি চর্মাবৃত কুশি, অ্যাত্তোটুকুন তেকোন-নাবাল। ওই ফোঁকড়ে জলও ছিল কিছু, ওঠার ঝাঁকুনিতে ঝরে পড়ল। রোগা কালো হাতদুটির একটি তার ঝুলুবি স্তনযুগলের ওপর অন্যটি চিমসানো দাগালো উদরদেশ পেরিয়ে জংঘার আড়ালে লজ্জাদেশের মুখচাপা।

মানুষ তো নেই-ই, আকাশে পাখিও নেই। তবু, নারী যখন বাইশা এবং বস্ত্রবিহীন, সহজাত লজ্জাবোধে এভাবেই উঠে এল ডাঙ্গালে। একটা বড় পাথরের পাশে তার শতছিন্ন শাড়িখানি। রাখার সময় সে কুণ্ডল করে রেখেছিল, বাতাসের বেয়াড়া ঝাপট তার আট-হাতি লেঙ্গমাথার শরম ভেঙেছে। সুতরাং কুড়ানকালে উবু হতে হল বাইশাকে। যে ভঙ্গিতে খ্যাপলা জাল টানা মারে রাতের আন্ধারে ক্যাওটজালির হাড়বজ্জাত জেলে, সে ভঙ্গিতেই উবুসুন্দরী বাইশা পাথরের খাইখড়ঙ্গা ফলা বাঁচিয়ে ভুঁয়ে-লপেটো শাড়িখানি অতি যত্নে বগলদাবা করে ওপর পানে চাইল। অনেক উঁচুতে গনগনে নীলের মাঝে চক্রাকারে পাক খাওয়া একটা শকুন নজরে পড়ল হঠাৎ। মনে মনে সে বলল, মুর্গাডির আকাশে চিল-শকুন ছাড়া আর কী রইবে।

কোমরে দু-পাল্লি জড়িয়ে খাটো শাড়ির আর যা বাকি থাকে, তাতে কাঁধ ঢাকল আধা। দু-দাপ্‌নার খাঁড়ি ধরে নিতম্বের গাঁট তক্, খড়খড়ে, স্লেটরং, অনাবৃত অংশে তার রোদ চমকায়।

পাথরের তেতে ওঠা চাপানো ফলা পার হয়ে শুরু সিঁদেকাটার ঝোপ। অজস্র ঝরে পড়া গুট্‌লি। পায়ে ফুঁড়লে বিপদ। ঝোপটুকু বাইশা পেরুলো নৃত্যের ছন্দে। দায়ে পড়ে। কোথাও শুধুমাত্র আঙুল চেপে, কোথাও বা খালি জমিতে গোড়ালির ভর। একসময় ঝোপ পড়ে রইল পেছনে, সামনে পথ আঁকাবাঁকা, ধূসর। নাক বরাবর মুগাড়ি। ওই যে বাঁ-হাতি পথ, সাতগুড়ুম নদীর মতো নীলদহা পেঁচিয়ে গুরাকলার দিকে, ও গেছে কেন্দুয়াডি।

ক্ষণপূর্বে যে ছিল, একগলা জলে, শরীর এখন তার শুকনো খড়খট্টি। গরম বাতাসের ঝাপটে এরই মধ্যে সে যথেষ্ট রুখু। ঘাড়ের কাছে জটাল চুলের প্রান্তদেশ বিনে কোথাও ভেজা ভার নেই। ত্যানাসদৃশ শাড়ি ভেদ করে জ্বলন্ত বাতাস তাকে ছোবলায়, ধীরে ধীরে, ভেজা স্লেট শুকোলে যেমন গতরাতের দেগেবসা অক্ষরমালা আবছা জেগে ওঠে, তেমনি খড়ির দাগ ফুটে ওঠে হাতে পিঠে। চুলকোয। নখে আঁচড়ালে আরও আরাম, শেষটায় যা কিনা হারাম ; জ্বালায়। তবু নখ বাইশার বশ মানে না। আর এভাবেই সে দ্রুত চলতে চেষ্টা করে। ছোট নুনাটাকে বহুক্ষণ সে দুধ দেযনি।

জাহেরথানের বিশাল, শতাব্দীপ্রাচীন, জড়াজড়ি করে সইপাতালি-ভঙ্গিতে পাঁচটি শাল মহুয়া যেখানে দাঁড়িয়ে, যার তলে কালো পাথরে সিঁদুর লেপা 'জাহের দেব', 'মোরেকো দেব', 'মারাং-বুরু', 'পরগনা বোঙ্গা' ও 'গোসাই এরাঃ', যেখানে 'বাহা' উৎসবের দিনে 'সারি সরজাম বাহা হো' ধ্বনিতে রুখু মাঠঘাট মুখরিত হয়ে ওঠে অথবা 'সহরায়', 'হারিয়াড়', 'জাছার' বা 'দসাই' উৎসবে ধামসা মাদলে সুর ওঠে ঘিজা ঘিন্ ঘিজিং ঘিনা—সেখানে ক্রুদ্ধ মুখে দাঁড়িয়েছিল জামতাড়া ব্লকের আদিবাসী নেতা কাপ্তান মুর্মু। চোখদুটি তার গনগনে। হবে নাই বা কেন ? আশপাশের দশ-পনেরোটা গ্রাম ঘিরে যার অসীম প্রতাপ, যে নিজে কিনা একদিকে শিউলিবাড়ির 'গোডেত্', অন্যদিকে নেত্রা—তার কথার এমন অমান্যি !

সামনে ঝিম চোখে বসে থাকা কেলেকালো মানুষগুলোর মুখে রা নেই। তাদের ফ্যাকাসে চাহনিতে না ধরা পড়ে সামান্য উত্তেজনা, না আগ্রহ। তাতেই আরও তেতে ওঠে কাপ্তান মুর্মু।

—কী ব্যাপার, তুরা কথা কইছিস নাই কেনে ? গুংগা বটি ? ক'টা বাইজেছে সি খিয়াল আছে ? দু-দিন আগুতে গাঁয়ে-গাঁযে চোঙ্ফুঁইক্যে বইলে গেলম মিটিনের কথা, তাতেও তুদের কুনও সাড নাই ? বলি ঝাডখণ্ড কি আমার একাব লেইগ্যে হবেক ?

বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বৃদ্ধ তিলকা মুর্মু চিঁ চিঁ করে বলল, প্যাট্ দুখাইছে গো কাপ্তান, সিংদোয়ারিরি পঁচা কুঁইয়ার জল খাঁইযে বাচ্চা বুঢ়হা সবাকারই প্যাট্ দুখাইছে। অত দূরে যেইতে লারব।

সঙ্গে সঙ্গে খিঁচিয়ে ওঠে কাপ্তান, ত কেনে যেঁইছিস ? টুকুন মেহনত কইরে হুই ড্যাম থিক্যে ঘড়া ভইরে কেনে জল আনিস না ? তুরা সাঁওতালদের বদনাম কইরে দিবি শালো...ঝাড়খণ্ডের লেইগ্যে হাজাব হাজার মানুষ কুথায জান লডাই দিইছে, আর তুদেব প্যাট্ দুখাইছে, হঁঃ—

নেত্যে মাথা চুলকে ঘাড তোলে, তা কাপ্তান আটবচ্ছর আগে থিক্যে রোজই ত শুইনছি, 'ঝাডখণ্ড হবেক--ঝাডখণ্ড হবেক', তা হঁইছে কুথায ? যদি হয, তা তুমাদের ঝাড়খণ্ড হবেক। গাঁয়ে একটো কুঁয়া নাই, জমি নাই, রাস্তা নাই, প্যাটে ভাত নাই। শরীলে যতদিন তাগদ ছিল, বোদ্‌মার পাথর ভাইঙ্গে ফুরকনের পাথরকলে পঁহুচাইতম, দুটা পয়সা পেইথম। তা তুমরা ফুরকনের পাথর-ভাঙ্গা কলটো জবরদস্তি উঠাই দিলেক। দুমকার নগু বেসরাকে বস্ করাইলেক। উ ব্যাটা একবছর না পুরাতেই পাথরকল বন্ধ্ কইরে দিল। এখন মিশিনঘরে ধুধুল গাছ। আমরা যাব কুথা ?

গর্জে উঠল কাপ্তান। অ্যাই নেত্য, বড় বুলি ফুটাইছিস শালো। ঝাড়খণ্ড কী হাতের মুয়া বটেক। বইললেই দিবে ? ইযার লেইগ্যে আন্দোলন কইরতে হবেক। 'হড়-সম্বাদ' পড়িস ? দ্যাশ্‌টোতে কী হঁইছে সি খিয়াল আছে ? খালি চদুর পারা ফটর-ফটর কইরছিস ! শুন, ইবারে কাড়মাটাড়ে রেল-রোকো হবেক, লাগাতার। সরকার যতদিন না দাবি মাইনছে, ততদিন টিরেন চইলবে না। বড বড় চুলাতে রাতদিন খিচুড়ি হবেক। ডিংলার ঝোল। লাইনে বউবাচ্চা লিয়ে বইসে রইবে যারা, উয়াবা সাঁঝ-বিহানে দু-টেম্ খিচুডি পাবেক। খাঃ শালো দমভর। উধার কেলাহী, ন্যাবাঘুটু, শিউলিবাড়ি, চুঁহাডির বিস্তর মানুষ নাম লিখাইছে। দ্যাখ্, মিটিনে আজ তুরা যদি না যাস্, তো কাহাকেও রেল-রোকোতে লিব না। ক্যালা টের পাবি। তুরা মর গা। কুন্ শালা অমন মাগনা খিচুড়ি দিবে ?

কাপ্তানের কথায় তিলকার চোখ জুলজুল করে উঠল। এখান থেকে অনেক দূরের পথ কাডমাটাড়। আগে জামতাড়া, তারপর। তবু যেন সে লাইনধারে কোমরসমান উঁচু বিশাল উনুনের বড়-বড কড়ায় খিচুড়ি ফোটার শব্দ শুনতে পাচ্ছে এমনভাবে টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে বিচিত্র শব্দ করল খুশির। কল্পিত স্বাদগন্ধের আস্বাদনে পশ্চিমবাহিত রুখু বাতাসপানে বড় করে বার-দুই শ্বাস নিয়ে বলল, হ্যাঁ—খিচুড়ি—ত্যামন ড্যাগ্ দেইখলে তুরা ভিরমি যাবি—পঞ্চাশ সনে যিবার আমাদের জমিগুলান সরকাব দখল লিলেক, ডি. ভি. সি.-র বান্ধের লেইগ্যে, অগলবগলের পঁচিশ-তিরিশটো গাঁয়ের লোক জুটঠা বাইন্ধে বুইখ্যে উইঠেছিল, বাদুরমারার সরকারি ক্যাম্প জ্বালাই দিইছিল, সিবারে হুই...ই মাঠের মাঝে ক্যাওটজালির গান্ধি-আশ্রমের বাবুগুলান আইসে অমনই বড বড় চুলা বানাই খিচুডি বাট কইরেছিল গাঁয়ের ঘরে ঘরে। বাবা রে...সে কী হুলুস-

থুলুস কাণ্ড বটি...লোকে বইস্যে খেঁইছে, বাটি ভইরে ঘরকে লিয়ে যেইছে...তুদের তখন জনম হয় নাই রে লদো...

প্রসঙ্গ অন্য দিকে চলে যাচ্ছে দেখে কাপ্তান মুর্মু ধমকে বলল, তুই গাঁধিবাবাগুলাই ত শ্যাষতক্‌কো আমাদের পোনে শাল দিইছে, হুঁঃ চরকা কাইট্যে আর রামধূন গাইয়ে যদি সব হবেক, তো তুদের হাজার-হাজার একর জমি ডি. ডি. সি.-র লেইগ্যে দখল কইরলেক কেমনে ? আসলে আমরা, আদিবাসীরা, তখন চদু ছিলম, যে যা বইলথ, তাতেই কুইদে দিতম...এখন উটো হবার লয়। আমাদের লিজের পাট্টি হঁইছে, মুক্তি-মোর্চা বইনেছে, সরকারের ঘুম টুইটে গেছে। ইবারে ত আসল খেল্—

বিরাজ মাঝি বিরক্ত স্বরে বলল, আঃ কাপ্তান, উসকল ছাড়ান দাও...তুই রেল-রোকোর খিচুড়ির কথা বল্। তা সত্য বইলছ ত ? দু-টেম্ খিচুড়ি দিবে ? যদি বউবাচ্চা সবাইকে লিয়ে যাই ? সবাইকে দিবে ত ? কাজ কইরতে হবে নাই ত ?

—ধুস্, তুরা গাড়ল বটি। কাজ কিস্‌কে ? ইটোই ত কাজ। ইটোই আন্দোলন, হঁঃ, শুধুই বইসে রইবি লাইনে, এক ঠাঁয়। তুদের পারা মেলা মানুষ রইবে। হাগু পেইলে জলার ধারকে যাবি, ফিরে প্যাট্ খোলশা কইরে আবার খিচুড়ি।

—ইরি বাবা ! ই যে জবর খিশ্‌সা। তা ঘুম পেইলে ?

—ঘুমা কেনে যত খুশি। বালিশের পারা লাইনে মাথা দিয়ে দমে ঘুমাবি...

—টিরেন যাবে নাই ত ধুকের উপর ?

কাপ্তান হো হো করে হেসে বলল, তুদের পারা হাজার-হাজার মানুষ রইবে। তুদের আগুতে রইব আমরা। আমাদের আগুতে রইবে বড় বড় নেতা। তাদের আগুতে রইবে পুলিস। শালো টিরেন রইবে তার দু-টিশন তফাতে, হঁঃ...অতই সুজা... !

লদো. টুডু গাদি চুলকোতে-চুলকোতে উঠে দাঁড়ায় এবং রেল-রোকোর খিচুড়ি নিশ্চিন্ত করার বাসনায় সবার আগে বলে, আমি আজ মিটিনে যাব রে, কাপ্তান, আমার নুনামুনি বউয়ের নাম লিখা রে, সাতজনা...

লদোর দেখাদেখি তিলকাও পেটে হাত চেপে উঠে দাঁড়ায়।

একথা সত্যি, সিংদোয়ারির সবেধন নীলমণি, একমাত্র কুয়োটির জল খেয়ে তার পেট ছেড়েছে, শুধু তারই বা কেন, মুর্গাডির অনেকের। সে নিজে রাতে লাঠি ঠুকঠুকিয়ে বার দুয়েক বাইরে গেছে এবং তৃতীয়বার সেই অবসরটুকুর অভাবে নেত্যর ঘরের সামনেই, পথের ধুলোয় 'করে ফেলেছে', শরীর যথেষ্ট দুর্বল, হাঁটুর জোড় খুলে আসতে চায় ; তবু লাগাতার রেল-রোকোর লাগামছাড়া খিচুড়ি, বিনি পয়সায় খাওয়ার সুযোগ কোন্ মুর্খ হাতছাড়া করতে চায় !

কোনওক্রমে উঠে দাঁড়ানো তিলকা, পঞ্চাশ সনের অমনই এক স্মৃতিস্বপ্নে খানিক আগেও যে ডুবে ছিল, ফোকলা মুখে বলল, লে, তবে লিখা কেনে আমার দশজনার নাম...

নিত্য, খাদু, লদো, বিরাজ হেসে ওঠে। কাপ্তান বিস্মিত স্বরে শুধায়, দশজনা কেনে ? চার বাচ্চা তুরা মেইয়া-মরদ, ছ'জনা...

—হেঁঃ হেঁঃ...দুটা ছাগল আর মুর্গি দুটা ? উয়ারাও যাবেক। উয়ারাও রেল-রোকো কইরবেক। ডিংলার খোশা আর শালপাতা খুইট্যে দিব্যি রইবে আমাদের সনে।

ভুঁয়ে-মুখ, থুবড়ানো, গেল ক'সন আগের এক গো-যানের আড়ালে দাঁড়িয়ে 'জাহেরথান'-এর আলোচনার অনেকটাই শুনল বাইশা। একসময় আর থাকতে না পেরে

বেবিয়ে এসে বলল, হেই কাপ্তানদাদা, অত কইবছ তুমবা, পাট্টি বইনেছে, ইবাবে দ্যাশ্ বইনবেক , তা মুগাঁডিতে একটা কুঁযা বইনছে না কেনে ? কেনে সিংদোযাবিব পঁচা কুঁযাব জল খেইযে বইতে হবেক মু'দেব ?

এহেন কথায, বিশেষত গাঁযেব সব্বোজনাব সম্মুখে একজন মেযেব মুখে, কাপ্তান ভাবি ক্রুদ্ধ হল ফেব। গলা তুলে সে তিলকাব দিকে চেযে বলল, শুইনলে, শুইনলে 'জগ-মাঝি', তুবা বইতে মেইযাছেইলা ফোঁপড দালালি কইবছে...শুন নিত্য, বিবাজ— তুবা ইবাবে চুডি পডগা শালো...

গত তিনদিন আধপেটা খুঁদ-সিজা ও গেডিগুগ্‌লি খাওযা বাইশাব তাতেও দমাব লক্ষণ নেই। সে পূর্ববৎ চডানো স্ববে ফেব বলল, চুডি কি লোতুন পইবেছে মবদগুলান ? সাবাদিন ঘবে মুখ গুইজ্যে পইড়ে আছে, দুটা পযসা পেইলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁডিযা মাইবছে হাটে, আব বচ্ছব বচ্ছব বাপ বইনছে। জঙ্গলেব লকডি আনা ঘডা ভইবে দূব থিকে জল আনা কুন্ মবদে কবে ? হঁঃ, মবদ ! কাজ নাই, কাম নাই, খালি বেইতেব বেলায খাপাং দিবাব সময যত মবদ ! থুঃ...

আব সহ্য কবতে পাবল না জাহেবথান এব সমবেত পুবুষবা। একযোগে উঠে দাঁডিযে বলল, এত সাহস তুব ?

তিলকা বাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, এক চডে তুব মু' ফ্যাব্‌ডাই দুবো বে বাইশা , মানীব মান বাইখতে জানিস না, ইঠেনে তু কেনে কথা কইবছিস শালো ঢ্যামন। যা, ঘবকে যা, তুব মবদকে ইঠেনে পাঠাই দে...

আব কথা বাডাল না বাইশা। তিলকা মুর্মু গাঁযেব জগমাঝিও বটে। গত পবশু খুদটুকু সে অনেক চেষ্টায ওবই ঘব থেকে ধাব এনেছিল। এছাডা কোলেব নুনাটাকে বহুক্ষণ দুধ দেওযা হযনি। হযত সে এবই মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিযে পডেছে। যাবাব আগে ঘাড ঘুবিযে বাইশা তীক্ষ্ম চোখে সমবেত জনমানুষসহ কাপ্তানকেও দেখল। তাবপব ইচ্ছে কবেই ধূলিময পথে দুপদাপ পা ফেলে, হযতো বা কিছুটা ঘষ্‌টে, সামান্য ধুলো ওডাল। ওব আঙ্গাবিযা চাহনি ও চলাব ভঙ্গি কাপ্তানসহ সকলকে ক্ষুব্ধ কবলেও একসময কাপ্তান বলল, মেজাজ যেন হাঁসুযাব ধাব, ইদিকে মিটিনে যাবাব নামে কথাব বাহাব। অমন বিটিছেইলাব লেইগ্যেই ত নাদু মাঝিব কাশিব বিমাব, কাইশতে-কাইশতে শালোব খুন বিবায...

বাইশা চলে যেতে কাপ্তান যখন বুঝতে পাবল মিটিং-যে যাওযাব ব্যাপাবে প্রায সকলেই বাজি, তখন সে মোক্ষম অস্ত্রটি ছাডল।

—মিটিনে আজ চুডা-গুড দিবে। মিহিজামেব দোযাবকা সাহু দশ বোবা চুডা আব মেলা গুড দিইছে।

চুডা-গুডেব পবিমাণ শোনা মাত্র বিবাজ মাঝি চিৎকাব কবে উঠল, দশ বোবা চুডা...বাবা বে... !

তাব কোলে দীর্ঘসময ধবে ঘ্যাঙ্গব-কাটতে থাকা ন্যাংটো ছেলেটা কঁকিযে বলে উঠল, বাবাগ', চুডা-গুড খাব...অ বাবাগ চুডা-গুড...

ছেলেব পিঠে প্রচণ্ড এক কিল মেবে বিবাজ কষা-গলায বলল, ইটো হঁইছে আমাব মবণ। মাকে খেঁইছিস চিবাযে ইবাবে আমাকে খা। শালো ছেইলা বটেক, ঘডি-ঘডি অত ভূখ লাগে ত চিবা গা' নীলদহাব পাথব...শালো শুযাব কুথাকাব...

নাদু মাঝি, অর্থাৎ বাইশাব অসুস্থ স্বামী, কাশতে-কাশতে ঘব থেকে বেবিযে সবে খানিকটা এসেছে, তখনই চিঁড়ে-গুড সংবাদেব কিযদংশ কানে গেল। সে অতিদ্রুত হেঁটে

এল জাহেরথানে। ফলত, নাদুর কাশির দমকে পেছু ফিরে চাইল। অতিকষ্টে মুখে একহাত চাপা দিয়ে কাশি সামলাবার বৃথা চেষ্টা-স্বরূপ পিচ্ছিল লোল-শ্লেষ্মা হাতে-মুখে-একসা অবস্থায় কোনক্রমে সে বলল, চুড়া... ? হাই বাপ, চুড়া দিবে তুমরা ?

নাদুর গর্তে বসা পিঙ্গল চক্ষুদুটি ক্ষণেকের তরে ঝিলিক মেরে উঠল। অসুস্থ শরীরেও যথাসম্ভব তেজের ভঙ্গিমা ফুটিয়ে সে ফের বলল, বলো. কুথা যেইতে হবেক ?

—হুঃ, বড় মরদ আইসেছে ! বিটি-ছেইলার দাপানি খেইয়ে যে চুঁহার পারা সিধাই রয, মুখে তার বড়ই ফুটানি। বিরাজ মাঝি তাচ্ছিল্য সহকারে কথা শেষ করেই কানে গুঁজে রাখা পোড়া-বিড়িতে অগ্নিসংযোগ করল।

কাপ্তান মুর্মু, ক্ষণপূর্বে বাইশার তীক্ষ্ম প্রশ্নাবলীর মুখোমুখি হয়ে যার মান যায়-যায় অবস্থা, বিশেষত এতগুলি লোকের সামনে, সে স্বীয় সম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় গলা-তুলে, যাতে করে বাইশার কানে পৌঁছোয় এমনভাবে বলল, তুর বিটিছেইলাকে সামহাল দেগা আগে। অত মুখের ধার ভাল লয়। উল্টাপুল্টা কথা কইরে মেজাজটো খিঁচাই দিইছে। তুদের লেইগ্যে খাইট্যে জান বিরাই যেইছে, আর তুদেরই বউ-বিটি...

মাথা চুলকে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে নাদু, তুমার গোড়ে দণ্ডবত কাপ্তান, তুমায দয়াব শরীল, মাফ কইরে দাও। ঘরে একদানা খুদ নাই, নুনাদুটার কান্নার শ্যাষ নাই ;মা বটে কিনা, তাথেই উয়ার মাথাটো বিগড়াই গেইছে। উযার মুঁহে খ্যাংড়া মাইরব লিয্যাস, মাফ কইরে দাও। তুমাদের সনে বউ-নুনা সবাইকে লিয়ে যাব, চুড়া-গুড় মিলবেক ত কাপ্তান ?

—হুঃ, কেনে লয ! লিয্যাস দিবে। ফিরে রেল-রোকোতে নাম লিখাইলে লাগাতার খিচুড়ি পাবি। তুদের আর কী ! সাঁঝে দমভর খাবি আর বিহানে ভুইলে যাবি। বিহানে খাবি ত সাঁঝে...। জেল খাইটতে হবে আমাদের, পুলিসের ডাণ্ডা খেইতে হবে আমাদের। লে...বেলা হঁইয়ে যেইছে, ঘর-ঘর থিক্যে বিরাই আয় সব। চাঁইবাসার ভীমা হাঁসদা আজ ভাষণ দিবে মিটিনে। শরীলের খুন কেমন হাওযাই-জাহাজের পারা ছুটে দেখিস। ভাষণ শুইনে মনে লেয এখুনি শালো কুইদে দি' আগুন-গাঢহায। লে, জলদি কইরে সব বিরাই আয়...

অবশেষে, একসময় দেখা গেল—অভাব অনটনে দাঁড়াভাঙা হাড় জিরজিরে কিছু মানুষ সংখ্যায় জনা পঁচিশ, যার মধ্যে লাঠি হাতে বৃদ্ধ, খালিপায়ে উদল গায়ে বালক বালিকা, কোলে-কাঁখে নেতিয়ে থাকা রুগ্ণ শিশুসমেত মা, নেত্য-বিরাজ-তিলকা-লদো-সাধু সমেত মুর্গাডির দলটা কাপ্তান মুর্মুর পেছু-পেছু দুপুর রোদে জ্বলন্ত বাতাসের মধ্যে ন্যাড়া মাঠ পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। বাইশার কোলে দেড়বছরের শিশুসন্তান। দেড়বছর বয়েস হলে কী হয়, আজও সে হামা দিতে শেখেনি। প্যাঁকাটি সদৃশ দুটি অক্ষম পা নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা ওই শিশু দিনরাত তীক্ষ্ম স্বরে শুধু কাঁদে। আর বাইশা যখন কোলে নেয়, সে কেবল বুকে মুখ ঘষে। এ বিনে তার সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

নাদু মাঝির হাত ধরে বাইশার ছ' বছরের ছেলে রসু। চিঁড়ে-গুড়ের প্রাপ্তি-সংবাদে উৎফুল্ল রসুর গতি বাপের চেয়েও বেশি আপাতত। মাঝে মাঝেই সে নাদুর হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে চায়। এর জন্য ধমকও খেতে হচ্ছে তাকে বাপের কাছে। মিটিনে বিস্তর লোক হবেক। হাত ছাইড়লে হারাই যাবি রে নুনা...

বোদমা পাহাড় সামনে। ক্রমশ চড়াই। অল্পেই হাঁপ ধরে। পেটে যাদের রাত্রিদিন ক্ষিধের কামড়, দিন কাটে তো রাত কাটে না, ভুঁয়ে পেট রেখে নিথর পাটিসাপটার

মত শরীরে ক্ষিধের কাটান দিতে যারা কোনও কোনও রাত শুকনো মহুল চিবিয়েই কাটিয়ে দেয়—তাদের দলটা বোদমা পাহাড়ের গোড়ায় অল্প চড়াই ঠেলেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

কপালের ঘাম মুছে তিলকা বিড়বিড় করে বলে, পা চইলছে না, আধা পথেই থইকে গেলম।

নেত্য, লদো, এই সুযোগে বড় একটা পাথরের ওপর বসে। তাদের দেখাদেখি গোটা দলটা দাঁড়িয়ে যায়।

এমত দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড রাগে কাপ্তান মুর্মু চিৎকার করে ওঠে, কী বটে। মজাল কইরছ? বইসে গেলে কেনে?

--টুকুন জিরাইছি...

--এখন জিরাবার সময়! শুইনে রাখ, মিটিন শুরু হুঁইয়ে গে চুড়া-গুড় কিছু পাবেক ন্যাই...হুঁঃ...

ঘোষণাটি সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে। ঢিমেতাল, কেঁদে-কঁকিয়ে চলা মানুষগুলোর গতি ফের দ্রুত হয়।

কোলে বাচ্চা নিয়ে চড়াই ভাঙতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল অভুক্ত বাইশার। তার ওপর বাপের হাত ছেড়ে রসু এখন মায়ের আঁচল টেনে ধরেছে। ঠোঁটের কোণে তার বছর ভরের ঘা। আগুনে বাতাসে ওই ঘা আরও টান ধরেছে, তৎসহ অনবরত নানা প্রশ্ন করার কারণে ঘায়ের চুমটি ছিঁড়ে রক্ত গড়াচ্ছে। হাতের উল্টোপিঠে, কখনও বা মায়ের শাড়ির আঁচলে তা মুছে, গরম চাটুর মত উত্তপ্ত পাথরের রাজ্য পেরিয়ে দিব্যি চলেছে রসু।

বোদমা পাহাড়ের গড়ানে ঢাল পেরিয়ে সাঁওতালি কামিনের বিঁড়ের মত চক্রাকারে পথ চলে গেছে সাহাড্ডাল লেবেল ক্রশিং বরাবর। আমবাগান, অর্থাৎ মিটিং এর জায়গা এখনও মাইলটাক।

হেঁটে চলতে চলতে একসময় ঘর্মাক্ত তিলকা হাঁপধরা গলায় নেত্যকে শুধায়, হ্যাঁরে নেত্য, চুড়া-গুড় দিবে ত সত্য?

পরক্ষণেই সংশয়ভরা চোখে এতক্ষণ ধুতির আড়ালে লুকিয়ে রাখা দুটো বাটি বার করে চাপা গলায় বলে, দুটা বাটি লিইছি। এতদূর থিক্যে আইসেছি, এক বাটি কেনে লিব?

তিলকার কথার জবাবে নেত্য হেসে বলে, খুড়া, তুমি দু-বাটি লিবে, আর হামি হাঁ কইরে ভাইলব! এই দ্যাখো, আমিও লিইছি দুটা কান্দাওলা বাটি...ডাগর, তুমার চেইয়ে টুকুন বড়ই...হিহিহি...

তিলকা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, বাটি ত লয়, উ থালের বাপ, তা চুড়া-গুড় না পেইলে কী কইরবি?

সামান্য দেরি না করেই নেত্যর জবাব, চুড়া না পেইলে শালো বাটি দুটা বেইচ্যে দুবো হাটে। দমভর মহুয়া খেঁইয়ে বেহোঁশ হঁইয়ে যাবক।

---ফিরে হোঁশ আইসলে? খুদ-সিঁজা খাবি কিস্‌কে?

---কেনে! মাটিতে গাব্বু বানাই। মাটি-খুঁদে মিশাল হঁইয়ে প্যাট টুকুন বেশিই ভইরবে, বটে কিনা!

মাথার ওপর সূর্য! প্রচণ্ড রোদ্দুরের তেজ। মনে হয় চারপাশখানি আবছা। চোখে ঘোর লাগে। বাতাসের ঝাপটে মাঝেমাঝে ধূলিঝড়। হাতের আড়ালে মুখচোখ ঢাকে ওরা। ফের শুরু পথচলা।

বোদমা পাহাড়ের পাথুরে বুকক্ষেরত গনগনে বাতাসের মধ্যে হেঁটেচলা ভুখাশুখা মানুষগুলোর দিকে চেয়ে হঠাৎ কাপ্তান মুর্মু হাঁক দেয়, কিহে, তুমরা কি বিয়া ঘর যেইছ ? নাকি বাহাপররে কুটুমঘর ? লাও, ইবারে গলা খুইলে হাঁকান দাও 'ঝাড়খণ্ড জিন্দাবাদ. .আমাদের দাবি মাইনতে হবেক...'

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষগুলোর তখন স্লোগান দেবার শক্তি নেই। তেমন সাড়া মিলল না।

– তুমরা সব মুর্দার পারা চইলছ। আরে বাবা, মিটিনে যেইছ তুমাদের নাড়ায় কুথায় মাটি কাঁইপরে, অগল বগলের মানুষ কুথায় বিরাই আইসবে দলে দলে...লাও, গলা ফাঁইড়ে হাকান দাও দেখি, 'ঝাড়খণ্ড জাইগেছে বোদমা পাহাড় কাঁইপেছে...

সমবেত স্লোগানের বদলে বিরাজ-মাঝির ন্যাংটো ছেলেটা করুণ গলায় কঁকিয়ে উঠল, বাবা গ, চুড়া কখন দিবে... অ বাবা...

শূন্যে মুঠো ছুঁড়ে ক্রোধান্বিত কাপ্তান চিৎকার করে বলল্, তুরা মোদের জাতের কলঙ্ক। একটো জাতির এতদিন বাদে লিজের দ্যাশ্ বইনতে যেইছে কুথায় তুরা বুকের খুন উজারি দিবি, তা লয় খালি চুড়া কই...খিচুড়ি কই...

বিরাজ ছেলের চুলের মুঠি ধরে জোরে টান মেরে বলল, ইবারে আর যদি 'চুড়া চুড়া' কইবরি তো মু' ক্যাবড়াই দিব চড়ে। মা-কে খাঁইয়ে প্যাট ভরে নাই তুর, গোটা বোদমা পাহাড় চিবাই খেইলে তুর খিদা মিটবেক না...

সাহাড্ডানি লেবেল-ক্রশিং পেরিয়ে পিচ রাস্তা। রোদ্দুরের তাপে গলন্ত পিচের বুড়বুড়ি। নগ্নপদ মুর্গাডির মিটিং-মুখী দলটা সাবধানে পা ফেলে চলছে। চলার গতি এখন কম।

মাঝে-মাঝেই হাঁক পাড়ছে কাপ্তান। কখনও বা থমকে দাঁড়াচ্ছে। মুখচোখে তার রাগ ও বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট।

এর মধ্যে হঠাৎ বাইশার ছেলে বসুর পা গলন্ত পিচে আটকে পড়েছে। কিছুতেই সে পা তুলতে পারছে না। কোলে আর একটা বাচ্চা নিয়ে জেরবার বাইশা বসুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই ছেলেটা পথের ধুলোতে পড়ে পরিত্রাহী কাঁদতে শুরু করল। ছোট ছোট দুটি পায়ের পাতা জুড়ে গহীন কালো পিচ। আঙুলে-আঙুল সেঁটে আছে কড়াভাবে। পুরো দলটা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

কাপ্তান মুর্মু পেছিয়ে এসে ধমকে উঠল, তুদের লিয়ে সংগঠন করার চেইয়ে কাঁড়া দিয়ে আঁক কষা ঢে-এ-র সোজা। একটো মিটিনে যেইতে হাজারবার বুইখছ।

বাইশা কাতরগলায় বলল, আমার বসুর পা জুইড়ে গেছে গ, এখন কী করি!

--চুপ্, তুদের আকল আছে। কেরোসিন দে' ঘইষ্যে দিবি, পিচ উইঠে যাবেক। লে...ইবারে চল্...

—কেরোচিন ? কিচ্‌রি তেলে টেমি জ্বলে, কেরোচিন কুথা পাব রে কাপ্তান ? টুকদু কেরোচিন পেইলে শরীলে ঢাইলে জ্বালা জুড়াইতম...

ফের চলা। কাঁদতে-কাঁদতে পিচ-মাখা আঙুলজোড়া পায়ে বসু এখন বাপের সঙ্গে। সে চলছিল না, নাদুর হ্যাঁচকা টান তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ফলত বসুর কান্না ঘেঙিয়ে বাজতে লাগল সারা পথ।

আমবাগান আর দূরে নেই। শোনা যাচ্ছে স্লোগান। পথ প্রায় ফুরিয়ে আসার আনন্দে, বকলমায়, চিঁড়ে-গুড়ের প্রাপ্তিক্ষণের সমূহ সম্ভাবনায়, মুর্গাডির দলটা এখন দ্রুত। প্রত্যেকের মুখচোখে উৎসাহের ছবি। কেবল কাঁদছে বসু। তার আঙুলে-আঙুল জোড়া। পায়ের তলায় পুরু হয়ে জমা পিচ।

নাদু মাঝি ছেলেব মাথায হাত বেখে হেসে বলল, কাঁদিস কেনে ? বড বাহাবেব জুতা পইডেছিস তুই। অমন চক্‌চকা জুতাব কত দাম জানিস ?

দুই

মিটিং সবে শুবু হযেছে । সভায শ্রোতা যত তাব চাবগুণ-চিঁডে-গুডেব লাইনে। সে এক ভীষণ ব্যাপাব। চিৎকাব চেঁচামেচি, ধস্তাধস্তি, মাটিতে গডাগডি, তাবস্ববে কান্না, গালাগালি, অভিশাপ, কাবও কাবও মুখে বাজ্যজযেব হাসি—এব মধ্যে দিযেই চিঁডে-গুড বিলি হচ্ছে দূবাগত ক্ষুৎপিপাসায কাতব গ্রামেব মানুষদেব মধ্যে।

দুর্ভাগ্যবশত, মুর্গাডিব দলটা এসেছে দেবিতে। সুতবাং লাইনে বেজায ভিড। সবাব পেছনে দাঁডানো ওদেব মধ্যে অশক্ত তিলকা চিন্তিত স্ববে বলে, ইবি বাবাবে, অত কুদাকুদি কইবতে লাইবব বাপ, অ নেত্য, আমাব লেইগ্যে টুকুন চুডা-গুড আইনে দে বাপ...

নেত্য, যে নিজে পাবে কি না সেই সংশযে কাতব, এমত প্রস্তাবে খিঁচিযে বলল, লিজেব পোন লিজে সামহাল খুডা, হঃ, ভিড ঠেইলে আগাইতে লাবছি আব তুমি কাঁদান পাইডছ...

বাচ্চা কোলে বাইশা একবাব প্রবল ধাক্কায লাইনেব বাইবে যায, ফেব ঢোকে। ভিডেব মধ্যে পাযেব চাপে বসুব কান্না এখন চৌগুণ। নাদু মাঝি এক ধিডিঙ্গে মানুষেব কনুইযেব গুঁতো খেযে ডাক ছেডে কেঁদে উঠল, উবি বাবাবে, চোক ফুঁইডে দিলেক বে.. চুডা চেইযে চোক গেল বে...এ...এ...

কাপ্তান মুর্মুব টিকি দেখা যাচ্ছে না। তাব এখন অনেক কাজ। ছেলে সমেত বিবাজ মাঝি মাটিতে হুমডি খেযে পডেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয লাইন এগোচ্ছে না। তবু চিঁডে-গুড হাতে দেখা যাচ্ছে কোনও কোনও উস্কোখুস্কো ঘেমো-মুখে প্রাপ্তিব আনন্দ। বেলা যায যায। সুয্যি ডুবু ডুবু। মঞ্চে হ্যাজাক বাতি। স্থানীয এক বক্তা এই হৈ-হট্টগোলেব মাঝেই হাত-পা ছুঁডে বলে যাচ্ছে কত কথা। এক মহাসংগ্রামেব পটভূমি।

হঠাৎ জ্বলন্ত মুখচোখে বাইশা বসুব হাত ধবে টালমাটাল পাযে বাইবে ছিটকে এল। চিৎকাব কবে বসুব বাপকে ডাকল, ইভাবে হবেক নাই। ইধাবে আয...

বহুকষ্টে লাইন থেকে বেবিযে চোখে হাত ডলতে-ডলতে নাদু প্রায কেঁদে-ফেলা গলায বলে, দবকাব নাই বাপ, অমন চুডা-গুডে মুইতে দি...

—কেনে ? পেইছে ত কেউ কেউ।

—উদেব পাবা কামডা-কামডি কইবতে পাববি ?

দাঁতে-দাঁত ঘষে বাইশাব জবাব, হঃ, আমুও পাবি, ভূখা নুনা বুকে চাইপ্যে পাহাড ডিঙ্গাই যাব...আমি মা বটি, তুব পাবা ডব খাওযা বাপ লইবে...

বলেই কোলে বাচ্চা সমেত বাইশা তিবেব মত ছুটে গেল বে-লাইনে। যেখানে মানুষেব হাত আব শূন্য বাটিব মাঝে হাহাকাবে অদ্ভুত এক খঞ্জনিসুবে বেজে চলেছে ক্ষুধার্ত মানুষেব কান্না, চুডা দাও...গুড দাও...চুডা...আ.....আ.....

নাদু ও বসু হতভম্ব চোখে পাগলিনীপ্রায বাইশাকে অনুসবণ কবতে লাগল। একসময খেই না পেযে বসু তাবস্ববে কেঁদে ফেলল, হেই মা গ', কুথা গেলি তুই ..হেই মা...চুডা আমি খাব না, তুই ফিবত আয মা...উযাবা বাক্‌কশ তুকে খাঁইযে লিবে গ মা...আ...আ...

চাঁইবাসার ভীমা হাঁসদা ভাষণ দিতে ওঠার খানিক আগে ঘোষিত হল, 'চুড়া-গুড় শ্যাষ্ হঁইয়ে গেইছে, আপনারা সব্বোজনা ইবারে ধিয়ান দিয়ে মিটিনে মন দেন'...

ক্লান্ত-বিধ্বস্ত মুর্গাডির মানুষেরা হতাশ হয়ে খোলা মাটিতে ছড়িয়ে গড়িয়ে। আর তখনই বিরাজ মাঝির ছেলে কেঁদে উঠল, বাবা গ', চুডা-গুড় কই, বড় খিদা পেইছে বাপ, প্যাট্ দুখাইছে গ'...

বিরাজ আর সহ্য করতে পারল না। কারণ ক্ষিধে, তৃষ্ণায় সেও কাতর। তদুপরি আশাভঙ্গের বেদনায় এক বুনো রোষ তাকে কুরে খাচ্ছে। ছেলের কান্নায় সে ঠাটিয়ে দু-গালে দুটি চড় মেরে খিঁচিয়ে উঠল, ফের যদি রা' কাইড়েছিস ত মু'হে তুর টাং গুঁজি দুবো শুয়ার, চুপ্ যা...

হাততালির দাপটে মাঝে মাঝেই ভীমা হাঁসদার গলা ডুবে যায়। ফের দ্বিগুণ জোরে বেজে ওঠে। গ্রামগঞ্জের মাইক্রোফোন অতিরিক্ত চিৎকারের দাপট সইতে না পেরে মাঝে-মাঝেই কর্কশ গলায় খেঁকিয়ে ওঠে, ফের শান্ত—এরই মধ্যে দশ-দফা দাবির ভিত্তিতে রেল-রোকোর সমর্থনে যুক্তির বিন্যাস তরঙ্গায়িত হয়ে আমবাগান পেরিয়ে বহুদূরে মিহিজাম পেরিয়ে যায়।

একসময় ভীমা হাঁসদার ঝড় থামে। রাজমহলের বাঁকা হেমব্রম যখন মঞ্চে আসে, তিলকা তখন হাতের বাটি মাথায় দিয়ে খোলা আকাশের নিচে চিৎ। চাঁদ-তারার গহিন গাঙে চোখ রেখে নিজের বুকের ধুকপুকি, চিমসানো পেটের ভেতর দড়ি পাকানো নাড়ির ক্ষিধেকান্নার গ্রাম্যভাষা পাঠ করতে চেষ্টা করে। ক্রমে রাত বাড়ে। ভিড় কমে।

নেত্য দু-হাঁটুতে মাথা রেখে, যেন বা হাঁড়িকাঠে উবু। পাশেই একটা লোক। হাতের বাটির ওপর গামছার আচ্ছাদন।

—কুথায় ঘর ?

—কেলাহী।

—চুড়া-গুড় পেইছ মনে লিছে ?

—ইঁঃ, দুকুর দুটায় লাইনে দাঁড়াইছিলম। গুতাগুতিতে তিনবার ভুঁয়ে পাক খেঁইছি, ধুতি খুইলেছে দু-বার, তবু হাল ছাড়ি নাই। ক্যাওটের জান বইলে কথা...মুই মদনা ক্যাওট, দু বাটি পেইছি, হিহি...তুমরা লাও নাই ?

নেত্য আপসোস চাপা দেয় আদর্শের ভাষায়, একজনা দু-বাটি লিছ, ত অন্যজনা পাবে কেমনে ?

কেলাহীর ভাগ্যবান জবাব দেয়, তবে শুনঅ, দু-বাটি পাই নাই, পেইছি এক-বাটি, দুটা বাটিতে বাট কইরে রাইখেছি, বেশি দেখায় কিনা...

নেত্য গম্ভীর। অ...তা বেশ কইরেছ। আমরা ত চুড়া-গুড়ের লোভে আসি নাই, আইসেছি মিটিন শুইনতে। লিজেদের দ্যাশ্ হবেক, জমি হবেক, ঠিকানা হবেক, এখন গুড়-চুড়ার লোভ কইরলে চলে ?

—বেড়ে বইললে বাপ। তবে আসল কথাটো কী জান, দ্যাশ্ হবেক, জমি হবেক, ঠিকানা হবেক, সবই ঠিক, কিন্তু প্যাট্ না ভইরলে যে সকলই মিছা। বটে কিনা ? আর প্যাট যদি ভরে ত দ্যাশ, মাটি, ঠিকানা, ই সকল বিত্তান্ত কে পুছে ? দ্যাস বইলতে প্যাট, জমি বইলতে প্যাট, আর ঠিকানা বইলতে প্যাট। ইয়ার চেইয়ে সত্য ঠিকানা কিছু আছে নাকি ? তুমি রাত তককো মিটিন শুন, মুই ঠিকানা পেইয়ে গেইছি...চইললম...

কেলাহীর মানুষটা চলে গেল। আর নেত্য, মনে মনে কাপ্তানকে জঘন্য একটা গাল দিয়ে তিলকার দেখাদেখি মাটিতে শুয়ে পড়ল। বাতাসের তরঙ্গে তখন মাইক্রোফোন-বাহিত বাঁকা হেমব্রমের অগ্নিসম ঢেউ। কোথাও টু শব্দটি নেই। শুধু খুব মৃদু স্বরে, একটানা, বিরাজ মাঝির ছেলের ঘেঙিয়ে কান্না...'প্যাট দুখাইছে গ'...তুমি কেনে মিছা বইললে বাপ...'

অন্ধকারের শুরু থেকেই লোক উঠতে শুরু করেছিল। মিটিং যখন শেষ হল তখন সিকিভাগও নেই। যারা আছে, তারা সব স্থানীয় বাসিন্দা। আর আছে মুর্গাডিির দলটা। কারণ খিদে-তৃষ্ণায় কাতর ওদের কারও এই অন্ধকারে পথ হেঁটে অতদূরে ফেরার উপায় ছিল না।

সবুজ ঝাণ্ডাওলা জিপ শব্দ তুলে ছুটে গেছে। সভাস্থল ফাঁকা। মঞ্চে কাগজফুলের মালা হালকা হাওয়ায় দোলে। অন্ধকারে 'রসি' খাওয়া শালপাতা খড়খড় শব্দে ফাঁকা মাঠ চষে চেড়ায়। শুধু একদল শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষ ছাড়া আমবাগানের বিশাল মাঠে আর যা আছে, তা হল ক'টি ঘেয়ো-কুকুর। কখনও তারা চুপ, কখনও ভীষণ শব্দে পরস্পরের প্রতি আক্রমণোদ্যত।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে ভেসে আসে অতি-পরিচিত সেই কাশির শব্দ, খুকখুক...খুকখুক...

তিলকা চোখ কুঁচকে বলে, শালো নাদু বটেক, হুই কাশি...

—তাই ত মনে লিছে। আন্ধারে কুথায় ছুঁইপ্যে আছে? শালো কি চুড়া-গুড় পেইছে?

সাধুচরণ উবু হয়ে অন্ধকারে চোখ চালান দেয়। বিরাজ, লদো, নেত্য এবং আরও অনেকে সন্ধানী দৃষ্টিতে ঠাহর পেতে চেষ্টা করে লাইন থেকে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া বাইশার পরিবারের।

বেশ কিছুক্ষণ অবিচ্ছিন্ন নীরবতার পর তিলকা সন্দেহমিশ্রিত গলায় বলে, উয়ারা ত চুড়া-গুড় পায় নাই লিশ্যাস। তবে আন্ধারে ছুঁইপ্যে আছে কেনে? গতিক সুবিধার লয় রে সাধু...

ফের শব্দ, খুকখুক...খুকখুক। এবারে একটানা অনেকক্ষণ। সুতরাং শব্দের সুতো হাতড়ে পরিবারসহ নাদুকে খুঁজে পেতে বিশেষ কষ্ট হল না। মাঠের কোণায় এক খর্বুটে মহুলগাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে বাইশা। কোলের রুগণ শিশুটি মাটিতে শয়ান। পাশে রসু। আলকাতরা মাখা বীভৎস দুটি পা। দুজনেই ঘুমোচ্ছে। আর বুকে হাত-চাপা দিয়ে নাদু কাশির দমক সামাল দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে।

চারপাশ থেকে ছায়ামূর্তির মতো, পা টিপে-টিপে, এগিয়ে এল ওরা।

হঠাৎ অন্ধকারে চুপি চুপি আগুয়ান ছায়ামূর্তি দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল বাইশা। নেত্য আকর্ণ হেসে বলল, ডরাস না, তুদের খুঁজতে আইসেছি। ইঠেনে ছুঁইপ্যে রইছিস যে বড়!

সাধুচরণ দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরাল। তখনই ক্ষণিকের আলোয় বাইশার শতচ্ছিন্ন শাড়ি যা কোনওমতে শুধু কোমরে থাপা-থুপি দিয়ে ঢাকা, বুকের কাছে পাতা-সমেত একটি মহুয়া গাছের ডাল-বিনে সুতোর লেশমাত্র নেই, নজরে পড়ল। দেশলাই নিবে যেতে বোধহয় বাঁচোয়া, ভেবেছিল বাইশা। কিন্তু তা নয়, একে গাঁয়ের লোক, তায় পুরুষ; সুতরাং এবারে দেশলাই জ্বলল তিনহাতে। স্পষ্ট ফুটে উঠল বাইশার গালে আঁচড়ের লম্বাটে দাগ, ঠোঁটের

কোণায় ফুলে ওঠা নীল ক্ষতচিহ্ন, এলো চুল ও আঙ্গারিয়া চাহনি।

—তু কি যুদ্ধ কইরে আলি রে বাইশা ? তিলকার প্রশ্ন।

—হঁঃ। রোজেই ত কইরছি, লতুন কী ! আজ টুকুন বেশিই কইরলম।

—কার সঙ্গে ? নেত্যর জিজ্ঞাসা।

—তুদের পারা অনেক মানুষের সঙ্গে। গলা কেঁপে উঠল বাইশার।

—চুড়া পেইছিস ? গুড় ? সাধুচরণের বিস্ময়।

—হঁঃ। কেনে পাব নাই ? এত লোকে পেইছে। তিনবাটি পেইছি...তবে গুড় শ্যাষ্ হঁইয়ে গেইছিল। এই দ্যাখ্...

শাড়ির যে অংশটি তখনও মানুষের নখ-দাঁতের আঁচড় বাঁচিয়ে অক্ষত ছিল, তারই মাঝে বাঁধা চিড়ে, পোটলাসম, পেটের ওপর, যেন বা সাতমাসের পোয়াতি ; বাইশা দেখাল।

আর সেই মুহূর্তে মুর্গাডির 'জগমাঝি', তিলকা মুর্মু প্রচণ্ড রোষে চিৎকার করে উঠল, তু মুর্গাডির মা-বুনের ইজ্জত মাটিতে মিশাই দিইছিস, বিটিছেইলা হঁইয়ে মরদের মাঝে তুই কুইদ্যে দিলি চ্যামন, তুর শরম হঁইছে না ?

কথা নয়—যেন বিষাক্ত তির।

তিলকা থামতেই নেত্য, বিরাজ, সাধু, লদো সকলে একযোগে গর্জে উঠল। শুধু ওরা কেন, ফটিক মাঝির বুড়ি মা ধামাই, নন্দ ক্যাওটের বউ ফুলমণি সবাই আঙুল তুলে বাইশার এহেন নারীত্বের স্বেচ্ছা-অবমাননায় চরম ধিক্কারে ভরিয়ে তুলল আমবাগানের খোলা মাঠ। তার চরিত্র নিয়ে অজস্র আকথা-কুকথা এল ঘুরে-ফিরে, স্বামী সম্পর্কে অশ্রাব্য গালিগালাজ চলতে লাগল বিরতিহীন।

থমথমে চোখে স্তব্ধ বাইশা। নাদুর গলায় ফের কাশির দমক। ভয় ও সাময়িক উত্তেজনায় সে কিছুতেই কাশির সঙ্গে যুঝে উঠতে পারছে না।

হঠাৎ 'জগমাঝি' তিলকা মুর্মু, মুর্গাডির ঝগড়া বিবাদে যার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, গম্ভীর স্বরে রায় দিল, তুর চুড়া ফেইক্যে দে মাঠে....

—কেনে ? ফুঁসে উঠল বাইশা।

—মরদের সঙ্গে কুদাকুদি কইরে তুর ইজ্জত গেইছে। কত লোকে তুকে নুচানুচি কইরেছে তার ঠিক্ আছে ! তুর উদল শরীল কত লোকে চুড়ার ছলে রগড়িছে তা জানিস ? ঐ চুড়া ফেইক্যে দিলে তুই বিটিছেইলার ইজ্জত ফিরত পাবি, তা বিনা গাঁয়ে ফিরে তুকে একঘরে কইরব...

—না... না... না...। আঁতকে উঠল বাইশা। অমন কইরছ কেনে খুড়া ? খিদা পেইলে গরুতে কাগজ খায় ; মানুষে পাথর চিবায় ; আমি মা বটি ; চুরি তো করি নাই, খালি মরদগুলোর মাঝ থিক্যে ছিনাই লিইছি। খিদায় কামড়ি-কামড়ি ছুট নুনাট বুকের ছাল উঠাই দিইছে, দুধ পেইছে নাই, খুন বিরায়, তাথেও। হেই গো ধামাই বুড়ি, অ ফুলমণি, তুরা কিছু বল, তুরাও ত মা বটিস্...

দ্বিগুণ রোষে চেঁচিয়ে উঠল তিলকা, অ্যাই নেত্য, হাঁ কইরে রগড় দেইখছিস রে চুহাড় ! ছিনে লে চুড়া, মাটিতে ফেইক্যে দে, বেইজ্জতের চুড়ায় তুর হক্ নাই, ইটোই আমার বিধান...

পেট চেপে ঝট্‌তি উঠে দাঁড়ায় বাইশা। একহাত পেটের পোঁটলায়, অন্য হাত রসুর হাতে। ভুঁয়ে-লটপটে কোমরের ছাইছ্যাদ্‌ড়া শাড়ি। নেত্য এগোয়। ঘোর অন্ধকারে বাইশার চোখ জ্বলে। হঠাৎ তীব্র চিৎকার তুলে দুহাতে চোখ ঢেকে নেত্য মাটিতে বসে

পড়ে, আর পাগলিনী-প্রায় বাইশা পড়িমড়ি ছুটতে থাকে অন্ধকারে। পেছনে রসুর ডাক বাজতে থাকে, মা... আ... আ... কুথায় যেছিস মা আন্ধারে...

চোখে আঙুলের তীক্ষ্ণ খোঁচা খেয়ে ছটফট করছিল নেত্য। তাকে ঘিরে মুর্গাডির হতভম্ব মাতব্বরসকল। এই ফাঁকে জন্মবুগ্‌ণ ছোট নুনাকে বগলদাবা করে সরে পড়ে নাদু অন্ধকারের আড়ালে।

আশ্চর্য, ক্ষিদে তৃষ্ণায় কাতর মানুষগুলোর মন থেকে এইমুহূর্তে উবে গেছে যাবতীয় ক্ষিধে ও তৃষ্ণাবোধ। যে অপরিসীম ক্লান্তিতে মিটিং শেষের মুহূর্ত অবধি যন্ত্রণায় ঝুঁকেছিল, তা এখন অন্তর্হিত। এক ক্ষিদে অতিক্রম করে ওরা অন্যতম ক্ষিদের দ্বারস্থ। নূতনতর এক উত্তেজনায় দিনমানের যাবতীয় ক্লান্তি-শ্রান্তি, আশা, আশাভঙ্গ কেটে গিয়ে নতুন নেশার সমীপবর্তী ওরা।

হাঁপাতে হাঁপাতে উদ্‌ভ্রান্ত বাইশা যখন আমবাগানের বিশাল মাঠ পেরিয়ে মিহিজাম হাটের বাঁধানো কুয়োচাতালে এসে দাঁড়াল আকাশে তখন তৃতীয়ার ডিংলো-ফালি চাঁদ। পেছন পেছন সেই এক সুরে, 'মা গো...কুথায় যেইছিস আন্ধারে'...

বাইশার ক্ষমতা ছিল না দাঁড়ায়। কুয়ো চাতালের ঠাণ্ডা শানে তার আধখোলা শরীর নেতিয়ে। আঁচলের একপ্রান্ত মরাঘাসে জোছ্‌না বিলায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাকে অনুসরণরত কান্নাঘামে ভেজা রসু ও ছোট নুনা-কাঁখে নাদু এসে দাঁড়ায়।

রসু আর থাকতে পারল না। মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে বলল, খিদায় প্যাট্ জ্বইলে যেইছে মা... চুড়া দে...উয়ারা ছিনাই লিলে খাব কী? চুড়া দে মা...

অন্তর্গতি কান্না দমন করে বাইশা বলে, শুখা চুড়া চিম্‌সা মুখে খেইতে লারবি বাছা, জিভে রগড়ি ছাল উইঠে যাবেক, জলে ভিজা কইরতে হবেক, টুকুন র'স বাছা...

রসু দেখল টলোমলো পায়ে বাইশা উঠে দাঁড়িয়ে কুঁয়োর জল কতটা নিচে তার হদিশ নিচ্ছে। কিন্তু দড়ি বালতি কই?

নাদু ঘর্ঘরে স্বরে বলল, বিনা জলেই চিবাই খা, দে প্যাটে পাক মাইরছে...

—নুনা দুটা পাইরবে? দ্যাখ্...কেমনে জলে ভিজাই...তুই উঠেনে যা...

কথা শেষ হতেই একটানে শাড়ি খুলে ফেলল বাইশা। অন্ধকারে পুত্রের সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক জননী চিঁড়ের গিঁটবাঁধা আঁচলখানি ছেড়ে যাচ্ছে কুঁয়োর গভীরে, ঝুঁকে, অন্যপ্রান্তে তার হাতে।

নাদু মাঝির কাশি উঠল প্রচণ্ড দমকে। বুকে হাত চেপে সে উবু হয়ে বসল ঘাসে। আর বাইশা, কুঁয়োর জলে শাড়ির প্রান্তে পোঁটলাবাঁধা চিঁড়ে যখন যথেষ্ট ভিজে নরম-ডাগর, ধীরে ধীরে টেনে তুলল সেই মহার্ঘ ধন।

পোঁটলা খুলতেই, ভাতফুলের আদলে ঝিকি দিল ভিজে টাপুর-টুপুর ফুটফুটে চিঁড়ে।

জন্মবুগ্‌ণ বাচ্চাটাকে চিঁড়ে চটকে মণ্ড মুখে পুরে দিতে-দিতে বাইশা কেঁদে ফেলল। আকাশে তখন তৃতীয়ার চাঁদ শাণানো কাস্তেসম। গাছের ডালের ফাঁক বেয়ে বাইশার মুখে আলো। সম্মুখে ভাতরঙ চিঁড়ে ও দুই পুত্রের আতঙ্কিত গোগ্রাস খাওয়ার মাঝে উলঙ্গ বাইশা।

দূরের অন্ধকারে কিছু মানুষের পদশব্দ ভেসে আসছে।

হাতের উল্টোপিঠে চোখের জল মুছে দৃঢ় স্বরে বাইশা বলল, খা নুনা, খা, কুনও ডর নাই। সাপের মাথা ছিঁচাই, বাঘের মুড়া চিবাই, মা হঁইয়েছি; ডর কিস্‌কে? খা...প্যাট ভইরে খা নুনা...

হস্তান্তর ॥ অমর মিত্র

বিবিজানের কথা ভাবতে ভাবতেই দুপুর গড়িয়ে সন্ধে নামে। দুই ভাই সকাল থেকে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। দলিলের খোঁজ নেই। দলিলের খোঁজে মনের ভিতরে বিবিজান ভাবির খোঁজ পড়ে। মতিন মিঞা তো দলিলের কথা ভাবে না, ভাবে বিবিজানের কথা। অথচ হারানো দলিল খুঁজতে গিয়েই না বিবিজানের কথা মনে পড়া।

আচ্ছা মিঞা জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ মতিন, তোর ঘরটা ভালভাবে দেকিচিস ?

মতিন আকাশের দিকে হাঁ করে বসেছিল। আচ্ছার কথা তার কানে গেল না। কখনো ভাবছিল বিবিজানের কথা, কখনো ভাবছিল আচ্ছা মিঞার শয়তানির কথা। গোলমালটা আচ্ছাই করছে কিনা তার ঠিক কী। এসবে তো তার নাম কম নয়। এক জমি দশজনকে দশবার গোপনে বেচে আসে। দলিলটা তো ও বেটাই লুকিয়ে রাখতে পারে।

মতিনের কাছ থেকে জবাব না পেয়ে আচ্ছা মিঞার সামনের দুটো হলদু হাঁত ভিতরে ঢুকে মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তাহলে শযতানিটা মতিনই করছে। ওর ঘরের কোথাও না কোথাও আছে। চালের বাতায় কিংবা পুরনো কলসিতে। দলিল লুকিয়ে জোচ্চুরি করার ধান্দা ! আর এসব তার মাথায় থাকতেই পারে। বেটা জুয়োর আড্ডায় বাঁশী বাজায়, চৌকি দেয় জুয়োর বোর্ড। বদবুদ্ধি ষোল আনা।

আচ্ছা মিঞা হেঁকে উঠল, ও মতিন কানে শুনতিচিস ?

মতিন চমকে গেল, এই শুনলাম।

—দলিলডা গেল কোথা ?

মতিন ভাবছিল আচ্ছা কতটা সরল কতটা কপট। দলিলের কথা তাকে জিজ্ঞেস করে। সত্যিই কি ও জানে না।

আচ্ছা মিঞা আর মতিন মিঞা পরস্পরকে জরিপ করছিল। ওদের চারপাশে কখন যে আঁধার ঘনায় তা খেয়াল হয় না কারোর। এমনিতে এখন বেলা ছোট, দুপুরটা কখন আসে আর কখন যে যায় বোঝা যায় না।

দুই ভাই উঠোনে বসেছিল। ওদের পিছনে বাঁশঝাড়ে এর মধ্যে ঝুপসি অন্ধকার নেমেছে। অন্ধকারের সঙ্গে বিনবিনে শীতও। বাঁশবাগান, বনবাদাড় একধারে রেখে দুই ভাইয়ের দুটো ধ্বস্ত কুঁড়ে ঘর। আজ সারাদিন দুই ভাই আঁতিপাতি করে দলিলটা খুঁজেছে। শেষে হাল ছেড়ে ঘরের বাইরে গালে হাত দিয়ে বসেছে। অথচ দলিলটা তো চাই। জমি বেচতেই হবে। বিবিজান ভাবির দলিল করে দেওয়া সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি না বেচলে এই অঘ্রান পৌষ যে আর কাটে না। বিবিজান দুইজনকে যে সম্পত্তি বেচে গিয়েছিল, সেই সম্পত্তিই বেচবে দুজনে।

—ভাবির সম্পত্তি কতডা হবে ? মতিন জিজ্ঞেস করল।

আচ্ছা মিঞা ভাবতে বসল। বিবিজান তাদের মৃত বড়ভাই কালু মণ্ডলের বিবি।

কালু মণ্ডলের মৃত্যুর পর কিছু সম্পত্তি তার বিবির কাছে বর্তায়। একেবারে ইসলামি ফরাজি নিয়মে। সেই সম্পত্তি বিবিজান এই দুইজনকে বেচে অন্য গাঁয়ে নিকে করে।

আচ্ছা মনে মনে হিসেব ক'রে ভাইকে বলে, হিসেব জানিনে, তবে কিনা বড়ভাইয়ের যা ছিল পেথমে, আমাদের দুজনেরও তা ছিল, মানে বাপের সম্পত্তি তো তিন ভাগ হয়েছিল, বুন ছিল না, মা মাটি নেছলো আগে।

হিসেব মতিনের মাথায় ঢোকে না। তবুও সে মাথা নাড়ে বিজ্ঞের মত! তার তুলনায় জমিজমা আচ্ছা বেশি বোঝে। বুঝবেই তো, মতিনের তো বোঝার কথা নয়। সে তো এতটা কাল গোলাবাড়ি হাটে হায়দর আলির জুয়োর বোর্ডের পাহারাদার হয়েই কাটিয়ে দিল। যেদিকে দেগঙ্গা, সেদিক থেকেই তো দারোগা পুলিসের মুখ দেখানোর কথা। পুলিসের গাড়ির মুখ কাচকলের বাঁক থেকে এদিকে ঘুরলেই মতিনের মুখে হুইস্‌ল বেজে ওঠে। পুলিস আসছে। হুইস্‌ল বাজলেই হায়দর আলি বোর্ড তুলে ভোঁ ভাঁ। মতিনের বাঁশী বাজলেই একটাকা। আর ভুল বাজালে আগের পাওনা থেকে আট আনা কাটা। হাটের দিন সতর্ক থাকতে হয় বেশি। বাস থেকেও নামতে পারে হাবিলদার কনস্টবল। সাদা পোশাকেও হাট করতে পারে দারোগাবাবুর পিয়ন। জুয়োর বোর্ড দেখলে পিয়নবাবুর উপরি আয় হয়। নতুবা সব সমেত থানায় চালান করার ব্যবস্থা করবে। বাঁশী বাজানো যার পেশা, সেই মতিন মিঞা জমির হিসেব বুঝবে কিভাবে?

এ বছর রোদে খরায় গেছে। পাতাল অবধি জল শুকিয়ে খাঁক হয়ে গেছে মাটির বুক। ধানের বদলে জমির খড় কেটে কদিন আগে ওরা বেচে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কি আর দিন চলে। এখন বেচতে হবে জমি।

হায়! অঘ্রান মাসে জমি বেচতে হয় একথা কি কেউ শুনেছো? দুই ভাইয়ের এতটা বয়স হলো, তবু এমন কাণ্ড কেউ করেনি কখনো। দশ কাঠার মত জমি দুই ভাইয়ের দখলে আছে। সে জমি কার দুই ভাই জানে না। যখন তখন জমি বেচেছে দুইজনে, এখন আবার বেচবে। তার জন্য চাই জমির দলিল। দাগ নম্বর, অংশ ভাগ দেখতে হবে। বিবিজান ভাবির কাছ থেকে যে সম্পত্তি কিনেছিল দুই ভাই, তা বিক্রি করবে!

আচ্ছা মিঞা বোঝাচ্ছিল, মতিন মিঞা ঘাড় দুলোচ্ছিল। ওদের মাথার উপরে শীত-পাখি তার অন্ধকার ডানা মেলে চরাচর আড়াল করছিল। শীতের ছোঁয়ায় দুজনে আর নড়ছিল না। আচ্ছা মিঞা তার গায়ের গামছা বেশ করে জড়ায়, আর মতিন তার আদ্দিকালের ছেঁড়া খদ্দরের চাদরে মুড়ি দিয়ে জবুথবু।

আচ্ছা ফিসফিসিয়ে বলল, যে জমিডা পড়ে আছে, তা বিবিজান ভাবির সম্পত্তি, ও ছাড়া আর নাই, সব বেচা হই গেছে।

মতিন ভাবছিল বড়ভাই কালু মণ্ডল এ্যাদ্দিনে নিশ্চয় মাটির নিচে মাটি হয়ে গেছে। তার বিবি ভিনগাঁয়ে ফের নিকে করেছে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি এই দুজনকে বিক্রি করে।

মতিন তার চাদরের ভিতর দিয়ে জুলজুলে চোখে ভাইকে দেখছিল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ভাবির কথা তোর মনে পড়ে আচ্ছা?

আচ্ছা অবাক হয়ে ভাইকে দ্যাখে। একথা কেন? ভাবির কথা মনে পড়বে কেন, মনে পড়ছে দলিলের কথা। জমি ছাড়া সে কিছু বোঝে না। এ ব্যাপারে তার মাথা খুব সাফ। মাদ্রাসায় যাতায়াত করেছিল কম বয়সে। আর মৌলবী সায়েবের পিয়নও হয়েছিল দু বছর। জুতো আর ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে হত। আচ্ছা ভাবল, এ কথা

মানে মতিনেব চালাকি। হচ্ছে দলিলেব কথা, এব ভিতবে ওসব কথা আসে কি ভাবে ? দলিল আব মেয়েমানুষ কি এক !

এ ভাবনা আচ্ছাব ভিতবে আসতেই তাব চোখেব মণি স্থিব হয়ে গেল। দু চোখে যেন বাবুদ ছুটতে লাগল। মুখগহ্ববে যে কটি দাঁত অবশিষ্ট আছে তা উপব-নিচ পবস্পবে ঘষে গেল। দুটো হাত নিসপিস কবতে লাগল। আচ্ছা ভাবল মতিন কথা ঘুবোচ্ছে, মানে দলিল ওব কাছে আছে।

সে হেঁকে উঠল, দ্যাখ মতি আমাবে ফাঁকি মাবতে যাসনে।

একথা শুনে মতিন লাফ দিয়ে ওঠে আব কি ! তাব সমস্ত দেহটা হঠাৎ যেন আগুন হয়ে উঠল। ফাঁকি মাবাব কথা ওঠে কিভাবে ? দাঁত কিডমিড কবে উঠল মতিন মিঞাব।

সে বলে উঠল, মিছে দোষ দিবিনে বলতিছি, বিচাব কবতি আমি হাযদব আলিবে লে আসপো !

আচ্ছা চিৎকাব কবে উঠল, লে আয তোব জুযোব পাটি, দলিলডা লুকোয বেকিচিস, বললি দোষ !

অন্ধকাবে দুজনে উঠে দাঁডিযেছে। মতিন লাফ দিযে আচ্ছাব দিকে তেডে গেছে। গলাবাজিতে কেউ কম যায না। এ বলে তুই চোব, ও বলে তুই চোব। দুটি একবকম মানুষ লাফ দিতে থাকে উঠোনেব শক্ত মাটিতে। একই বকম হাত-পা মুখ-চোখ আব মাথা।

আচ্ছা আব মতিন, দুই যমজ। এমনিতে চেনা দায। মতিনেব দাঁত নেই, আচ্ছাব গাযে গামছা। মতিনেব গাযে আদ্দিকালেব ছেঁডা চাদব, আচ্ছাব দেহটা একটু ন্যুব্জ।

দুই ঘব থেকে দুই বিবি দৌডে এল। সকাল থেকে এইবকম পবস্পবে দাঁত দেখানো যে কতবাব হল তাব ইযত্তা নেই।

দুই

কতকালেব কথা হবে। বছব হিসেব কবা দুই মিঞাব কাবো পক্ষেই সম্ভব নয। তা বডবন্যাব আগেব বছব তো বটে। বছব পাঁচেক কেটে গেছে। সেই সময দুই যমজেব বড ভাই পেটেব ভিতবে ঘা নিযে মাবা যায। হাসপাতাল অবধি নিযে যেতে হযনি, তাব আগেই শেষ।

কালু মিঞাব দেহ ছিল ছোটখাট। কিন্তু বড ভাই তো ! দুই যমজকে কী এক গোপন ছাযায ঢেকে বেখেছিল। পেটেব ব্যথায দুমডে-মুচডে যখন কালু তিনবাব থবথব কবে স্থিবচক্ষু হযে গেল, তখন বিবিজানেব কোলে এক বছবেব বাচ্চা। আব এই দুইজনেব দুই বিবিব পেটেও প্রথম সন্তান।

কালু মণ্ডল মবাব পবে মতিন একদিন ফিসফিস কবেছিল আচ্ছাব সঙ্গে, 'ভাবিবে বে কবতাম, কিন্তু আব এক দু বছব গেলি হত, এহন লয।'

আসলে প্রথম সন্তানেব আহ্লাদে মতিনেব তখন মাথা খাবাপ। কী কববে ঠিক কবতে পাবছে না। ক'দিন বাদেই তো সে বাপ হচ্ছে।

কালু মাটি নেযাব পব বিবিজান স্থিব নিশ্চল হযে ঘবে বসে থাকত। তাব বূপ ছিল দেখাব মত। তাবিফ কবাব মত। ঠিক যেন ইমানদাব ঘবেব বউ-বিবি। কালুব ভাগ্য বটে। যে কদিন বাঁচল এই বিবিব সঙ্গে কাটিযে গেল।

কালু মিঞা হলো বিবিজানেব দ্বিতীয পক্ষ। আগেব স্বামীকে মনে ধবেনি তাব।

কালুর যাতাযাত ছিল সেই বাড়ি। সেখানে বিবিজান নিঃঝুম হয়ে বসে থাকত। আজগার মণ্ডলের বউ-এর মনের ভিতরে ঢুকবে কে?

আজগার মণ্ডল, বিবিজানের প্রথম পক্ষ। সে ছিল কসাই। হাড়োয়ার নামকরা মানুষ লতিফ মণ্ডলের পিলখানার এক নম্বর ওস্তাদ। শেষ রাত থেকে গরু কাটত। আকাশ ফর্সা হতে না হতে গোটা তিনেক জবাই শেষ। আর তখন পিলখানার চারদিকে শকুন নামত। আজগার মণ্ডল শকুন পরিবৃত হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। দুপুর নাগাদ বিবিজানের সেই প্রথম পক্ষ ঘরে ফিরত লুঙিতে গরুর খুন মাখামাখি ক'রে। এ স্বামীর ঘরে বিবিজানের মন বসে কিভাবে?

না, আজগার মণ্ডলের বাচ্চা তার বিবি তখনো পেটে ধরেনি। বিবিজানের ভয় ছিল। কসাই নাকি নির্বংশ হয়। কসাইয়ের অঙ্গে অঙ্গে নাকি ভবিষ্যৎ কালে রোগ দেখা দেয়। চামড়া খসে খসে যায়। চোখ গলে যায়। সেই ভয়ে বিবিজান আজগার আলিকে ত্যাগ ক'রে চলে এল কালু মণ্ডলের ঘরে।

সেই আজগার আলি ছ'মাস পরে সত্যিই মাটি নিল। তিনদিনের জ্বরে শেষ। খবর এনেছিল মোতালের মিঞা। আজগার আলির এক স্যাঙাৎ।

মোতালের কালুকে এসে বলেছিল, আর ছড়া মাস যদি অপেক্ষা করত বিবিজান, তাহলি আজগার এর সম্পত্তির অংশ পেত, এখন সেই সম্পত্তি বারোভূতে লুটে খাচ্ছে।

কালু আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়েছে, উঁহু, কসাইয়ের সম্পত্তি ভোগের হত না, বিবিজান এ্যাদ্দিন ওর কাছে থাকলি বাঁচতিই পারত না।

কালু মণ্ডল মাটি নেযার পর বিবিজান নিশ্চুপ। চোখের জল ভিতরেই শুকিয়েছে বোধহয়। বেওয়া মেয়েমানুষের পায়ের শব্দও শোনা যায় না। নীরব চোখে কালুর গোরস্থানের দিকে চেয়ে থাকে বিবিজান। তারপর একদিন ওই পথেই আসতে দেখল মানুষজন। আনাগোনা শুরু হলো পুরুষ মানুষের।

বুদ্ধিটা আচ্ছা মিঞার, সে বলল, ভাবি তুই আবার নিকে কর, আর—।

আর কি? বিবিজানের চোখ আচ্ছা মিঞার চোখে।

—বড় ভাইয়ের যে সম্পত্তিডা পেয়েছিলি ওয়ারিশান হয়ে, তা ছেড়ে দে আমাদের দু ভাইরে, হ্যাঁ টাকা দেব।

মতিন কিন্তু আচ্ছার এই কথায় রুষ্ট হলো মনে মনে। বিবিজান ভাবি তার ঘরে এসে উঠুক, এই ছিল তার মনের কথা। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। ঘরে তার বিবির পেটে বাচ্চা, এখন কি নিকে সম্ভব? বড় ভাইয়ের বড় আদরের ছিল বিবিজান। জন্মেও সে ভাবেনি এমন বিবির সঙ্গে ঘর করা তার ভাগ্যে লেখা আছে, আর এমন বিবিকে ছেড়ে মাটি নিতে হবে অকালে। বিবিজানকে এই ভিটেতে রাখতে পারলে মাটির নিচে কালু মণ্ডলের বুক স্থির হবে।

আচ্ছার তখন ভবিষ্যতের ভাবনা। কম পয়সায় যদি ভাবির কাছ থেকে জমি পাওয়া যায় তো তাদের জমি বেড়ে যায়।

বিবিজান জলের দামে তার পাওয়া জমির ভাগ বিক্রি ক'রে দিল দলিল করে। দুই ভাই তা কিনল। সেই টাকা নিয়ে বিবিজান ঘর করতে গেল জীবনপুরে। এসেছিল মোতালের মণ্ডল, আজগার আলির পুরনো স্যাঙাৎ। সে নিয়ে গেল বিবিজানকে জীবনপুরে।

মতিন তার দাওয়ায় বসে দেখল ফাল্গুন মাসের ভোরে বিবিজান তার মেয়ে কোলে ক'রে মোতালেরের সঙ্গে যাচ্ছে ঘর করতে। তখন আমগাছে বোল এসেছে,

নিমগাছে ফুল। ভোরের সব সুবাস বিবিজানের পিছু পিছু হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে বিবিজান একবার পিছন ফিরল।

মোতালেবের এ ইচ্ছে অনেককালের। এই আশাতেই তো সে আজগার আলির ঘরে যেত। কিন্তু তখন হল না। কালু মণ্ডল নিয়ে চলে এল বিবিজানকে। কালু মাটি নেওয়ায় মোতালেবের আশা পূরণ হল।

তিন

রাতে আচ্ছা মিঞা ভাবল, ভাবি কি দলিল সঙ্গে নিয়ে গেল ?

মতিনও তাই ভাবছিল, ভাবি কি দলিল দিয়ে গেল না ?

আচ্ছা ডাকল, ও মতিন শোন।

মতিন বলল, আমিও ভাবতিছি তোরে ডাকপো।

দুই ভাইয়ে ভাবতে বসল। বিবিজান কি দলিল তাদের দিয়েছিল ! উঁহু, রেজিস্ট্রি করে আনার পর তো দলিলটা ভাবির কাছেই ছিল। আর তো চেয়ে নেয়া হয়নি।

চেয়ে নেয়া হয়নি বোধহয়। কিন্তু বিবিজান যখন কাজ করল মোতালেবের সঙ্গে, তখন তো দলিলটা দিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। জমি লোকে জমিতেই কেনে, কাগজে নয়। কাগজের দরকার না পড়লে খোঁজ হয় না বড়, বিশেষত যাদের জীবন জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দুই ভাই কথা বলে না। মতিনের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। দলিল কি বিবিজান নিয়ে গেছিল ? তাহলে কি সে ভেবেছিল মতিন যাবে দলিল আনতে ? মতিনের বুকটা হা হা করে ওঠে। চোখের সামনে গৌরবর্ণা পরীর মত বিবিজান বিবি ভেসে ওঠে। সে তো জানত মতিন তাকে নিকে করতে চায়। কিন্তু হল না। এমনিতেই হল না। শেষে মোতালেব এসে নিয়ে গেল তাকে। তখন তার না গিয়েও উপায় ছিল না। এই বয়সের মেয়েমানুষ কতদিন একা থাকবে ? আর মোতালেব তো খোঁজ রেখেছিল বিবিজানের। তক্কে তক্কে ছিল।

আজগার তালাক না দিলে, সেই ছ'মাস পরে আজগার মাটি নিলে বিবিজান তো মোতালেবের ঘরেই যেত। আজগার মরার আগে কালু মণ্ডল গিয়ে হাজির। আর কালু মাটি নেয়ার পর মোতালেব এল।

মতিনের মনে পড়ে সামনে যাচ্ছে আশমানি জোব্বা পরা মোতালেব মণ্ডল। দীর্ঘকায় শয়তানের মত পুরুষ। চোখ-মুখে ধূর্তামি। সে যেন আর এক কসাই। তার পিছনে ফুলের মত বিবিজান। কোলে এক বছরের বাচ্চা, যার বাপ কালু মণ্ডল, হাতে ঝুলছে পুঁটুলি। সেই পুঁটুলির ভিতরে কি দলিল ছিল ! যার আকর্ষণে মতিন গিয়ে হাজির হবে ভেবেছিল।

বিবিজান ভাবি ক বছর গেল ? মতিন জিজ্ঞেস করে।

—তা বছর পাঁচ তো হবে, ধর গে, আমার তোর ছাওয়াল দুটোর যত বয়স, তারা তো তখন ন মাস পেটে।

বাহ্ ! আচ্ছার মাথাটা সত্যিই সাফ। অক্লেশে হিসেব করে ফেলল। দেখতে দেখতে এতদিন কেটে গেছে ! মতিনের মনে হয় হায়দর আলির জুয়ার বোর্ড পাহারা দিয়ে সে বড় ভুলটা করেছে। না হলে তো দলিল খুঁজতে খুঁজতে বিবিজানের ওখানেই হাজির হতে পারত।

মতিন বিড়বিড় করল, জমিতো বেচতি হবে।

বিষণ্ণ আচ্ছা বলল, না বেচলি খাব কি, বেচতিই হবে।
মতিন বলল, তাহলি তো ভাবির কাছে যেতি হয়।
আচ্ছা ঘাড় কাত করল, যেতে তো হবেই।

চার

জীবনপুর কোথায় ? না সেই বিদ্যেধরী নদী পার হয়ে দক্ষিণে। বিদ্যেধরীর এপারে হাড়োয়া, ওপারেও হাড়োয়া। যেন দুই যমজ।

হাড়োয়ায় ছিল আজগার আলির বাস। সেখান থেকে অন্তত মাইল আটেক ডাউনে জীবনপুর। নদী পথে যাওয়া যায়, নদী আড়াআড়ি পার হয়ে পায়ে হেঁটেও।

ভোর ভোর দুই যমজ বেরিয়েছে। একরকম মুখ, একরকম চোখ। শুধু মতিনের লুঙির উপরে খাকি শার্ট, গায়ে সেই ছেঁড়াফাটা চাদর। আর আচ্ছার গায়ে কোঁচকানো গোলাপী পাঞ্জাবি, রঙ তার ধুয়ে গেছে। কাঁধে চেককাটা গামছা। দুই ভাই যাচ্ছে দলিল আনতে। না আনলে এ বছর খরায় শুকিয়ে মরতে হবে।

এই ভোরে যেন কুয়াশা দখল করে ফেলেছে গোটা পৃথিবী। মতিন এগোয় তো আচ্ছা ওকে যেন কুয়াশায় হারিয়ে ফেলে! আর আচ্ছা তো সর্বক্ষণই মতিনের মনে হারিয়ে আছে। কুয়াশায় মতিন যেন বিবিজানের মুখমণ্ডল ধরার চেষ্টায় আছে। সেই চোখ সেই মুখ যেন হারিয়ে না যায়।

আবছা নীল কুয়াশায় ওরা দুজন ভিজে যায়। সমস্ত দেহটা কেমন স্যাঁতসেতে হয়ে যায়! মতিন দেখছিল কুয়াশার নীল আর ধূসরতায় মেশামেশি রঙ যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠছে। ওরা এসে পৌঁছয় দেবালয়ে। এখান থেকে পিচঢালা রাস্তা সোজা বিদ্যেধরী নদীর গায়ে পীরগোরাচাঁদের মাজারে গিয়ে শেষ হয়েছে।

পথে মতিন একবার জিজ্ঞেস করে, মোতালেব মিঞার ঘর জানিস তো ?

—মৌজায় গে জিজ্ঞেস করলি হবে।

বাস বন্ধ। ওরা দুই ভাই ভ্যান রিকশায় উঠে বসল। কুয়াশায় সামনেটা পরিষ্কার দেখালেও দু হাত দূরে ধূসর নীল পর্দা। দুই যমজ বোঝে তারা বারে বারে আবছা নীল থেকে নীলচে ধূসরে ঢুকে পড়ছে। জোরে ছুটছে তিন চাকার ভ্যান রিকশা।

মতিন ভাবছিল, কতক্ষণে পৌঁছবে জীবনপুর, বিবিজান খুব অবাক হবে। আচ্ছা ভাবছিল, কতক্ষণে হাতে আসবে সেই দলিল।

দুই যমজ শীতের ঘায়ে কাঁপছিল। কুঁকড়ে যাচ্ছিল দুজনে। কাঁপতে কাঁপতে মনের ভিতর বিবিজান আর দলিলের খেলা খেলতে খেলতে ওরা এসে পৌঁছয় বিদ্যেধরীর কোলে। মতিন মিঞা অবাক হয়ে দেখল এখানে কুয়াশা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। রোদ ছড়িয়ে পড়ছে নদী আর পৃথিবীর উপর। অঘ্রানের প্রথম রোদ যেন গলন্ত সোনা। সোনার জলের পুকুর। তার ভিতরে পাখিরা সাঁতরাচ্ছে অকাতরে।

এখানেই দেরি হয়ে যায়। নৌকো ছিল না। নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করে বেলা বেড়ে ওঠে। তখনই আবার নদীতে জোয়ার ঢুকল। জোয়ারে ডাউনে যাওয়া কষ্ট। মতিন হাঁটতে চেয়েছিল। নদীবাঁধ ধরে হেঁটে, জীবনপুরের ঘাটে পার হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না।

নদীপথে, স্রোতের বিরুদ্ধে জীবনপুরে পৌঁছতে সূর্য আকাশের মাথা থেকে নামার উদ্যোগ করেছে। মতিনের বুক কাঁপছিল। সে আর সময় নষ্ট করতে চাইছিল না। জীবনের অনেকটা সময় হারিয়ে গেছে। জীবনপুরে পা দিয়ে আর দেরি করা নয়। সে কি জানত,

বিবিজান দলিল নিয়ে জীবনপুরে এসে তাকে গোপনে এতকাল ধরে ডেকেছে।

নৌকো থেকে নেমে আচ্ছা জিজ্ঞেস করল, ও মতিন ভাত পাওয়া যাবে এখেনে ?

মতিন যেন সব জানে। যেন মতিনের ঘরে মতিন ফেরে। সে হেসে বলল, কি করে জানব ওকি আর আমার ঘর ?

দুই যমজে একসঙ্গে হাসল। ক্ষিদে চেপে থাকার অভ্যেস আছে দুজনেরই। সকালে পান্তা খেয়ে বেরিয়েছে! সন্ধে অবধি চলে যাবে।

দুপা এগিয়ে দুজনে ধরল এক চাষাকে, মোতালেব মিঞার ঘর জান ?

লোকটা কাটা ধান বোঝাই করছিল একা একা। অতবড় নিঃঝুম প্রকৃতিতে তার চারদিকে আর কোন মানুষ নেই। সে চমকে যায় এদের দেখে। চোখে ভুল দেখছে না তো। একটা মানুষ কি ডবল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে!

আস্তে আস্তে তার বিস্ময় কাটে। সে বোঝে, না দুজনই দাঁড়িয়ে। দুটোই একরকম, শুধু জামা কাপড়ে যা তফাত। সে খুঁটিয়ে ওদের দেখে জিজ্ঞেস করে, কোন মোতালেব ?

কোন মোতালেব! বিপদে পড়ে যায় দুই ভাই। মোতালেবের বাপের নাম তো জানে না। তাহলে কি পরিচয় দেবে ?

আচ্ছা বলল, হাড়োয়ায় এক কসাই ছেল, আজগার আলি, তার স্যাঙাৎ।

মতিন বলল, তেনার বিবি হলো বিবিজান, সেই বিবিজান যে আজগার আলির বিবি ছেল পেত্থমে, তারপর হয় আমার বড় ভাই কালুর...।

আর পরিচয় দিতে হয় না। লোকটি মাথা দুলোতে লাগল। মাথা দুলোতে দুলোতে মতিনকে জানায়, বুঝতি পেরেছি, এখেন থেকে সিধে হেঁটে যাও, অশখতলা পাবা, তা থেকে বাঁ দিকি ঘোর, সামনেই মোতালেব মিঞার ভিটে।

দুই ভাই তখন প্রায় দৌড়য় আর কী! নদীকে পিছনে ফেলে দুই ভাই রোদ ছেড়ে ছায়াময়তায় প্রবেশ করে। অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ভীষণ অন্ধকার, যেন গাছের জন্মইস্তক এ মাটিতে রোদ পড়েনি।

এই ছায়ায় দাঁড়িয়ে দুজনের হঠাৎ যেন শীত লাগল। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে। মতিনের বুক টিপটিপ করতে লাগল। সে বুকের বাঁদিকে হাত চাপা দেয়। দুজনে একসঙ্গে দেখতে পেল মাটির ভিটে বাড়িটা।

বড় অগোছালো। উঠোনে খাবলা খাবলা মাটি তোলা। গোবরছড়া কতকাল পড়েনি বোঝা যায় না। চালের খড়ও এলোমেলো। কোণের ক্ষেতে অবহেলায় বোনা মুসুরি আর সর্ষে সবুজে হলুদে একাকার হয়ে পড়ে আছে! উঠোনের একধারে ধানের স্তূপ, তাও যেন বড় এলোমেলো, অস্থির।

আচ্ছা ভাবল, জমি থাকতেও এ লোকটা তার মর্যাদা বোঝে না। তার যদি এমন জমি থাকত, রাখতে পারত যদি জমি, সর্ষেয় রঙের বাহার দেখিয়ে দিত। জমি বেচে বেচে চাষবাস ভুলে যাচ্ছে সে!

আচ্ছা মিঞা হেঁকে উঠল, বিবিজান ভাবি, বিবিজান!

মতিন যেন দম আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

আচ্ছা আবার হাঁক দিল, মোতালেব ভাই।

একটা শীর্ণকায় মানুষ তখন মাথায় করে ধানের বোঝা এনে উঠোনে রাখছিল। ওদের আসার ফাঁকে সে ছিল ভিটের পিছনের জমিতে। সে মোতালেব মণ্ডল।

মোতালেব ক্ষেত থেকে উঠোনে আসার পথে দূর থেকে দেখছিল দুটো মানুষ পায়চারি করছে তার সর্ষে ক্ষেতের সামনে। সে উঠোনে ধানের বোঝাটা ফেলে গামছা দিয়ে গায়ের খড় ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে আসে।

আই বাপ! দুজনে যে একরকম। তার মানে! মোতালেব হাঁ করে নিরীক্ষণ করতে থাকে দুই যমজকে।

আর আচ্ছা মতিন দুজনে দেখছিল, রোগা ডিগডিগে, এ যে দেখি তালপাতার সেপাই। দুটো চোখ কোন গহ্বরে সেঁধিয়ে গেছে। চোখের মণি বোঝা যায়, দেখা যায় না। এই বয়সেই চুল-দাড়ি সব পেকে সাদা। একটু বাঁকা বাঁশের মত হয়ে গেছে লোকটা। যখন হেঁটে আসছিল এদিকে ওর বুকের ভিতরের সব কলকব্জা যেন কাঁপছিল। বুকটা দপদপ করে উঠছে নামছে। হাড়ের উপর চামড়া যেন ফেটে যায় যায়।

—কেডা? চিনতে না পেরে মোতালেব ওদের সামনে এসেছে।

দুই যমজ অবাক! সেই মোতালেব! মস্ত চেহারার, প্রায় শয়তানের মত পুরুষ, গায়ে ছিল নীল আশমানি পাঞ্জাবি, সেই মানুষে আর এই মানুষে যে মেলে না একেবারে। দুই যমজে যেমন মিল, দুই মোতালেবে তেমনি অমিল।

—চিনতি পারছো, ভাবির আগের পক্ষ কালু মিঞার দুই ভাই মোরা।

আচ্ছা মিঞার কথায় মোতালেব হঠাৎ যেন শক্ত হয়ে ওঠে। সে বসে পড়ল উঠোনে। গায়ে গামছা জড়ায়। তার চোখমুখে কেমন নিস্পৃহের ভাব। সে জিজ্ঞেস করে, তা হঠাৎ, বেপার কি?

—ভাবির কাছে দরকার, মানে এটডা দলিল, ভাবিরে ডাক দিনি।

মোতালেব আচ্ছা মিঞার কথা কিছু শোনে কিছু শোনে না। মতিন ততক্ষণে এগিয়ে গেছে, 'তুমার এরম চেহারা হলো কী ভাবে মোতালেব ভাই, এক্কেবারে ভেঙে গেছো দেখতিছি।'

মোতালেব অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ম্যালেরিয়া জ্বর ধরেছে সেই বৈশেখ মাস থেকে, বছর ঘুরতি গেল, জ্বর আসে আর ছাড়ে, এই এখন যেন আবার কাঁপুনি আসতেছে, এই রোগেই খেয়েছে আমারে।

মতিন তার গায়ের চাদর ফেলে দিল মোতালেবের গায়ে। চেপে ধরল জীর্ণশীর্ণ দেহটিকে। মোতালেব থরথর করছিল।

আচ্ছা বলল, মিঞা ঘরে ঢোক, ক্ষেতে লোক আছে তো?

মতিন বলল, না হয় আমরা দেখতিছি, কোন জমি দেখায় দ্যাও।

মোতালেব আস্তে আস্তে বলল, ভিটের ঠিক পেছনে।

তখন মতিন প্রায় ফিসফিসিয়ে বুক ভার করে বলল, ভাবিরি এটটু ডাকো, পানি খাব, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মোতালেব মাথা নামিয়ে কাঁপছিল জ্বরে। সেই অবস্থাতেই ধুঁকতে ধুঁকতে বলল, বিবিজানের খোঁজে তো এয়েচো, আরও মানুষ এয়েছিল, তা সে তো নেই।

—নেই! মতিন যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

—তালাক হয়ে গেছে, ফের নিকে করেছে ও।

মতিন বসে পড়ল। ওর পাশে মোতালেব হাসফাঁস করতে থাকে। আচ্ছা ছুটল মোতালেবের ক্ষেতের দিকে।

মতিন একটু পরে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, কবে হলো তালাক?

—তা বছর ঘুরতি চলল পেরায়, গেল বৈশেখে, যবে রোগে ধরল আমারে।

—বিবিজানের তালাক দে দিলে মোতালেব ভাই! মতিনের কণ্ঠস্বরে হতাশা। মোতালেব অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর ধুঁকতে ধুঁকতে বলে, আমি কী দেছি তালাক, বিবির রূপ যেন ফেটি পড়ছিল, অমন মেয়েছেলে ঘরে রাখাই দায়, কালু মিঞার এটডা, আর আমার দুটো বাচ্চা লে সে পাটকেলঘাটার মাজারুল হকের কাছে গেছে, হক সায়েব, ইমানদার, জমিঅলা মানুষ! তারে নে গেল পেরায়, বিবিজানেরে সে দেখিল হাড়োয়ার মেলায়।

ওরা রাতে থেকে যায়। মোতালেবের ঘরে এখনো নতুন বিবি আসেনি। সব ধূধূ পড়ে আছে। ঘর গেরস্থালি ভাঙাচোরা। শীতে তিনজনে ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়। সন্ধেবেলা আচ্ছা মিঞা তাদের আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তার কথা শুনে জ্বোরো মোতালেব লাফ দিয়ে ওঠে। তাই তো! সে যে দুবিঘা জমি দানপত্র হেবানামা করে দিয়েছিল বিবিজানকে। সে দলিল কোথায়? বিবি তালাক হয়ে গেলে তো আর সেই বিবিকে জমি দেবে না মোতালেব।

খোঁজ খোঁজ! খুঁজে পাওয়া যায় না দলিল। গাভর্তি জ্বর নিয়ে মোতালেব বাক্স-পেঁটরা উপুড় করে দেয়। দলিল নেই।

তখন মতিন বলে, লে গেছে বিবিজান, দলিল আনতি হয়ত তুমি যাবা, তাই ভেবেছেলো।

মোতালেব মুখ ঢেকে বসে থাকে, কোনরকমে বলে, হবে হয়ত, জ্বরের কাঁপুনিতি মাথার ঠিক ছেল না আমার!

পাঁচ

রাতে দুই যমজে ঠিক করল পাটকেলঘাটা যেতে হবে। তখন জ্বোরো মোতালেবও ধরে বসল ওদের, আমারেও নে যেতি হবে।

কিন্তু তুমার যে ধুম জ্বর, আচ্ছা বলল।

সহালে থাকপে না।

রাতে মতিনের দুচোখের পাতা এক হয় না। সে ভাবছিল গত চৈত্র বা বৈশাখে আসতে পারলে সে নিয়ে যেতে পারত বিবিজানকে। এখন যেতে হয় মাজারুল হকের ওখানে। আরো অপেক্ষার দিন এল।

শেষ রাতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল মোতালেবের। সকালে গা ঠাণ্ডা। সে ঘরে তালা দিয়ে সঙ্গ নিল দুই যমজের। দুর্বল শরীর টলেমলে হাঁটে। যেতে যেতে মোতালেব বলল, বিবিজানের যে মন বসে না কারো ঘরে।

আচ্ছা মিঞা ভাবে দলিলটা পেয়ে কবে জমি বিক্রি করে দেবে! মাটি তাদের কপালে নেই। আজ কিনলে কাল বেচতে হয়। বড়মানুষ কিনে নেয়।

মতিন জিজ্ঞেস করল, পাটকেলঘাটা পৌঁছতি কি সূয্যি ডুবে যাবে?

মোতালেব ঘাড় কাত করল, জে, সে তো অনেক দূর, যখন পৌঁছব, বেলা আর থাকপে না।

হাঁটতে হাঁটতে মোতালেব মণ্ডল হঠাৎ দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গো, তুমাদ্দের ভেতর কোনডা কেডা?

মানে? মতিন দাঁড়িয়েছে।

—আচ্ছা মিঞা কেডা?

আচ্ছা সরে এসে বুকে হাত দিয়ে বলে, এই আমি।

—তুমার কথা খুব বলত বিবিজান।

মতিনের বুক একা একা ভেঙে যায়। মাথাটা ঝুলে পড়ে। এ কী বলছে মোতালেব মিঞা! সত্যি! বিবিজান কি জানত তাদের কোনটা আচ্ছা কোনটা মতিন। তাকেই তো ভুল করে ক'দিন আচ্ছা বলে ডেকেছিল না! সে বিষণ্ণ হয়ে হাঁটতে থাকে, চোখমুখ কালো হয়ে গেছে। পা যেন আর এগোতে চাইছে না পাটকেলঘাটার দিকে।

তিন মানুষে হাঁটছে। দুই পাশে দুই যমজ আর মধ্যিখানে হাড়জিরে মোতালেব। বিবিজানের ঘর আর কতদূর! তার কাছে যে গচ্ছিত রয়েছে নানা মানুষজনের নানা সম্পদ। চাষার জমি চাষার হৃদয়। সেই খোঁজে দুজন থেকে তিনজন, তিন থেকে চার, এমনি করে গাঁ উজাড় পাড়ি।
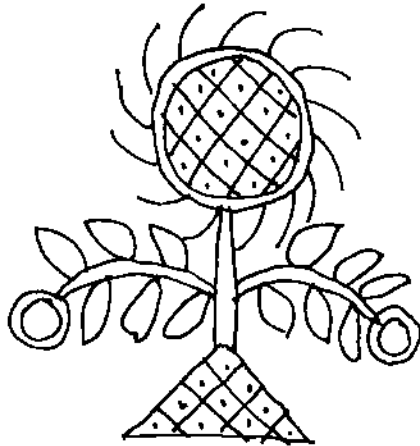
বর্ণপরিচয় ॥ বীরেন শাসমল

আজ বাচ্চাদের হাতে খড়ি দেওয়ার দিন, হয়তো সে কারণেই, পরিচিত মানুষজন অন্তত তাই ভাবব—কাকভোরে উঠে পড়েছেন তায়েব মাস্টার, কিন্তু না, খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছেন তিনি, এই আবছা আমানীরঙা ভোরে, সাদা-কালোর কাজ করা জটিল ব্রহ্মাণ্ড নকশায়, গত কয়েকদিন কানাঘুষা আর ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলি ঢুকে পড়ে গভীর দুর্বোধ্য আকার নেয়, রাতচর মনুষ্যমূর্তিরা হাঁসুয়া হাতে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, ষড়যন্ত্রী হাওয়ার সাথে কীসব ফিসফিস করে, পাস্‌নী শোর্ড, রাম-দা হিসহিস করে হাওয়া কাটে, আকাশে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কারা যেন একটি একটি নক্ষত্র ছিঁড়ে ফেলে, তারপর লতাগুল্ম ঘাস মাটি দ'লে ঘরবাড়ি মানুষজনের বুক কাঁপিয়ে দিয়ে হিম হাসি হাসতে হাসতে চলে যায় কোথায়—যেখানে তাঁর বোধি পৌঁছোয় না, অনুমানও, পরিবর্তে তাঁর কাছে পৌঁছে যায় একুশটি তাজা মৃতদেহের ছবি, একটি ইঁদুরকলের মিনিয়েচার এবং ছেঁড়া-ফাটা একটি মানচিত্র—

এবং এসব নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে, বা বলা যায় বিগত কয়েকশো বছর ধরে চিন্তান্বিত আছেন তায়েব মাস্টার, এসময়ে প্রায়শই মানুষজন সতর্ক করে দিয়ে যায়—হাওয়া খারাপ, সতর্ক থাকুন—কিন্তু কাঁহাতক গর্তের ভেতর চুপচাপ বসে থাকা যায় ভেবে তিনি হাওয়ার গতি বুঝতে চেষ্টা করেন, তাঁর বোধির দরজায় ঘা পড়ে,

এবং এমনই এক উৎকণ্ঠায়

তিনি দুচোখ এক করতে পারেন না, এই যেমন কাল রাতে জানালার ফাঁক দিয়ে তিনি যতোটুকু আকাশ দেখেছিলেন, তাতে তাঁর হাজার বছরের নিদ্রাহীনতা হয়েছিল, দেখেছিলেন আকাশের গভীর তলদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত ইফরিতের দীর্ঘ ছায়া, তারাগুলি ভয়ে মিজ্‌মিজ্ করে জ্বলছে, বেহেস্ত-এর উদ্যান থেকে তাঁর হৃদয় পর্যন্ত প্রসারিত নূর-এর আশ্চর্য আলো খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু ঠিক এসময়ে বৃষের কাঁধের মতো অন্ধকারের ঢিবিগুলি তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ায়, এবং বিপন্ন তায়েব মাস্টার

এই আহত ভোরবেলায় তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে, দেখেন হাঁসুয়ার মতো একখণ্ড অন্ধকার ঘন হচ্ছে ঠিক তাঁর মাথার ওপরে, প্রথমে তা ছিল অজগর সাপের কুণ্ডলীপাকানো দেহের মতো, পরে সেটি কুণ্ডলী খোলে, লম্বা হতে হতে সারা আকাশ ঘিরে ফেলে, ফুঁসতে থাকে, মাস্টারের গায়ে যেন তার নিঃশ্বাস এসে লাগে, মাস্টার অস্বস্তি বোধ করেন, ঘামতে থাকেন এমনভাবে যেন তাঁর অনেকদিন ধরে গভীর কোন অসুখ করেছে, এখন এই নির্বান্ধব আবাসে তিনি একা, তিনি ঘাম মুছতে থাকেন এমনভাবে যেন গোপন কোন রক্তের ধারা হাত দিয়ে মুছে ফেলছেন, বলতে চেষ্টা করেন—আল্লাহ নূরোস সামাওয়াতে—হে আল্লাহ্ তুমি দ্যুলোক ভূলোকের জ্যোতিস্বরূপ, কিন্তু তাঁর গলা কাঠ হয়ে যায়, তাঁর সামনে অন্ধকারের গলাবন্ধ পরে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু কবন্ধ, জনমানবশূন্য মাইল প্রান্তরের সীমায় দোজখ্—যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় একটি

বন্ধ ট্রেনেব কামবা থেকে, তাযেব মাস্টাবেব বুকে অসহ্য বেদনা, তাঁব দুনিযা গুটিযে ছোট হযে আসে, তাযেব মাস্টাব হঠাৎ মনসংযোগ হাবিযে ফেলেন, যেন তিনি জীবনেব কেন্দ্রভূমি থেকে বিক্ষিপ্ত, মনুষ্য পবিচয হাবিযে কোথাও তলিযে যাচ্ছেন, অদ্ভুত এক ধবনেব বিপন্নতায তাঁব গলায খেদোক্তি জমে, তিনি ঠায দাঁড়িযে অর্থহীন বিড়বিড় কবেন, যেন চলে গেছেন স্মৃতিমগ্ন নিকট অতীতে, নিকট মানে এই দুদিন আগেব, তিনি সেই হতভম্ব দর্শক হযে দাঁড়িযে আছেন পানাপুকুবেব পাড়ে, সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি তিনি দেখেছিলেন পুকুব পাড় ধবে মাঠে বেবোতে গিযে, এই আধা গ্রাম আধা শহবে এখনো বযে গেছে মজা পুকুব, পানা জমাট বেঁধে আছে যেন চড়া পড়ে গেছে মানুষেব হৃদযে, পানাব ওপব গজিযেছে আগাছাব জঙ্গল, ঘাস, আব সেই পানাব ফাঁকে কুণ্ঠিত অন্ধকাবে জেগে আছে একটি মাথা, খেযাল কবে দেখতে গিযে মনে হল হাঁ মানুষেবই মাথা এবং একজন তাজা যুবকেব, তাযেব মাস্টাব হকচকিযে গিযে ভযে খানিক সবে এসেছিলেন,

আবাব কিসেব টানে যেন কাছে গিযে দাঁড়িযেছিলেন, খুব কাছে তখন দুটি ভয পাওযা চোখ, কেমন অসহ্য বিপন্ন আলো সে চোখে, যেন অনেকদিন, অনেকযুগ সে চোখে ঘুম আসেনি, নিদ্রাহীনতাব বেদনাটি স্পষ্ট, তাযেব মাস্টাব দেখলেন তা অস্তিত্বেব বেদনাও বটে, পচাপানায নিজেকে অর্ধেক পুঁতে বেখে সেই মনুষ্যমূর্তি একজন মানুষেব দিকে তাকিযে কী ভিক্ষা কবছিল কে জানে, মাস্টাব ভাবলেন তিনি কী দেবেন, কী দিতে পাবেন, প্রাণ দিতে কি তিনি পাববেন প্রাণ ফিবিযে দেওযাব জন্য, এসব সংশয সেই মুহূর্তে তাঁকে গ্রাস কবে ফেলেছিল, তবু,

তিনি তাকে চুপিচুপি উঠে আসতে বলেছিলেন জল থেকে, চাবদিকে সতর্ক চোখেব কথা একবাব ভেবেওছিলেন, মানুষেব চলাফেবা ক্ষিপ্র, ভযার্ত, এখানে ওখানে অশ্লীল উত্তেজনায কেউ কেউ দাঁত বাজাচ্ছিল, তবু,

সেই আর্ত মানবকে তিনি উঠে আসতে সাহায্য কবেছিলেন কেননা ঠিক তাব পবেই দিনেব আলো ফুটে উঠবে, আলো ফুটলে বিকৃত উৎসব শুবু হবে, যুবকটিব মাথা আস্ত থাকবে না, মাস্টাবেব মনে হল আপাতত সে বলিব জন্য নির্দিষ্ট সেই ছাগল যে দড়ি ছিঁড়ে পালিযে এসেছে, কিন্তু লুকোবে কোন খোঁদড়ে, এমন ছাগলেব বেঁচে থাকা উচিত কিনা, ঘাড় উঁচু কবে মনুষ্যসমাজে ফিবে যাওযা উচিত কিনা ইত্যাদি ছোটখাটো ভাবনায হঠাৎই বহুদিন আগেব পড়া একটি গল্পেব কথা মনে কবে বসলেন, মানুষ পশু হযে গেলে পশু নাকি মানুষ হিসেবে গণ্য হয যেমনভাবে বমেশ সেনেব 'সাদা ঘোড়াটি' হযেছিল এবং মনুষ্যক্রোধেব মর্যাদা দিতে দু'টুকবো হযে বাস্তায পড়েছিল, তাযেব মাস্টাব সেই দু'টুকবো হওযাব দৃশ্যটি ভাবতে ভাবতে সেই যুবককে বাতে নিজেব বাড়িতে আশ্রয দিলেন, সাবাবাত জেগে জেগে পাহাবা দিলেন, আব তখনই তাঁব নিজেকেও মনে হল সেই বিপন্ন যুবকেব মতো, তিনিও এই আগাছা আব পানাভর্তি মনুষ্য জঙ্গলে শিকাব হযে যাওযাব ভযে পচা পানাপুকুবে ডুবে আত্মবক্ষা কবছেন, অথচ নিজেকে পানাপুকুব থেকে না তুললে আশ্রয পাওযা কঠিন, পাঁকে দাঁড়িযে থাকলে আব কোথাও যাওযা যাবে না অথচ যেতে তাঁকে হবেই, বাচ্চাগুলিকে আনতে যেতে হবে, ভযে থেমে থাকলে চলবে না, বাচ্চাগুলি আসবে, না আসবে না, অথচ বাচ্চাগুলোব আজ তাঁব কাছে আসাব কথা ছিল, এলো না কেন ভেবে তাযেব মাস্টাব চোখ বন্ধ কবে দেখেন বাচ্চাগুলো দাঁড়িযে আছে বন্ধ ট্রেনটাব ওপাবে,

আবাব বাচ্চাদেব মুখ ভেসে ওঠে, তিনি তাঁব হৃদযজুড়ে তাদেব দেখতে পান,

কী এক ঘোরে বলে ফেলেন, কী সুন্দর এইসব শিশুরা, কিন্তু এই সৌন্দর্য সুষমা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, বারবার ফিরে আসে বন্ধ ট্রেনের কামরা তখন তিনি দার্শনিক হয়ে পড়েন, না-না করলেও লোকে শোনে না,

তিনি রিটায়ার করেছেন তবু তাঁকে এরা রিটায়ার্ড থাকতে দেবে না, আর তাঁরও হয়েছে যতো জ্বালা, অদৃশ্য সুতোর টানে তাঁকে বারবার ফিরতে হয় তাদেরই কাছে, অক্ষরগুলি দিব্যতায় জ্বলে, অক্ষর মানেই তো সেই নূর-এর বাতি, বাতি জ্বললে খুলে যায় অন্ধকারের দুয়ার, যে অন্ধকার তাড়াতে মানুষ সেই গুহাযুগ থেকে ভাবনাচিন্তা করেছে, কবে রাত্রি প্রভাত হবে এই আশায় ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে আগুনের কাছে শিশুদেরও তো সেই মানবের আদিরূপ হিসেবে দেখতে হবে, নজরুল হয়তো একথা ভেবে মাত্র দুটি কথায় হাজার কথার ছল রাখলেন ভোর হল দোর খোল খোকাখুকু ওঠরে—ওপারে অক্ষর—জগৎ জানার চাবিকাঠি, এপারে তমস, মহারাত্রি, অন্ধকারে মানুষ অন্ধ, ওপারে আহ্বান ওঠে ; ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ, মুনিঋষিনবীদের সেই গভীর মন্ত্রোচ্চারণ—হে তিমিরবিনাশী জ্ঞান, তুমি মূর্ত হও—তায়েব মাস্টারও খড়ি ছোঁয়াতে যাবার আগে সেই জ্ঞানকে আহ্বান জানান, হে তিমিরবিনাশী জ্ঞান তুমি রূপ নাও গোল, চৌকো, তেকোণা এই অক্ষর চিহ্নগুলিতে, তাৎপর্যময় এই মহাবিশ্বকে প্রকাশিত কর—

এমনই পরিচিত ধ্যানমগ্নতায়

তায়েব মাস্টার আবার মা-পাখি হন, অক্ষর খুঁটে তুলে ধরেন বাচ্চাগুলির ঠোঁটে, তারা কিচমিচ করে ডাকে, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পাখিগুলি রব করে, কাননে কুসুমকলিরা একে একে সবাই ফুটে যায়, দিগন্তে, আকাশ পর্দার পেছনে, বোধির গভীরে সঞ্চিত আলোকঝর্ণায় দেবশিশুরা গান গায়, কিন্তু হঠাৎই তারা মিলিয়ে যায় কোথায় তাদের সামনে তেড়ে আসা অজগরটি নিঃশ্বাস ছাড়ে, বর্ণমালাগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে ভাগ হয়ে যায়, দস্যুরা তাদের লুঠ করে নেয়, দু'দলে ভাগ করে নেয়, তখন তারা পরস্পরে খামচাখামচি করে,

বিদ্যাসাগরের 'জল' আর 'পানি' দুটির আলাদা মানে হয়, আকাশ থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে বারি ঝরে, জল পড়ে বটে কিন্তু তাতে গাছের পাতাগুলি নড়ে না, বরং গাছগুলিকেও দেখায় ক্লান্ত, কালিমাখা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তারা গা জড়াজড়ি করে রুদ্ধশ্বাস দাঁড়িয়ে থাকে, দূরে কালিমাখা সেই ট্রেনের আদল চোখে পড়ে, উত্তেজিত মানুষজন পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, সশস্ত্র, কে বা কারা ট্রেনের পেছন দিকের ভ্যাকুয়াম পাইপ কেটে দেয়, অন্ধকারে কারুর গলা শোনা যায় বল্ শালা, 'জল' না 'পানি' 'কৃষ্ণ' না 'আল্লা', এমন কুৎসিত আদেশে তায়েব মাস্টার উৎকণ্ঠিত হন, যেমন বহুবার হয়েছেন, শব্দ সত্য মিথ্যায় পরিচিত করে নিজেকে, এবং এটিই মিথ্যের সত্য হয়, প্রাণের ভয়ে আল্লাহ্ হন কৃষ্ণ, জল হয়ে যায় পানি, তখন কারুর দেশ গাঁ জন্মস্থান থাকে না, ধু ধু মরুতে আঁধি ওঠে, জীবনভূমি যেখান থেকে দূরে, বহুদূরে মরুতে দুরতিক্রমী রাত্রি নামে, ভয়ার্ত এক নারী অন্ধকারে তাকে যেন শুধায়—এরা কারা, উত্তরে কেউ কেউ বিকৃত হাসিতে নৈঃশব্দ ছিঁড়ে ফেলে, বলে, এরা আর কোনদিন আল্লাহের নাম উচ্চারণ করতে পারবে না, তায়েব মাস্টার তাঁর প্রিয় অক্ষরগুলির দিকে তাকান, তারা যেন আতঙ্কে পাণ্ডুর, তায়েব মাস্টার ধীরে উচ্চারণ করেন, হে ভগবান দানবদের হাত থেকে তুমি অক্ষরগুলিকে রক্ষা কর, কিন্তু

দুঃস্বপ্নের ডানা আকাশ ছেয়ে ফেলে, তাঁর চারপাশে বিষাদ জমে, বায়ুস্তর ভারী

হয়ে ওঠে, ধীরে মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ে সে বিষাদ, তাঁর চশমার কাচ ভাঙে, ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি, গভীর হৃদয়দেশে বহুদিনের লুকনো এ্যালবামটির পাতা খুলে যায়, অপ্রতিহত একটি মুখ মনে পড়ে, মনে পড়ে এবং তাঁকে কষ্ট দেয়, যেন এই এসে সে দাঁড়ালো সামনে, তীব্র অব্যর্থ যুক্তিব তিরন্দাজ ছিল সে, তাঁর মুখ ফালাফালা হয় যন্ত্রণায়, কিন্তু পরাজিত সে মুখ তিনি আব দেখাবেন না তাই না দেখাবার কষ্টে কষ্ট করেও পথে বেরোন

বেরিয়েই হকচকিয়ে যান, ভোরের শুদ্ধ হাওয়াযও শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাঁর, নাকে গন্ধ পান কিছু পচছে, গন্ধের উৎস ধবতে পাবেন না, ভাবেন একি তাঁর নিজের ভেতরে, এই ভেবে মাস্টাব বিব্রত, দু'পাশে আবছা গাছপালার তলায় কি কোন সরীসৃপ হেঁটে যায়, এই আলোছায়ার খেলায়, তীব্র পচনগন্ধ নিযে বাতাস বয়ে যায, মাস্টার চোখ বোজেন, আর তখনই

একটি মৃতদেহ, অতি পরিচিত মৃতদেহটি চোখে পড়ে, নাকি একটি ইমান একটি স্থির বিশ্বাস যার মুখোমুখি হতে পারেন না তিনি, কোথাও আশ্রয় খোঁজেন, কোথায় আশ্রয়—এ প্রশ্নে বিশ্বচরাচর খুঁজতে লেগে যান, এবং

আপাত গ্রাহ্য পূর্বাপর ঘটনাসম্বন্ধ

তাঁর মানে একটি শৃঙ্খল তৈরি করে, খবরের কাগজ হাতে কিছুক্ষণ তিনি অর্থহীন ফ্যাকাশে চোখে বসে থাকেন, সর্বশেষ সংবাদসূত্রে ক্রমপ্রকাশ্য মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় একুশ-এ, অনেক মানুষ স্বভাবতই নিখোঁজ থেকে যায়, যেমন চিরকাল থাকে, সরকারি ভাষ্যে অপ্রয়োজনীয় এই মৃত্যুর জন্য স্বভাবতই কোন বেদনা থাকে না, হতাহতের সংখ্যার সমর্থনে বড জোর কৃত্রিম বিবৃতি যান্ত্রিক নিযমে ছাপা হযে যায, অক্ষরের আগুন থিতিয়ে এলে পড়ে থাকে অনুভবের ছাই

এইসব ছড়ানো মৃতদেহের ভূগোল টপকে যান তিনি, কেননা এ ভাবেই যেতে হয় পথে, আবার সেই পচন গন্ধে তাঁর শরীর ভূখণ্ড বিষিযে ওঠে, এখানে শিশুরা বাঁচতে পারে না, শ্বাস নিতে পারে না, গন্ধের উৎস খোঁজেন তিনি, খোঁজেন কোথায় সেই গলিত মৃতদেহটি রয়েছে কিন্তু তাঁর চারপাশের লোকজনের কোন বিকার থাকে না, তারা বলে ঝুড়ি ঝুড়ি ব্যাঙ পচেছে, অথচ তাযেব মাস্টার ঘুরে বেড়ান পাট খেতে, না হৃদয়ের খেতে, সেখানে নাকি অনেক দিনের দুর্গন্ধ জমে আছে, সে দুর্গন্ধ কেউ কি কোনদিন সাফ করবে না,

তায়েব মাস্টার হঠাৎ সেই প্রিয় মুখটিকে আবার দেখতে পান, যেন সে দাঁড়িয়ে আছে, কাছে, ডাকছে, এসো—এবং এই আহ্বানের সাথে সাথে তাঁর হৃদয়ের রুদ্ধ স্রোত খুলে যায়, ধর্ম শিকারিরা শরীয়ত বিরোধী পৌত্তলিক বলে যে মুখ শিকার করেছিল আজ থেকে দশবছর আগের কোন এক রাতে, পবিত্র ইসলামকে সে নাকি বিপন্ন করে তুলেছিল, মোল্লা মৌলবীদের বলেছিল অচল আধুলি, বলেছিল এরা সব শূন্যমার্গে শূন্যের খিদমতগার, জ্ঞান নিয়ে এরা মিথ্যে রহস্যলোকে লুকায়, অথচ জ্ঞান কখনোই রহস্যাবৃত থাকতে পারে না, আল্লাহের নূর-এর মতো জ্ঞান যতো রহস্য কুহেলী সাফ করে দেয়, এইসব মৌলবীরা যখন আল্লাহকে রহস্যে ঢেকে রেখে সাধারণ মানুষগুলিকে বোকা বানায় তখন এরা আল্লাহের দিকে থেকে উল্টো পথে হাঁটে ইত্যাদি ইত্যাদি চোখা অস্ত্র নিযে সেই ছেলেটি হাঁটছিল মুক্ত সূর্যের দিকে অথচ মোল্লারা তাকে খেয়ে ফেললো, তার রক্ত এই পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়েছিল, এপথে তার রক্তের দাগ ছিল,

এমন চিন্তায় তাঁর ভেতরেই গোবিন্দমাণিক্য বলে ওঠে, এত রক্ত কেন জয়সিংহ—

সে রক্ত সোপান শ্রেণীর ধাপগুলি বেয়ে তাঁর হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখন একে একে ভয়ঙ্কর সব উন্মোচনের দৃশ্য—হৃৎপিণ্ডের কাটা দাগগুলি দগদগে জ্বলুনিতে ছেয়ে দেয় শারীরবৃত্ত, একে একে দৃশ্যগুলি ভিড় করে—সাতচল্লিশের লাহোর কিম্বা অমৃতসরের বন্ধ ট্রেনের কামরা, রক্তের তীব্র গন্ধ, আরো আগের সেই উনিশশো ছাব্বিশের রক্তধারা এসে মর্মমূলে ঢুকে পড়ে, তায়েব মাস্টার লণ্ডভণ্ড হয়ে ছেঁচল্লিশের নোয়াখালিতে উপস্থিত হন, খোদা আর ঈশ্বরের কাজিয়া বা একতরফা খোদার প্রবল ধর্মযুদ্ধ দেখতে দেখতে তিনি খুঁজতে থাকেন মানুষের জন্য পাক বাসভূমি,

কিন্তু তাঁর মনে হয় তাঁর নিজের জন্য কোন শহর বা গাঁ নেই, থাকলেও যেন সে শহর সে গাঁয়ের মানুষজনকে তিনি চেনেন না বা তাঁরা তাকে চেনে না, তায়েব মাস্টার এই তথাকথিত মনুষ্যবাস থেকে অনেক দূরে, কোন মরুর বুকে বসে দূরের কাফেলার দিকে চেয়ে থাকেন, কালো বিন্দুর মতো দূরে বহু দূরে তা দেখা যায় কিন্তু কোন সময়ে তা কাছে আসে না, যা এমনও হতে পারে কাফেলা তাঁর মতো আর্ত মানুষকে ফেলে এগিয়ে গেছে, সেখান থেকে হৃতসর্বস্ব মুসাফিরের মতন তিনি মানবকেই ডাকেন, কিন্তু কেউ শোনে না সে ডাক, তিনি বাচ্চাগুলিকে ডাকেন, বাচ্চারা আসে না, শুধু হাওয়া ধেয়ে আসে, পাশের কোথাও কোন জনপদে বহুদিন ধরে আগুন লেগেছে, আগুনের চক্রান্ত লেগেছে আরো বহুদিন আগে থেকে, কিছু মানুষ তায় বৃথাই জল ঢেলে যাচ্ছে, ভেতরে, একেবারে ভেতরে সেই আগুন জ্বলছে অবিনাশী, আগুন ধেয়ে আসে, লোমকূপে উত্তেজনায় চাপ পড়ে, তারিখগুলি ওলোট-পালোট হয়, ক্যালেন্ডারের পাতা ছিঁড়ে পড়ে, তারিখগুলি গাদাগাদি লাশ নিয়ে দগ্ধ হয়, এবং এই অবিনাশী আগুন নিয়ে তায়েব মাস্টার বসে থাকেন গুম হয়ে, আচ্ছা কতোকাল তিনি এভাবে বসে আছেন—এমন চিত্রে, কৃষণ চন্দরের 'অমৃতসর' গল্পের নানীও পাথর হয়ে বসে থাকেন তাঁর তৃষ্ণার্ত কচি নাতিকে নিয়ে, কামরায় রাত্রি নামলে রক্তের গভীরতা বাড়ে, সহৃদয় তেমন কোন মানবপুত্র রক্তের বদলে রক্ত খাওয়াতে চাইলেও তিনি নড়েন না, বেলা বাড়ে, প্রখর রোদ আর মেঘলা আকাশের জটিল গুড়গুড় বেড়ে যায়, সেই কচি বাচ্চাটির প্রোফাইল বড় হতে হতে তাঁর চারপাশ জুড়ে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে জল চায়, কিন্তু তিনি জল দিতে পারেন না, তখন তাঁর সেই প্রিয় মুখটি কাছে এগিয়ে আসে, কিন্তু আবার সেই চিন্তা তাঁকে আক্রমণ করে, বাচ্চাগুলো এখনো এলো না কেন-- তবে কি ওরা আসবে না, তবে কি

ওদেরও মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেছে অনতিক্রমী দিওয়ার, এমন সব সম্ভাব্য সূত্র ধরে প্রশ্ন করতে করতে তিনি ব্যথা অনুভব করেন, ব্যথাটা পাক দিয়ে ওঠে, নিদানকালে নাড়ি খুঁজে-না-পাওয়া ডাক্তারের মতো মুখটি তাঁর, আজ চারপাশের এই ছোট্ট শহরটাকে অবিশ্বাসী মনে হয়, তিনি শহরকে কেমন নির্মম বিষণ্ণ উত্তেজিত দেখেন, তখন আবার সে দানবের লুণ্ঠন শুরু হয়ে যায় তাঁর আকাশে, তারা আবার বর্ণগুলিকে ভাগ করতে লেগে যায়, ভেদচিহ্নগুলিকে স্পষ্ট করে তোলে, যেগুলি পছন্দ নয় সেগুলিকে নির্বিচারে তছনছ করে যায়, নিচে পথে পথে কিছু নিরীহ মানুষ হতভম্বের মতো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খুন হয়ে যায়,

তায়েব মাস্টার হায় হায় করে ওঠেন, চিৎকার করে বলেন, আপনারা শুনুন পূজা ধ্যান সমাধির সাথে কালিমা নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত-এর কোন মৌলিক প্রভেদ নেই, কিন্তু কেউ শোনে না তাঁর কথা, তিনি সুরা ফাতেহা থেকে আবৃত্তি করেন, ইন্না, ল্লাহা রাব্বী ও আরব্বুকুম ফা-রোদু হো আজা সেরাতুম মুস্তাকিম, শুনুন আপনারা--

পরমেশ্বর আমাদের সবারই মুস্তাকিম—তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহী ধিয়ো যোন প্রচোদয়াৎ—আমি ধ্যান করি তাঁর আলো, সেই নূর, তিনিই আমাদের মহাবিশ্বের চালনকর্তা, তাঁকেই ধ্যান করি, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে সত্য এবং মঙ্গলের দিকে চালিত করুন,

কিন্তু কেউ কান দেয় না তাঁর কথায়, তাঁর চোখ জ্বালা করে ওঠে, আবার সেই পচনের গন্ধ পান তিনি, যেন দোজখ্-এর রন্ধ্রপথ দিয়ে ধেয়ে আসা না-পাক দুর্গন্ধ বাতাস দূষিত করে রেখেছে,

তায়েব উৎকণ্ঠায় পথের দিকে চেয়ে বসে থাকেন, খবরের কাগজের হরফগুলি ছিটকে পড়ে পথে, প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এটি একতরফা খুন, যার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সমূহ ভাষা পায় খণ্ডবিখণ্ড মনুষ্যজটলায়, প্রক্ষিপ্ত তপ্ত আলোচনায়, তিনি বোঝেন এখনো কসাইদের উৎসবের রেশ কাটেনি, এখনো পরস্পর বিরোধী মন্তব্য উত্তাল রাখে হাওয়া, গলির ভেতরে, চায়ের দোকানে মনুষ্যভাষা খুবই সতর্ক, হাওয়া ক্রমশই নাকি খারাপ হচ্ছে,

সারা শহরে শুধু ফিসফাস,

মাস্টার নেমে আসেন দরজার কাছে, তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে উত্তেজিত জনতার একটি ছোট্ট দল চলে যায়, তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেন তাঁকে দেখে তাদের কথাবার্তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, তারা খানিক হতভম্ব, তবু কষ্ট করে কেউ একজন বাধ্য হাসিটি মেলে ধরে, কিন্তু সে হাসিতে কোন প্রাণ থাকে না, তায়েব মাস্টার বিস্মিত, ঠোঁটের ডগায় কুশল-জিজ্ঞাসার সামান্য ইচ্ছা জেগে মিলিয়ে যায় তাঁর,

আর এমনই সময়ে বুড়ো চক্রবর্তীকে আসতে দেখা যায় কতকগুলি শিশুকে নিয়ে, তারা কলকল করে আসে, তায়েব মাস্টারের ভেতরের অক্ষরগুলো হুটোপাটি শুরু করে দেয়, আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলেন তিনি কিন্তু,

মাস্টারের কান্না থেমে যায়, তিনি দেখেন রাস্তায় উত্তেজনা, জনা-দশ বারো লোক হাত-পা নেড়ে চক্রবর্তীকে কী সব বোঝাচ্ছে, বারণ করছে নাকি, না ভয় দেখাচ্ছে এখান থেকে ঠিক বোঝা গেল না, চক্রবর্তী রীতিমত উত্তেজিত, মাস্টার ভাবলেন শেষ হয়ে গেল, কিন্তু না, চক্রবর্তীকে দেখা গেল শিশুদের নিয়ে তাঁর বাড়ির দিকেই আসতে, আমুদে চক্রবর্তী দূর থেকেই ডাক দেন, মৌলবী সাহেব—থুড়ি মাস্টারসাহেব—নাও এগুলিকে আমি তোমার হাতেই দিলাম, আচ্ছা করে বিদ্যে দিয়ে দাও, এমন কষে বাঁধবে যাতে সরস্বতীর হাত থেকে কিছুতেই পালাতে না পারে, একথা বলে চক্রবর্তী সহাস্য তাকান, মাস্টার কিন্তু ম্লান হাসেন, সাদা দাড়ির ভেতরে সে হাসি বিকশিত হয় না,

চক্রবর্তী বলেন, ধর্মযুদ্ধের রেশ কাটেনি, আজও আবার ছোটাছুটি, চারদিক থমথমে, গত ক'দিনের খোয়ারি কাটেনি, ধর্মের গলায় ছুরি চালিয়ে সব ধার্মিক হয়েছে, গুণ্ডা মস্তান লোচ্চা সব তেলক কেটে ভগবানের ষাঁড়, এতদিন একসাথে বাস করে এলাম আজ এরা শিং দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভগবানের সৃষ্টিকেই দেশ ছাড়া করে দেবে, কী মাস্টার হাসছো না যে, বলে চক্রবর্তী তাকান তাঁর দিকে, শিশুগুলি কিচমিচ করে, মাস্টারের নিজের হাতে লাগানো রজনীগন্ধার ডগা দোল খায়, বাইরে কোথাও একটি আহত কোকিল ডেকে ডেকে কাঁদে, কাকগুলি খা খা করে উড়ে যায়, মেঘেরা দলবেঁধে হামলাবাজদের মতো জড়ো হয় মাথার ওপরে, চক্রবর্তী মাথার ওপরে অকারণে যেন তাকান, আকাশের অবস্থা ভালো না, বুঝলে মাস্টার, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে আজ, বড্ড ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি, এতদিনের পুরনো একটা ব্যাপার ভুলি কী করে, ও হাঁ,

ভুলে গেলে চলবে না আজ তোমার নেমন্তন্ন আমার বাড়িতে, তবে একলা যেও না আজ, আমি লোক পাঠাবো, একলা কোনমতেই যাবে না, আরে তোমার ভয় নেই, চক্রবর্তী বেঁচে থাকতে, হ্যাঁ তবে বলি শোন. এত বছর পরে আজ প্রথম আমাকে একটু ঝামেলায় পড়তে হল বুঝলে, বলা যায় ছেলেদের সাথে লড়তে হল, মাস্টার আমরা বোধহয় পুরনো হযে পড়ছি, এরা নাকি আধুনিক, আচ্ছা আধুনিকতা আর অসহিষ্ণুতা কি এক, যাক্‌গে—

মাস্টার, চক্রবর্তী একটু থামলেন, চুপিচুপি তোমায় বলি, আজ কিন্তু তোমার সামনে আসতে আমার লজ্জা করছিল, হয়তো আমি আমি বলেই, আমাদের এ পাপের কি কোন ক্ষমা হতে পারে, আচ্ছা মাস্টার শব্দের কি কোন সম্প্রদায় হতে পারে আমার জানতে ইচ্ছে করে কে এমন সব নাম চালু করেছিল কে এগুলিকে সমর্থন কবেছিল, বহুবার, সেই আগে যখন কংগ্রেস করেছি তখন থেকেই আমি এর বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছি—এই যে হিন্দুস্তান পাকিস্তান--

মাস্টার এবার হাসেন, শিশুদের শেলেটে দাগ টানতে টানতে বলেন, শব্দকে আমরা শত্রু করেছি, বর্ণকে ব্যবহারের পাপে অপবিত্র করেছি, দেখ, 'হিন্দুস্তান' কথাটার বিপরীতে শত্রুর মতো দাঁড় করানো হল পাক-ই-স্তান, কিন্তু 'পাক' কথাটার মানে কী—পবিত্র, পবিত্রতার কোন্ জাত, কোন্ সম্প্রদায, পবিত্রতার উল্টোদিকে হিন্দুই বা কোন্ অপবিত্রতা, না-পাক—কী অদ্ভুত আমাদের জ্ঞানের মহিমা বল, যে শব্দটি পাক সেটিকেই ব্যবহারের গুণে আরা না-পাক করে ফেলেছি, আবার দেখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম দিযেছি, আলিগড মুসলিম ইউনিভার্সিটি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, হিন্দু কলেজ, আমাদের কোন ক্ষমা হতে পারে না, এমন কথোপকথনের ফাঁকেই তায়েব মাস্টার কাজে লেগে যান, ক্রমেই তিনি গুরু হয়ে ওঠেন, তাঁর চিত্ত উন্মোচিত হয এবার যেন বুকের ভেতরে নিজের ছেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পান, সেই ছেলে তাঁকে বলেছিল, কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছো বেহেস্ত্-এর নূর, তোমার হৃদয়ের মধ্যেই তাঁর নিদর্শনমালা, তুমি কি তাঁকে দেখতে পাও না, দেখ তোমার গ্রীবাস্থিত ধমনীর আরো কাছে দেখ, তোমার ইমান নিয়ে তুমি লোকযাত্রায যাও, অলৌকিকের পেছনে সময় নষ্ট কোর না, পবিত্র জলবে তুমি যেমন জান কুরবানি দিতে পারো, পবিত্র জ্ঞানের দীপ জ্বালাতে তেমনিই নিজেকে কুরবানি দাও—তবেই হবে তোমাব ইরফান, প্রকৃত জ্ঞানলাভ, তুমি জীবনকে নতুন করে দেখার জন্য সাধনা কর, জীবনকে জেনেই তবে জীবনের সাথে মিলতে পারবে তুমি, এই তোমার ফনা ফিল্লাহ. বক্‌কা বিল্‌লাহ, এখানে তোমার বলতে আর কিছুই থাকবে না, এই দুনিয়াই আল্লাহ্‌ময়, তুমি এই পবিত্র গযবে বিশ্বাস স্থাপন কর, দেখবে পৃথিবী জুড়ে নূরের বাতি জ্বলছে, তুমি পৃথিবীতে যাও, বাতিগুলিতে তেল ভরে দাও,

মাস্টার বাচ্চাদের যত্ন করে গোলাকৃতিতে বসান, চোখ বন্ধ করে পবিত্র মনে আল্লাহের নাম উচ্চারণ করেন, প্রত্যেকের শেলেটে প্রথমে লেখেন এলাহিভরসা, শেলেট নিজের মাথায় ছোঁয়ান, তারপর লেখাটি মুছে দিয়ে বলেন, বাবাজি, ঐটি ছিল আমার, এবার লেখেন শ্রীশ্রীহরি, শ্রীদুর্গাশরণম, ওঁ সরস্বত্যৈঃ নমো নমহ,—এগুলি বাবা তোমাদের, বলেই শেলেট ছোঁয়ান তাদের মাথায, খড়িশুদ্ধ হাত মাথায ছোঁয়ান, খড়ি তুলে দেন হাতে, চক্রবর্তীর দিকে ফিরে বলেন, কী সুন্দর কল্পনা বল, শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পশোভিতা, অক্ষর ফুটিয়ে তোলেন শেলেটে, অদ্ভুত আলো নেমে আসে তাঁর মুখমণ্ডলে, মাস্টার বাচ্চাদের কচি কচি হাতে খড়ি ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, চক্রবর্তী, মনসামঙ্গল পড়া আছে তোমাব, চক্রবর্তী কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কপালে ভাঁজ পড়েছে

তাঁর, কোথাও সংশয়ের কীট ঢুকে পড়েছে নিজেরই ভেতরে, এ পরিস্থিতিতে বাচ্চাগুলিকে নিয়ে এসে তিনি কি খুব ভুল করে ফেললেন নাকি, তাঁরই বা ভয় কী, লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি নিশ্চয়ই একেবারে লোপ-পেয়ে যায়নি, চক্রবর্তী মাথা নাড়েন, কেন জানি তাঁর চোখ পড়ে থাকে রাস্তায়, দিনের বেলায়ও মাস্টারের উঠোন লাগোয়া কাঠের দরজাটির দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন, মাস্টার আবৃত্তি করে শোনান,

শুভদিন পাইয়া করাইল কর্ণভেদ,
রাজনীতি শেখাইল জানাইল বেদ ॥
শুভদিনে লক্ষীন্দরের বিদ্যা আরম্ভিল
নানা বিদ্যায় লক্ষীন্দর বস্ত্রতুল্য হইল ॥

বিজয়গুপ্তের লেখা, বুঝলে, আর তোমাদের বিপ্রদাস পিপিলাইও কী লিখেছে শোন, শেখাইর হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে, তারপর বলেছে,

ক খ গ ঘ ঙ পড়ি হরষ অন্তরে
চৌত্রিশ অক্ষর পড়ে কালা লক্ষীন্দরে ।।

কর্ণভেদ তো উঠেই গেছে কী বলো, উঠে যাওয়াই উচিত, কানফোড়ানো বড়ো নিষ্ঠুর আচার, চক্রবর্তী বলেন, ঠিক কথা, ওগুলি মধ্যযুগের ব্যাপার, আমরা অন্তত সেই তুলনায় আধুনিককালের মানুষ—কিন্তু তা বলে ইংলিশ মিডিয়ামে আমার রুচি নেই ভাই, একখান অক্ষরকে পাঁচখান ভেঙে শেখায় আমার এই বাবা শেলেটেই আস্থা বেশি, আমার পুরো অক্ষরটি চাই, আরে এরা সব বিদ্যের দোকানি বুঝলে, একটাকেও সামাজিক মানুষ তৈরি করে না,

মাস্টার গম্ভীর, হৃদয়দেশ থেকে স্বর তুলে এনে বাচ্চাদের বলেন, বল—অ—অ—অক্ষরটি নানান কাকলিতে ভরিয়ে দেয় চারদিক, অদ্ভুত সঙ্গীত ধ্বনি ছড়িয়ে যায়, মাস্টার ধীরে ধীরে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে থাকেন অক্ষরের সাথে, যেন অন্ধকার রাতে অভিজ্ঞ মানুষের মতো তিনি শিশুদের দেখিয়ে দিচ্ছেন পা ফেলবার নির্ভরতম জায়গা,

চক্রবর্তী দেখতে থাকেন মাস্টারকে, তাঁর চোখে শ্রদ্ধবোধ চিকচিক করে,

মাস্টার গোঁড়ামিহীন মোসলমান, ভালো হাফেজ, খোতবা পড়েন ভালো, লম্বা মুলাজাৎ করেন নির্ভুল উচ্চারণে, কিন্তু কখনো কোনসময়ে নিজেকে আমিন-উল মিল্লৎ বা ধর্মরক্ষক মনে করেন না, বেনামাজীদের বেদ গীতা ধর্মশাস্ত্র থেকে অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন সাচ্চা হিন্দুর ছেলেরা যারা হেগেল মার্ক্স আওড়ায় অথচ নিজেদের দর্শন বা ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানটুকুও রাখে না, তাদেরকে অনায়াসে হিন্দুদর্শনের কথা বলে যান, ব্যাখ্যা করেন,—

মাস্টার বলেন, তোমার মনে আছে, চক্রবর্তী, ছেলেবেলায় সেই বুড়ো মুসলমান ফকির মস্ত বড় মাটির প্রদীপ হাতে মুশকিল আসান বলে হাজির হয়েছেন তোমাদের বাড়িতে—চক্রবর্তী ছিনিয়ে নেন কথা, আর আমার মা সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল হিন্দুরমণী হয়েও তাঁর প্রদীপে তেল ঢেলে দিচ্ছেন, পয়সা দিচ্ছেন, দেখ এগুলি সবই হল সম্প্রীতির চিহ্ন, প্রতীক, বলেই তিনি শিশুদের কপালে অক্ষয় বিদ্যার্জনের আশীর্বাদী টিপ এঁকে দিলেন, তাঁর মন প্রসন্নতায় ভরে গেল, কিন্তু এসময়ে, অপ্রসন্ন ঝাঁঝালো হাওয়া বইলো, আবার ক্রিয়াশীল সেই পচনগন্ধ,

বাইরের উচ্ছৃঙ্খল শব্দসমূহ ঝাঁপ দিয়ে আসে, বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়, মাস্টার দেখেন তাঁর বুলবুলিরা কেমন ভয় পেয়ে গান থামিয়ে দিয়েছে, মাস্টার মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, হে ভগবান, এইসব শিশুদের আলোর পথে চালনা কর, সেরাতুম

মুস্তাকিম-এ মতি হোক এদের, এরা এখন আঁতুড়ঘরে অক্ষরের ওম মাখছে, সঠিক রোদ্দুরে এদের তুমি লালন কর এই অক্ষরগুলি দিয়ে যে শব্দব্রহ্ম গড়ে উঠবে, সেই ব্রহ্ম একদিন এদের কলুষমুক্ত করুক, শব্দ থেকে শব্দান্তরে, শাখায় প্রশাখায়, সভ্যতার নানান দিকের অগ্রগমনে এরা পথ খুঁজে চলুক,

মাস্টার চক্রবর্তীর দিকে তাকান, আবার তাঁর চোখে তাঁর প্রিয় মৃতদেহটি ভাসে, কেন এভাবে এসময় তাঁকে বারবার বিক্ষত করে তা তিনি ঠিক এই সময়ে বুঝতে পারেন না, তবু শান্তভাবে চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করেন, ঝুম্‌লী মা কেমন আছে, ঝুম্‌লী চক্রবর্তীর ছোট মেয়ে, ঝুম্‌লীর একটি গল্প আছে, সে গল্পের সাথে তাঁর প্রিয় মৃতদেহটির একটি যোগসূত্র আছে, অথচ সেই গল্পটি গল্প পেরিয়ে জীবনে প্রবেশ করতে পারেনি, অসম্পূর্ণ সেই গল্পের দুটি চরিত্রের মাঝখানেও ছিল অনতিক্রমী দিওয়ার, তাই ঝুম্‌লী আর রশীদের পেছনে দুদিকে দুই বুড়ো নীরবে বসে থাকলেন, যেমন থাকেন, ঝুম্‌লী-রশীদের গল্পটি তাঁদের মুখের রেখায় লেখা হয় এভাবে,

ঝুম্‌লীর মুখ, টলটলে দুটি চোখে মুক্তোবিন্দু, বিষাদ সিন্ধুর জয়নাব যেন বা, ঝুম্‌লী আজও মাস্টারকে চিঠি লেখে, অধুনা অনেকদিন যদিও তিনি চিঠি পাননি, ঝুম্‌লী আজও রশীদের একটি ছবি লুকিয়ে রাখে, বিয়ে হয়ে যাওয়া ঝুম্‌লী আজও একটি নির্দিষ্ট দিনে স্বামীর দিকে পেছন ফিরে কাঁদে, সে কেন কাঁদে মাস্টার বোঝেন, এই ঝুম্‌লী-রশীদকে ঘিরে এ শহর তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল একদিন, ভয়ঙ্কর দাঙ্গার প্রেক্ষিতে দুইবুড়ো সবচেয়ে নির্মম কাজটি করেছিলেন, ঝুম্‌লী এখনো সেই গভীর দিঘির মতো, তার তল খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা, সেখানে রশীদের জন্য হয়তো কিছু বর্ণমালা লুকনো আছে, তারা লুকনোই থাকবে হয়তো, সভ্যতার ইতিহাসে এমন অনেক কিছুই লুকনো থাকবে, এখনো যেমন ঝুম্‌লীর কাছে লুকনো আছে একটি ফাউন্টেন পেন, একটি গানের খাতা আর একটি দর্শনের বই যা তার জন্মদিনে সর্বশেষ উপহার ছিল, এই চিন্তা ক্রিয়াশীল দুই মুখের ওপরে,

বাইরের এলোমেলো চিৎকার আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ গুজবে দোকানপাট যেমন দুদ্দাড় বন্ধ হয়ে যায়, তেমনিই সামনের রাস্তার অনেকদূর পর্যন্ত বাড়িঘরের দরজা জানালা বন্ধ হতে লাগলো, চক্রবর্তী এসময়ে গভীর চিন্তিত, পথে বেরিয়ে যেতে চাইলেন, মাস্টার আটকালেন, হেসে বললেন, বিপদকালে পৃথক হতে নেই, বলে হো হো করে হাসলেন, আরা দুজনে কী বলে, ওই যে আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে চড়ুইভাতি করছি, তাই না, মাস্টার নিজেও চিন্তিত, অনেক কষ্টে বললেন এবার দেখ তোমাদের বেদ বলেছে, মনুষ্যে নহুষো বি-জাতাঃ, সকল মানুষ এক নহুষের সন্তান, কোরআনও দেখ একই কথার প্রতিধ্বনি করেছে, সমস্ত মানুষ এক জাতি, কান্না ন্নাসো উম্মাতান ও আহেদাতান, ধর্মে বলপ্রয়োগের কোন স্থান নেই, লা একরাহা ফীদদানে, আর আমাদের সবার বিদ্যাসাগর কী বললেন ঐক্য-বাক্য-মানিক্য—মাস্টার বাচ্চাগুলিকে বলেন, তোমরা সব ঐক্যে বড়ো হও,

বাচ্চাগুলি অক্ষরের ওপর ঝুঁকে আসে, মনোযোগ দিয়ে খড়ি ঘোরায়, কেউ ভাঙা ভাঙা ছড়া বলতে চেষ্টা করে, কেউ নতুন জামার ওপরের নকশা ফুল বা ফুটবলের ছাপানো ছবিতে মন দেয়, কেউ লাথালাথি করে, একজন বলে অ—য় অজগর আসছে তেড়ে/ আমটি আমি খাব পেড়ে

এসময়ে দূরে কোথাও বোমা পড়ে এরপর কয়েকবার, বাচ্চারা দুই বুড়োর মাঝখানে এসে দাঁড়ায় ভয়ে

সেই অজগরের জিভ বার করা ছড়াছবি অ আ ক খ'র বইয়ের পাতাটি খোলা পড়ে থাকে, আমও আর খাওয়া হয না, হাওয়া এসে বারবার অজগরের মুখটিকেই দেখায, অজগরটি তেড়ে আসবার ভঙ্গিতে হাওয়ায ওলটপালট খায, বাচ্চারা ভয়ে খেলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে অথচ এই কিছুক্ষণ আগেই বিদ্যাসাগরের তৃতীয পাঠে তারা যেন কথা বলছিল, হাত নাড়ছিল, কিন্তু এখন তাদের মাথার ওপরের প্রলযের আকাশ,

চক্রবর্তী আবার একবার বেরিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসবেন বলেন, মাস্টার বলেন আমি তোমায কী করে একলা ছেড়ে দিই বলো কিন্তু তাঁর চোখে বিষণ্নতার রেখা, তিনি ভেজা চোখে বাচ্চাদের দেখেন, বলেন, জানো চক্কোত্তি, রংপুর জেলার মাযেরা একটা ছোট্ট ছড়া বলে, চক্কোত্তির ছড়ায মন নেই, মনে পড়ে আছে রাস্তায, বারবার তিনি দরজার কাছে গিয়ে কান পাতেন, মাস্টার বলেন, ভয নেই, আমায কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু চক্রবর্তী উসখুশ করেন, আগের সাহস ধরে রাখতে পারেন না, বাচ্চাদের কেউ পাঠাতে চাযনি, বলা যায না কোথায কী হবে, কিন্তু চক্কোত্তিই দাযিত্ব নিয়ে খানিকটা জেদের বশে চলে এলেন, ভাবখানা এই যে সব স্বাভাবিক আছে, মাস্টার ছড়া বলছেন, চক্কোত্তি তাকিয়ে থাকেন, মাস্টার বলে চলেন, হামার ছাওয়া মতিহার/আকাশের তারা/ যদি তারা হাসে/ তারা কাছে আসে/ যদি ছাওয়া কান্দে/ তারা যাবি চান্দে

আমার খালি মনে হয, এইসব তারাগুলি আকাশ আলো করুক, দুনিযার রহস্য উন্মোচিত হোক, জ্ঞান বড়ো সক্রিয বুঝলে, রশীদ বলেছিল, সমাজের কোন প্রযোজন নেই নিষ্ক্রিয জ্ঞানের, আজ জীবনের শেষ মাথায এসে বুঝতে পারি নিজেই নিজের ভেতর কুয়ো হয়ে আছি, বুঝলে, জ্ঞানের দাতা সেজেছি, দেওয়ার অহঙ্কারে স্থাবর হয়ে আছি, নিতে পারিনি কিছুই, জীবনের কাছে, হাঁটু গেড়ে বসে কিছু শিখতে পারিনি, এবং একথা বলার পরে পরেই

বাইরের উচ্ছৃঙ্খল শব্দসমুদ্র কাছে চলে আসে, গোলমালের শব্দ শোনা যায, শব্দ ক্রমে কাছে আসে, ভযঙ্কর শব্দে আছড়ে পড়ে ঠিক তাঁরই দরজায, দরজা সে ভার সইতে পারে না, পথ করে দেয নিজে ভেঙে গিয়ে, হুড়মুড়িয়ে একশো দু'শো লোক ঢুকে পড়ে বাড়িতে, তাদের অনেকেরই তখন রুদ্রমূর্তি তারা ঘরে ঢোকে, বইপত্তর আলমারি, জলের কলসি, বিছানা বালিশ, টেবিলের ওপরকার লেখা ম্যানিউসক্রিপ্ট তাদের ক্রোধের আগুনে লণ্ডভণ্ড, দেওয়ালের মৌলানা আজাদকে লাঠি পেটা করে ভাঙতে গেলে রবীন্দ্রনাথ গান্ধী বঙ্কিমচন্দ্র সুভাষেরও মুখ ফেটে যায, আতিপাঁতি করে তারা এঘর ওঘর বাথরুম রান্নাঘর পেছনের দরজায খোঁজে, চিৎকার করে বলে, কোথায লুকোলে শালা, তারা দরজা জানালায দমাদম লাথি মারে, কেউ বলে—চিড়িযা উড়েছে, কোথাও কিছু না পেয়ে তারা দাওয়ায পাতানো মাদুরের ওপর রাখা শেলেটগুলিকে আছড়িয়ে ভাঙে, একজন অতি উৎসাহীর চোখ চলে যায—একটি শেলেটে অস্পষ্টভাবে এখনো লেখা রয়েছে 'এলাহি ভরসা', জনতার মধ্যে পণ্ডিতেরা গর্জন করেন, হিঁদুর ছেলেকে শেখানো হচ্ছে 'এলাহি ভরসা', হিঁদুর রাজ্যে বাস করে মুসলমানের খোদার চামচেবাজি হচ্ছে, এ কথায,

মাস্টারের ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে ছাযা পড়ে, শিশুগুলির মুখেও ছাযা, চক্রবর্তী বাধা দিতে এলে তাকে খোদার চাম্‌চে বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয, মাস্টার এবার দৃঢ় গলায বলেন, তোমরা অনেকেই তো আমার কাছে অ-আ-ক-খ শিখেছিলে, ও ররে শিখেছিলাম শিখেছিলাম, অ আ ক খ শিখিয়ে মাথা কিনে নিযেছেন নাকি, এখন জমানা

বদলে গেছে, আজ বাবরি মসজিদ চাই, কাল কাশ্মীর চাই, এসব ফ্যাঁকড়া তুলছেন, এসব মামদোবাজি চলবে না এখেনে,

ওই আল্লার বাচ্চাকে কোন্ পথ দিয়ে হাপিশ করে দিয়েছেন, এই প্রশ্নে মাস্টার স্থির হয়ে জনতার দিকে তাকালেন, জনতা চুপ, কেন এভাবে চুপ করে গেল উত্তেজিত এইসব মানুষ মাস্টার জানেন না, অথচ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এদের মধ্যে অনেকেই এখনো বিবেকের ভার নিয়ে বিব্রত, উত্তেজনায় সবাই হয়তো অশ্লীল হয়ে উঠতে পারেনি, মাস্টার বললেন, মানুষ মানুষের কাছেই আশ্রয় নিতে আসবে, পশুর কাছে নয়, কে যেন বলে উঠলো, এসব কিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে ওই নেংটিপরা বুড়োটা, পাকিস্তানের নাতজামাই, পাকিস্তানকে তিনশো কোটি টাকা দিয়ে দাও বায়না ধরেছিল, অথচ নোয়াখালিতে ভড়ং করে থেকেও হৃদয় পরিবর্তন করতে পারেনি, বলাবাহুল্য এসব কথা হচ্ছিল খুব উঁচু পর্দায়, মাস্টার নিচু পর্দায় নামলেন কেননা তা নাহলে এরা উন্মাদ হয়ে উঠবে এখুনিই, ঘন গলায় দুঃখ করে বললেন ছেচল্লিশের নোয়াখালি যেন আর কোনদিন ইতিহাসে না হয় তার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করার আছে, জনতা চুপ হচ্ছে, ক্রমে থিতিয়ে যাচ্ছে, এসব দেখে চতুর পণ্ডিত ক'জন যাদের বাস মাস্টারের বাড়ির কাছাকাছি, তারা হঠাৎই যেন গোপন কথা ফাঁস করছেন এই ভাব দেখিয়ে বললেন, কাল রাতে আপনার বাড়িতে মুসলমানদের মিটিঙ্ হয়েছে, রেল স্টেশনের ঘটনার বদলা নেবে ওরা, আমাদের কাছে গোপন খবর আছে, আপনার বাড়িতে তারা শোর্ড ড্যাগার জমা করেছে, মাস্টার স্তম্ভিত, জনতা আবার উত্তাল, লোকদুটির চোখ মাস্টারের বাড়ির ওপর, বড় বড় ঘরের ওপর, রাস্তার ওপারের চমৎকার পজিশন মাস্টারের ভিটের, মাস্টার আবারো বললেন আমি আপনাদেরই একজন, এতদিন এখানে বাস করছি কেউ বলবে না আমি কোন হীন ষড়যন্ত্র করেছি কোনদিন, এটা আমার নিজের দেশ, নিজের জন্মভূমি, আমার পাশাপাশি আপনারা আমার প্রতিবেশি, বলা যায় নিজের ভাই, আপনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে তো নিজের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করতে হয়, কিন্তু সেই দুইজন ছাড়বে না, আস্তে আস্তে গুজবের অস্ত্রগুলি একে একে ব্যবহার করে এবং সেই দ্বিপ্রহরে বিনা মেঘে আকাশ ক্রমশ কালো হতে থাকে, ক্লান্ত বিধ্বস্ত মাস্টার ধীরে বলেন, আমায় কী করতে বলেন আপনারা, তখন ছোঁ মেরে নিয়ে কেউ কেউ উত্তর দিতে চেষ্টা করে এবং সেই উত্তরটিই শ্লোগানের মতো জনতাকে আবিষ্ট করে, জনতা বলে, পাঠশালা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে, বাড়ি বিক্রি করে দিতে হবে

কিন্তু তাতে আবার বেশ কিছু লোক বেঁকে বসে, এমন দাবি ঠিক তারা গিলে উঠতে পারে না, পারে না দেখে, চতুর পণ্ডিতেরা এবার ধর্মের ঘা-মুখ খুলে দেয়, ক্ষতস্থানে খোঁচায়, এলাহি ভরসা শব্দ দুটিই তাদের কাছে এখন বিষাক্ত ছোবলের মতো, এতে হিন্দুধর্মের গায়ে নাকি বিষ চারিয়ে যায় এবং অচিরেই এর নিরাময় চাইতে গিয়ে জনতার উন্মাদ দাবি ওঠে, এলাহি ভরসা হিন্দুদের শেখানোর জন্য আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে, আর নিজের হাতে তা মুছে দিতে হবে, চক্রবর্তী ভিড় ঠেলে এসে কিছু বলতে চান কিন্তু ছেলে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে যায় দরজার বাইরে, চক্রবর্তী ছেলের সাথে যুদ্ধ করেন, পারেন না, এদিকে ভেতরে কয়েকজন শেলেট তুলে ধরে সবাইকে দেখায়, এলাহি ভরসা

কথা দুটি বৃহৎ হতে হতে সবার হৃদয়ে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যায়, কেন এই মনুষ্যকুল এই দুটি শব্দের পেছনে লুকনো আরো একটি মনুষ্যকুলের হাতে অদৃশ্য অস্ত্রসমূহ দেখতে পায়, যেন তারা দুই বিবাদমান মানবগোষ্ঠী গোচারণভূমি দখলের জন্য জঙ্গলে পাথরের টিলার আড়ালে সশস্ত্র, অপেক্ষমান, শুধু আক্রমণের মুহূর্তটি

টিকটিক করে কাছে আসতে থাকে, যেন বিস্তৃত স্তেপভূমিতে হা রে রে করে দুই মানবগোষ্ঠী ছুটে আসছে পরস্পরের দিকে, মাঝখানে একটি সবুজ বৃক্ষ পাতা ঝরিয়ে ঝরিয়ে এদের বারণ করছে, মাস্টার সেই সবুজ পত্রশাখা মেলে দিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, চিরদিন যেমন লিখে এসেছি, আজও ঠিক সেভাবেই লিখেছি, দুটি পথকে পাশাপাশি রেখেছি, এলাহি ভরসার দাবিদার একমাত্র আমি, আমি যেমন এলাহি ভরসা লিখি, তেমনি শ্রীশ্রীহরি বা শ্রীদুর্গাশরণম লিখতে আমার হাত একটুও কাঁপে না, আমার নিজের ধর্মে তাতে ঘা পড়ে না, জীবনে সঠিক শব্দটি শিখতে গিয়ে যেমন বেঠিক বর্ণ বহুবার লিখেছি আর মুছেছি, তেমনি---হঠাৎ তিনি আর এগোতে পারেন না, অনেকেই রে রে করে ওঠে, ওরে জ্ঞান দিচ্ছেরে—মাস্টার অসহায় দাঁড়িয়ে, ওসব জ্ঞান না দিয়ে আগে ওটা মুছে দিতে বলা হচ্ছে আপনাকে আগে মুছুন, এ কথায় মাস্টার ব্যথিত হন, বলেন আমি কোনকিছুতেই অন্যায় আদেশ মেনে নিই না, আদপে এগুলি অক্ষর যা বারবার মোছা লেখা যায়, কিন্তু আপনারা যখন আমাকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করছেন মুছতে, তখন এগুলি আমার কাছে বিশ্বাস, বিশ্বাসকে আমি মুছতে পারবো না, মুছে দিলে আমার আল্লাহকে মুছে দেওয়া হয়, কেটে দিলে তাঁকেই কেটে ফেলা হয়, ঠিক যেমন জয়দেব গীতগোবিন্দের লাইন কেটে দিয়ে ভগবানের পিঠে ক্ষত করে দিয়েছিলেন, এও তেমনি, এতবড়ো গভীর ক্ষত আমি করতে পারি না—জনতা উন্মাদ, কে হঠাৎই নামিয়ে আনে লাঠি, কিন্তু তাতে জনতার মধ্যেই গণ্ডগোল শুরু হয়, এভাবে মারাটা ঠিক নয়, ঠিক—এই দুই দলে জনতা বিভক্ত, প্রায় খণ্ডযুদ্ধ হতে যায়,

বিভক্ত জনতার পেছনে বাচ্চারা, তাদের দেখার কেউ থাকে না, তারা পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, ভয়ে কাঁদতেও পারে না,

রক্ত গড়িয়ে নামে মাস্টারের মাথা থেকে, সাদা দাড়ি ভিজে লাল হয়, মাস্টার পড়ে যান, তাঁর ক্ষত থেকে রক্ত ছিটকে পড়ে খোলা দ্বিতীয়ভাগের পাতায়, ঐক্য বাক্য মনিক্যগুলি এখন ঝাপসা, পরক্ষণে পুলিস বা ই এফ আর নেমেছে বলে জনতা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল, শুধু বাচ্চাগুলি পালাতে পারে না, তারা স্থাণু হয়ে মস্ত মহাকাশে স্নিগ্ধ তারকাপুঞ্জের মতো কিন্তু ম্লান, কিন্তু ক্রমে তারা সক্রিয় সচল হয়, তারা ধীরে ধীরে পড়ে যাওয়া মাস্টারসাহেবের কাছে আসে, একজন ভাঙা শেলেটখানি তুলে ধরে, দেখা যায় এলাহি ভরসা শ্রীশ্রীহরি নিয়ে শেলেটটি তিন-চার টুকরো হয়ে গেছে, বাচ্চাটি এবার কাঁদে, শেলেটটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, একজন তায়েব মাস্টারের গালের রক্তধারা মুছিয়ে দেয়।

অচেতন হওয়ার আগে মাস্টার এগিয়ে আসা বাচ্চাগুলিকে দেখেন ভালো করে, দেখেন আকাশ থেকে ভূমি পর্যন্ত প্রসারিত নূর-এর আলোর মতো তারা জ্বলছে, বর্ণগুলি ফুটে উঠেছে জীবন থেকে জীবনান্তরে, ঝরে পড়ছে আলোবীজ উপত্যকা ভরে যাচ্ছে সবুজ ফসলে, মাস্টার আরো দেখতে পেলেন শিশুদের মুখগুলিতে কী এক ঐশ্বরিক কষ্ট, মাস্টার ধীরে ধীরে শিশুদের উদ্দেশে বললেন, হে মহানবীরা, তোমরা এইসব অজ্ঞানদের দেখো, এদের কারুরই যে অক্ষর চেনা হয়নি, তোমরা এদের বর্ণ পরিচয় করিয়ে দিও,

শিশুরা কী বুঝলো কে জানে।

এই লেখার জন্য পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ রিপোর্ট মুর্শিদাবাদ ২৪ জুন ১৯৮৮ এর কাছে কৃতজ্ঞ- লেখক

কালো মেঘ যেন সাজিল রে ॥ আবুল বাশার

বাপের মজুতের ব্যবসা। রাঢ়ের ধানচাল মজুত করত বাবা। একই জেলার পূর্বাঞ্চল হল ভড়, পশ্চিমাঞ্চল রাঢ়। আরও একটা অঞ্চল আছে, কালান্তর। মাটির এই তেভাগা বিন্যাস। ভড় নেমেছে নিচু হয়ে পদ্মার ঢালে। রাঢ়ের জমি উঁচু, ঢেউ খেলানো। ওখানে ধান ভাল জন্মে। শাক-সবজি কম ফলে। কালান্তর হল আরও গাঢ় ধানের জায়গা। মাটি নাকি কৃষ্ণমহিষের চেয়ে কৃষ্ণ। ভড়ের লোকেরা কালান্তর যায় জন খাটতে। কালান্তর আসলে জেলা ছাড়িয়ে যাওয়া বিভুঁই। কালান্তর মানে কি তা হলে দেশান্তর ? জেলার শেষ সীমা তো বটেই। তা বাদেও যেতে হয় কত দূর। কালান্তরে কি মানুষ সহজে যায় ! পেটের দুঃখে যায়। যেত এক কালে। তখন জমি দু'ফসলি। আউশ আর আমন, নতুবা রবিখন্দের চৈতী।

অবশ্যি মজুতের ব্যবসা চিরকালই ছ্যাঁচড়া ব্যবসা। মহাশয় গোছের লোক এ ব্যবসা পারে না। বাবার হল কড়া সামন্তর মতো মেজাজ, খর স্বভাবকে মানুষ ভয় পায়, সে মানুষ চোপা সিধে করে কথা বলতেই পারে না, শুঁয়োপোকার মতো ঝুলো ভুরু, কানের লতিতে কুচি সাদা লোম, নাকের ছিদ্রে লোমের গুঁড়ো, চোখ না পাকিয়ে নিরীক্ষণ করে না কাউকে।

—কে র‍্যা বিছনখেগো মূল খাগির পুত, কী চাস ? অ্যাই শালা পা ছুঁবি নে, খবর্দার !

—আমি আজ্ঞা, আপনের সুমুন্দির পো, কেতন পরামানিক, পিসা মোর মুয়ে জুতা মারুন, বিছন খাইছি মায়েপোয়ে, বড্ডই আকাল গেল, কিছুই রাখতে পারি নাই। দ্যান বাবু, একটি ধামা বেতাই।

—এ যে শালা মাউথপিসে রুমাল জড়িয়ে মুখ বাজায়, কে কার সুমুন্দি মনে করি দাঁড়া, জুত করে মুখ তুলে ইদিক পানে চা, পষ্ট করে তাকাবি বেতায়ের পোতা ! চলছে খরা আর উনি চাইলেন বেতাই।

—আজ্ঞে শীলের হাফ-পঞ্জিকে নিকেছে আগুতে বর্ষণ নাগবে। বান ডাকবে। নদীর কোলে বেতায়ের ছিটা মারবে পিতিবেশী সকলে, বেতায়ের বিছন কুথা পাই, আপনের বারাণ্ডায় ধন্না না দিলে যাই কুথা !

—তাকা, আগে গত সনের হিসাব চুকিয়ে তবে পেন্নাম করবি শালা, এক খুতি বেগুনবিচি শিশার ডিহায় পাকান কর নাই ডিহিদার বিছনখোর ! ওই লাগানের কথা ক' আগে।

নিঃসাড় হয়ে গেল কেতন পরামানিক। হাফ-স্বর্ণকার, হাফ-চাষি। মাথার টাকে চুলবুল করছে ঘামের স্বেদ। কী অকাট্য ফাঁদে পড়ে গেল লোকটা। স্বর্ণকার হাফ নয়, সিকি। সূক্ষ্ম কারু হাতে আসে না। সোনা নয়, চাঁদির মোটা কাজের বানী নেয়।

বাবার তো শুধু মজুতের ব্যবসাই না। মজুত খোরাকের বাঁধাই-ব্যবসা। সেটা কী রকম বোঝা দরকার। তা বুঝতে হলে বিছনখোর কাকে বলে বুঝতে হবে। যে লোক

হরসন ধানের বীজ ঘরে জুগিয়ে রাখতে পারে না, অভাবে খেয়ে ফেলে, সে হল বিছনখোর। বীজ হল গেরস্তির মূল। চরম অভাবেও মানুষ বীজ ধরে রাখে। রাখে আর কোথা, খেয়েই তো ফেলে। এই খাদক-শ্রেণীকে বাবা বিছন দিত অর্থাৎ বীজ বাঁধাই করত, বলতে কি বাবার হাতে বীজ যেন 'বন্ধক' পড়ত। অবশ্য বাঁধাই কথাটা এ ক্ষেত্রে মজুতেরই হেরফের।

'বিছনখোর' শব্দটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ভর্ৎসনা এবং অভিসম্পাত। শৈশবেই সে কথা বুঝে ফেলেছিল অন্নপূর্ণা।

সেই শৈশবেই সে চিনত বেতাই আর বেগুনবিচি। বেতাই ছিল কালো খোসাঅলা মোটা ধান। নোনা ধানের বীজও ছিল তাদের। তবে নোনা আর বেতাইয়ের পার্থক্য বুঝতে হবে। নোনা হল জলের ধান, বেতাইও তাই। দুটিতে তফাতটা কিন্তু সামান্য নয়। একটি জলে মরে না, জলের সঙ্গে তার সদ্ভাব ঠিকই, যদি জল অধিক চঞ্চল এবং স্ফীত না হয়—এ হল নোনা। সাধারণভাবে মোটামুটি স্থির জলে নোনা ফলে ওঠে।

বেতাইয়ের পাল্লা আলাদা। কেতা দেখবার মতো। অন্ন সেসব দেখেছে। তাদের দেওয়া বীজে নদীর কোল ভরে উঠত, নদীর জলের উপর গলা তুলে চেয়ে থাকত বেতাই। কেউ কেউ বলত এ হল বেতিধান। নদীর জল বন্যার তাগিদে বাড়ত যখন তখনই বেতিধানের কেরামতি দেখা যেত। জল যত বাড়ে, সে-ও তত গলা তোলে।

বেতাইয়ের গা-গতর ছিল মানুষের মতো গাঁটঅলা, যেন তারও ছিল হাঁটু, কোমর, বুক, গলা, এমন কি ঠোঁটও ছিল। খানিকটা বেতের মতো লতানে ভঙ্গিমা। ওর গাঁটে সরু সরু ঝুরো শেকড় গজাত সাদা সাদা, খোঁচা খোঁচা দেখতে।

উপরে বর্ষণ, নীচে বান। কোন্ দিকটা ঠেকায় বেতি। গলা ডোবে, ঠোঁট ডোবে, কপাল ডুবে যায়। তলিয়ে যায় জললতা বেতাই, ডুবে থাকে আড়াই দিন। বাবার সঙ্গে অন্ন নদী দেখতে আসে। নদীর লাগোয়া বিল জলে জলাকার, সব ডুবু ডুবু, সব ভরভর। নদীর বাঁধে ভাঙন, পথ জলমগ্ন, কোমরে কাপড় তুলে ছপছপ। এই আড়াই দিনে নদী যদি এক নয়, আধ বিঘত মরে, আকাশ যদি ক্ষান্তি দেয়, বেতাই নিজেকে জাগাবে। সে তার শীর্ষ দেখাবে সূর্যকে।

—হায় ঠাকুর তাই যেন হয়। নদী হোক মরমর, আকাশ হোক জরজর, বেতাইকে মৌকা দাও একটিবার। জলের দেবতাকে পেন্নাম করি, আকাশের দেবতাকে করি, নদীকে করি ; রক্ষা কর, বেতাই ওঠ্, মুখ দেখা...এইভাবে প্রার্থনা করেছে অন্নপূর্ণা।

বেতাই জলে ডুবে রয়েছে এ কথা ভাবলে আজও কষ্ট হয় অন্নপূর্ণার। বাবা মেয়ের মনের কষ্ট বুঝতে পারত। বলত—কষ্ট কী মা ! বেতাই ঠিক উঠবে। ধানের এই বিটি তিন-চার দিনেও মরে না। খানিকটা কাহিল হয়। তবে আড়াই দিনের দম ওর। কী করে যে বাঁচে।

—কী করে বাঁচে বাবা ?

—এ হল মা গরিব চাষার খোরাক। ভারি, মোটা খসখসে চাল হয়, বাবুরা খায় না। বাবুদের ফাইন চাল লাগে। বাবুরা হজমই করতে পারবে না।

—তুমি কি বাবু বাবা, তুমিও তো খাও না !

—আমি বাবু নই অন্ন। আমি মহাজন।

—বাবুদের চেয়েও বড় !

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—কারণ বাবুরা বইয়ের অক্ষরই শুধু চেনে, বিছন চেনে না।

—আমি কী করব বাবা!

—তুমি তো অন্নপূর্ণা। অন্ন চাইলে ক্ষুধার্তকে ফিরিয়ে দিও না। বীজ চাইলে দিও।

—নোনা, পাথরকুচি, বেগুনবিচি, বেতাই, বাসমতি?

মেয়ের কথা শুনে বাবা সেদিন হা-হা করে হেসে ফেলেছিল। তারপর বলেছিল—বাসমতি এই গরিব ভড়ে কেউ বোনে না, চারা করে না। বানবন্যার জায়গা, বাসমতির বীজ আমি বাঁধিনি মা অন্ন।

—বাঁধলে না কেন?

—বানে যদি সব বীজ খেয়ে যায়! বীজ হারিয়ে গেলে আমি যে অপরাধী হব অন্নপূর্ণা! মানুষ সকলে জানে আমার কাছে সব বীজ আছে এবং তা হারায় না। বিছনখেকোরা তাই নিশ্চিন্ত থাকে, মূলে খেলেও আমার গোলায় আসল মূল থেকে যাবে। আমি যে গোলোকপতি মজুতদার। আমি মানুষের গলায় গামছা বেঁধে দবকার হলে পাওনা বুঝে নিই। তুমিও নেবে। টাকায় এক আনি নাফা রাখবে, বেশি না, মাত্তর এক আনা। বীজের ধামা প্রতি ছোট হেটো বাড়তি নিবে ফিরত। এক ধামা বীজ দিলে ফিরত নিবে এক ধামা এক হেটো।

—পারব?

বাবা সেই ছোট্ট অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসে বলেছিল—নিশ্চয় পারবে।

—আমি যে মেয়ে! মনে মনে বিড়বিড় করে উঠেছিল কিশোরী অন্নপূর্ণা। সে জানত, বাপের সংসারে মেয়েরা চিরকাল থাকে না। বাবাও তার বিয়ে দিয়ে কোথায় যে দ্বীপান্তর দেবে ভগবানই জানে। কার ঘরে যাবে অন্নপূর্ণা? সে কেমন লোক!

কিশোরী অন্নপূর্ণার একটি জোয়ান ছেলেকে বেশ মনে ধরেছিল। সে কথা বাবার সামনে পাড়বে কে? আখেরিগঞ্জে বাড়ি ছেলেটার। ওখানকার নদী যে কী ভয়াবহ, বানভাসি হয়! ছেলেটা বস্তা হাতে করে এসেছিল তাদের বারান্দায় বেতাইয়ের বীজ চাইতে। তাকে চাষিবাসির ছেলে বলেই মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল এ ঠিক কৃষ্ণের মতো সুন্দর, কোথাকার যেন কে!

—কে তুমি? শুধালো অন্নপূর্ণা।

ছেলেটি লাজুক মুখে নাম বলল—ইন্দ্র।

—ইন্দ্র কী?

—আমরা ওঝা।

—মন্ত্র জানো?

—মন্ত্র!

—সাপে কাটার মন্ত্র জানো না?

—না।

—কী জানো?

ইন্দ্র চুপ করে রইল। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। তা দেখে অন্নপূর্ণা গলায় সুর তুলে খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসির গমকে ছেলেটা কেমন আরও ভ্যাবলা হয়ে গেল।

থতমত গলায় ইন্দ্র বলে উঠল—ঠাকুদ্দা মন্ত্র জানত। শেঠের দিঘির ছোট চৌধুরিকে সাপে কাটল। ঠাকুদ্দা মন্ত্র ঝেড়ে বাঁচালে, সবাই জানে। ছোট চৌধুরি বেঁচে উঠে ঠাকুদ্দাকে

ভূমিদান করলে। মন্ত্রের জমি এখন ভাঙনে খাচ্ছে, যা রয়েছে কষ্টেসৃষ্টে, তা-ও তো নদীর কোলে পড়েছে, বাবা বললে বেতিধানের বিছন আনো গে ইন্দ্রনাথ। তোমরা দেবে আধ মণ ?

—তোমাদের বীজ নেই ?

—না।

—কেন ?

– বেতিধানের বীজ নেই।

—নোনা আছে ?

—না, নেই।

—কী আছে ?

—নেই।

—কিনবে বিছন ?

—না। তোমবা বাঁধাই কব না ?

—করি।

—তাইই দাও না আমাকে।

খুতি অর্থাৎ বস্তা প্রায় ভর্তি করে নিয়ে আখেরিগঞ্জ ফিবে গেল ইন্দ্রনাথ ওঝা। কিন্তু বৎসরান্তে আবার এল ইন্দ্র বিছন চাইতে।

অন্নপূর্ণা বুঝল ইন্দ্ররা বিছনখোর। মনটা তার কেমন দমে গেল। বাবা বলল—তুমি তো বিছন পাবে না। অন্ন তোমাকে গত সন যা দিয়েছে সেইডের হিসেব লাগাও আগে।

—আজ্ঞে বানভাসি হল যে কী করব বলুন! বেতাইয়ের জান, তবু পচে গেল, মাথা তুলতে পারল না। এই বচ্ছর দিয়ে দেখুন, দুই সনের একত্রে পাবেন। মা মনসার কিরা আপনার বিছন ফিরত দিব আজ্ঞে। বলে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

—ওহে আজ্ঞেচন্দ্র, তুমি গাড়ি বইতে পার ? রাঢ়ে যাচ্ছে সাত সাতটা গাড়ি। গাড়োয়ানি করে এসো তা হলেই হল, আবার পাবে বিছন। যাও। না হলে গোলা বন্ধ। তুমি মা অন্ন নতুন কুঠি খুলবে না। বলে গোলোকপতি ঘাড়ে রঙিন গামছা ফেলে মাঠের দিকে চলে গেল।

কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল অন্নপূর্ণা। বিছনখোর ইন্দ্রনাথকে সে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে দেখছিল। বাবা নতুন কুঠি অর্থাৎ মাটির গোলা, যাতে বিছন থাকে, খুলতে মানা করে গেল। বোঝা যাচ্ছে, বেচারি ইন্দ্রনাথকে বাবা বিশ্বাস করেনি।

অন্নের দিকে সভয়ে চেয়ে কাতর গলায় ইন্দ্র হঠাৎ বলল—আমি মন্ত্র জানি না অন্ন। তবে বাবা বিষ নামাতে পারে। ঠাকুদ্দার মতো বড় ওঝা নয়, তা হলেও মন্ত্র জানে। আমাদের দিগরে বাবার মান আছে। আমি যদি মিথ্যে বলি বাবার মন্ত্র কাজ দেবে না, মন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে।

—তুমি তো লেখাপড়াও করেছ !

—করেছি। যা কবেছি, তাতে কিছু হয না। কেন সে কথা ?

—এমনি শুধোচ্ছি। মন্ত্র বিশ্বাস কর ?

—আমি করি না। বাবা করে। তুমি কর না ?

—না।

—ও, আচ্ছা ! বলে ইন্দ্র ভীরু দৃষ্টি নামিয়ে ফেলে। তারপর ঘাড় নিচু কবে বগলে

ডেবে রাখা বস্তা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। পথের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। ইন্দ্র ফিরে চলে যাচ্ছে।

ইন্দ্র ফিরে যেতে যেতে বিষণ্ণ মনে কত কিছুই ভাববার চেষ্টা করছিল। মন্ত্রে কী হয় সত্যিই সে জানে না। বাবা-ঠাকুদ্দার মন্ত্রের জীবন। মন্ত্র তাদের কাছে ফক্কিকারি কিছু নয়। মন্ত্রের জোরে জমি মেলে। যদিও মন্ত্রের বদলে কারও কাছে কিছুই দাবি করতে পারে না ওঝা। ওঝার ধর্মমতে মন্ত্র বিক্রি হয় না, বিষ নামিয়ে প্রাণ দাও বিনিময়ে কিছু নেই। প্রাণতুল্য মন্ত্র আসলে অমৃত ফলায়, মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার আনন্দই শেষ কথা।

মন্ত্রবশ্যতা কী কঠিন বাসনা জাগায় মনে! বাবা ঠাকুদ্দার জমি ভাল করে কখনও আবাদ করল না। ছোট চৌধুরি দান করেছিলেন যে সম্পত্তি, তাকে ঠিক বিনিময় বলে না। সেই মন্ত্রের জমি-জিরেত নদীতে পড়েছে এখন, বাবা সেদিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে আর মন্ত্র আউড়ে ফেরে গ্রামে-গ্রামান্তরে। সে এক আশ্চর্য ওঝা, সংসারে থেকেও সংসারের নয়।

ফলে কলেজে ঢুকেও ইন্দ্রকে বিদ্যা উপার্জনের বাসনা ত্যাগ করতে হয়েছে, ধরতে হয়েছে সংসারের হাল। মন্ত্রে তার সংশয়, তবু মন্ত্রকারকে সে কখনও কোনও কটু কথা বলতে পারেনি। যদিও অন্যের প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরছে বাবা আর তারা মায়েপোয়ে মরতে বসেছে, তথাপি বাবা তাদের কাছে যেন অলৌকিক প্রাণী। অলৌকিক এবং শ্রদ্ধা উদ্রেককারী।

গত সন বিছন চাইতে এসে ইন্দ্র অন্নপূর্ণার সামনে মন্ত্রের কথা উঠলেও বাবার কথা তোলেনি। এই আশ্চর্য বাবার কথা মানুষের সামনে সে আড়াল করতেই চায়। কারণ বাবার মন্ত্রই তাদের মারছে।

ঘাড় নিচু করে রাস্তায় চলেছে ইন্দ্র। রাস্তাটা মাঠের ভিতর ঢুকে অর্ধচন্দ্রাকার হয়ে আবার বার হয়ে গেছে। মাঠ বলতে শস্য-প্রান্তর। সেই দিকেই চলেছে ইন্দ্রনাথ। ওঝা। ছোট জাত। এবং বলা বাহুল্য সে মন্ত্রহীন। গোলোকপতি চক্রবর্তী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কী ভয়ংকর কঠোর মানুষটা। নাকের, কানের, ভুরুর চুল মহাজনের দৃষ্টিকে করেছে কঠিন। ইন্দ্রকে 'আজ্ঞেচন্দ্র' বলে বিদ্রূপ করল মানুষটা। প্রণাম নিল না। সংসারের বীজ যারা আগলায় তারা কি বিধাতার মতো খেয়ালি, এই লোকটার গোলায় সমস্ত বিছন কী করে জমে উঠল?

এখন চৈত্র মাস। মহাজনের ক্ষেতে মিঠে কুমড়োর অপূর্ব রঙ ধরেছে। সাতখানা বলদের গাড়িতে বস্তা করে সেই কুমড়ো সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই কুমড়ো নিয়ে রওনা দেবে গাড়ি রাঢ়ের দিকে। কুমড়োর বদলে ধান বস্তা ভরে ফিরে আসবে। ইন্দ্র দেখল, সাতখানা গাড়ি কিন্তু ছ'জন গাড়োয়ান। ঠিক এই জন্যেই মহাজন তাকে অমন করে বলল তখন।

—কী হে যাবে নাকি? একজন গাড়োয়ান শর্ট হচ্ছে। বংশীর আবার আমেশা, বেতাইয়ের ভাতে আমেশা হয়, পেট গড়গড় করে, ভারী ভাত তো! বাবু বলচেন যখন, মাগনা-বেগার তো না। তা ছাড়া তুমি হলে বিছনখোর, বাবুর কথা রাখ, চল ইটে-সরান যাই, পাচগাঁ যাব না। শর্টে শর্টে ফিরব।

গাড়োয়ানদের মুরুব্বি ইন্দ্রকে ফুসলাতে লাগল। ইন্দ্র বলল—আমার জামা কাপড় ঠিক নেই, অত দূর ভিনগাঁ যাব!

—ঠিক আছে, জামা-পিরহান দেওয়া হবে। মুনশির রেডিমেট আছে, উলোসপুরের মোহড়াতে দোকান, কী বলেন বাবু!

গোলোকপতি মাথা নেড়ে সায দেয। তাবপব বলে—ইন্দ্রকে ভাল বলদেব গাড়ি দিও সবদাব। জামা-পিবহান যা লাগে মুনশিকে বলে...

—আজ্ঞে বাবু।

ইন্দ্রকে সবচেযে তাগড়া আব শিক্ষিত বলদ দেওযা হযেছে। তাব গাড়ি চলছে দ্বিতীয স্থানে। সম্মুখে শুধু মুবুব্বিব গাড়ি। ইন্দ্র ভাবছিল, শেষ অবধি সে গাড়োযানি কবছে, বাঢেব ইটে-সবান যাচ্ছে, কেমন আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু আবও বেশি সে আশ্চর্য হল যখন উল্লাসপুবেব মোহড়াব দোকানে নেমে পোশাক নিতে হল। মুনশিব দোকানে মেঝেব উপব বসে বযেছে অন্নপূর্ণা। হাঁটুতে ভব দিযে পিছনে পা ছড়িযে বসে তাব জন্য পোশাক পছন্দ কবল মহাজনেব মেযে।

মুবুব্বি গাড়োযান বিস্ময়কব খুশিতে বলে উঠল—তুমি যখন পছন্দ কবে দিচ্ছ মা, ভাল জিনিসই কপালে জুটবে ছেলেডাব। ওহে ইন্দ্রনাথ, ইদিকে আস দেখি! তবে মা বেশি ফাইন জিনিস দিও না, তা হল্যে পবতে নজ্জা পাবে উঝাব পো।

—লজ্জা পাবে কেন, আমি যা দেব পবতে হবে। ও তো তোমাদেব মতো গাড়োযান নয। তোমাদেব সঙ্গে যাচ্ছে শখ কবে! বলে একটি দামী পাঞ্জাবি হাতে উঠিযে অন্ন সুন্দব কবে চাইল ইন্দ্রেব চোখে।

ইন্দ্র বলল—আমি শখ কবে যাব কেন! আমি সত্যিকাব যাচ্ছি। এত দামী পোশাক কখনও পবিনি। আমাকে দিও না।

—কেন? আমি দিলে পববে না তুমি? বলে উঠল অন্নপূর্ণা।

—মানে, তা নয। আমাকে ঠিক মানাবে না। আমবা তোমাদেব বীজ খেযে ফেলেছি অন্নপূর্ণা। এখন এইসব মূল্যবান জামাটামা পবলে নিজেকে খুব নির্লজ্জ মনে হবে। তুমি ঠিক বুঝবে না।

এ কথায খুব একটা ধাক্কা খেল অন্ন। 'আমবা তোমাদেব বীজ খেযে ফেলেছি অন্নপূর্ণা'—আশ্চর্য কাতব এই উক্তি অন্নেব অন্তবে পাকিযে পাকিযে উঠতে থাকল। কখনও তাব হৃদয তাব সঙ্গে এমন কবেনি। খানিকটা সে কেঁপে উঠল যেন। কোনও দিন এমন এক বীজখেকোব সঙ্গে দেখা হযনি তাব। লাজুক, ভদ্র, কেমন নবম প্রকৃতিব ছেলেটা। এত লজ্জা কেন ওব! যাবা অভাবে-টানে বীজ খেযে ফেলে তাদেব কি কোনও লজ্জা থাকে?

—আমি বুঝব না! গলাব অত্যন্ত খাদে আপন মনে বলে ওঠে অন্নপূর্ণা। তাবপব হঠাৎ পাঞ্জাবিটা ইন্দ্রেব গাযেব উপব ছুঁড়ে দিযে বলে—আমি যা দেব, তাইই পববে তুমি, কেউ কখনও আমাদেব মুখেব উপব কথা বলে না। নাও, এই ধুতিটাও পবো। জুতো? শোনো কিংকবদা, ওকে জুতোও দেবে সেনদেব দোকান থেকে। বাবাব নামে খাতা আছে, সেনবাই তাতে হিসেব বাখে। যাও, চলে যাও।

তাবপব ধান নিযে ফিবে এল গাড়িগুলি। সাত দিনেই ফিবল। ধুতি পাঞ্জাবি জুতো পবা ইন্দ্রকে দেখাচ্ছিল জামাইযেব মতো। ওকে দেখে গোলোকপতি প্রথমে অবাক হল। চিনতেই পাবে না।

—ওবে কিংকব এডা কে ব্যা। অদ্ভুত বিদ্রূপমাখা কড়া গলায হাঁকল মহাজন।

কিংকব জবাব কবল সভযে—আপনেব গেড়েন আজ্ঞা।

অতি লম্বা বাবান্দাব দবজাব মুখে এসে দাঁড়িযেছিল অন্নপূর্ণা। বাবাব গলা শুনে চমকে উঠল।

—গাড়োযানেব এই পোশাক! কে দিযেছে ওকে? তোমাব নাম কার্তিক? কী বাবা

তোমার নাম ?

—আজ্ঞে আমি ইন্দ্র। ইন্দ্রনাথ ওঝা। আখেরিগঞ্জের লোক। আপনার খাদক।

—তা এই 'বেশ' কেন বাবা !

—আমি চাইনি বাবু।

—চাওনি তো পরেছ কেন ? গত সনের পাওনা বুঝিয়েছ ?

—না।

—আচ্ছা বাবা কার্তিক তোমার লজ্জা করছে না ? তুমি কি জানো, তুমি দেখতে কেমন হয়েছ ?

হঠাৎ এই কথায় ইন্দ্রনাথের চোখের সামনে বীজময় পৃথিবীর অন্তঃকরণ কেঁপে উঠে অনুদ্ভূত অন্ধকার ছড়াতে লাগল। যেন সে এক অতল পাতালে ঢুকে যাচ্ছিল। পৃথিবীর স্বাদ বেতাইয়ের মতো ভারী, মোটা, খসখসে ঠেকছিল।

—তুমি খাদক। তা এখন আমার মাথা খাও। পোশাক খুলে বস্তা ধর ব্যাটা। ওরে কে আছিস বিছন মেপে দে। বলে মোড়া ছেড়ে উঠে মহাজন ভিতরে চলে গেল অন্য আর একটি দোর ঠেলে।

ইন্দ্রের মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে, ঝিমঝিম করছে শরীর। গলা কাঠ হয়ে উঠেছে। তার বত্রিশ নাড়ি ছেড়ে যেতে চাইছে, কী করবে বুঝে পাচ্ছে না। দেখতে সে সত্যিই কেমন হয়েছে ? এই অপূর্ব পোশাক সে মাত্র ক্রোশ খানেক আগে পরেছে। মুনশির দোকান থেকে বেরিয়েই অন্নের চোখের আড়াল হওয়া মাত্র সে পোশাক খুলে তার ছেঁড়া শার্ট পরে নিয়েছিল। লজ্জায় সারা পথ আর ওই অভূতপূর্ব পোশাক স্পর্শ করেনি। ফেরার পথেও অন্নের দেওয়া জামা-ধুতি-জুতো ছুঁতে চাইছিল না। গাড়োয়ানরা তাকে পরবার জন্য জেদাজেদি করেছে, ফের রসিকতাও করছিল, তাই সে খুলে রাখা ওইসব গলাতে চায়নি গায়ে অথবা পায়ে।

কেমন হয়েছে সে দেখতে ? কার্তিকের মতো ? গাড়োয়ানরা তাকে সারা পথ 'জামাই', 'জামাই' বলে ঠাট্টা করছিল। গ্রামেগঞ্জে এভাবে কেউ কেউ 'জামাই' আখ্যা পায়, নামটাই জামাই হয়ে যায়, আসল নাম চাপা পড়ে যায়।

আয়না বা জলদর্পণে মহাজনের পোশাকে নিজেকে দেখেনি ইন্দ্র। কারও চোখের দর্পণেও না। ইন্দ্রের লজ্জা করেছে। ইন্দ্রের লজ্জা করেছে আখেরিগঞ্জের পদ্মাভূমি থেকে জলবেতি বেতাইয়ের বীজ নিতে এই মাধবপুর পর্যন্ত দৌড়তে। বেতাই যে সবখানে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া যাদেরবা আছে, তারা জমির পরিমাণমতো বীজ রেখে বাকি সব গিলে ফেলে। গোলোকপতি মহাজনের সুনাম আছে, কাউকে সে বিছন না দিয়ে ফেরায় না। তার কাছে ভগবানও বীজ বাঁধাই করেন, কখনও ঈশ্বরের কোনও বিছন হারিয়ে গেলে তিনি গোলোকপতির কাছে হাত পাতবেন।

মহাজনের এক হাজার একটা বিছন-কুঠি। মাটির সেইসব গোলা সাজানো রয়েছে গোলাবাড়িতে। প্রত্যেক কুঠির গায়ে ফুলখড়ি দিয়ে লেখা শস্যের নাম। লিখেছে মহাজনের মেয়ে অন্নপূর্ণা। শস্যের বানান নির্ভুল লেখার মতো বিদ্যা জানে মেয়েটা। একবার এখন সেই গোলাবাড়ি দেখার সাধ হল ইন্দ্রের। শুধু বীজ, শুধু বীজ, হা ঈশ্বর তোমার ছড়ানো মহৎ বীজেরা এখানে ঘুমিয়ে রয়েছে পরম শান্তিতে।

দানার উপর অক্ষর লিখতে পারে ইন্দ্র। মহাজনের বহিপ্রাঙ্গণে ছ'গাড়ি ধান এল। একখানিতে এল বাসমতি চাল। চালের গাড়িটি খেদিয়ে এনেছে ইন্দ্রনাথ। কী আশ্চর্য সুবাস সেই চালের। বস্তার একটিতে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্র গলে চাল এল

ইন্দ্রের মুঠোয়। কান্দীতে যখন এক রাতে গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছিল ওরা, তখন কাছের একটি দোকান থেকে সোনামুখি সুঁচ জোগাড় করে নেয় ইন্দ্রনাথ ওঝা। সেটা দিয়ে তুলি বানিয়ে নেয় সে। চালের দানার ওপর আঁকে অক্ষর। 'বাসমতি তুমি আমার'। ন'খানা অক্ষরে লেখে কথাটা। তারপর ন'খানা চাল বাঁধে একটি সাদা ট্যানায় অর্থাৎ কানিতে। ন'অক্ষর ন'টা চাল।

এটা একটা মজা। কানিখানা হাতে নিয়ে বিষহরি গানের একটি কলি আউড়ে ফুঁ দেয় ইন্দ্র। 'কালিদহের কূলে কালো মেঘ যেন সাজিল রে'—এই হচ্ছে কলি। বিষহরি মন্ত্রই বুঝিবা। এই 'কালো মেঘ' আসলে কৃষ্ণ। এইভাবে সে যেন তুক করছে কাউকে। কাকে ? অত বোকা নাকি ইন্দ্র ! নাম বলে মরবে নাকি ! মুঠো তুলে দেখাবে খালি। বলবে, এই ট্যানায় চাল আছে। চাউল। চাউল সেদ্ধ হলে যা হয়, তাকে সাধু করে বল, তাকেই তুক করলাম গো।

ইন্দ্রনাথ গায়ের পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে পাকা দালানের মেঝেয় ফুঁ দিয়ে দিয়ে ধানশস্যের ধুলো সরায়। গাড়ির কাছে এসে তার গামছাখানা নেয়। তারপর আবার ফুঁ দেয় মেঝেয় এসে এবং গামছা দিয়ে জায়গাটা মোছে। পাঞ্জাবি এবং ধুতি খুলে পরিষ্কার জায়গাটায় রেখে দেয়। জুতো খুলে রাখে থামের গোড়ায়।

নিজের শার্ট আর পাজামা পরে নেয়। সেফটিপিন দিয়ে আটকানো ফিতের হাওয়ায় চপ্পল পায়ে গলিয়ে নেয়। চপ্পলের চটা উঠেছে, একটির খানিকটা এমন ক্ষয়ে পাতলা হয়েছে যে কখন আধখানা খসে যাবে বলে ভয় হয়। ভয় অবশ্য ইন্দ্রেরই হয়। তাই সে সাবধানে পা ফেলে হাঁটে এবং ভয়ে ভয়ে ভাবে সেফটিপিনটা বুঝি খসে পড়ে !

ওই চপ্পলই ইন্দ্র যত্ন করে পায়ে পরল। আধ-ময়লা শার্টটা লাইফবয় সাবান দিয়ে রাঢ়ে কেচে নিয়েছিল, সেটাও ব্যবহারে হালকা হয়ে এসেছে, কলারের খিছুটা ছিঁড়েছে, শার্টও গলিয়ে নিল সাবধানে। ইস্তিরিহীন ধোয়া পাজামার ফিতে বেঁধে নিল।

কপাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অন্নের দিকে সসংকোচে চোখ তুলে চেয়ে ইন্দ্র বলল—আমার বস্তাটা দাও। বলেই লক্ষ করল অন্নের চোখ দু'টি কেমন ছলছল করছে।

ইন্দ্রের কথাটা শুনে হঠাৎ কেমন খটকা লাগল অন্নপূর্ণার। চমকে উঠল সে। তারপর কিছু ভেবে না পেয়ে বারান্দার কোণে পড়ে থাকা ইন্দ্রের বস্তাটা তুলে এনে হাতে ধরে রেখে বলল—নেবে না ?

—কী ?

—বেতাই।

—দাও তা হলে ! বলে ইন্দ্র দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল উঠে মেঝের উপর এবং বস্তার মুখ ফাঁক করে পায়ের তলায় ফেলে ধরল বস্তা। অন্নপূর্ণা দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা এনে ধান মেপে দিল। আধ মণ বীজ। মাপা শেষ হলে দড়ি দিয়ে মুখ বাঁধতে গিয়ে ইন্দ্রনাথের আঙুল স্পর্শ করল অন্ন এবং কেঁপে উঠল। তার চোখ নত হয়ে এল।

নত চোখ হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মুখের উপর মেলে ধরে মহাজনী গলায় অন্ন বলে উঠল—তোমার কাছে এক মণ দুই হেটো পাওনা হল ইন্দ্র। ধান উঠলে দিয়ে যেও। অন্নের বলার মধ্যে কোথাও যে একটা চাপা অভিমান বেজে উঠেছিল সেই সুর ধরতে পারল না ইন্দ্রনাথ ওঝা।

বাঁধা বস্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্র। অন্নের চোখের দিকে চাইতে পারল না। এক লাফে সে সিঁড়িতে নেমে এল। সিঁড়ি থেকে বাইরের এই আঙিনায় এবং ঘাড় গুঁজে হেঁটে চলল পথের দিকে।

পিছন থেকে ডেকে উঠল অন্ন—নেবে না?

কোনও উত্তর দিল না ইন্দ্রনাথ।

—নেবে না তুমি? আর্দ্র আর ব্যাকুল হয়ে উঠল অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বর।

—না।

—নিয়ে যাও ইন্দ্র। রাগ করো না। শোন। যেও না। আমাকে বাবা বলেছে, কেউ যেন না ফেরে খালি হাতে।

যেতে যেতে হঠাৎ এবার দাঁড়িয়ে পড়ল ইন্দ্রনাথ। পিছন ফিরে বলল—আমি আখেরিগঞ্জের ছেলে অন্নপূর্ণা। আখেরি মানে শেষ, এরপর আর নেই। তারপর শুধু জল। মাটি নেই। ভারতবর্ষ নেই। আমরা কারও উপর রাগ করি না। আমি জানি মহাজনের বীজ আর ফেরত দিতে পারব না। হঠাৎ মনে হল, বিছনখেগো হয়ে বাঁচার চেয়ে মরা ভাল। পদ্মা আমার দিকে তেড়ে আসছে অন্ন। আমার আর সময় নেই। চলি।

চলে যেতে যেতে ফের ফিরে আসে ইন্দ্রনাথ। ন'অক্ষরী বাসমতির ট্যানা সে গোয়ালঘরের নিচু চালের বাতায় গুঁজে দেয়। তারপর ছুটতে শুরু করে পথের দিকে।

গোয়ালঘরের চালার কাছে ছুটে আসে অন্নপূর্ণা। বাতায় গোঁজা ন্যাকড়া টেনে বার করে নেয়। খুলে দেখে ন'খানা চাল বাঁধা ছিল। অবাক হয়। মাথায় তার কিছুই ঢোকে না। ন্যাকড়ার গিঁট বাঁধে চালসুদ্দো। তারপর ছুটে যায় পথে। ছুটে চলে যাচ্ছে ইন্দ্রনাথ। সেদিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া অন্নপূর্ণার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

হাতের মুঠো থেকে চালবাঁধা অতি ক্ষুদ্র পুঁটলিটা ফেলে দিল না অন্নপূর্ণা। আবার তা নিয়ে কী করবে ভেবেও উঠতে পারল না সারাটা সন্ধ্যা। রাত্রি বেড়ে গেল। চৈত্রের হাওয়া পাকা দালানের মস্ত ছাদে তরঙ্গের মতো বইছে। আশ্চর্য ধুলোয় আচ্ছন্ন আকাশের চাঁদ। সেই দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হল, মুঠোয় ধরা চালগুলি আসলে তুক। নইলে অমন চোরের মতো ন্যাকড়াটা গোয়ালঘরের চালের বাতায় গুঁজে দিয়ে পালাল কেন ইন্দ্র?

ভাবতে বসে অন্নের হাসি পেল। কাকে তুক করল বেচারি ইন্দ্রনাথ? অন্নকে? অন্ন যেন তার হয়! এইসব ভাবনার আশ্চর্য পীড়নে চোখে জল এসে গেল। নীচে নেমে কাঁচের গেলাসে জল নিয়ে আবার ছাদে এল অন্নপূর্ণা। তারপর ন'অক্ষরী চাল, এই অক্ষর পড়ে উঠতে পারেনি অন্ন, কারণ ওতে যে অক্ষর এঁকেছে ইন্দ্র তা সে ভাবতেই পারছে না, সেই চাল জল দিয়ে গিলে নিল। মনে হল, তার কেমন আচ্ছন্নতা ঘিরে আসছে বুঝি। ভেবে আবার হাসি পেল তার। কান্নাও পাচ্ছিল।

সারা রাত ঘুমাতে পারল না অন্নপূর্ণা। বিছানায় শুয়ে ছটফট করল। ভোরে হঠাৎ মনে হল, ইন্দ্রনাথ মন্ত্র জানে না। তা হলে বাতায় কেন গুঁজল অমন করে এই চালের ন্যাকড়া? সে জানে না ঠিক, তবে তুক-করা লোক তো সংসারে আছে। তারাই কেউ ইন্দ্রকে ওই চালে মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। বলেছে, বাতায় গুঁজে দিতে। যত অন্ন ভাবে, ততই মনে হয় সে কারও প্রেমে পড়েছে। মন তার আশ্চর্য চঞ্চল হয়ে উঠল।

নিজেকে বলল—আমার উপর তুক করেছে ইন্দ্র। অতএব আমাকে যেতে হবে।

—কোথায় যাবে তুমি? গোয়ালঘরের চালে বসে থাকা একটি লাল টুকটুকে মোরগ অন্নকে শুধালো। এই বদমাশ তুখোড় জীবটা বিছন খায়, কুঠি খুললেই তাক করে ছুটে আসে। ওকে সামলানো যায় না। ওর দু'পায়ে অদ্ভুত জোর, ডানায় আশ্চর্য সাহস। নখে তীব্র ধার। গলায় বীজ-খাওয়ার উল্লাস। এই মোরগটার নাম চুনিলাল।

চুনিলালকে অন্ন বলল—তোমার মতো সাহস নেই যার, তার কাছে যাব।

—কার কাছে, কার কাছে! চোখ পিটপিট করে জানতে চাইল চুনি।

অন্ন বলল—যার তোমার মতো তুখোড় ডানা নেই, যে ঝাপটা জানে না, তার কাছে।

—কার কাছে বললে!

—যার তোমার মতো ধারালো নখ নেই, ঠোঁট নেই। আমি নিশ্চয় যাব। চিরকালের মতো যাব।

—বীজ নিও সঙ্গে। বেতাই। আড়াই দিনের দম।

—নিশ্চয়। আমি সব কিছুর বীজ সঙ্গে নেব। মানুষের সংসারে যা যা বিছন লাগে, সব নেব। আমি আর ফিরব না চুনিলাল।

—তুমি যে চক্রবর্তী মহাজনের মেয়ে গো! কালীদহে যাচ্ছ! মানুষের বীজে সইবে নাকি!

—তুমি চুপ করো। আগেই বলেছি, আমি আর ফিরব না। এই বলে গাড়োয়ান ডেকে গাড়ি সাজালো অন্নপূর্ণা। সাজাতে সাজাতে মনে হল, কোন আকাশে কালো-নীল মেঘ যেন সেজে উঠেছে। তার বর ইন্দ্রনাথকে সে মনের মতো করে সাজাবে।

'কালীদহের কূলে কালো মেঘ যেন সাজিল রে'...

অন্নপূর্ণার হাতে দুনিয়ার সকল বীজই যেন সেজে উঠল। ধান ছাড়াও সে সঙ্গে নিয়েছে ঝিঙে, লঙ্কা, করলা, শশা, কুমড়ো, ফুটি, বেগুন, চিচিঙ্গা—সব, যা যাগে। সে নিয়েছে সরষে, ছোলা, গম, যব, তিসি, তিল। ভড়ের মাটিতে যা যা সক্রিয় এবং শোভন কিছুই যেন বাদ নেই। বীজেরা যেন মুকুট পরে আজ অন্নপূর্ণার সঙ্গে চলেছে।

সূর্য ডোবার আগে গরুগাড়ি করে আখেরিগঞ্জ পৌঁছল অন্নপূর্ণা। ভারত এখানে শেষ হয়ে এসেছে। পদ্মা এখানে গর্জমান, বধির, চক্ষুহীন এবং একগুঁয়ে। ঢেউয়ের শত-সহস্র-লক্ষ জিহ্বা মানুষের বসতি-মৃত্তিকাকে ভিলেনের মতো লালসায় চাটে। চাটে আর খায়।

হরনাথ ওঝা মহাজনের মেয়েকে দেখে ভয়ে কেমন সিঁটিয়ে গেল। আরও ভয় পেল যখন হরনাথকে প্রণাম করল অন্নপূর্ণা। হরনাথের মাটির দেওয়াল গাঁথা চারচালা পদ্মার ক্রোধ-রসায়িত-হিংস্র হাওয়ায় মটমট করছে, ভেঙে পড়ে যাবে বলে কাঁপছে।

শস্য-বীজ গাড়ি থেকে নামাতে গেল গাড়োয়ান ; অন্ন বলল—আমি বেতাইয়ের বিছন এনেছি বাবামশাই, আপনার ছেলেকে ডাকুন।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হরনাথ। মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্তি হতে চাইল না। হঠাৎ কেমনই আটকা-শব্দ ছিটকে এল মুখ থেকে—থাক্! বলে হাত তুলল হরনাথ গাড়োয়ানের দিকে।

—কেন বাবা! এখানে আমি থাকব বলে এসেছি! বলেই দূরে চেয়ে দেখল অন্ন, পদ্মার দিক থেকে এগিয়ে আসছে ইন্দ্রনাথ। খালি গা, কাদার ছিটে লাগা। পরনে ময়লা লুঙ্গি। মাথায় মাথাল।

প্রথমে খুবই অবাক হল ইন্দ্রনাথ। চেয়ে দেখল অন্নপূর্ণার চোখে চাপা অশ্রু চিকচিক করছে। গাড়ির বস্তাগুলোর দিকে চোখ গেল ইন্দ্রনাথের। বস্তার মুখ খুলে খুলে বীজগুলি হাতে তুলে পরখ করল সে। সবগুলি দেখে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল তার। তারপর চোখ তুলল।

—নেবে না?

—না।

—একটা বীজও নষ্ট নেই ইন্দ্র। আমি বলছি, তুমি নেবে না? প্রত্যেকটির অঙ্কুর হবে। প্রত্যেক গাছে শিষ হবে। বেতাই মুখ তুলবে। আমি যাব না। কিছুতেই যাব না আমি। তুমি নাও।

হরনাথ বলে উঠল—সব বীজ মাটি পায় না মা। উড়ে বেড়ায়, ভেসে বেড়ায়, আঁধারে, কালীদহে, সব ন্যাংটো ; পোশাক পায় নাই, আত্মা পায় নাই, অন্তর পায় নাই, শুধু বীজ কী করব মা ! যদ্দিন বিষহরির মাটি পদ্মা না খেয়েছে, তদ্দিন বীজখেগোরা গেছে দরবার করতে। মাটি না থাকলে বিছন কেউ দেয়, তুমিই বল ! গতকাল ভোরে মাটি চলে গেছে, এখন আমাদের কালান্তরে যাত্রা। তুমি এসো। ওরে ইন্দ্র, গরুর কাঁধে জোয়াল উঠায়ে দে।

—নাও, ধর হে। হাত লাগাও। বলে গাড়োয়ানকে হাঁক দিয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ ওঝা।

আশ্চর্য কঠিন দেখাচ্ছিল ইন্দ্রের মুখ, ইন্দ্রের বাহু।

গাড়োয়ান বলল—ছইয়ের ভিত্‌রি ঘুসে যাও গো অন্নদিদি। সাঁঝ হয়েছে।

চোখের কোণের জল আঁচলে মুছে নিয়ে গাড়ির ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল অন্নপূর্ণা।

পিছনে চেয়ে বসে ছিল অন্নপূর্ণা। হঠাৎ ডাকল—তুমি আমাকে এগিয়ে দেবে না ইন্দ্র ? পাকা সড়ক পর্যন্ত তুলে দিয়ে এসো।

গাড়ির পিছুপিছু এগিয়ে চলল ইন্দ্রনাথ। সহসা বলল—আমারই শুধু একার যায়নি অন্নপূর্ণা। পদ্মা প্রতি সন ভাঙছে। গোটা বসতি, বাজার, দোকানপাট সবই গেছে। খবরের কাগজে মাঝে-মিশেলে খবর হয়।

—তুমি চলে এলে কেন ?

—এসে দেখি বিষহরির জমি তলিয়ে গেছে, আর কী কষ্টের রইল ! সবই এখন জলের মতন সমান।

—তুমি তুক করলে কেন ইন্দ্রনাথ !

—তুক !

—নটা চাল। শুনেছি। বল, তোমার সাহস কী করে হল।

—চালের গায়ে আমি অক্ষর লিখেছিলাম। তুক কেন করব ! আমি তো মন্ত্রই মানি না অন্ন।

—কী লিখেছিলে ?

—তোমাকে বলব কেন ?

—বলই না। আমি তো চলেই যাচ্ছি।

—বাসমতি, তুমি কার ?

—আটটা হল হে !

—নটা করবার সাহস কোথা অন্ন ! ভাগ্যিস জমিটা গেছে ! নইলে কী করে ফিরতে অন্নপূর্ণা !
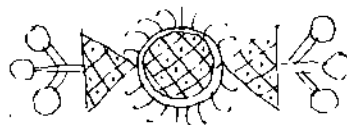
ঢোঁড়া উপাখ্যান ॥ স্বপ্নময় চক্রবর্তী

দুপাশের সবুজকে ছিঁড়ে রমারম চলে গেছে লাল রাস্তা। বু-বু-বু বাতাস। বংকা দাঁড়িয়ে পড়ে।

—একটা বিড়ি খাবার মন করে।

—ধুস্। বিড়ি খাবি কিরে, চল পা চালিয়ে, স্যারের এখনো চান খাওয়া হয়নি। নস্করীবাবু বলে। নস্করীবাবুর হাতের আঙুলে সিগারেট।

—না বাবু, এট্টু বিড়ি না ছাড়া চইলবেনি। এট্টু রোসো।

—'এক পয়সার মুরগি তো চার পয়সার পুদ্গানী'—নস্করীবাবু নিজে নিজে হাওয়া আর ধানগাছের কাছে বলে। আড়চোখে অফিসারের দিকে একবার তাকায়। অফিসার তখন আকাশের মেঘে কুড়িমুড়ি দিয়ে বসা বোতল-দৈত্যটাকে দেখছিল।

বংকার মাথা থেকে নস্করীবাবু বেডিংটা নামায়, কালো ট্রাংকটা নামায়। কালো ট্রাংকের গায়ে সাদা রঙ-এ লেখা অমিতাভ মুখার্জি, ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসার।

—এখানে বসুন স্যার, এই ট্রাংটার উপর। একটু রেস্ট নিয়ে নিন, নস্করীবাবু বলল। নস্করীবাবু হল 'ভাসাদেউলে' ক্যাম্পের আমিন।

—আপনার দুটো চিঠিই পেয়েছিলাম স্যার, আপনার লাস্ট চিঠিটায়, ডেটেড টোয়েনটি ফিফ্থ আগস্ট, লিখেছিলেন ফোর নুনে জয়েন কববেন। বেলা এগারটা থেকে বসে আচি স্যার।

—দুঘণ্টা তো বসে রইলাম গুস্করায়, কাসেমনগরের বাস নেই। গলসি থেকে তো স্টার্ট করেছিলাম সকাল সাড়ে সাতটায়।

আবার চলতে শুরু করে ওরা। আর কদ্দুর নস্করীবাবু?

—তা ধরুন আরও তিন কিলোমিটারটাক।

—হুঁ।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে—ওর যেখানে থাকতে হবে, সেখান থেকে নিয়ারেস্ট বাসরাস্তা ৮/৯ কিলোমিটার দূর। কি আজব জায়গায় ট্রান্সফার। অমিতাভ ভাবে।

—অফিসে কাজ-কম্মো হচ্ছে কিছু? অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে।

—রাজা নেই তে রাজ্য চালাবেক কে? অফিসার কই?

—অফিসঘরটা কেমন?

—গেলেই দেকবেন।

—থাকব কোথায়?

—আমরা তো অফিসেই থাকি। আপনি অফিসার মানুষ, দেখুন...।

—আচ্ছা, আনন্দ কোঙারের নাম শুনেছেন? গলসির আনন্দ কোঙার!

—মানে হাঁদুবাবু তো? কেন বলুন দেকি!

—না, এমনি। এখানেও ওনাকে চেনে?

—আমার ভেয়ের একটা চাকরি করে দিয়েছিলেন তো, একটা এমেলের চিঠি এনে দিইছিল আমার সোম্বন্ধী। সেই চিঠি নিয়ে ওনার কাছে গেলাম, ব্যবস্থা হয়ে গেল। হাঁদুবাবু লোক খুব ভাল...।

অমিতাভ অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলে না। নস্করীবাবুও ঠিক বোঝে না সাহেব হঠাৎ চুম্ মেরে গেলেন কেন।

অমিতাভ এবার বংকার কাছে যায়।

—তোমার নাম বংকা ?

—আজ্ঞা।

—বংকা কী ?

—দাস।

গলার তুলসীমালার কণ্ঠি দেখে জিজ্ঞাসা করল, বৈষ্ণব ?

—আমরা বলরামী।

—সেটা আবার কী ?

—সেটা হল বলরামী।

—থাকা হয় কোথায় ?

—থেকেও আছি গো, থেকেও নেই,

যেমন তুমি আর আমি রে ভাই—

চক্ষু মেলিলে সকল পাই

চক্ষু মুদিলে কিছু নাই।

নস্করীবাবু অমিতাভর হাত ধরে মৃদু টান দিল।

—ওকে বকাবেন না স্যার, ও একটা খ্যাপা। নিজেকে ভাবে রামচন্দ্র। আসলে ও জাতে হাড়ি।

—নাম তো বলল বংকা দাস।

—আরে দাস তো সবাই, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও দাস কালিদাসও দাস আবার বংকা দাসও দাস। ও হল নিরাপদ চ্যাটার্জির মাহিন্দার।

বংকা এবার রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে যায়। অমিতাভর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠতে নস্করীবাবু বলে—অনেক শর্টকার্ট স্যার, আবার রাস্তাতেই উঠব ফের।

ভাঙা জমি। পতিত। পাথুরে। কাঁটাঝোপ, তাতে হলুদ ফুল, মাঠের মাঝখান দিয়ে টায়ারের গভীর কারুকাজ।

—এটা কিসের দাগ নস্করীবাবু ?

—মাটির তলায় তেল আছে ভেবে অনেক লোকজন আর বড় বড় এয়েছেল ? স্যার। মাস তিনেক তোলপাড় করে চলে গেল।

মাঝে মাঝে গর্ত। মাটি ফুঁড়ে চাগিয়ে আছে পাথর। বংকা অনেকটা এগিয়ে গেছে। অমিতাভ হোঁচট খায়। নস্করীবাবু চেঁচিয়ে ওঠে, লাগেনি তো স্যার ? অ্যাই বংকা, কায়দা দেকাচ্ছিস ! ফোঁপড়ী করে কে তোকে মাঠ ঠেঙে যেতে বলেছিল ? রাস্তা দিয়ে গেলেই তো হোত।

বংকা দাঁড়িয়ে যায়। বলে, আগে হাঁটনী, পাঁঠা কাটনী, মাটি নিরোয়, পোয়াতীর ধাই—এসব কম্মের যশ নাই।

নস্করীবাবু অমিতাভর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে কিছুটা ঘাড় বেঁকাল। যার মানেটা দাঁড়াল—দেখলেন তো, যা বলেছিলাম...।

হলুদ টিনের পাতে কালো কালিতে লেখা—'সেটেল্‌মেন্ট হলকা অফিস। ভাসা দেউলে। পাকা বাড়ি। দেযালে সদ্যমারা পোস্টার—কাসেমনগর ফুটবলমাঠে যাত্রাপালা—সিঁথির সিদুঁর। পরবর্তী আকর্ষণ ফুলনদেবী। টানা বারান্দা তিনটে ঘর।

—এই যে স্যাব অপিস ঘর। পাশেব এই ঘরে আমরা কোনরকমে থাকি, আর এই ঘরে রান্না।

—বাথরুম নেই?

—ওটা স্যার বাইবে যেতে হয়।

অমিতাভর কুঞ্চিত কপালে বিরক্তি-চিহ্ন নস্করীবাবুর নজর এড়ায় না।

—আমিন আর নেই?

—আর একজন আছে স্যার, নারায়ণ গড়াই। দেশে গেচে।

—পেসকার?

—দেশে।

—পিওন?

—আসবে স্যার। এখন দেশে।

সকালবেলা উঠতে একটু দেরি হযে যায় অমিতাভর। বেশ ঝলমল করছে রোদ্দুর। বারান্দা জুড়ে গোটা দশ-বারো বাচ্চাকাচ্চা। নস্করীবাবুর খালি গা। অমিতাভর বসার চেযারটা বার করে বসে পড়াচ্ছে—স্বরে-অ খিয় অক্ষ। দ-খিয দক্ষ...।

সকালবেলাটায় সামান্য টিউশনি স্যার...নস্করীবাবু বলে।

অমিতাভর গাযে তোয়ালে জড়ানো, হাতে টুথব্রাশ, বাইরে বেরুচ্ছে, এমন সময় ধুতি ও হাফ-পাঞ্জাবি পরা ফর্সামত একজন, পাকাচুল, পুরো বডিটাই হাসছেন, হাতজোড় করে বললেন—আপনি বুঝি নতুন সেটেলমেন্ট অফিসার? নমস্কার। আমি নিরাপদ চ্যাটার্জি। অমিতাভ একহাতের টুথব্রাশ অন্যহাতের সিগারেটের সঙ্গে লাগিয়ে মাথা নিচু করে।

নিরাপদবাবু বলেন—বাহ্য ফিরতে যাচ্ছেন বুঝি? যান। আমি বসচি।

—কিছু দরকার?

—সবসময় কি দরকার-অদরকার বিচের চলে? আমি আসি। খোঁজখপব করি।

—ও। ভালো কথা। আনন্দ কোঙারকে চেনেন? গলসির?

—হাঁদু কোঁয়ার? খুব করিতকর্মা লোক। কেন, কী হয়েচে?

—না, এমনি।

অমিতাভ বাইরে আসে। পর পর দশ-বারোটা কাঁচা ঘরের পরেই আকাশের নীল মাঠের সবুজে মিশেছে। মাঠ-দাপানো হাওয়া। ওর আর কিছু না। এখন একটু আড়াল চাই।

গলসিতে বেশ তো ছিল অমিতাভ। জি. টি. রোডের উপরই অফিস। উল্টোদিকে বিডিও অফিসের স্টাফ কোয়ার্টার্স। এক ব্যাচেলার এক্সটেনশন অফিসারের কোয়ার্টার্সে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে ছিল। স্যানিটারি ল্যাট্রিন ছিল, ট্যাপ-ওয়াটার ছিল। সন্ধের পর পাশের কোয়ার্টার্সে গিয়ে বৌদি চা খাবো...।

গলসির সেট্‌লমেন্ট অফিসে এক দুপুরবেলা এসেছিল আনন্দ কোঙার।

—এই একটু আলাপ করতে এলাম, নিন, সিগ্রেট খান। এক্কেবারে কচি বয়েস

আপনার। ফাস্ট পোস্টিং ?

কিছুদিন পরই তদন্তের কাজ শুরু হল। মাঠে গেল অমিতাভ।

ডি ভি সি-র খাল মাঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে গেছে। সেচের জলে বছরে তিনবার চাষ।

—৬৭ নম্বর দাগ ?

—শালি। দং আনন্দ কোঙার। পিং দীনবন্ধু। ৮০ শতক।

—৬৯ নম্বর ?

—শালি। দং বিভাবতী দেবী। স্বামী আনন্দ কোঙার। ৫৫ শতক।

—৭০ নম্বর ?

—নিস্তারিণী দেবী। স্বামী ৺রাধামাধব যশ। সাং বারাণসী। ৬৯ শতক। লিখুন বর্গা-দখল আনন্দ কোঙার।

—সে কী কথা আনন্দবাবু, কী বলছেন ? আপনি বর্গাচাষী ?

আনন্দবাবু হাওয়াই শার্টের তিন নম্বর আর চার নম্বর বোতামের ফাঁক দিয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বিধবা মামিমার জমি ভাগে চষি।

—আপনি নিজে চষেন ?

—অতশত নিকেশ নিচ্ছেন কেন বলুন তো ? গভরমেন্ট বলছে বর্গা রেকর্ড করতে, আপনি রেকর্ড করুন। যত রেকর্ড করতে পারবেন আপনার প্রমোশনের ভালো হবে।

—আমার প্রমোশন আপনাকে ভাবতে কে বলছে ?

—আচ্ছা, ঠিক আছে মশাই, বর্গা লিখতে হবে না। নিস্তারিণী দেবীর নামটাই লিখে রাখুন।

—আপনার মামিমা কোথায় ?

—বললুম তো, কাশীবাসী। চাষ করে আমি ওনাকে টাকা পাঠাই।

—ওনার কত জমি আছে ?

—তা বিঘে চল্লিশ হবে।

—টাকা পাঠিয়েছেন এমন মানিঅর্ডার রসিদ আছে ?

—সে সব কি যত্ন করে করেছি ?

—আপনার মামিমা ফসলের টাকা পেয়েছেন, এমন চিঠিপত্র আছে কিছু ?

জামার ভিতর থেকে হাত বের করে আনে আনন্দ কোঙার। সিগ্রেট ধরায়। বলে, মামির নামের দলিল রয়েছে।

তাতে কি হয়েছে ? আদৌ আপনার মামিমা আছেন এমন প্রমাণ দেখান।

—তাহলে কাগজের জোরে করবেন না ?

অমিতাভ ভিতরে ভিতরে বেশ থ্রিলড হচ্ছিল। সিলিং ফাঁকি দেওয়া নীট ১৪ একর জমি বার করে ফেলেছে ও। অমিতাভ শিওর যে নিস্তারিণী দেবী সম্পূর্ণ ফল্‌স্।

সন্ধ্যাবেলা আনন্দবাবু হাজির। হাতে এক বাক্সো মিষ্টি।

—একা একা বসে আছেন, আরে বে-থা করুন ভাই। কেউ ঘরে এলে চা করে দেবারও কেউ নেই।

—ঘরেই এসে গেছেন ? তা আপনার মামিমার চিঠিপত্র খুঁজে পেলেন ?

—চিঠিপত্র খুঁজে পাওয়া কি খুব শক্ত ব্যাপার নাকি ? দরকার হলে কাশী থেকে

একডজন চিঠি লিখিয়ে আনতে পারি।

আনন্দবাবুর হাতটা ওর বুকপকেটের কাছে যায় বলে, অতসব ফ্যাচাং-এর দরকার নেই। এটা ধরুন। দু-হাজার আছে।

অমিতাভ উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করেছিল—এক্ষুণি বেরিয়ে যান, টাকা দেখাতে এসেছেন!

আনন্দবাবু হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তারপর দাঁতমাজার আঙুলটা নাড়িয়ে বললেন---আমার নাম হাঁদু কোঁয়ার। আগুরিব বাচ্ছা বটি। আমিও দেখে নেব। কাজটা ভালো করলেন না।

পরে জেনেছিল হাঁদুবাবু একজন বিখ্যাত লোক। চারটে বাস লাইনে খাটে। বর্ধমান বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। কোল্ডস্টোরেজ আছে একটা। এখানকার গলসির স্কুলের জন্য জমি দান করেছিলেন উনিই, বর্ধমান শহরে থাকেন, ওখানে বাড়ি আছে, এখানে মাঝে মাঝে আসেন।

মাসখানেক পরে অমিতাভ খাকি খামে অশোক স্তম্ভ লাগানো রেজিস্ট্রি চিঠিতে জেনেছিল—গভর্নর ইজ প্লিজড টু ট্রান্সফার শ্রী অমিতাভ মুখার্জি, কে. জি. ও. গ্রেড ওয়ান টু ভাসাদেউলে হলকা অফিস ইন দি ইন্টারেস্ট অব পাবলিক।

একটু আড়াল খুঁজছিল অমিতাভ। অবশেষে একটা ছোটমত কালভার্ট পায়। আস্তে জল বইছে। এখানেই একটা পার্মানেন্ট ব্যবস্থা করলে কেমন হয? ওর অফিসে কিছু ইট পড়ে থাকতে দেখেছিল, ওখান থেকে দুটো ইট দুই হাতে নিয়ে গেজেটেড অফিসার হাঁটছে কালভার্টের দিকে, তখন বংকার সঙ্গে দেখা--।

—কি ছ্যার, আপনার হাতে ইঁট? দেন-দেন, আমার হাতে দেন, কোথায় নে যাব?

অমিতাভর বলতে লজ্জা করে কোথায় নিতে হবে। বলে, তোমার দরকার নেই। তোমার নিজের কাজে যাও।

বংকা যাবার সময় বিড়বিড় করে—আমি যাই তিনি তাই, যা তিনি তাই তুমি, বোবা কালায় কয় কথা, ইন্দুরে খায় বিড়ালের মাথা।

খ্যাপা না কী? অমিতাভ ভাবে।

ইটদুটো নিয়ে কালভার্টের তলায় চলে গেল অমিতাভ। ইটদুটো পেতে নেয। তলায় জল। নিরিবিলি। কাশফুল দুলছে।

কদিন পরে ঐ কালভার্টের ওখানে যাবার সময দেখে, একটি ১২/১৪ বছরের ছেলে ইটদুটো নিয়ে যাচ্ছে। অমিতাভ ঘাবড়ে যায়।

—আরে আরে এগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—শান হবে। পা ধুবার শান।

—মানে?

—পা ধুয়া হবে, পায়ে কাদা মোট্টে লাগবে না।

নিরাপদবাবু রোজই প্রাতঃভ্রমণে বের হন। পঁচাত্তরেও সুন্দর স্বাস্থ্য। গোয়ালটা, মরাইটা, দিঘিটা, একটু তদারকি করে অফিসটায় আসেন। আসলে এটা তাঁরই তো বাড়ি। বড ছেলেটা এখানে ডাক্তারি করবে ভেবে রাস্তার ধারে এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলে বর্ধমান টাউনেই ডাক্তারি করে। ওখানেই একটা ছোট করে নার্সিংহোম বানিয়েছে।

নিরাপদবাবু জিজ্ঞাসা করেন—কী সাহেব, আপনি নাকি দুটো ইট দুহাতে নিয়ে হাঁটছিলেন ? ব্যায়াম করছিলেন নাকি ?

অমিতাভ একটু হেসে নিয়ে ব্যাপারটা বলে। আর বলে—সব কিছু পারি নিরাপদবাবু, মাঠে বসে ওইটে পারি না।

নিরাপদবাবু বললেন—ছ্যাঃ। আমারই তো আগে তত্ত্বতালাশ নেয়া উচিত ছিল। আপনি সিধে আমার বাড়ি চলে যাবেন। কোন সংকোচ করবেন না।

—হুঃ, তা কি হয় নাকি ? আপনার বাড়ি যাব ওইটে করার জন্য ?

—শুধু ওইটি করার জন্য যেতে কে বলেছে ? সবসময় যাবেন। আমার ছোট ছেলেটি তো আপনারই বয়সী। বিকাশের সাথে আলাপ হয়েছে ?

একদিন নিরাপদবাবুর সঙ্গে ও-বাড়ি গেল অমিতাভ। পাঁচিল-ঘেরা একতলা বাড়ি, উঠানে বিশাল মরাই, উঠানের কোণায় পায়খানাটাকে আঙুল উঁচিয়ে দেখালেন নিরাপদবাবু। ভালোই হল, বাড়ি থেকে বেশ দূরেই আছে। বারান্দায় শস্যের ঘ্রাণ ও ইঁদুরমারার কল। নিরাপদবাবুর স্ত্রী দুধ মেরে ঘরে তৈরি করা ক্ষীরের নাড়ু ও বেশি মিষ্টি দেয়া চা দিলেন। বিকাশের স্ত্রীর চুড়ির শব্দ ও গলার স্বর শুনল। গোলগাল চেহারার বিকাশ বি. কম পরীক্ষা দিয়েছিল, হয়নি। একটা ট্রাক্টরের জন্য ব্যাংক লোন চেয়েছিল, মায়ের দয়ায় হয়ে গেছে। গলায় ঝোলান সোনার হারের লকেটে মিনে করা মা কালী স্পর্শ করে হাত কপালে ছোঁয়াল। শিগ্‌গিরি ট্রেনিং-এ যেতে হবে হরিয়ানা। বিকাশ বাগানে নিয়ে গেল। সিগারেট বের করল। 'নিন স্যার ধরান একটা।' বিকাশের পরনে কর্ডের প্যান্ট এবং পলিয়েস্টার গেঞ্জি। আঙুলে প্রবাল।

জানেন স্যার, বাবার খুব আপত্তি, বলছে বামুনের ছেলে চাষ করতে নেই। ট্রাক্টর তো কি হয়েছে, ওটাও তো লাঙল, কলের লাঙল। আমি ওসব মানি না। যত সব কুসংস্কার, আপনার কি ওপিনিয়ন স্যার ?

অমিতাভ বলল—পাঞ্জাব-হরিয়ানায় উঁচু জাতের এডুকেটেড ছেলেরাই তো চাষ করছে...।

—বিডিও সাহেব ঠিক এই কথাই বললেন আমাকে। উনি আমাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসেন। ট্রাক্টর ছাড়া আর উপায় নেই স্যার, মুনিষ-মজুররা পলিটিকস করতে শিখে গেছে। আজ এটা দাও, কাল সেটা দাও...আর পড়তা পোষায় না। আমার স্যার একটু সুবিধে আছে, জমিগুলো সব একলপ্তে। দু' একটা এক্‌সচেঞ্জ করতে হবে। একটু দেখবেন স্যার...।

চিঠি পাঠিয়ে দেশে পালানো স্টাফদের অফিসে নেয় অমিতাভ। কুনুর নদীর পাড়ে মাপজোক শুরু করে। বড় আঁকাবাঁকা নদী। বেহুলা নাকি এই নদী বেয়েই লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় ভেসেছিল। মনসার অভিশাপে নদীটা এরকম এঁকেবেঁকে গেছে।

কাজ থেকে ফিরে এসে একটু রিলাক্‌স করার যো নেই। একটা ঘরে এক গাদা স্টাফ। ওরা কাগজে মোড়ানো বই পড়ে, টুয়েন্টি নাইন খেলে, অমিতাভর বইপত্র ওলোটপালোট হয়। বিদিশার চিঠিও সম্ভবত খুলে পড়েছে...।

—আপনি অফিসার মানুষ, এসব আমিন-পিওনদের সঙ্গে থাকেন কি করে বলুন তো ? নিরাপদবাবু একদিন একা পেয়ে বলেন।

—কি করা যাবে, সরকারের তো কোন ব্যবস্থাই নেই।

—তবেই বলুন সরকার কি করে অফিসারদের কাছে ভাল কাজ আশা করবে ?

অমিতাভ কিছু বলে না।

এক কাজ করুন মুখার্জিবাবু। আমার বাড়িতে একটা বাইরের ঘর এমনি এমনি পড়ে আছে। এটা বাবার আমলে গদিঘর ছিল। নিজের মত থাকবেন। কেউ ডিস্টার্ব করবে না। চলুন, দেখবেন ঘরটা।

অমিতাভ দেখল, ধুলোভর্তি তক্তোপোস আছে, টেবিল আছে, দক্ষিণের জানালা আছে। জানালার ধাবেই বকফুল গাছের পাতার ঝিরঝির। খুব পছন্দ হল ঘরটা। প্রাইভেটে এম. এ. পরীক্ষাটা সামনের বছরই দিয়ে দিতে হবে। অমিতাভ বলল— আপনাকে ভাড়া নিতে হবে কিন্তু।

—সে দেখা যাবেখন।

আবার বংকার মাথায় চাপল বেডিং আর কালো ট্রাংক।

অমিতাভ নস্করীবাবুদের কাছেই খেতে আসে। খাওয়া খরচ খুব কম পড়ে। নস্করীবাবুর বুদ্ধি অসাধারণ। সব্জির মাঠে চেন পিওন নিযে যায়। নস্করীবাবু বলে, মাপ হবে।

—ভরা ক্ষেতে লোহার চেন চললে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে না?

—তা কি আর করা যাবে, সরকারের কাজ। অবশেষে ফয়সালা হয়। চেন পিওন কুমড়োটা মুলোটা নিয়ে ফিরে আসে।

—এসব কি ঠিক হচ্ছে? এভাবে মিথ্যে কথা বলে...।

নস্করীবাবু বলে—আমরা হচ্ছি স্যার আমিন। আপনাদের আ, মিথ্যেবাদীর মি আর নিমকহারামের ন মিলে হচ্ছে গে আমিন। আমাদের ছেলেপুলের সংসার। দেশে টাকা পাঠাতে হয়। আমাদের এভাবেই ম্যানেজ করতে হয়।

বিকাশ একদিন একটা কেরোসিন স্টোভ দিয়ে গেল। 'চা-টা খাবেন স্যার যখন ইচ্ছে হবে। একটু চা-চিনি রাখবেন, আমি আধসেরটাক করে দুধ দিয়ে যাব।'

—দুধ-টুধ দরকার নেই, আমার তো চা-ই বেশি ভাল লাগে। অমিতাভ তাড়াতাড়ি বলে।

বিদিশাকে চিঠিতে জানায়—আগের অসহ্য অবস্থায় আর নেই, একটু বেটার আছি। নিজে রান্না করে খেলে কেমন হয়? সহজ রেসিপি পাঠিযে দিও। অভ্যেস হয়ে যাওয়া ভালো, পরে অনেক স্ত্রী-স্বাধীনতা হবে।

বিকাশ ট্রেনিং যাবে। দেউলগড়ে পুজো দেওয়া হল। দেউলেগড় মানে একটা ছোটখাটো ঢিপি। এখানে নাকি একটা দেউল ছিল। কুনুরের বানে সেই মন্দির ভেসে গেছে। তাই এই গ্রামের নাম ভাসাদেউলে। বিকাশের কপালে চন্দন তিলক। ওর মা যাবার সময় কড়ে আঙুল কামড়ে দিল। মাথায় আলতো থুথু দিল। বিকাশের স্ত্রী কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। সে বিকাশকে পা ছুঁয়ে নমস্কার করল। বংকার মাথায় বেডিং। গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে উঠানে। অমিতাভর ঘরে এল বিকাশ। 'আমার বাবা রইল। বাবাকে দেখবেন স্যার। আর আপনার টুকটাক কাজকর্ম বংকাকে বলবেন, করে দেবে। অ্যাই বংকা, সাহেবের জলটল এনে দিবি।'

গোরুর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয় অমিতাভ। বিকাশ আস্তে আস্তে বলে—এই বংকাকে নিয়ে খুব ঝামেলা, কাজকম্ম কিচ্ছু করে না, খালি খ্যাপামি। পুরোনো লোক, তাড়াতেও খারাপ লাগে। গোরুর গাড়িতে বিকাশের মা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যাবে বোধ হয়। আরও দুজন মাহিন্দার, ওরা বর্ধমান পর্যন্ত যাবে বোধ হয়। আর বিকাশের

মামাতো ভাই, হাওড়া পর্যন্ত যাবে বোধ হয়। বিকাশের চোখে গগল্‌স। পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দুগ্‌গা—দুগ্‌গা।

কুনুর নদীর পাড় থেকে মাপজোক সরে আসছে গ্রামের দিকে। নিরাপদবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলা অমিতাভর ঘরে ঢুকলেন। হাতে সামান্য কচলামি ভাব। কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তো মুখার্জিবাবু। তার পরে বললেন—আমার জমিতে কোন গণ্ডগোল পাবেন না মুখার্জিবাবু। কোন বর্গা চাষ নেই, যা ছিল উঠিয়ে দিয়েছি। মুনিষ-মাহিন্দার দিয়ে চাষ করাই। ছেলেটা তো নিজেই চাষ করবে বলছে। কাজটা কি ভাল হচ্ছে!

—তা—খারাপ কি? অনেকেই তো করচে।

—আপনারা পাঁচ জনে বলচেন বটে, কিন্তু মন সায় দেয় না। পরে লোক পাওয়া যাবে, কি বলুন, ট্রাক্টর চালাতে জানে এমন লোক মাইনে দিয়ে রাখলেই আর নিজেকে চালাতে হবে না কি বলুন। এরপর নিরাপদবাবু বলেন—একটা আমবাগান ছিল আমার, পৈতৃক, তা বিঘা বিশেক ছিল। আম মোটে হয় না, কেবল জঙ্গল, তাই ওটা কেটে সাফ করে চাষের জমি বানিয়ে ফেলেচি। আগেকার রেকর্ডে ওটা আমবাগান দেখানো ছিল। এখন নতুন রেকর্ডে স্যার ওটাকে আমবাগানই রেখে দেবেন। জমি দেখাবেন না...।

ব্যাপারটা বুঝল অমিতাভ। পরিবার পিছু ৫২ বিঘে হল জমির সিলিং। এর বেশি হলে সরকার নিয়ে নেবে। কিন্তু বাগান থাকলে সে জমি রাখা চলে।

নিরাপদবাবু ছেলেদের নামে আলাদা আলাদা জমি সিলিং পর্যন্ত রেখেছেন। এখন আমবাগানটা যদি জমি দেখানো হয়, সেই জমি সরকারের ঘরে চলে যাবার কথা।

কপাল কুঞ্চিত হয় অমিতাভর। বলে—তা কি করে সম্ভব! ওটাকে চাষের জমিই দেখাতে হবে।

অমিতাভর হাত চেপে ধরেন নিরাপদবাবু। বাইরে বকফুল গাছের ঝিরঝির। ঘরের সদ্য চুনকাম হওয়া দেয়াল থেকে উঠে আসা গন্ধের মধ্যে নিরাপদবাবু বললেন—আপনি আমার ছেলের মত, এটা করে দিতেই হবে...।

বিদিশাকে চিঠি লেখার জন্য ডাইরির কাগজ ছেঁড়ে অমিতাভ। বেশ কিছুদিন আগেকার লেখা একটা ছড়া পায়।

হাঁদুবাবু, হাঁদুবাবু কোথায় তুমি থাকো?
সর্বত্রই থাকি আমি খবরটা কি রাখো?
হাঁদুবাবু হাঁদুবাবু করছ তুমি কি
এই দেখ না পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছি!
হেরে গেলে হেরে গেলে কানুনগো মশাই,
দুয়ো তোমায়, দুয়ো তোমায়, দুয়ো দিয়ে যাই।
আরো যদি হাঁদুবাবু আসে শত শত
করব না আর করব না আর আবার মাথা নত।

ধুস, যত্তসব চাইল্‌ডিশ্‌ ব্যাপার। পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে অমিতাভ। এবার চিঠিতে লেখে—ব্যাড্‌লাক। কলকাতা গিয়ে এবার তোমার সঙ্গে দেখা হল না। পুরী কেমন কাটালে জানিও। জানো তো এখন নিজেই রান্না করছি। খাঁটি সরষের তেল পাচ্ছি। ঘানিতে ভাঙা, কলকাতায় ভাবাই যায় না। তরকারি ভাতে দিয়ে দিই, দু-চার ফোঁটা

সরষের তেল দিয়ে দিই, ব্যস। বংকা নামে এক আজব লোক আমায় জলটল এনে দেয়। সর্বক্ষণ বিড়বিড় করে। চ্যাটার্জিবাবুদের গোয়ালঘরের পাশে থাকে। খড় বিচালিতেই শোয়। বলে ও নাকি বলরামী। অথচ গলায় তুলসী মালা। ব্যাপারটা বুঝি না। এই চাকরিটা ভাল লাগছে না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন নজরে রেখো। টুকটাক পড়াশুনো করছি। এম. এ.-টা হয়ে গেলে একটা স্কুলে অন্তত হয়ে যাবে। বলো ?

বিকাশ ফিরেছে। গালের দু-পাশে লাল লাল ছোপ। চোখের তলায় কালি। আর একটু ফুলেছে।

একদিন বিকাশ বলে—সে কী, আপনি নিজে বাসন ধুচ্ছেন, আমার কিন্তু চোখ টাট্‌ছে। খুব খারাপ লাগছে দেখতে। আমি একটা লোকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বাসন-টাসন মেজে দেবে।

—হারিকেনের চিমনিটা পরিষ্কার করা মহা ঝামেলার...।

—ওটাও করে দেবে। সব করে দেবে, যা চাইবেন। বিকাশের চোখদুটো একটু ছোট ছোট হয়, ঠোঁটে আঁকাবাকা হাসি।

একটা মেয়েকে নিয়ে এল বিকাশ। নাম কুসুম। বংকারই মেয়ে। ছোট বাচ্চা আছে একটা। বাচ্চাটা হবার আগেই লিভার-পচা রোগে মরেছে ওর স্বামী।

ভোর। সারারাত শিশিরের সোহাগ পেয়েছে মাঠ। মাঠের মাটিতে তাই সদ্য আসা ট্রাক্টর টায়ারের আলপনা। ট্রাক্টর এসেছে গ্রামে। উঁচু সিটে বসে বসে ঘটঘট চালাচ্ছে বিকাশ। লাল ট্রাক্টর চলছে কেঁপে কেঁপে। চাষ নয়, এমনিই চালাচ্ছে হয়তো, খুশির চালানো হয়তো, গায়ে ছাপ ছাপ গেঞ্জি। মুখে সিগারেট। জানালায় চোখ রেখে তক্তোপোশে শুয়ে আছে অমিতাভ।

কুসুম বাসন মেজে এনে রাখল। অমিতাভর দিকে তাকালো। ভাসা ভাসা চোখের তলার কালি। চোখ কিছু বলতে চায়।

—কিছু বলবে ?

—না।

—তবে ?

—কিছু না, বলে কুসুম চলে যায়। শাড়ির আঁশটে গন্ধ বাতাসে লেগে থাকে।

নিরাপদবাবুর বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ে এবার জোর করে বিকাশের সঙ্গে অমিতাভকেও ভাইফোঁটা দিয়ে দিয়েছে। নেমন্তন্নও ছিল। মুরগি-টুরগি হল। বিকাশ ওর ঘরে নিয়ে গেল অমিতাভকে। এই প্রথম। বিছানায় সত্য কাহিনী, তদন্ত কাহিনী এইসব। চুলের কাঁটা, ফিতে। মা কালীর বিশাল ছবি ঘরের দেয়ালে।

—একটা জরুরি কথা ছিল অমিতাভদা।

আর স্যার নয়, অমিতাভ মার্ক করে।

—আমাদের জমিতে অনেক সিডুলকাস্ট অনেকদিন ধরে আছে, কিছু বলি না আমরা। কোথায় যাবে ওরা। গাঁয়ে মাপ এলে ওদেরকে...।

উঠে দাঁড়ায় অমিতাভ। প্লিজ বিকাশবাবু, এ ব্যাপারে লিখে দেব। কিচ্ছু করার নেই। অমিতাভ পা বাড়ায়।

—আরে তা তো দেবেনই, সে কথা হচ্ছে না, বসুন না! উইল্‌স-এর প্যাকেট বাড়িয়ে ধরে বিকাশ। বলে—পুকুরপাড়ের ঝুপড়ি-টুপড়িগুলোকে আপনি আপনার আইনে যা খুশি

করুন, আমি কিছু বলব না। আমার রিকোয়েস্ট হল কুসুমের প্লটটা নিয়ে। কুসুমের শ্বশুর যখন ওখানে থাকতো তখন রাস্তাটা ছিল না। পরে রাস্তাটা হয়েছে। ফলে ওর প্লটটা হয়ে গেছে রাস্তার ধারে। আমি ট্রাকটারটা উঠোনে নিতে পারি না, স্পেস কই? ত্রিপল দিয়ে রাস্তায় ঢেকে রাখি। কুসুমের প্লটটা পেলে ওখানে একটা শেড করে ট্রাক্টরটা রাখব। আমার বাড়ির কাছাকাছিও হবে। ওটা আমার পেতেই হবে অমিতাভদা।

—আর কুসুম? কুসুম কোথায় যাবে?

—কুসুম? ওর কথা কি আমি ভাবব না ভেবেছেন? ওকে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেব।

—ব্যবস্থাটা কি করলেন ঠিক করুন, তাতে কুসুম রাজি হোক, পঞ্চায়েতকে বলুন, তারপর দেখা যাবে।

অমিতাভ ওঠে। বিকাশ দরজা পর্যন্ত এগিযে দেয়। ফিরে আসবার সময় বিকাশের স্বগতোক্তি শোনে।

মাগীটার জন্য খুব দরদ হয়েছে দেখছি। ওকে আমিই তো ফিট্ করে দিয়েছিলাম।

মাঠে যাবার পথে নস্করীবাবু অমিতাভর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল—একটা কথা বলছি স্যার, মনে কিছু করবেন না। আপনার ঘরে যে মেয়েছেলেটা কাজ করে, তার একটু উনকুট্টি আছে। মাটির তলার তেল খোঁজার পার্টি এয়েছিল না গ্রামে, তাদের চণ্ডলবাবু নামে একজনের সঙ্গে খুব লটঘট করেছিল। বিয়ের পরই তো স্বামী লিভার পচা রোগে শয্যাশায়ী, অথচ বাচ্চাও একটা হল। লোকে বলে...কিছু ব্যাড মাইন্ড করলেন না তো স্যার, অনেকে আপনাকেও নিন্দেমন্দ করে, আপনাকে ভালবাসি, তাই বললাম।

অমিতাভ কুসুমকে তাড়িয়ে দেয়।

কুসুম চুপচাপ দাঁড়িয়ে হাত কচলায়। ভাসা ভাসা চোখের দৃষ্টি অমিতাভর দিকে।

—কিছু বলবে?

কুসুম মাথা নাড়ায়।

অমিতাভ টাকাপয়সা হিসেব করে দিয়ে দেয়। দু-টাকা বেশি।

কুসুম তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

—কিছু বলবে?

কুসুম মাথা নাড়ায়।

—তবে যাও।

কুসুম চলে যায়। শাড়ির আঁশটে গন্ধ থাকে।

পরের দিন সকালেই দেখা গেল কুসুম ওর ঘরে মরে পড়ে আছে। মুখ থেকে গাঁজলা উঠছে।

অমিতাভ ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। কুসুমকে ছাড়িয়ে দেবার কথা কাউকে বলতে পারে না, নস্করীবাবুকেও নয়। মানুষের চোখ দেখলেই ভয় পায় অমিতাভ। দু-একজন বেশ কড়া মেজাজেই অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করেছে—কুসুমের কি হয়েছিল বলুন। অমিতাভ বলেছিল বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না। কুসুমের বাবা অমিতাভকে কিচ্ছু বলেনি। বংকা যেমন বিড়বিড় করে, তেমনি করত, মাঝে মাঝে বলত—মরণ—মরণ—নেকা ছিল। বলাই জানে, বেগুনপোড়ায় মরণ নেকা ছিল, কুসুম করবে কি? তেলের ভিতর মরণ নুইকে থাকলে কুসুম করবে কি?

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল কুসুমের পাকস্থলিতে পোকা মারার বিষ পাওয়া গিয়েছিল।

পুলিস এনকোয়ারিতে এসেছিল—নিরাপদবাবুদের বাড়িতে। দুধ মারা ক্ষীরের নাড়ু ও চা যথারীতি ছিল। অমিতাভর ডাক পড়ল। অমিতাভ ঢকঢক করে জল খেয়ে ও বাড়িতে গেল। ছুটি নিয়ে বাড়ি বসে থাকলেই হত। ও ঘরে ঢুকবার আগেই গলা শুকিয়ে গেল আবার।

—আপনার ঘরে কাজ করত?

—হ্যাঁ।

—কিছু হয়েছিল নাকি?

—না।

—ফ্র্যাংলি বলুন মিঃ মুখার্জি, ধরুন না গসিপিং হচ্ছে। মেয়েটার শুনেছি ক্যারেকটার ভালো ছিল না। এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছিল—যে ও আপনাকে অ্যাপ্রোচ করেছিল, আপনি রিফিউজ করেছেন।

—না।

—লাস্ট আপনার সাথে কি কথা হয়েছিল?

বিকাশ তাকাল অমিতাভর দিকে। একটা চোখ টিপল। বিকাশ পুলিসকে বলল—কুসুম মুখার্জিবাবুকে নাকি চঞ্চলবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিল—কলকাতায় চঞ্চলবাবু নামে কাউকে চেনে কি না।

—চঞ্চলবাবুটি কে?

—ঐ চঞ্চলবাবুর সঙ্গেই কুসুমের গণ্ডগোল ছিল। ঐ যে ও. এন. জি. সি-র তেল খোঁজার পার্টি এসেছিল, ওদের চঞ্চলবাবু নামে একজনের সঙ্গে খুব লটঘট হয়েছিল। বাচ্চাটা নিয়েও কোশ্চেন আছে।

বিকাশ পুনরায় অমিতাভর দিকে তাকায়।

ন্যাচারালি, মুখার্জিবাবু বলেছিল—ও নামে কাউকে চেনে না।

—কেস্‌টায় বেশ ঘ্যানাপ্যাচা আছে। কমপ্লিকেটেড। আসুন না থানায় আজকালের মধ্যে। ডোন্ট ওরি।

বিকাশ অমিতাভকে পরে বলেছিল—চিন্তা করবেন না স্যার, সব ম্যানেজ হয়ে গেছে।

কুসুমের ননদ থাকে পাশের গাঁয়ে। কুসুমের বাচ্চাটাকে সে নিল। পঞ্চায়েতের মিটিং-এ ঠিক হল—বিকাশবাবু মানবতার খাতিরে পাঁচশো টাকা কুসুমের ননদকে বাচ্চাটা মানুষ করার জন্য দেবে। বিধবা কুসুম যে জমিটায় থাকত ওটার মালিক তো আসলে চ্যাটার্জিরাই, ওদের থাকতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কুসুমের মৃত্যুর পর ঐ জমির মালিক চ্যাটার্জিরাই। আইন অনুযায়ী এটাই ব্যবস্থা।

একজন চোয়াড়গোছের পঞ্চায়েতের লোক বলেছিল—কুসুম বিষ তো খেইচে, কিন্তু ঐ কীটপোকা মারার বিষ সে পেল কোন্ থে?

বিকাশ বলে—হ্যাঁ। আমাদের বাড়িও ঝাড়পোঁছ করত কুসুম। অন্য বাড়িও কাজ করত। কোত্থেকে বিষ চুরি করেছে কে জানবে, আর চুরি করে খেলে আমরাই বা কি করবো?

কুসুমকে ছাড়াই সেবারের নবান্ন হয়ে গেল। ধনে গাছে সাদা ফুল, সরষে গাছে হলুদ ফুল। কৃষ্ণচূড়া শিরীষ আর আমড়া গাছের পাতা ঝরলো, আবার নতুন পাতা

এল, বসন্তের হাওয়া এল, দু-চারটে কোকিল এল।

ও. এন. জি. সি-র তেল খোঁজা গাড়ির চাকার দাগ মুছে গিয়ে এখানে-ওখানে এখন ট্রাক্টরের চাকার দাগ। কুসুমের ভিটেয় এখন উঁচু অ্যাসবেসটাসের শেডের তলায় বিকাশের লাল ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে থাকে।

আজ অমাবস্যা। সকাল থেকে মাইক বাজছে। বিকাশ আজ কালীপুজো দিচ্ছে। ট্রাক্টরটাকে জবাফুলের মালায় সাজিয়েছে। ঐ শেডের তলায় কালী মূর্তি। থানার ও. সি, পঞ্চায়েতের লোকজন সবার নিমন্ত্রণ। অমিতাভদেরও অফিসশুদ্ধ নিমন্ত্রণ। রাত্রে জেনারেটর চালিয়ে ভি. ডি. ও. শো হবে। মুনিষ মজুরেরা, যারা ট্রাক্টরের কারণে অনেকেই কাজ পাবে না, সবাই আজ রাতে ভি. ডি. ও. দেখবে। অমিতাভ আজ কলকাতা যাচ্ছে, দিন পনের-র ছুটিতে।

ঘর বন্ধ করে চাবিটা দিতে গিয়েছিল নিরাপদবাবুর কাছে। নিরাপদবাবু অসুস্থ। নিরাপদবাবু বলেন—বিকাশটা কি শুরু করেছে দেখেছেন ? ট্রাক্টর ট্রাক্টর করে একেবারে পাগলপারা হয়ে গেল। কি করে কিছু ঠিক নেই। ও তো আপনার ভাইয়ের মতো, একটু বোঝান না।

কি বোঝাবে অমিতাভ ? অমিতাভ কিছু না বলে চলে আসে।

একটু বসুন মুখার্জিবাবু। আপনার বাড়ির জন্য একটু সরষের তেল নিয়ে যান। নতুন সরষে উঠেছে, সবে ভাঙ্গা করিয়েচি।

অমিতাভ বলে—না-না, ওসব নেয়া যাবে না।

—কেনে ?

—এতটা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

—সে আমি লোক দিয়ে দেব।

—না-না-না, তা হয় না। লোকে কি ভাববে ? না-না, আমি এইসব নিতে পারব না।

নিরাপদবাবু বললেন—তবে আর একটু বসুন, এক্ষুণি আসচি। একটা খাম নিয়ে এলেন। বলেন—সামান্য কিছু আছে, আপত্তি করবেন না। এটা মনে করুন আমার আশীর্বাদ। আপনি আমার ছেলের মতো...অ মবাগ 'নের কেসটা আপনি করে দিলেন। কিছু না দিলে অন্যায় হবে।

অমিতাভ চারিপাশে তাকায়। শুধু একটা টিকটিকি আছে দেয়ালে আর মাইকে 'জিলে লে—জিলে লে...' অমিতাভ খামটা পকেটে পুরে নেয়।

রাস্তার মুখটাতে বিকাশ। কপালে তেল-সিঁদুরের লাল তিলক। খালি গা। বলল—আজ রাত্রে থেকে যেতে পারতেন অমিতাভদা। ভি. ডি. ও. আনছি। টারজন, শোলে, প্রেমনগর...

অমিতাভ হাঁটছে। কোকিল ডাকলো। মাইকের গান। একটা সাপের খোলস পড়ে আছে।

বুকের ভিতরটা খচখচ করে ওঠে অমিতাভর। পকেটের ভিতর থেকে টাকাটা বার করে। গোনে না। চারিদিকের হা—হা—শূন্যতার মাঝে অ্যাটাচি বাক্সটা খোলে। খামটা ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়, সামনের একাকী তালগাছটা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

জলতেষ্টা পায় অমিতাভর। এখনো অনেকটা পথ যেতে হবে।

আরো তিনটে গ্রাম পেরুলে বাসরাস্তা।

কি বলতে চেয়েছিল কুসুম ? বলতে গিয়ে বলেনি ?

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে বংকা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা ছিপি আঁটা পলিথিনের পাত্র। বংকা বলল--আপনার জন্য দাঁড়া হয়ে রইছি। মুনিব পাঠাইলেন। মুনিবের হুকুম--বাসে উঠে দিতে হবে। আর এই চিঠি।

'ঘানিতে ভাঙ্গা সরষের তেল পাঠাইলাম। আপনার বাবাকে নমস্কার জানাবেন। বংকা বাসে উঠাইয়া দিবে। আপনাব চিন্তা নাই।'

বংকা বলল—আপনি আগে রওনা হয়েছেন, আর আমি মাঠ ঠেঙে দৌড়ে কত আগে এসে গেছি দ্যাখো।

অমিতাভ ভাবে ওকে ফিরিয়ে দেবে। তারপরই মনে হয় থাক না, এই পাগলটা ছাড়া পৃথিবীতে কেই বা জানছে আর, খাঁটি তেল, দিদির বাচ্চা হবে, খুবই কাজে লাগবে। মাও খুব খুশি হবে। বাবা তেলমুড়ি খেতে ভালবাসে। বিদিশাকেও এক শিশি দেবে। সেবার ডায়মন্ডহারবারের হোটেলে গরম ভাত পেয়ে একটু হলুদবাটা আর সরষের তেল চেয়ে নিয়েছিল বিদিশা। খুব ভালবাসে।

অমিতাভ বংকাকে বলে—আমি এসব একদম পছন্দ করি না, বুঝলে, পাঠিয়ে দিয়েছে কি আর করা যাবে, চল।

বংকা চলে। চলতে চলতে বলে--বলাইয়ের কেমন চাতুরী, বাবু আনলেন ধরি। যে রাঁধে না তাকেও দেয়। আবার রাঁধুনী নেই তো রান্না হয়। খাও বাবু, ভালো তেল। তোমার তেলে দোষ নাই। তোমার কুসুম পানা গতি নাই। ভাঁড়ার থিক্কে আমি নিজ্জে ঢেলেছি।

—এ সব কী বলছ বংকা ?

—বলছি বাবু বলায়ের দহায়। আপনাব তেলে বিষ নাই। আমনার কুসুম পানা গতি নাই।

--কুসুমের কি হয়েছিল জানো ?

—মরণ হইছিল। মরণ। বলাই ডেকেছিল। গরিবের ঢ্যামনামী হইছিল। বেগুনপোড়া তেল দে মেখে খাবার শখ হইছিল। গরিবের ঐ শখ হয় কেন ?

—তারপর ?

—আর জানি না। গুরুর মানা। না জেনে বলতে নাই। তবে এট্টু তেল চেয়েছিল, বেগুনপোড়া মেখে খাবে বলে আমাদের ছোটবাবুর কাছে, এট্টু তেল চেয়েছিল সেটা আমি নিজে শুনেছি গ—শুনেছি!

—তা তুমি একথা আগে বলোনি কেন ?

—কতই তো বললাম। বোবায় বলল--কালায় শুনল। বাঁজা নারীর ছেল্যা হল। তোমরা আমায় পাগলা বল, ছাগলা বল, আমার কথার দাম কি ?

বংকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, ভিটেটা ছাড়তে কুসুম, পিরথিমীর ভিটেটাই ছাড়লি...।

সামনের গ্রামটা নিকটবর্তী হয়। বংকা বলে—আমার লাতিটার জন্য এট্টু তেল দেবে বাবু ?

—তোমার নাতি ?

—হ। আমার নাতি, মানে কুসুমের ছা, এই গাঁয়ে ওর পিসিমার কাছে আছে।

অমিতাভ বলে—নিশ্চয়ই দেব, যতটা খুশি নাও, কিসে নেবে ? এই সবশুদ্ধু নিয়ে নাও।

বংকা বলে—এট্টু গাঁয়ে চলুন বাবু, এই তো সামনে।

কি আর করা যাবে। বংকার পিছু পিছু চলল অমিতাভ। রাস্তায় শুকনো বিষ্ঠার মধ্যে মরে থাকা কৃমি। সামনে গ্রাম।

এই যে, এই ঘর। ঘরে লতুন খড় দেছে দ্যাকো, আলকাতরা দেছে। পাঁচশো ট্যাকার খেলা ; কুসুম মরেছে, এনাদের ঘরে ট্যাকা এসেছে, পাঁচশো ট্যাকাগো বাবু।

বংকা হাঁক দেয়। লাতিটারে একবার দ্যাকা দিনি, চোকের দ্যাকা দেখি এট্টু। এক মহিলা শিশুকে নিয়ে এল। রোগা গায়ে ছটফটায় বংকার নাতি।

—শিশি দে দেকি একটা, বংকা বলে। ঘর থেকে শিশি আসে। থ্রি এক্স রামের। বংকা বলে—মাটির তলার তেল খোঁজার বাবুদের বুঝি ?

বাবুর থে তেল চেয়ে নিচ্ছি এট্টু। রসুন দে ফুট্টে লিবি। খুব দলাই-মালাই করবি, বুইজলি। বংকা তেল ঢালে শিশিতে।

আর একটু নাও না, ভর্তি করে নাও, অমিতাভ বলে।

বংকা হাতের চেটোয় একটু তেল নিয়ে ছেলেটাকে মাখায়। দলমলে হবি ব্যাটা, ভীম হবি, ভীম। দুর্যোধন শালাকে দিবি—এক্কেবারে পটকে, হেঁ-হেঁ-হেঁ...আজকে হল হাপুস হুপুস কালকে হবে ভোজ, কার জিনিস কে লিয়ে পালায় খোঁজরে ব্যাটা খোঁজ...দলমলে হবি ব্যাটা দলমলে হবি...।

বংকা আগে আগে চলে। দুটো ফড়িং-এর ভোঁ ভোঁ আর প্লাস্টিক পাত্রে হালকা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। আর মাইলটাক পথ। রাস্তায় একটা সাপ। চিৎকার করে ওঠে অমিতাভ।

বংকা খুব শান্ত গলায় বলে—ঢোঁড়া।

অমিতাভ বলে—এত সাপ কেন বলো তো, কত খোলস দেখলাম।

বংকা বলে—শীতঘুমের পর এখন সাপেরা সব জাগতিছে। কিন্তু এটা ঢোঁড়া। সামনে গিয়ে জোরে লাথি মারে বংকা, সাপটা মাঠে গিয়ে পড়ে।

ঢোঁড়া সাপের বিষ নেই, তাই না বংকা ?—অমিতাভ বলে।

—না, ঢোঁড়ার বিষ নাই। আগে ছিল। সব সাপের চেয়ে ঢোঁড়ার বিষ ছিল বেশি।

—তারপর ?

—মা মনসা তো ঢোঁড়াটাকে পাঠাইলেন লোহার বাসরে। ঢোঁড়া সাপ লদী পার হচ্ছে—শুনুন তবে গল্পটা—

'আঁকিয়া বাঁকিয়া ঢোঁড়া গাং পার হয়।
গংগা দেবী সে সময় কৌশল করায়।
সিরজিলেন মায়া মৎস্য ঢোঁড়ার সম্মুখে।
মাছের ঝাঁক দেখ্যে ঢোঁড়ার নোলা আসে মুখে।'

ক্যানোনা, গংগা দেবী জানতেন, ঢোঁড়ার বিষ আছে বটে কিন্তু লোভটাও আছে বড়, লোভ তখন করলে কি—

বিষদন্ত খুলে ঢোঁড়া পদ্মপাত্রে রাখে। তারপর ছুট্যে গেল মাছের সম্মুখে। ঢোঁড়া তথন সব ভুলে গেল বাবু। মা মনসা যে কাজের ভার দেছিলেন সব ভুলে গিয়ে মাছের

পিছনে ছুটল ঢোঁড়া।

অমিতাভ বংকার মুখের দিকে তাকায়। বংকা নির্লিপ্ত। দূরের মাঠের দিকে চেয়ে ভাবলেশহীন বংকা বলে যায়–

বহুদূরে চলে গেল ঢোঁড়া। তারপর হল কি মায়া মৎস্য অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর ফিরে এল ঢোঁড়া। যে পদ্মপাতে বিষদাঁত রেখেছিল, সেখানে গিয়ে দ্যাখে—বোলতা ভীমরূল চেলা এবং পিঁপড়ি, মৌমাছি কাঁকড়া বিছা নিছে লুট করি।

সেই বিষদাঁত আর সে পায় না। তারপর কেঁদে পেদে ও মনসার কাছে গেল।

মা মনসা বলল—ছি—ছি—ছি, এত লোভ তোর ? মাছের লোভে কাজ ভুললি ?

অমিতাভ বংকাকে ফেলে এগিয়ে যায়। শুকনো ধানগাছের গোড়া ওর পায়ে খোঁচা দেয়। শূন্য মাঠের হা—হা উত্তপ্ত হাওয়ায় ওর কপালের ঘাম শুকোয়। মাথার মধ্যে হ্যাজাক বাতির শোঁ—শোঁ।

বংকা চেঁচিয়ে বলে—সেই থেকে ঢোঁড়ার আর বিষ নেই গ বাবু। যে মানুষ ঢোঁড়াকে দেখলে ভয়ে পালাত, সে মানুষ এখন ঢোঁড়াকে পায়ে মারে, পিষে মারে।

অমিতাভ মাঠের মধ্যে কিলবিল করে।
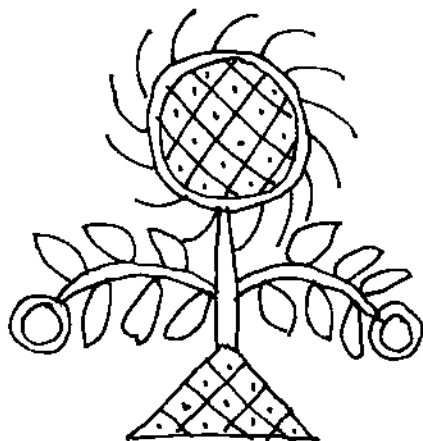
দাম্পত্য ॥ সুদর্শন সেনশর্মা

তাহের আমাকে দেখেই ডেকেছিল। বলল, যা চাইবেন তাই। গর্দান থেকে কেটে দেই? শিনা, গর্দান, রাঙ যা বলবেন।

দেখে দিও।

আমার রাগ হচ্ছিল। এতবেলায় বাজার থাকে না। আমি বাজারের ব্যাপারে বরাবরই নাদান। বাবা-মা বাজারে পাঠিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তেন। নমিতাও। আসলে আজকে ওর ভাই-এর সামনে বেইজ্জতি করাব জন্যই কি নমি ঠেলে বাজারে পাঠাল! নমিতাই বাজারহাট সামলায। এখন অবশ্য ওকে আমিই বারণ করেছি। কাজের মেয়েটাকে দিয়েও নমিতা বাজার তো করিয়ে নেয় এক-আধদিন। আজ আসেনি?

চাতালে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ওপরে পা ঝোলান। সামনের দুটো পা হাওয়ায দুলছিল একটু-একটু। কাটা মুণ্ডটা গোল মতো কাঠের তক্তাটুকুর পাশেই। সকাল থেকে একটাই শেষ হয়নি! অন্তু, যে দুটো পাঁঠা দোকানের লাগোয়া ফুটপাথে জড়ো করে দেয়া ঘাসপাতা চিবুচ্ছিল আর ঘাড় উঁচু করে তাদের ভবিতব্য এবং ঘাতককেও স্থির চোখে দেখছিল মরা চাউনিতে, সে দুটোকে দেখিয়ে বলল, সুধাদা এদের নিশ্চয়ই কোন প্রিমোনিশন হয না, হয কি? ব্যাপারটা আমার কিন্তু খুব ক্রুয়েল মনে হয। আপনার?

—মাংস কিনতে এসে এসব বললে লোকে কিন্তু হাসবে।

—লোকের কথা তো বলিনি, আপনার কথা বলেছি। ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারে না। তাহলে ঠিকই ব্যাব্যা করে চেঁচাত।

—গোট ফিলসফি তো ভাই কোর্সে ছিল না। বলতে পারব না। ওদের কথা বুঝতে হলে তো পাঁঠা হতে হয়।

খেতে বসে নমিতা বলল, অন্তু তুই এইখানে থেকে পড়বি? থাক না সুবিধেই হবে, তোর জামাইবাবু দু'দিনে সিধে হয়ে যেত।

অন্তু বলে, দিদি হস্টেলে না থাকলে হবে না রে।

—তোর সুধাদা কবে হস্টেলে ছিল জিজ্ঞাসা কর?

—তুই তো সুধাদা কোয়ার্টার পেলেই ডায়মন্ডহারবার চলে যাবি! তখন?

--আরে রাখ ওর কোয়ার্টারের কথা। ছ-মাস ধরে শুনছি। সব মুখেই। আসলে কেউ তোর জামাইবাবুকে পাত্তাই দেয় না।

নমিতা হাসতে হাসতে উঠে গেল! কিছুই খায়নি। আসলে এখন খেতেই পারে না। আয়রন ক্যাপসুলটাই পজিটিভ ব্যালান্স। একটু খেলেই নাকি বসতে পারে না, শুতে পারে না। আমার হিসেবে এখনও দিন পঁচিশেক বাকি আছে। সা[illegible]র সপ্তাহেই নার্সিং হোমে নিয়ে যাব। যা ভীতু। ভাই-এর সামনে রাজা-উজির [illegible]। আসল সময় কত সাহস বোঝা যাবে।

নমিতা বলল, মুন্নি তো এল না।

—দাঁড়াও ডেকে নিয়ে আসি। নীরাদিকে বলেছিলাম পাঠিয়ে দিতে। মেয়েটা দিন-রাত কাকিমা কাকিমা করে।

অন্তু বলল, মুন্নি কে ?

আমাদের পাশের বাড়ির প্রফেসরের মেয়ে।

নমিতা বলেছিল, জানো নীরাদি আজকাল মেয়েকে একদম ছাড়তেই চায় না। কোথাও বেরুলে আমার কাছে রেখে যায়। সেই লোকটা আজকাল প্রায়ই আসছে।

নমিতা মুন্নিকে গিয়ে নিয়ে এল। ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সেই লোকটাকে ডায়মন্ডহারবার হসপিটালে একদিন দেখেছি। ওর বৌকে নিয়ে এসেছিল। বৌটার হরেকরকম অসুখ ছিল। সে-যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল। লোকটাকে একদিন বললাম, তুমি ঐ ভদ্রলোককে জ্বালাতন করছ কেন ? লোকটা কেঁদে ফেলল। বলল, ডাক্তারবাবু ঠিক আছে আর যামুনা। মেয়েটারে হাসপাতালে ফেইল্যা গেছিলাম। প্যাটের দায়। মাইয়াডার হাসপাতালই ঘরদোর হইয়া গেছিল গা। খাইতে দিমু কি। নিজেরাই খাইতাম কি কিছু ! মাইযাটা পড়ল অসুখে। হাসপাতালে দিয়া আইলাম। আর খোঁজ লই নাই। বছর দুই বাদে একদিন লুকাইয়া গেছিলাম। দেখি মাইয়াডা বড় হইয়া গ্যাছে। কেমন সুন্দর শিউলি গাছের লাহান। হ্যার পর প্রায়ই যাইতাম। মাইয়া বাপেরে চেনত না। বাপত চেনত। দিদিমণিগো সাথে ঘুইরা বেড়াইত মাইযা আমার। ডাক্তারবাবুরা জামাজুতি দেত। তা একদিন গিয়া দেখি নাই। ঐ বাবু মাইয়াডারে নিয়া নিল। খোঁজ কইরা হ্যাসে...

—আর যাবে না। মেয়ে তো তোমার দুঃখে নেই। তুমি খাওয়াতে-পরাতে পারবে ?

লোকটা পায়ের দিকে হাত বাড়াল আমার, ছুঁইয়া কইতেছি, আর যামু না।

কিন্তু লোকটা আসে। নমিতা বলছিল, মাঝেমাঝেই ; প্রফেসর গিন্নির ভয় বেড়ে উঠছিল। মেয়েটাকে এখন পারতপক্ষে বেরুতেই দেয় না। দেবীবাবু সেদিন বলছিলেন, দেখুন আর এক অশান্তি। আপনার দিদির আবার স্ট্রোক না হয়ে যায়। আমি মানি দেবীবাবুরও হতে পারে। লোকটা এখনও আসছে। বাড়ির দরজায় নমিতার কোলে মুন্নির একটা ছবি আছে। একসময় মুন্নি আমাদের পেসেন্ট ছিল। বছর দুয়েক কেউ ওকে নিতে আসেনি। মেয়েটা বড় হচ্ছিল নার্সদের আদরে। দেবীবাবু অনেকদিনের বন্ধু। স্ত্রীর সঙ্গে মানসিক সংঘাত শুরু হয়ে গেছিল। বুদ্ধিটা আমিই দেবীবাবুকে দিয়েছিলাম। কিন্তু বুড়ো হাড়গিলেটা আবার...

নমিতা যাবেই। ছবিঘরে 'গণদেবতা'। অন্তু ছিল। নীরাদিরও যাবার কথা ছিল। মাথা ধরেছে বলে আসতে পারেননি। দেবীবাবু মুন্নিকে কোলে নিয়ে ঘর অব্দি এসে বললেন, কি ভায়া, স্ত্রীর প্রক্সিটা দিয়ে আসব নাকি ? মুন্নি খুব জেদ ধরেছিল, ও যাবে। অন্তুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। দেবীবাবু মেয়েকে নিয়ে বাসায় চলে গেলেন।

ফেরার পথে বৃষ্টি নামল। বিভ্রাট। দু-পা হেঁটেই নমিতা হাঁপাচ্ছিল। বলল, রিকশা নাও।

রিকশার ঝাঁকুনি ডেঞ্জারাস।

আমি বললাম, চল ট্যাক্সি ধরি।

নমিতা ভুল বুঝল। ঠিক আছে হেঁটেই যাচ্ছি।

অন্তু বলল, দিদি, সেটাই সেফ। দেখিস আছাড় খাসনি।

আমি তবু রিকশা খুঁজতে গেলাম। শেয়ালদার মুখটায় দু-তিনটে রিকশা দাঁড়িয়ে। কেউ যাবে না। নাইট শোতে নমিতাকে নিয়ে এই অবস্থায় আসা ঠিক হয়নি। একটু এগিয়ে একটা রিকশার দিকে তাকিয়ে ফের দু-পা পিছিয়ে এলাম। পেছন থেকে বুঝতে পারিনি। পা-রাখার জায়গায় একটি বাবুজীবী বসে পা নাচাচ্ছিল। রিকশাওয়ালা একটু দূরে এক ডিমওয়ালির সঙ্গে পঁচাচ্ছে। হাতে ঘুঙুর ঘণ্টিটা। সিটের দিকে তাকিয়েই মুখ সরিয়ে নিলাম। যাকে দেখলাম সেও। তায়েব বসে আছে। আর তার পায়ের কাছে বাবুজীবী মেয়েটি পা দোলাচ্ছিল। তায়েবের জীবনযাত্রায় অনেক গোলমাল আছে। এক রোববার, আগে যখন বাসায় কয়েক ঘণ্টা রুগী দেখতাম, একদিন তায়েবের বৌ এসে হাজির। সারা শরীরে ক্ষত। শঙ্কর মাছের লেজ দিয়ে তায়েব পিটিয়েছিল। বিকেলে বাজারে তায়েবকে খুব গালমন্দ করলাম। তায়েব ঘাড় নিচু করে সব শুনল, শেষে বলল, বাবু ঘরের কিসসা নাইবা শুনলেন। আমি দেখলাম কসাই-এর চোখে জল। তায়েবের এক পার্টনার ছিল। সে লোকটাকে আজকাল আর দেখা যায় না। চেহারাটা জগার মতই কালো, খ্যাপা মতন, মারকুটে গোছের। জগাকে চাক্ষুষ এখনো দেখিনি। তা সেই পার্টনার নাকি অলক্ষে তায়েবের অন্দর মহলেও চৌকি দেওয়া শুরু করেছিল। মুশকিল হল তায়েব বৌটার সঙ্গে ওর ছেলেটাকেও ধরে পেটাত। ছেলেটাও মনেপ্রাণে কসাই হয়ে উঠেছে। নীরাদিদের মাদি বেড়ালটাকে একদিন সামনের টগর গাছটায় সাড়ে ছ' বছরের ছেলেটা উলটো ঝুলিয়ে একটা ভোঁতা ছুরি হাতে ধরে পেটে ছুঁইয়ে চেঁচাচ্ছিল— জবাই করেগা। জবাই করেগা। জবাই করেগা। কিলো চৌদা রুপিয়া, চৌদা রুপিয়া। মুন্নির সে কী কান্না। আমি ছেলেটার হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়েছিলাম। তায়েব বলেছিল, বাবু রক্তের দোষ। কোন রক্ত?

নমিতা আস্তে আস্তে বলল, শুনলে?

অন্তু একটু এগিয়ে গিয়েছিল। শিয়ালদা স্টেশনের পাশের সেই নতুন রাস্তাটায় বৌবাজারের দিকে হেঁটে আসছিলাম। 'বন্ধুগণ' কথাটা শুনে উৎকর্ণ হতেই চাপা মেয়েলি কণ্ঠটি সুর করে ফের বলছে শুনলাম, 'আমরা বৌবাজারের লোক। কিন্তু বাবুদের ন্যাকড়া বেড়েছে। ঘরের লক্ষ্মীই তাদের ঠান্ডা রাখছে। আমাদের কেউ চাইছে না, নিচ্ছে না...হিঃ হিঃ আমরা না খেতে পেয়ে কি মরে যাব? আমরাও ছিনতাই করব, ছিনতাই করব'...শেষের কথাগুলি হাসির রেশের সঙ্গে মিলিয়ে যেতেই দেখলাম গুটি তিনেক মেয়ে এ-ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বন্ধুগণ কথাটার কি ডায়মেনশন!

নমিতা ফের বলল, শুনলে?

—শুনেছি।

—ভয় করছে!

—এই অন্তু তোমার দিদির ভয় করছে। এদিকে এস।

মাঝখানে নমি, ডাইনে অন্তু বাঁয়ে আমি। ফুটপাথের দোকানিরা শোয়ার আয়োজন করছে। কোলে মার্কেটের গলিতে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল। প্রাচী সিনেমা হলের লাইট নিভে গেছে! সামনের মিষ্টির দোকানটায় ধোয়াধুয়ি চলছিল। মোড়ের ফুলওয়ালা এই রাত্রে তারই পাশের নিম-দাঁতনওয়ালীর সঙ্গে গল্প করছে।

নমিকে বললাম, তোমার ফুলওয়ালা।

এ পাড়ার পাগলটিকে সবাই ভয় পায়। আজকে আমিও পেলাম। এমনিতে কেউ ওকে দেখে না বড় একটা। কোথায় থাকে, কোথায় যায় কেউ জানে না। হঠাৎ একদিন

মাঝরাতে চিৎকার করে জানান দিয়ে যায় সে এসেছে। কেউ তখন জানলা-দরজা খুলে দেখতে যায় না ওকে। জানলায় ঢিল ছোঁড়ারও অভ্যেস আছে। তার বাণীও মর্মস্পর্শী। প্রথমে সে উপদেশের সুরে বলে, ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না। তারপরে অস্ফুটে নাচের মুদ্রায় কী সব বলে। শেষের কথাগুলো খুব খারাপ। নমি এই নিয়ে হাসাহাসিও করেছে কয়েকদিন। কথাগুলো হল, প্রথমে উচ্চস্বরে, ধোপামাগী কাপড় কাচে ঠ্যাং তুলে তার বাবলা গাছে। তারপর খাদে, গলা নামিয়ে বলে, তার যে মোড়ল যাত্রাদলে/কাছা দোলায় পাছার কাছে...হিঃ হিঃ

কথার কোনো সংগতি নেই। পাগলের রোজকার স্লোগান এই-ই। ও নাকি কোনো সময় যাত্রার একটা দলে কাজ করত। পাড়ার অনেকের কুসংস্কার এই যে জগা পাগলা যেদিন আসে তার পরদিনই একটা কিছু অঘটন ঘটে। যেমন নমিতা বলে এর আগের সপ্তাহে নীরাদি দোতলার সিঁড়িতে পড়ে গেছেন। প্রফেসরের কী একটা পেমেন্ট আটকে গেছে। তার আগের সপ্তাহে যেদিন রাতে জগা এসেছিল, তার পরদিনই আমি বাড়ি ফিরতে পারিনি। সকালে ফেরার কথা ছিল। একটি ভাল পেশেন্ট দুম করে খারাপ হয়ে গেল। আজকেও জগা কুডাক ডেকে গেল, কাল কিছু হবে না তো!

নমি আমাকে ঠেলল, অ্যাই ঘুমুলে? আমি পাশ ফিরে বললাম, জেগেই আছি।

—জগাটা আজকে আবার এল।

—হুঁ।

—কেন?

—আমি কি করে জানব।

নমিতা অস্ফুটে একবার আহ্ বলল।

আমি বললাম, কি হল?

বাচ্চাটা আজকে খুব লাথাচ্ছে। মিনিট দশেকের মধ্যে তিনবার গোঁত্তা মারল।

আমি আর নমিতা মুখোমুখি। ইদানীং রাতে আলো না জ্বালিয়ে নমি ঘুমোয় না। একটা ছোট আলো জ্বলছে। নমির মুখটা সেই আলোয় ফ্যাকাশে লাগছিল। ঘরের হাওয়ায় একটা গুমোট ভাব। জগা চেঁচিয়ে যাবার পর আমি জানলাটা দিয়ে দিয়েছি।

আমাদের খাটের নিচে আর-একটা ছোট্ট খাট আছে। আমার জন্মের আগেই ঠাকুর্দা মনোরঞ্জন মিস্ত্রিকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। এখন ঠাকুর্দাও নেই। মনোরঞ্জন মিস্ত্রিও নেই। আমি আছি। নমি আছে। আর আমার ঠাকুর্দার আমাকে দেওয়া সেই বেবিকটটি আছে। ঠাকুর্দার ভালবাসায় তো খাদ ছিল না। সেই বিত্তহীন হেডমাস্টারটি তাঁর কর্মজীবনের প্রান্তসীমায় এক অনাগতের জন্য অগাধ ভালবাসায় শাল কাঠের সুদৃশ্য খাটটা বানিয়েছিলেন। সেই খাটটাতেই মনে মনে আমি আমার সন্তানের স্থান করে দিয়েছি। কিছুদিন আগে আমি এক রাতে চুপি চুপি খাটের নিচ থেকে ছোট খাটটি বের করে আনতে গিয়ে নমির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। হেসে নমি বলেছিল, তোমায় অপত্য পেয়ে বসেছে। আমি নমির কোলে মুন্নির ছবিটা দেখিয়ে বলেছিলাম, ও ছবিতে অপত্য নেই?

নমি বলল, সত্যি সুধা, আজ ভয় করছে।

আমি মুন্নির গলাটা নকল ক'রে বললাম, ভয় করছে।

—তুমি তো কাল ভোরে উঠেই ডায়মন্ডহারবার চলে যাবে। না?

আমি নমির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, একমাসের ছুটি নিয়ে এসেছি।

—এক মাস? যাহ্ মিথ্যুক।

—নতুন ভাড়াটে না-আসা অব্দি আমি নড়ছি না।

নমি আর একটা গোঁত্তা খেল। 'আহ্' করল একবার। বলল, কি কথার ছিরি। নমি উঠে বসার চেষ্টা করছিল।

বললাম, উঠছ কেন ?

ও বসল, বলল, তুমি মিথ্যে বলেছ। ছুটি তুমি নাওনি !

আমি বললাম, তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ওরকম ফিসফিস করে কখনও মিথ্যে বলেছি !

—বলনি ?

—ভেবে দেখ।

নমি পাশ ফিরল। ফের বলল, ভয় করছে।

আমার একটু চিন্তা হচ্ছিল জগাটা সত্যিই—। আর বেশিদিন বাকিও নেই। একদিন আবার ডায়মন্ডহারবার যেতেই হবে। নমিকে একা ফেলে...। মা-ও অভিমান করে এলেন না, ওকে মায়ের কাছে পাঠাইনি বলে। আমি খাট থেকে নেমে পড়লাম। উবু হয়ে বসে খাটের তলায় হাত ঢুকিয়ে ছোট খাটটা টানলাম। শব্দ হল। নমি আস্কারার গলায় বলল, পাগলামি হচ্ছে মাঝরাতে !

খাটটা বাইরে টেনে আনতেই বেড়ালের মিঁউ শুনলাম। নীরাদির মাদি বেড়ালটা আমায় হুলো ভেবে রাগে ফুঁসে উঠল। বেড়ালের কোলের কাছটায় আর-তিনটে অপগণ্ড বেড়ালশিশু। চিঁ চিঁ করে ডাকছিল। নমিতাকে ডাকলাম, নমি দেখ তোমার আগেই নীরাদির বেড়ালটা...

—আমি আজ সন্ধ্যায় বেড়ালটাকে দেখেই বুঝেছি ফাঁক খুঁজছে। মুন্নি ভীষণ বেড়াল ঘাঁটে বলে দেবীবাবু ওটাকে দূর করে দিয়েছেন। তুমি উঠে এস—

—দেখ না আমার জায়গায় বাচ্চা নামিয়ে আমাকেই রাগ দেখাচ্ছে।

নমি তাড়া দিচ্ছিল, খাটটা ঠেলে দাও। ওদের তাড়িও না প্লিজ। তুমি উঠে এসো তো।

বাজারটা কাছেই। আরো কাছে তায়েবের বাড়ি। আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে কয়েক পা হাঁটতেই ভিড়টা চোখে পড়ে। ততক্ষণে পুলিস কর্ডন করে ফেলেছে। দেবীবাবু সকাল বেলাতেই দরজা থেকে নাম ধরে ডাকছিলেন। আমি আর দেবীবাবু ব্যাপারটা সত্যি কী, জানতে এগিয়েছিলাম। তায়েবের নিঃসঙ্গ ছেলেটা মাঝে মাঝে মুন্নির সঙ্গে খেলতে আসত। আমাদের দেখে সেই ছেলেটা করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। ছেলেটার আরও সামনে ঘরের চৌকাঠ ছাড়িয়ে দৃষ্টি ভেতর যেতেই তায়েব আলির নির্মম পরিণতি দেখে আমি আর দেবীবাবু গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম তড়িতাহতের মতো। ঘরের সামনের চাতালে তায়েব আলির ছেলেটা বসা। ছেলেটাকে নাকি বেঁধে রাখা ছিল। ছেলেটার পাশেই তায়েব আলির তিনটে পাঁঠা নির্বিবাদে কেনা ঘাস চিবিয়ে খাচ্ছিল। উদাসীন তায়েব-তনয়ের হাতের পাতা থেকে ঘাস তুলে নিচ্ছিল একদম ছোট্ট পাঁঠাটি। এই অবলা চতুষ্পদেরা কি তাদের ঘাতকের পরিণতির কথা বুঝতে পারছে ?

দেবীবাবু একবার অস্ফুটে বললেন, হরিবিল।

কাল রাতে জগা পাগলা জ্বালিয়েছে। তখনই জানা ছিল এরকম কিছু ঘটবে। তায়েব আলির দুটো পা সিলিং-এর আংটা থেকে ঝুলছে। কণ্ঠার কাছটায় রক্ত জমে আছে। ঠিক তায়েব যেভাবে পাঁঠা মারে সেভাবেই কেউ তায়েবের কণ্ঠার কাছটুকু চিরে

দিয়েছে। মেঝে রক্তে ভাসছে। তায়েবের মাথাটা মাটির দিকে ঝুলছে। ঝোলানো হাত দুটিতেও অনেক আঘাতের চিহ্ন। একটু দূরে একটা ছাগল দাঁড়িয়ে আছে। এই ছাগলের দুধ বিক্রি করে তায়েবের বৌ। সবচাইতে বুড়ো পাঁঠাটি দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যেতে চাইছে সেই দিকে। শিং দুটো শানে ঘষছিল, চাব পা-ও। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়েও এই চতুষ্পদটি রমণার্ত ! থানার বড়বাবু এগিয়ে এসে দু-একটি কথা বললেন। তায়েবের বৌকে পাওয়া যাচ্ছে না। তায়েবের ছেলেটি এইবার কেঁদে ফেলল। দেবীবাবু পা বাড়ালেন, আমিও। তায়েবের নিঃস্পন্দ শরীরটা এইবার নামিয়ে আনা হচ্ছে—

ছেলেটার কি হবে ? ফিরতে ফিরতে খেয়াল হল। দেবীবাবু বললেন, ও চিন্তা পুলিস করুক।

আমি ভাবছিলাম এ বেলাটা নিয়ে এলেই হতো। দেবীবাবু আমাব দিকে তাকালেন। চোখে বিস্ময়। আমরা বাড়ির দিকে হাঁটছি।

নমিতা খুব বাগারাগি করল। ওকে তো সবটা বলাই হয়নি।

—এসব দৃশ স্ট্যান্ড কর কিভাবে তোমরা ?

—ছোটলোকদের ব্যাপারে কেন যে নিজেদের জড়াতে যাও। নীরাদেবীও দেবীবাবুকে দুষবেন জানাই আছে।

মনটা খুব খারাপ হয়েছিল, থাকবেও। নমি আজ প্রায় সারাক্ষণ শুয়েই আছে। সন্ধের দিকে নীরাদি এসে আবহাওয়াটা সহজ করতে চাইছিলেন। কিন্তু আমি আলটপকা কী অলক্ষুণে কথা বলে ফেললাম !

নীরাদি আমার সামনেও ফ্র্যাঙ্ক। বলছিলেন নমিতাকে, মুন্নিটার আর তর সইছে না। ভাই কবে আসবে, ভাই কবে আসবে বলে যা জ্বালাচ্ছে না অহরহ।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, কবে আসছে ? দেরি আছে নাকি ?

আমি হাসলাম, তা মুন্নিব ভাই তো আসবে, কিন্তু ভাই রাখার জায়গাই নেই। ভাই-এর থাকার জায়গায় তো মুন্নির বেড়াল...

নীরা প্রথমে হেসে উঠেছিলেন। হাসতে-হাসতেই বললেন, বাপো, কথার কি ছিরি। ভাই এলেই আমি মুন্নির জন্য নিয়ে যাব না।

নমিতা খুব আহত হল। মুখ ফিরিয়ে নিল আমার দিক থেকে। আমার মুখ খুব খারাপ। কিছু যদি হয়ে যায় তখন ? নমিতা তো আমায় আস্ত রাখবে না। না কাল সকালেই...

রাতে শোয়ার পরেও নমিতা গোঁজ হয়েছিল। খোঁচালাম। রাগি গলায় বলল, ওভাবে কেউ বলে নাকি ?

—কি ভাবে ?

—তুমি যা বললে।

—ও তো কথার পিঠের কথা। ধরতে নেই।

—ধরতে নেই ? নাহ্।

নমিতা চিৎ হয়ে শুয়েছিল। চোখ সিলিং-এর দিকে। খাটের তলা থেকে নীরাদির মাদি বিড়ালটা অপত্যের ডাক পাড়ছিল। বাচ্চাগুলোর আওয়াজ, ফ্যানের শব্দ আমাদের কথায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল। নমিতা ছাদের দিকে তাকিয়েই বলল, আজ যেন একটু কম নড়ছে। আমার মোটেই ভালো লাগছে না। কবে নিয়ে যাবে ?

—কালকেই। এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন বল তো ? বাচ্চাটার তো ঘুমও পায়।

সারাক্ষণ দাপাবে নাকি!

বুঝলাম নমি আমার কথায় খুশি হল না।

আমি স্টেথোটা নামালাম। স্টেথোটায় আজকাল অসুবিধে হয়, জোড়ের কাছটা ভেঙেছে। ওটা নমিতা ফেলে দেবে বলেছিল। বাড়িতে বড় একটা লাগে না। নমি বলে মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয় সত্যি তুমি ডাক্তারি কর কিনা? বাপের বাড়ির দিকে ব্রজ ডাক্তার নামে একজনের কথা বলে নমিতা। পসার ছিল না, স্টেথোস্কোপ সে নাকি ভাড়াও দিত কখনও ভুঁইফোঁড় হোমিওপ্যাথকে, কিংবা যাত্রা পার্টিকে। মাঝে-মাঝে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে ব্রজ ডাক্তারও বলেছে দু-একবার নমিতা।

ভাঙা স্টেথোটা নামাতেই নমিতা রেগে বলল, ঐ ঘোড়ার ডিমে কিছু শোনা যায়? ওটা না পাল্টালে এবার দেখ ঠিক আমি ফেলে দেব।

কোমরের দড়িটা ঢিলে করল নমিতা। আমার হাতের নিচেই দু-বার ছেলেটা লাফাল। স্টেথোটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে, নমিতার পিঠে সাপোর্ট দিয়ে ওকে বসিয়ে বললাম, তোমার বাচ্চার হার্টবিট তুমিই শুনে নাও।

আহ্লাদীর মতো কানে ইয়ার পিস লাগিয়ে শুনল নমিতা। বলল, এই আওয়াজ? ঘড়ির শব্দ!

আমি বললাম, হ্যাঁ, ওইরকমই তো।

নমিতার ভয়টা মরে আসছিল। হাসতে-হাসতে বলল, বাচ্চার কিছু হলে তোমার ডাক্তারি করা বের করে দেব।

নমিতার সারা শরীরে এখন সুখী ভাব। শীতের দুপুরে শরীর-ফোলানো পায়রার মতো।

নমিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমারও ঘুম আসছিল। কিন্তু এই এখনই জগা পাগলা ফের খেউড় করে গেল। নমি শুনতে পায়নি বোধহয়।

ভোর বেলাতেই আমার শরীরে ঘাম ফুটে উঠল। নমির শরীরময় একটা শব্দকে আমি খুঁজে যাচ্ছি। সেই রাতের শব্দটা। পাচ্ছি না তো! তবে কি?

নমিতা ঠেলে তুলেছিল আমাকে, এই একদম নড়ছে না ভোর রাত থেকে।

হাতের নিচে বাচ্চাটা নড়লও না। শব্দটাও খুঁজে না পেয়ে স্টেথোটা সরিয়ে রাখলাম। নমি বলল, আমায় শোনালে না!

আমি বললাম, তুমি তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নাও। নার্সিং হোম যেতে হবে।

নমিতা সাজগোজ করতে করতেই ড্রেসিং টেবলে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলল। দেবীবাবু ট্যাক্সি ডাকলেন। আমি ওঠার পর নিজেও গাড়িতে উঠে বসলেন। আমার কাঁধে এখন প্রফেসারের হাত।

নমি ভর্তি হল। ডাক্তার বিশ্বাসকে বললাম, পাঁচ ঘণ্টা আমি বাইরে থাকব। একবার ডায়মন্ডহারবার যেতে হবে।

ডাক্তার বিশ্বাস গভীর প্রত্যয়ে মাথা দুলিয়ে বললেন, পাঁচ-ছ ঘণ্টায় কিছু হচ্ছে না।

ডাক্তার বিশ্বাসের হাতের নিচে হারামজাদা নড়ে উঠেছিল। হৃদ্‌স্পন্দনও শোনা গেল। কালকে ওরকম একটা ছেঁদো কথা বলেছি! ডায়মন্ডহারবারে কাজটা একবারে সেরে রাখা ভাল। দেবীবাবু তো আছেন। না বললেও থাকবেন। নমিতা বলেছিল, পালিয়ে যেও না যেন।

কিন্তু কাজটা সেরেই আসা যাক।

সিস্টার কাকে ধমকাচ্ছিল, আজব বাক্যবিন্যাসে। 'বুঝলেন এখানে কেউ ভদ্রলোক নেই! ডাক্তারবাবু আছেন।' আমি তাজ্জব। বলে কি মেয়েটা। কেউ ভদ্রলোক নেই। সবাই ডাক্তারবাবু। মানে কি? কাছাকাছি যেতে দেখলাম একটি মহিলাকে সিস্টার ধমকাচ্ছে। মহিলাটি আমার চেনা।—এই তো আমাকে এ বলছিল, ঐ ভদ্রলোককে একটু ডেকে দেবেন? এরা ডাক্তারবাবু বলতে পারে না?

মহিলাটি করুণা চাইছে। আউটডোর এখন বন্ধ। ইমার্জেন্সিতে সে রোগী নিয়ে এসেছে। আমাকেই দেখতে হবে! আমার যে তাড়া আছে। কলকাতায় কি হচ্ছে কে জানে। কেউ ভদ্রলোক নেই! সবাই ডাক্তারবাবু। মেয়েটা পাগল নাকি? নার্স-এর এই কথাটি কলকাতার কোনো কাগজ যদি কালই ছাপিয়ে দেয়। সবাই ডাক্তারবাবু। কোন ভদ্রলোক নেই! পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি মুন্নির বাবার নাভিশ্বাসের মতোই। আমার তাড়া আছে। সেই লোকটা, যে গিয়ে কলকাতায় দেবীবাবুদের জ্বালাত। খসখস করে লিখে দিলাম, সিস্টার অ্যাডমিট হিম। নাথিং কুড বি ডান এক্সেপ্ট অ্যাকোযাগ্যাঞ্জেস। চলি সিস্টার বাই। অ্যাপ্লিকেশনটা অফিসে জমা দিয়ে দেবেন। কেউ ভদ্রলোক নেই সবাই ডাক্তারবাবু।

নার্সিং হোমের গেটের কাছটায় দেবীবাবু, নীরাদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেবীবাবু বললেন, লেবার রুমে নিয়ে গেছে। ডাক্তার বললেন কাল সকালের আগে কিছু হচ্ছে না।

আমি হেসে দেবীবাবুকে বললাম, মরে যাচ্ছে।

দেবীবাবু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, কি যা-তা বলছেন!

সেই লোকটা, ডায়মন্ডহারবারের। মুন্নির...

'বাবা' কথাটা ওদের সামনে উচ্চারণ করতে পারলাম না। নীরা বললেন, তাই নাকি? কখন?

এতক্ষণে নিশ্চয়ই মরে গেছে। আমি যখন আসছি তখন তো খুব খারাপ অবস্থায়।

বাঁচা গেল—নীরার গলা।

দেবীবাবু বললেন, ছিঃ ওভাবে বলবে না।

নীরাদি বললেন, বলব না? কম জ্বালিয়েছে? নিজের মুরোদ নেই আমার মেয়েকে এখন কাড়তে চাইলেই দিয়ে দেব!

দেবীবাবু বললেন—আর চাইবে না।

রাত বাড়ছিল। দেবীবাবু আর আমি। আমি আর দেবীবাবু। নমিতা ভেতরে আছে। ভেতরের কোনো খবর নেই। দেবীবাবু সিগ্রেট টানছেন। কৃতজ্ঞতা জাগছে দেবীবাবুর জন্য। এখনও আমার জন্য না ঘুমিয়ে বসে আছেন। নীরা চলে গেছেন। দেবীবাবু কিছুতেই গেলেন না। নীরা বলছিলেন, না না ও আজ থাকবে।

জগা পাগলাটাকে দূরে কোথাও তাড়াতে হবে। তায়েবের বাচ্চাটার কী হবে? কোথায় আছে ছেলেটা। খাওয়া-দাওয়া। নার্সটা যেন কি—! এখানে ভদ্রলোক নেই, ডাক্তারবাবু আছেন।

আচ্ছা, মারল কে তায়েবকে? বৌটাই বা গেল কোথায়? 'বন্ধুগণ' মনে হতেই সেই মর্মস্পর্শী বাক্যবিন্যাস, 'আমরা বৌবাজারের লোক...'।

আমাদের খাটের তলার খাটটাকে বেড়ালটা নোংরা করে রেখেছে। বেড়ালটা

নবজাতকদের সঙ্গে নিয়ে খাট থেকে নেমে এল কি? মুন্নি কি করছে এখন? নমি তোমার কি খবর? কতটা প্রগ্রেস করলে? খবর নেই। মনের মধ্যে যাবতীয় দুর্ভাবনা এ সময় বটের ঝুরি নামিয়ে ফেলছে যে। চোখ বন্ধ করে ফেলি। এখন সব অন্ধকার। সেই অন্ধকার ধরে রক্তাক্ত তায়েবতনয় হেঁটে আসছে যে। সেই বুড়োটাকে আমি আজ ফেলে পালিয়ে এসেছি। লাল শাড়ি পরা মহিলাটি আমায় শাপান্ত করছে না? জগা পাগলার মতো সেও আঙুল তুলে আজগুবি কী সব বলছে। খাটের তলার ছোট খাটটায় একী, নীরাদির বেড়ালটা মরে কাঠ হয়ে আছে। দূর শালা। কি উল্টোপাল্টা ভাবনা দেখ। প্রফেসর ঘুমিয়ে পড়েছে। ভদ্রলোক নেই। ডাক্তারবাবু আছে। বোগাস। উদ্ভট ভাবনা সব। পালা পালা। ঘুম আসছে। প্রফেসর আমিও ঘুমুচ্ছি। ফানি থিঙ্কিং। যাহ্। নমি গুডনাইট।

...সিস্টার বলল—কংগ্রাচুলেশনস্। সেই নার্স! ভদ্রলোক নেই ডাক্তার বাবু আছেন। এ কথা-সে কথার পর বলল—আপনি যাকে গঙ্গাজল দিতে বলে গিয়েছিলেন সে চিনির জল পেয়ে চাঙ্গা হয়ে বাড়ি চলে গেছে। —মানে? লালাদা পাশেই ছিল, বলল, ওর বউ-এর এই এখন-তখন অবস্থা তাই তো বেচারা নাভিশ্বাস আর দীর্ঘশ্বাসে গুলিয়ে ফেলেছিল। আরে সেন, ইন্ট্রাভেনাস গ্লুকোজ দিতেই ভেউ ভেউ করে সেকি কান্না। পাঁচ-ছদিন নাকি প্রায় কিছু খায়ইনি। ওদের এক বাচ্চা...

ভালো খবর। আমি উঠতেই লালাদা বলল—এখনই পালাচ্ছ। খাওয়াবে কবে।

খাওয়াব। পরশু আসছি।

বাড়ির কাছাকাছি কালো জালওয়ালা গাড়ির জানলা থেকে একজন বলে উঠল, শুনছেন?

ড্রাইভারের পাশে, ও-সি বন্ধুটি।

—এই, বলেন আমরা কিছু পারি না? দেখবেন?

গাড়িটা থামল। আমি খুনিকে দেখলাম। চমকে উঠেছিলাম। জগা পাগলাকে ধরেছে।

—করেছেন কি! পাগলটাকে!

তায়েবতনয় ঘুমের মধ্যে ভয়ের চোটে থানায় প্রথম দিন রাতে কেঁদে উঠেছিল। বড়বাবু কাছে যেতেই নাকি চেঁচিয়ে বলেছিল—জগা পাগলাকো কোতল করেগা। বড়বাবু বলল—কিউ! তায়েবতনয় পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। থানার বড়বাবু বলছে—ঐ যে খেউড় করত না ও, ওটা হল ওর ইশারা, শ্যামের বাঁশি আর কি। এই হারামজাদা এদিকে আয়।

—লোহাপুলের কাছে জগার আখড়া খুঁজে পেয়েছি। সেখানে যাত্রার গোঁফ-দাড়ি, টিনের তোরঙ্গ ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই যাত্রার কোনো এক অভিনেত্রীর ছবি পাই। দেখুন দেখুন। ভাল না? বুঝতে পারেন এ এখন ছাগলের দুধ বেচে। মেলে তো? মিট চপারটা পাওয়া গেছে একটু দূরে লাইনের কাছাকাছি। চম্পাহাটি স্টেশনেই আজ জগা পাগলাক পাকড়াও করা গেছে তায়েবগৃহিণী সমেত। এই হারামজাদাই তায়েবের পার্টনার ছিল। তায়েব আলিও এলেমদার মশাই। যাত্রার মেয়েকে কেমন ফুঁসলে...জগার খিস্তির লাইনদুটো মনে করতেই এখন দেখুন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বড়বাবু আমার কথায় বলে উঠলেন, কেন মিছিমিছি ঝামেলা করবেন।

একথা-সেকথাব পর বলে উঠলেন—ঠিক আছে পাঠিয়ে দেবখন, আপনি যখন বলছেন। এসব দাতব্য তো আপনাদেরই পোষায়। খুনি ঠিক কিনা বলুন ! ধরেছি তো। জগা অবশ্য স্বীকার করেনি। ওর বাপ স্বীকার করবে। বামাল ধরেছি। হেঃ হেঃ।

গাড়িটা চলে গেল। নীরুব জামা-প্যান্টের দোকানের কাজ সেরে বাড়ির গলিতে ঢুকতেই শুনলাম ঢোলের আওয়াজ। অন্যের বাড়িতে দেখলে আমার হাসিই পেত—নিজের বাড়ির দরজায় হেঁড়ে গলা আর ঢোলের আওয়াজে যুগপৎ লজ্জা এবং রাগ হল। হিজড়ে সর্দারের সঙ্গে দেবীবাবু ! হেসে-হেসে কীসব বলছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন এই যে ছেলের বাবা।

কি করে যে খবর পায় এরা ! সর্দার বলছে—ছেলে হয়েছে, পাঁচটাকায় হবেনি। অ্যা হা অ্যা। অহ্ দিদিমণি—দিদিমণিগো—সন্ততির নপুংসক সম্বর্ধনার আয়োজন হচ্ছে। হিজড়ে সর্দারের পাশে দাঁড়িয়ে, আমার রাগ হল, অসমর্থ অ্যাজোম্পারমিক দেবীবাবু কেলিয়ে যাচ্ছেন।

—এই প্রফেসর কি হচ্ছে কি ! তাডাতাড়ি বিদেয় করুন।

—অহ্ দিদিমণি ছেইল্যা কই ?

দেবীবাবু এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন--চটছেন কেন ? খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনার জন্মেব সময়ও নেচেছে।

নীরা ছোটখাটটা পরিষ্কার করছিল। ঠোঁটে টেপা হাসি--সুধাবাবু, আমার বেড়াল ভদ্র--সময় মতো জায়গা ছেড়ে দিয়ে গেছে।

নমিতা হাসল, উবু হয়ে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরে ঢোলের আওয়াজ। হাতের মোড়কটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠার ভান করল নীরা।

—দেখি দেখি কি এনেছেন। এমা এত বড় জামা-প্যান্ট দিয়ে কি হবে ? নমি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হাবা ঠাউরে আমার দিকে দেখল।

দেবীবাবু বুদ্ধুর মতো বলে উঠলেন—ওকি মশাই, ও জামা-প্যান্ট পরতে তো ছেলের অনেক দেরি আছে।

আমি বললাম—এ বাড়িতে আর-একটি ছেলেও আসছে দেবীবাবু।

সব বললাম। ডায়মন্ডহারবারের গল্পটা বাদে। লালা বলে ভাল, ক্ষুধার্তর দীর্ঘশ্বাসকে নাভিশ্বাস বলে ভুল করেছি। এই সময়ে নীরাকে বিষণ্ণ করে দিতে ইচ্ছে হল না আমার। মুন্নির বাবাও ফের আসবে দেবীবাবু। আমার নতুন সন্ততির নপুংসক সম্বর্ধনা চলছে। আমি আড়ালে সরে আসি। হিজড়ের নাচ, ঢোলের আওয়াজেব মধ্যেই অসমর্থ দেবীবাবুর পাশে আমার পৌরুষ হঠাৎ পায়ে পা ঠুকলো।

—তায়েবের ছেলেটাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলেছি।

আব আমার এই আলোকিত সংসারে আজ কিংবা কাল মা-ও এসে পড়বেন।
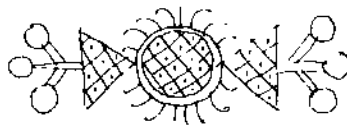
অসম্বন্ধ ॥ কেশব দাশ

অবশেষে কারখানাটা খুলল, একটানা পাঁচশ একান্ন দিন তালাবন্ধির পর।

মেসিন শপের তিননম্বর সেডে ওভার হেড ক্রেনটার নিচে ওরা তিনজন বসেছিল।

মাটি থেকে প্রায় বিশ ফুট ওপরে সেডের দু দিকে রেলের লাইনের মতো লম্বা করে দুটো লোহার পাটি পাতা, আর তার ওপর লোহার স্ট্রাকচার, যেটা চার টন পর্যন্ত মাল শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে সেডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে স্বচ্ছন্দে চলাচল করে। কোথায় একটা গণ্ডগোল, আজ কারখানা খোলার তৃতীয় দিনেও ধরতে না পারায়, ক্রেনটা এখনো অচল।

ওরা তিনজন শ্রমিক একটা লোহার স্লাবের ওপর বসে কথা বলছে। বলছে একজন—সুখিয়া কৈরি, শুনছে বাকি সকলে।...'আরে বাই সাঁপ, ও স্টোর মে। কাল ও-লোগ সাফা করনে লাগি তো এক সাঁপ—ইতনা বড়া, তড়াক সে নিকাল আয়ি। ওতো শালা কামউম ছোড়কে দৌড়নে লাগি ডরসে। শালা একদম পুরা কাউটা—'

গজু সাহা, ক্রেন ড্রাইভার, ওদের মাথার ওপর অচল ক্রেনের রেলিঙে শরীরের ভার রেখে ওদের কথা শুনছিল। এবার মুখ খোলে, 'শালা কাউটা—না?' তলার তিনজন ঘাড় তুলে ওর দিকে তাকায়।...'এক্কাবে ফোঁস কইরা ঢ্যুইকা যায় নাই ভিত্‌তর' বলেই গজু সাহা হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে এমন একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে যে সুখিয়া কৈরি ছাড়া সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।...'কাউটা দ্যাখছ হ্যালায় বাপের জন্মে..'

কেউটে বেরিয়েছে, অত্যোক্তি। তবে কারখানার স্টোর যে প্রান্তে, যার একদিকে গঙ্গা নদী আর অপর দিকে পুরানো ভাগাড়ের ডাঁই করা ময়লার উর্বর মাটিতে এখন ঘন জঙ্গল, সেখান থেকে সাপখোপ বেরিয়ে স্টোরে মালপত্তরের ফাঁক-ফোকরে যে আশ্রয় নিতে পারে—বিশেষত যখন পাঁচশ একান্ন দিন গোটা কারখানাটা অলস অচল হয়ে পড়ে থাকে—তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে একেবারে কেউটে—সাপের মুখে যে পড়ে তার চোখে সব সাপই কেউটে। তারপর সেটা মুখে রটনা হতে হতে তো নির্ঘাত কেউটেই হয়।

দীর্ঘ তালাবন্ধির পর কারখানাটা যখন খুলল তখন কারখানার ভেতর গোটা তল্লাটে কেমন নিস্তব্ধ ভূতুড়ে চেহারা। ফাঁকা জায়গাগুলোতে রোদ-জল পেয়ে গজিয়ে ওঠা ঘাস-গুল্ম, মেসিনগুলোর গায়ে ধুলোবালির পুরু আস্তরণ, যন্ত্রের খাঁজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমাট মরিচা। ঢালাই ঘরের উঁচু চিমনিটা, যার মুখ অবিরত কালো ধোঁয়া আকাশের বুকে মেঘের মতো উগরে দেয়, তা থেকে আর তপ্ত ধোঁয়া বের হচ্ছে না দেখে কয়েকটা চিল চিমনির মুখে ঘেরা জায়গাটায় কাঠকুটো সাজিয়ে বাসা বেঁধেছিল।

গেটের দারোয়ান সুন্দর সিং আজ সকালেই গল্প করছিল, 'রোদ আউর বারিষ মে গেটকা তালা এ্যায়সা খিঁচ গায়া কি যিতনা চাবি ঘুমায়, যিতনা ঘুমায় খোলে নেহি।

তব সেন সাহাব যে বোলা কি, সুন্দর তুমি তালা তোড়ে দাও। তো ফিন হ্যাম ফোর্জিং ডিপার্ট সে হাতাউড়ি লে আকে মারতে মারতে মারতে...'

পাঁচশ একান্ন দিনের আগের দিন কারখানায় নাইট শিফ্‌ট শুরু হবার আগে জেনারেল ম্যানেজার চৌধুরি নিজের চেম্বারে বসে লক-আউট নোটিশে স্বাক্ষর করার পর মানসিক উত্তেজনা অথবা বিচলতাব কারণে আর্জেন্টি ফাইলের আলমারিটা লক করতে ভুলে গেছিলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, জানালাগুলো ছিল খোলা। রাত্রি শেষ হবার আগেই লক-আউটের সংবাদটা মোটামুটি চাউর হয়ে যাবার পর আর কেউ কারখানায় ঢুকতে পারেনি। তারপর এতগুলো দিন খোলা জানালা ডিঙিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক চড়ুই পায়রা ম্যানেজারের সাজানো চেম্বারে ঢুকে নির্বাধ দৌরাত্ম চালিয়েছে। কারখানা খোলার পর চৌধুরি সাহেবের আর্জেন্ট ফাইলের আলমারিটা খড়কুটোয় ঠাসা।

সকাল থেকে গজু সাহা থেকে থেকে একবার করে ড্রাইভার কেবিনে ঢোকে, ইঞ্জিনটা পরখ করে, আবার বেরিয়ে আসে। কিন্তু ক্রেন আর চলে না। এবারও ড্রাইভার কেবিন থেকে বেরিয়ে ক্রেনের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। নিচে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ে, 'সৃখিয়া, তুম সুপারভাইজার কা পাশ খবর ভেজা?'

'হ্যাঁ, ভেজা তো।'

'আতা কিঁউ নেহি?'

'ক্যা মালুম।'

অবশ্য সুপারভাইজারের আসা অথবা না-আসা একই। সে এসে ক্রেনটা চালু করে দেবে না। রিপোর্ট নেবে, চলে যাবে। তারপর সেটা পাঠিয়ে দেবে ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজারের টেবিলে। তবু ক্রেনটা চলছে না—শুধু এই সংবাদটুকু ক্রেনে যারা কাজ করছে, এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের কাছ থেকে যথার্থ স্থানে যাওয়া দরকার—সে জন্যই সুপারভাইজারকে খবর দেওয়া।

নিচে ওদের তিনজনের মধ্যে ফটিক মণ্ডল বল্লে, 'বুঝলে গজুদা, এ যার জিনিস সে যদি থাকত, দেখতে সুপারভাইজার-টাইজার কোনো শালাকে ডাকতে হতো না। ক্রেন চলত গড়গড় করে।'

ফটিক মণ্ডল যে সনাতন মিস্ত্রীর প্রসঙ্গ বলছে, ওদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই সেড তৈরির পর থেকে এই ক্রেন সে নিজ হাতে নাড়াচাড়া করে এসেছে। সুতরাং এর নাড়িনক্ষত্র যাবতীয় তার ছিল মুঠোর মধ্যে। কিন্তু সনাতন মিস্ত্রী তো এখন গোবরা মেন্টাল হসপিটালে লোহার ফটকে বন্দি।

কারখানায় তালাবন্ধির দিনগুলিতে অনাহার যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছিল, তখন একদিন সনাতন মিস্ত্রী নিজ হাতে বিষ তুলে দিল বৌ-ছেলের মুখে। তারপর নিজেও খেলো। বৌ আর ছেলেগুলো মরল, সনাতন মিস্ত্রীর লোহা পেটা জান, মরল না—পাগল হল। খবরটা বেরিয়েছিল কাগজে। লোকমুখে টি টি পড়ল। ছ্যা ছ্যা করল সকলে। বাপ হয়ে এতো নিষ্ঠুর হয়! অথচ সনাতন মিস্ত্রী ছিল উপলক্ষ মাত্র। যারা তার স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা করতে বাধ্য করল, সকলে তাদেরকে চিনত, অভিযুক্ত করল না কেউ।

গজু সাহা রেলিঙের ওপর পায়ের ভার বদল করে সামনের দিকে তাকায়। নিচে লম্বা সেডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নানা জাতের লেদ মেসিনগুলো একের পর এক কয়েকটা সরলরেখা বরাবর সাজানো। গজু সাহা সমগ্র সেডটাকে তার দু চোখের দৃষ্টিতে ধরে সারা শরীরে কেমন একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করে। এই কারখানা, এই মেসিন,

কারখানার এই সেড, গায়ে ময়লা তেলচিটে এই উর্দি, উর্দিতে গন্ধ, গন্ধে লোহা আর তেল...এসব যাবতীয় মিলিয়ে আলাদা একটা প্রাণ, যা থেকে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আর তা নয়, বাজারে আলু-পটল বিক্রি—'নিন বাবু—ফেরেস্! আহা রে, এক টাকা বিশ কিলো—এমন মাল কার বাগানে ছিলো-ও!' শালা, তার চেয়ে মেয়েছেলের ইজ্জত বিক্রি অনেক ভালো।

পেটের ধান্ধা করতে বাজার দিয়েছিল গজু সাহা, লক-আউটের শেষ কযটা মাস।

সুপারভাইজার আসছে দু সারি লেদের মাঝে সরু রাস্তাটা পেরিয়ে, গজু সাহার চোখে পড়ে। কাছাকাছি আসতে লক্ষ করে, সুপারভাইজার হাজরাবাবুর সেই থলথলে শরীর, চামড়ার গায়ে মাখনে রঙ, ভারি চিবুক-চোয়াল সব পাঁচশ একান্ন দিনে ঝরে গেছে। এইসব লোকের এই সমস্যা, এরা জীবনে কখনো বেপরোয়া হতে জানে না। বিপদে পড়লে ছেলে-বৌ-এর হাতে বিষ তুলে দেবার মতো সাহসও নেই, বাজারে আলু-পটল বিক্রি করাটাও সম্মানে বাধে।

হাজরাবাবুকে আসতে দেখে সুখিয়া কৈরি গাল দেয়, 'আ রহা হ্যায় শালে শুয়ারকা আওলাদ!'

হাজরাবাবু ক্রেনটার নিচে এসে দাঁড়ান। 'কি হয়েছে, ক্রেন চলছে না—'

'কোথায় একটা ডিফেক্ট, ঠিক ধরা যাচ্ছে না।' গজু সাহা বলে।

'ইঞ্জিন চলছে?'

'হ্যাঁ। ইঞ্জিনে কোনো গণ্ডগোল নেই। কিন্তু টোটাল বডি তো নড়ছে না।'

'হুঁ, দেখি—' বলে হাজরাবাবু ঝুলন্ত মই বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন। হাজরাবাবুর এই মই বেয়ে ওপরে উঠে মেসিন চেক করা, ওদের চোখে নতুন ঠেকে। হাজরাবাবুর কাজ শুধু রিপোর্ট করা। মেসিন খারাপ হলে রিপোর্ট, কাজ করলে রিপোর্ট, না করলেও রিপোর্ট। ওপরওলার কাছে রিপোর্ট চালান করেই হাজরাবাবু খালাস, এতদিন ওরা তাই দেখে এসেছে। আর আজ সেই হাজরাবাবুর উল্টো আচরণে ওরা বিস্মিত হয়, ওদের ভালো লাগে। পাঁচশ একান্ন দিন কারখানার প্রথাগত পদ্ধতি আর স'পর্কগুলোকে কি পাল্টে দিল?

একদিন, কারখানায় লক-আউটের আগে, ক্যান্টিন বয় ডিউটি আওয়ার্সে চা দিয়ে গেছে। তিন নম্বর সার্ফেসিং লেদের মেসিনম্যান হারু ঘোষ মেসিন বন্ধ করে চা খাচ্ছে আর পাশে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। নজর পড়ল হাজরাবাবুর। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের টেবিলে রিপোর্ট। পরদিন চার্জশিট।

হারু ঘোষ ধরল হাজরাবাবুকে, 'এটা কি রকম হল হাজরাবাবু?'

'আমি কি করবো বলো।' হাজরাবাবুর ভালোমানুষি উত্তর।

'একটা মিথ্যে রিপোর্ট দিলেন!'

'মিথ্যে? তুমি কাজের সময় গল্প করছিলে—'

'না, চা খেতে খেতে কথা বলছিলাম।'

'ঐ একই হল।'

'কি করে একই হল? কাজের সময় চা খাওয়া বেআইনী নয়, আর চা খেতে খেতে তো কাজ করা যায় না, তাই দুটো কথা বলা বেআইনী?'

এরপর হাজরাবাবুর স্বভাবজ ভঙ্গিতে চোখ-ভ্রু-ঠোঁট-গলা একত্রে একই মাত্রায় তেরচা করে উত্তর হল, 'তোমার কাছে কি আমায় আইন শিখতে হবে?'

রাগ আর বেঁধে রাখা যায় না। দাঁতে দাঁত চেপে হারু ঘোষ, 'এ তো শালা

ত্যাঁদোড়েব মতো কথা বলছেন আপনি ?'

জল গড়িয়েছিল অনেক দূর।

ড্রাইভার কেবিনে ঢুকে সুপারভাইজার হাজরা ইঞ্জিন পরীক্ষা করেন। কয়েকবার ইঞ্জিন চলার শব্দ শোনা যায়। প্রায় আধ ঘণ্টা পর আবার নিচে আসেন। এক হাত তুলে মাথায় সাদা টাক ঘষতে ঘষতে ঠোঁট উলটিয়ে 'ফল্ট তো ঠিক ধরা যাচ্ছে না; তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি গুপ্তর কাছে খবর দিয়ে আসি।'

হাজরাবাবু যে-পথে এসেছিলেন সে-পথে বিদায় নেন।

ওরা তিনজন শ্রমিক আবার সেই লোহার স্লাবটার ওপব একে একে এসে বসে। গজু সাহাও ওদের পাশে জায়গা করে নেয়। 'খেল খতম পয়সা হজম!' গজু সাহা বলে।

'হাজরাবাবু এক্সপার্টেরা কেরামতি শেষ!'

জামাল বলে, 'এ শালা এখন সহজে ঠিক হবে না। সব মেসিনই তো ভোগে। কারখানায় মাত্র পাঁচ-ছটা মেকানিস্ট। কতগুলো সারাবে।'

সুখিয়া কৈরির দিকে গজু সাহা হাত বাড়ায় 'একটা বিড়ি ছাড—'

'বিড়ি ? তলব মিলনে কা বাদ...'

'ভাক্ শালা। নিকাল জলদি—'

'লাও! বিড়ি কাঁহা সে মিলি। আরে বাই, পানশো একাওন রোজ লকআউট— ঘরকা আউরৎ ছোড়কে সবকুছ বিকানা পড়া।'

'তা শালা ওটাকেই বা বাকি রাখলে কেন ?'

সুখিয়া কৈরি জিভ কাটে, 'এইসা বাত্ মাৎ বোলনা। উসকো বাপ হামারা উপর জিম্মেদারি দেনে ক্যা টাইম মে বোলা কি, হামারা বেটি কো তুম দেখভাল করো, আপনা কাম মে লাগাও। মগর কিসিকা হাত মে ছোড়ে নেহি।'

সুখিয়া কৈরির এমন অকপট রসিকতায় ওরা সকলে প্রাণ খুলে হাসে। জামাল বলে, 'যা হালত্ হয়েছিল, আর কিছুদিন লক-আউট চললে দেখতে সব শালাকে ঐ শেষ সম্বল ঘরের আউরতটাকেও বিক্রি করতে হতো। নইলে শালা সনাতন মিস্ত্রীর মতো, গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে ফিনিশ—'

ওরা এভাবে পরস্পর কথা বলে চলে, আর সেই কথা বলার মধ্য দিয়ে লক-আউটে দুরূহ দিনগুলোর নানা প্রসঙ্গ উঠে আসে। কথা বলতে বলতে ওরা এক সময় দেখে ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজার গুপ্ত সাহেব আসছেন, দু সারি লেদের মাঝে সরু রাস্তাটা ধরে। সঙ্গে হাজরাবাবু। একেবারে গুপ্ত সাহেবকে আসতে দেখে ওরা বিস্মিত হয় রীতিমতো। ওরা উঠে দাঁড়ায়। গুপ্ত সাহেবের চলায় বেশ ব্যস্ততা। এক তাড়া জুট হাতে নিয়ে বার বার হাত মুছছেন। গুপ্ত সাহেব এতক্ষণ অন্য কোনো মেসিন চালু কবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ওর ঘাম জবজবে পোশাক আর তেল-কালি মাখা হাত দেখে অনুমান করা যায়। ওদের সামনে এসে দাঁড়ান গুপ্ত সাহেব। সবকিছু শোনেন।

'হুঁ। ক্রেনের টোটাল বডিটাকে অয়েলিং করেছিলে ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'গিয়ার, বল বেয়ারিং--সব ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কোথাও শর্ট সার্কিট ?'

'না স্যার।'

'তাহলে...' গুপ্ত সাহেব চিন্তিত। লম্বা পায়ে ঝুলন্ত মইটার দিকে এগিয়ে যান। হাজরাবাবু পিছু অনুসরণ করতে করতে 'স্যার, আপনি ওপরে—।' গুপ্ত সাহেব কোনো উত্তর না দিয়ে মই বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন। কয়েক ধাপ উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। নিচে তাকিয়ে হাল্কা হেসে 'বুঝলে হে, ঘরে বৌ-ছেলে আছে, পড়ে গেলে দেখো, অন্তত কমপেনসেশনটা যাতে পাই...'

নিচে ওরা সকলে হেসে ওঠে, এক সাথে, গুপ্ত সাহেবের এমন জমাটি রসিকতায়। গুপ্ত সাহেব রসিকজন, প্রচার আছে। কিন্তু কারখানার সেডে শ্রমিকদের সামনে, তাঁকে এমন মেঠো রসিকতা করতে, বিশেষত সুপারভাইজারের উপস্থিতে—কখনো দেখা যায়নি। কারখানায় কাজের স্তর-পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আর সেই সম্পর্ক অনুসারে নির্ধারিত হয় কথা বলার ধাঁচ ধরন ইত্যাদি। এটাই নিয়ম। আর এখন তার ব্যতিক্রমে ওরা অবাক হয়। একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান কি সম্পর্কগুলোকেও পাল্টে দিতে পারে?

গুপ্ত সাহেব ড্রাইভার কেবিনে ঢুকে হাজরাবাবুর মতো ইঞ্জিন পরীক্ষা করেন। তারপর নিচে নেমে এসে হাজরাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ইঞ্জিনে তো কোনো ডিফেক্ট নেই। আমার মনে হয় কি জানেন, বডির কোনো ভাইটাল পার্টস্—এতো দিন তো আইডেল হয়ে পড়েছিল ক্রেনটা—ঠিক মতো ফাংশন করছে না।'

'আমারও এতক্ষণ ধরে ঠিক এরকম একটা সাসপিশন স্যার...'

গুপ্ত সাহেবের ছড়ানো পাঁচ আঙুলে মুখ ঢাকা। তাঁর দৃষ্টি অন্তর্মুখী। ডান পায়ের জুতো সমেত গোড়ালি মাটির ওপর ওঠে আর নামে, ওঠে আর নামে। এক সময় সামনের দিকে তাকান গুপ্ত সাহেব, 'এই যে তুমি, হ্যাঁ তুমি, কি নাম যেন—'

'জী, সুখিয়া কৈ—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুম যাও, জলদি, দো নম্বর স্টোর মে—এক রশি, বড়া দেখকে, হিঁয়া সে ও-ও খামবা তক্—লে আও।'

কয়েক মুহূর্ত পর সুখিয়া কৈরি একটা বড় মোটা শনের দড়ি টানতে টানতে নিয়ে আসে। গুপ্ত সাহেবের নির্দেশে দড়ির দুটো খুঁট উঁচুতে ক্রেনের দুই প্রান্তে শক্ত করে বাঁধা হয়। ফলে বাকি দড়িটা অর্ধ বৃত্তাকারে ঝুলে পড়ে মাটিতে। গুপ্ত সাহেব গজু সাহাকে ড্রাইভার কেবিনে যেতে বলেন। আশেপাশে লেদ মেসিনগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের ডেকে আনা হয়। তারপর ম্যানেজার সাহেব, সুপারভাইজারবাবু, শ্রমিকরা সকলে মিলে দড়িটা বেড় দিয়ে ধরে টানতে থাকে সামনের দিকে।

দাঁতে দাঁত মানুষগুলো। শরীরের সমস্ত শক্তি অর্পিত একটা দড়ির ওপর। শক্ত পায়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরার উদ্যম। মুখে অস্ফুট চিৎকার—'হেঁ-ই-ই-ই-ও-ও-ও...'

প্রথম একটা জড় ভারকে গতিশীল করতে যতটা শক্তি আরোপ করতে হয়, তারপর সেটা ক্রমশ বেগবান হতে হতে শক্তির আরোপণও কমায়—এবং এক সময় ওরা দেখে ক্রেন, ক্রেনের গোটা দেহ আপনা থেকেই চলতে শুরু করেছে। সামনের দিকে কিছুটা গিয়ে ক্রেনটা গিয়ার চেঞ্জ করে পেছনের দিকে মোড় নেয়। ড্রাইভার কেবিন থেকে গজু সাহার খুশিতে উচ্ছ্বলিত মুখ বাইরে বেরিয়ে আসে। আনন্দে চিৎকার করে ওঠে গজু সাহা, 'ও-হো-হো-হা-আ-আ-আ...'

আর নিচের মানুষগুলোর মুখেও একটা সাফল্যের পর খুশির ঢল। ওরা সকলে হাসে, হাসে আর হাত নাড়ে—একটা প্রচণ্ড বাধা অতিক্রমণের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে।

এটা একটা ছবি। একটা মুহূর্তের দুষ্প্রাপ্য একটা ছবি। একে তো চিরস্থায়ী ধরে রাখা যায় না। একে একে যন্ত্রগুলো আবার সচল হয়ে উঠলে, যন্ত্রের উদর থেকে কাঁচামাল পণ্য হয়ে বেরিয়ে এলে এ ছবির মুখ, ভাবভঙ্গি, অবস্থান, ভাষা সব আলাদা হয়ে যাবে, হয়ে যায়, হতে বাধ্য...
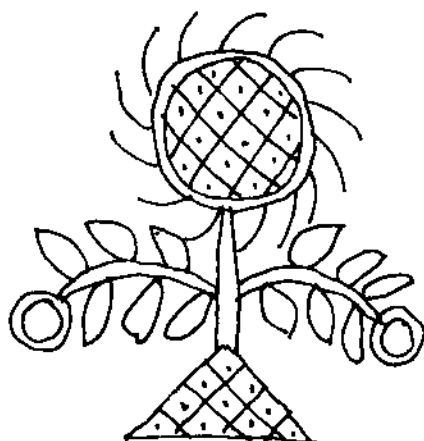
আবহমানের ছবি ॥ কিন্নর রায়

মধ্য-বৈশাখের রোদ লাগা ভোর। পাছদুযার পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বাঁ-পা এবং জলে ডান-পা'টি ডুবিয়ে, কোমর থেকে পিঠ মাথা গলা বুক ঝুঁকিয়ে এনে, লালচে নতুন গামছায কালো সর্ষে ধুতে ধুতে উমা টের পেল অক্ষয় তৃতীয়ার পৃথিবী বড় তাড়াতাড়ি গরম হয়ে উঠছে।

নতুন গামছায় কালো সর্ষে প্রায় দু-আড়াই সের। সঙ্গে সামান্য হলুদ, তেজপাতা, জিরে, ধনে—সব মিলিয়ে বারো রকম মশলা প্রায়। বোঁটাঅলা সবুজ কাঁচা আম, গিলা ফল—সবই গামছার বুকে। জলে ডোবানো ওঠানো, হাতের পাতা দিয়ে ঘষে ঘষে ধোয়াধুযির সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানা বর্ণে রোদেব মনোরম কারুকাজ।

উল্টোদিকে তারই মুখোমুখি, অথচ স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পূর্ণ বিপরীত শরীর বিন্যাসে দাঁড়িয়ে দেড় বছরের ছোট জা শৈল গামছার দুটি খুঁট বাঁ হাতে ধরে, ডান হাতে জলের ভেতর সর্ষে আর অন্যান্যদের রগড়াতে রগড়াতে প্রায় মন্ত্রের উচ্চারণে বিড়বিড় করে বলছিল—চিনি চিনি, মধু মধু হইও। বারো বারো বছর থাইকো। হগ্‌গলের ভালো দেইখো...। আর এই শব্দমালা, জলে নাড়ানাড়ির সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের জলে ভেসে থাকা দুই নারীর ছায়া ক্রমাগত ভাঙছিল। এই একই সুর, একই কথা ফুটে উঠছিল উমার কণ্ঠেও।

সবে কুড়ি পেরনো দুই সন্তানের জননী উমার ফর্সা ঘাড়ে রোদ আর পুকুরপাড়ে বিশাল নিমের ছায়ার আশ্চর্য কাটাকুটি। কখনও গালেও। আর গালে এই রোদ-প্রহারে আবছা এক লালিমাও। সে তুলনায় শৈল তো কালোই, কিংবা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

উমার কালীঘাটের পট হেন শারীরিক মানচিত্রের পাশে শৈল একহারা, ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গী। এককথায় আধুনিকেব স্লিম। উমার পাতলা, ভিজে, লালচে চুলে আটকে থাকে হলুদ হলুদ বুড়ো নিমপাতা। শৈলের দীর্ঘ কেশের এলো খোঁপায় সদ্য স্নানের চিহ্ন। বাড়িতে ফিরে মেলে দিতে হবে, নইলে শুকায় না। দুর্গন্ধ হয়। তার কানের পাশে যে শুকিয়ে ওঠা আলগা মতো ঝুরো চুল, সেখানে পুকুর থেকে সর্ষে ধোয়া জল ছিটকে এসে লেগে আছে। হঠাৎ দেখলে সাদা পোখরাজের উপমা মনে আসতে পারে।

ঘাটের ওপর পিতলের মাজা কলসি। স্বর্ণবর্ণে রোদের বাহারি কারুচিত্র। এবং পাশে দাঁড়ানো প্রায় নির্বিকার, সর্বাঙ্গ সাদায় মোড়া যে দীর্ঘাঙ্গিনী, তার আভরণহীন হাত, কান, গলায়, ছেলেদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুলে বৈধব্যের রিক্ততাই। শিবানী, মুখে মুখে যার নাম শিবি—বছর আড়াই বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে। সম্পর্কে উমা ও শৈলের আপন ননদ। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। তার তিনটি সন্তানের দুটি মৃত। একটি জীবিত। অবশিষ্টটি এ-বাড়ির আশ্রয়ে।

এ নারীর সাদা পোশাক, আভরণহীন শারীরিক বিন্যাস যেন বা কোনো শ্বেতপাথরের শোকস্থাপত্য, যার গায়ে দুই অথবা চার লাইনের এপিটাফ। তার আয়ত

গভীব চোখে বেদনাব স্থিব কাজলে এব, দৃষ্টি নিক্ষেপেও এক সকবুণ শোকযাত্রাব স্থিবচিত্র।

মাত্র তিন মাস আগে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহেব নেতা সূর্য সেনেব ফাঁসি হযে গেছে। অথচ ১৯৩৪ এব এই অক্ষয তৃতীযায ফবিদপুব জেলাব উপোসিতে তেমনই কাসুন্দিব আযোজন। যেমন প্রতিবছব, এ সমযেই। তিন নাবী গামছায বাঁধা সর্ষে ধুযে কলসিতে পুকুব জল ভবে বাড়িব উঠোনে পৌঁছে যায। সেখানে গোবব মাটি ল্যাপা অনেকখানি জাযগায ঐ ভিজে গামছাটি পেতে তাবা সর্ষে এবং মশলাদেব শুইযে দেয। তীব্র বোদ জল টেনে নিতে থাকে। আব ঐ কলসিব জল, যাকে আব জল বলা যাবে না, বলতে হবে মধু, ঢেলে দেযা হয পবিস্কাব উনোনেব আঁচে বসানো মাজা বিশাল পিতলেব হাঁড়িতে। তাপে বাস্প হয জল অথবা 'মধু'।

হৈমবতী হাঁড়ি থেকে ধুঁইযে ওঠা বাস্প ছুঁযে ছুঁযে পবীক্ষা কবেন জল, যাকে আব জল না বলে মধুই বলা হচ্ছে, আঁচে ঠিক তৈবি হচ্ছে কিনা।

তীব্র তাপে সর্ষে শুকিযে ওঠে। আগুনেব হলকা হাঁড়িব ভেতব জলকে নির্দিষ্ট মাপেব জাযগায পৌঁছে দেয। ঢেঁকি ঘবে অনেকগুলি পাযেব পাবা পড়ে। সর্ষে কোটা হযে যায। তাবপব সেই ফুটন্ত জলেব ভেতব সর্ষে এবং নুন। অল্পক্ষণেব মধ্যেই প্রচণ্ড ঝাঁঝে নাক জ্বলে, চোখও। খেজুব গাছেব পাতা ফেলে দেযা সবু কাঠিব সাহায্যে স্নান সেবে আসা, পবিস্কাব কাপড় মোড়া হৈমবতী কাসুন্দি নাড়েন, নাড়েন। এবং পাশে কখনও শিবি, কখনও শৈল বা উমা।

হৈমবতীব সংসাব এবকম। বিজয, অন্নদা, অক্ষয—তাঁব তিন পুত্র—তাদেব তিন বৌ সৌদামিনী, উমা, শৈল। বিজযেব চাবটি সন্তান। তিনটি বেঁচে আছে। বড় মেযে, তাবপবেব ছেলেটি নেই। তাবপব আবাব ছেলে এবং কোলেবটি মেযে, তাব বযেস মাত্র মাস আড়াই। সেই আড়াই মাসেব নবজাতিকাব শবীব কেমন যেন অপুষ্টি-আক্রান্ত, আট মাস গর্ভবাসেব পবই তাব পৃথিবীব আলো দেখা। এবং সৌদামিনী ঘোব সূতিকায। সৌদামিনীব বড় মেযে উত্তমাব বযেস এগাবো।

উমাব দুটিই পুত্রসন্তান। এবং শৈল এখনও মা হতে পাবেনি, ফলে তাব মানসপটে ক্বচিৎ বিষাদ। দেবতাব আশীর্বাদী ফুল, মালা, সন্ন্যাসী, ব্রত, উপোস—কিছুই তাকে এখনও সন্তানবতী কবতে পাবেনি। আব শিবি-ব জীবিত সন্তানটি পুত্র। মৃতদেব একজন পুত্র, একজন কন্যা।

বেশ কম বযেসেই বিধবা হযেছিলেন হৈমবতী। এশিযাটিক কলেবায মাবা গেছিলেন দুর্গাশঙ্কব। সন্তানবা সকলেই তখন ছোট ছোট। নিজেব স্থিব বুদ্ধি এবং মানসিক স্থৈর্যে তাঁব সংসাব সামলে নেযা। এবং তখন অবশ্যই পাশে পাশে দুর্গাশঙ্কবেব আট বছবেব বড় দাদা শিবশঙ্কব আব দুর্গাশঙ্কবেব থেকে তিন বছবেব ছোট ভাই কালীশঙ্কব। যৌথ পবিবাবে নানান ভালো-মন্দেব ভেতব হৈমবতী তাঁব জীবনেব এই বিশাল ঝঞ্ঝা-পর্বটুকু একটু একটু কবে সামলে নিযেছিলেন।

বোদ তাব আপন নিযমে ঝলসে দিচ্ছিল চবাচব। উঠোনে সেই গোবব নিকনো জাযগাটিতেই পিতলেব হাঁড়ি থেকে মাটিব হাঁড়িতে ঢালা কাসুন্দি বাখা হযেছিল। তাব মুখে পবিস্কাব কাপড়েব ঢাকনা। হাতায হাতায ঝাঁঝালো সর্ষেব জল তুলে তুলে ঢেলে দেয হাঁড়িব মুখেব ঐ ন্যাকড়াব ওপব। বোদেব তাপে তাপে তাবা যেন বা বাতাসা। অনেক অনেকটা সময পবে তাদেব চেঁছে চেঁছে তুলে বাখা হয নতুন মাটিব ঘটে। তাব মুখে নতুন মাটিব খুবি, ঢাকনা হিসেবে। তাব ওপব আবাব ন্যাকড়াব বাঁধন।

তারপর চালের সঙ্গে টাঙানো ছিকায় তুলে রাখার আগে নতুন দুব্বোর গুছি নিয়ে বলা, দুব্বা দিয়া রাজার মুখ বাঁধলাম, রানীর মুখ বাঁধলাম।

সমস্ত পর্বটিই গ্রথিত অত্যন্ত ধীর লয়ে, দীর্ঘ সময় ধরে। ছিকায় কাসুন্দির ঘট টাঙানো দেখতে দেখতে হৈমবতীর মনে পড়ল আর তিনদিন পরে ঘট নামিয়ে কাসুন্দির সাধ দিতে হবে এবং সেও অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে, স্নানের পর ধোয়া কাপড়ে। উলু শাঁখ এবং কিছু প্রচলিত উচ্চারণের পর ঘট ফিরে যাবে সেই শূন্যে, ঝুলন্ত অবস্থানে। তারপর রথ কেটে গেলে নিস্তারিণী পুজোর দিন এই ঘট নামবে। তার ভেতর শুকনো শুকনো কাসুন্দি। ভাতের ঘ্রাণ, আস্বাদ সবই পাল্টায় তার সঙ্গগুণে।

ঘটের অবস্থান দেখতে দেখতে হৈমবতীর মনে পড়ল দুর্গাশঙ্কর বড্ড ভালোবাসতেন আম-কাসুন্দি। কালো পাথরের চ্যাটালো খাদার বুকে চাক চাক কাটা খোসা ছাড়ানো সাদা কাঁচা আমের টুকরোরা কাসুন্দির সোনালি স্পর্শে অন্য কোনো মাত্রা পেয়ে যায়। এবং এভাবেই প্রায় তেঁতুল-কাসুন্দিও।

ছিকার দড়িতে কাসুন্দির ঘট ঝুলিয়ে রাখছিল অক্ষয়। আর হৈমবতী তখন দুর্গাশঙ্করকেই দেখতে পাচ্ছিলেন, এমন কি অক্ষয়ের সিঁথি ও গোঁফের ডিজাইনেও দুর্গাশঙ্করই। চোখের পাতা ভারী হলো হৈমবতীর। রগড়ে ফেললেন। এবং পাতা নিংড়ে জলই, জলের রেখা। একি সর্ষের ঝাঁঝ, নাকি চালের বাতা থেকে ঝড়ে পড়া কুটো? নাকি স্মৃতিভার? হৈমবতী কি এখনও দুর্গাশঙ্করের মায়ায়?

হাতের উল্টোপিঠ নয়, আঁচলকেই জল-নিরোধী করে তুললেন হৈমবতী। তিনি জানেন মানুষকে একাই বাঁচতে হয় আর যা সামনে আসছে তাকে যতটা পার সহজভাবে মেনে নাও, এ সবই অবশ্য প্রকৃতির পাঠশালায় শিখে নেয়া।

নতুন ঘট ছিকাতে স্থির। অক্ষয় ধীরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। হৈমবতীও। এই মধ্য বৈশাখে তৈরি করা কাসুন্দি রোদে দিতে দিতে গৃহস্থর বর্ষার সঞ্চয় হয়ে উঠবে, অন্যতম ব্যঞ্জনও। যেমন শীতের শেষে পাকা তেঁতুল বঁটিতে কুটে বিচি বের করে হাতে হাতে দলা পাকিয়ে, সামান্য সর্ষের তেল মাখিয়ে মাটির হাঁড়িতে হাঁড়িতে রেখে দেয়া। মুখে পরিস্কার ন্যাকড়ার ঢাকনা। সেই সময়ই গুড়ে ফুটিয়ে তেঁতুলের আচারও। ওপরে ভাজা মশলার গুঁড়ো। আর এই গরমে কাঁচা আম দিয়ে নানাবিধ আচার— গুড় এবং চিনিতে। সবই তো গৃহস্থের সঞ্চয়। এসবই রাখা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে। যেন বা গৃহদেবতা, নারায়ণ শিলা বা বাণলিঙ্গ।

যাদের বাড়ি কাসুন্দি হয় না, বিশেষ করে মুসলমানেরা কাল পরশু থেকেই বাড়িতে আসতে আরম্ভ করবে বাটি নিয়ে। ওদেরও কাসুন্দি দিতে হবে—এক হাতা—এক হাতা, এমন প্রায় সারা বছরই। এ নিয়ম আবহমানের। যেমন ওরা বিজয়া দশমীর দিন হৈমবতীকে একটাকা দিয়ে প্রণাম করে জোড়া নারকেল নিয়ে যায়।

এমন নানা ভাবনার সুতো বুনতে বুনতে হৈমবতীর উঠোনে পৌঁছে যাওয়া। তীব্র রোদ কাসুন্দির নতুন হাঁড়ির গায়ে, তার পাশে ছোট্ট একটি ছায়া। বাতাসে মিষ্টি ধুলোর গন্ধ। আর বোধহয় কোনো ফুলের। কি ফুল, কি ফুল! বার বার স্মৃতি ঝাঁকিয়েও হৈমবতী মনে করতে পারলেন না।

দুই

এই শেষ রাতের অন্ধকারে তলপেটের তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে যেতে যেতে শিবি বুঝতে পারে তার ঋতু শুরু হবার সময় এসেছে। অথচ এই পঁচিশে, এই আভরণহীন বৈধব্য

যন্ত্রণায় এ প্রাকৃতিক নিয়মের তো কোনো দরকার নেই। কেবলই জ্বালা শুধু, শরীরে এবং মনে করিয়ে দেয়া এখনও সে-কোনো নারী-ই। উর্বরা নারী-ভূমি।

মেঝেতে লম্বা বিছানায় হৈমবতী শিবি আর অনাথ, বেঁচে থাকা একমাত্র সন্তানটি, যাকে নিয়ে কখনও শিবির ছোট ছোট স্বপ্নের ঢেউ। এই প্রচণ্ড তলপেট মোচড়ানি, আসন্ন ঋতুপর্বের পূর্বাভাস শিবিকে সন্ত্রস্ত করে। তিন দিনের রক্তপাত, শারীরিক অস্বস্তি, শুধুই কাপড় পেতে ভূমিশয্যা, তেল না মাখা সবই তো প্রথানুগ। তারপর কলা গাছের খোসায় তৈরি ক্ষারে মাথা ধুয়ে পূর্ববর্তী স্বাভাবিকে ফিরে এসেও শরীরে কি এক দহন জ্বালা। এ লজ্জার কথা শিবি কাকে বলে!

ঋতুকালে সধবা রমণীও তো কাপড় পেতে একক ভূমিশয্যায়, রুক্ষ স্নান ও কপালে সিঁদুর না নিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করে। তিন রাত্রি স্বামী-সঙ্গহীন নারী আবার তো স্বাভাবিকে ফেরে—ক্ষারে মাথা ধুয়ে, কপালে-সিঁথিতে সিঁদুর এঁকে রক্তিম তাম্বুল রেখায় উদ্ভাসিত ঠোঁটে। তখন সে আবার স্বামী সহবাসে নিজেকে ধন্য করে, শরীর-দহন ফেরে শীতল-বিন্দুতে।

আর শিবি এই অন্ধকারে তার নারীত্বের যন্ত্রণা শরীরে নিয়ে ক্রমাগত শারীরিক অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে। মাথার বালিশ চেপে ধরে তলপেটে। কিছু পরে হৈমবতীকে ঠেলে জাগিয়ে তার সমস্যাটি জানাতে চায়। কি ভেবে যেন জাগায় না।

শিবি এই যন্ত্রণার মুহূর্তেও পৌঁছে যেতে পারে ধাউনকায় তার শ্বশুরবাড়ির চৌহদ্দিতে। যেখানে তার স্বামী বিষ্ণু মারা যায় পান-বসন্তে। এখনও যেন শ্বশুরবাড়ির অম্বিকা মন্দির, যেখানে পাথরের অষ্টভুজা দুর্গা—যাঁর পরিচিতি অম্বিকা নামেই, স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। মন্দিরের গর্ভগৃহে ঘিয়ের প্রদীপের হলুদ মতন আলোয় দেবীর কষ্টি পাথরের শরীরে অষ্ট ধাতুর ত্রিনয়ন, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ। কল্যাণ-করুণার বদলে দৃষ্টিতে যেন কিছু ভয়ই। আর সেই মন্দির-গৃহে কোনো শব্দ ছুঁড়ে দিতে পারলেই প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। তারও কেমন যেন এক আকর্ষণ আর আতঙ্কও। কিছুদূরে বুড়োশিবের মন্দির। বিশাল, দীর্ঘ শিবলিঙ্গ। মাথায় কোনো ছাদ নেই। এর পেছনেও এক প্রচলিত মিথ। বুড়োশিব নাকি মাথার ওপরে ছাদ মেনে নেননি। বহুদিন আগে একবার ঢেকে দেয়ার পর স্বপ্নে দেখা দেয় সেবায়েতকে। তারপর প্রচলিত ধারা অনুযায়ী দেবতার পদাঘাতেই নাকি মন্দিরের ছাউনি নিশ্চিহ্ন। এখন ছাদ বলতে আকাশ। সেখান থেকে শীতের হিম, বর্ষার বৃষ্টি, অন্য ঋতুর রোদ, নক্ষত্রের আলো, হাওয়া ঝরে পড়ে দেবতার মাথায়। পাশে বিশাল বেল গাছ। নাগকেশর ফুল গাছ। অহো, হাওয়ায় তার সুঘ্রাণ মিশে থাকে। বিল্বপত্রে নিয়মিত দেবতার সেবা।

আর গাজনের দিনে বুড়োশিবের সামনে পাঁঠা বলি। গাজন-সন্ন্যাসীদের বাণ ফোঁড়া, কাঁটা ঝাঁপ। জিভে ফোঁড়া লোহার বাণ খুলেই দিব্যি বুড়োশিবের প্রসাদী মাংস আর ভাত খেয়ে নেয়া গাজন-সন্ন্যাসীদের। দুর্গা পুজোয় অম্বিকার উৎসব। চারদিন ধরে ভোগ, পাঁঠা বলি। ঢাক-ঢোলের তীব্র বাদ্যি।

রাত নিশুত হয়ে গেলে খড়ম খটখটিয়ে বুড়োশিব নাকি অভিসারে যান অম্বিকার মন্দিরে। তার আগেই প্রথম প্রহরের শেয়ালেরা ডেকে গেছে। নাগকেশর ঝরে যায় ঘাসের ওপর। আর সেই খড়মের শব্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে পৃথিবী।

শিবি কখনও এই পদশব্দে শুনতে পায়নি। বিষ্ণুও না। তার বাবা-মা অথবা তাঁদেরও পিতা-মাতারা কেউ হয়তো এই খড়ম-ধ্বনি শোনাকে নিজেদের অন্তর্গত অভ্যাস করে নিয়েছিলেন। আর সেই থেকেই হয়তো সূত্রপাত এই কাহিনীটির।

যেমন আরও এক কাহিনী—ধাউনকাব শ্যামা ঠাইরেনের পুকুরে পুজোর আগে নির্দিষ্ট সময়ে ভেসে উঠত পুজোর বাসন। পুজো শেষে জলে দিলেই আবার তারা যেত ডুবে। তারপর এক ঝি মাজতে গিয়ে লোভে পড়ল। চুরি করল বাসন। তারপর আর বাসন ভাসে না। দেবী স্বপ্নে এসে জানিয়ে যান এই দোষের বিবরণ। অপরাধিনীর শাস্তি হয়।

দেবতা-দেবী মানেই তো তার সামনে-পেছনে কাহিনী, উপকাহিনী। তাঁর মাহাত্ম্য। এই যন্ত্রণায় হৈমবতীকে জাগাবে কি জাগাবে না ভাবতে ভাবতে শিবি তো ধাউনকার সেই বাড়ি, অম্বিকা, বুড়োশিবের মন্দির, নাগকেশর ফুলের গাছ ছুঁয়ে ফেলে। তার চেতনায় ভেসে আসে অম্বিকা মন্দিরের পাশে বিশাল কালো পাথর দিয়ে বোজানো সুড়ঙ্গ-পথটির ছবি।

কবে—কোন প্রাচীনকালে সেখানে নাকি তৈরি হতো মহামাষ তেল। সুড়ঙ্গপথে বন্দি করে রাখা হতো নারী, আর নপুংসকদের। দীর্ঘদিন খাইয়ে-দাইয়ে ঘিয়ে-দুধে, মাছে-মাংসে তাদের নধরকান্তি করে তোলা। তারপর একদিন লক্‌লকে আগুনের কুণ্ডের ওপর মাথা নিচের দিকে করে পা বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া সেই সব স্বাস্থ্যবতী নারী আর মোটাসোটা নপুংসকদের।

আগুনের আঁচে ঝলসে যাওয়া জীবন্ত, নগ্ন শরীর থেকে তেল একটু একটু করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে নিচে রাখা বড় পাত্রের মধ্যে। আর ঝলসানো শরীরেরা শিউরে শিউরে উঠছে যন্ত্রণায়। শরীর ভাঙা আর্তনাদ আর অস্পষ্ট গোঙানি শোনার কেউ নেই। মাটির নিচে এই সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে আসা গুহা ঘরে শুধু ভিষকেরা। যারা মহামাস তেলে বানাবে মহার্ঘ কবিরাজি ওষুধ, শুধুই ধনীদের ব্যবহারের জন্যে।

ইংরেজ আসার পর পরই নাকি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় এই নারীমেধ-এর জায়গাটি। তারপর থেকেই অম্বিকার মন্দিরেব পাশে এই বিশাল কালো পাথরটি অনেক দীর্ঘশ্বাসের চিহ্ন হয়ে স্থির।

নারীত্বের এই কষ্টে ঐ নিকষ কৃষ্ণবর্ণ পাথরটিকেও বড় বেশি মনে আসে শিবির। যার আড়ালে হা-হা সুড়ঙ্গ, অনেক নারী এবং নপুংসক হত্যার স্মৃতি নিয়ে। বুঝিবা পাথরেই নিজের প্রতিমা আবিষ্কার করে।

এই কষ্টের গভীরে, ফলহীন, প্রাক-ঋতু মুহূর্তে বিষ্ণুচরণের আশ্লেষ, তিন-তিনটি সন্তান, তাদের প্রথম দুজনের মৃত্যু, আর বিষ্ণুর মৃত্যুর পর তিন সাড়ে তিনের অনাথকে নিয়ে একরকম চাপে পড়েই তাব চলে আসা—সবই মনে পড়ে যায় শিবি-র। হৈমবতী চাননি তাঁর একটি মাত্র কন্যা অবস্থাপন্ন শ্বশুরবাড়িতে দেওর-ভাসুরদের গলগ্রহ, কিংবা পেটভাতার ঝি হিসেবে থাকুক। বিষ্ণুর মা-বাবারা সাত মাসের ব্যবধানে মারা যান বিষ্ণুর মৃত্যুর বছর দুই আগে। আর বিষ্ণুর মৃত্যুর ঢেউতেই তো শিবি-র আছড়ে-পড়া তার শৈশবের উপোসিতে।

আকাশের রঙ কি ফিকে হয়ে এলো? কোথাও কি ডেকে উঠছে পাখি? তলপেট কামড়াতে কামড়াতে নেমে আসা অস্বস্তি সামলাতে শিবি বিছানা ছাড়ল। তারপর হৈমবতীকে না ডেকেই বাইরে যাওয়ার জন্যে দরজার খিলে তার হাত ছোঁয়ানো।

তিন

দোলে রে দোলে
কাঁঠাল খাইয়া ফোলে

দোলেরে মাল
চন্দনী কপাল
দুদু ভাতু খাইয়া মালোর
ভুতু ভুতু গাল

বাবু হয়ে বসা উত্তমা কোলে কাঁথার ওপরে শোয়ানো মাস-তিনেকের বোনকে হাঁটু ঝাঁকিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিল। ধীর, আরামদায়ক দুলুনি, ঘুম পাড়ানিয়া গানের সুর, কিছুই কচি প্রাণটিকে ভোলাতে পারে না। তার বুক জুড়ে স্তন-তৃষ্ণা। আর তারই চিহ্ন উৎসারিত প্রবল কান্নায়, চিল্ চ্যাচানিতে। ঝিনুক-বাটি দিয়ে সামান্য সামান্য দুধ তার কান্নার ফাঁকে ফাঁকে একটু আগে গলা দিয়ে নামিয়ে দেয়া হলেও, এখন তার তৃষ্ণা মাতৃস্তনেরই।

সৌদামিনী গত রাত থেকেই আরও অসুস্থতায়। সূতিকা, রক্তশূন্যতা, সেই সঙ্গে কোনো সংক্রামক জ্বর তাকে বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রাখে। রক্তহীন, হাত-পা-মুখ ফোলা সৌদামিনী জ্বরের ঘোরে বাচ্চাকে খোঁজে, আর বাচ্চা মায়ের স্তন।

স্থানীয় কবিরাজ এবং হোমিওপ্যাথ তাঁদের চিকিৎসা-জ্ঞানের শেষ ব্রহ্মাস্ত্রটুকু সৌদামিনীর প্রাণ রক্ষার জন্যে নিক্ষেপ করে আক্ষেপের সঙ্গে ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে যান।

অবশেষে জেলা শহর থেকে একজন এল এম এফও। যিনি শোলার হ্যাট, হাফ প্যান্ট, আলপাকার কোট ও কেডস পরে আসেন। চোখে রুপোর গোল গোল সাদা ফ্রেমের প্যাঁশো। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামছে।

নিজস্ব পালকি তাঁকে বয়ে নিয়ে আসে, নিয়ে যায়। সৌদামিনীর ঘরে ঢুকেই তিনি সব জানলা-দরজা খুলে দেন। কঙ্কালসার কাঠামোর নাড়ি দেখেন, কোটের ঘড়ি-পকেট থেকে গোল ঘড়ি বের করে কি যেন মেলান। বুকে পিঠে স্টেথো বসিয়ে টিপে টিপে শব্দ শোনেন। তারপর খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখে ঘাড নাড়েন, ঘাড় নাড়েন। আর তা আশাহীনতাকেই ফুটিয়ে তোলে।

আর তখনই বাইরের উঠোনে রোদ খাওয়া নতুন কাসুন্দির হাঁড়ির সামনে কোত্থেকে যেন উড়ে আসে কালো দাঁড়কাক। ডানা ঝাপটে ঝাপটে তাকে হাঁড়ির দিকে এগোতে দেখেই হুস হুস করে তাড়ায় উঠোনে দাঁড়ানো অনাথ আর অন্য বাচ্চারাও।

কাক সরে না। উড়ে বসতে চায় হাঁড়ির ওপর, বিশ্রি ডাক ডেকে ওঠে। আর কি ভেবে, কাক তাড়াতেই যেন একটি বড় ঢিল কুড়িয়ে ছোঁড়ে অনাথ। কাক ওড়ে, হাঁড়ি ভাঙে।

শহর থেকে আসা ডাক্তারকে বিদায় জানাতে উঠোনে আসা অনেকেই দেখতে পায় ভাঙা হাঁড়ির গা দিয়ে গড়িয়ে পড়া সোনালি কাসুন্দি শুকনো ধুলোটে মাটির বুকে একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে।

স্থান-কাল-পাত্র ভুলে—কোন হারামজাদার কাম—বলেই হৈমবতীর ডুকরে ওঠা। কারণ, তিনি তো তাঁর সংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে আছেন—কাসুন্দির হাঁড়ি ভাঙা মানেই এক গভীর অমঙ্গল, এমন কি মৃত্যুও। আর ঘরে অসুস্থ বড় বৌকে জবাব দিয়ে যাওয়া ইংরেজি ওষুধের ডাক্তার তো হৈমবতী ও তাঁর পরিবারের সকলকেই এক গাঢ় অমঙ্গলের জন্যে প্রস্তুত করে। আর তখনই কাসুন্দির হাঁড়ি ভেঙে ফেলার বিষয়টি অকল্যাণের মূল আবহ হিসেবেই বেজে ওঠে।

ভয়ার্ত অনাথ কোথায় লুকোবে, ভাবতে পারে না। তার জন্যে প্রবল মার, না

খেতে দেয়া বা যে কোনো শাস্তিই অপেক্ষা করতে থাকে। সকলেই সর্বনাশের দূত হিসেবে অনাথকে চিহ্নিত করে। আর সবে ঋতুস্নান সারা শিবি-র স্মৃতিতে তখনই ভেসে ওঠে অনাথের ছ'মাস হওয়ার পর, মানতের চুল দেয়ার জন্যে নৌকো করে মাওইসাব দিগম্বরীতলায় যাওয়া। সঙ্গে বাজনা বাদ্যি, ঢাক-ঢোল, আস্ত এক জোড়া বলির পাঁঠা, ঘন কৃষ্ণবর্ণ, পুজোর অন্যান্য সামগ্রী। বিষ্ণু ছিলেন, আর ছিল ওঁর ছোট ভাই সুধা। বাড়িরই বলির খড়েগ দুটি পাঁঠার মস্তক ছেদন। এবং রক্তাক্ত বলির মুণ্ড গড়িয়ে দেয়া সেই বিশাল বটবৃক্ষের কোটরে, প্রচলিত নিয়ম এমনই। কোনো দেবী মূর্তি নয়, এক প্রাচীন বটই সেখানে দেবতার প্রতিমা।

সুধাই বলি দিয়েছিল। আর তার এ অভ্যাস মজ্জাগত। অম্বিকার সামনেও বহুবার ঘাতকের ভূমিকায়। ঝলসে ওঠা খড়েগ ছিটকে যায় ছাগমুণ্ড।

দিগম্বরীতলায় অনাথের মাথা কামিয়ে, পুজো শেষে আবারও নৌকোয় ফেরা। ফুটফুটে অনাথের মুখে হাসি আর হাসি। তখন তো তার নাম অনাথবন্ধু, তার বাবা বেঁচে আছে, তাদের বাড়ির অবস্থা ভালো। আর এখন, এই যৌথ পরিবারে পরগাছা হিসেবে না হলেও শিকড়হীন অনাথ তার নামের বন্ধু শব্দটিকে কবেই না খুইয়ে ফেলেছে মুখে মুখে। এই প্রায় শেষ হয়ে আসা বৈশাখে কাসুন্দির হাঁড়ি ভেঙে নিশ্চিত অমঙ্গলের বোধন তো তারই হাতে। অনাথ তাই লুকিয়ে পড়ার প্রয়াসে। যেন বা ভীত, তাড়া খাওড়া জানোয়ার। সর্বসমক্ষে এতখানি আত্ম-খননের পর শিবি তো উচ্চারণই করে চাপা স্বরে, যেন বা অনাথকে বাঁচাতেই এবং কিছুটা আপন আত্মগ্লানি মোচনে—হারামজাদারে একবার পাইলে হয়।

সৌদামিনীর কোলেরটি উত্তমার কোলে আবারও স্তনের নেশায় ডুকরে ওঠে। বিছানার পাশে অভ্যাসমতো শিশুশরীর না পেয়ে প্রবল জ্বরবিকারের ঘোরে এদিক-ওদিক হাতড়ে ফেরে সৌদামিনী—এলোমেলো কাঁপা হাতে। তারপর একসময় তার দু' চোখের ঘূর্ণমান তারারা শিবনেত্র হতে হতে টিনের চালে শাল খুঁটির ফ্রেমে কোনো নাট বল্টুর পাশে আটকে যায়। স্থির। একটা গভীর শ্বাসের তরঙ্গ নাভি থেকে উঠে আসতে আসতে গলার কাছে হিক্কা হয়ে আটকায়। তারপর তো সৌদামিনীর সমস্ত পৃথিবীই অন্ধকার।

পালকি চড়া ইংরেজি ওষুধ লেখা ডাক্তার তখন এবাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে। পাখিদের ঘরে ফেরা ডানার ঝাপটানিতে বেলা শেষের গান। শেষ সূর্যের আলোয় এই ঘরে উপস্থিত হৈমবতী, উমা, শৈল এবং ঋতু-স্নানান্তের শিবি একটি স্থির মৃত্যুকে দেখছে। কেমন একটু বেঁকে যাওয়া হাত-পা। দু' চোখে মৃত্যুর হিম-নীল। দূরে—কোন গৃহস্থ ঘরে যেন শাঁখ বাজল। একটি, দুটি তারা ফুটে উঠল আকাশে, তাদের ম্লান আলোয় যেন বা কান্না, কান্নাই শুধু। তখনই হৈমবতীর ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়া শৈল উমা ও শিবি-র। সধবা সৌদামিনীর মতো শাঁখা, আলতা, সিঁদুর নিয়ে যেতে পারবে না, এমন দুঃখ শিবিকে আর সন্তানবতী হয়ে এভাবে যাওয়া হবে না—এ বেদনা শৈলকে বিদ্ধ করে। এই কান্নার ভিড়ে পাশের গোয়ালে লুকিয়ে থাকা অনাথও ফিরে আসে। তার পেটে খিদে, তাছাড়া অন্ধকারে তো শুধু ভয়, আর ভয়ই।

বাচ্চারা সকলেই সমবেত কান্নায়। আর উত্তমা কচি বোন সামলাতে কিছু বিহ্বল। তার কোল থেকে বোনকে নিজের কোলে এনে উমার ডুকরে ওঠা—উত্তমিরে, আমার সোনাডারে। আর তখনই উত্তমার চোখেও কান্নার সংক্রমণ। মা নেই—এমন অনুভব

তলিয়ে বোঝার মতো বয়েস তার নয়। তবু কি এক সর্বনাশ, কি এক হাহাকার যেন তার জন্যেই—এরকম ভাবতে ভাবতেই আবারও ফুঁপিয়ে ওঠা উত্তমার।

চার

শিবি-র চুল লম্বা লোহার কাঁচি দিয়ে মুড়িয়ে কেটে দিচ্ছিলেন হৈমবতী। তার আগে নিজের চুল কেটেছেন। একেবারে আধুনিক বয়েজ কাট। কাল একাদশী ছিল। নির্জলা!

আর শিবি তো তার প্রাত্যহিক নিয়মে পেতলের বোখনায় সেদ্ধ করা আতপ চালের ভাতে একবেলা আহারে, মুসুর ডাল, পুঁই শাক, কলমি শাক, চিচিঙ্গা না খেয়ে, লোহার কোনো রকম বাসন ব্যবহার না করে চালিয়ে যাচ্ছিল। নিত্য মাটির শিব গড়িয়ে, তার মাথায় ফুল-বেলপাতা, দূর কলকাতা থেকে বয়ে আনা গঙ্গাজল আর মন্ত্র সঁপে দিতে দিতে শিবি কি নিজের বৈধব্যের যন্ত্রণা ভুলে যেতে পেরেছিল? নাকি এ তার দৈনিক আত্মপ্রবঞ্চনা? দেবতা-রূপী কোনো পুরুষ-প্রতীকের কাছে নিজেকে নিঃশর্ত সমর্পণ? ৭ আষাঢ়ের তিন দিনের অম্বুবাচি—মা মেয়ে দুজনেরই ফল খেয়ে থাকা শুধু, আর আতপচাল বাটা। আগুনে জাল দেয়া কোনো জিনিসই তাদের খাদ্য তালিকায় থাকে না এই তিন দিনে, তিন রাতে। এমন বহু সংস্কারই তো ধারাবাহিক। আর এ সংসারে মা-মেয়ে এক সঙ্গেই তার প্রতিপালক। অনুসরণকারিণী। ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেতেই হোক। ভয়ে হোক আর ভক্তিতেই হোক।

শিবি-র ঘন চুল কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে দিতে হৈমবতী তার মাথার প্রায় শাঁস বের করে ফেলছিলেন। এই বিষণ্ণ মধ্যাহ্নে কাঁচি চালানোর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই ছিল না।

সৌদামিনীর মৃত্যু প্রায় এক মাস হতে চলল। পৃথিবী আপন নিয়মেই— বহমান। নিজেরই মেয়ের চুলে কাঁচি ডুবিয়ে ডুবিয়ে হৈমবতী তার বিধবা-চেহারাটি পাকা করে তুলছিলেন।

জ্যৈষ্ঠের দুপুরে ভারী গলায় কাক ডাকছিল—খা-খা-খা। কাঁচির মুখ দিয়ে একটা দুটো উজিয়ে থাকা চুল ছেঁটে দিতে দিতে হৈমবতী জানালেন উত্তমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবারও। কালাশৌচের এক বছর কেটে গেলেই—।

রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে আবার কাকের ডাক—খা-খা-খা।

মায়ের কথা, কাকের ডাক শুনতে শুনতে আমূল কেঁপে কেঁপে ওঠা শিবি-র। আবার সূতিকা, আবারও বৈধব্য কিংবা মৃত্যু। এমনই তো আবহমানের ছবি। হয় সৌদামিনী নয় শিবি, কখনও বা শৈলও।

হৈমবতীর হাতের কাঁচি বড় যত্নে শিবি-র মাথার বেমানান, উঁচু হয়ে থাকা চুল খুঁজে বেড়াচ্ছিল।
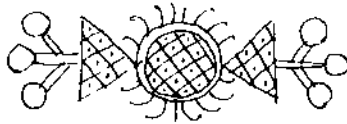
ভোমরা ॥ জয়কৃষ্ণ কয়াল

আমাদের ফেরার কথা ছিল কাল। কাল বিকেলে। আজ সন্ধের মুখে ট্রেন থেকে নামতেই কেউ যেন পিঠে চিমটি কেটে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়। কঙ্কার মুখটা ভেসে ওঠে আমাব চোখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে শামুকের মতো—'মতো'-র পর্দা দিয়ে আর আড়ালই বা টানি কেন! সত্যি কথাই বলি—ইদানীং বেশ বুঝতে পারছি, আমি একটা পুরো শামুক হয়ে গেছি। সকাল থেকে চারদিকে হাজার হোঁচট, ঠেলা-ঠোক্করের অনেক বিপর্যয়। সবকিছু ঠেলে সরিয়ে দামাল ইচ্ছার গোঁ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো জোর আমাব মধ্যবিত্ত মাংসে নেই। কোনোরকম সঙ্কটের গন্ধ পেলে তাই শামুক হয়ে আমি নিজের খোলসে সেঁধিয়ে যাই। আজও কঙ্কার মুখটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তেমনি নিজের মধ্যে গুটোতে শুরু করলাম।

বাপ্পা ট্রেন থেকে নেমেই ভোমরার কৌটোটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কানের কাছে উঁচিয়ে ধরে ভিতরে বোধ হয় কোনো সাড়া পায় না। উৎকণ্ঠায় চেঁচিয়ে ওঠে—দেখো দেখো বাবা, ভোমরাটা আর ডাকছে না। ও কি মরে গেলো নাকি! ছোট্ট হাতে কৌটোটা উঁচিয়ে আমার কানের উচ্চতায় পৌঁছে দিতে চায়। চোখে কান্নাব সুর। মুখে শ্বাসরুদ্ধ কষ্ট।

আমি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে কৌটোটায কান দিই। না, মরেনি—ভোমরাটা এখনও গুনগুন করছে; তবে খু-উ-ব আস্তে। আসলে এতোক্ষণ কৌটোবন্দি থেকে ওটা সম্ভবত ঝিমিয়ে পড়েছিল। এখন নাড়াচাড়া পেয়ে আবার সাড়া দিতে শুরু করেছে। সে কথা বুঝিয়ে বলে বাপ্পাকে আশ্বস্ত করি। তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়াই। তখন, আবার কে যেন চিমটি কাটে আমার পিঠে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসে গলায় স্মরণ করিয়ে দেয়—আমাদের ফেরার কথা ছিল কাল—কাল বিকেলে। সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিমানে পুরুষ্টু দুটো ঠোঁট, বাঁকা ভুরুতে ভাঁজপড়া সুর, ঈষৎ লালচে দুটো চোখে ক্ষোভের ধার—কঙ্কার সম্পূর্ণ মুখটা ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে।

দুই

কাল ছিল রবিবার—একটা ছুটির দিন। ছুটির দিনগুলোয় উদ্দেশ্যহীন কোথাও বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার। পড়িও। মাঝেমধ্যে কঙ্কাও আমার সঙ্গী হয়। তবে সেটা খুবই কম। কোনোরকম উদ্দেশ্যহীনতাব বেহিসেবিপনা সে আদৌ সহ্য করতে পারে না। বাপ্পা এখনও হিসেব শেখেনি। ওকে সঙ্গে নিই। বাপ্পাও যেন তাই ছুটির দিনগুলোর জন্যে মুখিয়ে থাকে। প্রায়দিন সকালে ঘুম ভেঙে জানতে চায—বাবা! আজ তো তোমার ছুটি?

—না রে।

—কেন?

—কেন আবার! সবদিন বুঝি ছুটি থাকে?

—তবে ?

--হাত ধরে ওকে ক্যালেন্ডারের কাছে নিয়ে যাই। অসীম সময়ের সসীম বিভাজন। লাল কালো তারিখের রহস্য বুঝিয়ে ছুটির দিনগুলো চেনাতে চেষ্টা করি। তখন হয়তো ওর চোখের মধ্যে চোখ পাকায় অভিমান। বলে—তোমার ব্যাগে তো লাল কালির কলম আছে।

-হ্যাঁ। তাতে কী হলো ?

- তুমি সবগুলো তারিখ লাল করে দাও না কেন ? তা হলে ফি-দিন ছুটি, ফি-দিন আমরা বেড়াতে যাবো।

পান চিবানো লালের মতো কষ্ট হাসি হয়ে শুকিয়ে যায় আমার ঠোঁটে। বাপ্পার ধারণা- -আমরা, অর্থাৎ বড়োরা যা খুশি তাই করতে পারি। আমাদের খুশির হাতগুলো অনেক লম্বা। ও এখন ছোটো। শরীরে বড়ো হওয়ার অর্থ যে হাত দুটো ক্রমশ ছোটো হয়ে যাওয়া—তা ও জানে না। জানাতেও চাই না : সব কিছু জানার চেয়ে কিছু কিছু না জানা ভালো—এই বোধে।

কঙ্কা আমার সঙ্গে বেড়াতে যায় না ঠিকই ; কিন্তু আমার যাওয়া নিয়েও ওর কোনো অভিযোগ বা আপত্তি থাকে না—অন্তত প্রকাশ্যে। সপ্তাহের ছ'টা দিনই আমি বাড়িতে থাকি না। একটা দিন থাকাটাই বরং ওর কাছে বেখাপ্পা ; যেমন বেখাপ্পা এবং বিরক্তিকর ওকে না জানিয়ে কোনোদিন অফিস থেকে দেরিতে বাড়ি ফেরাটা। ওর কাছে সব কিছু একটা ফর্মুলা। পাঁচজনে যা করে, পাঁচদিন যা ঘটে—সেটাই রীতি ; নিয়ম। সত্য এবং স্বাভাবিক নির্ধারিত হয় সেই একই পদ্ধতিতে। গঙ্গা-যমুনা খেলার মতো সেই রীতি ও নিয়মের নির্দিষ্ট ঘরে ঘরে পা ফেলে চলাই, ওর মতে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন। কোথাও এর ব্যাতিক্রম সেই ঘরের দাগের বাইরে পা পড়ার মতো ব্যাপার। ওর ভাষায়—কপালের সিঁদুর দাড়িতে পরার মতো বেখাপ্পা ; অসভ্যতা।

স্বাভাবিকের এই ব্যতিক্রম কঙ্কা পছন্দ করে না। পছন্দ করে না বলেই অন্যদিন যেমন আমার বেড়াতে যাওয়া নিয়ে কোনো আপত্তি থাকে না, কালও তেমনি ছিল প্রবল আপত্তি। বাপ্পা এ বছর স্কুলে ভর্তি হবে। সোমবার অর্থাৎ আজ—আজ সকালে ছিল সেই ভর্তি পরীক্ষার নির্ধারিত সময়। কাল আমাদের বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠতেই তাই ও বলে—পরীক্ষার আগের দিন কেউ হাওয়া খেতে যায় নাকি ?

—তাহলে কী করবো ?

অন্য বাড়ির বাবারা যা করেন, তাই করবে। ছেলেটাকে কাছে বসিয়ে এ বি সি ডি-গুলো বার কয়েক লেখাবে। নাম, বাবার নাম, ঠিকানা- -আরও যে সব মডেল প্রশ্নোত্তরগুলো আছে—জিগ্যেস করলে যাতে গুলিয়ে না ফেলে, তার জন্যে একটু ভালো করে তালিম দিয়ে দেবে।

—দেখো, ওর বয়স মাত্র তিন বছর।

—না। প্রায় সাড়ে তিন বছর--তিন বছর চার মাস...

—ওই হলো। কিন্তু এর মধ্যে নাম, বাবার নাম, মার নাম, বাবার সঙ্গে মা-র সম্পর্ক—আরও সব কি কি জিগ্যেস করবে তার ঠিক নেই--সব কি গুছিয়ে জবাব দেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব !

কঙ্কা শুকনো হাসে। বলে—ছেলের চেয়ে ছেলের বাবাই দেখছি বেশি ভয় পেয়ে গেলো !

—সেটাই স্বাভাবিক। আমি—মানে আমাদের—

আরও কি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম। কঙ্কার মুখের দিকে চেয়ে থমকে যাই। চোখের সামনে থাকতে থাকতে কঙ্কা কখনো আমার খুব অচেনা হয়ে যায়। তখন ওর চোখ মুখ পাথর—সেই পাথরের ভিতর দিয়ে ঝলসে ওঠে তীব্র ধার—নির্মম নিরাসক্ত। দেখেশুনে মনে হয় কঙ্কা অথবা আমি—দু'জনের কেউ একজন নিশ্চয় এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযুক্ত। আজও ওর গলায় সেই অন্য কঙ্কার সাড়া—এমন ভাব দেখাচ্ছো যেন ওই বয়সে আর কারও বাচ্চা স্কুলে যায় না, যাবে না!

—না, আমি ঠিক তা বলতে চাইছি না। তবে—

—তবে আবার কী! আর সব বাচ্চারা যদি পারে তাহলে আমাদের বাচ্চাই বা পারবে না কেন? তুমি না বললে আমাকেই দেখতে হবে। ও যে কারও চেয়ে কম নয় সেটা দেখাতে হবে।...বাপ্পা! সোনা আমার, যাও তো বাবা, তুমি কেমন লিখতে শিখেছো তোমার বাপিকে দেখাও তো। যাও, বই খাতা নিয়ে এসে রোদ্দুরে বোসো তো।

কিন্তু বাপ্পা এখন ক্যালেন্ডারের লাল দাগের অর্থ বুঝে গেছে। ও জানে যে ওই লালের মধ্যে নিহিত রয়েছে অফুরন্ত সবুজ—ট্র্যাফিকের সবুজ আলোর মতো। তাতে শুধু চার বাই দশ ব্যালকনিতে বসে একমুঠো রোদ্দুরের বৈভব পাহারা দেওয়া নয়—সমস্ত শরীর নিয়ে রোদ্দুরের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া—খেয়ে মেখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শেষে নিজেই রোদ্দুর হয়ে ওঠা।

বাপ্পাকে তাই আটকানো গেলো না কিছুতেই। আগে ওকে একদিন আমার এক মাসির বাড়ির গল্প বলেছিলাম। ডায়মন্ডহারবারের দিকে বেণীপুর নামে একটা গ্রাম। এমন শীতের দিনে সেখানে পাওয়া যায় টাটকা খেজুর রস, তাতারসির নলেন গুড় আর পুঁইশাকের ভিটুলির সঙ্গে চিংড়ি-চাঁদার মাখামাখা চচ্চড়ি। ছোটোবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে আমার অনেকগুলো দিন কেটেছিল সেখানে। পরেও সেখানে গিয়েছি; কিন্তু বাপ্পাকে কখনো নিয়ে যাওয়া হয়নি। কথা দিয়েছিলাম এই শীতেই একদিন নিয়ে যাবো সময় করে। কাল বাপ্পা বায়না ধরে বসলো সেখানেই নিয়ে যেতে হবে ওকে। না হলে ও দুধ ডিম ভাত রুটি কিছুই খাবে না। তারও চেয়ে বড়ো শাস্তি—দুটো চক্ষু বুঁজিয়ে ও সত্যি সত্যি মরে যাবে।

বড়োদের মতো বাচ্চাদের এই পাকা পাকা কথা, একরোখা দাবি—এগুলোও কঙ্কার হিসেবে বেয়াড়াপনা; অসভ্যতা। তাই ও সহ্য করতে পারে না কিছুতেই। ভুরুতে ভাঁজ পড়ে ওর, দুটো চোখে ছড়িয়ে যায় রাগের লাল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হয়।

সময়টা ডিসেম্বর। এখনও তেমন ঠাণ্ডা নামেনি। কিন্তু আমরা যাচ্ছি একটা গ্রামে—কঙ্কার চোখে সেখানে জন্মের বাহুল্য থেকে মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা—সমস্ত কিছুতেই ব্যতিক্রম। সেখানকার শীতটাও নিশ্চয় তাই হবে। বাপ্পাকে সে সাজিয়ে দেয় গরম পোশাকে। আমার ব্যাগে গুঁজে দেয় উলের টুপি। সতর্ক করে বলে—দেখো, সেখানকার আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে কিছু 'বিশুদ্ধ মাতৃভাষা' শিখে আসে না যেন বাপ্পা; কালকের অ্যাডমিশান টেস্ট-এর কথাটা মাথায় রেখো—টাটকা খেজুর রসে ভাসিয়ে দিও না ভুলে; আর বিকেল বিকেল ফিরতে চেষ্টা কোরো—যাতে ও ঘুমিয়ে পড়ার আগে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে নিতে পারি।

কথাগুলোর সঙ্গে কঙ্কা মিশিয়ে দেয় চন্দনবনের ফুরফুরে বাতাসের মতো হাসি। এতক্ষণের সমস্ত কথাবার্তায় যে-কঙ্কা আমার ধরা ছোঁওয়ার বাইরে কোথায় চলে

গিয়েছিল—এই ক'টা কথার অন্তর্নিহিত হাসির টানে সে আবার ফিরে আসে আমার কাছে। বুঝতে পারি তর্কে ঘাড় নাড়া নয়, আনুগত্যে মাথা নোওয়ানো—তাতেই এ-কঙ্কার কাছে শান্তি আর আনন্দ অনেক বেশি। কথা দিই—দুপুরে দুটো খেয়েই বেরিয়ে পড়বো কঙ্কা, তুমি দেখে নিও সন্ধ্যার অনেক আগেই এখানে এসে যাবো আমরা।

...কিন্তু সেই আসা আমাদের সত্যি হচ্ছে আজ, এই সন্ধ্যায়।

তিন

বাপ্পার স্বভাবে একটা বিশ্রী ধরনের বদ অভ্যাস আছে। ও বেজায় পিটপিটে। আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটা বাসনপত্র ধোয় তার একটা ছেলে আছে, বাপ্পারই সমবয়সী। সে সবসময় একটু ধুলো ময়লা জড়িয়ে থাকতে ভালবাসে। কেন জানি না, বাপ্পা তাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। সে হয়তো বাপ্পার সঙ্গে খেলতে বা কথা বলতে চায়। কিন্তু সে কাছে এলেই বাপ্পা কেমন সিঁটিয়ে যায়। একদিন সেই ছেলেটা জল খেয়েছিল আমাদের একটা গ্লাসে। তখন নাকি নাকে শিকনি ছিল তার। সেই অজুহাতে বাপ্পা আজও সে গ্লাসটা এড়িয়ে চলে।

সেই বাপ্পা কিন্তু কাল একেবারে অবাক করে দিল আমাকে।

আমার তিন মাসতুতো দাদার প্রত্যেকেরই অনেকগুলো করে ছেলেমেয়ে। কাল যখন ওদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোই তখন তাদের ক'জন একটা রেডিও তৈরি করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যে ছেলেটা রেডিওটা তৈরি করছিল তার নাম পরে জেনেছিলাম, মদন। বয়সে সে বাপ্পার চেয়ে কিছুটা বড়োই হবে। কিন্তু সে তখন সম্পূর্ণ দিগম্বর। সারা শরীরে তার কাদা শুকনো বিভূতি—নাক দিয়ে তরল দড়ি ঝুলে পড়ছে বারবার, আর সে সেটাকে নাসিকা পদ্ধতিতে চালান করে দিচ্ছে অন্তঃপুরে। একটা দেশলাইয়ের খালি বাক্সে সে বন্দি করেছে একটা ভোমরা। বাইরে থেকে বাক্সের মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়েছে লম্বা দুটো খেজুর কাঁটা। কাঁটার বেরিয়ে থাকা অংশটা হলো রেডিওর 'নব'। সেগুলোর পাক দিলে ভিতরে ভোমরাটার গায়ে সুড়সুড়ি লাগে আর তাতে সে গুনগুন শব্দ করে। ওই শব্দটাকে ধরে নিতে হবে আকাশবাণীর সঙ্গীতানুষ্ঠান।

দূরে দাঁড়িয়ে বাপ্পা অনেকক্ষণ লক্ষ করছিল ব্যাপারটা। ওরাও কৌতূহলী চোখে বারবার তাকাচ্ছিল তার দিকে। চোখের ভাষায় অনুচ্চ নিমন্ত্রণও ছিল হয়তো। কিন্তু বাপ্পা সাড়া দিচ্ছিল না তাতে। একসময় মদন উঠে দাঁড়ায় সোজা হয়ে। তার চোখে কৃতিত্বের হাসি। হাত নেড়ে সে বাপ্পাকে ডাকে। ভেবেছিলাম বাপ্পা বোধ হয় ও চেহারার কাছাকাছি ভিড়বে না। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে বাপ্পা দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ায় তার কাছে। মদনও দেশলাই রেডিওটা তুলে দেয় তার হাতে। তারপর সে তার পরম পরিচ্ছন্ন হাত দুটো দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বাপ্পাকে। আসন্ন বিস্ফোরণের আশঙ্কায় ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠি আমি। কিন্তু বাপ্পা দেখি শেষ পর্যন্ত কিছুই বলে না।

একটু পরে লক্ষ করি ধূলি ধূসরিত সেই উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ ভৈরব-ভৈরবীদের সঙ্গে বাপ্পা বেরিয়ে যাচ্ছে মাঠের দিকে। ডেকে জিগ্যেস করি—কোথায় যাচ্ছিস বাপ্পা ?

—মটরশুঁটি আনতে।

—মটরশুঁটি। কোথায় ?

—ওই দিকে আছে। মদন বলেছে আমার প্যান্টের পকেট বোঝাই করে দেবে।

চোখেমুখে আলোর খই ফুটছে—ছুটে বেরিয়ে যায় বাপ্পা। বুঝতে পারি, শুধু প্যান্টের পকেটের শূন্যস্থান নয়। মনের শূন্যস্থানও ভরানোর সন্ধান পেয়েছে নিশ্চয়।

তবু ব্যস্ত হয়ে উঠি—কোথায় কার বাগানে যাবে, কে কী বলবে! বড়োবৌদি আশ্বাস দিয়ে বলে—যাবা আর কোতায়! তুই বসতো! আঙ্গার কড়াইক্কেতে গেছে সব। এক্কুনি আসেয়েই।

ঘরসংসার, চাকরি, কঙ্কার শরীর, আগামী সন্তান—টুকিটাকি নানান প্রসঙ্গ শুরু করে বৌদি।

দুপুরের একটু আগে কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে বাপ্পা। তার হাতে সেই দেশলাই-এর বাক্সটা—খালি। পিছনে মদন ও তার দলবল। উত্তেজিতভাবে মদন জানায়—আমি মানা কল্লোম; তেবু শুনলোনি। ঝেই বাক্সটা খুলেচে—শালার ভোমরাও তক্ষুণি ভোঁক্কা দেলো—!

বুঝলাম বাক্সের ভিতরের রহস্যের লোভ সামলাতে পারেনি বাপ্পা। তাতেই এ বিপর্যয়। কিন্তু মদনের ওই ভাষা সে কি নিছক প্রতিবেদন, নাকি বাপ্পার বিরুদ্ধে অভিযোগ? বাপ্পা কাঁদছে। তবে কি মদন তাকে কিছু বলেছে, কিংবা—! সেই প্রশ্নই করতে যাচ্ছিলাম তাকে। তখন দেখি সে দু হাতের তালু বিস্তার করে প্রাণপণে জল মোছাচ্ছে বাপ্পার চোখের। তার হাতের কাদামাটির দাগ দৃশ্যমান সান্ত্বনা হয়ে স্তরে স্তরে জমে যাচ্ছে বাপ্পার দুই গণ্ডদেশে। আমি কি বলবো কিছু বুঝতে পারি না। বারান্দায় আড়কাঠের বাঁশে বড়ো বড়ো কয়েকটা ছিদ্র। সেগুলো দেখিয়ে মদন বাপ্পাকে আশ্বাস দেয়—ওই যে গত্তগুনো দেখতি পাচ্ছিস তো! ওগুনো হলো ভোমরা-গার ঘর। শালার ভোমরা পালাবে কোঁতায়। রাত্তিরি স-অ-ব ফিরে আসবে একেনে। তখন তোর অনেকগুনো ধরে দেবো, দেকিস!

বাপ্পার বয়সী একটা মেয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল একটা। ধান কেটে নেওয়ার পর খড়ের যে অংশটা মাঠের মাটিতে থেকে যায়, তাকে এরা বলে 'নাড়া'। বাঁশিটা সেই নাড়া দিয়ে তৈরি। বাপ্পাকে সান্ত্বনা দিতে মেয়েটা সেই বাঁশিটা দিয়ে দেয় বাপ্পাকে। আর একটা ছেলে এতোক্ষণ কাঁঠাল পাতার মুকুট মাথায় দিয়ে আর কোমরে খেজুর ছড়ির তরোয়াল ঝুলিয়ে সম্রাটের মতো ঘুরছিল এদের সঙ্গে। মদন আদেশ করতে সে তার রাজমুকুট, অস্ত্র—সবকিছু বাপ্পাকে নিবেদন করে। বাপ্পা যে সেগুলো পেয়ে খুব খুশি হয় তা নয়। কিন্তু ওরা দিতে পেরেই খুশি। আজ একজন আশ্চর্য অতিথিকে ওরা পেয়েছে ওদের মধ্যে। তার চোখে জল ওদের সহ্য হচ্ছে না। ওদের যথাসর্বস্ব যা আছে সবকিছু দিতে রাজি। শুধু একটুখানি হাসি ফুটুক ওদের অতিথির মুখে। বাপ্পাও বুঝি অনুভব করে, কান্না থেমে যায় তার। বাঁশিতে একটা ফুঁ' দিয়ে বাজাতে না পারার ব্যর্থতায় অপ্রস্তুত হাসে। তখন অন্য সবাইও হাসে তার সঙ্গে। কেউ কেউ আবার ব্যস্ত হয়ে বাজানোর সঠিক প্রণালীটা ওকে শেখাতে চেষ্টা করে।

চার

ছেঁড়াখোঁড়া চিন্তার বিলাপ কিংবা আকাশ বাতাসকে গাল দেওয়া কয়েকটি বিক্ষোভ মিছিলে সঙ সাজা ছাড়া আমার পঁয়ত্রিশ বছরের মৌন মুখরতায় একটিও সত্যিকারের বিদ্রোহ নেই। অথচ প্রত্যেকটি দিনের কণ্ঠস্বরের ধারে, তাদের ব্যবহারের ল্যাং মারায়, ছুঁড়ে ছড়িয়ে দেওয়া ইটপাথুরে পরিহাসে আমার অস্তিত্ব জুড়ে কতো থ্যাঁতলানো, হাড়গোড়ভাঙা রক্তারক্তি। বুকে হাত চেপে কনুই কানকো বেয়ে আমি সরে গেছি একদিকে। প্রত্যেকটি দিন আমার কিছু না কিছু ভেঙেছে। কিন্তু একেবারে ভেঙে যাওয়ার ভয়ে আমি কিছুই ভাঙতে পারিনি।

সেই আমি কিন্তু কাল একটা সত্যিকারের বিদ্রোহ করে বসলাম।

দুপুরে খাওয়ার পরে বাপ্পা আবার মদনদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল মাঠে। কোলকাতায় ফিরবো বলে একটু পরে ওকে ডাকতে গিয়ে থমকে যাই আমি। এখন আর শুধু বাপ্পা বা তার সমবয়সীরাই নয়, ওদের চেয়ে কিছু বড়ো ক'জনও নেমে পড়েছে মাঠে। তাদের কারও হাতে শাবল কোদাল, কারও মাথায় ধামা, চাঙারি। ইঁদুরগর্ত খোঁড়ার মহোৎসবে মেতে উঠেছে সবাই।

মাঠে যতোদিন ধান থাকে ততোদিন ইঁদুরগুলো খায়, খায় আর কেটে নিয়ে লুকিয়ে রাখে গর্তে—মাটির নিচে, অসময়ের জন্যে সঞ্চয়। মদনরা হাত লাগিয়েছে মাটি খুঁড়ে সেই ধান উদ্ধার করার কাজে। বাপ্পাও অংশীদার হয়েছে তাতে। তার হাতে-পায়ে কাদার দাগ, মাথায় মাটির গুঁড়ো, কিন্তু কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো। ধামা বা চাঙারি ধানে যতো বোঝাই হয়ে উঠছে, সবার সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পাও ততো উল্লাসে ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে মাঠে।

চেহারায়, সাজে-পোশাকে, পা ফেলে ছোটার ভঙ্গিতে, সমস্ত কিছুতে সে অন্য সবার চেয়ে আলাদা। তবুও এই আদিগন্ত প্রসারিত মাঠে, এই উধাও আকাশের নিচে, প্রতিরোধহীন সূর্যের আলোয় তালমাত্রাহীন এতগুলো দামাল পায়ের উদ্দাম লাফালাফি যে সে যে প্রাণ আনন্দের জন্ম দিচ্ছে—তাতে বাপ্পা আর সবার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। সমস্ত মাঠ জুড়ে এখন একটা সমুদ্র, সেই সমুদ্রে আর পাঁচটা ছেলের মতো একটিমাত্র ঢেউ হয়ে সে যেন হারিয়ে যাচ্ছে কোথায়। কেমন ভয় করে আমার। হাত তুলে ডাকি বাপ্পা...!

ওদের উল্লাসের নিচে আমার সে ডাক চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু এখন যে ফিরতে হবে আমাদের। চিৎকার করে ডাকি, বা-আ-প্পা আ!

এবার একবার ফিরে তাকায় ও। আমি ওকে কোলকাতায় ফেরার কথা জানিয়ে কাছে ডাকি। শুনে সবাই যেন থমকে যায় কেমন। মদন দৌড়ে এসে বাপ্পার কানে কানে কি বলে। অন্য সবাই এসে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়ায় ওর চারদিকে। সেই ব্যূহবেষ্টিত অবস্থায় কিছুটা এগিয়ে আমার কাছাকাছি এসে ও চেঁচিয়ে জানায়—আমি এখন যাবো না, মদন রাতে ভোমরা ধরে দেবে, নিয়ে তবে যাবো।

সে কী! বাধা দিয়ে আমি ওর পরীক্ষার কথা বলতে চাই। কিন্তু তা আর শোনার সময় পায় না ও। হাত ধরে টানতে টানতে সবাই মিলে ওকে নিয়ে দৌড়ে চলে যায় একদিকে—তারপর সেখান থেকে অন্য একদিকে। মাঠের এ প্রান্ত, ও প্রান্ত, মধ্য মাঠ—গোটা মাঠ জুড়ে তখন ওদের পায়ে পায়ে যেন সমুদ্রমন্থন।

...দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে দেখি কখন এক বিশাল আনন্দের শরীর পেয়ে গেছে বাপ্পা। ওপরে অফুরন্ত আকাশে মাথা ঠেকে গেছে ওর—ছোটো ছোটো দুটো পায়ের তলায় চাপা পড়ে গেছে সমস্ত মাঠ—হাত বাড়িয়ে দিগন্তের মাথা থেকে ছিঁড়ে আনছে পাতা—প্রজাপতি আর ঝিঁঝিঁর মতো বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে সেগুলো—ওর কুলকুল হাসির উচ্ছলতা উৎসবের রোদ্দুর হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে দশদিকে...

বাপ্পার প্রায় সাড়ে তিন বছরের জীবনে এ চেহারা আগে কখনো দেখিনি। সাড়ে সাত শ স্কোয়ার ফুটের বুমবুম ফ্ল্যাট বাড়িটার কথা মনে পড়ে। বাপ্পার এই শরীরের তুলনায় সেটাকে এখন নস্যির ডিবার মতো লাগে।

ওর অ্যাডমিশান টেস্ট-এর কথা মনে পড়ে—দেখতে পাই আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ায় একটা করুণ রঙের স্কুল ভ্যান—ভ্যান থেকে স্কুল—স্কুল থেকে

বাড়ি—বাড়ি থেকে অফিস—দিন যায়—বছর কাটে—এক খাঁচা থেকে বেরিয়ে অন্য খাঁচায় গড়াতে গড়াতে—গড়াতে গড়াতে—গড়াতে গড়াতে বাপ্পার এই শরীরটা কখন ছাতার পাখির লেজ কাঁপানো ধূসরতায় স্থির হয়ে যায়...।

কেন জানি না, ঠিক এ বছরই বাপ্পাকে স্কুলে দেওয়ার ব্যাপারে আমার খুব একটা মানসিক সমর্থন ছিল না। কঙ্কার মুখে বারবার আর দশজনের দৃষ্টান্তের কথা শুনে শুনে...শেষে একদিন ওর সিদ্ধান্তে পিছন ফিরে সম্মতি দিয়েছিলাম মাত্র। আজ সেই কঙ্কার মুখোমুখি বুখে দাঁড়াই হঠাৎ। আমার পঁয়ত্রিশ বছরের লেপ কম্বল ঢাকা শীতকাতুরে জীবনে প্রথম সত্যিকারের বিদ্রোহ। বিশাল শরীরী আমার সমুদয় উত্তরকাল বাপ্পা—আকাশ মাটি আদিগন্তের ছড়ানো ক্যানভাসে তোর শরীর ধরে না—একটা খাঁচার মধ্যে তুই থাকবি কী করে! তুই যে তাহলে পঙ্গু হয়ে যাবি ; সমস্ত অস্তিত্বে বামন হয়ে যাবি—ট্র্যাপিজের বিশাল বিস্তারের দিকে তাকিয়ে তোর দীর্ঘশ্বাস শুধু অঙ্গভঙ্গি করবে। অসম্ভব! এ আমি কিছুতেই মানতে পারি না, কিছুতেই না—।

—এ কী! তোমরা এখনো এখানে!

—হ্যাঁ, কঙ্কা।

—তোমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিলাম না।

—আমরা আজ ফিরবো না।

—সে কী! কাল যে বাপ্পার অ্যাডমিশান টেস্ট?

—জানি। ও এ বছর স্কুলে যাবে না।

—কী ছেলেমানুষি করছো কী!

কঙ্কার চোখেমুখে অসহ্য বিরক্তি ; কপালে, ভুরুর ভাঁজে করাতের দাঁতের ফাঁকের অন্ধকার। বঁড়শির মতো বিঁধতে চায় গলার স্বর—তাই বুঝি ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছো এখানে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ। বাপ্পা কোথায়? ডেকে দাও তাকে। আমিই নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে করে।

—তুমি যেতে পারো কঙ্কা। বাপ্পা যাবে না। এ বছর স্কুলে ভর্তি হবে না ও। ছেলেমানুষি নয়—এ আমার স্থির সিদ্ধান্ত।

আমাদের নাতিদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এ স্বর বোধ হয় কঙ্কা এই প্রথম শুনলো। চমকে ও তাকায় আমার চোখের দিকে। তারপর মাথা নিচু করে মিলিয়ে যায় সামনে থেকে!

পাঁচ

কঙ্কার যে প্রতিক্রিয়া দেখবো বলে আশঙ্কা করেছিলাম সে কিন্তু তার ধার দিয়েও গেলো না। এমন কি একবার জিগ্যেসও করলো না যে কাল আমরা ফিরলাম না কেন। স্বাভাবিক ঠোঁট ছাপানো হাসিতেই দরজা খুলে দেয়। বাপ্পাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু আর আদর মাখায়। তারপর আমার কাছে মাসিমাদের বাড়ির খবরাখবর নেয়। জিগ্যেস করে ভাইপো-ভাইঝিরা সংখ্যায় কিছু বাড়লো কি না, কিংবা অদূর ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনা বুঝেছি কি না। এমনভাবে সমস্ত কথাবার্তা বললো যেন মাত্র আজই ফেরার কথা ছিল আমাদের।

রাতে বাপ্পা এবং আমাকে খেতে দেয় কঙ্কা। কিন্তু নিজে কিছু খায় না। পরে খাবো বলে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টায়—কখনো টি ভি-র পর্দায়

তাকিয়ে কিছু না দেখার চেষ্টা করে।

আজ একটু ঠাণ্ডা বেড়েছে। টি ভি-তে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের অনুষ্ঠানগুলো মিলিয়ে গেলো পর পর। বাপ্পা আগেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার আমারও শুয়ে পড়া দরকার। কিন্তু কঙ্কা এখনও খায়নি। আর একবার তাগাদা দিতে গিয়ে অবাক হই। কঙ্কা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমাকে দেখে উপুড় হয়ে শুয়ে কান্না আড়াল করে। অবদমিত বাষ্পের উত্তাপ অবশেষে জলের লিপিই লেখে--বুঝতে পারি আমি।

বড়ো বিব্রত বোধ করি তখন। নিজের কোনো মত কিংবা সিদ্ধান্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে গেলে অনেক ঝড় ঝাপটা মেনে নিতে হয়। পা দুটো শক্ত করে দাঁড়াতে হয়। সে জন্যে যে সামর্থ্যের দরকার তা আমার শরীরের আছে কিনা জানি না--মনের অন্তত নেই। সে তাই ধারালো তর্কবিতর্ক এবং ভোতা ঝুটঝামেলা--সবকিছু নির্বিচারে এড়িয়ে চলতেই অভ্যস্ত , আহ্বান করতে নয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হলেও তাই দেখি সে ঘাড়ে সম্মতি জানায়—বড়োজোর কখনো কখনো মেঘলা আকাশের মুখে থুম মেরে থাকে। কোনোরকম সজ্ঞান বিদ্রোহ তার কাছে যেন হঠাৎ কলতলায় আছাড় খেয়ে পড়া—হাড়ে শক্ত চোট খাওয়া।

কালও সেরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেলো আমার। হাড়ের আঘাত কিছু সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। সেই অন্ধকার পরিণামের আশঙ্কায় তখন থেকেই গলা শুকিয়ে আসছিল আমার। এখন কঙ্কার চোখের রঞ্জন রশ্মির মুখোমুখি হয়ে অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করি। অবসন্ন আর বিপন্ন।

সান্ত্বনা দিয়ে ওকে তুলে বসাতেই ও জিগ্যেস করে—তুমি কি সত্যিই চাও না যে আমাদের বাপ্পা আর পাঁচজন ছেলের মতো লেখাপড়া শিখে বড়ো হয়ে উঠুক?

ওর ঠোঁটে ঘনীভূত ঝড়—চোখের তারায় সংশপ্তক জল আর আগুন। মাথা নিচু করে আমি শুনতে পাই ওপরতলার বাপি, বুমু--দত্তদের লখাই--ডাক্তারবাবুর ছোটো ছেলে—মিসেস গুপ্তর নাতনি—সব্বাই, সব্বাই স্কুলে যাবে—আর বাপ্পা! ভুবুতে ফুঁ দিয়ে একটা বছর উড়িয়ে দেবে। তুমি কি চাও যে আমাদের বাপ্পা সবার চেয়ে পিছিয়ে পড়ুক, সবার পিছনে মাথা নিচু করে জড়ানো পায়ে গুটি গুটি হাঁটুক? বলো, বলো—চুপ করে আছো কেন—আমাদের বাপ্পা হেরে যাবে আর আমরা তাই দাঁড়িয়ে দেখবো! কান্নায় ঝরে পড়ে কঙ্কা আমার বুকের মধ্যে নদী হয়ে যায়।

সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলি—কঙ্কা শোনো। যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে—। এখন আর---

বাধা দিয়ে কঙ্কা বলে--না। এখনও কিছুই হয়নি। তুমি চাইলে এখনও সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। আমি আজ স্কুলে গিয়েছিলাম। বাপ্পা অসুস্থ জানিয়ে সময় নিয়ে এসেছি। আগামী পরশু আবারও অ্যাডমিশান টেস্ট দিতে পারে এবং আমি জানি ও পাস করবে তাতে। তুমি কী চাও তাই বলো। আর দশজনের মতো ও মাথা তুলে সোজা হয়ে চলবে, না তোমার মতো—

কঙ্কা থেমে যায়। স্পষ্ট বুঝতে পারি ওর জিভের নিচে কতকগুলো তেতো, ধারালো শব্দ। প্রাণপণে ও চিবিয়ে ফেলার, গিলে নেওয়ার চেষ্টা করছে সেগুলো।

অসহায়ভাবে আমি ঘুমন্ত বাপ্পার মুখের দিকে তাকাই। সবচেয়ে ভালো হতো ও কি চায় তা জানতে পারলে। কিন্তু ও এখন ছোটো। ঠিক-বেঠিক বোঝে না, জানে না। ওর মাথার কাছে তাকের ওপর এখনও সেই ভোমরার কৌটো; দুটো খেজুর কাঁটা। ও শুধু জানে কাল সকালে দেশলাইয়ের বাক্স খুঁজে একটা রেডিও বানিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু আজ থেকে দশ, পনেরো, পঁচিশ, ত্রিশ বছর পরে—ও যখন বড়ো হবে—নিজের ভালোমন্দ, ঠিক-বেঠিক বুঝতে শিখবে—আমার বাকলে ফাটল ধরবে কে জানে তখন ঘড়ির কাঁটা কোনদিকে ঘুরবে—পৃথিবীর আলো-অন্ধকারের বিবর্তন কোন পথে হবে—তখন যদি বাপ্পা আমাকেই দোষ দেয় ?

মনে পড়ে অফিসে সেদিন পলাশ দত্ত জিগ্যেস করছিল—তোর ছেলের মান্থলি ওয়েট নোট করিস ? ওর ফুড হ্যাবিট, ব্যবহার, কথাবার্তা—এসবের কোনো রেকর্ড রাখিস ?

—কেন, কী হবে ওগুলো ?

—সামনে কি দিন আসছে বুঝতে পারছিস না তুই। বি পারটিকুলার, ভেরি পারটিকুলার। কখন কোনটা দরকার হবে কে বলতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তো দেখবি যে এইসব রেকর্ড দিয়ে কমপিউটারে আই কিউ টেস্ট হচ্ছে এবং তার রেজাল্ট নিয়েই ভালো স্কুলে ভর্তি, চাকরি, বিয়ে—সবকিছু ঠিক হচ্ছে। আমি তো আমার মেয়ের সবকিছু নোট করে রাখি। তুইও রাখবি।

পলাশ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সব ব্যাপারেই ও খুব সিরিয়াস। ওই কথাগুলোর মধ্যে ওর একটুও রসিকতা নেই। কিন্তু আমি নিতান্তই মধ্যবিত্ত প্রাণী। বেশি দূরে তাকিয়ে কিছু দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা, মাসের প্রথমে দাঁড়িয়ে মাসের শেষে কিছু দেখতে পাই না। কোন সাহসে আমি বাপ্পার জীবনের সোনালি একটা বছর আমার খেয়ালীপনার খাতে খরচ করবো ! বাপ্পা যদি বড়ো হয়ে হিসেব চায় ? শঙ্কিত বোধ করি আমি। কঙ্কার কথায় ওকে পড়াবো। পরশু ও পরীক্ষা দেবে—।

কঙ্কার চোখ-মুখের অন্ধকারে ভোর হয়। আস্তে আস্তে—সকাল জাগে।

ছয়

পরদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙে বাপ্পার চিৎকার চেঁচামেচির প্রবল ধাক্কায়—বাবা, ওঠো ওঠো—দেখো ভোমরাটা আর গাইছে না।

আমার চোখের ওপর কৌটোটা ঝাঁকায় বাপ্পা। শুকনো খটখটে একটা শব্দ ওঠে—আগের সেই গুনগুন সাড়া আর পাওয়া যায় না।

চমকে উঠে বসি আমি। কৌটোটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। সত্যি সত্যি মরে গেলো ওটা ! কিন্তু মরার তো কোনো কারণ নেই। টিনের কৌটোর মুখে অসংখ্য ছোটো ছোটো ছিদ্র—পেরেকের ডগা দিয়ে মদনই করে দিয়েছিল ওগুলো—ভোমরাটা যাতে দমবন্ধ হয়ে মারা না যায়। তবুও কি—

ছিপিটা খুলে ফেলি আমি। ভোমরাটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে কৌটোর তলায়। আমাদের ব্যালকনিতে আজও সেই তমোঘ্ন রোদ্দুর। বাপ্পাকে ওদিন কঙ্কা যেখানে পড়তে বসতে বলেছিল কৌটোটা নিয়ে সেখানে উপুড় করে দিই। বাপ্পাও ঝুঁকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। আঙুল দিয়ে ক'বার নাড়াচাড়া করে। জানায়—মরে গেছে বাবা, একেবারে মরে গেছে, আর যে একটুও নড়ছে না, একটুও না—

বলতে বলতে বাপ্পা ডুকরে কেঁদে ওঠে। তারপর পাগলের মতো দৌড়ে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে খাটের ওপর। কঙ্কার পরিপাটি বিছানা গুলিয়ে তছনছ করে—সমস্ত শরীরে ভেঙে, ছিঁড়ে, কুটি কুটি হয়ে উধাও স্রোতে কান্না হয়ে ভেসে যায় সে। কঙ্কা কিছুতেই আর সামাল দিতে পারে না।

বুকের মধ্যে দম আটকানো কষ্ট, কান্না পাক খায় আমারও গলার মধ্যে।

ভোমরাটা শেষে মরেই গেলো ! এতো কষ্ট করে আনলো বাপ্পা---একটা দিনের জন্যেও সে কিছু বাড়তি আনন্দ পেলো না !

হঠাৎ লক্ষ করে দেখি হাত-পা নাড়ছে ওটা, পাখায় মৃদু স্পন্দনও দেখা যায়। তবে কি শীতের জন্যে-- ! দম আটকানো উল্লাসে বাড়ি কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠি আমি— মরেনি, বাপ্পা মরেনি ! বেঁচে আছে, এই যে দেখবি আয়—।

বাপ্পা ও কঙ্কা দু'জনেই দৌড়ে এসে দাঁড়ায় দরজায়। ভোমরাটা একটা পাক খেয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর আমাদের সবাইকে স্তম্ভের মতো দাঁড় করিয়ে রেখে সোজা উড়ে যায় আকাশের দিকে। যাওয়ার সময় শুধু রেখে যায় একমুঠো শব্দের বিক্ষোভ— ভোঁ-ও-ও-ও।
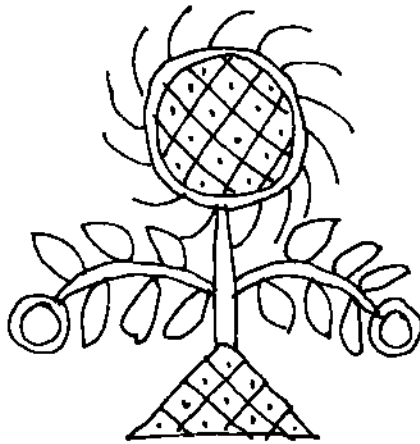
মামিমা ॥ মীনাক্ষী সেন

চিমটা দিয়ে ধরে উনানের ওপর ফেললে সাদা রুটিগুলো গোল আর বড় হয়ে ফুলে ওঠে। সাদা রঙে হালকা বালি রঙের ছোঁয়া লাগে।

—মামিমা, পুড়ে গেলে ?

মামিমার হাতে-গড়া রুটির প্রত্যেকটাই সেঁকার সময় গোল হয়ে ফুলে ওঠে। কোনটাতে পোড়ার এতটুকু দাগ ধরে না।

—পোড়ার একটু দাগ ধরলেই বাপু আমি রুটি ফেলে দিই..., মামিমা একদিন বলেছিলেন ! নন্দিনীর তাই বুক টিপ্‌টিপ করে। আজ দুটাকার আটা কিনে এনেছে মামা। তাই দিয়ে তিন-তিনটে মানুষের জন্য রুটি ফেলে দিলে খাবে কি ?

রুটি কিন্তু একটুও পোড়ে না। গোল হয়ে ফুলে-ওঠা হালকা বালিরঙের রুটিতে একটুও কালো দাগ ধরে না।

—খা না একখানা।—বলে মামিমা বাটিতে করে রুটি এগিয়ে দিলে নন্দিনী 'না' করতে পারে না।

—চিনি দিই একটু ?

নন্দিনী মাথা নেড়ে 'না' করে। গরম ফুলে-ওঠা রুটির হাওয়া বের করে দিতে দিতে সে হাত সরিয়ে নেয়। জিভের ওপর রুটির নরম স্বাদ অনুভব করতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ করে, মামিমার মায়াময় চোখ তার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে আছে।

কুপির নিভু আলোয় ঘরটাকে প্রায় অন্ধকারই লাগে। আলোর চেয়ে বেশি গাঢ় হয়ে উঠেছে অন্ধকার-ছায়া। হাওয়ার হঠাৎ দমকে কখনো-কখনো আলোর শিখা এদিক-ওদিক হেলে পড়লে, কেঁপে উঠছে কোনো কোনো ছায়া। জ্বলন্ত উনানের নীল আলোয় কেবল মামিমার মুখখানা দেখা যায়। আলো ও ছায়ায় আঁকা। দেখা যায়, সাদা চোখের জমির ভেতর নরম উজ্জ্বল চোখের মণি নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে স্নেহে কোমল হয়ে এসেছে।

—আহা রে, কার মেয়ে, আমার ঘরে...

সে সচকিত হয়ে ওঠার আগেই মামিমা উনানে পোড়া কয়লা দিয়ে আগুন চাপা দেয়।

—চল, বারান্দায় বসি গে।

এ সময় কুপি নিভিয়ে বারান্দায় এসে বসলে অনেকখানি কেরোসিন বাঁচে।

অথচ চাঁদের আলোয়-ভরা দাওয়াতে বসে মামিমা যে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন, সেকি কেরোসিনের খরচা বাঁচাতে, নাকি তারা দেখতে, নন্দিনী কখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

জ্যোৎস্নার আলোয় কোলের ওপর হাত দুটো জড়ো করে বসে থাকা মামিমা। তার গাঢ় সবুজ মোটা তাঁতের শাড়ির আঁচলে-বাঁধা অকেজো চাবির গোছা। ছোট্ট,

শীর্ণ মধ্যবয়স্ক শরীরে এক অসম্ভব তরুণী মুখের আদল। দেখতে-দেখতে নন্দিনীর মন কেমন করে।

—মামিমা, তারা চিনবে?

—তারা? চেনাবি?

শিশুর অকেজো আবদারকেও অগ্রাহ্য না-করতে পারার করুণায় মামিমা মাথা নেড়ে সায় দিলে, নন্দিনী মামিমাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল চেনায়, শুকতারা চেনায়। কালপুরুষ চেনালে মামিমা রিনরিনে মৃদু গলায় হাসেন...

—তোদের মত যুদ্ধে যাচ্ছে বুঝি!

নন্দিনী চমকে ওঠে। মামিমা কী জানে এবং কতটা, তা বোঝার জন্য তার দিকে তাকানোর আগেই মামিমা উঠে পড়েন—'যা, একবার রঞ্জুকে দেখে আয়, আবার চ্যাঁচাবে এখন!'

মুহূর্তের জন্য তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যেতে ইচ্ছে করে না। এই গরমে সারাক্ষণ খালি গায়েই রাখতে হয়। ডান বগলের নিচ থেকে কোমর পর্যন্ত দগ্‌দগে ঘা এখনও শুকোয়নি। কোমর থেকে গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে পোড়ার সদ্য শুকনো দাগ। চামড়া কুঁচকিয়ে দলা-পাকানো কাগজের মতো হয়ে গেছে এখানে-ওখানে। ভুরু পুড়ে মুছে গেছে। আগুনের ঝলকানিতে সাদা হয়ে পুড়ে-যাওয়া চোখের পাতার নিচে, ভাবলেশহীন অন্ধ চোখ—মাঝে মাঝে বড় বীভৎস লাগে। মাঝে-মধ্যে তারচেয়েও বীভৎস হয়ে ওঠে রঞ্জুর ভাঙা গলার কান্না আর বিলাপ।

সকাল থেকে তার পেছনেই তো সে লেগে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে আধঘণ্টা যায় ঘায়ের পরিচর্যায়, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হয়। তার সঙ্গে রয়েছে চারবেলা খাবার ব্যবস্থা করা—জলটুকুও তো হাতের সামনে এগিয়ে দিতে হয়।

তবু নন্দিনী ঘরের বাইরে পনের মিনিট থাকলেই রঞ্জু চিৎকার করে। তক্ষুণি তার জল চাই, অথবা অন্য কিছু।...কিসের এত দাবি তার ওপর রঞ্জুর?

কে রঞ্জুকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলো কেউ জানে না। বোধ হয় পাড়ার লোকজনই হবে। সঙ্গে যারা ছিল তারা কেউ আর পেছনে ফিরে তাকায়নি। কারণ রঞ্জু ততক্ষণে, তাদের ধারণায় এক মৃত মানুষে পরিণত হয়েছে। নেহাত কার কাছে খবর পেয়ে জিতেন এল।

—নন্দুরে মরে যাবে...পুলিসের হাতে পড়লে তো আর বাঁচবেই না। একবার দেখে আয় গিয়ে, যদি কিছু করার থাকে।

যাকে বলে 'বোম কেস'। তাই পুলিসের নজর পড়েছে, এটা সকলের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। এবং ছেলেদের পুলিসের হাতে পড়ার ভয় ছিল। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, নন্দিনী বা কুমকুমের সে ভয় ছিল না। তবু ছেলেদের ধরা-পড়া এবং পুলিসের গুলির যে-প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এতদিনে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, মেয়েদের বেলায় সম্পর্কটা ততটা সরাসরি নাও হতে পারে এবং এসব 'কেস'-এ মেয়েদের যাওয়াই কৌশলগতভাবে সম্ভবত নিরাপদ। এসব ধারণা এক গভীর সংস্কারের মতোই বিরাজমান থাকায় নন্দিনী আর কুমকুমই শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে যায়। প্রাণের টানে জিতেন অবশ্য পেছনে কিন্তু দূরে ছিল, মেয়েরা পুলিসের হাতে পড়ল কিনা দেখার জন্য।

কুমকুম না থাকলে নন্দিনী বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। সুস্থ, সবল, সুন্দর এক যুবক বোমার আগুনে পুড়ে কতখানি বীভৎস হয়ে যেতে পারে তা দেখে। কুমকুম

সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখত। বিপদে ধৈর্য হারাত না। রঞ্জুর জন্য বিপদের সবটা ঝুঁকি কুমকুম আর সে একসঙ্গে বহন করেছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

সেই কুমকুম পনেরো দিন আগে চলে গেছে মধ্যপ্রদেশে। 'দিদির ছেলেটার বড অসুখ। আমাকে একবার যেতে লিখেছে দিদি।' কুমকুম বলেছিল। নন্দিনী আর কুমকুম দুজনেই জানত যে, কথাটা মিথ্যা।

জিতেনকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে, ওদের বডদার মাথায় গোলমাল দেখা দিচ্ছে, দুই ভাইয়ের এই অবস্থা হয়ে যাওয়ার পর কুমকুমকে কোনও নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে বাড়ির লোক।

যে-আন্দোলনের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই ব'লে মনে হচ্ছে, তার জন্য বিপদ মাথায় করে নিত্যদিন জীবনযাপন, অন্ধ, পুড়ে-যাওয়া, ক্রমশ অবুঝ হয়ে-ওঠা এক ছেলেকে নিয়ে দমবন্ধ করে দিনরাত কাটানো...চারদিকে মৃত্যু আর হতাশা...। কুমকুম চলে যাবে বলেই ঠিক করেছিল। তবু যখন বলেছিল—'কদিন পর আবার ফিরে আসব'—তখন তার সে বলায় আর কোন মিথ্যে ছিল না। যাওয়ার আগে সব মানুষই হয়তো ভাবে, সে আবার ফিরে আসবে।

নন্দিনী জানে, ফিরে আসার ইচ্ছে, আর ফিরে আসা, এক নয়। ছেলেদের নিয়ে অবশ্য অনেক জ্বালা। যাদের পিঠে একবার 'নকশাল' ছাপ লেগেছে সে ছাপ সহজে মুছে ফেলে তারা হারিয়ে যেতে পারে না জনারণ্যে।

কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারটা আলাদা। তাদের কপালে একবার সিঁদুর পরিয়ে দিতে পারলেই তারা ভিন্ন গোত্রের হয়ে যায়।

কোন একদিন রাস্তায় সিঁদুর পরা কুমকুমের সঙ্গে তার দেখা হবে—নন্দিনী জানে।

বহুক্ষণ রঞ্জু ডাকেনি কেন, ভাবতে-ভাবতে অন্ধকার ঘরে পা দেয় নন্দিনী। তারও কেরোসিন বাঁচানোর সমস্যা আছে। কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনের আলো রঞ্জুর চৌকি পর্যন্ত পৌঁছোয়নি—তবু তার ঈষৎ আলো সমস্ত ঘরে ছায়া ও অন্ধকারের যে হরেক রকমের নকশা আঁকছিল—সেখানে রঞ্জুর কোন চিহ্ন সে দেখতে পায় না।

অন্ধকারে চোখ সয়ে এলেও নন্দিনী দেখে রঞ্জুর বিছানা শূন্য। তার বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে।

শিখা বাড়িয়ে দিয়ে হ্যারিকেন দুলিয়ে ঘুরিয়ে সে জানলার কাছে ঘরের একমাত্র ভাঙা চেয়ারটিতে রঞ্জুকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকতে দেখে। বসে থাকার সেই বিধ্বস্ত অসহায় ভঙ্গি নন্দিনীর মনে মমতার উৎস খুলে দেয়। সে রঞ্জুর মাথায় হাত রাখলে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে রঞ্জুর গোটা শরীর।

—দিদি, আমি ভেবেছিলাম, তুমি রাগ করে চলে গেছ, আর কখনও আসবে না। সত্যি তুমি কুমকুমদির মত আমায় ছেড়ে চলে যাবে দিদি?

এই অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। দেখা যায় না পোড়ার দুরারোগ্য ক্ষত কিংবা রঞ্জুর দৃষ্টিহীন অন্ধ চোখ। কিন্তু শোনা যায়। জোয়ানমদ্দ ছেলেটার পাগল-করা কান্না শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে নন্দিনী।

শব্দহীন, অশ্রুহীন কান্নায় তারও বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়, 'ভাই রে তোদের ছেড়ে কোথায় যাবো?'

রঞ্জুকে খাইয়ে, তার ঘা পরিস্কার করে, মলম লাগিয়ে, নন্দিনী বাইরে এসে বসে। মামিমা ততক্ষণে সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে দাওয়ায় ঠোঙা বানাতে বসেছেন। নন্দিনী মামিমার পাশে বসে-বসে ঠোঙা বানানো দেখে। মামিমার হাতের কাছে কাগজ

এগিয়ে দেয়। বড় বড় কাগজ মামিমা ক্ষিপ্রহাতে গোল ক'রে ভাঁজ দিয়ে একপাশে আঠা লাগিয়ে জুড়ে দেন। তারপর ঝটাপট নিচের দিকে কাগজে যে কতরকমের ভাঁজ করে আর আঠা লাগিয়ে জোড়েন, তর্জনী দিয়ে বাটি থেকে আঠা তোলেন মামিমা, হাতের তালু দিয়ে চেপে আঠা লাগান। একটা ঠোঙা বানানোর শেষ করে এক মুহূর্তও না থেমে দ্বিতীয় ঠোঙাটি বানানো কাজে হাত দেন। এত তাড়াতাড়ি কাজ করেন মামিমা যে নন্দিনী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—একশো ঠোঙা বানালে দু টাকা। মামিমার হাত তাই তুফানের চেয়েও দ্রুত ছোটে।

—মামিমা, আমাকে ঠোঙা বানাতে শেখাবে?

—তুই? ঠোঙা বানাবি?

হাত একটুও না থামিয়ে মামিমা চোখ দিয়ে তাকে আদর করেন। নন্দিনীর ইচ্ছে হয়, পেটে চেপে রাখা কথাটা বলে ফেলে।

মামিমার বাড়িতে সে চল্লিশ টাকা ভাড়ার ভাড়াটে। জ্বলন্ত স্টোভ ফেটে পুড়ে যাওয়া ভাইকে নিয়ে রয়েছে এ বাড়িতে। তাদের মা নেই বাবা ধানবাদে চাকরি করেন—এই পরিচয় দিয়েই তো মামা-মামির কাছে তারা এসেছিল। তবু মামি কেন যুদ্ধে যাওয়ার কথা বলেন?

মামিমা প্রায়ই বলেন, 'আহা কার মেয়ে, আমার ঘরে গো।'

নন্দিনী ভাবে, জিজ্ঞেস করেই ফেলবে মামিমাকে। মামিমা কী জানেন এবং কতটা। তারপর সাতপাঁচ ভেবে চুপ করে যায়। রাত আরও গভীর হলে মামিমা হাতের কাজ গুছিয়ে তুলে বলেন, 'যা শুতে যা, একা একা ভালো না-লাগলে আমার কাছে চলে আসিস। আমি তো পাশেই রইলাম।'

বিনিদ্র রাত গভীর হলে নন্দিনী বেড়ার ওধার থেকে মামিমার ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পায়। মামা নামে শুনতে 'বাড়িওয়ালা'। এক ইটের দেওয়াল আর টিন বা অ্যাসবেসটাসের ছাদওয়ালা যে চারখানা ঘরের মামা মালিক, তার ভাড়া থেকে মামার আয় সাকুল্যে একশো চল্লিশ টাকা। এখন নিজেদের বসবাসের ঘর থেকেও একখানা ঘর নন্দিনীদের ভাড়া দেওয়ায় রোজগার দাঁড়িয়েছে একশো আশি টাকা।

কোণের ঘরে কালীতারা মাসি থাকেন, তাঁর স্বামী কোন গভর্মেন্ট অফিসে 'ক্লাস ফোর'। তিনি তো মামার তুলনায় রাজা, মাস গেলে কোন্-না সাত-আটশো টাকা তাঁর ঘরে আসে।

—দেমাকে তো কালীতারার মাটিতে পা পড়ে না। —মামিমা মুখ গোমড়া করে বলেন।

বলতেই পারেন, কারণ তিনি বাড়িউলি, কিন্তু কালীতারা মাসির মেজাজ দেখলে, কে বাড়িউলি তা ভুল হয়ে যায়। তা তো হবেই, কারণ সব ভাড়াটেদের সামনে বসেই উদয়াস্ত খাটতে হয় মামিমাকে। ঘরকন্না, রান্নাবান্না সামলিয়ে বাকি সময়টুকু তো যায় ঠোঙা বানাতে-বানাতে।

পেশা অবশ্য মামারও একটা আছে। নিজেকে তিনি জমি আর বাড়ির দালাল বলে থাকেন। রোজ সকালে, মামিমার নিজের হাতে ধপ্‌ধপে সাদা ক'রে কাচা পুরনো জীর্ণ ধুতি ও লম্বা শার্ট ইস্তিরির ভাঁজ ভেঙে প'রে তেলে-জ্যাবজেবে ভেজা চুল পাট করে আঁচড়ে, কালো লম্বা ছাতি বগলে 'কাজে' বের হন মামা। কিন্তু জমির দালালি করে মামা একটি পয়সাও আয় করেছেন, এমন তো কখনও দেখেনি নন্দিনী।

তবু মামিমার ক্লান্তিভরা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ বাতাসে ভেসে-ভেসে মিলিয়ে যাওয়ার

আগেই সে মামার অস্বস্তিতে ভবা গলা-খাঁকারি শুনতে পায়। সে জানে এরপর শুরু হবে সেই পরিচিত কথোপকথন। দুমাস ধরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে-শুনতে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল নন্দিনীর।

—শুনছো নাকি ? মামা স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলায় ডাক দিলে মামিমা প্রতিরাতে যেন বা নতুন ভালোবাসার লজ্জা নিয়ে মৃদুতর কণ্ঠে জবাব দেন :

—কি বলছো ?

—ওই তালবাগানের ধারের জমিটার কথা বলছিলাম...

—হুঁ।

—পার্টিকে প্রায ধরিয়ে ফেলেছি জমিটা...

—আচ্ছা।

—তা নয়তো কি বলছি ? এটা হয়ে গেলে একখেপেই ধব গিয়ে দু-তিন হাজার...

—তাই নাকি গো ?

—তাছাড়া অতুলবাবুর জমিটার দিকেও খদ্দেরের নজর আছে...

—আচ্ছা ?

—দেখো বাসু, আর দু-এক বছর কষ্ট করো। এতদিন তো করলেই। এরপর দেখবে, এইসব জমি, ভি.আই.পি. রোডের ধারের এইসব জমি দুচার বছর পর সোনার চেয়েও দামি হবে। কত খদ্দের আমার পেছনে ঘুরবে তখন। বুঝলে বাসু, তখন আব সময় পাব না। তখন যে পয়সা রোজগার হবে, সে তুমি ভাবতেই পারবে না। বুঝলে তো ?

—তাই নাকি গো ? তা অতদিন আমি বাঁচবো তো ?

—কি.যে বলো, তার ঠিক নেই। বাঁচবে তো বটেই, কিন্তু অত পয়সা দিয়ে তখন কি করবে বাসু ?

—আমি তো গরিবের ঝি, গরিবের বউ, বেশি পয়সা দিয়ে কি করতে হয, তা কেমন করে জানবো ?

মামিমার যেন বা কিছু অভিমান ভরে গলা ভারী হয়ে আসে। মামা, তখন সেই মধ্যরাতে মামিমার মানভঞ্জন শুরু করলে নন্দিনী লজ্জা পেয়ে কান সরিয়ে নেয়।

সে এতদিনে বুঝেছে, মামিমার চেয়ে বেশি করে কেউ জানে না যে, মামা কোনদিনও এক পয়সা রোজগার করেননি, করতে পারবেনও না। কিছু-কিছু লোক ইস্তিরি করা পাটভাঙা জীর্ণ ধুতি শার্ট প'রে ছাতা বগলে পাড়ার চায়ের দোকানে বসে নানান রকম সারগর্ভ আলাপ-আলোচনা করার জন্যই জন্মায়। পয়সা রোজগার করার পন্থাপদ্ধতিগুলো তারা কোনদিনই ঠিক আয়ত্ত করে উঠতে পারে না, যদিও স্বপ্নে তারা যে-কোন সময় পৃথিবীর ধনীতম ব্যক্তিও হয়ে যেতে পারে। মামা এদেরই দলে।

এসব জেনেও মামিমা কেন মামাকে কখনও কোন রূঢ় কথা বলেন না ? কেন এত মমতায় মামার বড়লোক হয়ে যাওয়ার স্বপ্নে উৎসাহ জোগান !

দারিদ্র থেকেই আসে মনোমালিন্য, ঝগড়াঝাঁটি। এমনটাই চিরকাল শুনে আসছে নন্দিনী। আর সেটা তো স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু মামিমার সামনে সব তত্ত্বধারণা কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবন যদি মামাকে সুযোগ দিত, তবে লেখাপড়া শিখে মামা দারুণ 'একটা কিছু' হতে পারতেন হয়তো।

তবু এই বঞ্চনার দুঃখেও মামা নষ্ট হননি, ভ্রষ্টও নয়। মামাব মত নিখাদ ভালোমানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ। মামিমার এই বিশ্বাসই কি ভালোবাসা হয়ে এত রাস্তা

হেঁটে এল মামার সঙ্গে ?

আঠারো বছরের নন্দিনী জীবনের এতসব গভীর জটিলতা বুঝে ও না-বুঝে জিতেনের কথা ভাবে। কে জানে জেলে বসে এখন জিতেন কি করছে, কেমন আছে। ভাবতে-ভাবতে চোখের কোণে মস্ত দুই জলের ফোঁটা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নন্দিনী।

পরদিন দুপুরে কালীতারা মাসির গলাও যখন ঘুমের কারণে চুপ হয়ে গেছে, ঠোঙা বানাতে-বানাতে মামিমা নন্দিনীকে বলেন, 'বুঝলি রে ভাগ্নী, সুবীরের বুঝি আর পড়া হবে না।'

—হবে না! আর্তনাদ করে ওঠে নন্দিনী।—কেন হবে না মামিমা ? ও মামিমা।

মামিমার বালিকার মত শীর্ণ মুখে চিন্তা ও দুঃখের ভাঁজ একাকার হয়ে যায়। ক্লাস এইটের অনেক খরচ। যত উঁচু ক্লাসে উঠবে, খরচ ততই বাড়বে বই কমবে না। কিন্তু একশো আশি টাকা বাড়িভাড়া আর ঠোঙা-বানানোর রোজগারে তিনটে প্রাণীর খাওয়াদাওয়া, তারপরেও সুবীরকে পড়ানো, এতসব কি সম্ভব ? এসব বুঝেও নন্দিনীর মন মানতে চায় না। সম্ভব-অসম্ভব নানান উপায় চিন্তা করে সে। বাড়িভাড়া কুড়ি টাকা বাড়িয়ে দিলে হয় না ? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব ? তিনশো টাকা দেয় জয়দা, বহু কষ্ট ক'রেই। তা-ই সম্বল। রঞ্জুর ঘায়ে লাগানোর জন্য রোজ দু-টিউব দামি মলম লাগে। তার ওপর অন্য ওষুধপত্রও আছে। দুধটা-ছানাটাও তো দিতে হয়। পোড়ার রোগীর পুষ্টিকর খাবার দরকার। এর মধ্যেই আবার এত ছেলের নিত্য আসা-যাওয়া, তাদের খাওয়া খরচ।

প্রথম দিকে সে আর কুমকুম একা-একাই থাকতো, রঞ্জুকে নিয়ে। বোমায় পোড়া যুবক ছেলে—পাড়ার কে কখন নজর করে, পুলিসের কানে খবর যায়, বিপদ ঘটে, তাই কেউ এদিকে আসত না। এখন মাস দুই নিরাপদে কেটে যাওয়ার পর নিত্য দুপুরে ঘর ভরে যায়।

ভি আই.পি. রোডের ওপর, ব্যস্ততম মোড়ের মাথায় বাড়ি, কার কখন নজরে পড়ে, এখানে তাই বেশি লোকজনের ভিড় না-জমানোই উচিত, অন্তত রঞ্জুর নিরাপত্তার কথা ভেবেও—নন্দিনীর এসব কোন সাবধানবাণীই এখন ওদের আটকাতে পারে না।

একবেলার পেটভরা ভাত, একরাত্তিরের নিশ্চিন্ত ঘুমের জন্য পুলিসের গুলি আর জেলখানার ভয় মাথার ওপর নিয়ে পাগলের মতো ঘুরছে সেইসব ছেলেরা, জলের মধ্যে মাছের মত জনগণের গভীরে যাদের নিশ্চিন্তে বিচরণ করার কথা ছিল।

—তুই হতাশা ছড়াচ্ছিস, তোর মধ্যে সংশোধনবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে। মামা-মামি কি জনগণ নয় ?

—তো ?

—মামা-মামি তো সবই বুঝছেন, তোর কথা শুনলেই তো বোঝা যায়। তবু তো তারা আমাদের থাকতে দিচ্ছেন, এত ভালোবাসছেন...

—হুঁ।

—হুঁ কি ? তাই বলছি। হতাশা ছড়াস না। পঁচাত্তর সালের মধ্যেই গণফৌজ 'মার্চ' করছে পশ্চিমবঙ্গে। —ব'লে গোঁফের ফাঁকে হেঁ-হেঁ ক'রে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে তোলে গণেশ। যে হাসিতে একদিন স্বপ্নের আবেশ দেখত, সে হাসি আজকাল কেমন নির্বোধের হাসি বলে মনে হয়। মাথা থেকে শরীরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়া বিরক্তিকে দমন করে উঠে যেতে যেতে নন্দিনী বলে, জনগণের সঙ্গে একাত্মতা বাড়ানোর জন্য আজ আবার মামিমার ঘরেই খেতে বসিস না যেন। কোনমতে এক টাকার আটা

এনেছেন মামা। একজন বাড়তি লোক খেলে, মামাকেও আজ উপোস দিতে হবে।

—তুই যে দেখছি খুব...হ্যাঁ, আমি কি চামার নাকি? গজগজ করতে থাকে গণেশ। নন্দিনীর বিরক্তি মিলিয়ে গিয়ে একটু হাসি পায়। গণেশটার একটু খিদে বেশি। ভাগের ভাগ করতে করতে যেটুকু খাবার নন্দিনীর ঘরে জোটে তাতে বেচারার পেট প্রায়ই ভরে না। পাশের এঘর-ওঘরে তাই একটু খাবারের সন্ধানে গিয়ে বসে। সবাই ওকে খাওয়াতে ভালোবাসে। মামিমাও। তবু এ নিয়ে খোঁটা গণেশের অসহ্য ঠেকে।

একদিন সকালে উঠে মামিমার দাওয়াতে ছড়ানো বর্ণচ্ছটা দেখে নন্দিনীর চোখে ধাঁধা লাগে। সাদা, বাদামি, নীল, লাল হরেকরকমের রঙের ভিড় দাওয়া জুড়ে।

—ও মামিমা, এসব কি?

—আয়, বলছি, মুখ ধুয়ে আয়।

মুখ ধুয়ে এসে নন্দিনী দেখে মামিমাদের পুকুরধারের একচালাটার ভাড়াটে নেপালি দারোয়ানের মেয়ে নাইনি দাওয়ায় এসে বসেছে। মামি গুড় দিয়ে বানানো কালো চায়ে দুমুঠো মুড়ি ফেলে দুটো হাতল ভাঙা কাপ দুজনের দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসেন :

—পাঞ্জাবিদের পাগড়ি সেলাই হবে এসব কাপড় দিয়ে।

—সেটা আবার কি মামিমা?

—কি আবার, পাঞ্জাবিদের পাগড়ি। এতে ভালো পয়সা রে ভাগ্নী। ঠোঙার চেয়ে লাভ থাকবে অনেক বেশি।

—ঠোঙা বানাবে না?

—তাও চলবে, এটার ফাঁকে-ফাঁকে।

মামিমা চা পর্ব শেষ করেই কাজে বসেন। নন্দিনী বসে বসে দেখে। অ-আ-ক-খ লিখতে শেখেনি মামিমার যে শীর্ণ আঙুল, তার শ্রমনৈপুণ্যে সে অভিভূত হতে থাকে। সে তো এতদিন দেখেও ঠোঙায় আঠা লাগাতেই শিখতে পারল না ঠিকমতো। মামিমা কি করে এমন সহজ নৈপুণ্যে পাগড়ির কাপড়ে সেলাই দিচ্ছে, এই প্রথম দিনই!

—আর কত কি করবে মামিমা বলতো দেকি নন্দদিদি? অবাঙালি টানে চমৎকার বাংলায় কথাগুলো ব'লে নাইনি তাকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারে একটা।

—তাই তো দেখছি রে নাইনি। মামিমা, সুবীরের পড়া...

—সে হবে, চালিয়ে নেব, সেই জন্যই তো এ কাজটা।

নন্দিনীর হঠাৎ হাসি পায়। কালীদা শুনতে পেলে এক্ষুণি হয়তো বা তার তীক্ষ্ম চোখে ফুটিয়ে তুলতো বিদ্রূপ। সিগারেটের ধোঁয়ার অন্ধকার থেকে মুখ বের করে বলতো : যে যত পড়ে, সে তত মূর্খ হয়, চেয়ারম্যানের এই যে শিক্ষা শ্রদ্ধেয় নেতা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, তা কি ভুলে যাচ্ছো, কমরেড? নইলে সুবীর বুর্জোয়া শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারল কিনা, তা নিয়ে এত ব্যস্ত হলে কেন? পার্টির বিপ্লবী লাইনে তুমি আস্থা হারাচ্ছো। তোমার অধঃপতন হচ্ছে কমরেড নন্দ।

—আপনার ব্যাখ্যা যান্ত্রিক। এই কথা ব'লে হয়তো বা তর্ক জুড়তো নন্দিনী। কালীদা তবু কখনও মেনে নিতেন না। কালীদার মুখে সব সময় সিগারেট আর মৃদু হাসি। ধীর ও শান্তভাবে সবাইকে সব কিছু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেন কালীদা, কখনো ধৈর্য হারান না। তবে কারও বিবুদ্ধতাকে মেনেও নেন না। কোনরকম বিরোধিতা শুনলেই শ্রদ্ধেয় নেতার লাইনের বিরুদ্ধতা করা হচ্ছে—এই ধারণায় কালীদার মাথার দুপাশের রগ্ ফুটে উঠে দপ্‌দপ্ করতে থাকে।

তবু অধঃপতন। হবেও বা। কিন্তু তারা যে যুদ্ধে বেরিয়েছে, মামিমা যে বলেন।

যারা যুদ্ধ করছে, তারা সুবীরের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মামিমার যে-যুদ্ধ, তার উত্তেজনার আঁচ নিজের শরীর-মনে অনুভব না-করে পারে না। নন্দিনী জানে, শুধু সে নয়, গণেশদের গায়েও আজকাল এই উত্তেজনার আঁচ লেগেছে। গণেশ আজকাল হঠাৎ দিনদুপুরে এসে সুবীরকে বাড়িতে দেখলে জিজ্ঞেস করে, 'কি রে ইস্কুলে যাসনি ?'

—ও মামিমা, নন্দুদিদির যে তাজ্জব লেগে গেলো গো তোমার কাণ্ড দেকে। কেমন হাঁ-ক'রে আছে দেকো একবার। উচ্ছল নাইনি হেসে গড়িয়ে পড়লে নন্দিনীর সম্বিৎ ফিরে আসে।

ঠোঙা বানানো আর পাঞ্জাবিদের পাগড়ি সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ওড়নায় জরি ও চুমকি বসানোর কাজ নিয়ে যেদিন এলো মামিমা, ঠিক তার সাতদিন পরে, একদিন সন্ধেবেলা মামার সঙ্গে সেই ছেলেটি এলো। ভাঙা-চোরা শীর্ণ চেহারা, চোখের নিচে কালি পড়া ঈষৎ খুঁড়িয়ে হেঁটে ছেলেটি যখন এসে দাঁড়াল, তার আগেই ওড়নায় চুমকি বসানোর কাজটা কিন্তু অনেকটাই শিখে ফেলেছিলো নন্দিনী।

—দিদি, সটকে যান, রুগী নিয়ে...

—মানে ?

—মামুদের কাছে খবর হয়ে গেছে, আমরাও রেডি...

—আপনি ?

—ও-ই...বোঝেনই তো...হেঁ...হেঁ...

—তো খবর দিতে এলেন ?

—হেঁ...হেঁ...কাকুকে রেসপেকট করি। কাকু ফেঁসে যাক চাই না, তাছাড়া...

অন্ধকারে ছেলেটার চোখ ধকধক্ করে, আমি তো আপনাদেরই লোক দিদি, মেরে পুলিস খোঁড়া করে দিল তো নকশাল বলেই। মাইরি বলছি দিদি, আপনাদের জেনুইন সাপোর্টার ছিলাম আমি। কিন্তু গরিবের ছেলে, বাড়িতে থাকতে না-পারলে থাকবো কোথায় ? ছেড়ে দেওয়ার পর খোঁড়া পা নিয়ে ঘরেই থাকতাম। তিনবার পুলিস ধরে নিয়ে গেল। বাবা ঘটিবাটি বেচে জামিন করাল। তার ওপর কি রামপ্যাঁদানি পুলিসের জানেনই তো, এখন শালা খোঁড়া হয়ে হাঁটি, বেজন্মাগুলোর সঙ্গে বসে থাকি। আর যা যা করি থাকগে। পুলিস এখন ভালোবাসে। কাল মামুদের সঙ্গে ওরাও আসবে। সবাই ভাবছে অনেক আর্মস আছে আপনাদের, তাই জোর ফাইট দেবেন অ্যাটাক হলে, সেজন্য একটু প্রিপারেশন চলছে। দুজন মামু বাড়ির সামনে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ফিট আছে। নজর রাখছে...প্লিজ দিদি, সটকে যান।

এসব বলে চলে যেতে যেতেও ফিরে আসে ছেলেটা। তার কালি-পড়া চোখের কোলে, মুখে, কপালে ও গোটা শরীরে অসংখ্য রেখার অস্বাভাবিক ভাঙচুর পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সে আবার ভাঙা গলায় বলে, 'প্লিজ দিদি চলে যান, কাল ওদের সঙ্গে আমিও আসবো কিন্তু...'

ছেলেটা চলে গেল, ঘরে ঢুকে নন্দিনী দেখে দশটি মাথা ঘরের ভেতর উৎকর্ণ হয়ে বসে। তাদের তক্ষুণি চলে যেতে বলে নন্দিনী। ওরা অবশ্য কেউ যেতে রাজি হতে চায় না। রঞ্জুর জন্য তারা সেই মুহূর্তে জান লড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

—তোরা জান লড়ালে রঞ্জুর জানও বাঁচবে না, তোরাও মারা পড়বি। আমিই রঞ্জুকে বাঁচাব, তোরা সরে যা।

এ কথার পর ঘর ফাঁকা হয়ে যায় ধীরে ধীরে। সবার শেষে যায় অনির্বাণ।

ঈষৎ ইতস্তত করতে-করতে। হতভম্ব রঞ্জুর অন্ধ চোখ উৎকণ্ঠায় ঠেলে বেরিয়ে আসবে মনে হয়। অসহায় হাত বাতাসে হাতড়াতে-হাতড়াতে সে শুধু প্রশ্ন করে, 'এখন দিদি? এখন?'

তখন মাসিমা এসে তার চার ফুট চার ইঞ্চি লম্বা শীর্ণ শরীর দিয়ে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি নন্দিনীকে আবৃত করে দাঁড়ান। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন 'তোরা আমার কাছেই থাক ভাগ্নী। আমি থাকতে কেউ তোদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

—তা হয় না মামিমা। তুমি ওদের জানো না। আমি জানি। মামার কোন ক্ষতি আমি হতে দিতে পারি না। তাছাড়া সুবীরের বয়সও তো তেরো-চোদ্দ হলো...

তাকে আবৃত করে রাখা মামিমার শরীর অজানা ভয়ের তাড়নায় কেঁপে উঠেছে টের পেতে-পেতে নন্দিনী শুধু ভাবে যে, তার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি বাবার পায়ের ছ'টা হাড় যদি পুলিস ভাঙতে পারে, তবে মামার মতো দরিদ্র পরিচয়হীন মানুষকে কি করতে পারে ওরা। আরও মনে পড়ে—বাপী, স্বপন আর গোরাকে পুলিস যখন গুলি করে, তখন বারো থেকে চোদ্দর মধ্যে ছিলো ওদের বয়স।

মামা বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হয়ে পায়চারি করছিলেন। নন্দিনী ধীরে ধীরে মামিমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'মামা, এ ঘরের রান্নার সব জিনিসপত্র তোমার রান্নাঘরে নিয়ে যাও। সুবীর, তোর পড়ার টেবিল আর বইপত্তর সব এঘরে এনে, ঘরের চৌকি দুটোকে এক করে দে। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি রঞ্জুকে নিয়ে। সুনীলদা একটা ট্যাকসি ডেকে দেবেন? নাইনিদের ঘরের আশপাশে কোথাও গাড়িটা দাঁড় করাবেন। মামা, যেই আসুক, বলবেন, এ ঘর আপনাদের বসবাসের জন্য। এখানে কেউ, কোনদিন ছিল না। আমার মনে হয় পাড়ার ছেলেরা আপনার পক্ষেই থাকবে, আপনাকে সবাই ভালোবাসে, আমি জানি।'

অন্য ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে এসে সবাই জড়ো হয়েছিল আশেপাশে। চলে আসার সময় কালীতারা মাসি পর্যন্ত চোখ ছলছল করে চেয়ে আছে দেখে নন্দিনী স্বস্তি পায়। না, ওদের কথা বলে দিয়ে কেউ বিপদে ফেলবে না মামা-মামিমাকে।

প্রথমে অন্ধকারে গা ঢেকে নাইনিদের বাড়ি। সেখান থেকে নাইনিদের বারান্দা ও ছোট্ট আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে ভি. আই. পি. রোডের যে অংশটায় তারা পৌঁছল সেখানে সুনীলদা তার চেনা এক ট্যাকসি ডেকে এনেছিল। রঞ্জুকে নিয়ে কোনমতে তার ভেতরে ঢুকতেই কোনও এক তরুণী কণ্ঠস্বর গাড়ি ছেড়ে দিতে বলে। আঁতকে উঠে নন্দিনী পাশে নাইনিকে দেখতে পায়। —'আমার মেজদিদির বাড়ি চলো গো একন, চারপাঁচ দিন থাকতে পারবে, তারপর দেকে-বুজে যা হয় একটা...', নাইনি নিচুস্বরে বলে। ধাবমান গাড়ির ভেতর হু-হু ক'রে ঢোকে ভি. আই. পি. রোডের সতেজ হাওয়া। নাইনির কাঁধের ওপর মাথা রেখে শরীর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে এমনভাবে ভেঙে পড়ে নন্দিনী যে, বাতাসে তার আভাস পেয়ে রঞ্জু পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ও দিদি, কিচ্ছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নন্দিনীর মনে পড়ে, পুড়ে যাবার আগে একা রঞ্জুই বুক টান করে দাঁড়ালে নির্ভয় বোধ করত একটা গোটা তল্লাট।

নাইনির দিদির বাড়ি থেকে আবার হাসপাতাল। সেখানে চোখ অপারেশনের পর ব্যাণ্ডেজ খোলার দিন প্রথমে ডাক্তারের এক আঙুল স্পষ্ট দেখতে পেলো রঞ্জু। ...তারপর দুই-তিন, এমন কি পাঁচ আঙুলও।

সে উল্লাস থিতিয়ে এলে ডাক্তারের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেয়ে খাট থেকে নেমে তাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলো রঞ্জু। তিনি রঞ্জুকে মাঝপথে বাধা দিলেন, 'এখন নিচু হয়ো না, চোখের ক্ষতি হবে। যেদিন নিচু হতে পারবে, বরং দিদিকে প্রণাম কোরো। আমি জানি, ও তোমার সহোদরা নয়। যদি হত, তাহলে এত ঝুঁকি ও নিতে পারত না। এত করতোও না হযতো। দিস ইজ, সামথিং এল্‌স হুইচ আই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যাণ্ড...

--ডাক্তারবাবু...। নন্দিনী কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে একটা চিরকুট স্বহস্তে লিখে তিনি নন্দিনীর হাতে দেন। বলেন, এ ছেলেটি প্লাস্টিক সার্জেন। নিউ, বাট প্রমিসিং--বগল আর হাত বুকের সঙ্গে জুড়ে গেছে, সেটা ছাড়িয়ে দেবে, কোন পয়সা নেবে না।

- ডাক্তারবাবু, আপনি তো আমাদের চেনেনও না। আপনিও তো কম ঝুঁকি নিলেন না আমাদের জন্য। এত নামকরা ডাক্তার আপনি, ওযান অফ দি টপস্।

- এসব কিছু নয়। দিস ইজ মাই ডিউটি। আর আমাকে আবার কে কি বলবে ? আই অ্যাম নট্ বাউন্ড টু নো হোয়াট মাই পেশেন্ট ইজ। মাই ডিউটি ইজ টু কিওর হিম, অ্যান্ড দ্যাটস্ অল।

নন্দিনীও এবার নিচু হয়ে ডাক্তারকে প্রণাম করতে গেলে তিনি নন্দিনীরও হাত চেপে ধরেন, 'আরে না, না, প্রণাম করো না। আমি শুধু বুঝতে চাইছি, দ্যাট ইউ আর এ পার্ট অফ আওয়ার নেকস্ট জেনারেশন, কিন্তু কী তোমাদের এমন সাহসী করে তুললো ? আমার বাড়ি কোথায় জানো ? আমি তোমাদের অনেক ছেলেকে মরতে দেখেছি।' নন্দিনীর হাত ছেড়ে ডাক্তারবাবু নন্দিনীর মাথায় হাত রাখেন, 'বেঁচে থাকো।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে নন্দিনীর বুকের ভেতরটা ফাঁকা লাগে। সে কি সাহসী ? সে কি ভীরু ? সে বোঝে না। শুধু বোঝে সে, কি এক সময়, কি এক আবেগ, কি এক স্বপ্ন ! মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি। মুক্তি মানে পেটভরা ভাত, মুক্তি মানে মাথার ওপর ছাদ, পরনের কাপড়। মুক্তি মানে স্বাধীনতা। কাগজের দোকানে কিছু টাকা বাকি পড়ে যাওয়ায একদিন মামিমাকে মারতে এসেছিলো দোকানের মালিক...এ লড়াই ইজ্জতের লড়াই...সবই কি ব্যর্থ হলো ? ব্যর্থ কি হয় ?

হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সরা নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে ওষুধ আর পথ্য জোগাড় করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন রঞ্জুকে নন্দিনী গিয়ে পৌঁছনোর আগে। পুলিসের হাত এড়িয়ে রঞ্জুকে নিয়ে নন্দিনী চলে আসতে পেরেছিল তাঁদেরই জন্য। জয়দা নিজে আধপেটা খেয়েও রঞ্জুর চিকিৎসা পথ্যের সব খরচ জুগিয়ে গেলো। তারপর মামিমা, নাইনি ও মামা, সুনীলদা, নাইনিব দিদি, জামাইবাবু, কালীতারা মাসি পর্যন্ত।

এত ভালোবাসা...এত সম্ভাবনা...

—ও দিদি ? তুমি যে কী না। রাস্তায় দাঁড়িযে-দাঁড়িয়ে এত কি ভাবো ? এসো রাস্তা পার হবে...এখনও তো গাঁইয়া ভূতের মতো রাস্তা পার হতে ভয় পাও...। রঞ্জু আজ তার হাত ধরে বলে। সে আজ রাস্তা পার করে দেবে।

নন্দিনীর বুকের ভেতর বিরামহীন একঘেযে বৃষ্টির পর রোদ্দুর ওঠে। সব যদি ব্যর্থও হয় তবু একটি জীবন রক্ষা পেল, একজন অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেল, শুধু এইটুকু নিযেই কি কাটানো যায় না বাকি জীবন ?

প্লাস্টিক সার্জারি করে হাতটা স্বাভাবিকভাবে নাড়তে পারার পর রঞ্জুকে নিরাপদ

এক আশ্রয়ে যেদিন পৌঁছে দিল, ঠিক তার দিন দশেক পর পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে গেল নন্দিনী।

নন্দিনী পরে জেনেছিল, খবরটা পেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছে রঞ্জু। তিন দিন নন্দিনী মামাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল শিয়ালদা কোর্টে। পুলিসের বেষ্টনী ডিঙিয়ে মামা কোনদিনই তার কাছে পৌঁছতে পারেনি। কেবল একদিন গাড়িতে ওঠার সময় মামাকে এক মিনিটের জন্য কাছে পেয়েছিল সে।

—মামিমা তোমার জন্য রোজ কাঁদে ভাগ্নি। রুটি বানাতে বসলেই চোখ দিয়ে জল পড়ে। মামিমার বানানো রুটি তুমি কত ভালোবাসতে! তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো ভাগ্নি।

মামার গলা বুজে আসা দেখতে-দেখতে গাড়ি ছেড়ে দিলে, সে শুধু বলতে পেরেছিলো, 'মামা, কষ্ট করে আর এসো না।'

আসলে, ভয় পুলিসকে। পুলিস শুধু সন্দেহ বোঝে, গ্রেপ্তার বোঝে, নির্যাতন বোঝে। ভালোবাসা তো তারা বোঝে না। ওরা যদি মামাকে নির্যাতন করতে চায়...।

সাড়ে চার বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নন্দিনী দেখল, পৃথিবী এক ভিন্ন গ্রহে পরিণত হয়েছে। সেখানে শান্তিজলের ছিটে ছিল, ভাঙনের মর্মভেদী শব্দ ছিল, এমন কি নন্দিনীর জন্য মালাও ছিল। কিন্তু প্রিয়জনের হৃদয় ছাড়া অন্য কোথাও রক্তের দাগ ছিল না। আর ছিল না সেই জায়গা, যেখান থেকে নন্দিনীকে ধরে নিয়ে গেছিল পুলিস।

কাউকে চিনতে পারছিল না নন্দিনী। চেনা সেই পৃথিবীকে অচেনা লাগছিল, এমন কি সহোদরের মুখও। কুয়াশায় পথ খুঁজতে-খুঁজতে সে দেখল, বহুদিন আগে জেল থেকে বেরিয়ে গৃহস্থ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে গৃহস্থ হবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে স্কুল শিক্ষক জিতেন। রঞ্জু এলাকায় ফিরে গিয়ে পনের পাওয়ারের চশমা পরে কয়লার দোকানে কয়লা মাপছে।

বোমা আর পাইপগানের অধীত বিদ্যা কাজে লাগিয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চললে শর্টকাটে বড়লোক হতে পারবে এবং রঞ্জুর সঙ্গে অতীতের সব শত্রুতা তারা ভুলে যাবে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক পার্টি প্রস্তাব দিয়েছিল। সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে রঞ্জু এখন কয়লা মেপেই সুখী। ওরাও রঞ্জুকে আর ঘাঁটায়নি তারপর।

গণেশ অবশ্য আগের চেয়েও বেশি জোরে ঘোষণা করছিল, পশ্চিমবঙ্গে গণফৌজ 'মার্চ' করবেই। তবে সে 'মার্চে'র সালটা এখন বদলে গেছে, আর গোঁফ রাখে না বলেই হয়তো তার হাসিকে এখন নির্বোধতর মনে হয়। এমন কি সেখানে এক অচেনা ধূর্ততার ছাপ দেখে ছাঁৎ করে ওঠে নন্দিনীর বুক। একমাত্র অনির্বাণ বলেছিল—'যদি অনেক ভুলও হয়, কিংবা সবই ভুল তবু প্রথম থেকে হলেও শুরু তো করতে হবে আবার থামা কি সম্ভব?'

--হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আর পারব না। বলে অনির্বাণকেও ফিরিয়ে দেয় নন্দিনী।

কেবল মামিমার বাড়িতে গিয়ে নন্দিনী দেখলো, সব ঠিক আগের মতোই রয়েছে। সেই চার ঘর, দুই উঠোন—মায় নাইনিদের একচালাটা পর্যন্ত। শুধু নাইনি সুনীলদাকে বিয়ে করে তার ঘরনী হয়েছে। তার হাসিতে নন্দিনীর প্রতি সেই পুরনো অভ্যর্থনা ছিল। মামারও খুশির অন্ত ছিল না নন্দিনীকে দেখে। তার আশীর্বাদভরা স্নেহের হাত

বারবার স্পর্শ করছিলো নন্দিনীর মাথা। সুবীর তার হাত ধরে আনন্দে উচ্চিংড়ের মত লাফাচ্ছিল।

কেবল, যে-মানবীর আকর্ষণ তাকে টেনে এনেছে এ বাড়িতে, তিনি বসেছিলেন উচ্ছ্বাসহীন, স্তব্ধ এক শোকগাথা হয়ে।

মামা আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন নন্দিনীকে। বললেন, মাথাটা কেমন হয়ে গেছে ভাগ্নী। তুমি যেন মনে দুঃখ পেও না ওর ব্যবহারে।

—কবে থেকে মামা? কবে থেকে?

মামা চুপ করে থাকে। সে কি আর কেউ জানে? সে খবর কি কেউ রাখে? কত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের ভেতর জমিয়ে রাখতে রাখতে মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়—কত হাজার ঠোঙায় আঠা মাখালে একসময় থেমে যায় হাত—কোন্ স্বপ্ন ভেঙে গেলে কথা বলতে ভুলে যায় মানুষ—সে খবর কেই বা রাখতে পারে।

—ও মামিমা, আমি নন্দু, আমাকে চিনতে পার না?

—ও মা, তোকে চিনব না? তোকে কি ভুলতে পারি? যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে কথাগুলো বলেই আবার অতল ঘুমে তলিয়ে গেলেন মামিমা।

—ও মামিমা, খিদে পেয়েছে যে। নন্দিনী বলল। একথা শুনে মামিমা উঠে রান্না করলেন। সেই পাতলা মুসুর ডাল। আলুভাজা। মামা একটা ডিম নিয়ে এলে ডিমভাজাও হলো। সুবীরকে নিয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে খাওয়া-দাওয়া, গল্প এইভাবে সন্ধ্যা গড়িয়ে এলে মামিমা রুটিও বানালেন। সেই আগের মতই সুন্দর গোল হয়ে ফুলে-ওঠা রুটিতে পোড়ার একটি দাগও ধরলো না।

—সুবীর, মামিমা পাগল হয়নি রে! মামিমা আর পারে না রে।

—জানি দিদি, তাই তো অন্য সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছি এখন। ঠোঙা বানিয়ে ক'পয়সা দিদি? দুটো টিউশানি করে আমি তার ডবল পয়সা রোজগার করি।

এক চান্সে দ্বিতীয় বিভাগে হায়ার সেকেন্ডারি পাস ক'রে সুবীর কলেজে পড়তে পড়তেই শ্রম ও পুঁথিগত বিদ্যার মূল্যভেদ খেয়াল করতে পেরেছে বটে, কিন্তু সারা জীবনের শ্রমের মূল্যে গড়া সুবীরের এই সাফল্য মামিমার মনকে এখন স্পর্শ করতে পারছে কিনা বুঝতে বুঝতে রাত কাবার করে ফেলে নন্দিনী।

বাড়ি ফেরার জন্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দাওয়ার নিচে নন্দিনী পা দেওয়ার আগেই নির্বাক বিষণ্ণ মামিমা এই প্রথম নিজে থেকে কথা বলেন, হ্যাঁ রে, তুই যে চার বছর জেল খাটলি, তা তোদের সেসবের কি হলো?

কেঁপে উঠে বুঝেও অবুঝ হয়ে নন্দিনী মামিমাকে প্রশ্ন করে, কি সবের? মামিমা?

সুঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে, এমন নৈঃশব্দ্যের ভেতর হ্যারিকেনের ম্লান আলোর অন্ধকারে তার প্রশ্ন তার কাছেই ফিরে এলে মামিমা আবারও জিজ্ঞেস করেন, সেই যে বলতি, সব মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচবে। তা তোদের সে সব হবে না?

পুলিসের ঘুষি, লাথি আর লাঠির বাড়ি-খাওয়া তার মতো মেয়ের চোখে জল মোটেই মানায় না জেনেও, নন্দিনী মামিমার কোলে মাথা রেখে কাঁদে। অনেকক্ষণ পর মামিমাই তার মাথায় হাত রাখেন, 'যা এখন বাড়ি যা। রাত অনেক হল।' তবু মামিমার হাত মুঠোর মধ্যে ধরে রেখে সে অনুভব করে অনন্ত শ্রমে রুক্ষ আর শীর্ণ শিরা-ওঠা বয়সহীন এক হাতের স্পর্শ। মামিমার কোলে শুয়ে-শুয়ে সে দেখে দ্বাদশীর ক্ষয়া চাঁদ, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, আজও যুদ্ধে যাচ্ছে কালপুরুষ।

বছর তিনেক পর সুবীর বি. কম. পাস করে যায়। মামা বলেছিলেন সেকেন্ড

হয়েছে সুবীর। অবাক হয়ে সুবীরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নন্দিনী টের পায়, সেকেন্ড নয়, সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে পাস করেছে সে। নাম সই আর চিঠি লিখতে পারা, মামার কাছে দুটো শব্দের কোন তফাত নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু মামিমার প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে যে লেখাপড়া শেখা, বি. কম পাস করেও সে লেখাপড়ার অর্থ চাকরি পাওয়া নয়, ঘরে পয়সা আসাও নয়, বরং তার অর্থ শিক্ষিত বেকারের দলে নাম লিখিয়ে সুবীরের হাসিভরা মুখে অন্ধকারের ছায়াপাত। অথচ দু-বেলা দু-মুঠো ভাত খাবার জন্যও তো পয়সার দরকার; পয়সার দরকার মামিমার চিকিৎসার জন্যও—এসব চিন্তা ও দুশ্চিন্তায় শীর্ণ হতে হতে কোঁচকানো ধুতি-শার্ট পরে মামা একদিন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। তারপর থেকে একরকম পাগলই হয়ে গেলেন মামিমা।

মামার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কেবল চাকরি খুঁজতে-খুঁজতে হন্যে হয়ে টিউশনির চাপে নিজের যৌবনকে হারিয়ে ফেলার আগেই সুবীর আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সন্ধান পায়। সে প্রদীপ মামা-মামিমার কাছেই পড়েছিল। কেবল তারা তা ব্যবহার করেননি কোনওদিন। করতে জানতেনও না। এখন বাণিজ্যবিদ্যার স্নাতক হয়ে সুবীর সে প্রদীপের ব্যবহার বুঝে নেয়।

ভি. আই. পি রোডের ওপর এক সদাব্যস্ত মোড়ের মাথায় মামার পুকুরসহ ছ-কাঠা জমির চার-কাঠা প্রমোটারের হাতে তুলে দিয়ে সুবীর নিজের জন্যও দু-কাঠা জমি রেখেছে। তার মায়ের বড় শখ ছিল নিজের ছোট্ট পাকা বাড়ি বানানোর। তাই ভবিষ্যতে কখনও ওই জমিতে বাড়ি তুলবে বলে ভেবে রেখেছে সুবীর। চার-কাঠা জমি প্রমোটারকে দিয়ে সুবীর ১০০০ স্কোয়ার ফুটের একটি ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছে, সঙ্গে পেয়েছে বেশ কিছু টাকা ও একটি দোকান।

দোকানের নাম মামার নামে রেখেছে সুবীর। কাগজের দোকান থেকে কাগজ আনতে গিয়ে প্রায়ই অপমানিত হতেন মামিমা। সে কথা মনে রেখে নিজেই কাগজের এক হোলসেলের দোকান দিয়েছে সে। তার কাগজের দোকান এখন খুব ভালো চলছে।

সচ্ছল হয়েও মাকে অযত্ন বা অবজ্ঞা করতে শেখেনি সে। জেলে বা পাগলাগারদেও পাঠায়নি। মায়ের সে যথাসাধ্য চিকিৎসা করে তবে একটি বউ ঘরে নিয়ে আসার জন্য সে যে ব্যাকুলতা অনুভব করে আজকাল তা যৌবনের প্রয়োজনে, না ঘর বাঁধার স্বপ্নে, না কি মাকে সেবাযত্ন করার জন্য এক রমণী-হস্তের প্রয়োজনের কথা ভেবে—সেটা মাঝেমাঝে গুলিয়ে ফেলে সুবীর। তবু নিজের সন্তানকেও এখন আর ঠিকমত চিনতে পারেন না মামিমা।

তারপর চলে গেছে বহুদিন। মামিমার কাছে আর যাওয়া হয়নি। তবু কখনও ভি. আই. পি রোড ধরে যেতে হলে সুবীরের 'অখিলচন্দ্র পেপার হাউস' আর মামার জমিতে তৈরি বহুতল অট্টালিকার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে নন্দিনী। ভাবে একদিন নামবে, নিশ্চয়ই নামবে—গিয়ে দেখে আসবে মামিমাকে। এতদিনে ঠিকই সেরে উঠেছেন মামিমা। এই মহিলার ক্লান্তিহীন কর্মব্যস্ত হাতই তো একদিন হার না-মানা চিরপ্রবহমান সেই জীবনযুদ্ধ চিনিয়েছিল নন্দিনীকে।

আর কখনও কখনও প্রবাসে ঝিঁঝি আর শেয়ালের উল্লাসধ্বনিভরা একলা নির্জন রাতে ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে এলে বাইশ বছরের ওপার থেকে এসে নন্দিনীর চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই চুলে হাত রেখে স্নেহভরা চোখে চেয়ে থাকেন সেই মহিলা, কোন এক আলো নেবানো রাতে যাকে কালপুরুষ চিনিয়েছিল নন্দিনী।

কসাই ॥ সৈকত রক্ষিত

মেঘ করেছে একপেশে। পুবের চাপ চাপ মেঘ দেখতে-দেখতে আকাশময় ছড়িয়েও যাচ্ছে।

বিপরীতমুখী হাওয়ার ধাক্কায় হাড়িরাম সামলে উঠতে পারে না। গামছাটা সে ছাগলের গলায় জড়িয়ে তাকে টেনে-হিঁচড়ে হাঁটে। মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'হিঁট্ র‍্যা শালা—হিঁঈঈট্!'

ধুলো ঢোকে হাড়িরামের চোখে। থুতনি কাত করে সে কাঁধে সাঁটিয়ে নেয়। কখনো-বা চোখ কচলে দেখে, সামনে, গ্রামের কাঁচা ঘরগুলো বেবাক উধাও। কোথায় লম্বা-লম্বা তার খুঁটা? পথের ধারে পড়ে থাকা নড়বড়ে কাঠের রথটাও বুঝি নেই। একটা বিরাট ধুলোর পিণ্ড হাঁ করে তার দিকেই ছুটে আসছে।

দুর্যোগে পড়ে, হাড়ির যত ফালতু রাগ ছাগলটার ওপর। এটা না থাকলে কখন সে তুলিনে ঢুকে যেত। কিন্তু ওই! বকরি হল হারামি। মাঠ-খামার ডিঙিয়ে দেড় ক্রোশ রাস্তা সে এই হারামির সঙ্গে আসছে। কাড়িয়র গ্রাম থেকে। কখনো তাকে হাঁটিয়ে আনছে, কখনো-বা নিজের ছেলের পারা কোলে লাদিয়ে। যদিও হাড়িরামের কোনো ছেলে নেই।

ছেলের জন্য অনুশোচনাও তার নেই। এই তিন কুড়ি বয়সে সে-কথা নতুন করে কোন বুড়বক ভাবে? পড়শিরা যখন তার মর্দানিতে কাঠি দেওয়ার চেষ্টা করে, হাড়ি তখনও অমলিন। ছাগলের পিঠ চাপড়ে হয়ত বলে, 'ইটা হামার বিটি লয়? কি মৈৎলাল?'

মতিলাল হাসে, 'স্যা বটে।'

কোলে সন্তান পাওয়ার মতো ছাগলের আমদানিতে হাড়ি এমনি ডগমগায়। পাইকারের কাছে যদি সুবিস্তা দরে কিনতে পারে, তাকে কুপিয়ে বাজা'র দরে বিক্রি করলেও হাতে তার দশ-পনের টাকা থাকে।

পাঁঠার মাংস হাড়ি বেচে না। পঁচিশ টাকা দরের জিনিস খায়োয়া গাঁয়ের ভিৎরে ক'জন আছে? দু'কেজি বিকতেই বেলা কাবার হয়ে যাবে। সে বেচে পাঁঠির মাংস। কুড়ি টাকা কেজির মাল শেষতক আঠারোয়। গাঁয়ের খদ্দাররা পরনের লুঙ্গি কি শাড়ির আঁচলেই পোঁটলা পাকিয়ে নিয়ে যায়।

পাঁঠি কাটে সে হাটবারে। তুলিনের হাটে, দু-পহরে যখন আশপাশের গ্রাম থেকে লোক ঢুকতে শুরু করে, হাড়ি তখন ছুরি-বঁটিতে শান লাগায়। তলের পাটিতে অবশিষ্ট ছাগল নাদির পারা দাঁত কটা দেখিয়ে যে-কাউকে অনর্থক গন্তব্যের কথা জিজ্ঞেস করে নজর টানার চেষ্টা করে।

বগলের ছাতা কিংবা কাঁধের টাঙি নাচিয়ে হাটযাত্রী বলে, 'ঘুরৎ আসছি।'

হঁ, হাটে সয়দা-পাতি কেনা-বেচা করে তবেই না মাংস কেনা? আর মাংস কিনে সটান ঘর!

ধাপে ধাপে এমনি অনেক কথা আপ্‌সে হাড়ির মগজে এসে ভিড় করে। হাতে তার জ্যান্ত পাঁঠি, কিন্তু এরই মধ্যে, কল্পনায় সে তাকে ঘরের সামনে ছাই-ঢিবির খুঁটায় বেঁধে ফেলেছে। দু' হাঁটুর মাঝে হারামিকে চেপে র‍্যাচ্ র‍্যাচ্ অস্ত্র চালিয়ে দিচ্ছে। ফের ঠ্যাঙে দড়ি পরিয়ে চালার বাঁশে পাঁঠি ঝুলাও। মাংস-চামড়া ভিন্ন করে দাও। একদিকে খদ্দের আসছে, একদিকে হাড়ি সাইজ-করা মাংস পাল্লা উপুড় করে তাদের বিকছে।

এই সব আগাম ভাবনায় হাড়ির দমতক ফুর্তি আসে। কেন-কি, কাজের প্রতিটি দফায় তার হাতে অস্ত্র। কাঁই খচ্-কাঁই খচ্! তাকে চনমনে করে। জাগিয়ে দেয়। হাতে অস্ত্র পেলে হাড়িরাম কলু অন্য মানুষ।

হিট্ র‍্যা শালা!

বুড়ো হাড-পাঁজরায় বাতাসের ধাক্কাও সামলাতে সে পারে না। লুঙ্গি বারবার সরে গিয়ে তাকে বেআব্রু করে দিচ্ছে। বাতাসের ঠ্যালানিতে সে সামনে বাড়বে কি, কদম-দু'কদম পেছু হটে যাচ্ছে। একদিন ছিল, ডাগর ডাগর ভেড়ি-বকরি গাঁ-বস্তি থেকে কিনে দরকার বুঝলে ঘাড়েও তুলে নিত। আজ সামান্য পাঁচ-সাত সেরের ছাগলটা নিয়ে ঘর পৌঁছুতে তার কম হায়রানি?

লুঙ্গিটা পেটের দু'পাশে গুঁজে উবুর ওপর সে তুলে নিল। এখন তাকে বিলকুল কসাই লাগছে। ছাগলের খুরের রঙ গায়ে, মুড়োনো মাথা আর হাড-চামড়া বরাবর শরীরে তাকত কি হাড়ির কম? গামছায় হ্যাঁচকা টান দিয়ে হিড়-হিড় করে সে এগোতে থাকে। হাওয়ার গতিতে ছুটে-আসা বালি ঝাপ্টা মারে তার পায়ে।

নির্মম কসাইয়ের হাতে পড়ে জানোয়ারটা এক-তরফা গোঙানি ছাড়ে। হাড়িরাম মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'হিট র‍্যা শালা!'

মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপ্টা। বৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্থানান্তরে। পিচ রাস্তার দু-পাশাড়ি মাটির দেয়াল আর খড়ের চালা নিয়ে তুলিনের ছোট ঘরগুলো ঈষৎ কেঁপে ওঠে কিন্তু পড়ে না। পথের ধুলো-খড়-আস্তাকুড়ের আবর্জনা ঘরের ভিতর পর্যন্ত জোরজার ঢুকে পড়ে। খোলা বারান্দা আর গরাদহীন জানলার ফোকর দিয়ে।

চালাও বড় নিচু হাড়িরামের। কোলে ছাগল নিয়ে সে কুঁজো হয়ে বারান্দায় ওঠে। বৃষ্টি আটকাতে মাথায় জড়িয়েছিল গামছা। এখন সেই গামছার পাক খুলে ফের ছাগলের গলায় বেঁধে দেয়। বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে হাড়ি ডাকে তার বউকে, 'কুথা গেলি গো!' ঢিবির ওপর হাওয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকা দড়ির খাটটার দিকে তাকিয়ে সে বউকে দোষারোপ করে নিজেকেই শোনায়, 'দেখ্, আক্কেল দেখ্ মাঞ্জটার!'

পিছনের দেয়ালের গা থেকে হিমানী চটপট শুকনো ঘুঁটেগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছে। হাড়ির গলা পেয়ে বলে, 'যাছি, যাছি।'

'আর বলে যাছি? আয় চাঁড়ে।'

'তিন-দিন ল্যা শুঁকায় ঠনঠৈনা হঁযে আছে। নাই উঠাব?' শুকনো ঘুঁটেগুলো বৃষ্টির আগে না তুলে নিলে? ভিজে সব বরবাদ হয়ে যাবে না?

বারান্দার কোণে ঝুড়ি উপুড় করে হিমানী, ঘুঁটের গাদায় ঘুঁটে মিলিয়ে দেয়। খাট তুলে সে হাড়ির পায়ের কাছে হড়াস করে পাতে। ছাগল-বাঁধা দড়ি তার হাতে দিয়ে বলে, 'দামে কিছু কমাল নাই? ঐ লি-ল?'

'কমাবেক? চুঁথিয়া টাকার জন্মা বঠে।' খাটের খুরায় ছাগলটা বেঁধে হাড়ি তার পিঠ ঝেড়ে দেয়। লোম ওড়ে। বয়স আর গা-গতরে কচি বলে চিকনাই আছে। ল্যাজের ডগায় লটকে থাকা বাবলা কাঁটাটা তুলে সে বলে, 'হামি কত্ত করে বললি, আদিম

ভাই, পাঁচ সেরের বেশি ইয়ার মাঁস হবেক নাই। ফির তুমার সঙে যখন ধারের কারবার নাই তবে দুটাকা কমেই লাও ? চুঁথিয়ার এক কথা। চার কুড়ি চার টাকার কম লিবেক নাই।—কই দে, ভাদ্ দে ভাদ্ দে।' খিদেয় পেট জ্বলে হাড়িরামের।

হিমানী ছাগলটার ঘাড়-গর্দান দেখে কুত করে। গায়ের মাংস খিমচে ধরে বলে, 'পাঁচ সেরের বেশিই জানাছে। হবেক-নাই ?'

'আই দেখ্। পাঁচ সেরের বেশি হলেই হামি উয়াকে বলব ক্যানে ? আচ্ছা বকা মাঁঞা !'

হিমানী বোকা। বেচা-কেনার সে কী জানে ? পাইকার যা ওজন বলবে হাড়িরাম অবশ্যই অপেক্ষাকৃত কম মাংস অনুমান করে দরাদরি চালাবে। আদিম আনসারি প্রথমে কী বলেছিল ? নিট সাত সের মাঁস হবে। কেটে ফেলে দিলেই সওয়া শ টাকা রকা। তবে সেই পাঁঠি তুমি শ টাকায় লিবে নাই ক্যানে হে ?

হাড়ি জানে, কারবারিরা অমন ধাঁ-কে-সাঁ বলে। এবার তুমি কুত কর রে বাবু। কুত করা মানে হল, চোয়াল দেখে ঘাড় দেখে সেই অনুপাতে মাংসের পরিমাণ মালুম করা। হাড়ি বলেছিল, পাঁচ সেরের উপ্‌রে যাবেক নাই।

আখেরে ফয়সালা হল চার কুড়ি চারে। তবে ?

'আগু খাঁইয়ে লি। বাদে বচসা হবেক।' ফোঁপরা পেট চোঁ চোঁ করছে। চৌকাঠে বসে কপাটে শরীর এলিয়ে বুকের নিচে সে আলগা হাত বোলায়।

অতটা পথ পায়দল করার ধকল তো আছে ? কাড়িয়র যাওয়ার বাস নেই। তুলিন থেকে দক্ষিণমুখে নেমে ক্ষেত আর জঙ্গল মাড়িয়ে যেতে হয়। সেই সকালে বেরিয়ে এখন বেলা ডুবিয়ে যে মানুষ ঘরে ঢোকে, শরীর তার বেহাল হয়ে যাবে না ? পেটটা দিন দিন পিঠের সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছে তার।

কাঁসার কানা-উঁচু থালাতে ভাত আর জলের ঘটি ন্যমিযে দিল হিমানী, 'হাতে-মুহে টুকু পানি লে, অঁ ?'

'আর লিতে পারি।' ঘটি কাত করে সে ডান হাতে সামান্য জল নেয়। থালার কিনারে জল ছড়িয়ে আদেখলের মতো খেতে থাকে।

'কাঁথা-কানি মেলা আছে নাকি ? উঠা উঠা। মেঘে ঘোর করে আসছে।' এঁটো হাত লম্বা করে সে মতিলালের চালার ওপারে প্রকাণ্ড কালো মেঘ প্রায় ধরে ফেলার ভঙ্গিতে হিমানীকে দেখায়, 'হি ডাগর দুয্‌যোগ। হুল-পাথরে ছ্যাচ্‌রা-ফুটা করে দিবেক।'

আগাম দুর্যোগ জানিয়ে রাখতে হাড়িরাম ভালবাসে। হিমানী ভাবে হয়ত তাই। হযত সারারাত মুষলধারে চলবে বৃষ্টি। হয়ত রাতভর শিলাবৃষ্টিতে ঘর-বাড়ি চাক্‌নাচুর করে দেবে।

হাড়ির কোনো ফিকির নেই। নতুন করে তার হারাবার কী আছে ? না আছে বিশ-পঁচিশটা গাই-গরু, আবাদ করা চাষবাড়ি। তেমন শিলাবৃষ্টি হলেও বড়জোর চালটা চৌচির হয়ে যাবে। শুধু এই ছাগলটা কোলে পেটে আগলে রাখতে পারলেই হয়। খোলা-খাপরা না হোক, ডালপালা দিয়ে আবার চালা বানাতে কতক্ষণ ?

'আসুক। আসবেক নাই ক্যানে ?' অনিবার্য লৌকিক ছড়া কাটে হাড়িরাম, 'কথায় বলে, চৈতে হুল-পাথর/বৈশাখে উথল-পাথল।'

মাঝরাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি।

কুপি জ্বেলে হিমানী দেখে চালা ফুটো হয়ে জল পড়ছে। কোথাও অনর্গল ধারা,

কোথাও ফোঁটা-ফোঁটা। মাটির মেঝেতে গর্ত করে দিচ্ছে।

থালা-বাটি পাতে হিমানী। কিন্তু এমন মার-মার বর্ষা সে বাধা মানে ? বাটি উপচে জল গড়িয়ে যাচ্ছে খাটের তলায়।

দুর্যোগ দেখতে দরজা খুলে দেয় হাড়ি। বাইরে জমাট অন্ধকার। মতিলালের টিনের চালার জল ছড়ছড় করে পড়ছে রাস্তায়। তল্লাট কাঁপানো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ঝাঁক তার মুখে ঝাপ্টা মেরে চলে যায়। প্রকৃতিকে এক কিস্তি গালাগাল করে হাড়ি স্বভাব-মাফিক চেঁচিয়ে ডাকে, 'কই শুনলি ? ঘুঁটাগুলা ভিৎরাবি ন নাই, হ্যাঁ ? সোব ভিজে গেল যে।'

হিমানীর সঙ্গে সে-ও হাত লাগায়। ঘুঁটে তুলে তুলে ঘরের ভেতরে গাদাগাদি করে রাখে।

বৃষ্টির ছাঁট খেয়ে মাঝ-ঘরের খুঁটোতে বাঁধা ছাগলটা ম্যাঁ-ম্যাঁ ডাকতে থাকে। নাকে সিকনি। খাটের নিচে বাসি কুসুম ডালটা জিভ দিয়ে টানার জন্য ছটপট করে সে। হাড়ি বলে, 'পাল্‌হা আছে ত দে দুটা। খাক।'

সবুজ পেচ্ছাপ আর নাদি পায়ে পায়ে মাড়িয়ে চারোতরফ ভরিয়ে দিয়েছে। দুর্গন্ধ তাদের নাকে লাগে না।

মেঝের কাদাজল ঝেঁটিয়ে চৌকাঠের দিকে ঠেলে দেয় হিমানী, 'ভিতর-বাহার সমান। জলের এমন বহি গেলে ঘরেও টেকা যাবেক কি করে ?'

গম্ভীর হয়ে ওপরে তাকায় হাড়ি। ঘরামির দৃষ্টিতে সে দেখে মাথার ওপরে প্রচুর ঝুল। খোলার নিচের বাতায় উই ধরে চালা এখন বসে পড়ার সামিল।

কুপির আলো উঁচুতে তুলে হিমানী বলে, 'উঠবি নাকি ?'

এক মুহূর্ত ভেবে নেয় হাড়ি। সারারাত কষ্ট পাওয়ার চেয়ে একবার চালায় উঠে যদি ফাটা খোলা কটা পাল্টে দেয় আপাতত নিশ্চিন্ত। খাট পেতে রাতটা শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিতে পারে।

ছেঁড়া বস্তা ডোঙার মতো করে হাড়ি মাথায় পরে নেয়। পিঠও ঢেকে যায় তাতে। কাঁচা মাটির দেয়ালে পা ফসকে গেলেও সে সামলে উঠে যায়। ওপর থেকে বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে চিল্লায়, 'কন্‌খেনে গো ?'

খাটের ওপর দাঁড়িয়ে কুপি হাতে হিমানী। ছোট লাঠি দিয়ে ফাটা খোলায় খোঁচা মারে, 'হি, এই ত। এহ্‌-এহ্‌-এইটা।'

ভাঙা খোলাটা ছুঁড়ে ফেলে হাড়ি। সেখানে বসিয়ে দেয় উঠোনে জমিয়ে রাখা পুরোনো খোলার একটি।

চালার মাথায়, ঝনঝমে বৃষ্টির মধ্যে হাড়িরাম, একটার পর একটা ভাঙা খোলা বদলে যায়।

ভোরের দিকে চোখ লেগেছিল। কপাটে ঠেস দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালের আলো হাঁ করা মুখে পড়তেই সে গা ভাঙে। গোটা রাত দুর্যোগের পর একটা বিশুদ্ধ সকাল বড় আন্তরিক আর ঘনিষ্ঠ হয়ে তার কাছে আসে। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস, জোড় গাছে কচি পাতার পিন-পিন কাঁপুনি, মাটির সোঁদা বাসের সঙ্গে একাকার ছাগলের নাদি-নদাড়ি-গু-মুতের দুর্গন্ধ—এইটুকুই হাড়ির নিজস্ব।

গেল রাতের প্রাকৃতিক উৎপাত তাকে সামান্যও বিপর্যস্ত করতে পারেনি। অতীত তার কাছে কোনো ঘটনা নয় স্মৃতিও নয়। পিঁচুটির চোখে সে, ছাইগদার কাছে দাঁড়িয়ে,

ডাইনে-বাঁয়ে অকৃপণ দৃষ্টি ফেলে।

পিছের রাস্তা আরো পরিচ্ছন্ন ও নিটোল হয়ে উঠেছে। সারি সারি খড়ের চা'লাগুলোর ছাঁচে এখনো টপ-টপ ঝরছে জল। মতিলালের উঁচু বারান্দায়, হাড়ি দেখে, দু তিনটে কুকুর পরস্পর পেছনে চাটাচাটি করছে।

আর সে নিজে যে ঢিবিতে দাঁড়িয়ে, জলে তার পাঁশ ধুয়ে পোড়া কয়লার কুচি বেরিয়ে গেছে। পাতাহীন শুকনো কুসুমডাল, ছাগলের কবেকার রোঁয়ার গুচ্ছ, ময়লা-আবর্জনা সব নালার মুখে জড়ো হয়েছে।

ঢিবিতে বসে, হাড়ি, সেদিকেই তার গরম পেচ্ছাপ গড়িয়ে দেয়।

রোদ ওঠার আগেই দেয়ালে ভেজা কাঁথা-বস্তা মেলে রাখে হিমানী। খাট বের করে খাড়া করে দেয় রাস্তার ধারে। সেই খাটে বসে হাড়ি লম্বা আঁকশিটার ডগায় আলগা ফলাটা শক্ত করে বাঁধে সুতলি দড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তারপর হিমানীকে কিছু না বলেই এক হাতে আসমান ছোঁয়া আঁকশি আর অন্য হাতে দড়িসুদ্ধ ছাগল নিয়ে পাতপালা পাড়তে চলে যায়।

বাঁধের পাড় ধরে, তার পেছু পেছু যায় মতিলালের কুকুর।

কোমরে ডালা দুলিয়ে পাঁচু কামারের বউ এসে বসল। উঠোনে। খুঁট খুলতে-খুলতে বলে, 'আনা চারেকের দে কুলু-বউ। শুখা-শুখা দিবি বাবা।'

'হামা'র ঠিনে করে ভিজা ঘুঁটা নিয়ে গেছিস গুরার মা ?' শাড়ির আঁচলে ঘুঁটে এনে হিমানী তার সামনে ফেলে দেয়, 'এখন এই পাওযাছে এই বহুত। দুদিন বাদে ভিজা ঘুঁটাই পড়তে পারেক নাই। আনায় তিনটা মাঙলেও নাই।'

বর্ষা আরেকটু জাঁকিয়ে নামলে দ্বিগুণ হবে ঘুঁটের দাম। গোরু-কাড়া রোজ গোঠে আসবে না। রাস্তার গোবর জলে ধুয়ে যাবে। তাছাড়া ঘুঁটে দেবে কোথায় ? রোদ না উঠলে শুকোবেই বা কোন ভাটাতে ?

গুরার মা মুখ বেঁকিয়ে দেয়। পাকানো নোট বের করলে হিমানী বলে, 'হামার ঠিনে খুচরা নাই ধন।'

'খুচরা নাই ক্যানে ?' কুলু-বউকে রাগিয়ে দিতে সে বলে, 'ঝালদা থানায় বাঁটা পাছিস নকি ?'

হিমানীর মুখ ভার দেখে তলপেটে লুকনো খুচরো তার হাতে দিয়ে বলে, 'ইবার শান্তি হল ?'

যাবার সময় উঠোনে পড়ে থাকা টিনের কৌটোটা সে পায়ের আঙুলে তুলে ডালাতে ঢুকিয়ে নেয়।

ছুরি-বঁটির সঙ্গে একটু কুড়ুলও নামিয়ে দিয়ে হাড়িরাম বলে, 'পাইঝাও দেখি, পাঁচু ভাই। পাইঝাও।'

উনুন-শালে বসে হাপর টানতে টানতে পাঁচু ঘেমে উঠেছে। গলার ভাঁজে-ভাঁজে ভরপুর ময়লার সঙ্গে ঘাম টসটসিয়ে নামছে তার লোমশ ভুঁড়িতে। মুদ্রাবশে একবার ঘাড় কুঁচকে পাঁচু বলে, 'রাখে হরি ত মারে কে। হ্যাঁ হাড়িখুড়া, আজকাল তবে কুড়হার দিয়েও পাঁঠি কাটার কাম হচ্ছে ?' হাড়ির মুখের দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়েই সে ফস্ করে হেসে ফেলে। সাথে সাথ নিতাইও।

পাঁচু রসিক মানুষ। রসিকতা জানে। ছুরি-বঁটি দিয়ে ছাগল কাটাকাটি করে হাড়ি।

মাসে-দুমাসে সেগুলো ভোঁতা লাগলে পাঁচুর কাছে পাঝিয়ে নেয়। আজ আচম্বিতে কুড়ুল দেখে কর্মকারের এই শ্লেষ।

হাড়ি বলে, 'কাঠ-মোট চ্যালা করতে কুড়হারের দরকার আছেই। বলি, শালে যখন যাছি ইটাও লিয়ে যাই। কী নিতা ভাই?'

'ঠিকেই করেছ। এক লম্বর কাম করেছ। আমার হিসাবে কী বলে জান?' নিতাই হালের টকটকে ফলা সাঁড়াশিতে উল্টেপাল্টে বলে, 'ঘরে অস্তর যখন আছে, আলবাৎ তাকে শানায় রাখ।'

'ক্যানে, ক্যানে?' প্রচুর আগ্রহ নিযে শুধায় পাঁচু।

'আঃ, বিপদে-আপদে মানুইষ তুমার সঙ্গে থাকবেক নাই। অস্তরটা ত থাকবেক? বল, বঠে কি নাই?'

'এই?' কৌতূহল নিরসন হলে পাঁচু বলে, 'রাখে হরি ত মারে কে। কযলা দাও।'

নিভন্ত আঁচে ফলা গুঁজে উঠে পড়ে নিতাই। টিনের ভেতর থেকে কুচি কযলা মুঠোয় নিয়ে সে উনুনে দেয়। হাপরের শিকল টানে পাঁচু।

'তুলিনের ভিৎরে, বুঝলে পাঁচুদ্দা, হাড়িখুড়া আমাদে' সাহ্যাব মানুইষ', তর্জনীর ডগার বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে। নিতাই দেখায়, 'আমার সনা-পকাটা যখন এৎটুকু ছিল, তখন লে দেখছি খুড়া পাঁঠি বিকছে।—পাঁঠি বিকেই একদিনকে দেখবে দালান বনাবেক।'

মাংসের পয়সায় বিল্ডিং ঠুকবে হাড়িরাম। তার ভাঙা খাপরার এক-খড়ের চালা ফেলে, মাটির ফাটা পাঁচিল ভেঙেচুরে মিশমার করে একদিন সেও বড় হবে। আজ যে হাতে সে পাঁঠি কাটছে, কসাইয়ের সেই কর্কশ নির্মম হাত জীবনের অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে গিয়ে পাবে সভ্য মানুষের কোমলতা।

ছাই!

এইসব বুজরুকি আর ধড়িবাজি কথার অর্থ হাড়িরাম বোঝে না। বৃত্তি নিয়ে, জীবন-যাপন নিয়ে, সমাজে শ্রেণীগত ফারাক আর নিজস্ব দৈন্য নিয়ে আকুলি বিকুলি তার নেই। এক-কালে বাপ-চোদ্দপুরুষ তার ঘানি ঘুরাত। তখন এমন যন্ত্র-তন্ত্র পিষাইয়ের কল ছিল না, উপরন্তু সর্ষে কেনার পুঁজিও ছিল। আজ কী আছে তার? কী দিয়ে সে দুটো পেট পুষতে পারে? এই পেট পোষার জন্য তার পাঁঠি কাটা। আজ পাঁঠি কাটছে, দরকার হলে আগামী দিনে সে মানুষও কাটতে পারে। তবে কোনো কিছুর বিনিময়েই প্রাসাদবাসের অমন চতুর আসমানি মানসিকতা এই নিরীহ সঙ্কীর্ণ মানুষটিতে নেই।

বিদ্রূপ না প্রশংসা ধরতে না পেরে, নিতাইয়ের কথায় হাড়ি একটা ফাঁকা-ফাঁকা হাসি মুখে ছড়িযে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। অনর্থক বসে থাকার অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলে, 'কই, পাইঝাও?'

'হবেক হবেক।' পাঁচু শুধায়, 'এখন তাইলে বকরি আসছে কুথা থিকে?'

'হামার ত জানোই পাঁচু ভাই, মাহাজনের হামার ঠিক-ঠিকান নাই। যার কাছেই দু-পসা সুবিস্তা পাই, তার ঠিনেই কিনি। ই-হাপ্তারটা আদিমের কাছ লে আইনেছি।'

'কাড়িযর লে? ক্যানে ঝালদার হাটে দু-দশ টাকা সস্তায় নাই মিলত?'

'তবে আর কী বলছি তুমাকে? টাকাই জগাড় করতে পারি নাই। আনুয়ার ভাই টাকা দিব দিব করে আখেরে বলল, লারছি কাকা।'

'রাখে হরি ত মারে কে।—তার বাদে?'

'কাল মৈৎলালের ঠিনে বহুত করে চার কুড়ি দশ টাকা নিয়েছি। আজ বিকে

পুবাপুবি দিতে হবেক।'

মতিলাল বিড়িব পাতা কেনাবেচা কবে। তাব কাছে সময-অসময়ে ধবনা দিলে হাড়ি কিছু পায। যদিও ইনিযে-বিনিযে মতিলাল হবদম নিজেকে দবিদ্র বলে জানায। শেযতক কড়া শর্তে টাকা ছাড়তে কসুব কবে না। বিশেষ কবে হাড়িবাম, লুধু মুচি, এই এই লোকেব কাছে। যাবা হাত পাতে ভিখিবি হযে, আবাব সুদে-মূলে টাকা আপসও কবে সসঙ্কোচে।

আজকেব বিক্রি থেকে মতিলালকে হাতে-হাতে শ টাকা মিটিযে দিতে হবে। শেযাল-শুগনিব পাবা সে মাংস আগলে বসে থাকবে।

'ক্যানে, মনহব দাবগা নাই দিছে ?' নিতাই বলে, 'আগে-আগে যে উযাব ঠিনেই হাওলাত লিতে ?'

'ক্যানে নাই দিবেক ? কিন্তুক উযাব টাকা লিযে হামাব পড়তা হবেক ক্যানে ?' হাড়িবাম জানায, 'শালাব বহুত গবম। বলে, চাব কুড়ি দিযে পাঁচ কুড়ি লিব।—হ্যাঁ পাঁচুভাই, ইটা সম্ভব ? তুমিযেই বল নঁ ? কুড়ি টাকা নাফা নাই কুড়ি টাকা সুদ দিব ?'

হাপব টানাব তালে পাঁচু শুধু এপাশ-ওপাশ থুতনি নাড়ে।

'আগে দু একবাব না পাবতকে নিযেছি। এখন ধুব্ লে গড় কবি। বলি তোব টাকা তোব ঠিনেই থাক।'

'গড় কববাবেই বটে। দাবগাব টাকা।' নিতাই ঠাট্টা কবে, 'আব নাইলে দু-পাঁচশ লিযে ফুটে দাও। কন্‌ট্রোলেব চাল-চিনি বেলেক্ কবে দাবগা বহুত কামযছে।'

পুলিসেব বেশনেব মাল তুলিনে মুদিদেব কাছে বেশি দামে বিক্রি কবে মনোহব। তাতে টাকাব মালে তিন টাকা হয। তাব ওপব পুলিসে কাজ কবে বলে হুমকি দিযে হাপ্তাব হাটে গ্রামে গ্রামে মাশুলও আদায কবে। হাবামেব বোজগাব। হাড়িবাম এই ধান্দাবাজ লোকটাব থেকে একটা মোটা টাকা ধাব হিসেবে নিযে বেপাত্তা হযে গেলেই পাবে ?

নিতাইযেব এমন দুঃসাহসিক প্রস্তাবে, পাঁচু জানায, 'পুলিস-দাবগা যে-সে লোক ? কুকুব শুঁঙায মানুইষ বাব কবাবেক।' পুলসেব এমন ক্ষমতায পাঁচুই বিস্মিত হয বেশি। হাড়িবাম নির্বিকাব।

আগেব প্রসঙ্গ টেনে নিতাই বলে, 'এখন তাইলে মৈৎলালেব সঙেই লিযাদিযা ? আব যদি হিসাবেব টাকা ঘুবৎ দিতে না পাব ?'

'না পাবি মানে ? জবানেব জবান !'

'আঃ, যদি-ই মনে কব কী দিতে—ভগবান না কবুক—নাই পাবলে ? তবে ?'

'তবে ? হামি যেন পাঁঠিকে খিদি-খিদি কবি, উ তেমনেই হামাব গাযেব মাঁস খিদি-খিদি কবে লিবেক।'

লুঙ্গিটা নেংটিব মতো কবে এঁটে নিযেছে।

ঝুলন্ত পাঁঠিব সামনে ছুবি হাতে সে এখন বড় শানদাব কাবিগব। গোল কবে টেংড়িব চামড়া কাটে, ছুবিব আগা আলতো ডুবিযে। এমুড়ো-ওমুড়ো গেঞ্জি খোলাব মতো সে চর্চব কবে খুলে নিচ্ছে চামড়া। জানোযাবটা টেব পায না তাব চামড়াশূন্য দেহেব প্রকাশ্য নগ্নতা।

আব হাড়িবাম ? সে-বকমই নির্বোধ। হযত তাব গাযেব চামড়াও এমনি নিপুণ কৌশলে কেউ অল্প অল্প কবে খুলে নিচ্ছে। তাব অজান্তেই।

ছাড়ানো চামড়ায় শেষ টান দিতেই মলদ্বার থেকে ঝুর-ঝুর করে পড়ে একগাদা নাদি।

মতিলাল অবাক! তাৎক্ষণিক অহিংসা আর গভীর অধ্যাত্ম ভাবনায় কাতর হয়ে বলে, 'জীবনের কী মাহাত্ম্য দেখ হাড়িভাই। বাঁচার কালে যা খাঁইয়েছিল মরার কালে সোব দিঁয়ে গেল!'

হাড়ি কান দেয় না। দেয়াল-কোলে চামড়াটা ছুঁড়ে বউকে বলে, 'কট্‌রাগুলা ফাবাকে রাখ ক্যানে। সৈরা।'

মাটির ছ-সাত কোপটায় পাঁঠির রক্ত। এতক্ষণে জমাট হয়ে গেছে। কপালে ঘোমটা টেনে হিমানী সব সরিয়ে রাখে।

লধু এসে চামড়া তুলে নেয়। মাটিতে লম্বালম্বি বিছিয়ে বলে, 'তিরিশ ইঞ্চির বেশি হবেক নাই। লিবি কত হাড়িরাম?'

'তুঁইয়েই বল ন ভাই। আগু তোর দামটাই শুনি।'

'হামি? বলব?' লধু নিজের মনে বিড়বিড় করে নিয়ে বলে, 'দশ টাকার বেশি দিব নাই।'

'দিস না।'

'মানে?'

ছুরি থামিয়ে হাড়ি দেখে লধুকে। বিছানো চামড়ার দিকে ছুরি বাড়িয়ে বলে, 'মাপ দেখি। বার টাকার এক টিকলি কম হবেক নাই। লিবার আছে লে, নাই ত ভাগ্‌।'

'সাপা জবাব?'

'হু, সাপা জবাব।

দরে কম করবার লোক হাড়ি নয়। তার বক্তব্য, ভেড়ার চামড়া কিনবে যাও পাঁচ টাকায় পাবে। আর ঐ মাপের চামড়া যদি খাসির হয়? পঁচিশ-তিরিশ টাকায় বেপারি লুফে নেবে! লধু মুচি চলে যাক, ফের কত-কত মুচি আসবে। খলিল আছে, গোবিন্দ আছে। তারা চামড়ার বেপারি। নুন মাখিয়ে দশ-বিশ রোজ মাল ফেলে রাখে। একদিন শহরে গিয়ে থোক বিক্রি করে আসে। বড় মহাজনের কাছে। কেউ কেউ আবার নিজেই মেহনত করে রোদে শুকিয়ে কেটে-কেটে কাজে লাগায়। তাতে শুখা-শুখিব ঝামেলা থাকলেও তৈরি মালে পড়তা বেশি হয়। তবে? চামড়ার থোড়াই অবিক্রি আছে?

ফতুয়ার পাকিট থেকে গজ-সমান দড়ি বের করে লধু চামড়ার গায়ে ফেলে। বত্রিশ ইঞ্চির বেশি বই কম না। বারো টাকায় রাজি হয়ে সে পাকিটে হাত ঢোকায়।

মতিলাল বলে, 'দাও টাকা!'

বায়না করে লধু সাইকেল ঘুরিয়ে চলে যায় হাটে। সেখানে আরো কিছু যদি দরদস্তুর করে পটিয়ে নিতে পারে। ঘুরতি পথে সব কটা মাল ক্যারিয়ারে বেঁধে সে গ্রামে ঢুকে যাবে। লধুর গ্রাম? ছোট বকদ।

ধুতি হাঁটুর কাছে টেনে মতিলাল গোড়ালির ভরে বসে। হাড়ির পাশে।

চামড়াটা ঢিবির ওপর ছড়িয়ে পেতে দিয়েছে। তাতে ডাঁই করা কাটা মাংস। একপাশে কোটরা।

কাঠের পিঁড়ি সামান্য পিছনে টেনে দাঁড়িপাল্লার পাক খুলে নেয় হাড়ি। গামছায় হাত মুছে কানে গুঁজে রাখা পোড়া বিড়ি বের করে ডাক দেয়, 'টুকু আগুনটা দিয়ে যাবে হে, ভাগবদ্দা!'

ভাগবৎ এলে, হাড়ি তার মুখের চুটি নিয়ে বিড়ি ধরিয়ে নেয়। লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া না ছেড়েই চোখ নাচায়, 'কেমন লাইগেছে ?'

'হাট ? নাহ্, সুবিধার লয়।'

'ক্যানে ?' চাপা উদ্বেগ নিয়ে মতিলাল শুধায়।

'দিন-কে-দিন জিনিসপাতির দরেই বাড়ছে। কাঁহাতক মানুইয খরিদ করতে পারে। বল্ ন ভালা ?'

হাড়িরাম একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'কিন্তুক হামার জিনিসের দর কিন্তুক দেখ যে-কে সেই। আঠারকে আঠারই। দিব এক-আধ পুয়া ? লিয়ে যাও র‍্যা ব ছ্যেলা-পুলায় খাবেক।'

ভাগবতের কোনো আগ্রহ নেই। কোপটার দিকে থুতনি বাড়িয়ে বলে, 'আর রক্তবাটি ?'

'ষাট প'সা। লাও লিবে ত আঠানায় দিঁয়ে দিব।'

মেঘ নামছে দেখে, সেই ছুতোয় ভাগবৎ চটপট চল্‌তা দিল।

খদ্দের আসে তারও পরে।

মাঝি-মাহাতান-গোয়ালিনরা এসে নিজের হাতে বেছে মাংস পাল্লায় চাপায়। হাড়-কাঁটা বাদে সবাই চায় নিট মাংস। এক পোয়া হোক আর আধ পোয়া হোক।

হাড়ি বলে, 'মাঁস-মাঁস বাইছে লিবি। আর হাড়গুলা কে লিবেক ? চিবাব হামি ?'

খদ্দেরের আদতই হল এই। আঁটি সে নেবে না, হরদম শাঁস চায়। তা বললে চলে ? শেষে একগাদা হাড় যদি পড়ে থাকে কে কিনবে ? ওজনের মালে লস্ খেয়ে যাবে না হাড়ি ?

এমনিতেই সে এক ঘা ঠকে গেছে। পাঁঠিকে যিস-তিস খাইয়ে আদিম তার পেট ভারী করে রেখেছিল। সেটা মালুম করেও ওজন ঠিক-ঠাক ঠাওর করতে পারেনি হাড়ি। এখন রক্ত-টেংড়ি-ভুটি বাদে ছ'সেরের মাল সাড়ে পাঁচে দাঁড়িয়েছে। বুকটা তার গুপ্‌গুপ্ করছে।

এর ওপর মেঘের অবস্থা দেখ!

দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির আভাস পেয়ে, মতিলাল, ভুরু কুঁচকে আকাশ দেখে। বলে, 'ভিৎরা হাড়িভাই, ভিৎরা এই বতর।'

ধুলা-গর্দা উড়ে আসে মাংসের গায়ে। জলদি জলদি তুলে নিয়ে তারা বারান্দায় বসে।

হিমানী বলে না কিছু। মহাজনের কাছে মাঁঞা মানুষ মুখ খুলবেই বা কেন ? কারবারের ব্যাপার কারবারি পুরুষ বুঝুক।

হাড়ি বুঝেছে ঢের। ভাবনায় মুখ তার পাঁঠির মেটুলির মতো কালো হয়ে আসছে। যতটুকু বিক্রি হয়েছে তার গোটা নোটের হিসাব মতিলাল রেখেছে। কড়চে। পিঁড়ির তলায় খুচরো পয়সাগুলো দেখে হাড়ি বলে, 'ইস্ শ্লা ফ্যাচাং হয়ে গেল! ভোরখোর সময়ে মেঘ করে দিল ?'

সত্যিই এটা তার চূড়ান্ত সময়। এখন হাওয়া-বাদলা মানেই বরবাদি। হাটের খদ্দের ভিড়-ভিড় করে পালাচ্ছে। ঝড় আসছে! গাঁয়ে ফিরতে-ফিরতে দুড়দাড় বারিশ নামবে তাদের মাথায়।

মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে মতিলাল বলে, 'তুমি মনে করে লাও হাড়িভাই—পাঁঠি যখন পড়ে গেছে বিক্‌রি তার হবেকেই। স্যা যতই দুয্‌যোগ আসুক!'

যদি না হয় ? এই তিনচার কিলো মাংস নিয়ে সে কী করবে ? বাসি মাংসই বা সে কার কাছে হাত জোড় করে ফেলে দেবে ? কোথা থেকে পরিশোধ দিয়ে রাখবে সে জবানের জবান ? মেঘের মতোই ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে আসে তার চিন্তা।

'হাড়িরাম ! কুথা গেলি রে ?' খাকি হাফপ্যান্টের সঙ্গে সাদা জামা গায়ে মনোহর। দেয়ালে সাইকেল ঠেসিয়ে বলে, 'দে, কী দিবি দে ত।—দুট্ পঁন্দে-মুড়ে ধূলা ঢুকে গেল ! দুহাতে এলোপাথাড়ি ঝাপটা দিয়ে সে ধুলো ঝাড়তে থাকে।

পাঁজরার হাড়গুলো থেকে মাংস ছাড়িয়ে হাড়িরাম তাদের গায়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নাড়িভুড়ি জড়ায়। তুখোড় সূচি-শিল্পীর মতো দ্রুত ফাঁস দিতে দিতে সে আড়চোখে মনোহরকে দেখে নেয়।

ঝাপ্টানি খেয়ে মনোহরের মাথার চুল এসে পড়েছে চওড়া কপালে। তাগড়াই চেহারার সঙ্গে খাপসই গোল মুখ, হাবিলদারসুলভ মাথার ছাঁচ, তার ওপর চুলের এই অবিন্যস্ততা—সব মিলিয়ে, হাড়িরামের তাকে মানুষ মনে হয় না।

জামার কাপড়ের প্রান্ত সরু করে পাকিয়ে অভিজাত ভঙ্গিতে সে নাকে ঢোকায়। তৃতীয়তম হাঁচির অপেক্ষায় মুখ বিকৃত রেখেও, হাঁচি নাহলে সে বলে, 'এই তুলিনের ভিৎরে, জানলে মতিলাল, হারামি লোকের তুমি অভাব পাবে নাই।' মতিলালকে বলার সুযোগ না দিয়ে সে নাগাড়ে শুনিয়ে যায়, 'গ্যানা হালদার হল এক্কের নম্বর হারামি। আজ তিন মাস হতে চলল দু টিন তেলের দাম পাছি নাই।'

'ক্যানে ?'

'যখনি যাছি বলছে বিক্রি বাটা নাই', মতিলালকে গ্যানা হালদার ধরে নিয়ে মনোহর বলে, 'হ্যাঁ রে হারামি, বিক্রি-বাটা যদি নাই—দকান করেছিস ক্যানে ? দুসরা লোককে ভাড়া দিঁয়ে দে ?'

'ত কী বলছে টাকা দিব নাই ?' মতিলাল শুধায়।

'দিব নাই বলবেক ? উয়ার বাপের হিম্মৎ আছে ?'

'তবে ?'

'ওই খিঁচায়-খিঁচায় দিছে। হাপ্তা-দুহাপ্তা বাদে লে দু টাকা লে পাঁচ টাকা ! মনে করে যেমন দারগার মাল লদীর জলের ভাইসে আসছে।'

'ক্যানে নাই বলবেক ?' মতিলাল ঠাট্টার ছলে খোঁচা দেয়, 'টাকার মাল তুমি কিনছ সিকার দরে। এমন চানোস্ যদি আমার মিলত তবে তুমার পারা আমিও লালে লাল বনে যাতি।'

'হুঁ ? হামি লালে লাল বনে গেছি ? ফুট্ !' সহাস্য মুখে ইচ্ছাকৃত বিরক্তি নিয়ে কথা পাল্টে দেয় মনোহর, 'কই হাড়িরাম ! দে রে বাবু কী দিবিস ? হাডজড়াগুলাও কী মাঁসের দরে বিকাবেক ?'

পিঁড়ির তল থেকে আধুলি বের করে হাড়িরাম বলে, 'ল্যান, ইয়ার বেশি আজ লারব। দেখছেন ত কী দুয্যোগ।'

'কী ?' আধুলিটা মাংসের গাদায় ফেলে মনোহর খেঁকিয়ে ওঠে, 'ভিখ মাঙছি অ্যাঁ, ক-ন কী ভিখ মাঙছি তোর ঠিনে ?'

'ভিখ ক্যানে মাঙবেন ? কিন্তুক আজ হামি দিতে লারব। কসম খাঁয়ে বলছি লারব।'

'লারব মানে ?' মতিলালের দিকে সে চোখ পাকিয়ে শোনায়, 'কই, গটা হাটে দেখা দেখি কে মনোহরকে আঠানা দিল।'

'স্যা ত সোবেই বুঝছি। কিন্তুক না দিতে পারলে জুলুমে লিবেন ?'

জুলুমের কথায় জলে ওঠে মনোহর। দুটাকার এক পয়সা কম সে নেবে না। কিন্তু হাড়িরাম নিরুপায়। পায়ে চেপে রাখা বঁটি সরিয়ে মনোহরের কাছে প্রায় হাত জোড় করে, 'দু ঠ্যাঙা মারুন আইজ্ঞা, স্যা ভাল। কিন্তুক ইয়ার বেশি হামি কী করে দিব ?'

মনোহরও নাছোড়বান্দা। কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে সে হাড়িকে দুর্বল করে দিতে চায়। আর আদায়ের ফিকিরে রাগ এবং উত্তেজনায় ভড়ং করতে করতে একসময় সত্যিই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

'উঠা, উঠা সোব !' দাঁড়ি-পাল্লা মাংস লাথি মেরে মনোহর বলে, 'তোর কন্ বাপের এক্তিয়ারে তুঁই ঘরে বসে মাঁস বিকছিস ? চল্ ঝালদা থানা !' কাঁধের গামছায় টান মেরে সে হাড়িকে বের করে। ছুটে আসে হিমানী।

'হেই হেই, ইটা কী করছেন ! আহ্....' হাড়িরাম যাবে না। কেন যাবে ? শরীরের ভারে পিছিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায় সে।

'কী করছি ? চল্ সুগুম !' এক হাতে সাইকেল আর-এক হাতে হাড়িকে টানতে-টানতে মনোহর পিচ রাস্তায় ওঠে। মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'হিট্ র‍্যা শালা !'

আংটার মতো জোরালো মনোহরের হাত। ছাড়াতে না পেরে গ্রামবাসীর মজ্জাগত আনুগত্য নিয়ে হাড়ি ফের বলে, 'কথাটা আগু শুনে ল্যান আইজ্ঞা। আমি কি দিব নাই বলেছি ?'

এগিয়ে আসে মতিলাল। হাড়িকে আলগা ধমক দিয়ে বলে, 'ঝন্‌ঝট করলে কারবার চলে ?'

আর ঝঞ্ঝাট করে মনোহরেরই বা ফায়দা কী ? কী পাবে সে হাড়িকে এমন হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ? মাথা ঠাণ্ডা করে সে তৎক্ষণাৎ বলে, 'দু টাকা নাই পারবি ত দেড় টাকা দে রে বাবু ? পাঁচ সিকাও দে ?'

মতিলালের থেকে একটা নোট নিয়ে হাড়িরাম বাড়িয়ে দেয়, 'খুশি মনে ল্যান আইজ্ঞা।'

'হঁ-হঁ,ক্যানে লিবেক নাই ?' আত্মীয়তার সুরে মতিলাল উপসংহার টানে, 'গাঁযে-ঘরের ব্যাপার। ঝগড়া-ঝামেলায় কাজ হয় ? আর বিকা-কিনার আবস্থা যদি স্যা-রকম থাকে, দুটাকা ক্যানে—পাঁচ টাকা দিলেও গায়ে বাজবেক নাই। কী হাড়িরাম ?'

হাড়িরাম কিছু বলে না। দু-একটা খদ্দার দেখে সে দ্রুত বারান্দায় আসে।

চারপাশে অবিন্যস্ত ছুরি-বঁটি। মাংসের ডাঁই। কোথাও জমাট বাঁধা রক্তের ফোঁটা, কোথাও নাদি-পেচ্ছাব। এই সবের মাঝখানে, কাঠের পিঁড়িতে হাড়িরাম আবার দাঁড়ি-পাল্লা ধরে বসে।
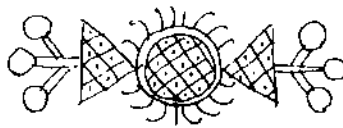
প্রার্থনা বিষয়ক কিছু ভাবনা বা একটি গল্প ॥ দেবর্ষি সারগী

তুরস্কদের আক্রমণের আশঙ্কায় বাংলার মানুষেরা যখন ভিটেমাটি ছেড়ে দেশ থেকে পালাচ্ছে তখন এক ব্রাহ্মণ যুবক ভাবল যে তার পরিবারকে ঈশ্বর রক্ষা করবেন, তাই পালাবার দরকার নেই। তার সিদ্ধান্ত তাকে সাহস ও শান্তি দিলেও ঈশ্বরকে বিচলিত করছিল। যুবকটি অন্যান্য প্রতিবেশিকেও দেশ ছেড়ে চলে যেতে মানা করল। কেউ কেউ তার কথা শুনে থেকে গেল, অনেকে চলেও গেল। বস্তুত, বাংলার গ্রামগুলোর মাথায় তখন একটা প্রকাণ্ড কালো মেঘের মতো ঝুলছিল আতঙ্ক। আতঙ্কটা যে শুধু বিদেশি তুরস্কদের ক্রুর মুখগুলো কল্পনা করেই হচ্ছিল তা নয়, নিজেদেরকে নিয়েও ওটা ছিল। বিশেষ করে, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে কৈবর্তদের বনিবনা হচ্ছিল না। গোড়ায় অবশ্য বৌদ্ধদের সঙ্গেই কৈবর্তদের সংঘর্ষ হয়, যাতে তারা বৌদ্ধ শাসককে পর্যন্ত হত্যা করতে সমর্থ হয়। পরবর্তীকালে তারা বর্ণহিন্দুদেরও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে।

বৃদ্ধ বাবা-মা, তিন ছেলেমেয়ে এবং সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে যুবকটির সচ্ছল সংসার। প্রকাণ্ড উঠোনসহ অনেকগুলো মাটির ঘর, গোয়ালে একজোড়া গাইগরু, আর চাষযোগ্য বেশ খানিকটা জমির মালিক সে। তবে ঈর্ষাপীড়িত কৈবর্তদের মতে তার সবচেয়ে মহার্ঘ সম্পত্তি তার স্ত্রী-ই, যাকে, তাদের মতে, তার বাবা সমুদ্রের গভীব থেকে চুরি করেই এনেছে, কারণ কোনো মানুষের ঔরসে ওই অপার্থিব রূপ জন্মাতে পারে না। মাছ ধরতে যাবার সময় ধীবরের দল বউটির মুখ কখনো দেখে ফেললে গভীর হতাশায় ডুবে যায়, তাদের জালে কোনো জলকন্যা কখনো ধরা পড়ল না বলে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে যুবকটি নিজে অবশ্য আগের মতো মুগ্ধ হয় না। এ কথা ভেবে সে মাঝে-মাঝে শঙ্কিত হয় যে তার স্ত্রী যেদিন বৃদ্ধা হয়ে যাবে সেদিনও সে তাকে সমান ভালোবাসতে পারবে কিনা। বৃদ্ধা স্ত্রীকেও সমান ভালোবাসার জন্য সে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে। বেদনার ভেতর দিয়ে সে ভাবে যে নারীর প্রখর সৌন্দর্যও শেষ বিচারে তুলনীয় অস্তগামী সূর্যের অন্তিম আভাটুকুর সঙ্গে। খানিক বাদেই অন্ধকার। ফলে সৌন্দর্যের চেয়েও সে বেশি গুরুত্ব দেয় প্রেমকে, যা সূর্যের আসল রূপের মতোই কখনো অস্ত যায় না। বস্তুত, জগৎ ও জীবনের সবকিছুকে ভালোবাসার দুরূহ চেষ্টাই তাকে সারাক্ষণ মগ্ন রাখে। সে কৈবর্তদের ভালোবাসে। লোকালয়ের অন্যান্য ব্রাহ্মণদের ভালোবাসে। এমনকী, বিনিদ্র রাতের অন্ধকারে নিজের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে এরকমও ভেবেছে যে আক্রমণকারী তুরস্কদের ভালোবেসে সে নিরস্ত্র করবে। আর ভালোবাসে ঈশ্বরকে, যিনি, সে মনে করে, তাদের সবাইকে রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের কাছে এটা ঠিক তার দাবি নয়। এটা ঈশ্বরেরই অনন্ত করুণাশীলতা।

গ্রামটা আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। লোকেরা প্রতিদিনই ঘুমের ভেতর তুরস্কদের বলবান ঘোড়াদের খুরধ্বনি শোনে। এবং গ্রাম ছেড়ে পালায়। ফলে বাজারঘাট আর আগের মতো বসে না। খাবারদাবারের মজুত যুবকটির বাড়িতেও শেষ হয়ে

এসেছে। খাবার জোগাড় করতে ইদানীং তাকে যেতে হয় কয়েক ক্রোশ হেঁটে, এক গহন জঙ্গল ভেদ করে, অন্য এক লোকালয়ে। নিজেদের ভয়ংকর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সেখানকার লোকেরাও সহজে আর খাবার বিক্রি করতে চায় না। যুবকটি তাতে রাগ করে না। তাদের অসুবিধে সে বোঝে।

একদিন খাবার কিনতে তাকে আরো বহুদূর যেতে হল। খাবারের সঙ্গে তাকে জোগাড় করতে হবে তার পীড়িত ছোট মেয়ের জন্য এক বৈদ্যের কাছ থেকে কিছু ওষুধও। খাবার সে পায়নি, তবে ওষুধ জোগাড় করে বাড়ির দিকে রওনা দিতে তার একটু রাত হয়ে গেল। এর আগে সে রোজ দিনের আলো থাকতেই ফিরে এসেছে। আকাশে শরতের ভিজে পূর্ণিমা। চাঁদের আলোর দিকে মুখ করে বাংলার প্রাচীন পাখিদের কেউ কেউ ডাকছে। খবর এসেছে যে তুরস্করা প্রায় বাংলার সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে। পালাবার আগে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা এখন নিজেদের ভেতরই লুঠপাট শুরু করেছে। ঘন, নিঃশব্দ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিরীহ, কল্পনাপ্রবণ যুবকটি নিজেকে কালো রেশমি কাপড়ে মুখ ঢাকা অশ্বারোহী তুরস্কদের সামনে নতজানু হয়ে প্রেমভিক্ষা করতে দেখল। ওষুধ হিসেবে পাওয়া গাছগাছালির মূল ও শেকড়গুলো নিজের কোমরের ধুতির সঙ্গে ভালো করে জড়াল। এখনো অনেকটা পথ তাকে হাঁটতে হবে। একবার অনতিস্পষ্ট কোনো আতঙ্কে তার মাথার ভেতরটা হঠাৎ অবশ হয়ে গেল। সে ঈশ্বরকে স্মরণ করে শান্ত হবার চেষ্টা করল।

দুই

যুবকটির জন্য বিচলিত হলেও আমি যে অসহায়, ঈশ্বর ভাবলেন। আমার প্রতি তার প্রেম ও আস্থাকে আমি সন্দেহ করি না কিন্তু আমি নিজেই যে নিজের নিয়মে বন্দি। প্রতিটি জীবনকেই আমি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকার, ইচ্ছেমতো শুভ বা অশুভ বেছে নেবার। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মালিক বলেই আমার নিয়মের কাছে পরাধীন থাকার সিদ্ধান্ত আমি ইচ্ছে করে নিয়েছি, যাতে আমার লীলাবিলাস উপভোগ করতে পারি। আমার সৃষ্ট প্রাণীরা কখন কেমন আচরণ করে তা আমি আগে থেকে নিজেই জানি না বলেই লীলাটা এত উপভোগ্য আমার কাছে। আমার এই অজ্ঞতাও আমার সার্বভৌম ক্ষমতারই অন্তর্গত। অর্থাৎ আমি সর্বশক্তিমান বলেই ইচ্ছে করে অজ্ঞ থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব।

আমি জানি না তুরস্করা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ আক্রমণ করবে কিনা। করলে এই ব্রাহ্মণ যুবকটির পরিবারও আক্রান্ত হবে কিনা।

তিন

এখনো অনেক পথ বাকি ভেবে যুবকটি শঙ্কিত হচ্ছিল। সে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে খেত ও ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে, ওগুলো পার হলেই আসবে জঙ্গল, যা গভীর হলেও তার চেনা। তাছাড়া চাঁদের রৌদ্রোজ্জ্বল আলো থাকার জন্য জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে তার বিশেষ অসুবিধে হবার কথা নয়। অকারণেই ভয় পেয়ে সে একবার পেছন ফিরে তাকাল। পেছনে ছিল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধু-ধু মাঠ, যা ফুঁড়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে নারকোল ও তাল গাছের সারি। নিজের ভীতিতে সে নিজেই হাসল, তারপর মনকে বোঝাল যে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, সে তো সজ্ঞানে কারও কোনো ক্ষতি করেনি, তাই ঈশ্বরও তার ক্ষতি কখনো হতে দেবেন না। তার সঙ্গে আছে ওষুধ, তার পীড়িত

পড়া একখণ্ড চাঁদের আলোর দিকে অথচ কিছুই আর দেখতে পায় না।

ব্রাহ্মণ যুবকটি অবশ্য সিংহী বা ডোম কারও খবর জানত না। ঘটনা সে জানতে পারে, যখন মৃত সিংহীটার পেটে দা-এর আঘাত করতে করতে রক্ত মাখা ডোমটা হঠাৎ উল্লসিত চিৎকার শুরু করে। হাঁটা থামিয়ে যুবকটি পেছন ফিরে কয়েক পা এগিয়ে যায়। ডোমটাকে সে চিনতে পারে। ডোমটাও তাকে চিনতে পারে। যুবকটিকে দেখে সে নিজের উল্লাস বন্ধ করে, তারপর তার মুখের দিকে এমন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেন সিংহীটাকে মেরে সে ভুল করেছে, কারণ তার আসল শত্রু তো এই যুবকটিই।

যুবকটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ডোমটার হঠাৎ মনে পড়তে থাকে যে ব্রাহ্মণেরা চিরকাল তাদের ঘৃণা করে এসেছে। তার মনে পড়তে থাকে যে এর আগে সে কখনোই কোনো ব্রাহ্মণের চোখে চোখ রেখে এভাবে তাকাতে সাহসই পায়নি। উত্তেজিত, নেশাগ্রস্ত ডোমটার কেমন মজা লাগছিল। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

আট

হযতো এই ডোমটাই এবার খুন করবে যুবকটিকে, ঈশ্বর ভাবলেন। যুবকটিও হয়তো তা বুঝতে পেরেছে। ভয়ার্ত হাসি মুখে ফুটিয়ে সে ডোমটার দিকে তাকিয়ে আছে, স্পষ্টতই মনে মনে প্রাণভিক্ষা করছে এবং মনে মনে আমার কাছেও প্রার্থনা করে চলেছে। এটা তো ঠিক যে ব্রাহ্মণ ও ডোমদের কখনোই সদ্ভাব হয়নি, যদিও এই যুবকটি নিজে অবশ্য কোনো মানুষকেই বিশেষ ঘৃণা করে না। কিন্তু ডোমটা হয়তো ভাবছে যে সে না করলেও তার বাবা তাদের ঘৃণা করে, তার পরিবারের অন্যেরা ঘৃণা করে, তার সম্প্রদায়ের অন্যেরা ঘৃণা করে। ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছাড়া কলহ রচনা হয় না আর কলহ না হলে লীলার নাটক জমে না। নাটকের স্বার্থেই আমি মানুষের ভেতর ঘৃণা বা বিদ্বেষের অনুভব সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছি যে মানুষের ভেতর এই অনুভবটা দেওয়া হয়তো ভুলই হয়েছে, কারণ এটার অগ্নিস্রাবে সে শুধু অপরকেই দিনরাত পোড়াচ্ছে না, নিজেকেও অবিরাম পোড়ায়। নিজেকেও ঘৃণা করে না এমন মানুষ দুর্লভ।

আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, এই যুবকটির ভেতর ঘৃণা বা বিদ্বেষের অনুভব কম। নিজেকে নিয়ে সে কোথাও তৃপ্ত, ফলে জগৎকে নিয়েও। কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে হয়ে চলা ঘৃণা ও বিদ্বেষের স্মৃতিগুলো ডোমটা ভুলবে কী করে? তার রক্তচক্ষুতে যে স্পৃহা এই মুহূর্তে চাঁদের আলোতেও থরথর করে কাঁপছে তা সম্ভবত এটাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে পারলে যুবকটিকে সে ভস্ম করে দেয়। পরবর্তীকালে আমার এটাও মনে হয়েছে যে মানুষের ভেতর এত কর্ম, বর্ণ, আকৃতি ও ভাষা তৈরি হবার সম্ভাবনা রাখা আমার উচিত হয়নি। বৈচিত্র্যের এত প্রাচুর্য মানুষ সহ্য করতে পারেনি, যা আমার অফুরন্ত সৃজনশীলতার পক্ষে একটা দুঃখজনক ঘটনা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের চেয়ে মানুষ বৈচিত্র্যহীন ঐক্যটাই বেশি সহজে বোঝে।

নয়

তুরস্কদের ভয়ে আরো অনেকে এই চন্দ্রালোকিত জঙ্গলে পালিয়ে এসেছিল। বিশেষ করে সেইসব স্বাধীন পুরুষেরা, পরিবারের শিকড় যাদের জীবনে গভীর নয়। এদের কারও কারও স্ত্রী মারা গিয়েছে, কেউ কেউ নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসে না। চন্দ্রভানু

নামে যে মধ্যবয়সী ব্যক্তিটি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কখনোই বিয়ে করেনি, যদিও স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা কারও চেয়ে কম নয়। শঠ, ধূর্ত, নিষ্ঠুর প্রকৃতির এই লোকটাকে গ্রামের মেয়েরা যেমন এড়িয়ে চলে তেমনি মনে মনে ভালোওবাসে। তার জালে কিছুক্ষণ ধরা পড়ার গোপন আকাঙ্ক্ষা তারা দমন করতে পারে না। এই লোকটার সবচেয়ে বড় দুঃখ যে ব্রাহ্মণ যুবকটির স্ত্রীর অপ্রাকৃত শরীরটায় হাত দিলে কেমন লাগে সে অভিজ্ঞতা তার হয়নি। তবে সুযোগ পেলে যে চন্দ্রভানু তরুণী বউটিকে ছিঁড়ে খাবে তা সবাই না জানলেও এ অঞ্চলের গণিকারা অন্তত জানত। তরুণী বউটির রূপের প্রশংসা গণিকাদেরও সহ্য হত না। ডোম না হলেও চন্দ্রভানু অস্ত্রচালনায় ডোমদের মতোই পারদর্শী। এবং আরো একটা বাড়তি জিনিস তার আছে, যা ডোমদের নেই। সেটা হল ছল, চাতুরি ও বুদ্ধি। ঠিক এই কারণে গ্রামের লোকেরা তাকে অন্ধকারে ওত পেতে থাকে সাপের চেয়েও বেশি ভয় পায়।

চন্দ্রভানুর কাপড়ে রক্তের দাগ, চাঁদের আলোয় যা কোনো গভীর কালো গর্তের মতো দেখাচ্ছিল। তার এক হাতে তিরধনুক, অন্য হাতে তিন-চারটে ধারালো অস্ত্র। একটু আগে সে ছ-জন মানুষকে হত্যা করে এসেছে। কিন্তু তার হাবভাবে সেটা বোঝার উপায় নেই।

হঠাৎ তার চোখে পড়ে যে ডোমটা ব্রাহ্মণ যুবকটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এটা বুঝে নিতে তার দেরি হয় না যে ডোমটা এক্ষুণি যুবকটিকে মেরে ফেলবে। একবার তার মনে হল যে যুবকটিকে মেরে ফেলাই উচিত। কিন্তু পর মুহূর্তে সে ভাবল যে যুবকটিকে একটা কথা বলা দরকার, যা তার শঠতাময় জীবনকে একটু গৌরবান্বিত করবে। এটা ভেবে সে ধনুকের ছিলায় তির বসাল, তারপর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে ডোমটার বুক বিদ্ধ করল।

দশ

যুবকটি আবার বেঁচে গেল, ঈশ্বর ভাবছিলেন, এবং এ ব্যাপারে আমার যে কোনো ভূমিকা ছিল না তা সে না জানলেও আমি তো জানি। সে কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবছে যে আমিই তার প্রাণ বাঁচিয়েছি।

তির দিয়ে ডোমকে বিদ্ধ করে এই লোকটা যে যুবকটিকে কেন বাঁচাল আমি বুঝতে পারছি না। আমার বিধান অনুযায়ী সংসারে নানা দুঃখজনক বা আনন্দদায়ক নাটক ঘটে চলেছে। কিন্তু মঞ্চের নাটকের ক্ষেত্রে যেমন দর্শক জানে না পরবর্তী দৃশ্যে কী ঘটবে এবং জানে না বলেই নাটক দেখতে আনন্দ পায়, আমার অবস্থাও সেরকম। আশ্চর্য লাগলেও এটা সত্য যে আমারই সৃষ্ট জীবেরা প্রতি মুহূর্তে অজস্র কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে, অথচ সেগুলো সম্পর্কে আমি এত কম জানি। এটা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে মানুষের জীবন সম্পর্কে আমার চেয়ে মানুষই বেশি জানে।

এগার

যুবকটিকে একটা কথা বলা খুবই দরকার চন্দ্রভানুর। ডোমটাকে মেরে সে অবিকল শৃগালের মতো হাসল, তারপর বাঁকা, তীক্ষ্ণ চোখের ভেতর দিয়ে যুবকটির দিকে তাকাল। যুবকটির কোথাও কষ্ট হচ্ছিল। সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল চিৎ হয়ে পড়ে থাকা ডোমটার দিকে, তীব্র বিষের স্পর্শে যার পাদুটো একটু আগেও জলের শিরার মতো নড়ছিল। অন্যের মৃত্যুর বিনিময়ে জীবন লাভ করার ভেতর যে একটা কষ্ট,

একটা লজ্জা, একটা দংশন মনের ভেতর পুঞ্জীভূত হতে থাকে এটা সে জীবনে প্রথম অনুভব করল। তার মনে হতে লাগল এরপর থেকে ডোমটার স্মৃতি তার মাথায় সারাজীবন অঙ্গারের মতো জ্বলতে থাকবে।

'তোমাকে একটা কথা বলা দরকার।' চন্দ্রভানু তার হাসি পালটে যুবকটিকে বলে।

কিছু না বলে যুবকটি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দ্রভানুকে সে চেনে। অন্য অনেকের মতো সেও এই লোকটাকে এড়িয়ে চলত, তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেত। সে ভাবল, তার জীবন রক্ষা করার জন্য চন্দ্রভানু হয়তো এমন কিছু দাবি করবে যা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে নিজের বাড়িতে হাঁড়ির ভেতর গচ্ছিত সমস্ত রৌপ্যমুদ্রার কথা ভাবছিল, যা পেলে চন্দ্রভানু হয়তো সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু এরপর বেঁচে থেকে সে নিজে কিসে সন্তোষলাভ করবে?

'বরং বলা উচিত, তোমার একটা কথা জানা দরকার।' চন্দ্রভানু রহস্য করে হাসল।

যুবকটি আগের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ জঙ্গলটার ঝরা পাতায় তোলপাড় করা শব্দ তুলে তাদের কাছে যে হাজির হল তাকে সবাই ভীম কৈবর্ত বলে জানে। তুরস্কদের ভয়ে সেও জঙ্গলে পালিয়ে এসেছে। তার হাতেও তিরধনুক ও অস্ত্র। এই সরল অথচ রাগী লোকটাকে গ্রামের সবাই সমীহ করে। এবং সবাই জানে, যুবকটির স্ত্রী যে জলকন্যাই, এটা সে-ই প্রথম ঘোষণা করে গ্রামের সকলের কাছে। এটাও কারো কাছে অজানা নয় যে মেয়েটির মুখ প্রথম যেদিন দেখে সেদিন সত্যি সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। প্রায় অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় এই জঙ্গলটাতেই সেদিন পালিয়ে এসেছিল, তারপর একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদার পর সুস্থ হয়েছিল। তারপর থেকে ব্রাহ্মণ যুবকটির স্ত্রীর মুখটার দিকে সে আর কখনোই তাকায়নি। তাকাতে ভয় পায়। যেন ওটা তার কাছে এমন কোনো জ্বলন্ত সুখস্বপ্ন, যা ছুঁলে হাতে তীব্র ছ্যাঁকা খাবে। তবে, সে অন্যদের মাঝেমাঝে জানায়, মেয়েটিকে যদি চিরদিনের মতো পাওয়া যেত তবে তার মুখের দিকে তাকাতে তার হয়তো এত ভয় করত না।

চন্দ্রভানুর সঙ্গে যুবকটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে অবাক। চন্দ্রভানুর নারীলিপ্সা সে জানে। সে ভাবল, ব্রাহ্মণ যুবকটিকে চন্দ্রভানু হয়তো এমন কোনো বেকায়দায় ফেলেছে যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব একমাত্র তার স্ত্রীকেই পণ হিসেবে রেখে। সে ঠিক করল যাকে সে অন্তত মনে মনে ভালোবাসে, চন্দ্রভানুর মতো নারীপিশাচের হাত থেকে তাকে সে রক্ষা করবেই।

'একাই পালিয়ে এলে? পরিবারকে সঙ্গে নাওনি?' ভীম কৈবর্ত যুবকটিকে ভর্ৎসনার স্বরে প্রশ্ন করে।

যুবকটি সমস্ত ঘটনা জানায়। এবং সব শেষে মন্তব্য করে যে পালানোর কোনো দরকার নেই, ঈশ্বর তার পরিবারকে রক্ষা করবেন।

এক মুহূর্তের জন্য ভীম কৈবর্তরও বিশ্বাসযোগ্য মনে হল কথাটা।

'তাহলে চলো, আমিও সঙ্গে যাই।' যুবকটিকে সে বলে। তারপর চন্দ্রভানুর দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'তুই এর সঙ্গে কী করছিস?'

'ওকে একটা কথা জানানো দরকার।'

'ভাগ! তোর কোনো কথাই সে শুনবে না। চলে যা!'

ভীম কৈবর্তকে চন্দ্রভানুও ভয পায। সে হাসল। তাবপব জঙ্গলে স্থিব হযে থাকা আলোছাযায অদৃশ্য হযে গেল। যুবকটিকে যা বলাব ছিল তা বলতে না পেবে তাব খুব হতাশ লাগছিল।

বার

চন্দ্রভানু যুবকটিকে কী বলতে চেযেছিল আমাব জানা হল না, ঈশ্বব ভাবছিলেন। এবা দুজনে আবাব লোকালযে ফিবে যাবাব জন্য পা বাডিযেছে অথচ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে তুবস্কদেব ধাবালো তববাবিগুলো চাঁদেব আলোয উডন্ত মাছেদেব মতো ঝলসে উঠছে। এব মধ্যেই প্রচুব নবনাবী হত্যা কবেছে তাবা। শুধু তাবাই নয, তাদেব বলবান, দুবন্ত ঘোডাবাও খুবেব নিচে পিযে মাবছে ছোট ছোট শিশুদেব। এটা স্পষ্ট যে শুধু লুণ্ঠনই এই বিদেশিদেব একমাত্র উদ্দেশ্য নয, এই অঞ্চলে নিজেদেব ধর্ম প্রতিষ্ঠা কবাও তাদেব অন্যতম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমাকে সামনে বেখেই তাবা এই অত্যাচাব চালাচ্ছে, অথচ এব দবকাব ছিল না, কাবণ এখানকাব লোকেবা তো আমাকে বিশ্বাস কবেই। অবশ্য না বিশ্বাস কবলেও আমি রুষ্ট হই না, কাবণ মানুষকে যে অজস্র স্বাধীনতা আমি দান কবেছি তাব ভেতব আমাকে অবিশ্বাস কবাব স্বাধীনতাটাও আছে। যে আমাকে স্বীকাব কবে না, অনেক সময তাব সঙ্গে খেলতেই আমি বেশি আনন্দ পাই। কাবণ নাটকটা তো তাব সঙ্গেই ভালো জমে। নাটকেব স্বার্থেই আমি মানুষেব স্বভাবে নাস্তিকতাব সম্ভাবনা সৃষ্টি কবেছি।

কিন্তু নাটকেব এই তৃষ্ণা বহুকাল হল আমাকে পীডা দিচ্ছে। শুভ ও অশুভেব সম্ভাবনা নিযে বচিত মানুষেব নানা নাটক উপভোগ কবব, আবাব এটাও চাইব যে মানুষ অশুভ ত্যাগ কবে আমাব কাছে ফিবে আসুক, সত্যেব মুখ দেখুক আমাব সৃষ্টিবিধানেব মূলে এই যে বিবোধাভাসটা আছে, সেটা আজকাল আমাকে কষ্ট দেয। জগৎ জুডে এত বক্তেব উল্লাস ও হত্যাব ক্রন্দনধ্বনি শুনে মাঝেমাঝে মনে হয যে মানুষকে এত স্বাধীনতা দেওযা আমাব উচিত হযনি।

তের

এটা কাবো পক্ষেই ভাবা সম্ভব হযনি যে অদৃশ্য চন্দ্রভানু হঠাৎ ছুটে এসে ভীম কৈবর্তকে আক্রমণ কবে বসবে।

যুবকটিকে সঙ্গে নিযে ভীম কৈবর্ত লোকালযেব দিকে সাবধানে হাঁটছিল। জঙ্গলেব সীমানা তখনো তাবা পাব কবতে পাবেনি। ভীম কৈবর্ত মনে মনে স্থিব সঙ্কল্প কবেছিল যে যেভাবেই হোক, যুবকটিব পবিবাবকে তুবস্কদেব হাত থেকে বক্ষা কবতেই হবে। এটা কবতে গিযে যুবকটিব স্ত্রীব অপ্রাকৃত মুখটা আবাব দেখে তাব মাথা বিগডানোব সম্ভাবনা আছে, এ সম্পর্কেও সে ভাবছিল। কিন্তু তেমন হলে তাব যে ঠিক কী কবা উচিত সে বুঝতে পাবছিল না। সে চোখ বুজে তাকে বক্ষা কবাব কোনো দুবূহ পবিকল্পনাব কথা ভাবাব চেষ্টা কবছিল।

ঠিক তখনই চন্দ্রভানুব বিষাক্ত তিব পেছন থেকে এসে তাকে বিদ্ধ কবে। আহত হযে সে চিৎকাব কবতে কবতে মাটিতে শুযে পডল, নিজেব একটা ধাবালো অস্ত্র মুঠোয পাকিযে ওঠাব চেষ্টা কবল, কিন্তু তিবটাব তীব্র বিষক্রিযায ধীবে ধীবে শিথিল হযে গেল তাব মুঠো এবং স্তব্ধ হযে গেল তাব কণ্ঠস্বব।

'কথাটা তোমাকে জানানো হযনি।' হাসিতে মুখ ভবিযে চন্দ্রভানু যুবকটিকে

বলল। 'তাই আবার ফিরে এলাম।'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে যুবকটি তাকিয়ে থাকে বক্তার দিকে, তারপর চোখ নামিয়ে নেয়। তার নিজেরও আর বাঁচতে ইচ্ছে করছিল না।

'এখানে পালিয়ে আসার আগে আমি তোমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছি। ধর্ষণটা যাতে বিনা বাধায় করতে পারি সেজন্য আগে তোমার বাবা-মা ও ছেলেমেয়েদের খুন করলাম। এবং ধর্ষণ করার পর খুন কবলাম তোমার স্ত্রীকেও। যা তোমাকে এতক্ষণ ধরে জানাতে চাইছিলাম সেটা হল, তোমার স্ত্রীকে স্পর্শ করে আমি এমন কিছু করতে সফল হয়েছি, যা গ্রামের সব পুরুষই করতে চেয়েছিল অথচ কেউই পারেনি।'

জঙ্গলের ভেতর হঠাৎ চিৎকার ও শোরগোল শোনা যেতে লাগল। এবং ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল অশ্বক্ষুরধ্বনি। তুরস্করা সম্ভবত এবার জঙ্গলের ভেতব এগিয়ে আসছে।

'ভেবো না, এরকম আঘাত বহন করে বেঁচে থাকার কষ্টটা আমি তোমাকে পেতে দেব না।' পালবার আগে চন্দ্রভানু তাড়াতাড়ি বলল যুবকটিকে। 'আমি তোমাকে দয়া করব। তোমাকে মুক্তি দেব।'

নিজের একটা ধারালো অস্ত্র চন্দ্রভানু যুবকটির গলার কাছে উঁচিয়ে ধরতেই যুবকটি ম্লান হাসল। কিংবা ম্লান হাসার চেষ্টা করল। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল, 'আমি তোমাকে ত্যাগ করিনি, ঈশ্বর!'

চৌদ্দ

'আমিও না!' ম্লান হেসে ঈশ্বর বললেন। নিজেকেই। এবং কথাটা বলার সময় ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর যেন যুবকটির কণ্ঠস্বরের চেয়েও বেশি কেঁপে উঠল।
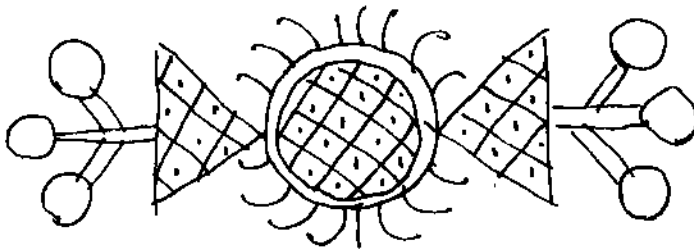
কামাদি কুসুম সকলে ॥ হর্ষ দত্ত

কৃষ্ণকামিনী মরিতেছে।

সীমন্তে সিঁদুর লইয়া তাহার মরিবার সাধ ছিল। সে আহ্লাদ পূর্ণ হইতেছে না। স্বামী বিনোদচন্দ্র পূর্বেই গত হইয়াছেন। বৎসরের হিসাবে তাহা অনেক দিনের কথা। কৃষ্ণকামিনীর শিয়রে বিনোদচন্দ্রের যে ছবিখানি দৃশ্যপটের ন্যায় রাখা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়, ছবিটি নিতান্তই পুরাতন। কাচের উপর ধোঁয়ার মালিন্য স্পর্শ করিয়াছে, ঊর্ণনাভ-তন্তুর সবিশেষ চিহ্ন বর্তমান এবং একটি অথবা দুইটি চন্দনের ফোঁটা বিনোদচন্দ্রের ললাটে প্রতীয়মান।

পুরাকালিক বোম্বাই খাট নামক সুবিশাল পালঙ্কে কৃষ্ণকামিনী বেঘোরে পড়িয়া আছে। পদদ্বয় যথেষ্ট ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি পূর্ণরূপে মুদ্রিত হয় নাই। তাহার বাম হস্তটি কনিষ্ঠা কন্যার করতলগত। কন্যা নীরবে অশ্রু ফেলিতেছে ও হস্তমথিত করিতেছে। কৃষ্ণকামিনীর বাম হস্তটি বড়ই মূল্যবান। তিনখানি সোনার চুড়িতে মৃতপ্রায় হস্তটির শোভা এখনও পর্যন্ত কিছুমাত্র কমে নাই। দক্ষিণ হস্তটি সেই তুলনায় আপাতত বড়ই নগণ্যবৎ শয্যার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। সামান্য এই হস্তটি, স্যালাইন ওয়াটার শরীরে প্রবেশ করাইবার দ্বার হিসাবে পূর্বে ব্যবহৃত হইতেছিল। এই হস্তে স্বর্ণনির্মিত যে রুলি দুইখানি ছিল তাহা কৃষ্ণকামিনীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনীতার শক্ত মুঠিতে ধরা রহিয়াছে। মধ্যমা কন্যা নবনীতা আড়চোখে দিদি ও ভগিনী পরিণীতার উপস্থিতবুদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। এমতাবস্থায় পড়শিরা তাহাকে দেখিয়া অবশ্যই ভাবিতেছে, আহা, কন্যা মাতৃশোকে বড় অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষের জল পর্যন্ত ফেলিতে পারিতেছে না।

কৃষ্ণকামিনী বিগত প্রায় একশ' দিন ধরিয়া শেষ শয্যা নিয়াছে। স্নান করিতে গিয়া কলঘরে পতন ও তাহা হইতে পক্ষাঘাতের উৎপত্তি। বিনোদচন্দ্রের বড় সাধের এই সুবৃহৎ গৃহের দ্বিতলে কৃষ্ণকামিনী ও তাহার কাজের মেয়ে চঞ্চলা বস্তুত একাই থাকিত। একতলায় তাহার নকুল নামীয় স্কুল-শিক্ষক চতুর্থ পুত্রের বসবাস। কৃষ্ণকামিনীর পঞ্চপুত্রের মধ্যে নকুলের অবস্থাই কিঞ্চিৎ দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত। তাহার অর্থ-ভাণ্ডারের অবস্থা—পূর্ণ হইতে পূর্ণ চলিয়া গেলে যাহা থাকে, তেমনিই। অন্যান্য ভ্রাতৃগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সে এখনও পর্যন্ত নিউ আলিপুর, লেকটাউন অথবা লবণহ্রদে নিজ গৃহ নির্মাণ করিয়া তথা পৈতৃক ভিটার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক চলিয়া যাইতে পারে নাই। যদিও নিয়ত স্বপ্ন দেখিতেছে। নকুল, নকুলের স্ত্রী শমিতা ও তাহাদের একমাত্র কন্যা-সন্তান সেঁজুতি নিকটে ছিল বলিয়া বুড়ি শয্যা ও সেবালাভের প্রাথমিকপর্বটুকু লাভ করিতে পারিয়াছিল। ইহারা না থাকিলে কৃষ্ণকামিনী কলঘরে মরিয়া পড়িয়া থাকিত বলিয়া অন্যান্য ভ্রাতারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল। বড়দাদা যুধিষ্ঠির প্রকাশ্যেই বলিয়াছে, নান্টু না থাকলে কী যে হত! ভাগ্যিস মায়ের কাছাকাছি

তুই আছিস! নকুলের স্ত্রী উক্ত প্রসংশাবাক্যটিকে নিংড়াইয়া যাহা বাহির করিয়াছিল তাহার সারমর্ম এই—তুমি যে এখনও এ বাড়ি ছাড়তে পারনি, সে কথাটাই বটঠাকুর ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে। তুমি তো হদ্দবুদ্ধু, তাই বুঝতে পারনি। নকুল এতদূর ভাবিয়া দেখে নাই! নকুলের রাগ হইয়া গিয়াছিল---দাদার উপরে নহে, অসুস্থা কৃষ্ণকামিনীর উপর। আর একটি ভয় তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মাতৃদেবীর অঞ্চলচ্ছায়ে থাকিয়া তাহার গৃহ সমস্যার সুরাহা হইতেছিল। বুড়ি চোখ বুজিলেই এই দ্বিতল বাড়িখানিতে তাহার আর কোনো অধিকার থাকিবে না। ভাগাভাগির কথা অচিরাৎ আসিয়া পড়িবে। উইল অনুযায়ী তাহার ভাগে দুইখানি ঘর ও বারান্দার অংশবিশেষ পড়িবে মাত্র। সেদিন আসিতে আর দেরি নাই। নকুলকে এই মুহূর্তে শয্যা-পার্শ্বে দেখা যাইতেছে না। আসন্ন গৃহচ্যুতির বেদনাকে ভুলিতে সে ভ্রাতাদের কাছ হইতে টাকা তুলিয়া শ্মশানযাত্রার আয়োজন করিতেছে।

বিনোদচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে বহুসন্তানবতী করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। তিনি চাহিতেন, তাঁহার সংসার পুত্র-কন্যায় ভরিয়া উঠুক ; খাইবার অর্থের যখন অভাব নাই, তখন পুত্র-কন্যাদের লইয়াই পঙক্তি-ভোজনের সমারোহ হউক। কৃষ্ণকামিনী স্বামীর এই উৎকট স্বপ্ন সফল করিবার জন্য সপ্তদশ বৎসরে প্রথম সন্তানের মা হইয়াছিল এবং বত্রিশ বৎসরে অষ্টম তথা শেষ সন্তানের জন্মদান সুসম্পন্ন করিয়াছিল। সর্বশেষটি জন্মিবার পর বিনোদচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে মাঝখানে বসাইয়া পুত্রকন্যাদের সহিত ছবি তুলাইয়াছিলেন। তাহার পর ছবিটির তলায় অতি পরিচিত একটি গানের কলি লিখিয়া দিয়াছিলেন---'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা'। সে ছবি আজ হারাইয়া গিয়াছে।

প্রথম দানে পুত্র। পূর্বাপর কিছু না ভাবিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছিল যুধিষ্ঠির। দ্বিতীয়বারেও যখন পুত্র হইল, তখন ছন্দ মিলাইয়া সেটির নাম রাখা হইল ভীমদেব। ভীমদেবের জন্মের সময় কৃষ্ণকামিনীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। বৃহদাকার শিশুটি যখন তাহার নাড়ি ছিঁড়িয়া ভূমিষ্ঠ হইল, তখন কৃষ্ণকামিনীর বাঁচিবার আশা বিনোদচন্দ্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশ্য সে যাত্রা কৃষ্ণকামিনী অদৃশ্য দৈব-আশীর্বাদে বাঁচিয়া গেল। ভীম তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল বলিয়া কৃষ্ণকামিনী এই পুত্রটিকে একটু ভিন্ন চোখে দেখিত। ইহাকে অধিক স্নেহ দান করিত তাহাও নহে, ভীমদেব সম্পর্কে তাহার একটি গোপন ভীতি ছিল। মৃত্যুর দ্বার হইতে তাহাকে যে ঘুরাইয়া আনিয়াছে, তাহার শক্তি উপেক্ষা করিবার নহে। ভীমদেব বড় হইয়াও ইহা বুঝিতে পারে নাই। কেবল তাহার আশ্চর্য লাগিয়াছিল, মা তাহার বিবাহ দিবার জন্য জোরাজুরি করে নাই। একবারই মাত্র সে বলিয়াছিল, বিয়ে আমি করব না মা। কৃষ্ণকামিনী পুনরায় বিবাহের কথা ভুলিয়াও তুলেন নাই। শুরুতেই এই নির্লিপ্ত যবনিকা পতনের ফলে ভীমদেবের আর বিবাহ হয় নাই। কৃষ্ণকামিনীর আজ মৃত্যু হইবেই---এমন সংবাদ পাইয়া ভীমদেব মাতাকে শেষবারের মতো জীবিতাবস্থায় দর্শন করিবার জন্য আসিয়া জুটিয়াছে। ইহাতে তাহার কাজের অবশ্যই ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বি ডি মুখার্জি নামে তাহার যে খ্যাতি, তাহা অদ্য কৃষ্ণকামিনীর শেষ যাত্রা উপলক্ষে ব্যাহত ও ধূসরিত হইতেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গতরাত্রে অকস্মাৎ কৃষ্ণকামিনী যখন যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময় তৃতীয় পুত্র অর্জুনকুমার ভীমদেবকে ফোন করিয়াছিল। ভীমদেবকে নিশ্চিত ও অবধারিতভাবে পাওয়া যায় নাই। তাহার সাদার্ন অ্যাভিন্যু-এর ফ্ল্যাটে ফোন ধরিয়াছিলেন কোনো এক অজানা মিস গীতালি, যিনি পুরা সেপ্টেম্বর মাসটি ভীমদেবের সহিত গভরনেস ও শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে দিবারাত্র থাকিতে

চুক্তিবদ্ধ। প্রবল মদ্যপানের ঘোরে মহিলা ইংরাজি-বাংলা মিশাইয়া এমত আত্মপরিচয় দিয়াছিল এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আগামী সকালেই ডাঃ মুখার্জিকে পাঠাইয়া দিবেন। মা মরিতেছে বলিয়া কথা! ভীমদেব বেলা আট ঘটিকা নাগাদ নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন মুখে নিয়া আসিয়াছে। এবং কৃষ্ণকামিনীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নাই। তাহাকে দেখা যাইতেছে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেবের সহিত কথা বলিতে। অলিন্দে দাঁড়াইয়া।

বাঙ্গালোর তোর কেমন লাগছে?

খারাপ না মেজদা। ভালোই। তবে খাওয়ার খুব কষ্ট।

ডোন্ট ফরগেট, কষ্ট না করলে—আই মিন কেষ্ট পাবি কি করে?

তা ঠিক। তবে হঠাৎ এইভাবে বদলি হয়ে যাব ভাবিনি। তুমি যদি একটু ঘোষরায়কে বলতে—

মিঃ ঘোষরায় মানে তোদের ঐ হামবাগ সেলস্ ম্যানেজার! নো ব্রাদার! তুই ভাবলি কী করে এ কথা! তুই কি জানিস না, ঐ লুম্পেনটা দু-পেটি রিয়েল ইটালিয়ান অলিভ অয়েল নিয়ে আমার সঙ্গে কি ব্যবহারটা করেছিল?

ভীষণ বাজে ব্যাপার—আমি জানি।

তবে। নো, নো, তুই আমাকে এমন রিকোয়েস্ট করতে পারিস না।

আচ্ছা, মাকে তোমার নার্সিংহোমে রাখলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি—

হয়তো, তবে আমি আনড্যান। নার্সিংহোমে কেউ জায়গা জুড়ে থাকবে—এমন জায়গা নেই। সবচেয়ে বড় কথা মাদার ইজ ডাইং। আউট অফ হ্যান্ড।

না, আমি বলছিলাম, ছোড়দার উপর দিয়ে তাহলে এত ধকল যেত না, তাছাড়া তুমিও মায়ের শুশ্রূষা করতে পারতে।

আঃ, একটা কথা তুই কিছুতেই বুঝছিস না যে, আমার তেমন সময়ও নেই অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু সে, আমার তেমন কারুকে মরতে দেবার জায়গাও নেই। ইজ্ নট্ ইট?

হ্যাঁ মানে—

নো, কোনো মানে নয়; অল থিঙ্গস্ আর ভেরি ক্লিয়ার। বাই দ্য বাই, তুই মায়ের ট্রিটমেন্টের জন্যে যে-সব ওষুধ ডোনেট করেছিস, সেগুলোর দাম আমার থেকে নিয়ে নিস। দ্যাট্ পুওর নান্টুর কাছ থেকে চাইবি না কিছু। দাদা আউট অব কোশ্চেন। অর্জুন দেবে কিনা জানি না। বাট আই উইল পে, ইয়েস আই হ্যাভ টু পে, রিমেমবার।

বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও, সহদেবের অন্তরাত্মা ভীমদেবের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাহার এই দাদাটি কাহাকেও আপন জ্ঞান করে না। সহদেব জ্ঞানপ্রাপ্তির সময় হইতে দেখিয়া আসিতেছে, ভীমদেব অন্যান্য ভ্রাতা-ভগিনী হইতে স্বতন্ত্র। প্রবল মেধাকে সম্বল করিয়া স্বকীয়ভাবে বড় হইয়াছে। চিকিৎসক হিসাবে আজ অর্থ ও খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহদেব বাল্যকালে ভীমদেবকে অনুসরণ করিয়া চলিত। কিন্তু কৈশোর ও প্রাক্-যৌবনে আসিয়া সে অনুভব করিয়াছিল, মধ্যম ভ্রাতা তাহাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনিতে চাহে না। বরং কৃপা প্রদর্শন করে।

সহদেব জীবনের সোপান অতিক্রম করিয়া আজ যে-স্থানে উঠিয়াছে, তাহার পিছনে ভীমদেবের কিছুমাত্র ভূমিকা নাই, তাহা বলিলে ভুল হইবে। সহদেব সে-কথা প্রকাশ্যে অস্বীকার করিলেও, মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সহদেব একবার স্ত্রীকে বলিয়াছিল, মেজদার মতো ডাক্তার কলকাতায় খুব কম আছে। জয়া বিন্দুমাত্র সময় না দিয়া মুখের উপর উত্তর দিয়াছিল, তোমার মতো ওষুধ-বিক্রি-করা লোকেরাই সে কথা ভালো বলতে পারবে। সহদেব স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ

শব্দদ্বয়েব এতদ্দৃশ অনুবাদ তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সেদিন হইতে সহদেব এই ধারণা পোষণ করে—ভীমদেবের জন্যই তাহার কিছু হইল না। মানুষটি এই মুহূর্তেও তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করিতেছে। তাহার ইচ্ছা হইল ভ্রাতাকে কঠোর ভাষায় বলে, তোমার টাকায় আমি ইয়ে করি...। সহদেব পারিল না। তাহার অপ্রকাশ্য ক্রোধ নিষ্ফল অস্ত্রের ন্যায় তাহাকেই বিদ্ধ করিতে লাগিল। সহদেব মাতার শায়িত ও নিঃস্পন্দ দেহখানির দিকে ফিরিয়া বিমূঢ় হইয়া রহিল।

যুধিষ্ঠির বারংবার কৃষ্ণকামিনীর কপালে হাত দিয়া জীবনের উত্তাপ অনুভব করিতেছিল। পিতার মৃত্যুর দিন সে নিকটে থাকিতে পারে নাই। শ্বশ্রূমাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিলাসপুরে যাইতে হইয়াছিল। পিতা প্রায়শই পরমানন্দে বলিতেন যাহাকে তাহাকে, বড়খোকাব বৌ এনেছি বিলাসপুর থেকে। বৌমার অমন রূপের সন্ধান কসবা-ঢাকুরিয়া-বালিগঞ্জে গোয়েন্দা লাগালেও খুঁজে পাবে না। সেই বিলাসপুরই তাহার কাল হইল। মৃত্যুর সময় জ্যেষ্ঠপুত্রের হাত হইতে গঙ্গাজল পাইলেন না ; পুত্রমুখ সন্দর্শন বিনা তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তিই ঘটিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে একটি কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছে তাহার স্ত্রী কমলা। বিলাসপুরের কন্যার তনুলতায় সেই বহুকথিত লাবণ্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। কাল আদ্যন্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। নিয়তদৃশ্য বয়স্কা বঙ্গমহিলা বিনা তাহাকে আজকাল আর কিছুই মনে হয় না। পলিতকেশ একষষ্টি বৎসর বয়স্ক যুধিষ্ঠির কমলাকে এখনও সেই ষোড়শী সুন্দরী বলিয়া মনে করে। ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকেই দেখিতেছিল যুধিষ্ঠির অদ্যকার এই একাধারে দুর্বিষহ ও করুণাঘন আবহাওয়ার মধ্যেও স্ত্রীরত্নটিকে পার্শ্বে লইয়া বসিতে ভুলে নাই। চিরদিন সে যে-ভাবে এই ধনটিকে আগলাইয়া রাখিযাছে, আজও তাহার ব্যত্যয় হইতে দিতেছে না। কমলা যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু সেজ দেওরের অধ্যাপিকা-স্ত্রী তাহাকে মাঝে মাঝে বড় কঠিন দৃষ্টিতে লক্ষ করিতেছে দেখিয়া সুযোগ পাইতেছে না। অর্জুনের স্ত্রী রমা চোখের জল বুঝিতে পারিতেছিল না। সে কাল রাত হইতেই কৃষ্ণকামিনীর কাছে রহিয়াছে। রমার চক্ষু দুইটি রীতিমত রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দ্বিপ্রহরে যুধিষ্ঠির ও কমলা আসিবার পর তাহার কান্না পুরাপুরি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। কমলাকে সে চোখে চোখে রাখিয়াছে। কী মনে করিয়া রমা উঠিয়া গেল। তাহার অশ্রুসিক্ত রুমালখানি মেঝেতে সতরঞ্জির উপর পড়িয়া রহিল। রুমালটির দিকে একবার রোষপূর্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া কমলা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া চুপিচুপি যুধিষ্ঠিরকে বলিল, আমার কাঁকাল ব্যথা করছে। আর বসে থাকতে পারছি না!

সে কি, এই সময় উঠে যাবে। নিন্দে হবে যে—

হোক নিন্দে, আমি আর পারছি না। তোমার মা, তুমি বসে থাক। বুড়ি যাচ্ছেও না, নিস্তারও দিচ্ছে না। যতদিন কাছে ছিলাম জ্বালিয়েছে, মরণকালেও জ্বালাচ্ছে।

ছিঃ ছিঃ তুমি এমন কথা বলবে ভাবতে পারছি না।

ভাবাভাবির কী আছে? যা সত্যি, তাই বলছি।

আঃ চেঁচিও না, সবাই শুনতে পাবে।

আমি চেঁচিয়েছি! তুমি তো চেঁচাচ্ছ। মায়ের প্রতি দরদ দেখানোর জন্যে জোরে জোরে কথা বলতে চাইছ। আমি বুঝি না, আমাকে সবার সামনে ছোট করার চেষ্টা।

আজকের দিনেও তুমি মায়ের উপর এমন রেগে থাকবে! সব ভুলে যাও, এসো দুজনে মিলে মায়ের জন্যে একটু কাঁদি। মা শান্তিতে যেতে পারবেন

রমাদের মতো দেখন-কান্না কাঁদতে আমি পারি না। সে তুমি ভালোই জানো।

আর যার জন্যে কাঁদব তিনি কী আর...

কমলার কথা শেষ হয় নাই। রমা কাহাকে কী নির্দেশ দিয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল। কমলা চুপ করিয়া গেল এবং মুখে কাপড় চাপা দিয়া গুম মারিয়া বসিয়া রহিল।

কমলা নববধূটি হইয়া এই বাড়িতে প্রবেশ করিবার পরপরই কৃষ্ণকামিনী তিনজন ঝি-র মধ্যে একজনকে বলিয়াছিল, তোমাকে আর দরকার নেই মঙ্গলার মা। ছেলের বউ এনেছি, এখন থেকে সে-ই সব দেখাশোনা করবে। তুমি টাকাপয়সা বুঝে নিয়ে কালই দেশে চলে যেও। কৃষ্ণকামিনীর এই বধূবরণের অভিনব প্রথায় কমলার অন্তঃস্থলে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বৃহৎ সংসারের কর্মহীন চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কমলা লুকাইয়া চোখের জল ফেলিত।

কৃষ্ণকামিনী রূপবতী কমলাকে খাতির করিত না। সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হিসাবে কৃষ্ণকামিনী কমলাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করিয়াছে। প্রাচীনা শ্বশ্রূমাতাটি বুঝিতেও পারে নাই যে, পুত্রবধূর ভিতরে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অগণন ক্ষত জন্মিতেছিল। যুধিষ্ঠির যেদিন নিজগৃহ নির্মাণ করিয়া পিতৃগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সেইদিন কমলা স্পষ্টতই অনুভব করিল দীর্ঘদিনের ক্ষতগুলি বিষাক্ত হইয়া তাহার সমগ্র দেহমন গ্রাস করিয়াছে। এবং কৃষ্ণকামিনী সম্পর্কে তাহার সত্তা শূন্যপ্রাণ বৃক্ষের ন্যায় কাষ্ঠবৎ হইয়া পড়িয়াছে। আপন সংসারে আজ পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিতা হইয়াও কমলা তাহার বধূজীবনের প্রাথমিকপর্বের দিনগুলিকে ভুলিতে পারে নাই। কৃষ্ণকামিনীর প্রতি তাহার ঔদাসীন্য ও বিরাগ আজ বড় নিষ্ঠুর আকার ধারণ করিয়াছে। বিশেষ অনিচ্ছায় অর্ধমৃতা কৃষ্ণকামিনীকে সে দেখিতে আসিয়াছে এবং বুড়ি মরিতেছে না দেখিয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। কেবল রমার চোখে তাহার এই অস্বাভাবিক নিঃস্পৃহ মনোভাব ধরা পড়িয়া গেছে। কমলা ইহাতেই কিছুটা বিব্রত।

অর্জুন ঘরের কোণায় দাঁড়াইয়া তাহার এক বাল্য বন্ধুর সহিত কথা বলিতেছে। কথা বলিলেও তাহার দৃষ্টি বারংবার কৃষ্ণকামিনীর মৃত্যুব্যথাতুর বিশুষ্ক মুখখানির দিকে চলিয়া যাইতেছিল। সেখান হইতে দৃষ্টিরশ্মি অন্তঃস্থলে ফিরিয়া আসিবার পথে এমন একটি স্থানে ধাবিত হইতেছিল যে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া অর্জুন মরমে মরিয়া যাইতেছে। অথচ তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার কোনোও প্রচেষ্টাও তাহার চিত্ত গ্রহণ করিতেছে না। ভিতর বাড়ি হইতে কৃষ্ণকামিনীর ঘরখানিতে ঢুকিবার যে দরজাটি আছে, সেখানে সহদেবের যুবতী শ্যালিকা দাঁড়াইয়া আছে। সহদেবের স্ত্রী সম্প্রতি গর্ভবতী হইয়া পিত্রালয়ে আছে। সে তাহার ভগিনীকে আজিকার মৃত্যু-উৎসবে তাহার প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। যুবতীটি এমনভাবে দণ্ডায়মান যে তাহার পীনোন্নত স্তনের ডৌল সুস্পষ্ট আকারে প্রতিভাত। তাহার নাভিপদ্ম হইতে স্তনদ্বয় পর্যন্ত উদরের অনাবৃত অংশ, অঙ্গবস্ত্র সরিয়া যাওয়ায়, লোভন হইয়া উঠিয়াছে। যুবতীর ভ্রূক্ষেপ নাই। সম্ভবত সে তাহার এই কামোদ্রেকী রূপবিভঙ্গ সম্বন্ধে অবহিত নহে। অর্জুনের নিকট নারীদেহ নতুন নহে। তাহার স্ত্রী রহিয়াছে। নগ্ন সৌন্দর্যের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। তথাপি তাহার দৃষ্টি পতঙ্গের ন্যায় বহ্নি সমীপে ধাবমান। এখন মাতৃশোকে তাহার চিত্ত বিবশ হইয়া যাইবার কথা। অথচ এই সম্পূর্ণ বিপরীত খেলার গণ্ডী হইতে সে বাহির হইতে পারিতেছে না। পলাইয়া যাইবারও ক্ষমতা নাই। অর্জুন নিজের কাছে পরাজিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাল্যবন্ধুটি হঠাৎ বলিয়া বসিল, হ্যাঁ রে, তোর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি না। অর্জুন যেন বাঁচিয়া গেল। রমাকে ডাকিয়া আনিয়া চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইল। মামুলি কথাবার্তার অবকাশে অর্জুন

পুনরায় অনুভব করিল, রমার দেহখানি তাহার সম্মুখে যে প্রাচীর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া আঁখিপাখি দরজার নিকটে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। অর্জুন শত চেষ্টা করিয়াও নিজেকে দমন করিতে পারিল না। কৌশলের আশ্রয় লইয়া দ্রষ্টব্য স্থলে তাকাইল। ততক্ষণে যুবতীটি সেখান হইতে অন্য কোথাও সরিয়া গিয়াছে।

দেহপিঞ্জরে আত্মা আর কিছুক্ষণ হয়তো আবদ্ধ থাকিবে। সময় যতই অগ্রবর্তী হইতেছে, ততই কৃষ্ণকামিনীর বোধশক্তি অবসিত হইয়া আসিতেছে। প্রাতঃকালেও তাহার সামান্য জ্ঞান ছিল। কোনো এক পুত্রবধূ তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিল, মা আপনার সব ছেলেমেয়ে আসবে, সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণকামিনী পুত্রবধূটিকে চিনিতে পারে নাই। সে রমা। লোক চিনিবার ক্ষমতা তখন হইতেই বিলুপ্ত হইতেছিল। বর্তমানে সে-ক্ষমতার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। কৃষ্ণকামিনীর পরিণীতা নামী কনিষ্ঠা কন্যাটি শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে লক্ষ করিল, মায়ের ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু নড়িতেছে। সে প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল, মা কি যেন বলছে, বড়দা মা কি যেন বলছে। বুড়ির সমগ্র নিকট আত্মীয়ের দল বিধবার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কৃষ্ণকামিনী কিছুই বলিল না। প্রত্যেকেই হতাশ হইল। কৃষ্ণকামিনীর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া কেবল করুণ সুরে বলিল, দিদি মনে হয় গঙ্গাজল চাইছেন। বাবা যুধিষ্টির, একটু গঙ্গা জল দে বাবা। কৃষ্ণকামিনীর ঠাকুরঘর হইতে গঙ্গাজল আনিতে গেল নকুলের স্ত্রী।

নবনীতা হতাশ হইল। সে আশা করিয়াছিল এই ডামাডোলের মাঝখানে পরিণীতা হয়তো মায়ের হাতখানি ছাড়িয়া দিবে এবং সে ঐ হাতখানির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবে। পরণীতা হাত ছাড়িল না। আরও দ্বিগুণ উদ্যমে মথিত করিতে লাগিল। নবনীতা বিনোদচন্দ্রের মুখে চুনকালি মাখাইয়া প্রেম করিয়া এক কায়স্থ সন্তানকে বিবাহ করিয়াছিল। ফলত, পিতা তাহাকে বিবাহোপলক্ষে কানাকড়িও দেয় নাই। বিনোদচন্দ্র কন্যাটিকে ত্যাজ্য করিতেই কেবল বাকি রাখিয়াছিলেন। পিতা যারপরনাই বঞ্চনা করিলেও মাতা তাহাকে গোপনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়াছে। নবনীতার স্বামী একটি প্রাইভেট কোম্পানির মেজকর্তা। তাহারা সংসারে সুখী হইয়াছে। কিন্তু নবনীতার মনে ততোধিক শান্তি নাই। তাহার দুই বোনের প্রত্যেকের গাড়ি আছে, সমাজে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠা আছে, সর্বোপরি নিজস্ব বাড়ি রহিয়াছে। তাহাকে এখনও ভাড়া বাড়িতে থাকিতে হইতেছে। তাহার স্বামী গত পনেরো বৎসর ধরিয়া 'বাড়ি করব, বাড়ি করব' বলিয়া নাচিতেছে ; হয়তো আগামী বৎসরগুলিতেও নাচিবে। স্বপ্নের বাড়ি স্বপ্নেই বিলীন হইতেছে। পিতৃবঞ্চনার কারণে নবনীতা যত না কাতর, তাহার অধিক কাতরতা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠার বৈভবের ক্রমবর্ধমান বহর দেখিয়া। নবনীতা অবশ্য একটি দিকে তাহার ভগিনীদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালিনী। তাহা হইল, তাহার দুই পুত্র মানুষ হইয়াছে। বড়টি সম্প্রতি ব্যাঙ্কে চাকুরি পাইয়াছে ; ছোটটি ডব্লু বি সি এসের জন্য প্রস্তুতি লইতেছে। অপর দিকে দুই ভগিনীর পুত্রকন্যারা নিজদিগকে অকালকুষ্মাণ্ড ও মাকাল ফলরূপে সংসার-উদ্যানে পরিচিত করাইয়াছে। নবনীতা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, প্রবঞ্চনা-প্রাপ্তির বহুতর কথা ভাবিতেছিল। শমিতা গঙ্গাজল আনিয়া দিয়া নবনীতার কাছে আসিল। উদাস স্বরে বলিল, তুমি সারাদিন কিছু মুখে দিলে না। চল, এখন একটু চা অন্তত খাও।

না ভাই, কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না। এই ভালো আছি। তুমি বরং কিছু খেয়ে নাও। সেই কাল রাত থেকে চরকির মতো ঘুরছ, খাটছ।

শমিতা কিছু বলিল না। সে বিলক্ষণ বুঝিল তাহার এই ননদটি 'এ বাড়ির

জলস্পর্শ করব না' বলিয়া পূর্ব-প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহাই আপ্রাণ চেষ্টায় জিয়াইয়া রাখিতেছে। শমিতা অন্য কাজে চলিয়া গেল।

ভীমদেব মাতার নাড়ি-স্পন্দন একবার অনুভব করিয়া গেল। তাহার মুখ দেখিয়া ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইল যে, কৃষ্ণকামিনীর চরম সঙ্কটকাল উপস্থিত। যে-কোনো মুহূর্তেই চলিয়া যাইতে পারেন। পুত্রের দিক হইতে কনিষ্ঠ সহদেব ও কন্যার দিক হইতে সর্বশেষ পরিণীতা—উভয়ের মধ্যে চোখে চোখে কি যেন কথা হইয়া গেল। মায়ের হস্তসেবা ছাড়িয়া সে উঠিতে পারিতেছে না। বড়ই বিচিত্র ফ্যাসাদ! অথচ সহদেব পরিণীতার নিকট হইতে যাহা জানিতে চাহিতেছে, তাহা না জানিলে সে স্বস্তি পাইতেছে না। অবশেষে সহদেব অনেক ভাবিয়া বড়দিদি বিনীতাকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিনীতা মাতার বুলি দুইটিকে জামার তলায় চালান করিয়া সহদেবের সকাশে বাহিরে আসিল। সহদেব ইতস্তত করিয়া দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ি নিয়ে তোর সঙ্গে সেজদার কোনো কথা হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে তুই কিছু শুনিসনি!

না, পরি সামান্য কিছু বলেছে, পুরোটা শুনিনি।

ও। হ্যাঁ, সেজদা এই বাড়ি কিনতে চাইছে। আমরা তো আর এই বাড়িতে থাকব না। আমাদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে। তোর কী মত?

আমার কোনো মত নেই। তোরা যা বলবি তাই হবে। তোর মত কী?

আমি অনেকদিন থেকেই ভেবেছিলাম বাড়িটা আমি কিনব। এত বড়, এত ভালো, এমন পজিশনে কোনো বাড়ি এ তল্লাটে নেই। তোর জামাইবাবুর অবশ্য ইচ্ছা নেই। ও বলছিল, কী সব আইনের ঝামেলা হবে।

ছোড়দাকে আমরা যদি লিখে দিই...

সেখানেও তো সবার মত চাই। আমি কিনলে অবশ্য নান্টুকে থাকতে দিতাম। যা ভাড়া দিত—দিত। বাড়িটার প্রতি আমার মায়া-মমতা কতদূর তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না!—এই বলিয়া বিনীতা অন্যমনস্কভাবে তাহার সম্মুখের বারান্দার বাহারি রেলিঙগুলিতে হাত বুলাইল।

ছোড়দা এসব ব্যাপার জানে?

জানে না বোধহয়। তুই এখনই কিছু ওকে বলিস না। মায়ের কাজকর্ম ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক। নইলে নান্টু মুষড়ে পড়বে।

সহদেব বিনীতার সাবধানবাণীতে সম্মতি জানাইল। এবং তৎসহ সে তাহার লবণহ্রদস্থিত ওনারশিপ ফ্ল্যাটটির কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে খুবই আনন্দিত হইল।

সন্ধ্যা নামিতে আর বাকি নাই। সূর্যদেবতা পাটে যাইতেছেন। আকাশ গোধূলির রঙে রঙিন হইয়া আছে। চতুর্দিকে একপ্রকার মাযাবী আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অপরাহ্নে কালেভদ্রে এজাতীয় আলো দৃষ্ট হয়। ইহাই কনে-দেখা-আলো বলিয়া খ্যাত। বিনোদচন্দ্রের বাড়িটি ক্রমে ক্রমে পাড়া-প্রতিবেশিদের আগমনে ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলেই যেন অধীর প্রতীক্ষা করিতেছে কৃষ্ণকামিনী কখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে। বুড়ির পুত্র ও কন্যা ভাগ্য দেখিয়া কোনো কোনো প্রবীণ মানুষ অল্প ঈর্ষান্বিত হইযাছে। একজন ব্যতীত সকলেই কৃষ্ণকামিনীকে ছাড়িয়া চলিয়া গিযাছে; অথচ সুখের বিষয় তাহারা মৃত্যুলগ্নে সবাই উপস্থিত। মহিলাটিকে ভাগ্যবতী বলিতে হইবে!

ইহাকে কাকতালীয় বলিলেই যথার্থ বলা হয়। ঘটনাটি হইল নান্টু পুষ্প-ধূপ-

খৈ-ধামা ইত্যাদি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল আর কৃষ্ণকামিনীর প্রাণবায়ু নির্গত হইল। মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামে অবশেষে অষ্টসন্তানবতী মাতাটি হার স্বীকার করিল। মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণকামিনীব ঘর হইতে মড়াকান্নার রোল উত্থিত হইয়া বাতাস ভারী করিযা তুলিল। নান্টু নিচতলা হইতেই বুঝিল, মা চলিযা গেলেন এবং তাহার পায়ের তলা হইতে মাটিটুকু সরিয়া গেল।

কন্যা এবং পুত্রবধূরাই তারস্বরে কাঁদিতেছে। পুত্রেরা নীরবে চোখেব জল ফেলিল। ভীমদেবের অকস্মাৎ মনে হইল, সমগ্র পৃথিবীতে তাহার আর আপনজন বলিয়া কেহ রহিল না। অর্জুন মাযের কোমল পা দুইটি ধরিয়া চক্ষের জল লুকাইতে চেষ্টা করিতে করিতে দেখিল সহদেবের শ্যালিকা বাহিরের অলিন্দে বিরস বদনে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখ অশ্রুশূন্য। কৃষ্ণকামিনীর মৃত্যু তাহার অন্তরে কিছুমাত্র আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। সে যেন এখান হইতে যাইতে পারিলে বাঁচে! কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে এমনই বিবশা হইয়া পড়িল যে, টাল সামলাইতে না পারিযা শ্বশুরের ছবিখানির উপর পড়িয়া গেল। ছবিখানি পালঙ্ক হইতে ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল।

অশ্রুমোচনের গতি স্তিমিত হইয়া আসিল। সকলেরই বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। যাহা ঘটিল, সে-সম্বন্ধে এখনও কেহই ধাতস্থ হইতে পারে নাই। মাঝে মাঝে কেবল কৃষ্ণকামিনীর চন্দনা পাখিটি ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া নিজের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে। ভিতর বাড়ির উঠানে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিটি তারস্বরে কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিতেছে—সাড়া পাইতেছে না। এই সময়ে তাহার দুগ্ধ সহযোগে ভিজা মুগ ডাল খাইবার কথা। পাখি শোকস্তব্ধ পরিবেশকে উপেক্ষা করিয়া চেঁচাইতেছে। ঘরের মধ্যে বিনীতা কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত করিয়া বেদনা-বিজড়িত কণ্ঠে, কনিষ্ঠাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, পরি, মায়ের হাত থেকে চুড়ি তিনটে খুলে নে। হাত শক্ত হয়ে গেলে আর পারবি না। পরিণীতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জ্যেষ্ঠার নির্দেশ পালন করিল। সহদেব এই কাজে আদরণীয়া ছোটবোনটিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইযাছিল। তাহার সহায়তার অবশ্য দরকার হইল না। নবনীতা সমগ্র দৃশ্যটি দেখিয়া তীব্রস্বরে আর একবার কাঁদিয়া ফেলিল। কেহই তাহাব এই আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজিতে তৎপর হইল না। সকলেই ভাবিল ইহা নিদারুণ শোকের বহির্প্রকাশ।

যাত্রাপর্বের সূচনা করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। পুত্র-কন্যারা পরমস্নেহময়ী মাতাকে সযত্নে অজস্র শ্বেতপুষ্পে সাজাইয়াছে। অগুরু ও ধূপের গন্ধে চারিদিক পূর্ণ। রমা শ্বশ্রূমাতার পা-দু-খানি অলক্তকে রাঙাইয়া স্মৃতিচিহ্ন লইয়াছে। যুধিষ্টির আর অপেক্ষা করিতে রাজি হইতেছে না। রাত বাড়িয়া যাইতেছে।

অবশেষে শ্মশানযাত্রার সমস্ত পর্ব সমাপ্ত হইল। কৃষ্ণকামিনীর দেহখানি রাস্তায় আনা হইয়াছে। রাত্রি হইলেও প্রতিবেশিদের ভিড় কম নয়। নান্টু ছবি তুলিবার যে লোকটিকে আনিযাছে সে সুযোগ খুঁজিতেছে আরও কয়েকটি ছবি গ্রহণের। সুযোগ পাইতেছে না দেখিয়া সামনের বাড়ির রোয়াকে উঠিয়া যন্ত্রখানি তাক্ করিতেছে। লোকটি বড়ই রসিক। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, দিদিমার মেয়েরা দয়া করে এগিয়ে আসুন। খাটের বাঁ দিকে বসে একটু কাঁদুন—আমি একটা শট নিয়ে নি। নবনীতা অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, লোকটি ছবি তুলিবার কালে যাহা বলা হয় ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলিতেছে। অথচ এই পরিস্থিতিতে তাহা সাযুজ্যহীন নহে। কন্যারা কেহই ছবি তুলিতে আগ্রহী হইল না।

পুষ্পচন্দনে সজ্জিতা কৃষ্ণকামিনীকে বিসর্জনলগ্নের সহাস্য দেবী প্রতিমার ন্যায় লাগিতেছে। কিন্তু রমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, অজস্র ফুলের ভারে কৃষ্ণকামিনী

ক্লিষ্ট হইয়া আছেন। পুত্রেরা হরিধ্বনি দিয়া মাতাকে স্কন্ধে চাপাইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া রমা সবার অলক্ষে কৃষ্ণকামিনীর বুক হইতে একটি পদ্ম তুলিয়া লইল। ফুলটি কৃষ্ণকামিনীর প্রতি তাহার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দ্যোতক। ইহা শ্মশানের আগুনে পুড়িতে দিবার নহে।

পরিক্রমা ॥ রামকুমার মুখোপাধ্যায়
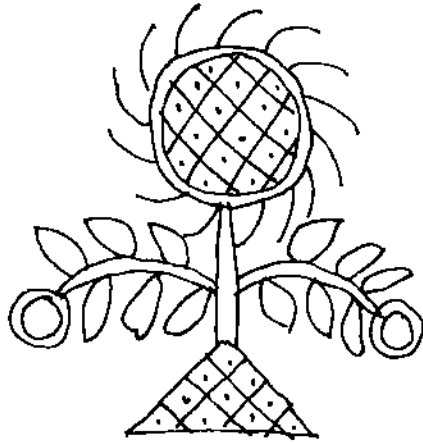
নদীর কাঁথি ভেঙে, জল পেরিয়ে, জঙ্গল মাড়িয়ে আসত মানুষটা। ঝোলা থেকে বার করত জগন্নাথের পট। মাথায় ঠেকিয়ে নামিয়ে রাখত নিচে। আবার হাত ভরতো থলেতে। বেরিয়ে আসত রঙিন লাঠি, ঠাকুরের প্রসাদ, পান-সুপোরির কৌটো। শ্রীনাথের এক মেয়ে আর খুচরো তিন ছেলে হাঁ করে সেই দৃশ্য দেখত। সব শেষে ভগবান পাণ্ডার থলে থেকে বেরোত জগন্নাথের তাগা। তালের মতো বিশাল এক কুণ্ডলী।

কুণ্ডলীটা শ্রীনাথের ঘর থেকে যেত পশ্চিমের গয়লাপাড়া। সেখান থেকে পুবের কামারপাড়া। যখন ফিরত তখন কুণ্ডলীতে হাতে গোনা পাঁচ-সাত খি।

মানুষটা আসত প্রত্যেক বছর। নবীনগঞ্জের শ্রীনাথ চক্রবর্তীর ঘরকে কেন্দ্র করে বিশ-পঁচিশ গাঁ ঘুরত। পৌষ পেরলো, বছরের কাজ শেষ। এবার চল। চুলে শরতের মেঘ ওড়ে, শরীরের চামড়ায় ভূমেশ ফাটে। এখনই তো কড়ি জমানোর সময়। মরায়ের ধান, বস্তার চাল, বার গণ্ডা গরু, তিন বাগানের ফল—কিছুই নেবে না পাটনি। কড়ি নেবে। শ্রীক্ষেত্র চল। আকাশে-বাতাসে পারাণির কড়ি মিলবে। ভবনদী পেরিয়ে যাবে তরতরিয়ে।

কানে শোনে মানুষজন, চোখে দেখে। নদী পেরলে ডাঙা, ডাঙা পেরলে বন। বন পেরিয়ে পাহাড়, পাহাড় টপকে স্বর্গদ্বার। ভেতরে পদ্মাসনে ভগবান। এবার সুখের দিন। সাপ নেই, নেকড়ে নেই, বান নেই, ওলাউঠা নেই। মাঝ রাতে মাথার ওপর ডাকাতে কুড়োল তোলে না। আঁতুড়ে নাতিন মরে না। মেয়ের হাতের শাঁখা বছর না ঘুরতে ভাঙে না। হাতে কড়ি এলেই সব সুখ। পরী হয়ে ঘুরবে। ফুলে ফুলে মধু খাবে।

কড়ি চাইলেই কড়ি মেলে না। আশ্বিনের ঝড়ে ঘরের চাল অর্জুন গাছের মাথায়। শ্রাবণের বানে খড়ের পালুই পুরে ভেসে যায়। হালের গরু ছটফটিয়ে মরে। মেয়ে খালাস হতে আসে। নাতনির বিয়ের দিন ধরা হয়। বোশেখের বাজে দেওর ছিটকে ছাঁচতলায়। এসব সামলে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে। ভগবান পাণ্ডার পেছন পেছন হাঁটে। গাঁ পেরোয়, বন পেরোয়, নদী পেরোয়, খেত পেরোয়, গঞ্জ পেরোয়। ট্রেনে চেপে জগন্নাথের শ্রীচরণে। সব আকাঙ্ক্ষার পূরণ। তখনই মনটা হু-হু করে ওঠে। নাতনিটাকে পেঁচোয় ধরেনি তো ? ক্ষুদে বামনীর মুখে আগুন। পাঁচ সের দুধের গাইটার বাঁটগুলো শুকিয়ে আমসি।

শ্রীনাথকে বলেছিল ভগবান, 'বউমাকে নে ঘুরে আসবে চল।'

শ্রীনাথের বউ ঘুঁটে দিতে দিতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তাকিয়েছিল শ্রীনাথের দিকে। শ্রীনাথ তালকুর কাটছিল দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের সামনে বসে। তিন ছেলে আর এক মেয়ের শরীরে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল মুখটা। ইচ্ছে-অনিচ্ছে

বোঝাব উপায নেই।

—মাযেবই হলোনি।

শ্রীনাথেব উত্তবটা শোনে বউ। ঘুঁটেতে ফেবে।

– তোবা যা না। বউটাব বাপেব ঘবে সাতকুলে কেউ নাই, দু'দিন যাবাব জাযগা নাই। নে যা।

শ্রীনাথেব সৎমা বান্নাচাল থেকে বলে। বিযেব বছব না ঘুবতে বিধবা। বাপেব ঘবেব লোকজন নিযে যেতে চেযেছিল। যাযনি। সৎ ছেলেব সংসাব আঁকড়ে পড়ে আছে। আব কটা দিন পাব কবতে পাবলে ছেলেব আগুনে স্বর্গে।

শ্রীনাথ মাথা নাড়ায—লোকে বলবে সৎমা বলে নে গেলনি।

লোকেব মুখে আগুন। মেযেটাবে আমাব কাছে বোখে তোবা যা।

—তুই যা। বোযেবে নে যা।

শ্রীনাথ উঠে দাঁড়ায। মা কে সে তীর্থ কবাবেই।

তা হবেনি হাঁড়ি নে তুমি তখন ঘবে নেত্য কববে, ধান সেদ্ধব উনোনে ভাটি চাপাবে।

শাশুড়ি আব ছেলেব কথাব ভেতব দোল খায বউ। যে কেউ গেলেই সে যাবে শ্রীক্ষেত্র।

—তাহলে দাদাব সঙ্গে তুই ই যা। একাই যা।

শ্রীনাথেব বউ দেযালেব গাযে সপাটে বসিযে দেয গোববেব তাল।

আড়াই পাড়াব গাঁযেব পাঁচজন যাত্রী মেলে। শ্রীনাথেব মা, গোপাল কামাবেব কাকা কাকী, সাধন গযলা আব তাব বউ। কামাব আব গযলাপাড়াব চিঁড়ে-মুড়িব পুঁটলি আসে শ্রীনাথেব ঘবে। পবে নাতি নাতনিবা। তাদেব খানিক পবে ছেলেবা। সবাব শেষে বউবা। যাবা যাবে তাবা এখনও শিবদালানে। ঘব সংসাব কাব সাহসে বেখে যাবে।

শ্রীনাথেব সংসাবে তখনও কান্না চলে। সকাল থেকে খাসিটা মেলেনি। মনমেজাজ ঠিক নেই। নেকড়েতে নিশ্চয টেনে নিযে গেছে জঙ্গলে। দেখা নেই শ্রীনাথেবও। কে জানে কোথায নেশা কবে পড়ে আছে। দুপুব হতে চলল। এবাব যেতে হয। ভগবান পাণ্ডাব দু'কাঁধে ঝোলে প্রকাণ্ড দুই ঝোলা। এক মাসেব নানান সংগ্রহ। ঝোলাব পেছনে পেছনে গযলা আব কামাবপাড়াব ছেলেব দল। তাব পেছনে বউ ঝিবা। তাব পেছনে পুবুষ মানুষ কজনা। শবেব বনেব ভেতব দিযে চলে। শিশু, অর্জুন, সেগুনেব গা বেযে হাঁটে।

শ্রীনাথেব তিন ছেলে আব বড় মেযেটা ঠাকুমাব আঁচল ছাড়ে না। কোনদিন চোখেব আড়াল হযনি। আজ চলে যায। নদীব জলেব কাছে এসে থমকে দাঁড়ায গাঁযেব মানুষ। শ্রীনাথ বালিব ওপব দিযে পা টেনে টেনে আসে। মাযেব হাতে গুঁজে দেয কটা টাকা। দূবেব পথ, কাজে লাগবে।

এবাব ফিববে গাঁযেব মানুষ। ভগবান পাণ্ডা হেঁটে যাবে পাঁচ বুড়োবুড়িকে নিযে। আবো জুটবে নদীব ওপাবে। কুমোবগঞ্জেব দুজন যাবে, নবোত্তমবাটিব চাবজন। তাদেব নিযে পানপাতা। সেখানে বাত কাটিযে পুণ্ডহীত। ওখানেব যাত্রী দুজনা।

শ্রীনাথেব বউ থমকে দাঁড়ায। এমনি কবে সেও চলে যেতে পাবত জল ভেঙে। ভগবান পাণ্ডাব পাযে পাযে পৌঁছে যেতে পাবতো জগন্নাথেব শ্রীচবণে। কত বউড়ি দিদিঘব, বাপেব ঘব, দেওব-জাযেব ঘব যায! কত লোক কত দূব যায। শাশুড়ি নদীব স্রোতেব কিনাবে দাঁড়িযে বউকে বলে—কাঁদিসনি। কটা দিন পবেই ফিবে আসবো।

ছেলেগুলোকে নজরে রাখিস। নদীতে নামতে দিসনি। পরের বছর ছিনাথ আর তুই যাবি। জগন্নাথ দর্শন হলে ছিনাথের নেশা কেটে যাবে। তোর গায়ে বল আসবে। কাঁদিসনি বউ। ছিনাথ আর তোরে আমি সামনের পৌষে জগন্নাথ দর্শন করাবো।

ঘরমুখো আর বাবমুখো মানুষের মাঝে নদী বয়ে যায়। সূর্য ডোবে, সূর্য ওঠে। যাত্রী-মানুষ ক্রমশ দূরে চলে যায় নবীনগঞ্জ থেকে। দূরত্ব বাড়ে। সেই ফাঁকে মাঠ ঢোকে, গাঁ ঢোকে, গঞ্জ ঢোকে। নদী, পাহাড, বন ঢুকে যায়।

দিন পেরোয়। মাস পেরোয়। বারমুখো মানুষ আবার ঘরমুখো। কিন্তু কখনো-সখনো কেউ কেউ আটকে যায় জগন্নাথের চরণে। ছেলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভবনদীতে গড়িয়ে পড়ে। জগন্নাথ টেনে নেন নিজের কোলে।

নদীতীরে কৃশদেহ দাহ করে শ্রীনাথ। অস্থি ভাসিয়ে দেয নদীর স্রোতে। চোখের জলে শ্রীনাথের বউয়ের চোখদুটো ঝাপসা। সে তাকিয়ে দেখে শাশুড়ি গায়ে হাত ঠেকিয়ে বলছে—কাঁদিসনি বউ। ছিনাথ আর তোরে সামনের পৌষে জগন্নাথ দর্শন করাবো।

দুই

শ্রীনাথের বউয়ের ঠোঁটে বাবলার আঠা। কারো বিয়ের সাজ দেখলে মনটা নেতিয়ে যায়। কারো গায়ে বেনারসী চাপলে নিজের বিয়ের সাজের কথা মনে পডে। বউভাতের দিন সে শালুর কাপড় পরেছিল। তখন সবে বারো বছর। দুঃখটা তেমন জমে ওঠেনি। বয়স বাডতে মনের কষ্ট বাডে। আহা, টিয়া রঙের বেনারসী।

শ্রীনাথ বয়ের ফোঁসফোঁসানি দেখে। শ্রীনাথ বানভাসী-কালনাগিনীর গর্জন শোনে পালুয়ের গায়ে। ফণাটা সবটুকু মেলে দেয় ভিনদেশি সরীসৃপ। হেঁসোর কোপটা গিয়ে পড়ে দু-খড়মের মাঝামাঝি। কপালের সবটুকু সিঁদুর ঝরে পডে। উঠোনের পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে যায়।

—ছ'টা মাস সবুর কর, জোডা বেনারসী কিনব।

—একটা জুটলনি, তার আবার জোড়া।

—অঘ্রানে ময়নার বিয়ের দিন ধরব। একটি ভাল পাত্র আছে ঘুঘুডাঙায়। কলকাতায় চাকরি করে।

—এ অঘ্রানে ?

—পনের পেরলো। আর বছর ঘুরিয়ে করবিটা কী ?

—জোগাড় নাই ?

—পিসেমশাইরে বলেছি। পুবের পনের বিঘে জমি আটশ টাকায় কিনবে। বলেছে টাকা জুটলে পরে শুদে দিস। জমি ফেরত করে দেব।

—শুদতে পারবে ?

—পাঁচটা বছর যেতে দে। এঁড়ে পাঁচটা হালের বলদ হবে। পুকুর পাডের তালগাছগুলো সোনার দরে বিকোবে। দুটো বছর নদী চুপ থাকলে মরাইয়ের বেড় বাঁধবো পাঁচ কাহন খডে।

আমার বেনারসী ?

এ অঘ্রানে। ময়না-মায়ের ময়ূরকন্ঠী, তোর টিয়া।

পনেরর ময়ূর আর তিরিশের টিয়া ডানা মেলে। বর্ষার জলে ডানা ধোয়, শরতের রোদে ডানা শোকায়, হেমন্তের শিশিরে ডানায় বুদ্বুদ গাঁথে।

নদীর মুখে গেঁজে ওঠে। ডাক পাডে নদী, হাঁক পাড়ে। পুণ্ডহীতের ঘাট-খেয়া

বন্ধ। পানপাতাব জেলেবা নৌকোয মাছ তুলে কুটুম্বিতে কবতে বেবোয। তিন কেজি বুই। কাব পুকুবেব পাড ডিঙিযে স্রোতেব শবীবে গা ভাসিযেছে। বান এসেছে। ফুর্তি কব। মাছেব ঝোল বাঁধো। নিজেবা খাও, আমাকে খাওযাও।

জল থৈ থৈ নবীনগঞ্জ। গযলাপাডা আব কামাবপাডাব মাঝেব জমি আকাশেব জলে উপুবচুপুব। শ্রীনাথ চক্রবর্তীব ঘবেব সঙ্গে কামাবপাডা আব গযলাপাডা লেতুড। নদীব বান শ্রীনাথেব দক্ষিণেব দেওযালে শ্বাস ছাডে। কুঁচো ছেলেবা কলাব ভেলা ভাসায। হাউসে মানুষেবা তালেব ডোঙাতে চেপে জলেব নাচন দেখতে বেবোয। বুডোবা শিবদালানে বিশ বছব আগেব মহাবানেব গপ্পো জোডে। বানেতে বডলোক কবে দিযেছিল হবিসাধন গযলাকে। চল্লিশ ভবি গযনা ছিল ভিনদেশি মেযেটাব শবীবে। যেমন এসছিল তেমন ভেসে চলে গেল। হবিসাধন বিশ বিঘে জমি কিনল, পাঁচটা গাই-গবু কিনল, ভালুকবাঁদিতে একটা মেযে পুষল।

শেযালেব মুখ থেকে হাঁসটা ছাডিযে এনে খালপোশ কবতে বসে শ্রীনাথ। মেযে মযনা হাঁসেব শোকে অঝোবে কাঁদে। মযনাব মা শেযালকে গাল পাডে। শ্রীনাথেব তিন ছেলে হাঁসেব পেটে কটা ডিম আছে তা দেখাব জন্যে প্রতীক্ষা কবে। বিজযজেলে নিজেব ভাগ্যে আনন্দে আটখানা। বেনো মাছ দিতে এসে মাংস-ভাত।

আযেসী দিন। হাত-পা ছডিযে শ্রীনাথেব সংসাব খেতে বসে। শ্রীনাথেব বউ মাংসেব বাটি সাজায। কাব বাটিতে কটা মাং। সেই নিযে শ্রীনাথেব ছেলেবা ঝগডা কবে, এ-ওকে খিমচোয, বাপেব হাতেব ঘা খেযে কাঁদে, হাঁসেব ছালকে বাগে আনতে কান্না ভোলে।

আকাশেব মুখ আবো গোমবা হয। বানেব জল চৌকাঠ ডিঙিযে উঠোনে। কামাবপাডাব বদন আসে। গযলাপাডাব ববি হাঁক মাবে। বউ-ছেলে আব গবু-ছাগলগুলোকে এবাব নদী পাব কবে দিতে হয। ঘব সামলাতে এক-আধজন পুবুষ-মানুষ থেকে যাবে।

বিজযজেলেব ডিঙিতে শ্রীনাথেব সংসাব নদীব ওপাবে চক্রবর্তীদেব ঘবে চলে। যাবাব আগে শ্রীনাথেব জন্যে চিঁডে বেঁধে দেয বউ। জল তেমন বাডলে চিঁডেব পুঁটুলি নিযে টুসি আমগাছেব টঙে উঠে যাবে। ছাগল দুটোকে ডিঙিব ওপব চাপিযে গবুব পাল নিযে চলে শ্রীনাথ। গযলা আব কামাবপাডাব থেকেও মানুষজন বেবিযেছে। কেউ নিজেব ডোঙায, কেউ জেলে নৌকোতে। যে যাব স্যাঙাৎ, তীর্থমা, বন্ধু-বান্ধবেব ঘবে গিযে উঠবে। দু-তিনটে দিন কাটিযে আবাব যে যাব সংসাবে।

নবীনগঞ্জ নদী পেবোয। সাঁতাবে কাব কত ক্ষমতা তাব পবীক্ষা হয। কাব মোষ কতখানা ঘাড তোলে তা নিযে ইযার্কি চলে। বউদেব ভেতব কথা-চালাচালি হয কাব বব ক' ঘোট জল খেলো।

ওপাবে যে যাব আপনজনেব ঘবে নিজেব সংসাব গচ্ছিত বাখে। ঠাট্টা-ইযার্কিব সম্পর্ক হলে কেউ বলে—যেমনটি দিলুম তেমনটি ফেবত দিস।

তিনজন ফেবে ঘাটে—শ্রীনাথ, কামাবপাডাব বদন আব গযলাপাডাব জগদীশ। নদীব সঙ্গে পাঞ্জা কষে পাড বদলায। হবিসাধন গযলাব ভাগ্যেব কথা ভেবে সোনাব মেযেব জন্যে অপেক্ষা কবে। দেখে খডেব পালুই ভেসে চলে, পোষা টিযা আকাশেব দিকে তাকিযে গডিযে যায, পুকুবেব পানা ঘূর্ণিতে পাক খায।

বাত নামে। নদী তীবে, জঙ্গলেব মাথায, আকাশেব কালো মেঘ জমাট বাঁধে। নদীব স্বব ঘন হয, ফেনাব চূড উঁচুতে ওঠে। এক সময বাতেব আঁধাব মিশে যায

মেঘের কাজলে। আকাশের জল আর বানের স্রোত জুড়ে যায়। তখন শ্রীনাথের গলা আর কামারপাড়ায় পৌঁছায় না। জগদীশের হাঁক বদনের কানে এসে জোটে না।

শ্রীনাথের বউ বাজের ডাকে জেগে ওঠে। রাত জাগো। চোখ জুড়লে ঢেউ ফণা তুলবে, শিরে ছোবল বসাবে।

রাত কাটে। জলের রাগ কমে। শ্রীনাথের নবীনগঞ্জের প্রবাসী সংসার নদীর তীরে আসে। আর দুটো দিন গেলেই ঘরে ফিরবে। আজই খবর আসবে পুকুরের কটা মাছ ভেসে গেল, কাদা হল খামারের কত খড়।

বেলা বাড়ে। দুপুর হয়। শ্রীনাথের ছেলেরা খেতে যায়। বেলা পড়ে। ময়নাকে খেতে পাঠিয়ে দেয় মা। শ্রীনাথের বউয়ের বুকের ভেতর ঢাক বাজে। মানুষ তিনটের খবর নেই কেন? শ্রীনাথের বউ অথৈ জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশের মেঘ কাটে। পড়ন্ত বিকেলের মরা রোদ ওঠে। শ্রীনাথের বউয়ের চোখ নবাবগঞ্জের হারিয়ে যাওয়া ঘাটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সূর্য মুখ গুঁজে দেয় পশ্চিম আকাশের বুকে। নবীনগঞ্জের এপারের মানুষজন নদীর তীরে আসে। তাকিয়ে থাকে নবীনগঞ্জের ঘাটের পথে। মানুষের মাথা বেরোয় বন থেক। ঐ যে বদন, ঐ জগদীশ।

শ্রীনাথের বউয়ের টিয়া-রঙ বেনারসী ঘোলা স্রোতে ভেসে যায়।

তিন

ময়নার বাবার পিসেমশাই দু'বার কলকাতা ঘুরে আসেন। বিয়ে পাকা। ফাগুনের তের তারিখ। মাঝে এক মাস। তোড়জোড় চলে। ধান চাল হয়। দেয়ালের গায়ে খেতমাটির সাদা রং চাপে। খড়ের সোনালিতে চালের রূপ ফেরে। ময়নার মা নিজের বিয়ের দানগুলো পালিশে পাঠায় ভব কামারের ঘরে।

শ্রীনাথের কাঁচির বন্ধু শিবু সাঁওতাল আসে। হেঁসোর ঘায়ে শিউলি গাছের ডাল কাটে। পেয়ারা গাছের মাথা ছাঁটে। ওলের গোড়া তোলে। উঠোনের ঘাস চাঁছে। খেতের মাটি দিয়ে উঠোনে রাস্তা বানায়। জামাইয়ের পায়ে যেন জল না লাগে। কলকাতার জামাইয়ের জন্যে দেড় হাত লম্বা পিঁড়ি বানায়। তেল-শালপাতা দিয়ে গাড়ু মাজে। কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে যায়। শাল-পিয়ালের ডাল কাটে। ময়নার তিন ভাই সে সব ডাল টানতে টানতে ঘরে তোলে।

গোপাল কামারের কাকী উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে। ময়নার মায়ের সুখের কথা শোনায়। মেয়ের বিয়ে মানের চিন্তার শেষ। এখন শুধু ছেলে তিনটের পৈতে। বড়টা চাষ দেখবে, বাকি দুটো ঘটি নিয়ে চলে যাবে দু' মুখে। বামুনের ছেলে চৌদ্দ বছরেই রোজগেরে। ঘণ্টা বেয়ে পড়বে চাল, শাঁখ থেকে মুড়কি। যাদু-ভাদু-মাধোর মায়ের সংসারে লক্ষ্মী খেলে বেড়াবে।

গোপালের কাকীর কথায় নিশ্চিন্তি মেলে না ময়নার মায়ের। পাকমারাদের মেয়েটা কাঠকয়লা দিয়ে ছক কেটেছিল উঠোনে। এ বেযাড়া ভিটে। এ সংসারে বেড়ি নেই। বাস্তুতে বন্ধন নেই। দেশান্তরে চলে যাবে তিন ছেলে। বড় পুবে, মেজ পশ্চিমে, ছোট উত্তরে। লণ্ঠনের ভাঙা কাচে ধোঁয়ার প্রলেপ দিয়েছিল। সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তিন ভুবনের ছবি দেখেছিল ময়নার মা। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িঘর, ঘোড়ায় টানা গাড়ি। খানিক দূরে ইঞ্জিন গাড়ি। নদী নেই, নালা নেই, গাছ নেই, গরু-ছাগল নেই। সে দেশে চলে যাবে যাদু। ভাদুর জন্যে কাগজ-কলম। দোয়াত-কালিতে টেবিল ভর্তি। ভাদু মাথা নামিয়ে ঘুমে অঘোর। চিন্তা মাধোকে নিয়ে। তিনটে বুক-ভারী মেয়ে। ঘরের

কোণে ফুলেব ঝুড়ি। ঝুড়িব গায়ে বোতল। বোতলেব পাশে ঘটি। তাব পাশে তেল ছবি। বিছেতে ভেড়া খায়।

তিনটে বাসন নিয়েছিল পাকমাবা মেয়েটা। যাদুব জন্যে ভবনেব গেলাস, ভাদুব জন্যে কাঁসাব ঘটি, মাধোব জন্যে থালা। প্রতি অমাবস্যায় তিনজনেব বালিশেব নিচে বাখতে হবে তিনটি পাথব। দিন পেববে, বং বদলাবে। যাদুব কালোপাথব হবে সাদা, ভাদুব হলুদ হবে সবুজ আব মাধোব সিঁদুব লাল বেগুনি। সংসাব নিয়ে সুখে থাকবে ময়নাব মা। চালেব মাথায় নাচবে ময়ূব। লক্ষ্মীপেঁচা ডাকবে টুসি আমেব ডালে। টুঙিব হাঁড়িতে পায়বাব সংসাব বাড়বে। শাশুড়ি বেলগাছ থেকে নেমে কামাখ্যা চলে যাবে। যেমন ভাসতে ভাসতে চলে গেছে শ্রীনাথ তেমন ভাসতে ভাসতে ফিবে আসবে।

মাছেব ঘিলু চিবোয় ববযাত্রীব দল। বসগোল্লাব হাঁড়ি গেলে ববযাত্রীব দল। যাদুব সোহাগেব পাঁঠাব হাড় চিবোয় ববযাত্রীব দল। ভাদুব লালু ভুলু মাছেব পেটি খায় ববযাত্রীব দল।

পিসেমশাই ববকর্তাকে নবীনগঞ্জেব ইতিহাস শোনান। আগে ময়াল থাকতো নবীনগঞ্জেব জঙ্গলে। এখন বছবে এক-দুটো চোখে পড়ে। হাতিব পাল আসতো আগে। একবাব দুটো হাতিব বাচ্চা হয়েছিল এই জঙ্গলে। সেবাবই শ্রীনাথেব বাবা যজ্ঞেশ্বব চক্রবর্তীব চাব গণ্ডা কলাগাছ খেয়েছিল হাতিব পাল। তেমন গাছে গাছে ঘুবতো বাঁদব। খোঁড়া কামাবকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল গাছ থেকে। আট মাসেব ছেলেব ডান হাতখানি আঁকশি হয়ে গেল। পিসেমশাই নিজেব কাহিনী শোনান। নদীনালা থেকে সবে উঠেছেন। ততক্ষণে সন্ধে নেমে গেছে। দেখেন টুসি গাছেব নিচে শ্রীনাথেব বাবা বসে। কানেব কাছে মুখ এনে বলেছেন– 'থাকাব কথা কোলে, কেন বসে গাছতলে ?' শালা তড়াং কবে লাফিয়ে উঠে দে ছুট। নেকড়ে ঢুকে গেল জঙ্গলে।

সকালে আশীর্বাদ। হলুদ জলে দুব্বো ঘাস ডোবানো হয়। শাঁখ বাজে। ময়না এক সেব চালে এতকালেব ভাতেব ঋণ শোধ কবে। অন্য ঋণে আবাব জড়িয়ে নেয় নিজেকে। গবুব গাড়িতে দান ওঠে। ময়নাব শবীবে ওঠে মায়েব নথ, মায়েব আটগাছি সোনাব চুড়ি, মায়েব বিয়েব দুল, ময়নাব মাকে শাশুড়িব দেওয়া বাজু। ময়নাব মাকে ময়নাব বাবাব দেওয়া হাব। ময়না নিজেব সংসাবে চলে যায়।

খানিক পবে জোড়া হয় পিসেমশাইয়েব গাড়ি। সে গাড়িতে পাঁচসেব মিষ্টিব হাঁড়ি ওঠে। হাঁড়িটা পেতলেব, পবে ফেবত পাঠাবেন পিসেমশাই। গাড়িতে তোলা হয় পাঁচ সেব বাদশাভোগ চাল। পিসিমা পায়েস খাবেন। গাড়িতে ওঠে শ্রীনাথেব সাধেব পেতলেব হুঁকো। পিসেমশাই টানবেন। গাড়িতে তোলা হয় শ্রীনাথেব সৎ মায়েব পানেব সাজ। পিসেমশাইয়েব মা আড়গালিতে পান চিবোবেন। গাড়িব পেছনে জোড়া হয় ময়নাব মায়েব তিনসেব দুধেব গবু বাছুব। চাব বাঁটে ঝুলে থাকবে পিসেমশাইয়েব সংসাব।

ময়নাব সুখে নবীনগঞ্জেব মানুষ হাসে। বড় ভাল পাত্রে বিয়ে হলো ময়নাব ঘুঘুডাঙাব চাল, কলকাতাব পয়সা। বাপ মবতে মনে হয়েছিল মেয়েটাব কপাল পু কোনো ঘাটেব মড়া হয়ত গাঁদা ফুলে উচ্ছুগ্য কবে তুলে নিয়ে যাবে কোনোদিন। ভগবান এক হাতে সিঁদ কাটেন, অন্য হাতে দান কবেন। মেয়েটাব কপালে সুখেব আঁক কেটে দিয়েছেন ভগবান।

ময়নাব মা হাসে না, ময়নাব মা কাঁদে না। ময়নাব মা ঘোমটা খোলে। ময়নাব মা আব শুধু বউড়ি নয় নবীনগঞ্জেব। ময়নাব মা শাশুড়ি। মাথাব কাপড় নামায় ময়নাব

মা। খনা ধুতি মাথা থেকে নামিয়ে ঘাড়ে ফেলে ময়নাব মা। আঁচল কোমবে জড়ায়। ঘোমটাব নিচে ঢুকে থাকাব উপায়ও নেই তাব। ছেলে তিনটেকে বড় কবতে হবে।

যাদু-ভাদুকে ইস্কুলে পাঠিয়ে গবু ছাড়ে ময়নাব মা। নদীব মানায় গিয়ে বসে। গাই বাছুব বলদে পঁচিশটা। পিসেমশাই একটা গাই বাছুব নিয়ে চলে গেছে। হিসেব দিয়েছে এখনো একশ' টাকা ধাব। আবাব কবে কী নিতে আসে কে জানে। বলদে হাত দিলে ছেলে তিনটেব কী হবে।

গবু-বাছুবগুলোকে চোখে চোখে বাখে ময়নাব মা। কে জানে কখন কোন পথে হাবিয়ে যায়। সংসাবে বেড় নেই। ঘবে বাঁধন নেই। বেনো জলে কোথায় কী ভেসে যায়!

মাঝ বাতে মায়েব কান্না শুনে যাদুব ঘুম ভেঙে যায়। মা কাঁদে ডুকবে ডুকবে, মা কাঁদে হাউ মাউয়ে। যাদু আব ভাদুকে জড়িয়ে ধবে মা কাঁদে। মা কাঁদে পনেব বিঘে জমিব ধানেব শোকে। মা কাঁদে গাই-বাছুবেব শোকে। মবাই হবে না সামনেব বছব। যাদু, ভাদু, মাধো দুধ পাবে না বাতে। ছাগলেব চিৎকাবে আব ঘুম ভাঙবে না ভোবে।

যাদু বলে—ভাবিসনি মা। দেখবি, শ' বিঘে জমি কিনব। বিশ মাপেব এক একখানা মবাই কববো। উঠোনে পা ফেলাব জায়গা বাখবোনি। তুই সিঁজোতে সিঁজোতে এলিয়ে যাবি।

ভাদু নাকেব জল মুছে বলে—একশ' গোঁজেব গুয়োল কববো। ছাগল পুষবো দু পাল। গয়লাদেব পাল জায়গা পাবেনি মানাতে। গাই পুষবো দু' গণ্ডা। অত গাই দুয়বি কেমন কবে?

ঘুমোয় ময়নাব মা। মবাই আব গবু-ছাগলেব স্বপ্নে বাত কাটে। ধান আব দুধেব স্বপ্নে দিন পেবোয়। লক্ষ্মী একদিন পা ছড়িয়ে বসবে উঠোনে। ভগবতী স বা মানা জুড়ে ছুটে বেড়াবে। সুখেব সংসাবটা দেখতে পায় ময়নাব মা। বাগানেব গাছে আমেব থোকা। তেঁতুলেব ডালে ডালে ভবাট শুঁটি। বর্ষায় মানাভর্তি নদীব মাছ। বান্না চালে গামলা গামলা দুধ। গোয়ালেব গায়ে আকাশ ছোঁয়া খড়েব পালুই। সজনে গাছে চিবুনিব দাঁড়াব মতো সাব সাব ডাঁটা। পুকুবেব পাড়ে জোড়া কলাগাছ। পোয়াল গাদায় পেথে পেথে ছাতু।

যাদু-ভাদু-মাধোব ছেলেপিলেতে সংসাবে নিত্যদিনেব উৎসব। কলকাতা থেকে নিজেব সংসাব নিয়ে আসবে ময়না। সাব সাব ঘব উঠবে খামাবে। লোকে বলবে বামুন পাড়া।

চার

বাধাকেষ্ট পাল ঘোড়া থেকে নামলেন। স্কুলেব ঘণ্টা বাজল। ছাত্র আব ঘোড়া, দুটো একই চাবুকে সামলান বাধাকেষ্ট পাল। বাবা ছিলেন পত্তনীদাব। সেই সূত্রে বর্ধমানেব বাজদববাবে যাতায়াত। ক্যাম্পবেল সাহেবেব সঙ্গে ওখানেই পবিচয়। সেই সম্পর্কেব সূত্র ধবে বিনয়কৃষ্ণ পাল জেনেছিলেন ষাঁড় চবানোব জলাভূমি কেমন কবে পৃথিবীব সেবা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকে বাধাকেষ্ট দেখেছেন বাবা অন্যসব মানুষজন থেকে কতখানি আলাদা। চাবপাশেব বন, সামান্য কিছু বাড়িঘব, বহমান ছোটখাল, ঝিঁঝিঁব স্বব, শেয়ালেব ডাক, ঝাড় লণ্ঠন—এসবেব ভেতব বসে বাবা চাব মাসেব পুবনো নিউ স্টেটসম্যান পড়তেন।

যাদুব মাকে চিনতে পাবেন বাধাকেষ্ট পাল। ছেলেটি যে যাদুব ভাই তাও বুঝতে পাবেন। যাদুব মাযেব কোন কথা শোনাব আগেই ভাদুকে প্রশ্ন কবতে শুবু কবেন

দ্য ক্যাকলিং অব গিজ সেভড বোম।

সাবজেক্ট কোনটি ?

মিস কিটি ওযাজ বুড এ্যাট দ্য টেবিল ওযান ডে।

প্রেডিকেট ?

উই ক্যাননট পাম্প দ্য ওসেন ড্রাই।

প্রেডিকেট ?

লিটল স্ট্রোকস ফেল গ্রেট ওক্স।

প্যাসিভ ?

মেন মাস্ট ওযার্ক এন্ড উযেমেন মাস্ট উইপ।

পাস্ট ফর্ম অব উইপ ?

উত্তবে খুশি বাধাকেষ্ট পাল। হাতেব বেতটা ভাদুব মাযেব দিকে তুলে বলেন—যাদুব মতো এবও ফুল ফ্রি। যাদু ইঞ্জিনিযাবিং পডছে, একে ডাক্তাব হতে হবে। স্কলাবশিপ এক টাকা। হি ইজ আ ল্যাড অব গ্রেট প্রমিস। ইজ লাইফ ওযার্থ লিভিং ? ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য লিভাব। বোজ আধসেব কবে দুধ দিতে হবে। সঙ্গে আধ ছটাক ঘি।

যাদু শিবপুবে। ভাদু দাদাব মতো সকালে চান সেবে বেবিযে পডে। পবনে ধুতি, হাতে কমণ্ডুলু, কাঁধে নামাবলী। নদী পেবিযে পুজো সাবতে সাবতে যায। পাঁচ গাঁ পেবিযে গোবিন্দপুবেব চক্রবর্তীদেব বাডি। ওখানে ভাতভোগ সেবে পোশাক বদলায। চক্রবর্তীদেব বাডিতে খেযে স্কুলে যায। ফেবত পথে ওখানেই পোশাক খুলে ঠাকুবেব সন্ধ্যাবতি দেয। সকালেব চাল আলু আব বাতেব মুডকি-বাতাসা নিযে মেঠো পথে হাঁটে। এক গাঁযে সন্ধ্যাবতি সেবে পবেব গাঁযে ঢোকে। ফিবতে ফিবতে সন্ধে-বাত গডিযে যায।

পিসেমশাই জমিব ধান বছব চাবেক ছেডে দিযেছিলেন। পবে আধাভাগ নিতেন। যাদু ইঞ্জিনিযাবিং কলেজে ভর্তি হওযাব পব পিসেমশাইযেব বড ছেলে আসে। জমিতে ধান-আলু বড কম হচ্ছে। ঠিক সমযে সেচ হচ্ছে না। লাঙল পডছে না বাত ওঠাব মুখে। লোক ডেকে এনে চায কবালে অমনই হয। গযলা পাডাব সুর্চাদকে চাষী ঠিক কবে।

মযনা হাতে-পাযে পর্যন্ত ধবে। বিযেব জন্যে পনেব বিঘে জমি বেচা। সুখে থাকবো ভেবে জমিব মাযা ছেডেছে মা। দেখ, কী সুখে আছি। জোডা থান এনে মা মেযেতে পবি। ছেলে দুটি নিযে মাযেব অন্নে ভাগ বসাচ্ছি। আব কটা বছব সবুব কব। ছেলে দুটো একটু বড হোক, ঘুঘুডাঙায চলে যাব। ততদিনে বড ভাইটি আমাব বোজগেবে হবে। পাবলে দেনা মিটিযে জমি ফেবত কবে নেবে। না পাবলে তোমাদেব জমি তোমবা যা খুশি কোবো। অন্যকে ভাগে দিতে চাও, দিও। বেচতে চাও বেচো।

পিসেমশাইযেব ছেলে ক্লাস সেভেন-এ তিনবাব ফেল কবে পিতল-কাঁসাব ব্যবসা কবেছে। হিসেব বোঝে। হয চাষী হও, নয কামাব। লোকেব চাষেব ধানে ভাত খাবে, পডবে ইঞ্জিনিযাবিং—হয না।

মযনা নিবর্থক ছয আব চাব বছবেব ছেলে দুটোব পিঠে ঘা বসায। ঐ পনেব বিঘেব দায তাদেবও। ওদুটোব জন্যে যত চিন্তাভাবনা। নইলে ঝি খেটে খেতো অন্যেব

ঘরে। ছেলে দুটোর পর রাগটা গিয়ে পড়ে নিজের ওপর। দেয়ালে মাথা ঠোকে। কপালটা ফুলে ওঠে বেশ খানিক। রক্তরক্তের কালো ছোপ পড়ে। মা শুকনো সান্ত্বনা দেয়—আমাদের জুটলে তোদেরও ভাত জুটবে।

ভাত জোটে। ছটি প্রাণীরই মুখে ভাত ওঠে। কোনদিন সময়ে, কোনদিন অসময়ে। কোনদিন সেদ্ধ কোনদিন আতপ। দেবদেবীকে কেউ অন্নভোগ দেয়। সে ভোগ বাড়ি আনতে পারে না ভাদু। তবু সেই সব পুজো ভাদু করে। বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধে চাল মেলে, দান মেলে। যাদের ভক্তি ভাগ কম তারা আতপ দেয়, কেউ বা সেদ্ধ চাল। আতপে ভাদুর মায়ের সুবিধে। ফেন ফেলতে হয় না। সাড়ে তিনসের চালে ছ'জনার দুবেলা' হয়ে যায়।

ভাদুর মায়ের হিসেবে কখনো কখনো গোলমাল হয়ে যায়—নদীর জল ফুলে উঠলে, আটপুকুরের কারো সংসারে জন্ম-মৃত্যু ঘটলে, বোশেখের ঝড়ে নদী কাঁথির গাছপালা প্রলয় নাচন শুরু করলে। তখন নিরুপায় ভাদুর মা গয়লাপাড়া কামারপাড়ায় চাল ধার চাইতে যায়। মাসের পয়লা, সংক্রান্তি আর লক্ষ্মীবারে ধার মেলে না।

সন্ধে নামে। মাধো আর ময়নার দু-ছেলে ভানু-কানু রান্না চালে গিয়ে বসে। উনোনের গায়ে কাঠের পাহাড়। আর খানিক পরে ভাদু ফিরবে। তখন উনোন জ্বলবে। ভাত চড়বে। ভাত ফুটবে। ভাত নামবে।

কোনো কোনো দিন ফিরতে দেরি হয় ভাদুর। বৃষ্টি নামলে, ঝড় উঠলে, নদীতে জল বাড়লে। তখন গাঁ-মুখো মানুষের অপেক্ষায় নদী তীরে বসে থাকতে হয়। সে সব দিনে মাধো আর ভানু-কানুর সময় কাটে ভবিষ্যতের পরিকল্পনায়।

বড় হয়ে ভানু চলে যাবে কলকাতায়। মিষ্টি দোকানে কাজ নেবে। রসগোল্লা তৈরি করবে। তৈরি করতে করতে চারপাশ দেখে নেবে। যেই মালিক মুখ ঘোরাবে অমনি মুখে পুরে নেবে দুটো।

—এখানে আর আসবিনি? মাধোর চোখে উৎকণ্ঠা।

—আসব। ছুটি পেলে। তোদের সবার জন্যে রসগোল্লা আনবো।

—দাদার সঙ্গে আমিও কলকাতা যাব। কানু বলে। সিঙাড়া খাব। চপ খাব।

—কলকাতাতে থেকে যাবি? মাধো অবাক।

—আসবো। আসার সময় চপ-সিঙাড়া আনবো। তুই খাবি, মেজমামা খাবে, দিদিমা খাবে।

—তুই কী করবি? ভানু প্রশ্ন করে মাধোকে।

মাধো চুপ। ভানু-কানু কলকাতায় ছিল। তারা দেখেছে অনেক কিছু। সহজেই কী করবে বলে দিতে পারে। মাধো ঠিক করে উঠতে পারে না কী করবে বড় হয়ে। গরু চরাতে পারে। পুজো করতে পারে। চাষ করতে পারে। গয়লাদের মতো ভিন গাঁয়ে দুধ দিয়ে আসতে পারে। কামারদের মতো মেলায় মেলায় হাতা-খুন্তি বিক্রি করতে যেতে পারে। কিন্তু কোনোটাই ভানু-কানুর রসগোল্লা কিংবা চপের মতো লোভনীয় হয়ে ওঠে না। অনেক ভেবেচিন্তে মাধো বলে—খেজুর গাছে রস দুবো।

—সে তো শুধু শীতকালে। তারপর? ভানুর প্রশ্ন।

—তারপর আম পাকবে।

—তারপর?

—বানে মাছ উঠবে। আড় মাছ খাবো।

—তারপর?

—গযলাদেব মতোন দু-তলা পাকা ঘব কববো। বন্দুক দিযে পাখি মেবে বিদু গযলাদেব মতোন ছাতে ফিস্টি কববো।

ভানু-কানুব বসগোল্লা-সিঙাড়া পানসে হযে যায। মাধোব বালিহাঁসেব দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিযে থাকে ভানু কানু।

পাঁচ

বর্ধমানেব ডাক্তাব সামন্ত বললেন—আপনি তো বত্নগর্ভা। বড়ছেলে ইঞ্জিনিযাব, মেজছেলে ডাক্তাব, ছোটছেলে এ্যাসিটেন্ট হেডমাস্টাব।

– অনেক কষ্টে মানুষ কবেছি বাবা। তোমাদেব বাপ-মাযেব আশীর্বাদে কবেকম্মে খাচ্ছে।

—তা হলে আব অত কষ্ট কবেন কেন ? ভাদুব সঙ্গে কলকাতায দেখা হযেছিল। বলল আপনি এখনো গবু ছেড়ে নদীব মানাতে বসে থাকেন।

—সে কি আব পাবি বাবা ! বাগালটা না এলে যাই। তাও মাধো দেখলে মুখ কবে।

সে তো কববেই। প্রেসাব হাই। এ্যানিমিযা আছে। বেস্ট নিন।

—কী কবে বসে থাকি বল ! ছোট বউযেব শবীবে তো কিছু নাই। বড় বুগনো। লাতা বাসনমাজা যতটা পাবি কবি।

– নবীনগঞ্জে থাকলে আপনাব বোগ সাববে না। হয যাদুদাব কাছে বম্বেতে গিযে থাকুন, নয কলকাতায ভাদুব কাছে যান। এই ওষুধগুলো ঠিকঠাক খাবেন। আমি পেসেন্টগুলো ছেড়ে দিই। আপনি ওপবে যান। মাযেব সঙ্গে কথা বলুন।

মাসে এক-দুবাব ডাক্তাব সামন্তেব কাছে চলে আসে যাদুব মা। খাল পেবিযে নদী ডিঙিযে তিন মাইল মাঠ ভেঙে বাসবাস্তায ওঠে। বাসে চেপে বর্ধমানে নামে। বিকশা ধবে ডাক্তাব সামন্তেব কাছে চেম্বাবে আসে। ভাদুব মেডিকেল কলেজেব বন্ধু ছিল দীপেন সামন্ত। কলেজে পড়াব সময বাব তিনেক নবীনগঞ্জে গেছে। সেই সূত্র ধবে বুড়ি মাঝে মাঝে চলে আসে। নিজেব সুখদুঃখেব কথা বলে। এক কথা বাব বাব বলে। ছোট বউ বেগে দু-কথা বললে বাগেব কথা শোনাতে আসে। ভাল কথা বললে খুশিব কথা বলে যায। পেসেন্টেব চাপ না থাকলে যতক্ষণ পাবেন শোনেন দীপেন ডাক্তাব। চাপ থাকলে ওপবে পাঠিযে দেন। কথায ঠিকমতো কান না দিলে দু-মাস হযত আসবে না। বোগটা উপলক্ষ—কথা বলতে আসে যাদুব মা।

ওপবে গিযে শুবু কবে—দীপু বলছিল যাদু-ভাদুব কাছে যেতে। গেসলুম। মন টিকেনি। যাদুব ঝিটা চটি পবে বাসন মাজে। বউকে বললুম। বললে ওখানে ওই বীতি। কী বীতি কে জানে বাবা। এই তো খালি পাযে আমি কতদূব এলুম। পা কি ক্ষযে গেছে !

দীপুব মা বলেন সে তো বটেই। বিদেশ-বিভুঁযে আমাদেব পোষাবে না। বম্বে-ফোম্বেতে তোমাব ঐ সিনেমা আর্টিস্টদেবই ভাল। আমাদেব কথা ওবা বোঝে না, ওদেব কথা আমবা বুঝি না।

ভাদুব মা বসগোল্লাতে মাড়িব কামড় বসিযে বলে—ঠাকুব দেবতা নাই, শনি মঙ্গলবাব নাই। যাদুকে বললুম—দেশে ফিবে চ বাবা। বর্ধমান জেলায কি কাবখানা নাই !

– সত্যিই তো।

—ছেলেটি পেটেব, বউটি তো না। দেশলাই বাক্সের উপর দেশলাই বাক্স, তাতেই সুখ। আমি বললুম, রিটার করেছিস। খামারে ঘর করবি চ। মাধো দু পাঁজা ইট পুড়িয়ে রেখেছে। নদীতে বালির পাহাড়। ক বস্তা সিমেন্ট আর লোহা আনিয়ে নিবি। ঘরের চাল, ঘরের আনাজ—সুখ করে থাকবি।

-কী বলল ?

দীপুর মা জিজ্ঞেস করেন।

—বলল ছেলেটা চাকরিতে ঢুকলে ঘরে ফিরবে। বউ বলে, আলো নাই পাখা নাই। হ্যাঁগো আমরা আছি তো, না কি ? সাঁওতাল পাড়ায় আলো এসেছে। মাঠের শ্যালোতে লাইন দিয়েছে। আর ক'টা থাম্বা গাড়লেই তো নবাবগঞ্জ। তখন পাখা, টিভি, ফ্রিজ--যা লাগাবে লাগাও।

—তা ঠিক।

—যাদু ইস্টিশনে তুলতে এসেছিল। হাত দুটি ধরে বললুম, বাবা মরণ সময় দেখতে পাবনি তোকে ? তোর হাতের আগুন পাবনি ? যাদু সেই আগের মতো। কামারপাড়ার সবার খবর নেবে। গয়লাপাড়ার পিসি, খুড়ি, মেসো—সবার খবর। নদীমানার আঁকড় গাছ, তাল গাছ, খেঁজুর গাছটি অবদি। যাদুর মনটি আমার নবাবগঞ্জের ঘাটে-মাঠে পড়ে আছে। মাসে তিনটি চিঠি আসবেই।

কথা বলতে বলতে বেলা একটা। সামন্ত ডাক্তার ততক্ষণে চেম্বার সেরে চান-খাওয়া করতে আসেন। যাদুকে ছেড়ে ভাদুতে চলে যায় বুড়ি—কিছু বলেছে ? গাজনে আসবে ?

—তেমন কিছু বলেনি। বলছিল যেতে হবে একবার। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

দীপুর মা জিজ্ঞেস করে—গাজনে আসে ?

—আগে প্রত্যেক বছর আসত। এখন মাঝে মাঝে। গাজনে বড় টান ভাদুর। তখন সবে ডাক্তারি পাস করেছে। মিশন হাসপাতালের ডাক্তার। গাজনে ছুটি দেয়নি বলে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। তারা আবার বুঝিয়ে-সুজিয়ে ধরে নিয়ে গেল।

—ঠাকুরই টেনে এনেছিল। দীপুর মা বলেন। ঠাকুর টানলে এবারও নিশ্চয় চলে আসবে।

একটু বিরক্তির স্বরে দীপু ডাক্তার মাকে বলেন—ঠাকুর টানলেই চলে আসবে ? ভাদু এখন কলকাতার প্রথম পাঁচজন গাইনির একজন। রুগী দেখা অপারেশন সব মিলিয়ে মাসিক আয় চার-পাঁচ লাখ টাকা।

—বাবা দীপু, তোমার কথা ভাদু শুনবে। বর্ধমানে তোমার মতো চেম্বার করুক। ঘর ভাড়া করে থাকুক। মাধোর মতো রোববার রোববার ঘর আসবে। বিধবা মায়ের কষ্টের ছেলে বাবা !

—ময়নাদির ছেলের খবর কী ?—বুড়িকে ভাদুর প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে দিতে চান ডাক্তার।

—ময়নার আমার আর এক দুঃখু রে বাবা।

—কেন ?

—কাঁচা বয়সে বিধবা হল। সে এক দুঃখু। ছেলে মানুষ করল। সে ছেলে দেশান্তরী হল। ভানু মেম বিয়ে করেছে। অ্যামেরিকা কত দূর রে বাবা ?

—ময়নাদি যায়নি ?

—একবার গেছল। মাস ছয়েক ছিল। বড় শীত সে দেশে। মেয়েরা অবদি প্যান্ট-

কোট পবে। মযনা বলেছে, মা আমি তোমাব কাছে থাকবো। মাঝে-মধ্যে এক দু'মাস গিযে থেকে আসবো ভানুব কাছে।

দীপুব মা বলেন—মযনাব ছোটটি ছিল আমাব মেযেব বযসী।

মুখটা বদলে যায বুড়িব। বুকেব ভেতব কিসেব উথালপাথাল। বুড়ি বলে ছ'টা মাস কানু ছিল আমাব কাছে। গবু ছেড়ে বসে থাকতো মানায। মাঠে যেতো। বলতো, দিদিমা আমাব চাকবি ভাল ল্যাগেনে। চাষ কববো। ঘুঘুডাঙাব বাড়িঘব বাগিযে চায ধববে। আমি তো হেসে লুটোপুটি।

– কেন ? ডাক্তাব জিজ্ঞেস কবেন।

—জন্ম থেকে কলকাতায। বলে কিনা চাষ কববে। সাঁওতাল পাড়ায যেতো। বলতো খাঁদুব ছেলেব কাছে তিবকাঁড় ছোঁড়া শিখছে। জমি নিযে গযলাদেব সঙ্গে সাঁওতালদেব মাবামাবি লাগল। থানা-পুলিস হল। ধবে নে গেল কানুকে। ফেবত দিলনি। মযনাব ঘবে ঠাকুব দেবতাব পাহাড়। কত মানুয কতকাল পবে ফেবে। ঠাকুব মুখ তুলে চাইলে ঠিক ফিববে।

—মাযেব মন। এ শোক ভুলবে কেমন কবে ? ডাক্তাবেব মা বলেন।

আমিও সে দশ্য ভুলতে পাবিনি গো। বলতো কলমে কাগজ নোংবা হয, লাঙলে ফসল ফলে। আমায বলেছিল কানু, ঘুঘুডাঙায নবান্নে নে যাবে। নাত বউযেব হাতে পিঠে-পুলি খাওযাবে।

ঝিমিযে পড়ে বুড়ি। ডাক্তাব ওঠেন। চেম্বাবে বসাব সময হল। দীপুব মা হাত ধুতে ওঠে। বুড়ি আসন তুলে কলেব সামনে যায। এবাব যেতে হবে। বেলা দুটোব ঘণ্টি বাজলো।

ছয

দুযাবে হ্যাবিকেনেব আলোয মাধো উচ্চ-মাধ্যমিকেব খাতা দেখে। পবশু বর্ধমানে জমা দিতে হবে। মাধোব বড় ছেলে কার্তিক পটাশ সাবেব বস্তাগুলোব জন্যে পাড়ন কবে। কার্তিকেব তিন বছবেব ছেলেটা মাযেব বলা বাংলা শব্দেব ইংবেজি কবে। কার্তিকেব মা বান্নাচালায দুধে জ্বাল দেয।

বুড়ি তুলসীতলায নামজপ কবে। সাবা মুখে দীর্ঘ সমযেব নানান চিহ্ন। নব্বইবই বছবেব চামড়া, সেমিজেব মতো, শবীবেব কাঠামোয ঝুলে আছে। চোখজোড়াতে বর্ষাব নদীব ঘোলাটে বঙ। বটেব ঝুবিব জড়ানো আকাব মাথাব চুলে। গ্রীষ্মেব বোদ আব শীতেব শুষ্কতা ছাপ বেখে গেছে বছবেব পব বছব দুগালে, নাকেব ডগে। নদীব বালি কুবে কুবে খেযেছে আঙুলেব ডগ, আঙুলেব সংযোগস্থল। হাতেব কনুই, পাযেব পাতাব বাইবেব দুই গাঁট, হাতেব নখেব আঠেব গিবে গাঢ় খযেবি। সব দায মিটিযে দিযে দুই স্তন পবজীবী উদ্ভিদেব মতো ভেসে আছে। ঠাকুবেব জপেব সমস্ত মন্ত্রগুলো আব মনে আসে না, দুটো শব্দেব পবেই হোঁচট খায। নাসিকাধ্বনিতে শূন্যতা পূর্ণ ক'বে আব চেনা শব্দে ফেবে বুড়ি। আবাব নাকে ফিবে যেতে হয পবেব শব্দেব সন্ধানে। শেষে হতাশ হযে নিজেব কথায আসে। যাদুব প্যাবালিসিস সাবিযে দাও ঠাকুব। যাদুব বড় মেযেব একটি ফল দাও। ভাদুকে বর্ধমানে ফিবিযে আনো। ভাদুব ছোট ছেলেব চাকবি দাও। মাধোব হেডমাস্টাব হওযাব শখ। বেজোব ইস্কুলটিও কাছে। ছেলেগুলি সব আমাব ঘবে ফিবুক। মাধোব বড় ছেলেটিব চাষে মন নাই। ব্যবসা-ব্যবসা কবছে। কার্তিকেব চাষে মন ফিবুক। মাধোব ছোটটি সমুদ্রে ভাসে। জাহাজে জাহাজে এদেশ-

ওদেশ। স্বপনকে দেখো ঠাকুব। ময়নার পেটে পাথর। গলিয়ে দিও।

পণ্ঠা গয়লা সদর দরজায় হাঁক মারে—এসেছ নাকি মাস্টার ?

—হ্যাঁ। ভেতরে আয়।

মাধো উত্তর দেয়।

—গত হপ্তায় তো এলেনি ?

—হেড এক্সামিনারের বাড়িতে খাতা জমা দেওয়ার ছিল। যেতে হলো।

কালীপুব স্কুলের এ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার মাধো। দায়-দায়িত্ব অনেক। অন্য কাজও আছে। প্রতি শনিবার আসতে পারে না। সরকারি নিয়মে এখন ষাটে রিটায়ার্ড। সেই নিয়ে টিচারদের পি এফ, পেনসন ইত্যাদি নানা হিসেব-নিকেশ। কার্তিকের বিয়ের পর মাধো বউকে নিয়ে গেছে কালীপুরে। হস্টেলের ভাত পেটে আটকাচ্ছে না। কার্তিকের বউ রেখা সামলাচ্ছে নবীনগঞ্জের ঘরসংসার। একটাই ছেলে। মাধোর মা-ই সামলায় তাকে। সব সময় দেখতেও হয় না। গয়লাপাড়া, কামারপাড়ায় নিজেই চলে যেতে পারে। চাষের কাজকর্মও আর তেমন নেই এখন। যতটুকু সংসারের চালমুড়ির জন্যে। তিরিশ টাকায় মজুব খাটিয়ে আর ইউরিয়া-পটাশের দাম মিটিয়ে লাভ নেই এখন। এর চেয়ে ব্যবসাতে বেশি লাভ। যাদুর ছোট ছেলে বোম্বেতে ভিডিও পার্লার করে লালে লাল। ভাদুর মেজ ছেলে কমপিউটার ট্রেনিং দিয়ে মাসে বিশ হাজার টাকা তুলে নিচ্ছে হাজরার ক্ষিরোদ ঘোষ বাজার থেকে। মেজ ছেলের বউয়ের সোয়েটের টিপের ব্যবসা। শেয়ারের কাগজে আলমারি ভর্তি।

চায়ে চুমুক দিয়ে পণ্ঠা বলে—শকুনির চোখ পড়েছে গো মাস্টার।

মুখ তোলে মাধো। বর্গ বেকর্ড খেতমজুর আন্দোলন, পঞ্চায়েত ইলেকসন নতুন কী, আবার ?

—মাস্টার, পিসিকে পুড়োতে গিয়ে হাতাহাতি।

পণ্ঠার পিসির কথা শুনে উঠে আসে বুড়ি। তার চেয়ে ন' বছরের ছোট ছিল। অকালে চলে গেল।

—কী হয়েছে রে পণ্টু ? হ্যাঁরে পণ্টু, হল কী ?

বুড়ি এগিয়ে আসে পণ্ঠার মুখোমুখি।

—ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বলে গাছ কাটা চলবেনি।

মাধো মুখ নামিয়ে নেয়। অন্য কিছু ভেবেছিল সে।

বুড়ির মাথায় চিন্তা ঢোকে। দুয়ারের দিকে মুখ তুলে বলে—হ্যাঁরে মাধো, শুনলি ?

—শুনলুম। গবমেন্টের গাছ। না দিলে করব কী ?

—তোরা কি আমায় কবর দিবি ? পুড়োবি নে ? পুতে দিবি ?

হেসে ওঠে সবাই। পণ্ঠা বলে—তোমার আর চিন্তা কী জ্যাঠাইমা ?

—কেনে ?

—চলে যাবে কলকাতায় ভাদুর কাছে। ছোট মেয়েটার জন্যে সম্বন্ধ করতে গেসলুম। আহা, কলকাতাতে মরেও সুখ গো।

—তাহলে মরার সময় কলকাতাতেও যেও কাকা।

কার্তিকের বউ রেখা বলে।

—যা বলেছিস মা। এখানে মরলে বাঁশের চৌদলা, ওখানে পালিশ করা খাট। সে খাট গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবে।

বুড়ি মুখ তোলে—যে যায় সে সুখেই যায়। যারা থাকে তাদেরই দুঃখ। ভবনদী...

—নদীর কষ্ট সবার নাই। কেওড়াতলায় ভি-আই-পিদের পিছনে বন্দুক দেগে দেয়। সোজা গিয়ে পড়ে স্বর্গে।

মাধো খাতাগুলো গুটিয়ে ফেলে। পণ্টা সন্ধেটা এখানেই কাটাতে এসেছে। মাধো উঠোনে নেমে এসে বলে—কাঠ পেলি কোথায় ?

—কুড়োল নিয়ে তেড়ে গেলুম। পালিয়ে গেল। আমাদের নদী, আমাদের চর, তোরা শালা মাতব্বরি করবি ?

বুড়ি বলে—পাঁচটা ডাল কাটলে মড়া পুড়ে ছাই। তার আবার ঝগড়া কিসের ?

—পাঁচটিতে হবেনি। পণ্টা বলে। নতুন দালানটা ফেঁদেছি। ঠিকই করে রেখেছিলুম দরজার কাঠগুলো নদীমানা থেকে করবো।

—তাই বল। হাসে মাধো। মড়া পোড়ানোর ডাল কাটতে ওরা বারণ করেনি। তুই মড়া পোড়ানোর সঙ্গে দরজা-জানলার কাঠ জোগাড় করছিলি!

—মাস্টার, তোমার মতো বুদ্ধি তো আমার নাই। তুমি কতকাল আগে তিনখানা মাজা অর্জুন ঘর ঢুকিয়ে রেখেছো। তা ঘরটা ফাঁদবে কখন ?

—দাঁড়া। রিটায়ার করি।

—দক্ষিণ দুয়োরিটা ভেঙে করবে তো ?

—নারে বাবু। রিটায়ার করলে পেনসেন সম্বল। আরামবাগের জায়গাটাতে একটা দোতলা তুলবো ভাবছি। নিচের তলাতে কার্তিক ব্যবসা করবে। দোতলাতে আমি টিউসনি করব। ছ-কুটরি করলে কাজ-থাকা সবই হবে।

—জ্যাঠাইমা, তুমি আরামবাগে না এখানে থাকবে গো ?

বুড়ি কার্তিকের ছেলে টুম্পুর মুখে মধু দেয়। গত রাতে খুব কেশেছে। মাধো-পণ্টার কথায় কান ছিল না বুড়ির। মুখ তুলে বলে—কী ?

—বলি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে ?

—যাওয়ার জন্যে বসে আছি রে বাপ। ডাকলেই চলে যাবো।

রেখা বলে—ঠাকুমার কানে কিচ্ছু ঢোকেনি। কোথায় যাবার কথা হচ্ছে বল দিকি ?

বুড়ির চোখ দুটো ভেসে ওঠে। শরীর থেকে বেরিয়ে কাপাস তুলোর মতো উড়তে থাকে। বাতাসে দোল খেতে খেতে তালগাছের মাথা ছাড়ায়। নিচে পড়ে থাকে নবীনগঞ্জের খেত-খামার, বালির চর, নদীর জল, ঘর-সংসার, কাশের বন, আম-কাঁঠাল-অর্জুন-আমলকির জঙ্গল। শাশুড়ি বসে আছে পা ছড়িয়ে। আয় মা, কতদিন তোকে দেখিনি। দাঁড়িয়ে আছে যাদুর বাপ, এই নে তোর সবুজ রঙের বেনারসী। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে জামাই। ভাদুর বড় ছেলেটা আঠার বছর বয়েসে ডুবে গিয়েছিল দীঘার সমুদ্রে। সে 'ঠাকুমা' 'ঠাকুমা' বলে ছুটে আসে। ময়নার ছোট ছেলে কানু আমড়াগাছের ওপর বসে আছে। সেই আগের একগাল দাড়ি। দিদিমাকে দেখে হুমড়ি খেয়ে ছুটে আসে। ঘুঘুডাঙায় নাত-বউয়ের হাতে পিঠে খাওয়াতে পারিনি। দেখ, এই তোমার নাত-বউ। দিদিমা আনন্দে আটখানা। যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনি। বুক-হাঁড়ি পাছা-ভারি মেয়ে। চিবুক ধরে আদর করে বলে—শত ছেলের জননী হও মা। সংসারের মুখে বোল ফোটাও।

—তুমি বাবা-মায়ের সঙ্গে আরামবাগে গিয়ে থাকবে ? রেখা জিজ্ঞেস করে।

—কোন দুঃখে ?

টুম্পুকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বুড়ি।

সাত

বুড়ির একশ বছর হলো। টেলিগ্রাম এসেছে বম্বে থেকে। বুড়ি কেঁদে হাপসে মরে। যাদু বলেছিল নবীনগঞ্জে পাকা দালান করবে। যাদুর ইটপাঁজাটা মাধো গাড়িতে চাপিয়ে আরামবাগ নিয়ে চলে গেল। যাদু বলেছিল বাপের বেচা সব জমি আবার ফেরত করে আনবে। মাধো জমি বেচে দেয়। যাদু গয়লাপাড়া কামারপাড়ায় মানুষজনের খোঁজ নিত ফি হপ্তার চিঠিতে। মাধো এখন মাসে একবার আসার সময় পায় না। যাদু অকালে বিছানা নিল। যাদু আর বিছানা ছাড়লনি। যাদু মরে গেল।

চিঠি লিখেছে কলকাতা থেকে ভাদুর নাতি। তাকে যেতে লিখেছে। কী হবে গিয়ে ? লোকে বলে তোমার বেটার একশ টাকা ভিজিট। কী আছে কাগজের টাকায় ? একশ গরু কিনবে বলেছিল ভাদু। বলেছিল নদীমানা জুড়ে একশ গরু হামলে বেড়াবে। টাকা হামলায় ? টাকা দুধ দেয় ? গাঁয়ের গাজনে কামারপাড়া গয়লাপাড়ার ঘর-সংসারে হৈ হৈ। পুকুরে মাছ ধরায়, ছাগল কাটে। রোজ আধ ছটাক ঘিয়ের কথা বলেছিল রাধাকেষ্ট পাল। মাথার কাজে ঘি দিতে হয়। কত আধ ছটাক ঘি হরলিক্সের শিশিতে শিশিতে পচে গেল। বিয়ের আগে পর্যন্ত মাসে মাসে আসত। দুধ খেত, ঘি খেত। বিয়ের পর দু-তিন মাস পরে পরে আসত। নিয়ে যেতো ঘরের ঘি। মা বেঁধে দিত চাষের চাল, জমির বাই সর্ষে, গাছের পেঁপে, লাউয়ের কচি কচি ডগা। এখন বছরে একবারও আসে না। নার্সিংহোম থেকে ছুটি পাওয়া মুশকিল। ঘি করা বন্ধ করে দিয়েছে বুড়ি।

চিঠি পাঠিয়েছে কার্তিকের ছেলে টুম্পু। ছেলেটাকে কোল থেকে কেড়ে নিল মাধো আর কার্তিক মিলে। মানুষ হবে না। তোরা মানুষ হলি কী করে ? ছেলেটাকে পুরুলিয়া মিশনে ভর্তি করে দিয়েছে। তেমন মা। একটু কাঁদল নে। ছেলেটা বাপের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। মুখ লুকিয়েছিল বড় ঠাকুমার বুকে। যেমন মা তেমন ঠাকুমা। কোল থেকে ছাড়িয়ে নিল দুজনাতে।

কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল ছেলেটা।

খেজুর গাছের নিচে পাকা খেজুর পড়ে, পচে, শুকোয়। গাছের পেঁপে কাকে ঠোকরায়। পেয়ারা পেকে পড়ে যায় গাছ থেকে। কাঁচা আম পেড়ে খাওয়ার মানুষ নেই। দুধ দোওয়ার সময় মাছি তাড়ানোর ছেলে নেই। মোষের বাছুর ঘোরে। সাত দিনের বকনা ছুটে বেড়ায়। রান্নাচালায় বেড়ালবাচ্চাগুলো ঘুরঘুর করে। কুঁচো নেংটি ইঁদুরগুলো চালের বস্তার ওপর নেচে চলে। খড়ের গাদায় মেটেলি সাপের বাচ্চাতে পাহাড়। ওলগাছের গোড়ায় বেঙাচির ঘরগেরস্তি। বাচ্চাগুলো লেজ নাড়ে। সব আছে। সবাই আছে। টুম্পুকে নিয়ে চলে গেল ওরা। নবীনগঞ্জে ছেলে মানুষ হয় না। যাদু-ভাদুর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে মাধোর নাতিকে দাঁড়িপাল্লায় চাপানো হবে। দেখবে কার কতো ওজন।

ছড়িয়ে যাওয়া ঘর-সংসারকে কেমন করে জুড়বে বুড়ি ? কখনো হারিয়ে যাওয়া মানুষজন মনের ভেতর ভিড় জমায়। ছড়িয়ে যাওয়া আর হারিয়ে যাওয়া মানুষজনের মাঝে শূন্যে ঝোলে বুড়ি। গুলিয়ে যায় সব কিছুই। পণ্ডার মৃত পিসির খোঁজে রাতদুপুরে গয়লাপাড়ায় ছোটে। গোয়ালের গাদের পোয়াল-ছাতু তুলে নদী পেরিয়ে চক্রবর্তীদের ঘরে দিতে যায়। স্কুল-ফেরত ছেলের কাছে বটকৃষ্ণ পালের ঘোড়ার খবর নেয়। পাকমারা মেয়ের কাছ থেকে নেওয়া পাথর কার্তিকের বালিশের ভেতর ফুটো করে ঢুকিয়ে দেয়। এই পাথরে কার্তিকের পায়ে শেকড় গজাবে।

আবার কখনো মাথাটা পরিস্কার হয়ে যায়। তখন পণ্টার ঘরে গিয়ে সে কখন মেয়ের ঘরে যাবে তার খবর নেয়। পণ্টা বোঝায় এই শরীরে বাস-ট্রেনের ধকল সইবে না। তার চেয়ে ভাদুকে চিঠি লিখুক। কিন্তু শুধু ভাদুতে আশ মিটবে না বুড়ির। নাতি, নাত-বউ, নাতনি, নাতজামাই সবাইকে দেখতে চায় বুড়ি। চিঠি লিখলে সবাই মিলে তো আসবে না। নিরুপায় পণ্টা মেয়ে আসা পর্যন্ত বুড়িকে অপেক্ষা করতে বলে। এখন আশ্বিন। ছ-আটমাস পরেই আসবে মীনা। ছেলের গরমের ছুটি পড়লে দিন পনের এসে থাকবে। ওদের সঙ্গে চলে যাবে। মীনার সংসারও দেখা হবে, ভাদুদার ঘরেও থেকে আসবে ক'মাস।

খুশি হয় বুড়ি। পণ্টার বউকে ভাত চড়াতে বলে। পণ্টার বউ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। পণ্টা চোখ টেপে। তরকারি বসায়। কার্তিকের বউকে খবর পাঠিয়ে ভাত আনিয়ে নেবে।

—পণ্টা, আর আসবি নে তোদের নবীনগঞ্জে।

—কেন গো ?

—নদী সরে গেছে দক্ষিণে। মানাটা নেড়া করে দিয়েছে। মরলে পুড়োবার কাঠ জুটবে নে! তোরা আমায় না পুড়িয়ে কবর দিয়ে দিবি।

—সে কি হয় নাকি গো জেঠিমা ? পণ্টা হাসে। তোমার চৌদলে আমি কাঁধ দুবো। তোমাকে আপন জ্যাঠাইমা ভিন্ন ভাবিনি কোনোদিন।

—তুই নে যাবি ?

—এই পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

বুড়ির পা-দুটো জড়িয়ে ধরে পণ্টা।

—কাঁদবি ?

—বুক চাপড়ে কাঁদবো।

—ভাদু, মাধোকে খবর দিবি ? ওদের সবাই আসবে ?

—নদীর চরে লোকে থিকথিক করবে।

—ময়নাকে খবর দিবি ? ও তো ভানুর কাছে। অতদূর থেকে আসবে ?

—নিশ্চয়। শেষ দেখা দেখে যাবেনি ?

ময়নার মারা যাওয়ার খবর দেয়নি বুড়িকে। দশ বছর আগে গত হয়েছে ময়না। বুড়ি জানে উড়োজাহাজের টিকিট মিলছে না।

ভাত খেয়ে চলে যায় বুড়ি। ঘরে ফিরে কুমড়োর বিচ ছাড়ায়। টিকিনের ভেতর কাপাস তুলো ভরে। ময়না বলেছিল ওদেশের বালিশ ভালো না। মাথা বসে যায়। ঘাড় ধরে। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ছুটে এলে বালিশ করে দেবে কে ? বালিশগুলো সাঙাতে ঝুলিয়ে রাখবে। কার্তিককে বলে রাখবে মনে করে দিয়ে দিতে।

কার্তিকের ভাই স্বপনের চিঠি এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। চিঠি নিয়ে কামারপাড়ায় যায় বুড়ি। স্বপনের জাহাজ ফিরছে। বম্বে আসবে। বম্বেতে জ্যাঠাইমার ঘরে তিনদিন থাকবে। তারপর উড়োজাহাজে কলকাতা। কলকাতাতে মেজজ্যাঠার ওখানে কদিন কাটাবে। সেখান থেকে আরামবাগ। আরামবাগ থেকে গাঁয়ে ফিরবে স্বপন। স্বপন পুরো বছরটা কাটাবে নবীনগঞ্জে। বুড়ি বলে স্বপন যখন জাহাজে ফিরবে ওর সঙ্গে চলে যাবে। বাসে করে আরামবাগ। মাধোর ওখানে কদিন কাটিয়ে কলকাতা। কলকাতা থেকে বম্বে। বম্বে থেকে স্বপনের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে ময়নার কাছে। বালিশগুলোর ওয়াড় করা শুধু বাকি। কামারপাড়ার তিনু করে আরামবাগ যাবে সে খবর নিতে গেছে বুড়ি।

আজই গেছল তিনু। মাধোর সঙ্গে দেখা হয়নি। সে হাতির খবর দেয়, হাতি বেরিয়েছে। হাতির পাল। নদী ধরে ধরে আসছে। বিহার থেকে পুরুলিয়া হয়ে মেদিনীপুরে ঢুকেছিল। সেখান থেকে বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার জঙ্গল পেরিয়ে হুগলিতে ঢুকেছে। এবার বর্ধমান জেলায় এল বলে। জঙ্গল দেখলেই ঢুকে যাচ্ছে। পঁয়ত্রিশটা হাতির বিশাল এক পাল।

কপাল চাপড়ায় বুড়ি। পাঁচ সের ধান দিলে হাতির পিঠে চাপাবে বলেছিল মাহুত। পাঁচ সের ধানের চালে এক-দিন সংসার চলে যাবে। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিল যাদু। এতো হাতি দোরগোড়ায় বেড়াতে আসে। যাদু নেই।

আট

দিন-কানা পেঁচা টুসিগাছের ডালে ডেকে চলে। রাত কানা মানুষ ঘুমোয়।

বুড়ি ওঠে। যাদুর বাবা নেশা করে এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। দরজার চাবি খুলে বাইরে আসে বুড়ি। কেউ নেই। ফিরে গিয়ে শোয়। চোখ দুটো জুড়ে যায়। ডাক শোনে বুড়ি। ময়না ডাকছে। বোশেখের ঝড়ে আমের ডাল ভেঙে পড়ে। এত আম ধরে না আঁচলে, ডালা নিয়ে বেরোয় বুড়ি। ময়না নেই। ঘরে ফেরে বুড়ি। হেমন্তের তরল শীত গায়ে সুড়সুড়ি দেয়। বুড়ি পায়ের নিচে থেকে চাদরটা টেনে গায়ে নেয়। সময় কেটে যায় বেশ খানিক। এবার স্পষ্ট শোনে বুড়ি। যাদু ডাকছে। বাইরে আসে। গোয়ালটা ডাইনে ফেলে ছানিঘরের কাছে যায়। বাঁদিকে ছানিঘরটা রেখে ল্যাংড়া আমগাছের নিচে। আর খানিক এগিয়ে পালুইয়ের গা দিয়ে তালগাছের গোড়ায়। হাঁড়ি তালগাছটা পেরিয়ে নদীমানাতে নামে। শরবনের মাথা নড়ে। অঘ্রানের হাওয়া শিষ দিয়ে যায়। তার বয়সী আসুদ গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায় বুড়ি। নদীমানাতে গরু নেই। দুদিকের জঙ্গলকে ডাঁয়ে-বাঁয়ে ফেলে বুড়ি এগোয়। মাটির পথ ফুরিয়ে যায়। এখন শুধুই বালি। আকাশের চাঁদের গায়ে উড়ো মেঘের লুকোচুরি। বুড়ি বালির পথ ভেঙে এগোয়। চলতে চলতে নদীর তীরে আসে। দূরে কাঁথি ভেঙে চলে শাশুড়ি। জগন্নাথ দর্শন করবে। চাঁদের মুখের ওপর মেঘ পড়ে, মেঘ সরে। সেই আলো-ছায়ার ভগবান পাণ্ডার সঙ্গে চলে যায় শাশুড়ি।

চাঁদ ডুবে যায় মেঘের কোলে। মেঘে জল জমে। চাঁদ-বুড়ির চরকার সুতো শুকোয় না। বুড়ি মেঘ নিকড়োয়। জল ঝরে। জল গড়ায়। জলের স্রোত বয়। নদীতে বান আসে। কী করে ফিরবে ভাদু? খেয়াঘাটের পয়সা দেবে না। বড় একরোখা। বুড়ি বসে থাকে কেওড়াগাছের নিচে। লণ্ঠনের আলো পড়বে নদীর ওপরে। গামছার চাল গলায় ঝুলিয়ে ভাদু ঘাটে নামবে। বইয়ের পুঁটলিটা তুলবে মাথায়। মা সাবধান করবে— বাঁয়ে গর্ত। ডাইনে আয়। গামছার গিঁটটা ভাল করে দে। লণ্ঠনটা সোজা কর। দেখ তেল পড়ছে নাকি। পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো হালকা দিসনি। অ-মানুঠাকুরপো! ভাদুকে দেখলে? আসছে? গয়লাপাড়ার কেষ্টর সঙ্গে?

ঘরমুখে ফেরে বুড়ি। মানা জুড়ে গরু। ভাদু গরু কিনেছে। একশ গরু। দোতলা গোয়াল করবে ভাদু। ওপরে খড়, নিচে গরু। দুধ বেচে শোধ করে দেবে পিসেমশাইয়ের টাকা। জমি ফেরত।

কত গরু! ভাদুর একশ গরু। ডাক শুনে ভয়ে বসে পড়ে বুড়ি। গরু নয়, হাতি। মড়মড় করে ডাল ভাঙে। হাতির ডাকে জেগে ওঠে তিন পাড়া। শাঁখ বাজায়। টিন পেটায়। পেঁচা ডাল ছেড়ে উড়ে যায়। নদীমানার পাখিরা ডাক দেয়। গোয়ালের গরু

ডাক পাড়ে। ছাগল ডেরায়। মুরগি ডাকে। হাঁস প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে।

দুপুরবেলায় সাঁওতালপাড়ার নতুন পোলের ওপর দিয়ে ফায়ার ব্রিগেড আসে আরামবাগ থেকে। বর্ধমান থেকে পুলিস আসে এক ভ্যান। আরামবাগ থেকে আর এক গাড়ি। নদীর মানাতে আশ্রয় নিয়েছে হাতির পাল। গাছের ডাল ভেঙে পাতা খায়। নদীতে চান সারে। জল খায়। জল ছড়ায়। গাঁয়ের লোক গরু ছাড়ে না। গাঁয়ের লোক ছেলে ছাড়ে না।

চারপাশের গাঁয়ে খবর যায়। সাইকেলে চেপে নৈশরাই, বুলচাঁদ থেকে ছেলেরা আসে। আরামবাগ থেকে রাজদূত আসে। বর্ধমান থেকে হিরো হন্ডা আসে। হাফপ্যান্ট পরা বুড়ো লোক দেখে নবীনগঞ্জ। ফুলপ্যান্ট পরা ছুকরি দেখে নবীনগঞ্জ। আরামবাগ-বর্ধমান টাউনের যুবক যুবতীরা হাতি দেখে। নবীনগঞ্জ আর চারপাশের গাঁয়ের মানুষ আরামবাগ আর বর্ধমানের ছোকরা-ছুকরিদের দেখে। নবীনগঞ্জের নদীমানায় এ দৃশ্য বিরল। এ দৃশ্য আগে দেখেনি মানুষ, এ দৃশ্য পরে দেখতে পাবে না।

বুড়ি সব দেখে। বুড়ি সব গেলে। বুড়ির বড় ভাল লাগে বর্ধমানের জিনস-গেঞ্জি মেয়েটিকে। ঠিক যাদুর লাতিনটির মতো। ডান হাত দিয়ে চিবুক ছোঁয় বুড়ি। মেয়েটি হাসে—কী আশীর্বাদ করলে ঠাকুমা? বুড়ি হাসে—বেঁচে থাক মা। সুখে থাক। গোঁফ ঝোলানো ছেলেটার কাছে যায় বুড়ি। পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—আহা, তোমার বয়সে আমার মাধো দেখতে ঠিক এমনটি ছিল। হঠাৎ ক্ষেপে যায় বুড়ি। একজন পুলিসকে সামনে পেয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে টানতে যায়। এক ঝটকায় সরিয়ে দেয় সে। গাঁয়ের লোক ছুটে আসে। তেড়ে যায় পুলিসটাকে। অন্যরা এসে সামলায়। বুড়ি চেঁচিয়ে যাচ্ছে তালগাছের কাটাগোড়ায় হাত রেখে—নে গেলি, ফেরত দে। এই মানা থেকে নে গেসলি কানুকে। ফেরত দে।

পাকা আড়াইটে দিন হাতির পাল কাটিয়ে দেয় মানাতে। পুরনো মানুষ চলে যায়। নতুন মানুষ আসে। তারা নতুন করে পালে হাতির সংখ্যা গোনে। হাতির আকার আর চেহারা দেখে প্রজন্ম নির্ধারণ করে। বয়সের হিসেব করে। মা-হাতি অর্জুনের ডাল ভেঙে আনে ছেলের জন্য। নাতি-হাতি ঠাকুমা-হাতির গা চাটে। চানে যায় হাতির পাল। ফিরে আসে। ছড়িয়ে যায় কেউ কেউ। আবার ফিরে আসে দলে।

মানুষ আসে, মানুষ যায়। বুড়ির নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। কার্তিক কোনোরকমে টেনে নিয়ে যায় দুপুরে। খেয়েই ফিরে আসে বুড়ি। বুড়ি হাতির পাল দেখে, বুড়ি মানুষের ঢল দেখে।

রাত নামে। ফিরে যায় অন্য গাঁয়ের মানুষ। রাত বাড়ে। ঘরে ফেরে গাঁয়ের মানুষ। রেখা ফিরিয়ে আনে বুড়িকে। খাইয়ে শুইয়ে দেয়।

মাঝরাতে উঠে পড়ে বুড়ি। তক্তপোশের নিচে থেকে কাস্তে বার করে। পুকুরের পাড়ে ওঠে। একটা কচি কলাগাছ কাটে। কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে কলাগাছটা কাঁকালে তুলতে চেষ্টা করে। পড়ে যায়। উঠে দাঁড়ায়। তিনবারের চেষ্টায় তোলে। বাঁশের ঝাড় শরের বন পেরিয়ে এগিয়ে চলে বুড়ি।

ফিরে যাবে হাতির পাল। উঠে দাঁড়িয়েছে। সুখের সংসার নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে। চলার পথে এখানে-ওখানে দু-চারদিন কাটিয়ে আবার চার পায়ে এগিয়ে যাবে।

হাতির পায়ে পায়ে হাঁটবে বুড়ি। নদীর কাঁথি বেয়ে নেমে আসবে শাশুড়ি। ফেরত স্রোতে ঘরে ফিরবে যাদুর বাবা। হাতে নীল বেনারসী। চলার পথে মাধোর সঙ্গে দেখা

হবে আরামবাগে। মাধো আর মাধোর বউ সঙ্গে যাবে। তারপর ভাদুর বাড়ি। ভাদু, ভাদুর বউ, তিন ছেলে, তাদের বউ, নাতিনাতনি এসে জুটবে। সেখানে থেকে যাদুর সংসার। যাদুর বাড়ি হয়ে স্বপনের কাছে। স্বপন থেকে আমেরিকায় ময়নার ঘর। ময়নার ঘর থেকে পুরুলিয়া মিশন। ঘুঘুডাঙা। সেখান থেকে কানুকে নিয়ে আবার নবীনগঞ্জ। চারপাশে ছড়ানো থাকবে জমি। জমির বুকে হেমন্তের ধান দুধ-বুকে দোল খাবে। ভাদুর গরু চরবে পথের দু-পাশে। ভগবান পাণ্ডার পিছন পিছন জগন্নাথ দর্শনে যাবে শ্রীনাথ চক্রবর্তীর সমগ্র পরিবার।

বুড়ির বগলে কলাগাছ। বুড়ির সামনে চতুর্থ প্রজন্মের হাতির ছানা।

তীর্থযাত্রা ॥ অনিতা অগ্নিহোত্রী
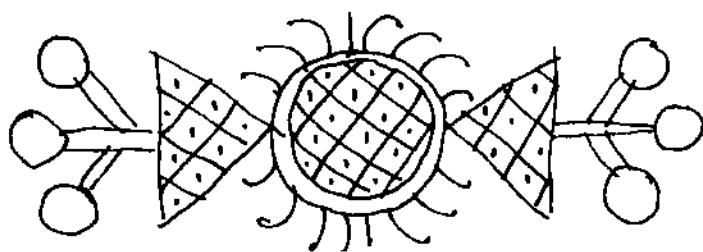
সাতাবা পর্যন্ত বেশ ভালোই ছিল আন্নাসাহেব, খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাবাব আগে ওব প্রাণেব পাখি ডানাব মৃদু ঝাপটে যদি জানান দিয়েও থাকে, তবে আবও অনেক অনেক পবে। সাতাবায বাস থামলে আন্নাসাহেব প্রায দৌড়ে গিযেই নিযে এসেছিল তাম্বেব দোকানেব ধোঁওযা-ওঠা এলাচ-চা, সাদামাঠা কাচেব গেলাসে, আব পেছন পেছন দোকানেব ছেলেটাব হাতে দু-প্লেট পাওভাজি। নিজেব ঝুডিব্যাগে বাখা স্টিলেব গেলাসটাব কানা সন্তর্পণে শাড়িব আঁচল দিয়ে মুছে নিয়েছিল সাবিত্রী, তাবপব দোকানেব চা-টা নিজেব গেলাসে ঢেলে নিতে নিতে আন্নাসাহেবেব প্লেটেব দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসেছিল— বাব্বা, এত ? বলতে নেই নিজে ডবল্ প্লেট চাপিয়েছিল আন্না , আব সাবিত্রীব জন্য এক প্লেট। সময ও পবিস্থিতিটা অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিল সাবিত্রীব, কাবণ বহুযুগ পব এই প্রথম তাদেব বাড়িব বাইবে একসঙ্গে খাওযা। এই যে শেষ, সেটা হযতো বঁড়শিব মতো অবচেতনে গেঁথে গেছিল পববর্তী সময়ে।

বাসস্ট্যান্ডেব পেছনেব হলদে ময়লাটে দেওযাল ফুঁড়ে এক প্রগাঢ় শিমূল গাছ তাব দশ বাহু মেলে টান টান দাঁড়িয়েছিল, মণিবন্ধে তীব্র লাল ফুল। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল ফাল্গুনেব আকাশে, সাবা পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে লাল ও ঈষৎ বেগুনি বঙে বাঙানো মেঘবাজি, দূবেব পাহাড় থেকে নিঃসঙ্গ কোনও মযূব হযতো ক্র্যাও ক্র্যাও ডেকে উঠেছিল বাত নেমে আসাব নিস্তব্ধতায। সাবিত্রী তাদেব বিয়েব পবে-পবেই বাসে চড়ে বাপেব বাড়ি থেকে সুদূব দেউবুখে শ্বশুববাড়ি যাবাব স্মৃতিতে উদ্বেল হযে পড়েছিল, 'হুঁ, কেন খাব না ! আমি কি তোমাব মতন পেটবোগা—' তখন তাব কথা সাবিত্রীব কানেই যাযনি। কপালে একচিলতে গোধূলিব আলো, সাবিত্রী তখনও হলদে দেযালটাব দিকে তাকিয়ে আনমনে মুখ টিপে টিপে হাসছে।

বাস ছাড়াব একমিনিট আগে দোকানেব ছেলেটা এসে গেলাস ও পযসা চেযে নিযে গেল, নাকেব শিকনি হাতেব পিঠে মুছতে মুছতে। দেখে পবিচ্ছন্নতাব বাতিকগ্রস্ত সাবিত্রীব শবীবেব ভেতবটা শিবশিব কবে উঠেছিল, চট কবে মুখ ফিবিযে ব্যাগ হাটকে হাত-তোযালেটা আন্নাসাহেবকে দ্বিধাব সঙ্গে বাড়িয়ে দিযেছিল—'নেবে, নাও না !'

ইঞ্জিনেব অস্থিব গর্জনে পুবনো বাসেব বড়িটা থবথব কবে কেঁপে উঠল, একবাব, দুবাব, তিনবাব... । সুতোব চাদবটা ব্যাগ থেকে বাব কবে নেড়েচেড়ে দেখছে আন্না। ওকে এমনিতে চাদব মাফলাব পবানো বেশ কঠিন, শীতেব দিনেই। এখন না হয সন্ধেব মুখে একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব, পাহাড়ি জাযগা বলে। দিনেব বেলা দশটাব পব বোদ আব তেমন পিঠে লাগে কই ? বিয়েব পব থেকেই একইবকম দেখে আসছে সাবিত্রী। কুযোব পাড়ে বসে তেল মেখে ঠাণ্ডা-জলে চান মাঘ মাসেও। বাবোমাস পবনে সেই মোটা সুতিব শার্ট ও ধুতি, শীতে খালি ভেতবে একটা গেঞ্জি। মাথায খদ্দবেব টুপি। ধুলিযাব অফিসেও ধুতি-শার্ট পবে গেছে আন্না, প্রমোশনেব পবেও। চাদবটা কোলে

মেলে রেখেছিল আন্নাসাহেব, তারপর সাতারার বৃক্ষবিহীন পাহাড়ের ঢেউ যখন বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে পাহাড়, আরও আরও পাহাড় তৈরি করতে লাগল, তারপর নেশার মধ্যে তাদের ডুবিয়ে দিতে থাকল বসন্তরজনীর আমমুকুলের গন্ধে শিউরোনো অন্ধকার, সাবিত্রী দেখল চারদটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে ওর স্বামী। আশ্চর্য লাগলেও মনটা খুঁতখুঁত করেনি সাবিত্রীর। কাচের জোড় দিয়ে আসা কোমল হাওয়া, জানলার কাছে বসা আন্নার শরীরে সংলগ্ন ওর শরীর, অনেক দিন পর ওর মনে স্বপ্নের টুকরো টুকরো ছবি গড়ে তুলছিল। কতদিন কোথাও যায়নি সাবিত্রী, কতদিন।

ধুলিয়ার 'চাল'-এর ছোট্ট ঘরে ভোর থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত সময় কেমন করে কেটে যায় বোঝাই যায় না! উনুনে আঁচ ভোরে উঠে, তারপর চান, পুজো, কুটনো কোটা, ছেলের নটায় অফিস, আন্নাসাহেবের দশটায়, একটা নাগাদ ঘরের কাজ সেরে ছোট্ট পিঁড়েয় বসে একা একা দুখানি জোয়ারের ভাকরি কি আটার রুটি। ছেলের বিয়ে হয়েছে নতুন, আজকাল কখনও-সখনও বউ খেতে বসে সঙ্গে। রাত্রে ওর রান্নাঘর ঝাঁটপাট দিয়ে হাত ধুয়ে আসতে আসতে অফিসে শ্রম ও টানাপোড়েনে ক্লান্ত আন্নাসাহেবের নাক ডাকতে লেগেছে। টাকা চাই বাজার খরচের, দু প্যাকেট ধূপকাঠি, বিছানার চাদর—সকালবেলা খাওয়ার আগে বলে নাও। ব্যস্। সারাদিনে আর সময় কই? তারপর ছেলের বিয়ে হলে যে সুবিধেগুলো আশা করে মানুষ, বড় ঘরে কেশবের বিয়ে দিয়ে, তার কোনওটাই জোটেনি সাবিত্রী ও আন্নার। ছেলের বিয়েতে ধূমধাম করেছে বেশ, জি-পি-এফের টাকাও ভেঙেছে। আবার নিজেদের বাড়ি নেই বলে ছেলের বউ ও শ্বশুর তেমন সমীহ করে না ওদের। বাড়িতে ভালোমন্দ রান্না হলে (যেটা প্রায়ই হয়), মেয়ের মা মেয়েকে ডেকে নিয়ে যান, ছেলে অফিস ফেরতা রাতের খাবার খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বাড়িতে ঢোকে। বাবার পাতে মায়ের বেড়ে দেওয়া রুটি ও ঢেঁড়সের তরকারির দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বলে—'কী যে রাঁধো, কী দিয়ে খাবে বলো তো বাবা?'

কলকাতায় সযত্নে কুলকুচো করতে করতে আন্নাসাহেব বলে ওঠে, 'বাপরে, আজ অফিসে একজনের ফেয়ারওয়েল ছিল, ঢের খাইয়েছে, আজ আর কিছু খেতে পারতাম না...।'

একটু বেশি বয়সের ছেলে বলে কেশব খানিকটা আদরেই মানুষ। ওর রাগের আভাসেও নির্মল হাসে আন্নাসাহেব, বউকে চোখ টেপে ঠাট্টাচ্ছলে। এঁটো বাসন তুলে মেঝে মুছতে মুছতে অভিমানে চোখে জল এসে যায় সাবিত্রীর। কই, এতই যদি টান, বাপের জন্যে কিছু আনোনি তো হাতে করে, নিজেরা পেটপুরে খেয়েদেয়ে এসেছ, আমিই বা একা হাতে কত করব, ইনিও তেমন, ছেলে-ছেলে করেই গেলেন!

কাজেই, গতমাসের শেষে যখন কোটের পকেট থেকে একতাড়া নতুন নোট বার করে আন্নাসাহেব রান্নাঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সাবিত্রীকে ডেকে বলেছিল, 'কই ধরো!' হাতজোড়া থাকলেও লোভীর মতন এগিয়ে এসেছিল সাবিত্রী। চৌবাচ্চার ওপরে রাখা ন্যাকড়াটায় বেশ করে ভেজা হাত মুছে—'আবার টাকা তুললে?'—ওর গলায় কাঙ্ক্ষিত অভিমান—'রিটায়ার করলে কী খাবে বল তো?'

—'বেশ, তুমিই তো বলেছিলে কোথাও ঘুরে আসি দুজনে, কতদিন কোথাও যাই না। তোমায় একটু তীর্থধর্ম করাই!' সাবিত্রীর সাদাকালো চুলে-ভরা মাথা ও শীর্ণ শরীরটা সস্নেহে কাছে টেনে এনেছিল আন্নাসাহেব—'রিটায়ার করি, প্রত্যেক বছর বেড়াতে যাব—'

শরীরটা অনভ্যাসে শিউরে ওঠে, চমকে পেছনে তাকিয়ে নেয় সাবিত্রী, ছেলে দেখে ফেলেনি তো ! কেশব অবশ্য বাড়িতে ছিল না, একটু আগেই বেরিয়েছে কোথাও।

আরে, এ যে ঘুমিয়ে পড়ল।

সত্যিই তো চিন্তার ঘোরে সাবিত্রী খেয়ালই করেনি, লোকটা জানালা দিয়ে দেখা ছেড়ে কখন ওঁর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, বেশ গাঢ় ঘুম, নাক দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে একটানা, মুখ দিয়ে নাল বেরিয়ে সাবিত্রীর কাঁধের কাছে ব্লাউজটা ভিজে উঠেছে। এত গরম ওর কপাল। ইস্, এ যে বেশ জ্বর ! হতাশভাবে এদিক-ওদিক তাকায় সাবিত্রী। বড় সুটকেসটা বাসের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোয়েটার তো লাগার কথা না, আনাও হয়নি। মোটা চাদরটা, ঔরঙ্গাবাদী, ওপরে রয়ে গেছে। নিচের হাতব্যাগ খালি, শুধু একটা মাফলার পড়ে আছে। পরম মমতায় সেটাই বার করে গলায় জড়িয়ে দেয় স্বামীর। শরীরটা কাঁপছে লোকটার !

বাস এসে থেমেছে নান্দুর এ। রাত সাড়ে নটা বাজে। যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে এক-এক করে। ছাতের ওপর থেকে ধুপধাপ নামছে বাক্স-প্যাঁটরা। পাহাড়ের নিচে ধর্মশালায় ওদের জায়গা করা আছে আগে থেকে। কিন্তু নামাবে কী করে। আন্নাসাহেবের শরীরে অঘোর ঘুম, ঘড়ঘড় করে নিশ্বাস পড়ছে। বাস ফাঁকা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ড্রাইভারের কেবিন থেকে বিড়ি ধরায় বুড়ো কনডাক্টর, ওদের সিটের কাছে এসে দাঁড়ায়।

'কী হল নামো !'

'নামব কী করে, একা মেয়েমানুষ, দেখছ না এর গায়ে জ্বর।'

'অ।' বুড়ো তার বিড়িটা নিচে ফেলে পায়ে ঘষে নিভিয়ে দিল। 'আমি ধরছি, চলো।' ওর গলার আওয়াজ বোধহয় আন্নাসাহেবের অবচেতনে কোথাও গিয়ে মৃদু করাঘাত করেছিল। 'উহুঁ, আমি, আমি নিজে যাচ্ছি—' গোঙানোর মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসে ওর গলা দিয়ে। নড়বড়ে পায়ে স্ত্রী ও কনডাক্টরের কাঁধে ভর দিয়ে কোনওমতে ধর্মশালায় পৌঁছে মেরুদণ্ডহীন কাটা গাছের মতো খাটিয়ায় পড়ল আন্নাসাহেব। পুরনো, স্যাঁতসেতে ঘর, বিজলি নেই, মোমবাতির আলোয় চুনখরা দেয়ালের ক্ষতমুখ আরও বীভৎস দেখায়।

একটাই খাটিয়া ঘরের মাঝখানে, আর-একটা দেবে কিনা কে জানে ! বাইরের বারান্দায় তীর্থযাত্রীদের যাওয়া-আসার শোরগোল, বাক্স-বিছানা নিয়ে যাচ্ছে কুলিরা। জ্বর বোধহয় দ্রুত বেড়ে চলেছে, লাল চকচকে চোখ দুটোকে অস্বাভাবিক দ্রুততায় ছাত থেকে দেয়ালে, দেয়াল থেকে দূরের কোনও অনির্দিষ্ট বিন্দুর পাশ ঘেঁষে ঘুরিয়ে আনে আন্না, ঘড়ঘড়ে গলায় যেন নিজেকেই শুধোয়, গোপাল, গোপাল কই আসেনি ?

তীর্থযাত্রীর রঙিন দিবাস্বপ্ন তখন মাথায় উঠেছে সাবিত্রীর, ভয় পাওয়া কাঁদোকাঁদো মুখে অস্থির ডানহাতটা বুলোয় জ্বরে পুড়ে যাওয়া স্বামীর বুকে গলায়—'কী বলছ গো, গোপাল কোথায়, এ যে আমরা তীর্থে এসেছি, তুমি সপ্তশৃঙ্গী দেখতে এসেছ, তীর্থে এসেছ তুমি।'

অর্ধ অচেতন আন্নার চোখ বন্ধ, ভুরু কোঁচকানো, ঠোঁট দুটো নড়ছে সামনে। সাবিত্রীর ভীত কণ্ঠের উদ্বিগ্ন আওয়াজ ওর মস্তিষ্কের কুয়াশাঢাকা গলিঘুঁজির রাস্তা খুঁজে পায়নি, আন্না তখন চলে গেছে সবুজ জলের তলায়, ১৯৫৬ সালে, লোনাভালার পাহাড়-ঘেরা সবুজ বিকেলে সে দু বছরের শিশু কেশব অথবা গোপালকে নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

বাবাবাংলা রোড ধরে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে তারা দুজন—গৌরবর্ণ নধর শিশু, কোঁকড়া

কোঁকড়া ঈষৎ বাদামি চুল, দৌড়ে এসে সে একবার বাবাকে ছুঁয়ে দিচ্ছে, আবার খলখল হেসে চলে যাচ্ছে দূরে...'গোপাল, এই, দুষ্টু কোথাকার...'

সাবিত্রী ওর আগুনওঠা চুলে আঙুল বুলোয়, দমফাটা কান্নায় ফুলে ওঠে ওর বুক, 'এই শুনছ, দ্যাখো এই যে আমি, চোখ মেলে তাকাও একবার...'

দ্রুত ঝাঁকুনিতে ঘাড়টা বাঁপাশে কাত হয়, একবার পাশে তাকিয়েই যেন পরম আশ্বাসে আবার চোখ বোজে আন্না, ওর চোখের মণিতে, ভ্রূসন্ধিতে কোথায় যেন এক শিশুমুখ ঘনিয়ে উঠেছে।

অসাড় হয়ে আসছে বুকের ভেতরটা, সবিত্রী ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে মরিয়ার মতো। করিডরে কে যেন ময়লা জল ঢেলে রেখেছে, সরু লম্বা বারান্দা পেরিয়ে নিভু-নিভু ছোট একটা ঘর, হয়তো ম্যানেজারের। চেয়ারে-বসা বছর চল্লিশের লোকটার দিকে অন্ধের মতো এগিয়ে যায় সাবিত্রী, টেবিলে দু হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'একটা ডাক্তার ডাকুন, ডাক্তার. .'

লোকটার গায়ে কালো টেরিলিনের গেঞ্জি, হাতে স্টিলের বালা, মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল, তীব্র চোয়াল, সব মিলিয়ে রূঢ় চোয়াড়ে মুখ। হয়তো আমল দিত না সাবিত্রীর কথায়, বুড়ো কনডাক্টর এসে তার হাতের চায়ের গেলাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখে। ঘড়ঘড় করে বলে ওঠে, 'আমি জানি, এঁর স্বামী খুব অসুস্থ, ডাক্তার ডাকো হে গণপৎ।

আধ ঘণ্টা বাদে ঝাঁকড়া সাদা গোঁফওলা স্থূলকায় ডাক্তার, পুরনো ধুলোমাখা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে ওদের ঘরে ঢোকে। 'কই, রুগী কোথায় ?'

সাবিত্রী পাথরের মূর্তির মতন স্থির বসে ছিল। চোখের দৃষ্টি চিবুকে লাগা হাঁটুজোড়ার খাঁজে আটকানো। তবু বাবার সোলের জুতোয় থপথপ শব্দ তুলে ডাক্তারকে চলে যেতে দেখে আতঙ্কিত উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'ডাক্তারবাবু...'

'মারা গেছে। আমি আসার আগেই। আপনি-- ?'

সাবিত্রীর ঘোর-লাগা সাদা ছাইয়ের মুখটার দিকে চেয়ে একরকম দোটানায় পড়ে যান ডাক্তার। 'একাই এসেছেন, সঙ্গে আর পুরুষ কেউ ? ও হো, স্বামী-স্ত্রী। তাই তো, পোস্টমর্টেমের জন্যও একটা লোক দরকার।'

পোস্টমর্টেম। খাটিয়ায় পড়ে থাকা সাধাসিদে জবো শরীরটার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায় সাবিত্রী। কথাটা একটা ছুরির মতো নিঃশব্দে চিরে দিয়ে যায় ওকে। পোস্টমর্টেম করবে ওরা ? কেন ? সে তো খুন-টুন হলে করে বা অ্যাকসিডেন্টে।

গণপৎ ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে বাইরের করিডরে। 'পোস্টমর্টেম তো জরুর হবে। ডেথ সার্টিফিকেট তো আর আপনি...।'

'না, আমি দিতে পারব না, মাফ করবেন। অচেনা লোক, পনেরো মিনিট আগে মরে ঠাণ্ডা হয়ে আছে, হাতে দড়ি পড়লে কার বাবা বাঁচাবে ?'

লণ্ঠনের কালিপড়া আলোয় স্তব্ধ সাবিত্রীকে দরজার ধার ধরে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ওরা চলে যায়, গণপৎ ও ডাক্তার। ফিরেও আসে কিছুক্ষণ পরে, যা সাবিত্রীর মনে হয় একযুগ। চারটে জোয়ান ছেলে, গায়ে এক রকমের সিন্থেটিক গেঞ্জি নানা রূঢ় রঙের, কব্জিতে বালা ও রঙিন কোয়ার্টজ ঘড়ি, মুখ থেকে দিশি মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

গণপৎ ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাইরে থেকে হাঁকে...'লে, উঠা খাটিয়া, ডোমশালারা বোতল খুলে বসলে ভোর হয়ে যাবে সারতে সারতে !'

ছেলেগুলো অবলীলায় খাটিয়ার ওপরের মাদুরটা সমেত মৃত আন্নাকে তোলে বুঝি, সাবিত্রী প্রায় ছুটে এসে কাছে দাঁড়ায়।

গণপৎ কঠিন গলায় বলে, 'সবুর সবুর, কী খেয়ে মরেছে ঠিক নেই, পুলিসে খবর যাবে, মর্গে বডি যাবে—সরে দাঁড়ান।'

বাঘিনীর মতো তাকে চোখের চাউনিতে বিদ্ধ করে সাবিত্রী—না! তার দেহ থেকে এখনও যার দেহের উত্তাপ মেলায়নি, তার প্রিয়তম সেই জীবনসঙ্গীকে চিরে ফুঁড়ো বস্তা সেলাইয়ের মতন সেলাই দেবে ডোমেরা। অদূর ভবিষ্যতের মধ্যে নিহিত এই অবশ্যম্ভাবী নিষ্ঠুরতা ওকে ভয়শূন্য ও আক্রমণের অতীত করে দেয়—। 'না! দেখি তোমরা কী করে নিয়ে যাও ওকে। এই আমি বসলাম। দেখি কার কত বুকের পাটা!' খাটিয়ার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে।

'যাঃ বাব্বা, গণপৎ রাও, এ তো আচ্ছা মুসিবতে ফাঁসালে। পার্টির সঙ্গে তোমার লফড়া আছে, আগে বলোনি কেন?' দলের নেতা গোছের ছেলেটি ঘাড়ে রুমাল খুলে ঝুলোয়। 'তোদের বলেছিলাম, যাস না, এক এক বোতল মাল পেয়ে ভিড়ে গেলি শালারা।'

ছোট্ট ঘরটার চারপাশে আস্তে আস্তে ভিড়ের সব পড়ে আসে। তীর্থযাত্রী সবাই নিজের নিজের ঘুম ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আলোবাতাস রুদ্ধ করে সেই জনতার দেয়াল ভোমরার মতো গুনগুন করে। একটা গভীর কুয়ার মধ্যে সোজা তলিয়ে যেতে থাকে সাবিত্রী, মাথার মধ্যে একটানা পতনের শব্দ, ওপরে আকাশটা ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে.।

দুই

চা খেয়ে বোধহয় গাছতলায় গেছিল সখারাম দেউস্কর, ফিরে এসে একমগ জলে ভালো করে চোখমুখ ধুয়ে গলায় ঝোলানো গামছাটা দিয়ে চাঁদের পিঠের মতন মুখখানা মুছে নেয় বেশ করে। তারপর সামনের জানালা দিয়ে মাথাটা ভেতরে গলিয়ে দেয়— 'একটু চা খাবেন নাকি? গরম চা আছে।'

'না।' সাবিত্রীর ভাঙা গলা বেজে ওঠে অন্ধকারে, যেন প্রেতাত্মার কণ্ঠস্বর। ঢাবা থেকে বেশ দূরে গাড়িটা দাঁড়িয়েছে, এখানে চার-পাঁচটা বড় বড় বট ও অর্জুন গাছের ঝাঁকড়া অন্ধকার। ছোট জায়গা, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে সন্ধের মুখে, লোকজন চলাচল প্রায় নেই। তবু দু-একজন মাঝে মাঝে হেঁটে যাচ্ছে পাশ দিয়ে, একটা বাচ্চা চলে গেল গাড়ির গায়ে দু-চারটে চড়-লাথি মেরে। সাবিত্রীর বুকটা ধক করে উঠেছিল।

'তাড়াতাড়ি চলুন। আর কতক্ষণ এখানে?'

'আরে যাচ্ছি, বাঙ্গিসাহেব, যাচ্ছি।' মৃদু গলায় গান গাইতে গাইতে নিজের সিটে ফিরে এলো সখারাম।

হাইওয়ের দুপাশে অন্ধকার মাঠবন, মাঝে মাঝে বিজলির তার জ্বলা ছোট ছোট গ্রাম, দূরের পাহাড়শ্রেণী নিঃশব্দে লীন হয়ে আছে আকাশের গায়ে। মাথার ওপর ঝিকমিক করছে নক্ষত্ররাশি। নিমফুলের গন্ধমাখানো, আমের মঞ্জরীর পরাগমাখা হাওয়া এসে লাগে নাকেমুখে। একটু কি হেলে পড়েছে আন্নার শরীর। পড়ুক, যদি গায়ের ওপর এসেও পড়ে সাবিত্রী নড়বে না। আপাদমস্তক চাদরে জড়িয়ে বেশ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছে কানুরা, তার ওপর আরও একটা চাদর। মাথায় বাঁদরটুপি, হাতের হাতঘড়িটা এখনও চলছে টিকটিক করে। শুকনো খড়ের মতন হয়ে গেছে আন্নার প্রাণহীন শরীর। নাকের নিচে শুকনো রক্তের ফোঁটা ঢেকে গেছে অন্ধকারে, পাথরের মতো সাদা নীরক্ত করতল, হালকা একটা গা-গুলোনো গন্ধ আসছে আন্নার দেহ থেকে,

এই কি মৃত্যুর গন্ধ ? বেহুলা চলেছে স্বামীর শরীর নিয়ে কলার ভেলায়। অন্তহীন, অন্তহীন পথ, সাবিত্রীর মাথার মধ্যে স্তূপীকৃত অন্ধকার, ঠোঁট শুকিয়ে খড়ি উঠছে, ঘাড়-পিঠ ফেটে যাচ্ছে ব্যথায়। গতকাল থেকে দু গ্লাস জল বই আর কিছুই স্পর্শ করেনি সাবিত্রী।

পোস্টমর্টেমের জন্য আন্নার বডি না-ছাড়ায় খেপে গেছিল, প্রায় লাফাচ্ছিল গণপৎ। এতদিনের ট্রাভেল এজেন্সিতে বাপের জন্মে এমন কেস দেখেনি সে যে মানুষ আটঘণ্টায় টেঁসে যায়। সাবিত্রীকে শাসাচ্ছিল, 'দড়ি পরাব তোমার হাতে, বুড়োকে কী ওষুধ খাইয়েছ ?' সব মিলিয়ে অভদ্র কুৎসিত ব্যাপার। কাল্লু সামনে এগিয়ে এসে একদিকে ঠেলে দিল গণপৎকে। 'চারশোটা টাকা দিন, 'সাবিত্রীর সামনে হাতটা মেলে ধরেছিল।

সাবিত্রী নির্বাক।

'কী হলো, হাঁ করে আছেন কেন, টাকা দিন, বডি ঘরে নিয়ে পোড়াবেন তো ?' পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বুক পকেটে রেখেছিল কাল্লু।

ভোররাতে সখারাম এলো। এরই মধ্যে দুটো চাদর কিনেছে কাল্লু, টুপি, বাঁধার দড়ি। তিনশো টাকা চেঞ্জ করে দিল সখারামকে। 'বুক পকেটে রাখবি', খরখর করে কাল্লুর গলা, 'রাস্তায় মামারা ধরলে একটা একটা নোট ধরাতে ধরাতে যাবি, দেরি করবি না।'

'ও-কে, ও-কে গুরু !' হাসতে হাসতে গাড়ির কাচ মোছে সখারাম।

সাবিত্রীর সামনে এসে দাঁড়াল কাল্লু।

'যা বলছি শুনে নিন। রাস্তায় কাঁদবেন না। গলা দিয়ে আওয়াজ না বেরোয়। মেয়েছেলেদের বিশ্বাস নেই। আপনি, আপনার বিমার বুড়াকে নিয়ে সরকারি হাসপাতাল যাচ্ছেন, ধুলিয়া, ঠিক আছে ?'

গাড়ি স্টার্ট দিল।

চন্দ্রপুরের কাছে নীল ইউনিফর্ম পরা এক বুড়ো হাবিলদার হাত দেখাল। ওর এক ভাইপো যাবে বিশ কিলোমিটার দূর, আবিলপুর।

জিভ কেটে মাফ চায়, সখারাম। 'ব্রেকটা ফেল মারছে কাল থেকে, জোয়ান ছোকরাকে কেন জেনেশুনে পাঠাবে দাদা ?' গাড়ির ভেতরে চোরা চাউনি হেনে চোখ টেপে, 'মরীজ বুড়োকে নিয়ে যাচ্ছি, বুড়ো-বুড়ির আর ভয় কি ?'

'রাম ! রাম ! দরকার নেই তাহলে।' বিমর্ষ হাবিলদার চায়ের দোকানে ফিরে যায়।

সাবিত্রী দরদর করে ঘামছিল। বাইরে সকালে নরম হলুদ আলো। শিরশিরে হাওয়া। গুলমোহরের ফুল ঝরে যায় মাটির ওপরে। প্রজাপতি উড়ে যায়, ফিরে আসে গাছের কটি ঘিরে। কালো কাচ উঠিয়ে দিয়েছে সখারাম, ভেতরে ভ্যাপসা গরমে সেই গন্ধটা গলা টিপে মারতে চাইছে সাবিত্রীকে।

সাবিত্রীর কাছে এখন সময়, সুখ, দুঃখ, ইহ-পরকাল সব স্থির হয়ে চোখের সামনে নিশ্চল এক স্ফটিকবিন্দু হয়ে গেছে, ও খালি ভাবছে, নদীতীরের শ্মশান, চিতার ওপর আন্নার দেহ, মুখাগ্নি। কেশব মুখাগ্নি করবে। না হলে মরেও জুড়োবে না আন্নার বুক, আশ্রয় ছাড়া পাখির মতন শহরের ধুলো-ধোঁওয়ায় ভরা ছাইরঙা আকাশে ঘুরে বেড়াবে ওর আত্মা। মুখাগ্নির সেই দৃশ্যটুক সাবিত্রীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এই সীমাহীন রাস্তায়। একটাই ওর কাতরানি, ভগবান, যেন মরে না যাই পৌঁছবার আগে।

সাতশো টাকা অগ্রিম নিয়েছিল গণপৎ এর ছত্রপতি ট্রাভেল কোম্পানি। দু রাস্তার ভাড়া। সাতদিনের থাকা খাওয়ার খরচ বাবদ একটি পয়সাও ফেরায়নি গণপৎ। সাবিত্রীর ঘেন্না করেছিল ফেরত চাইতে। কাল্লুকে দেবার পর মাত্র দেড়শোটি টাকা রইল হাতে। ভোররাত থেকে যন্ত্রের মতো গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে সখারাম, পাশে ঠোঙায় ছাড়ানো চিনেবাদাম ও কলার স্তূপ। দুবার চা খেতে থেমেছে। ভাবলেশহীন মুখ। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে শুধোয়, 'বাঈসাহেব, ঠিক হ্যায় না আপকা বুড়ঢাজি ?'

চোখ লেগে গেছিল মাঝখানে, হয়তো ঘণ্টাখানেক। হঠাৎ জেগে উঠল সাবিত্রী। রাতের প্রায় ঘুমিয়ে পড়া জনপদে ট্যাক্সিটা ঢুকছে। শহরের শুরু। প্রমোদ পেঠ ছেড়ে গণেশজি চৌক, নতুনবাজারের ভেতর দিয়ে লক্ষ্মীবাঈ লেনের গলি, প্রায় ঘুমন্ত দোকানপাটের সামনে রাস্তার কুকুরের আনাগোনা, হোটেলের দোকানিরা বাসনকোসন ধুয়ে তুলছে কর্পোরেশনের কলে। কী প্রিয় মনে হয় রং চটা পুরনো দোতলা বাড়িটাকে, আত্মীয়বৎ নিকট মনে হয় ভাঙা কাঠের সিঁড়িটা।

সখারাম গাড়ি থামাতেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে যায় সাবিত্রী। আন্নার মৃত্যুকালীন স্বগতোক্তি ভোমরার আওয়াজের মতন কুরে কুরে খাচ্ছে ওর মাথার ভিতরটা। ধকধক করে বাজছে হৃদপিণ্ড, রক্তচাপ যেন ফাটিয়ে দেবে তাকে সারানের বুদ্ধদেব মতন।

কলিংবেল আছে ভুলে গিয়ে সাবিত্রী দুমদুম করে দরজায় লাথি ঘুষি মারতে থাকে।

ঘরের মধ্যে ভিডিও চলছিল, হিন্দি একটা রঙিন ছবির, গোলাপ ওরফে কেশব বাবু হয়ে বিছানায় বসে, ওর কোলে কনুই রেখে স্ত্রী, এ পাশের সোফায় শালা ও শালাজ। সামনে টেবিলে ছড়ানো চিনেমাটির এঁটো বাসন, মুরগির চেবানো হাড় প্লেটের ওপর।

'হা. .ই। মাম্মি।' কেশব লাফিয়ে উঠে দু হাত বাড়িয়ে মার দিকে এগিয়ে এলো। 'শখ মিটল ? ব্যাক টু সুইট হোম ?'

সাবিত্রীর রাতজাগা লালচোখ, বিস্রস্ত চুল ও পরনের অগোছালো ময়লা কাপড় কেশব লক্ষ না করলেও, পুত্রবধূ করেছিল। কিন্তু সতর্ক করে দেবার সময় পায়নি। কেশবের মুখের আসব-গন্ধ ধাক্কা দিল ওকে, তারপরেই গত ছত্রিশ ঘণ্টার মৃত্যুর সঙ্গে সহবাসের অনুভূতি উন্মাদ করে দেয় সাবিত্রীকে, ঠাস ঠাস করে দুই চড় কষায় ছেলের গালে, জামার কলার টেনে দরজার কাছে নিয়ে যায়—'যা তোর বাবা বসে আছে নিচে, যা দ্যাখ গিয়ে।'

পাড়া ভেঙে পড়ল। মাঝরাতে ছুটে এলো বন্ধু অশোক জয়সওয়াল ও মনোহর আত্রি। বৃদ্ধ কুলকর্ণি ডাক্তার, পঁচাত্তরের ওপর বয়স, ডেথ সার্টিফিকেটে সই করে উঠলেন, ভাঙা গাল বেয়ে চোখের জল গড়াতে লাগল।

নদীর ধারে শ্মশান। অনেক বন্ধু-পরিজন এসেছে। চন্দন কাঠের চিতা। প্রচুর খরচা করেছে খোকা, সাধ্যাতীত, ধন্য ধন্য করছে সবাই।

সখারাম রয়ে গেল একটা দিন প্রতিবেশির ঘরে, সারা গায় হাত-পায়ে ব্যথা দিনভর গাড়ি চালিয়ে। একটা দিন বিশ্রাম দরকার।

রান্নাঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে রাত্রে শুতে গেল সাবিত্রী। দেয়ালে ঝোলানো আন্নার জামা ও কোট, তাকে বহুদিন ধরে সংগ্রহ করা ওর সব বইপত্র। আন্নার দেহগন্ধে

ভরপুর উন্মুখ হয়ে আছে ঘরটি। ব্যথায় কুঁকড়ানো ঘাড়-পিঠ টান টান করে নিজের বিছানায় শোয়—ঘুম ঘনিয়ে আসতে চায় দু চোখের পাতায়।

ছেলের বউ ছেলেকে বলছিল, (অবশ্যই না জেনেশুনে) ওরা ভেবেছিল মা বাথরুমের ভেতরে। 'মাকে কে বলেছিল তীর্থে যেতে? আমরা বলেছিলাম? বাবা বেঘোরে মরল, আবার তোমার গালে চড় মারল দাদার সামনে। নাটক। যেন আমরা মেরেছি বাবাকে।'

কাচা শার্টটি গায়ে দিয়ে ধোপদুরস্ত সখারাম আসে ভোর ভোর। 'চললাম বাঈসাহেব। প্রণাম। টাকা কটা রেখে দিন, কেউ তো চাইল না রাস্তায়।'

সাবিত্রীর নাকে মুক্তোর নথ আর নেই, কান-গলা খালি, হাতে ধান কাটা মাঠের নগ্নতা, তবু সরু পাড় সাদা শাড়ি, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলে তাকে দেখায় সকালের মতন প্রশান্ত। পায়ে বাইরে যাবার চটিজোড়া, হাতে সুটকেস।

সখারাম বিস্মিত হয়ে বলে, 'কোথাও যাবেন, টাউনে? ছেড়ে দেব?'

টাউনে না। শুকতারার মতন প্রসন্ন সাবিত্রী। 'তুমি আমার সুটকেসটা একটু নামিয়ে দেবে সিঁড়ি দিয়ে, কোমরে বড় ব্যথা।'

'আপনি যাবেন কোথায় বলুন না?'

'তুমি তো ফিরে নান্দুরেই যাচ্ছ আবার, আমিও ওখানেই যাব।'

ক্লান্ত ছেলে ছেলের বউকে আর ওঠায় না সাবিত্রী। দরজাটা ভেজিয়ে চলে আসে। এবার গাড়ির কালো কাচ নির্ভয়ে নিচে নামানো, শহর ছেড়ে বেরোতেই ভেতরে লুটোপুটি খায় বনগন্ধ-মাখা পাগল হাওয়া।

চারপাশে স্থলপদ্মের মতন আনন্দিত দিন ফুটে আছে। সাবিত্রীর বাঁ পাশে ছাড়া কোথাও কোনও শূন্যতা নেই। দিগন্ত ছুঁয়ে উড়ে যাওয়া ওই কালো পাখিটাই কি আন্না? নাকি ওই হলুদ প্রজাপতিটা, যে শিমূলের রক্তরাঙা ফুলকে অবহেলায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে নদীর জলগন্ধ মাখা আকাশের দিকে?

অনেক, অনেকদিন পর সাবিত্রী আজ তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে।
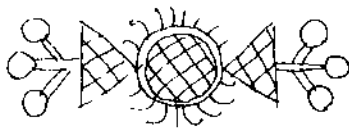
জাড়কাঁটা ॥ মুর্শিদ এ. এম

খবরটা কী করে যেন পৌঁছে গেছে হামিদার কানে—শোহারাব আসছে। তারপরই শুরু হয়ে গেছে খলবলানি।

একমনে গান গাইতে গাইতে নাড়া কাটছিল মাঠে। ও আর ওর চাচার মেয়ে সাবেরা, সঙ্গে পাড়ার নাযিম গাজির মেয়ে খতেমন। ফসল তুলে নিয়ে গেছে চাষী, পড়ে আছে যৌবনের থুতনিতে নতুন কেশচিহ্নের মতো ধানের গোড়ার বিঘতখানেক টুকরো-নাড়া। সুর করে গাইছিল ওরা রূপবানের পালা থেকে

বার দিনের শিশুর সাথে গো
ও দাইমা—ক্যামনে হবে বিযা গো,
ও মোর দাইমা —
দাইমা গো —।

তালে-তালে কাস্তে। পোঁচে-পোঁচে মাঠ হয়ে উঠছিল আরো সাদা মাটিসার। ভরে উঠছিল ঝাঁকা।

আরও কিছুদিন যেতে দিয়ে মাঠে নামবে নতুন ফসল—মাসকলাই, বিউলি। ছেয়ে যাবে সবুজে, মাঠের পর মাঠ, বাদার পর বাদা। তখন শুরু হবে ওদের কষ্টের। আকাশে রোদ্দুরের হলকা উঠবে ধুলোর গন্ধ মেখে। শক্ত হয়ে যাবে বাদার ঢেলা মাটি। থিরথির কাঁপবে বাদার দিকে পেছন ফেরা গাঁ, নারকেল তালের সারি।

এখনও কোথাও জমিতে জল আছে একটু-আধটু। নাড়াগুলো কোনওটা ভিজে। ছোট ছোট কুনি-ডোবার চারপাশে নাবাল জমিতে রয়ে গেছে জলের পাতলা আস্তর। দিনে দিনে তা হাত-পা গুটিয়ে ডোবার ভেতর সরে যাবে। এখানেও কষ্টের শুরু।

তা জমির মাটি শক্ত হয়ে গেলে, জল কমে এলে, কিংবা সবুজের আয়োজনে হামিদাদের কষ্টের শুরু হবে কেন? সাফসুতরো জবাব হলো, বর্ষা বা শীতের কিছু দিনই পাওয়া যায় জলা থেকে সামান্য খুদকুঁড়ো। টানাপোড়েন বেঁচে থাকার যা একান্ত সম্বল। এই যেমন নাড়া। শুকিয়ে গেলে জ্বালানি হয়। উঁচু জমির আলে বা চাষ না হওয়া পতিত জমিতে লম্বা সরু নলের মতো ঘাস জন্মায়—চুঁচকো, বেনা ঘাস। কেটে এনে কুচিয়ে দিলে বর্ষার চরা করতে না পারা গরুছাগলের মুখে দেয়ার মতো খোরাক। তারপর কুনির মোন থেকে ঘুনি পেতে ধরা কুচো চিংড়ি, পুঁটি খলসে, মৌটি মাছ। আঁটলে শোল, বোল, উলকো—। সবই ঐ বর্ষার দিকে কিংবা শেষাশেষি সময়ে। আরও আছে। পনের-বিশ ফুট লম্বা, ফুটদেড়েক চওড়া জাল, ধানখেতের মাঝে পেতে রাখা। জলের একধারে টিপলির টানে লম্বা-লম্বি ঝুলে রইল মাটিমুখো—মাটি ছুঁলো না। টিপলি রইল ভেসে। কইমাছ ভাসতে ভাসতে কানকো লাগিয়ে দেয়। সকালে গুটিয়ে তুলে আনলে গোটা পাঁচ-ছয় নাদুসনুদুস কই উঠে আসে। বাজারে নিয়ে যেতে পারলে দর। কখনও পাড়াতেই বেচে দেয়া। কারও আত্মীয়-কুটুম এসেছে, জোগাড়-যন্তর নেই—

তখন। এসব মাছ শিকারে হ্যাপা আছে।

কনকনে আঙুলকাটা জলে ভোর রাতে নেমে যেতে হয়। অন্ধকারে জলের রঙ কালো। হাঁটুসমান ফসল, ঘাসঝোপ, সাপ। এসব বাঁচিয়ে তারপর মাছের তদ্বির। সারা দিন চোখ পেতে বসে থাকতে হয়। নইলে চোরের ওপর বাটপাড়ি। জাল আঁটল তো একজনের নয়। গাজিপাড়ার হরেক মানুষের ঐ একই ফন্দি-ফিকির। কষ্ট এতেও কম না।

কিন্তু চোত মাসের কাঠফাটা গরমে জোগাড়পাতি না করতে পারাটাই আরও কষ্টের।

এ হলো আমডাবেড়ের কলজে ছেঁড়া কান্নার কথা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হদ্দ গাঁ। বেশি ভাগ মানুষই নিম্নবিত্ত। কিংবা বিত্ত থাকলে তবেই না তার উচ্চ-নীচ। বিত্তই নেই, অতএব গরিব-গুরবো। আর জমির অধিকারী—ধনী। ফারাক বলতে এইটুকুই। হিন্দু-মুসলমান আধাআধি। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই মোটেও। হরিসংকীর্তনের দল মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খোল-করতাল বন্ধ রেখে শ্রদ্ধা জানায়, নমস্কার করে কেউ কেউ। মহরমের মিছিল পেরোয় মুসলমান মহল্লা ছেড়ে হিন্দু মহল্লায়। চাঁদা তোলে, ছুরি-লাঠি-তলোয়ার খেলা দেখায়। বিয়েতে দু রকমের আয়োজন থাকে ধনীর ঘরে। এরা রাজনীতিতে যত না দড়, তার চাইতে বেশি সজাগ ধর্মকে নিয়ে যেন কেউ পলিটিক্স না করে। জাতপাতের দাঙ্গার উত্তেজনা এদের মনমরা করলেও তাপ ছড়ায় না।

ফারাক তাই আর্থিক ওঠানামায়, অন্য কিছুতে নয়। মোহরদ্দি শেখ, পাঁচু শেখ, জোনাব ঘরামি, শরিফুদ্দিন সর্দার হল জমিঅলা ধনী। নোনটু কয়াল, নিরাপদ গায়েন, রাঘব সর্দারও তাই। এঁদের জমিতে সম্বচ্ছর খাটে ফরিদার বাপ, সাবেরার ভাই, অক্ষয়, জীবন নস্করের ছেলেপিলেরা। বাড়ির কাজেও পড়ে থাকে কেউ কেউ। একেক পরিবার আট-ন'জন কাজের লোক পোষে, পালে। তারা বাজারে ডাবের কাঁদি কলার কাঁদি নিয়ে বেচে আসে, তরিতরকারি বেচে আসে হাটে। গরুর জাবনা বানায়, চরাতে যায়, লাঙলে হাতও লাগায়। বীজতলা তৈরি, ধান রোয়া থেকে কেরোসিন মেসিনে ধান ভানিয়ে চাল করা পর্যন্ত থাকে। সমস্ত মাঠের ধান উঠে গেলে, পরিপাটি হয়ে গেলে—ভোজ খাওয়ায় মনিব। গরম ডুমো ডুমো ভাতে মাখা সবুজ সেদ্ধ কলাই। সঙ্গে ঘানিভাঙান চাযের সর্ষের তেল, পোড়ান লঙ্কা, পেঁয়াজ।

যখন কাজ মন্দা তখনও এদের পয়সা গুনে যেতে হয় মালিককে। পেটের তাগিদে ঘাটতি জমে ওঠে মালিকের খাতায়। মরসুমে গতর লাগিয়ে শোধ হয়। সবাই সমান না। কেউ হিসেবমত খাটিয়ে নেয়, কেউ হিসেবের বাইরের কারণ এরা কেউই অক্ষর চেনে না। হলেও হিসেব তো রাখতে জানে। এদের কোনও ইউনিয়ন নেই। যদি কোনও মনিবের চাতুরির প্রমাণ বেরিয়ে পড়ে তবে সমস্ত মজুর মিলে তাকে একঘরে করে। এছাড়াও মজুরদের রোয়াব বেশ সইতে হয় মনিবকে। কাজের ফাঁকে জলপানীর একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কী—কথা ওঠে। পাড়ায় পাড়ায় রটে যায় বদনাম। এমন কি চুরি করে—ডোবাতে, জলাতে মাছধরা নিয়ে, ঘাসকাটা নিয়ে, আপত্তি তুললে, একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায় রসিদ গাজি, আছিরদ্দি গাজিরা। সাদা চোখে দেখতে গেলে এসব ঘটনা মালিকদের ওপর অন্যায় জুলুম বলে মনে হয়। কিন্তু মজুরদের চোখে তা অন্যায্য হয়ে ওঠে না। যাদের আছে, তাদের কাছ থেকে সামান্য চেয়ে-চিন্তে, কিংবা এক-আধটু হাত সট্কা করলে এতই কি কমে যায়?

না বিবেক-বিবেচনা, চরিত্রের সততা এসব বড় বড় কথায় ওদের বিশ্বাস নেই। মাথায় রাখা যায় না সব সময়। আবার এদের সাহায্য করেও দেখা গেছে—কাজে

আসেনি। চোদ্দ পুরুষের স্বভাব, বলে না 'শুকো মাছের না যার বোয়/ কমিনের বা যায় খোয়।' সহজে মোছার নয়। ফলে চুরি-চামারি হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্মানের, যোগ্যতার এবং মানানসই হয়ে ওঠার চরম মাপকাঠি।

তা জলজ্যান্ত দিনদুপুরে চুরিটা হয় কি করে? ধরা পড়ে না? পড়লেই বা। কেঁদেকেটে মুখ খারাপ করে পাড়ার লোক জড় করে বসে। ঐ মুখের সঙ্গে ভালো মানুষের ঝি-রা পারবে কেন! শেষে যার জিনিস, তার মনে হয়—চোর ধরে কী এক অপরাধ করে ফেলেছে।

মোহরদ্দি শেখ হলো ঐ সাহায্য বাড়িয়ে রাখা লোকগুলোর মধ্যে একজন। জমিজমা অন্য ধনীদের তুলনায় কম হলেও মনটা ঐ দিকজোড়া ধু ধু মাটির মতো সহনশীল। বয়েস হয়েছে, সবকিছুই কাজের লোককে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। তাতে করে হিসেবের গড়বড় মেনে নেয়া, ওজন কম সহ্য করা, জোরজবরদস্তি আনাজ-তরকারি বাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার মতো ছ্যাঁচড়ামি—সবই সহ্য। দুই ছেলে। বড়জন বউ নিয়ে খিদিরপুরে থাকে। জমিজমার কোনও খোঁজখবরই রাখে না। অন্যজন এম. এ. পড়তে মেসে আছে। সেও সেই কলেজস্ট্রিটের কাছে। যদি মতি হয় গ্রামে থাকার, সামান্য নজর দিলেই হয়ত বেঁচে থাকবে চাষবাস, জমিজিরেত।

এক মেয়ে মোহরদ্দির—খুরশিদা। ডাকনাম খুশি। চাঁপাফুলের রঙ। নাক নকশায় এ পাড়ার কেউ ধারেকাছে আসে না। পড়াশোনায় ভালো। দেরি করতে তবু মন চায় না মোহরদ্দির। চারদিক থেকে কথা উঠছে। সে কথার মধ্যে কতটা অখলতা, আর কতটুকু আকচা-আকচি তা ভালোমতই টের পায় মোহরদ্দি শেখ। আসছে বছরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে—তেমন কথাবার্তা চলছে। কিন্তু গোল বেধেছে অন্যখানে।

কিছুদিন হলো বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে দূর সম্পর্কের এক শালির ছেলে শোহরাব। কথাটা উঠেছে সেখান থেকেই। শেষ অবদি তার হাতেই না তুলে দিতে হয় মেয়েটাকে। হলে, আফশোসের সীমা থাকবে না। ছেলেটা মুখে হামবড়াই করে। এখনও তেমন খোঁজখবর করা হয়নি কী আছে, আর কী নেই। দু-চাকার ফট্‌ফটি—মোটরবাইকে ধুলো উড়িয়ে আসে যখন, তখন কেই বা চোখ বুজিয়ে বসে থাকবে? হুলুই দেয়া একদল ন্যাংটো ছেলেপিলে আর দুচারটে কুকুর তো গাড়ির পেছন পেছন ছুটে চলে আসে সামালি মোড়ের বাস রাস্তা থেকে। এই গাঁ অবদি। বেটি তাই দেখে নাচে। খুশির মা এখনও মনে করতে পারে না, তার কোথাকার কোন দূরসম্পর্কের বুনের বেটা শোহরাব! তবে ছেলেটার জমি-জমার জ্ঞান আছে ভালো। সম্পত্তি কীভাবে রাখতে হয়, তার পরামর্শ মাঝে মধ্যে সঠিক মনে হয়েছে মোহরদ্দির। পাড়ার মানুষের মনকষাকষির কারণ সেটাও হতে পারে।

খুশি বিকেলে টানটান করে চুল বাঁধে, বিনুনি করে। তারপর ওড়না পরিপাটি করে ঢেকে দেয় উদ্ধত আকর্ষণ। মাটির কলসি কাঁখে নিয়ে এগোয় ধীর পায়ে। এখানকার জলের তল বেশ নিচে। সরকারি সাহায্য ছাড়া কোনও বাড়িতেই নিজস্ব টিউবওয়েল নেই। জল আনতে আধমাইল হাঁটা। তারপর লাইন দিয়ে গল্পগুজব আর জল ভরে আনা। সকাল বিকেল দুবার যেতে হয় জলের খোঁজে। শুধু খাওয়ার জন্যে। অন্য কাজ পুকুরেই।

এমনিতেই ধীর মেয়ে খুশি। চোখেমুখে তবুও যেন চোরা গর্ব লুকিয়ে থাকে রূপের। কলসি কাঁখে যখন সে হাঁটে, তখন তার রূপ ঢেউ তুলে বেড়ায়। যাদের সে কাকা বলে, সেইসব চ্যাংড়ারাও নানা অছিলায় কথা বলে, ওর সঙ্গে হাঁটে। শান্ত খুশি তাতে বিরক্ত

হয না। সবাব সঙ্গে তাব খোলামেলা আলাপ। মোহবদ্দি এ নিযে সামান্য শাসন কবেও কোনও ইতববিশেষ কবতে পাবেনি। খুশি জানে যতই সবাই ঘুবঘুব কবুক না কেন, আবাব্বাব নামেব দৌলতে সাহস হবে না কাবও নোংবামি কবাব। অথচ শোহবাবেব কাছে কিছুতেই সহজ হতে চায না কথাবার্তা। তাতেই ভয ধবে যায। ভয, আবাব হিংসেও হয। গাজিবাড়িব মেযেবা যখন উঁকিঝুঁকি মেবে একনজব দেখতে চায সুদর্শন শোহবাবকে— তখন। অথচ তাবা কি দেখায, কি চলায, কি শিক্ষা বা পযসায খুশিব নখেব যুগ্যি নয। তবুও, শোহবাবটা যেন কিছুই বোঝে না। ন্যাকা, ছিঃ।

নিজেব ছেলেমানুষিতে নিজেই হেসে ওঠে, আযনাব খুশিকে দেখে। দাঁত থেকে গোড়াকষি ফিতেটা হাতে নিযে ভেঙচায। আব তাবপবই কানে আসে মোটববাইকেব কট্-কট্, কট কট শব্দ।

গান থামিযে ঝাঁকা হাতে উঠে পড়ে হামিদা। ছড়িযে যায কুচি কুচি নাড়াব কিছুটা। এবাব ফ্রকেব পেটে হাওযা ঢুকিযে সে দৌড়য। ফটফটিখানা পাড়াব ভেতব সেঁধোবাব আগে পৌঁছতে হবে বাস্তায। বাকুলেব পেছনবাড়ে, গোযাল ঘবেব মধ্যে নজব বাখতে হবে। শুধু নাড়া-ই না। ফেবাব পথে ঘুনি আজড়াতে হবে, আঁটিকতক কলমি তোলা আছে—শেখদেব কুনি থেকে। কযেকটা শাপলা। চুলোয দেযাব মতো খানকতক নাবকেলেব শুখা পাতা—চুমবি নিতে হবে আড়া থেকে। গবু আব খাসি দুটোকে এখন নেযা যাবে না। সাঁঝ ববাবব মাছেব জাল তুলবে, সেইসঙ্গে ওদেব নিযে ফিববে। জলাটা পেবোয হামিদা। আড়ায ওঠে। আড়া ধবে ট্যাডশ-বাড়ি পেবিযে বাখাবি ঘেবা জমিটাও পাব হয—বাখাবি ফাঁক কবে। আবাব নামে জলায। তাবপব নোনটু কযালেব কুনিব মোন ববাবব হাঁটুজলে।

হামিদাব মা বাহিলা তখন খড়ো চালেব বাতা থেকে কণ্চি টেনে উনুন জ্বালানব তোড়জোড়ে ব্যস্ত। দড়িব দোলায ঘুমিযে দুমাসেব বক্তশূন্য ম্যাতা বাচ্চা। মাটিতে মাদুবে আবও দু'জন। সবু হাত পা, ভুঁড়ো পেট, ন্যাড়া। কতই বা বযেস, সাত বছব আব দেড় বছব।

নাড়াব ঝাঁকা ধপাস কবে উঠোনে নামিযে দাঁড়ায হামিদা। হাত পা সিটে, গাযে জাড়কাঁটা। বড় বড় হাইনিঃশ্বেস, বুক দুটিব ওঠানামা—বাহিলা দ্যাখে, খুশি হয না। এত খবখব বাকুলে ফেবাব আশা কবেনি। মন্দ খোঁজে মেযেব চোখেমুখে। বছব চাবেকেব আবেকটা শিশু হামিদাব পেছনে এসে দাঁড়াল। ধুলোকাদা মেখে কোথা থেকে যে আসে, ওদেব তা নিযে মাথাব্যথা বড় একটা থাকে না। সে পযলা হামিদাব জামা ধবে টানে, তাবপব মাব কোলে গিযে আঁচলটা সবায। দুধ খাওযা শেষ হলে, যেমন এসেছিল, তেমনি আবাব কোথায চলে যায।

আঁচল ঠিক কবে বাহিলা। খবব তাব কানেও এসেছে। সটান কণ্চি হাতে ঘুবে দাঁড়ায হামিদাব সামনে। চুলেব মুঠি এক হাতে, অন্য হাতে কিল। দমাদ্দম পড়তে থাকে বুকে। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল।

—হাবামজাদি, এই কটা নাড়া নে তোব কোতায দিবি বা? বাঁড় আমাব। ভাতাবেব জমি খেনে চাড্ডি কাটকুটো নেসতি গতবে বেতা হয? চুলোয কি দোব বা—হাত-পা? অবলা জন্তুগুনো কি তোব বাপেব, হ্যাঁবা? সাঁজ অবদি তাবা আঁটি চোঁসপে। মাছগুনো কে আনবে—হ্যাঁবা মাগী, ভাতাবেব জলায উটতি শবম হয? তা, যা না, দুবো—উটগে যা না নাগবেব ভিটেয। চুন্নিব জাত, চুন্নিব বংশ কোত্থেনে এসে পড়ে মবেচে। ফটফটি চাইলে মিনসে এবাব আসপে, তাই মা গিচি-বাপ-গিচি কবে দৌড়িচিস। নজ্জা শবম হাযা কাযানি? ছ্যা ছ্যা ছ্যা। মব মব, গোলায দড়ি জইড়ে ঝুলে পড়। বেবো—

কোনও কথা বলা হয়ে ওঠে না হামিদাব। মাবেব থেকে গালাগালিতেই তাব মুখ বন্ধ থাকে। এসব বোজেব ব্যাপাব। শুধু জামাব পেছনেব দুখানি বোতাম আবো ছিঁড়ে যায়। গলাব ফাঁকটা বড হয়ে ওঠে। নিচু হয়ে কাজকাম কবতে গেলে চ্যাংড়াদেব নজব চলে যাবে। কোনমতে হাত ছাড়িয়ে দাবায় ওঠে। তাব পব বাঁশ খুঁটি ধবে পালটা আক্রমণ শানায়-

—চুন্নি আমি, না তুই? তোব বাপ চুন্নি, তোব মা চুন্নি। কাব জন্যি চুবি কবি বা। আসুক আজ তোব ভাতাব, বলবো, সব বলবো তাবে, মিছে কথা কইতি জোবানে আটকায় না? ইদিনে ঘাট থেনে ভিজে কাবুড়ে উটে আস্তায় ডেইড়ে কতা কোসনি মোহবদ্দিব হবু জামাযেব সাতে? শবম আচে তোব, আবাব বলিস? কিচ্ছু আনবনি। শুইকে মাবব তোদেব—

জবাব যেন আসে হাঁড়িব আগুন মুখে—বেশ বলিচি, তুইও বোলগে যা না। বাকুলে হাত ধবে টেনে নে ছেঁড়া চ্যাটাই বসা। বসা না।

হামিদা এবাব ভেঙে যায়। কথাগুলো সবটাই মিথ্যে নয়, অথচ এত লাগে কেন তা বোধবুদ্ধিব বাইবে। কিছুক্ষণ কেঁদে নিয়ে, চুবড়ি হাতে উঠে পড়ে জলাব উদ্দেশে। বেশ মালুম পায এব মাঝেই বাকুলেব পাশ দিয়ে ফটফটিটা আওয়াজ তুলে, ছেলেছোকবা আব কুত্তাদেব পেছনে নিয়ে বেবিয়ে গেছে। দেখতে পায়, খুশিব মুখখানা আবও বাঙা হয়ে উঠেছে পড়ন্ত বোদ্দুবেব ঝলকানিতে।

পাকা বাস্তাব মোড়ে দোকানপাট সামান্য। বোজেব দবকাবি সামগ্রী ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া যায় না। পাড়াব পুবুষেবা এখানেই মিলিত হয বোজ সন্ধেয। পাওনাগণ্ডা হিসেব নিকেশ চলে। মনিব আব মজুবদেব এ এক মিলন মেলা। কিছু কিছু চাষেব আনাজ, মাছ, ফলপাকুড় আসে। সবই গ্রামেব নিজস্ব ফলন। বাজাব নয, বাজাবেব মতো।

হামিদা সন্ধে পেবিয়ে 'বাস্তায' চলেছে। মোড়েব নাম, শুধুই 'বাস্তা'। একহাতে শিকাব মতো দড়িতে ঝোলান দুলতে থাকা ভাঁড়ে মাছ। বাচ্চা জ্যান্ত শোল, উলকো, কই। ছলাক ছলাক নাচছে ভাঁড়েব জল। বগলে চাপা চটেব টুকবো—মাটিতে পেতে বসতে হবে। মাথায কযেক আঁটি কলমি আব গোটা দুই লাউ। দাঁড়িপাল্লা, বাটখাবা। গামছা দিয়ে সেগুলোব পেট বাঁধা। তাব পা চলছে, মুখখানাও থেমে নেই। গাঁযেব পালান মুদিব দোকান থেকে চিটেগুড় কিনে নিয়েছে খানিকটা—তাই চিবোচেহ। বাকিটা ইজেবেব ট্যাঁকে পবম যত্নে বাখা। আধঘণ্টা হেঁটে সে বাস্তায পৌঁছয।

বেশিবভাগ দোকানেই কুপিব টিমটিমে অলৌকিক আলো। বড় দোকানে বেচাকেনা বেশি—সেখানে হ্যাজাক। তাবই সামনে বোজকাব মতো, ওবই মাথাব চ্যাটচেটে তেলেব দাগ ধবা পিলাবে ঠেস দিয়ে হামিদা বসে পড়ে। বিক্রি কবে সবজি, মাছ। তাবপব আব্বাব সঙ্গে ঘবমুখো হয। আব্বা ঐ সমযটা মর্জুবি নেয, তাস খেলে। তাবপব নেশা কবতে যায বিবিবহাটে। ঘবে ফেবাব সময অবশ্য নেশাটা ঝবে যায কিছু। অসুবিধা হয না হামিদাব। বেশি নেশা থাকলেও ঘবে নিয়ে যাওয়াব দায তাব। এসবে শিশুকাল থেকে ও এতই সড়গড় যে, এটাই নিযমমাফিক জীবনযাত্রা—তা মেনে নিতে কোনও ধন্দে পড়েনি কোনও দিন। ঝামেলা বলতে একটাই গাঢ় নেশা হলে আবোল-তাবোল বকতে শুবু কবে আব্বা—যাব এতটুকুও বুঝতে পাবে না। আব্বাব সঙ্গী নেশাড়ু হল সুদর্শন কাকা। দুজনে বলাকওযা কবে—হাবামজাদা দেশেব কিচ্ছু হবিনি। যত্ত কথা সব কইবে শালা নেতাব বাপেবা, সুমুন্দি গবিপদেব বলাব বাইট

নি। উত্তরে সুদর্শন বলে—রাঁড়ের বেটাদের কাছে কিনতি যাও--চড়া। আর চায়ের সামগ্রী বেচতি যাও—মন্দা। ফেলে রেকে পইছে, সাড়ে সর্বোনাশ হয়ে গেল গা!

কলমি পড়ে আছে এক আঁটি, শাপলা সবটাই। কিছু মাছ এখনও জলে খলবলে আওয়াজ ছাড়ছে। শোল, উলকো — এসব সস্তায় পেয়ে কিনে নিয়ে গেছে, কিন্তু বাকি মাছগুলো কেনার লোকজন বুঝি রাস্তায় আজ আসেইনি।

রাহিলা বিবির ঝাঁটায় একটা কাঠিও নিটুট থাকবে না, সবই ভাঙবে ওর পিঠে—ভেবে সারা শরীর কাঁটা হয়ে যায় হামিদার। দোকানের হ্যাজাকটা দপ্‌দপ্ করছে। সেই কাঁপা আলোর শিখায় হামিদার মুখ উথাল-পাথাল। বুকের গুরুগুরু শব্দ যেন শোনা যায়। আব্বার আসার সময় হয়ে এল। আশপাশে হাপিত্যেশ চোখ একবার বুলিয়ে যায় ভাবী খদ্দের খুঁজতে। হঠাৎ কোথা থেকে বুকের আওয়াজ যেন বাতাসে ভাসে, উঠে আসে রাস্তায়!

মোটরবাইক চালিয়ে শোহরাব একেবারে তার সামনে থামল। হাত ঘুরিয়ে পিঠের বোতাম লাগানোর চেষ্টা করে হামিদা। চুলগুলো কি পরিপাটি আছে! গামছাটাকে বুকের মাঝ বরাবর ঠিক করে নেয়। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। হলদে কষ পড়া পায়ের নখগুলো লুকোবার চেষ্টা করে। জামাটাকে যতটা পারে হাঁটুর নিচে নামায়, পা ঢাকে। চড়চড় করে গায়ে ফুটে ওঠে জাড়কাঁটা।

গুরুগুরু শব্দটা বুঝি বুক ফেটে বেরিয়ে আসবে শোরহাবের হাতে। এক ধরনের ভয়। শোহরাবের হবু শউরের কুনির মাছ, জানতে পেরে গেছে নাকি! হায় খোদা! কেমন এক সুবাস নিয়ে এসেছে শোহরাব--চারপাশ তার গন্ধে মাতোয়ারা। এগিয়ে আসে হামিদার দিকে।

—জীয়ল মাছ রয়েছে? শোহরাব বলে।

হামিদা 'মাছ' কথাটুকুই শুধু বোঝে, মাথা নাড়ে। শোহরাব সবগুলোকে ওজন করতে বলে ফিরে যায় গাড়িতে। বক্স থেকে সিগারেট বার করে জ্বালায়। ছোট চটের থলিটাও বার করে আনে।

হামিদা ওজন করতে গিয়ে ছড়িয়ে ফেলল। কয়েকটা কই, পাল্লা থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে। কানকো বেয়ে দূরে পালাবার মতলব তাদের। গুছিয়ে তুলতে হাত কাঁপছে হামিদার। কতবার কত মাছ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করেছে অনায়াসে। এখন কানকো ফুটে গিয়ে জ্বলতে লাগল হাত। চটের ব্যাগে মাছগুলোকে উপুড় করে দেয়ার আগে সে বলে—এই বেগে কইমাছ যাবিনি গো, কানকুরো ঘসে পেইলে যাবে!

শোহরাব চুপচাপ মানিব্যাগ বার করে।

হায় আল্লা! হামিদা আবার চমকে ওঠে। কুটুমের ডোবার মাছ—পয়সা দেবে কি গো! কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলা হয়ে ওঠে না। ধরা পড়ার ভয়, অন্তত শোহরাবের সামনে--সে বড় লজ্জার। একবার ভাবল বলে—নে যান গো, পয়সা লাগবেনি। কিন্তু যদি জানতে চায়, কেন? তখন কী উত্তর দেবে সে? তাই হাত পেতে টাকা নিতেই হয়।

শোহরাব চলে গেছে। পেট্রলের গন্ধ কিংবা তার সঙ্গে মিশে থাকা শোহরাবের দেহের সুবাস এখনও বুক ভরে টানছে হামিদা। একখানা দীর্ঘ শ্বাস নিল সে, তাতে স্বস্তির চিহ্ন নেই। চুরি করে সে। 'চুন্নি' তার গয়না, টায়রা-টিকলি। তবু এভাবে যার ধন, তাকেই বেচে পয়সা নেয়নি কখনও। টাকার বদলে সে যেন তার মান-ইজ্জত বিকিয়ে দিল, তার অহংকার বিকিয়ে দিল, তার ইমান বিকিয়ে দিল...।

হামিদা স্পষ্ট খেতে পেল, কইমাছগুলো লাল লাল পুরুষ্টু কানকোয় ভর করে, চটের ব্যাগ বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে...আরও আলো-বাতাসের দিকে।

মৃত্যুযোগ ॥ সুকান্ত চট্টোপাধ্যায

বাস থেকে নেমে অলকা যখন রিকশার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল বিশেষ আপত্তি করেনি ভূপতি। অন্যদিন হলে করত। বাস স্টপ থেকে এইটুকু তো পথ, হেঁটে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লাগবার কথা নয়। জানুয়ারি মাস, কদিন জমিয়ে শীত পড়েছে। সকাল দশটায় ছুটির দিনের কলকাতা ঝলমল করছে। মাথার ওপরে ঝকঝকে করে মাজা নীল আকাশ, কোথাও মেঘ লেগে ময়লা হয়ে নেই।

একেবারে ফাঁকা সুনসান রাস্তা। এইটুকু রাস্তার জন্যে কমপক্ষে দু টাকা রিকশা ভাড়া দিতে হবে—ভূপতি জানে। ভারতবর্ষে এখন এই দু টাকার বিশেষ কোনও মূল্য নেই, কোনও উল্লেখযোগ্য জিনিসই দু টাকায় পাওয়া যায় না এখন আর। তবু কুড়ি-একুশ বছর আগেকার দু টাকার স্মৃতি মনে পড়ে যায় ভূপতির। নিশীথের কাছে দু টাকা ধার করা এবং সেই টাকায় পাড়ায় মুদিখানার দোকান থেকে আটা কিনে সন্ধের অন্ধকারে গড়িয়ার সেই এক-কামরার ঘরে ফেরা—কলতলায় শীর্ণ রোগা দু হাতে ঠোঙাটা লোভীর মতো ধরছে মা—এই গোটা দৃশ্যটার মধ্যে লুকোনো অপমান আজও যে-কোনও দু টাকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে এই দু টাকাকে অপমান করবার জন্যই কি সে অকারণ খরচা করে? অলকাকে নিয়ে চিনে খাবার খেতে মিন্টো পার্কের দিকে একটা দোকানে যায়?

রাজা বসন্ত রায় রোড থেকে অনেকটাই দূর এই বাস স্টপ, অনেক উত্তরে। হাফ-স্লিভের ওপরে কোট থাকায় ভেতরে সম্ভবত একটু ঘামও হচ্ছে। ভূপতির মনে পড়ল বেরোবার ঠিক মুখে অলকা কিছুক্ষণ কথাও বলে নিয়েছে নিশীথের সঙ্গে টেলিফোনে, আমরা এই বেরোচ্ছি বুঝলেন। যা দূরে আপনারা থাকেন, যাওয়ার কথা ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে! ডাইনিং স্পেসে বেসিনের আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ভূপতি দেখেছিল উলটো দিকে দাঁড়ানো অলকার মুখে একটা ছায়া পড়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। আয়নায় চোখাচোখি হতে ম্লান হেসেছিল অলকা, ঠিক আছে, রাখছি। পকেটে পার্স ঢোকাবার সময় ভূপতি মনে মনে অলকাকে বলেছিল, কতটুকু আর তোমাকে জানতে পেরেছি আমি!

ছেলেকে কোলে নিয়ে কোথায় একটা রিকশা পাওয়া যাবে ভাবছিল ভূপতি, মেয়ে মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। আর তক্ষুণি রিকশাটা এল।

মৃত্যুর কোনও সাধারণ অর্থ নেই। প্রত্যেক মানুষের মতো প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুও আলাদা। রিকশায় উঠবার সময় অলকা বলেছিল, তুমি টিকলিকে কোলে নেবে? এত বড় ওই মেয়েকে কোলে নিয়ে আমি আজকাল আর সামলাতে পারি না। অন্যমনস্ক ভূপতি কথাটা শুনেছিল ঠিকই, কিন্তু তখন করবার কিছু নেই আর। টিকলি ততক্ষণে মায়ের কোলে। ছোট্ট, প্রায় পাখির মতো হালকা, বাপ্পাকে কোলে নিয়ে ভূপতি রিকশায় উঠছে। ডানদিকে অলকা।

রিকশা চলতে শুরু করবার পর যখন ছোট্ট ভীরু ছেলেটা ভূপতির কোলে বসে কোট আঁকড়ে ধরেছে এবং যখন রিকশা এগিয়ে চলেছে একটু দুলে দুলে, মৃত্যু মাত্রই ত্রিশ কি চল্লিশ সেকেন্ড দূরত্বে রয়েছে, তখন অদ্ভুত দক্ষতায় বাঁ হাতে টিকলিকে ধরে ডান হাতে ব্যাগ খুলে চিরুনি বার করেছিল অলকা। প্রথমে ছেলে এবং তারপর মেয়ের চুল আঁচড়ে চিরুনিটা ব্যাগে ঢোকাবার সময়ই বোধ হয় টিকলি মায়ের কোলে একটু আলগা হয়ে এসেছিল। এবং ঠিক তখন থেকেই ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে।

অন্যমনস্ক ভূপতি ঠিক সেই মুহূর্তে কী ভাবছিল কিছুতেই মনে পড়ে না। হয়ত তার চিন্তার ভিতরে নিশীথই ঘুরে-ফিরে আসছিল, নিশীথের দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা, চশমার কাচের নিচে শিশুর মতো চোখ দুটি—ঈষৎ বিষণ্ণ অথচ চঞ্চল। যে অস্থিরতা হয়ত জন্মাবধি ভেতরে লালন করছে নিশীথ, ভূপতি দেখছে গত কুড়ি-একুশ বছর, সেই অস্থিরতাই হয়ত নিশীথকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেছে সাফল্যের দিকে—কে জানে। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ থেকে এরিয়া সেলস ম্যানেজার হয়ে কে থায় কত দূরে যাবে নিশীথ ? গোটা দেশ চষা হয়ে গেছে, নিশীথের উদ্যত পায়ের নিচে আছড়ে পড়বার জন্যে অচেনা রহস্যময় কোন মহাদেশ আকুলি-বিকুলি করছে এখন ?

বস্তুত ভূপতি লক্ষই করেনি যে রিকশার ঠিক আগে রয়েছে একজন সাইকেল আরোহী, রিকশার সঙ্গে পাঁচ-ছ ফুট দূরত্ব রেখে ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। উলটো দিক থেকে লরিটা এসে গেছে পাঁচ-ছ গজের মধ্যে খুবই স্বাভাবিক গতিতে। প্রকৃতপক্ষে সাইকেল আরোহী যখন কোনও একটা অজানা কারণে আচমকা ডান দিকে সরে আসছে তখনই প্রথম ভূপতি লরিটাকে লক্ষ করে। কিন্তু সাইকেলের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বাঁচাতে রিকশা তখন ব্রেক কষেছে এবং ভূপতি দেখতে পাচ্ছে অলকার কোলে বসা টিকলি রিকশার সামনের চাকা ধার ঘেঁষে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, লরির সামনের ডান দিকের চাকার তখনও প্রায় ফুট-তিনেক দূরে—

অলকা ঠিক এ সময় আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, নাকি টিকলিকে বাঁচাবার জন্যে রিকশা থেকে লাফ দিয়েছিল—সেটা পরিষ্কার নয়। কারণ ভূপতির দৃষ্টি তখন সামনে লরির ক্রমশ এগিয়ে আসা চাকার দিকে, সে দেখছে অলকার দীর্ঘ শরীর প্রায় ঝরা পাতার ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়ছে পিচের ওপর আর লরির সামনের ডান দিকের চাকাটা টিকলিকে পাশ কাটিয়ে একটা পুরো পাক ঘুরবার আগেই বাঁ দিকে কাত হয়ে থাকা অলকার মাথার ওপর উঠে ফের নেমে যাচ্ছে ধীরে। কোনও চিৎকার নয় এমনকি মাথার খুলি ফেটে যাওয়ার কোনও শব্দও পেল না ভূপতি। ভূপতি শুধু দেখতে পেল কপালের বাঁ দিকে একটা ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে মগজ আর হাঁ-করা মুখ থেকে গলগল করে বেরোচ্ছে রক্ত—দু-একটা মৃদু অস্পষ্ট ঝাঁকুনির পর স্থির হয়ে যায় সম্পূর্ণ শরীর—ভূপতির এযাবৎ দেখা কোনও মৃত্যুদৃশ্যের সঙ্গে লেশমাত্র মিলও নেই।

এই তা হলে অলকার মৃত্যু ! গত বছর শীতে গোপালপুর বেড়াতে গিয়ে অলকা বলেছিল, 'আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না জান ?' সন্ধেবেলা, কী অন্ধকার ছিল সেদিন বাইরে, ঘরের ভিতরে মৃদু আলোয় ঘুমিয়ে আছে বাপ্পা, টিকলি ঘুরঘুর করছে হোটেলের দোতলা বারান্দায়। দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল অলকা, ছোট্ট বারান্দা, শোঁ শোঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, অল্প দূরে অন্ধকার সমুদ্রের আলোড়ন। অন্যসময় হলে ভূপতির রাগ হত, অন্ধকারে হিংস্র হয়ে উঠত তার মুখ, চাপা গলায় হিসহিস করে নিশীথকে জড়িয়ে কয়েকটা অশ্লীল কথা বলে ফেলত সে নিশ্চিত। কিন্তু সেদিন

অন্ধকার সমুদ্রের সামনে অলকাকে প্রকৃতই অসহায় মনে হয়েছিল তার, হয়ত অল্প মায়াও হয়েছিল, যেমন মৃত্যুপথযাত্রী কাউকে দেখলে হয়। বস্তুত ভূপতির মনে হয়েছিল মৃত্যুও অবাস্তব এখন। হাতের আধপোড়া সিগারেট নিচে, হোটেলের লনে না কোথায়, ছুঁড়ে দিয়ে ভূপতি ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'বেঁচে থাকার কষ্টটুকু বাদ দিয়ে শুধু আনন্দটুকু পেতে চাও তুমি ?'

কিন্তু এখন ভূপতি জানে সেটা ছিল নেহাতই কথার কথা। জন্মের পর থেকে যে মৃত্যু মানুষকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে ফেরে তার কথা মাঝে মাঝে বলতে মানুষ ভালইবাসে—ভূপতি দেখেছে। আশ্চর্য, তা হলে অলকার মৃত্যু ছিল মাত্রই কয়েক সেকেন্ডের দূরত্বে ! এই মৃত্যুর জন্যেই কি ছিল অলকার এত আয়োজন, এত প্রস্তুতি ? ওর বেড়ে ওঠা তিলে তিলে, ভিটামিন-প্রোটিন সংগ্রহ, প্রেম, বিবাহ, তারপর আবার প্রেম ? মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক ধরনের অদ্ভুত গুঞ্জন শুনতে পায় ভূপতি। মানুষের মুখ ও শ্বাসযন্ত্র থেকে উৎসারিত হয়ে শব্দগুলো হাওয়ায় একটা ঢেউ তোলে, একটু বাড়ে বা কমে, তারপর ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে। মৃত্যুর স্বাভাবিক, কিছুটা যান্ত্রিক এবং কাল্পনিক, শব্দ ক্রমে জীবনের টুং টাং ছন্দোময় নানা শব্দে ঢেকে যেতে থাকে।

গোটা ব্যাপারটা বুঝে উঠতে প্রায় মিনিটখানেক সময় লেগে যায় ভূপতির এবং তার কোলে ছেলে নেই, লরিটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েকে চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াতে দেখেছিল, কিন্তু এখন ঘনায়মান ভিড়ের মধ্যে সে যে কোথায় ! এত মানুষ ছিল না তো দৃশ্যের মধ্যে, এখন এসে যাচ্ছে পিলপিল করে সব। একটু দূরেই লরিটাকে থামিয়ে কয়েকটা ছোকরা টেনে নামাচ্ছে ড্রাইভারকে, যাকে ভিড়ের জন্যেই ভূপতি দেখতে পায় না, শুধু একটু পরেই লরিটায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে। অশ্লীলতম খিস্তি উঠে আসছে সেখান থেকে। মুহূর্তের জন্যে একবার যেন মনে হয়, ওই ভিড়, যেখানে আলাদা করে এখন আর কাউকে চেনা যাচ্ছে না, যদিও খুবই কাছে—এরই নাম জীবন। ছেলেমেয়ে ওখানেই আছে, খুঁজে নেওয়া যাবে। কিন্তু পথের ওপর যে শুয়ে আছে, বাঁ দিকে কাত হয়ে আছে, মুখখানা জমাট রক্তের ওপর, একটু হাঁ-করা মুখ, চোখ দুটি খোলা এবং ঘোলাটে, মাথার ফাটল থেকে ঘিলু বেরিয়ে খানিকটা পথের ওপর পড়ে আছে—অলকা—এই তা হলে অলকার মৃত্যু ! গত বছর গোপালপুরের সমুদ্রতীরে কি এই মৃত্যুই কামনা করেছিল সে ? অলকা যে আর নেই এটা বুঝতে ভূপতির এক মুহূর্তের ভগ্নাংশও লাগে না। চটি বাঁ পায়ে আসতো লেগে আছে, ডান পায়েরটা নেই, চন্দন রং-এর তাঁতের শাড়ি পায়ের গোড়ালি আর হাঁটুর মাঝামাঝি উঠে এসেছে, অবিকৃত পায়ে আজই সকালে লাগানো গাঢ় লাল আলতা। হাতের কব্জিতে বাঁধা গত পুজোয় কেনা কোয়ার্টজ ঘড়িটা নিঃশব্দে চলেছে।

ভিড় গোল হয়ে আছে। একজন চশমা-পরা মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা, নাকে আঁচল চাপা, খুবই শান্তভাবে মৃত্যু দেখে বলল, আহা রে, একেবারে কচি বয়স ! একটু দূরে ফুটপাথে আরও কয়েকজন মহিলা জটলা করছিল, এগিয়ে এসে মৃত্যু দেখতে ভয় পাচ্ছে, তাদেরই একজন আর একজনকে ভূপতির দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, ওই যে, ওই ভ[illegible]। ভূপতি টের পায় এই মৃত্যুতে তারও একটা ভূমিকা আছে—অস্পষ্ট, খুবই সুদূর, তবু ভূমিকা তো ! আমূল চমকে ওঠে সে।

ভিড়ের ভেতর থেকে একটি অল্পবয়স্ক ছেলে এগিয়ে এসে অলকার ব্যাগটা হাতে তুলে দিয়ে যায়। কালচে রক্তের ছিটে, একটা আঁশটে গন্ধ পায় ভূপতি, গা গুলিয়ে ওঠে, তবু সে এগিয়ে গিয়ে অলকার পায়ের কাছে দাঁড়ায়। চেপ্টে যাওয়ায় মুখটা অচেনা

লাগছে, বস্তুত এখন আর তাকে মানুষের মুখ বলেই চেনা যায় না। একজন পাশ থেকে বলল, আপনার কোটটা দিন তো দাদা। মুখটা ঢেকে দিই। যন্ত্রচালিতের মতো কোট খুলে দেয় ভূপতি, বিড বিড করে বলে, নিশীথকে একটা খবর দেওয়া দরকার। একটা ট্যাক্সি পেলে—

ফুটপাথে টিকলি এবং বাপ্পাকে আগলে আছে কয়েকটি যুবক। তাদেরই মধ্যে একজন কেউ বোধ হয় ট্যাক্সি ধরতে গেল। ভূপতি টের পায় সে নিজে এখন আর কিছু করছে না, তাকে যা বলা হচ্ছে সে করে যাচ্ছে মাত্র। ভিড়ের ভেতর থেকে একজন তাকে হাত নেড়ে ডাকে, দাদা, এদিকে চলে আসুন।

ট্যাক্সিতে বাপ্পা এবং টিকলিকে তুলে দিচ্ছে যুবকেরা। একজন উঠে বসল ড্রাইভারের পাশে, কোনদিক যাবে বলে দিন, দাদা। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করতে করতে ভূপতির মনে হল এত কাছে নিশীথের বাড়ি, সামনের পার্কটা ঘুরলেই দেখা যাবে বাড়িটা, ট্যাক্সি মিটারের ঘাট পালটানোর আগেই পৌঁছে যাবে সেখানে। ওরা তো চারজনেই এসেছিল এখানে, একজন পথের মাঝখান থেকে বাঁক নিয়ে চলে গেল অন্যদিকে। এখন তিনজন সেখানে যাচ্ছে।

দুই

নিশীথ, শুনুন, আমি আপনাকে ভালবাসি না। আমি ভালবাসি ভূপতিকেই। আমার সমস্ত বয়ঃসন্ধিকাল এবং যৌবন জুড়ে রয়েছে ভূপতি। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে রয়েছে ভূপতি। বলতে পারেন আমার যা-কিছু দেখা যায়, ছোঁওয়া যায় তার সবটুকুই ভূপতির নির্মাণ। আমার চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে ভূপতিকে আমি প্রথম দেখি। গড়িয়া বাস স্ট্যান্ডের কাছে আমাদের বাড়ির একতলায় আমার বাবার কাপড়ের দোকান ছিল। পেছনের দিকে একটা স্যাতসঁ্যাতে অন্ধকার ঘর অনেকদিন পড়ে ছিল, কেউ থাকত না। কিছু ভাঙা ফার্নিচার, পুরনো প্যাকিং বাক্স, চৌষট্টি সালের দাঙ্গায় যশোর থেকে পালিয়ে আসবার সময় আনা দুটো বিশাল স্টিলের ট্রাঙ্ক—এসব রাখা ছিল সে ঘরটায়। সেবার বাংলাদেশের যুদ্ধ শুরু হল, পিল-পিল করে শরণার্থী ঢুকছে বনগাঁ সীমান্ত পেরিয়ে। আমার বুদ্ধিমান এবং চূড়ান্ত বিষয়ী বাবা ঘরটা রঙ করে, দোতলার সিঁড়ির কাছে কলতলায় এক ফালি জায়গা অ্যাসবেস্টস-এর ছাউনি দিয়ে রান্নাঘর মতো করে দিলেন। ভূপতি তার মাকে নিয়ে ভাড়াটে হয়ে এল সেই ঘরটায়। সেই প্রথম আমি ভূপতিকে দেখি। ভূপতি দিনেরবেলায় কী একটা চাকরি করতে যেত বারুইপুরের দিকে, রাতে কলেজ করে ফিরত। খুবই পরিশ্রম করতে হত ওকে, আমাকে লক্ষ করবার সময়ই ছিল না ওর। ওর রোগা পরিশ্রমী চেহারা, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ—সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল ভূপতির। মৃত্যুর কিছুদিন আগে ভূপতির মা যখন শয্যা নিয়েছেন তখন আমি প্রায় সব সময়েই তার কাছাকাছি থাকতাম। খুব সম্ভবত ভূপতি তখনই প্রথম আমাকে লক্ষ করে। আমাদের ভালবাসা হল, নিশীথ! খুবই স্বাভাবিকভাবে হল। তখন আপনাকেও আমি দু-একবার গড়িয়ার বাড়িতে দেখেছি। কিন্তু ভূপতি তখন বিশাল পর্বতের মতো পৃথিবীর আর সব কিছু আড়াল করে আছে, অন্য কোনও পুরুষকে ভাল করে দেখবার কোনও উপায়ই ছিল না আমার!

কিন্তু এখন আপনাকেও আমার চাই। আপনাকে কদিন না দেখতে পেলে, টেলিফোনে আপনার গলা না শুনতে পেলে আমার সব কেমন বিস্বাদ হয়ে যায়। ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে উঠেই টের পাই আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আছে। মাথাটা

অল্প ভারী। টুথপেস্টের গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। মেয়ের স্কুল ইউনিফর্ম খুঁজে পেতে দেরি হয়ে যায়, স্কুল ব্যাগে ছবি আঁকার রঙিন অয়েল প্যাস্টেল ঢোকাতে ভুলে যাই। অফিসে বেরোবার আগে খেতে বসে সব কিছুই কেমন তেতো বিস্বাদ লাগে। কাজের মেয়েটাকে ডেকে অকারণে ধমক দিই, বলি ও যেন অন্য কোথাও কাজ দেখে নেয়। ওকে আর কাজে রাখব না। ভূপতি এ সময় খুব গম্ভীর হয়ে থাকে, কী ভাবে জানি না। ভূপতির সঙ্গে কোনও কথা হয় না। অফিসে এসে বড় অস্থির বোধ করি। সরকারি অফিসের ডেসপ্যাচ সেকশনে বিশেষ কাজ থাকে না, থাকলেও ধীরেসুস্থে করলেই চলে। টেবিলে বসে চিঠিপত্রগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। এক সময় শরীরে জ্বরভাব টের পাই। পাশের টেবিলের প্রদ্যোতবাবুকে বলে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু ভরদুপুরবেলায় কলকাতা শহরে আমি কোথায় যেতে পারি, নিশীথ? নিউমার্কেট ঘুরে ছেলেমেয়ের জন্যে টুকিটাকি দু-একটা জিনিস কিনি, গড়িয়াহাটার ফুটপাথে চাপা ভিড়ের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন একা ঘুরে বেড়াই, শেহনাজের ঠান্ডা ঘরের ভিতর ঢুকে মাস্ক নিতে বসে যাই।

অথচ, নিশীথ, এসব যে আপনার জন্যেই ঘটছে সেটা আমি অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে মেয়ের স্কুল টাস্ক নিয়ে বসি, সুঁচসুতো নিয়ে ছেলের প্যান্টের খুলে যাওয়া সেলাই ফের জুড়ে দিই। মনে হয় খুব শিগগির পৃথিবীতে যেন গুরুতর কিছু একটা ঘটতে চলেছে। অথচ তেমন কিছুই ঘটে না। এক একদিন রাত্তিরে আমার কী হয়! ভূপতিকে সঙ্গ দিই ঠিকই, কিন্তু কথাবার্তা তেমন হয় না। খাবার টেবিলে বসে মেয়ের স্কুলবাস, রান্নাঘরের ফুরিয়ে যাওয়া গ্যাস, কাজের মেয়েটির বাড়ি যাওয়া—এসব নিয়ে দু-চারটে কথা হয়। খুবই দরকারি, কিন্তু অর্থহীন সব কথা। মাথা ধরেছে বলে উঠে যাই। তাড়াতাড়ি লাইট নিবিয়ে শুয়ে পড়ি। ছেলে আমার সঙ্গে শোয়, মেয়ে বাইরের ঘরে ভূপতির সঙ্গে। মাঝরাতে আধো ঘুমের মধ্যে টের পাই ভূপতি পাগলের মতো আদর করছে আমাকে। আমার ঘাড় গলা আগুন নিশ্বাসে পুড়ে যেতে থাকে, আমার শরীর আমি ভূপতির হাতে তুলে দিয়ে চলে যাই দূরে...

এসব আপনার জন্যেই ঘটে, নিশীথ! কারণ পরদিন যখন অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত, চানঘরে ঢুকতে যাব, ঠিক তখনই বেজে ওঠে টেলিফোন। সমস্ত চরাচর জুড়ে টেলিফোন বাজে। টেলিফোন তুলতেই ওপার থেকে আপনার গলা শুনতে পাই, হ্যালো, আমি নিশীথ বলছি।

আমি চুপ করে থাকি, ওপার থেকে আপনার অস্থির কণ্ঠস্বর ভেসে আছে, শুনতে পাচ্ছেন, হ্যালো! অলকা। ভূপতি ফিরেছে? আমি চুপ করে থাকি আবার। আপনি উত্তরের অপেক্ষা না করে বলেই চলেন, গত রাতেই ফিরেছি গৌহাটি থেকে, জানেন! এবার টানা অনেকদিন থাকতে পারব কলকাতায়, পুজো পার করে সেই ডিসেম্বরের শেষে যেতে হবে কোহিমা!

আপনি কি আমার নিশ্বাসের শব্দ টেলিফোনে শুনতে পান, নিশীথ? নইলে কেনই-বা হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলবেন, কী হল, অলকা? কী হল আপনার? কথা বলছেন না যে? আপনাকে না দেখে গত দু মাস আমি গৌহাটিতে কী করে কাটালাম একবারও জিজ্ঞেস করলেন না তো?

—কী আর জিজ্ঞেস করব! আপনারা ব্যস্ত লোক।

টেলিফোনে আপনার সত্যিকার দুঃখিত গলা শুনতে পাই, ঠাট্টা করছেন! ঠিক আছে, কাল আপনার অফিসে আসছি দুপুরে। ভূপতিকে বলবেন রোববার সন্ধেবেলায়

আমি আসব, কোথাও বেরিয়ে না যায় আবার।

তারপর এক লহমায় আমার সব কিছু বদলে যায়, জানেন! মেয়ের স্কুলের রুটিন গোছাতে ভুল হয় না, মিনুর ফুলকপির ডালনা চমৎকার লাগে খেতে। বাপ্পাকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করি। ক্যামাক স্ট্রিটে টিকলিকে নাচের স্কুলে দিয়ে ফেরার সময় গড়িয়াহাট থেকে চিকেন আর ইলিশমাছ এনে যত্ন করে ফ্রিজে তুলে রাখি। একটু টক দইও আনতে ভুলি না। অফিস থেকে ফেরার সময় ভিড় বাস থেকে নেমে মিষ্টির দোকান থেকে আপনার প্রিয় সন্দেশ কিনি, ততোধিক ভিড় বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে টের পাই পাশের আধবুড়ো লোকটার ভীরু এবং লোভী হাত আমার কোমরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি রাগ করি না, ক্ষমা করে দিই। অনেক রাতে ঘুমন্ত ভূপতিকে জাগিয়ে তুলি। কাল দুপুরে আপনাকে দেখতে পাব। রোববার সারাদিন ধরে আমি আপনার জন্যে রাঁধব। নিশীথ, একথা ঠিক যে আমি ভূপতিকে ভালবাসি। ওর শরীরের স্পর্শ ছাড়া আমার শরীর বাঁচবে না। কিন্তু আপনাকেও যে আমি চাই, ভীষণভাবে চাই! এসব কী অদ্ভুত ব্যাপার বলুন তো!

অলকা ঠিক এভাবে কথা বলত না, কিংবা কে জানে এভাবে হয়ত কেউ কথা বলে না। তবু নিশীথ জানে যে গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে অলকা এই কথাগুলোই তাকে বলতে চেয়েছিল। অথচ অলকাকে তো নিশীথ চিনত তারও অনেক আগে থেকে। ভূপতি ডব্লু বি সি এস পাস করে হাওড়ায় জয়েন করেছে তখন, অলকা বিজয়গড় কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দেবে, তখনই তো নিশীথ দেখেছিল তাকে। বিয়ের আগেই ভূপতির মা মারা যান। বিয়ের পর ভূপতি উঠে আসে রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে। তখন থেকেই কি অলকা একটু একটু করে পালটাতে শুরু করেছিল? নাকি নিশীথই আবিষ্কার করেছিল অন্য এক অলকাকে?

কী করবে নিশীথ এখন? কী করতে পারে সে? ভূপতির কাছে ঘটনাটা শুনে প্রায় পাগলের মতো ছুটে গিয়ে সে যাকে দেখে এল পথের ওপর ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে তাকে তো সে চেনে না! এই ঘরে এখন মোট পাঁচজন মানুষ। নিশীথ, ভূপতি, বন্দনা আর বাচ্চা দুটি। নিশীথের ছেলে বুকুন, আজ সকালেও যার একশ এক-এর ওপর জ্বর ছিল, নিচতলার ভাড়াটে বউটার সঙ্গে কথা বলতে গেছে। দোতলার কোণের এই ঘরটা থেকেও অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ পাচ্ছে নিশীথ। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। দূরের পার্কটায় সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, চুড়োর লাল আলোটা জ্বলবার সময় হয়ে এল। আপাতত কারও কোনও কথা নেই। বাপ্পা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বিছানার একেবারে মাঝখানে। বুবুন খাতা আর রঙিন ক্রেয়ন দিয়েছিল, টিকলি সারাক্ষণ এলোমেলো ছবি এঁকেছে—এখন উঠে বারান্দায় গেল। খাটের এক কোণে চিৎ হয়ে শুয়েছিল ভূপতি, উঠে বসে বলল, একটু চা করবে, বন্দনা!

—দিচ্ছি! ড্রেসিং আয়নার সামনে ছোট্ট টুল থেকে বন্দনা উঠল। চেয়ারে বসা নিশীথের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি খাবে? বাইরের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে নিশীথ কী বলল বোঝা গেল না। বন্দনা দেখল নিশীথের চোখ দুটো লালচে হয়ে আছে, কিন্তু শুকনো খটখটে। বন্দনা বলল, নিচতলার সোমেন গেছে—হাসপাতাল হয়ে চিৎপুর থানায় যাবে বলছিল—সেখান থেকে ফোন করবে—

কথাটা কার উদ্দেশে বলা ঠিক বোঝা গেল না। বন্দনা কিচেনের দিকে যাচ্ছে, পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ভূপতি ফোন ধরতে গেল। অলকা মারা গেছে, প্রায় ছ ঘণ্টা হতে চলল। কিছুক্ষণ আগে পাড়ার একটি ছেলে এসে খবর দিয়ে গেছে, বডি

আব. জি. কব হাসপাতালেব মর্গে আছে। আজ বাতটা ওখানেই থাকবে। কাল সকালে নীলবতনে যাবে, সেখানেই পোস্টমর্টেম কবে বডি ছাডবে। চেযাব ছেডে উঠে বাবান্দায গিযে একটা সিগাবেট জ্বালবাব কথা ভাবছিল নিশীথ। কিন্তু এখন সিগাবেটও তেতো বিস্বাদ লাগছে।

পাশেব ঘবে কাব সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে ভূপতি, শব্দগুলো পাথবেব কুচিব মতো ছিটকে এ ঘবে ঢুকছে। চুপ কবে শুনল খানিক বুঝি , তাবপব আলাব বলছে ভপতি, বডি আজ পাওযা যাবে না। কাল দুপুবেব দিকে বলছে, হ্যাঁ, বিকেলও হতে পাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গডিযায ওদেব বাডিতে একজন কেউ যাক। হুঁ, হুঁ, কী আব কবা যাবে। বাচ্চা দুটোকে নিযে একটা ট্যাক্সি কবে চলে আসব। হ্যাঁ, কালীঘাট থেকে পিসিমাকে নিযে এনে বাখতে হবে কটা দিন।

বডি শব্দটা যেন এই প্রথম শুনছে নিশীথ। পাশেব ঘবে ফোন নামিযে বেখে ভূপতি বুঝি বাথবুমেব দিকে গেল। বডি—ওই শবীব কতবাব স্পর্শ কবেছে নিশীথ, বহস্যময মহাদেশেব মতো একটা শবীব। অনেকবাব দেখেছে সে, তবু মনে হয অদেখা বইল কত নদী কত পাহাড কত সমুদ্র। শবীবই তো শবীবকে ভালবাসতে পাবে। মেডিকেল বিপ্রেজেনটেটিভেব চাকবি নিযে দীর্ঘদিন কত দূবদূবান্তে ঘুবে বেডাচ্ছে সে। কতবকম মানুষ দেখছে, কত বিচিত্র তাদেব চাওযা-পাওযা। শবীব। একদিন পার্ক স্ট্রিটেব এক অন্ধকাব বেস্টুবেন্টে চুমু খাওযাব ফাঁকে অলকা বলেছিল, আপনাব ভাবনাগুলো বড্ড ক্রুড, নিশীথ। শবীবেব বাইবেও তো মানুষ আছে। ভালবাসা আছে। নিশীথ সেদিন বলেছিল, হযত আছে। কিন্তু শবীবেব বাইবে থেকে ঘুবে এসে ক্লান্ত হযে আমাদেব যে আবাব সেই শবীবেব মধ্যেই ঢুকতে হয। বাডি বদল কবাব মতো শবীব বদল কবাব কোনও উপায যে নেই।

জানালাব দিক থেকে চোখ না ফিবিযেই নিশীথ টেব পায ভূপতি নিঃশব্দে ঘবে ঢুকল। ভূপতি এসবেব কতটুকু জানে তা নিযে কখনও মাথা ঘামাযনি নিশীথ। বস্তুত ভূপতিকে দেখলে চিবকালই একধবনেব মাযা হয নিশীথেব। আজও হচ্ছে। ভূপতিব যেন কোনও ভূমিকাই ছিল না কোনওদিন। ঘাড ফিবিযে নিশীথ দেখল বন্দনাব বাডিযে দেওযা ট্রে থেকে হাত বাডিযে চাযেব কাপ তুলে নিচ্ছে ভূপতি। এবই মধ্যে ভাইযেব পাশে কখন এসে ঘুমিযে পডেছে টিকলি অবেলায। ভূপতি একবাব চিন্তিতভাবে তাকাল সেদিকে আব তখনই কুডি বছব আগেকাব ভূপতিকে যেন একঝলক দেখতে পেল নিশীথ।

তিন

ভোব হযে আসছে। শান্ত সমাহিত কলকাতায ভোব হচ্ছে! দু'জন বযস্ক লোক বাজা বসন্ত বায বোড ধবে লেকেব দিকে যাচ্ছে। যে কোনও ভোবেব মতো একটা ভোব। কতদিন পব ভোব হওযা দেখছে ভূপতি মন দিযে। গতবাব শীতে গোপালপুব যাওযাব সময মাদ্রাস মেলেব জানালা থেকে শেষবাব এবকম ভোব হওযা দেখেছিল সে। মনে পডল।

ডাইনিং স্পেসে মশাবি টাঙিযে কাজেব মেযেটা শুযে আছে। পাশেব ঘবে কালীঘাটেব পিসিমাব সঙ্গে শুযেছিল বাপ্পা টিকলি। আজ স্কুল নেই, বাস্ততা নেই। ভূপতি ঘবে এল। বুকে অল্প টান হচ্ছে। শীতকালে এবকম প্রাযই হয। ভূপতি জানে একটু পবেই কলকাতা ব্যস্ত হযে উঠবে। মোডানো খববেব কাগজ লাফিযে নামবে

ব্যালকনিতে। দুধওয়ালা, ঠিকে ঝি আসবে একে একে। শুধু অলকা শুয়ে থাকবে একা আর. জি. কর হাসপাতালের মর্গে ঠাণ্ডা মেঝেতে আরও অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না পোস্টমর্টেম হচ্ছে। অথচ একদিন মেয়েটাকে ভূপতিই তো আবিষ্কার করেছিল, শরীর উন্মুক্ত করে দেখেছিল কোথায় কী কী থাকে। কতটুকু জানতে পেরেছিল ভূপতি অলকাকে ? সত্যি সত্যি কী চেয়েছিল অলকা—ভাল করে বুঝে উঠবার আগেই চলে গেল সে চূড়ান্ত অনিচ্ছায়।

নিশীথ, তোর কী আছে বলতে পারিস যা আমার নেই ? ভালবাসাই যদি অলকার কাছে শেষ কথা হয়ে থাকে তাহলে তো তুই হেরে যাবি। শরীরের বাইরে কোনও কিছুরই কোনও মূল্য নেই তোর কাছে। তাহলে কি সিদ্ধান্ত এই—ভালবাসা আর শরীরের বাইরে এমন কিছু আছে যার জন্যে অলকা বারবার ছুটে গেছে তার কাছে ? নিশীথ, এই জন্যে তোকে আমি দোষী করতে পারি না। প্রথম যখন ঘটনাটা আমি জানতে পারি তখন বাপ্পার বয়স ছ মাস। খুবই অশান্তি হয়েছিল আমাদের। অন্য আর দশটা ক্ষেত্রে যা হয় আমাদের বেলায়ও ব্যতিক্রম হয়নি কিছু। নিশীথ, তুই জানিস জোর করে কোনও কিছু দাবি করা, কোনও কিছুর প্রতিবাদ করা আমার স্বভাবের মধ্যে নেই ! আমি ছোটবেলা থেকেই সব কিছু নিঃশব্দে মেনে নিতে শিখেছি। আমার কোনও উপায় ছিল না। তবু একরাতে আমি আমার স্বভাবের বাইরে দাঁড়িয়ে জানতে চেয়েছিলাম, আমার কী নেই আজ তোমাকে বলতে হবে, অলকা ! ব্যালকনির অন্ধকারে আমি দেখতে পাইনি অলকা কাঁদছিল কি না, তবে তার গলা স্বাভাবিক ছিল না, একটু ধরা গলায় বলেছিল, তুমি রাগ করতে পার, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। কোনও মানুষই সম্পূর্ণ নয়, কোনও না-কোনও কিছুর অভাব তার থাকেই। আমি ঠিক জানি না তোমার কী নেই, তবে কিছু একটা যে নেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারি। আমি বলেছিলাম, তোমার মতে সেটা তাহলে কেবল নিশীথেরই আছে ? অলকা একটু চুপ করে থেকে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, হ্যাঁ, আছে। শুধু সেইটুকুই আছে, আর কিছু নেই।

তারপর অলকা আর কিছু বলেছিল কি না শুনতে পাইনি আমি। শুধু অনেকক্ষণ ধরে ব্যালকনির অন্ধকারে অলকার চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম আর প্রকৃত মূর্খের মতো লাগছিল নিজেকে। মনে হচ্ছিল দুটো মানুষকে জুড়ে দিয়ে একটা অলীক মানুষ নির্মাণ করে এতকাল শুধু তাকেই কামনা করে গেছে অলকা ? নিশীথ, এও কি সম্ভব ?

শ্বাসকষ্টটা বাড়ছে বলে সোফায় এসে বসেছিল ভূপতি। নিদ্রাহীন চোখের পাতা দুটি ভিজে উঠছে বলে মনে হল একবার। চমকে উঠল ভূপতি। প্রকৃত শোক বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু তো ঘটছে না, হু হু করে উঠছে না তো বুক, মায়ের মৃত্যুর পর প্রথম কিছুদিন যেমন হয়েছিল ! নিজেকে বড় নিষ্ঠুর বলে মনে হয় ভূপতির। এরকম মর্মান্তিক একটা মৃত্যু—ভাবা মাত্র দৃশ্যটা চোখের সামনে চলে আসে, গা গুলিয়ে ওঠে। বহু দূরে উত্তর কলকাতা থেকে ভেসে আসতে শুরু করে আঁশটে গন্ধটা। মাথার দুদিকে শিরাগুলি দাপিয়ে ওঠে, নিঃশ্বাসে কষ্ট—সব মিলিয়ে ভিতরে একটা আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে—সবই কি ভূপতির একার জন্য ? এমনকি মাতৃহীন শিশু দুটিকেও কেবল ঘটনার দর্শক বলে মনে হয় ভূপতির এক সময়।

অস্পষ্ট হয়ে আসে চেনাজানা মুখগুলো, অস্পষ্ট হয়ে আসে চেতনা। এমন কি এ মুহূর্তে অলকাকেও অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে ভূপতির। বিশ্বাস হতে চায় না সাঁইত্রিশটা বছর পৃথিবীতে কাটিয়ে গেছে অলকা। মনে পড়ল সন্ধেবেলায় খবর পেয়ে

বেহালা থেকে অলকাব দিদি এসেছিল, চোখ দুটি লাল, ভেজা। যাবাব সময ডাইনিং স্পেসে ভূপতিব হাত দুটি চেপে ধবে বলেছিল, শক্ত হও, ভূপতি। এখন তোমাব অনেক দাযিত্ব। ছেলেমেযে দুটিকে মানুষ কবতে হবে, সবই তো একাই কবতে হবে তোমাকে। ভূপতি শুধু বলেছিল, হ্যাঁ, তাই তো। ভাযবাভাই অশোক কাঁধে হাত বেখে বলেছিল, জীবনে এসব আছেই, ভাই। কিছু তো কবাই নেই, বেঁচে থাকতে হবে, শক্ত তো হতেই হবে।

পাশেব ঘবে খুটখাট শব্দ হয। ভেজানো দবজা খোলাব শব্দ পেল ভূপতি। কালীঘাটেব পিসিমা বোধ হয উঠে বাথবুমেব দিকে যাচ্ছেন। নিজেব ঘনিষ্ঠ কেউ নয। বাবাব দূবসম্পর্কেব খুড়তুতো বোন। চাবদিক ফবসা হযে এসেছে। এ ঘবেব দবজা খোলা, আলো জ্বলছে দেখে উঁকি দিযে বললেন, সাবা বাত ঘুমোসনি বুঝি। দাঁড়া, চা কবে আনছি।

হযত কোনও কথা খুঁজে পাননি পিসিমা, কিংবা হযত ঠিক এই পবিস্থিতিতে কী বলত হয তিনি জানেন না—তবু পিসিমাব সামান্য এই দুটি কথায মুগ্ধ হযে গেল ভূপতি। ভোবেব আলোয কলকাতা জাগছে। কাল গড়িযা থেকে কেউ আসেনি এ বাড়িতে। পাশেব বাড়িব একটি ছেলে খবব দিযে গেছে, আসবাব মতো অবস্থা নেই কাবও।

অলকা চলে গেছে। বেঁচে থাকলেও অলকা ভূপতিব সঙ্গে সাবা জীবন নাও থাকতে পাবত। অলকাব চাওযা-পাওযাগুলো ছিল অত্যন্ত টানটান, পবিষ্কাব। এটা আমাব চাই, ওটা চাই না— ঠিক এবকম। শুধু একটা জাযগায এসে ও পথ হাবিযে ফেলেছিল। দুটো মানুষকে ভেঙে অন্য একটা মানুষ তৈবি কবেছিল অলকা। ভূপতি খুব ভাল কবে জানে অলকা ভালবাসত তাব সংসাব, ছেলেমেযে, ভূপতি এবং নিশীথকে।

সকাল দশটাব মধ্যে আত্মীযস্বজন অনেকে এল। এই শহবে ভূপতিব নিজেব আত্মীয বলতে মামা আব মামি। দমদম থেকে এসে স্তব্ধ হযে বসে আছেন সোফায। অলকাব আত্মীযস্বজনদেব অনেককেই চেনে না সে। অফিসকলিগ কাউকে কাউকে দেখতে পেল। অলকাব অফিস থেকেও এসেছে কযেকজন। ছেলে-মেযে দুটি শুকনো মুখে ঘুবে ঘুবে বেড়াচ্ছে। ভূপতি বুঝতে পাবে যে এখন তাব নিজেব আব কিছু কববাব নেই। ভিড়েব থেকে ছিটকে-আসা কথাবার্তায ভূপতি জানতে পাবে কযেকজন ইতিমধ্যে চলে গেছে এন. আব. এস. মর্গে। বেহালা থেকে অশোক এসেছে সবাব আগে, এসেই এত ব্যস্ত হযে আছে যে এখন পর্যন্ত একটাও কথা হযনি। মাঝেমাঝেই ডাযাল ঘুবিযে ফোনে দবকাবি কথাবার্তা বলছে। বস্তুত কোনও কিছুতেই ভূপতিব আব যেন কোনও ভূমিকা নেই। মাঝখানে পিসিমা এসে একবাব জিজ্ঞেস কবে গেছে, তোকে দুটো বুটি কবে দেব? কালকেব নিবামিষ তবকাবি আছে। সকাল থেকে চা ছাড়া কিছু খাসনি! ভূপতি প্রায ফিসফিস কবে বলেছে, থাক। এখন খিদে নেই।

নিশীথ এল একটু দেবি কবে। সঙ্গে বন্দনা আব বুবুনকেও দেখতে পেল ভূপতি। ঘবেব মধ্যে এই ভিড়ে কাউকেই আলাদা কবে লক্ষ কবতে পাবে না সে। পাড়াব অনেকেই এসেছে, যাদেব কাউকে কাউকে ভূপতিব মনে হল আজই সে প্রথম দেখছে। তবু চশমাব কাচেব ওপাবে নিশীথেব লাল ফোলা ফোলা চোখ দুটি পবিষ্কাব দেখতে পেল সে। অস্থিব চঞ্চল নিশীথ। অলকাব শেষ প্রেমিক। মাত্র একটা বাতেই চোখেব নিচে যেন ঘন হযে কালি পড়েছে, যেন বেশ কযেকটা বছব পেবিযে গেছে নিশীথ।

ঠাণ্ডা মেঝেতে বসা ভূপতি হাত নেড়ে ডাকল। রজনীগন্ধার স্টিক এনেছে কি কেউ ? এই ছোট ঘরটায় এত লোকের মধ্যেও গন্ধটা পেল ভূপতি। নিশীথ এগিয়ে এসে ভূপতির পাশে বসে কাঁধে হাত রাখতেই একটা গরম আঁচ পেল ভূপতি। অশোক বোধ হয় কাকে অলকার দুটো ছবি প্রিন্ট করিয়ে আনতে দিয়েছিল। অল্পবয়স্ক একটা ছেলে এসে একটা বড় খাম দিয়ে গেল অশোকের হাতে। বছর কয়েক আগেকার তোলা নেগেটিভ দুটো বোধ হয় অশোকের কাছেই ছিল। খাম থেকে ছবি দুটো বের করার পর সকলেই এখন ছবি দুটো দেখছে। ছবির থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বন্দনা আড়ালে চোখ মুছে নিল একবার শাড়ির আঁচল দিয়ে। নিশীথ উঠল না, মুখ ফিরিয়ে নিল জানালার দিকে। ভূপতি বলল, তোর শরীর ভাল নেই ? নিশীথ উত্তর দিল না। ভূপতি অনেকটা আপন মনেই বলল, গাটা ভীষণ গরম ঠেকছে।

অশোক একটা ফোন করল কাকে। ফোন নামিয়ে ভূপতির কানের কাছে এসে নিচুগলায় বলল, আর দেরি করে তো লাভ নেই, ভূপতি। কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিয়েছি মর্গে। বাইরে ট্যাক্সি রয়েছে, তোমার সিগনেচার ছাড়া তো আবার মর্গ থেকে বডি ছাড়বে না। নিশীথ কথাটা শুনে উঠে দাঁড়াল। অলকা নয়, অলকার বডি—ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল নিশীথ। কী চেয়েছিল অলকা তার কাছে ? কিছু একটা তো নিশ্চয়ই চেয়েছিল, কারণ অলকা পরিষ্কার করে সব চাইতে জানত। অলকার চাওয়াটা নিশীথের আর জানা হল না। নিশীথ মর্গে যাবে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় নিশীথ লক্ষও করল না বন্দনা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে তার যাত্রাপথের দিকে। পেছনে আসছে ভূপতি।

চার

গত ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে কতরকম প্রতিক্রিয়া দেখছে ভূপতি। কাল অ্যাকসিডেন্টের খবরটা পেয়ে নিশীথ যখন প্রায় উন্মাদের মতো ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন বন্দনা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এসে ভূপতির হাত দুটি চেপে ধরেছিল। একটিও কথা বলেনি বন্দনা, তবু তার নীরক্ত মুখখানা দেখে ভূপতি বুঝতে পেরেছিল বন্দনারও অনেক কথা জমে আছে। এখন এই চমৎকার শ্মশানটির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভূপতি তার কয়েকজন অফিসবন্ধুকে দেখতে পেল। কয়েকজন মহিলাও রয়েছেন, ভূপতি কাউকেই চিনতে পারে না। টালিগঞ্জ এলাকায় এই শ্মশানটা বোধ হয় নতুন হয়েছে, ভিড় কম। একপাশে একটা কালীমন্দির, তার বারান্দায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে ক'জন। দূর থেকেও নিশীথকে চিনতে পারে ভূপতি। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে নিশীথ, একা। ওপরে একটা গাঢ় কালো আকাশ স্তব্ধ হয়ে আছে এখন, ভূপতি সেদিকে তাকাল। ভিতরে ইলেকট্রিক চিতায় অলকার শরীর পুড়ছে। পুড়ে ছাই হতে আরও মিনিট কুড়ি লাগবে।

লাল বেনারসী পরা অলকা যখন লাল গহ্বরটার ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল ধীরে তখন শব্দ করে কেঁদে উঠেছিল নিশীথ। সে কান্নায় কী ছিল কে জানে, বড় অস্বস্তি হচ্ছিল ভূপতির। অথচ বেনারসীটা পরানো হয়েছিল নিশীথেরই অনুরোধে। এন. আর. এস. মর্গের ডোম খুব যত্ন করে শাড়িটা পরিয়ে দিয়েছিলে কাটাছেঁড়ার পর। ঘোমটা করে দিয়েছিল এমনভাবে যাতে নাকের নিচ পর্যন্ত ঢাকা থাকে। পাড়ারই একটি আধচেনা বউ আলতা পরিয়ে দিয়েছিল পায়ে। কপালে সিঁদুর পবার উপায় ছিল না, সেটা ডোম বলেই দিয়েছিল। খানিকটা সিঁদুর ঘোমটার ওপরই ঢেলে দিয়েছিল বউটা। হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে ওঠাবার সময় কে একজন বরফের কথাও তুলেছিল, অথচ তার

কোনও প্রয়োজন ছিল না।

ধরাধরি করে কাচঘেরা গাড়িটায় যখন অলকাকে ওঠানো হচ্ছে, তখনই আড়চোখে প্রথম অলকার ঠোঁট দেখতে পেয়েছিল নিশীথ। রক্তের দাগ তখনও শুকিয়ে কালো হয়ে আছে ঠোঁটের কোণে। বস্তুত তার আবারও মনে হয়েছিল, এ তো অলকা নয়, কিছুতেই অলকা নয়। অলকার অনেক কথাই যে জানা হয়নি এখনও তার! অলকা হঠাৎ এইভাবে খেলাচ্ছলে চলে যাবে! অবুঝ আচ্ছন্ন নিশীথের মনে হয়েছিল সে বোধ হয় পড়ে যাচ্ছে, কাটা ঘুড়ির মতো ঘুরে ঘুরে পড়ে যাচ্ছে এবং আশ্চর্য তখনই ভিড়ের মধ্যে সে বন্দনার উৎকণ্ঠিত চোখ দুটি দেখতে পেয়েছিল। এই তাহলে মৃত্যু, এরকম! মনে হতেই সে অবিশ্বাসী চোখে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে কাচের ঘেরাটোপের ভেতরে শায়িত অলকাকে দেখতে পায়। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে ধীরে এগিয়ে যাবার সময় আলতারঞ্জিত পা দুটি ফের দুলে ওঠে শেষ বিকেলের আলোয়। ভূপতিও যাচ্ছে গাড়িতে, সঙ্গে আরও দু'জন, ওদের পাড়ারই। গাড়ি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শীতের ঠাণ্ডা শুকনো হাওয়ায় ধুলো ও খই ওড়ে।

–এই যে, দাদা, আপনাকে ডাকছে! চমকে ফিরে তাকিয়ে ভূপতি অল্পবয়স্ক ছেলেটাকে দেখল। এই শ্মশানের কর্মচারী হতে পারে, আবার পাড়ার কেউও হতে পারে। ভূপতি চেনে না। ছেলেটা আবার বলল, আসুন আমার সঙ্গে, আপনাদের কাজ হয়ে গেছে! ছেলেটার পেছন পেছন চুল্লিঘরের দিকে যায় ভূপতি। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় ভূপতি টের পায়, নামছে নিশীথও। ছায়ার মতো মনে হয় নিশীথকে তার। পোড়া মাংসের গন্ধে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। পাশাপাশি দুটো ট্রেতে রাখা ছাই-এর ওপর জল ঢালছে একজন।

--ওই যে, ওটা আপনাদের। লোকটা বলল। নিশীথ স্থির তাকিয়ে আছে। ভূপতি প্রায় ফিসফিস করে বলল, এই হচ্ছে অলকা! নিশীথ বোধ হয় শুনতে পেল না কথাটা। অল্পবয়স্ক সেই ছেলেটা একতাল কাদা নিয়ে এল কোত্থেকে যেন! লোকটা ট্রের মধ্য থেকে আধপোড়া কী একটা জিনিস তুলে আনছে লম্বা চিমটে দিয়ে, ছেলেটার হাতে ধরা কাদার তালের ভিতরে সেটাকে গুঁজে দিতেই ভূপতির দিকে বাড়িয়ে ধরল সে, এই নিন অস্থি। গঙ্গায় দিয়ে আসতে হবে। লোকটা দেখছিল, বলল, একটা মালসায় বসিয়ে দে।

এও কি আমার করবার কথা ছিল, অলকা! মালসায় বসানো অস্থি নিয়ে ওপরে উঠবার সময় ভূপতি ভাবে। পেছনে ভূতগ্রস্ত নিশীথের পদশব্দ। অনেকক্ষণ পর অশোকের গলা পাওয়া যাচ্ছে বাইরে। কোথাও গিয়েছিল কাজে, এই এল বোধ হয়। ভূপতিকে আসতে দেখে অশোক বলল, ট্যাক্সি এসে গেছে, ভূপতি। আর দেরি করিস না। নিশীথ যাক তোর সঙ্গে। একটু থেমে অশোক বলল, ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে রেখে কাজটা সেরে নিস। নিশীথকে এসপ্ল্যানেডে ছেড়ে দিত পারিস ফেরবার সময়, ওখান থেকে নর্থের ট্যাক্সি পেয়ে যাবে। বাড়িতে নিশ্চয়ই ওর জন্যে ভাবছে—

ট্যাক্সিতে ওঠবার সময় নিশীথের মনে পড়ে, বন্দনা এখনও জেগে। ডাইনিং টেবিলে হাতে মাথা রেখে বসে আছে। কত রাত্রি হল এখন? অশোক ঝুঁকে পড়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে রুট বলে দিচ্ছে। আশ্চর্য, এতক্ষণ পর নিজের ঘরের কথা মনে হল! বড় ক্লান্ত লাগে! শ্মশানের আলোয় ভূপতির বিবর্ণ মুখখানা দেখল নিশীথ। হাতে ধরা কাদার পিণ্ডের ভিতরে অলকা।

মধ্যরাতের ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছোটে ট্যাক্সি। রাস্তা বদল হয়।

সারসার ঘুমন্ত মানুষ পথে, ঠাণ্ডাম হিমে জড়াজড়ি করে আছে। ঝলমলে ল্যান্সডাউন, এজেসি বোস রোড পেছনে পড়ে থাকে। গাড়ি ছোটে রেডরোড ধরে। ডান দিকে অন্ধকার ময়দান। জানালা দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। হঠাৎ এক অদ্ভুত খেলায় পেয়ে বসে ভূপতিকে। জানালার কাচ তুলতে তুলতে ভূপতি ডাকল, নিশীথ!

তার গলায় কী ছিল, নিশীথ চমকে ফিরে তাকায়। উল্টো দিক থেকে একটা গাড়ি আসছিল, হেডলাইটের আলোয় ভূপতি নিশীথের সন্ত্রস্থ চোখ দুটি দেখতে পায়। একটু হেসে ভূপতি বলে, অলকা তো তোরও ছিল, নিশীথ!

নিশীথ প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, কী বলছিস তুই!

ঠাণ্ডা গলায় ভূপতি বলে, ঠিকই তো বলছি। ও আমাকে কত বড় দায়িত্ব দিয়ে চলে গেছে, দ্যাখ! ভাল লাগুক-না-লাগুক ওর ছেলেমেয়েকে আমার মানুষ করতে হবে, একা। এর মধ্যে আমি কোনও মহত্ত্ব দেখছি না।

নিশীথের মনে হল এতকাল যেন সে একটা স্বপ্নের ভিতরে ছিল। এইমাত্র জেগে উঠে সে অপরিচিত একটা মানুষকে দেখছে।

চাপা হিংস্র গলায় ভূপতি বলে, ট্যাক্সি রোকো!

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় ট্যাক্সি ময়দানের মাঝামাঝি। ভয়ার্ত এবং বিপন্ন নিশীথের হাতে অস্থিসুদ্ধ মালসাটা তুলে দিতে দিতে ভূপতি বলল, এই একটা দায়িত্ব অন্তত তুই কর, নিশীথ!

নিশীথ কিছু বলবার আগেই দরজা খুলে নেমে পড়ে ভূপতি। সামনে অন্ধকার ময়দান। জীবনে এই প্রথম তার মনে হয় সে মুক্ত, প্রকৃত স্বাধীন। একটা হিমেল হাওয়া পথ দেখিয়ে ভূপতিকে নিয়ে যেতে থাকে ময়দানের গভীরে, যেখানে কুয়াশা ঘন হয়ে আছে এখন।
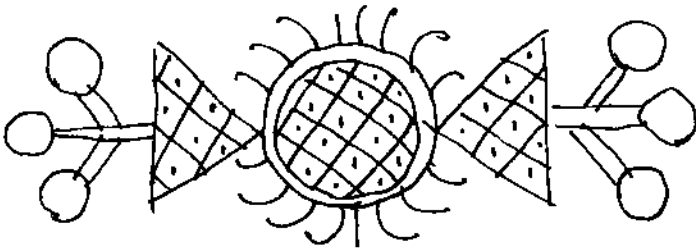
হাতিছাপ ॥ অনিল ঘড়াই

নদী পেরিয়ে এলেই হেলেসাপের মতো রোগা একটা গ্রাম, গ্রাম যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু হয়েছে আমুনি ধানের মাঠ। বুক চিতানো মাঠের শেষে সার সার পাহাড়, পাহাড়ের পাদদেশে শাল-মহুয়া-ঘোড়ানিম আর কুসুম-করণের জঙ্গল। এখন মধ্যদুপুর, মাথার উপর আগুন উগরানো সূর্য, দু-চার পা হাঁটার পর চোখে আঁধার দেখে ভীমাবুড়ো। সূর্যের আলো বিষগুঁড়ার মতো ছড়িয়ে পড়ে চামড়ায়, চড়চড় করে গা গতর –জু' নিতে চায় মদ-মেদো দেহটা -কিন্তু তার লক্ষ্য জটায়ু মোড়লের কোঠাদালান। খরিশ সাপের ফণার মতো চ্যাপটা আল চলে গিয়েছে গাঁ-মুখো, ভীমাবুড়ো সেই আলের উপর দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ছাড়ে ফসফস। এবার তার মোটেও আসার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ঝগড়ু নাছোড়বান্দা। কাকুতি-মিনতি করে বলল, না গেলে চলবে কি কত্তা, তুমায় একবার যে করেই হোক যেতেই হবে। এতদিনের কারবার, হট করে ঝাঁপ ফেললে কী করে চলে? পুরা গাঁ তুমার পথ চেয়ে বসে আচে।

ঝগড়ুর কথাগুলোয় মহুয়ার চেয়েও গাঢ় নেশা, দাদ চুলকে ভীমাবুড়ো উন্মনা। ফি-বছর জটামোড়লের ঘর যাওয়া তটীর একেবারে না-পছন্দ। রাতের অন্ধকারে তার চোখদুটো কটাশের চোখের মতো জ্বলছিল, না থাকতে পেরে উগরে দিল ক্ষোভ জ্বালা, যাচ্ছ যাও, কিন্তু লোক-ঠকানো কাজে আমার সায় নেই। তুমার পাপে মঙ্গলটা মরল, এতেও কি তুমার শেক্ষা হল না!

হোঁচট খেয়ে হাতের লাঠি হড়কে পড়ে ধানখেতে, ভীমাবুড়ো কাঁপতে কাঁপতে মাজা ধাপিয়ে তুলে নেয় বহু কষ্টে। তটীর কথাগুলো আক্রমণপ্রিয় চিলের মতো ঠোকরায়। দশ বছরের মঙ্গল বই বগলদাবা করে ফিরছিল পাঠ শেষ করে, তখন ফুটফুটে বিকেল, মানুষের ব্যস্ত পা ঘরমুখো। সবাই ফিরল কিন্তু ছেলেটার আর ফেরা হল না, পাগলা হাতির শুঁড় তাকে শূন্যে তুলে আছড়ে দিল পাথরে। ছেলেটা 'মা' বলারও সময় পায়নি—তার অনেক আগেই সব শেষ! মরা ছেলেকে বুকে আঁকড়ে তটী পাগল হাতির ডাকের চেয়েও উচ্চস্বরে কাঁদল, সেদিনও ভীমা ধীর-স্থির-মৌন পাহাড়ের চেয়েও প্রতিক্রিয়াহীন। গ্রামবাসীরা বলল, পাথর বটে মানুষটা, এমন মানুষ আমরা বাপের জন্মেও দেখিনি।

বিশ-পঁচিশ বছর আগের ঘটনা এখনো বুকের ভেতর শিঙিমাছের কাঁটা ফুঁকায় হরদম। মঙ্গলের ডিমা উপড়ানো চোখ, থেঁতলে-যাওয়া শরীর ধানমাঠের দিকে তাকিয়ে —হুবহু মনে পড়ে সব ভীমাবুড়োর। ধড়ফড় করে বুক, জল কাটে চোখে। জোরে জোরে পা চালাতে গেলেই টের পায় বুকের কাঁপুনি। গা-হাত পা শুলোয়, যেন কত দিনের রাত!

ফসল ভরতি মাঠ, উপরে বিশাল আকাশ—তবু নিজেকে বড় অসহায় বোধ করে ভীমাবুড়ো। ছেলের শোক ভুলে থাকা পাহাড়মানুষের পক্ষেও অসম্ভব—সে তো রক্ত-

মাংসেব মানুষ। যে হাতি তাব সুখ পা দিযে থেঁতলে দিযেছে—সেই ভযাল-ভীষণ যমবাজ সদশ হাতি নিযে এখন ভীমাবুডোব কাববাব। মঙ্গল নেই, তাব পুঁইডগালেব চেযেও নবম কথাগুলো বুকেব বাগানে কিলবিলিযে বাডে অষ্টপ্রহব। তটী কখনো-বা ছেলেব শোকে গলা ভাসিযে কাঁদে, তাব কান্নাব প্রগাঢতা ফালাফালা কবে সাজানো সুখ, সজনেফুল জ্যোংস্না অথবা অমাবস্যাব নিঝুম নৈঃশব্দ্যতাকে। তাকে বোঝালেও কথা শোনে না, শুধু প্রসাবিত উন্মুক্ত দু-চোখেব তাবায অবিবাম বর্ষণেব ধাবা। অমনভাবে কী দেখে সে হাপুস নযনে? তাব ভাষাহীন চোখে দুঃখেব অণু-কণিকাবা সাঁতাব কাটে পবাজিত মানুষেব সমস্ত চিহ্নগুলো আঁকা থাকে তাব মনেব খোঁদলে।

কাল অনেক বাতেও ঘুম আসেনি তটীব, ভেজা ভাত খাওযা শবীব—অন্যদিন হলে বিছানা ছোঁযামাত্রই দেদাব ঘুমে কাদা-কাদা, কিন্তু বিগত বাতে কী হযেছিল বউটাব দুচোখেব মাঝখানে, এইভাবে বাতেব নদী বযে যেতে যেতে একসময ফোঁপানিব শব্দে চমকে উঠেছিল ভীমাবুডো। হাতদুটো আঁকশিব মতো বাডিযে ঠেলা মেবে সে শুধিযেছিল, কান্‌চিস কেনে বে, কী হল তুব?

—তুমাব দুটা গোডতল ধবি—তুমি আব সেথায যেও না। তটীব ফোঁপানি একসময বূপ নেয লোম চাগানো কান্নায।

কুঁই কুঁই কবে বুডা বলে, বাবুব ডাক, না গিযে কি পাবি?

কথা নয যেন ছোবল মাবে তটী, তুমি মানুষ না পাথব চাট্টান? ছিঃ ছিঃ, তুমাকে! কলিজা ভাঙাব পবেও তুমাব বুকে বিদনা হয না?

ধানেব বঙ ধবলে সাবা বছবেব জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে যায ভীমাবুডো—দুচোখ নেচে ওঠে বাডতি কামাই আব খুশিব আনন্দে। তখন ঠ্যাঙেব উপব ঠ্যাং তুলে সে চেযে থাকে দূবেব মাঠপানে, মঙ্গলেব স্মৃতি ফ্যাকাসে হযে আসে ক্রমশ। পুবুষ্ট ধানগাছ যখন হাওযাব তালে কোমব দুলিযে নৃত্য কবে—তখন চাল্‌সে ধবা চোখ সবহুল পববেব আমেজে বিভোব হযে ওঠে। পুবো মাঠ নয, যেন পুবো গাঁ নাচছে দ্রিমি দ্রিমি মাদলেব তালে। শামুক-জলে ধোযা সাদা ধবধবে চোখেব মতো বুডোব তখন দৃষ্টি, মাদলেব শব্দ বুকেব ভেতবও বাজে—যখন সুবিন্যস্ত ধানখেত ধর্ষিতা হয বিবসনা অসহায নাবীব মতো সাব সাব নেমে আসা উচ্ছৃঙ্খল বুনোহাতিব মদমত্ততায। কাবোব পৌষ মাস, কাবোব সর্বনাশ। তটী তখন শুধোয, কী দেখো অমন কবে?

কী দেখে সে নিজেও জানে না, শুধু দীঘল প্রসাবিত দুচোখেব তাবায গুঁড়ি-গুঁড়ি সুখেব ডিম—যা অপ্রত্যাশিত তা যেন ধবা দিচ্ছে অবলীলায। হাতেব মুঠোয যদি সুখ এসে ধবা দেয—তাকে সে ফিবিযে দেবে কোন সাহসে, ততখানি বুকেব জোব তাব কোনোদিন ছিল না, আজ নেই।

আল শেষ হলেই গাঁযে ঢোকাব পথ। ভীমাবুডো মহুযা গাছেব ছাযায বসে হাড়িযা খায দুবাটি, তাকে ঘিবে উৎসুক মানুষেব ভিড, নানান কথাব জটলা। বুডোব তবু কোনোদিকে মন নেই, তাব অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি সংঘবদ্ধ বনভূমিব দিকে তাকিযে। ওই বনভূমি আজ তাদেব হাতছাডা, ঠিকেদাবেব শানানো টাঙি-কুডুল প্রতিনিযত মানুষেব বিপন্ন অস্তিত্বকে দগ্ধে-দগ্ধে কাটছে। অবণ্য ছেদন নয, ভীমাবুডোব মনে হয মুণ্ডুচ্ছেদন হচ্ছে শান্তিপ্রিয মানুষেব। ঠিকেদাবেব থাবা থেকে চিহডলতা, শালপাতা, তৈলবীজ কোনো কিছুই বাদ যায না। এখন একছটাক কুসুম তেল, পোযাটেক মহুযা শুখা, পাকা তেঁতুল সব কিছু কিনে আনতে হয বাজাব থেকে। জটামোডলেব এদিকে কোনো নজব নেই, ঠিকাদাবেব কুডুল তাব কোনো ক্ষতি কবেনি, ববং কোঠাদালান উঠেছে গাঁযেব

মাঝখানে। সেই হলুদ রঙের বাড়িটায় রোজ সন্ধ্যায় দারুর আসর বসে, চাট লেগে থাকা শালপাতা চেটে খায় গাঁয়ের হা ভাতে ল্যাংটো ছেলেরা। সেই বাবুর জন্য তিন মাইল পথ ঠেঙিয়ে আসা—ভয়ে কিংবা ভক্তিতে একথা ভীমাবুড়ো নিজেও জানে না। তবে সে এটা জানে জটায়ু মোড়লের দারুণ দুর্বলতা আছে তার উপর, কেননা এ অঞ্চলে আর কেউই তার মতো হাতির পায়ের ছাপ হুবহু নকল করে আঁকতে পারে না। নিতান্ত ঝোঁকের মাথায় বাপের কাছ থেকে শেখা বিদ্যেটা আজ এত বছর পরও তার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের দাবাই। এ গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই জানে—ভীমাবুড়ো এলে সরকার থেকে টাকা পাবে তারা। কেননা ভীমাবুড়োর হাতিছাপ ব্লক অফিস কেন ফরেস্ট ডিপার্টের কেউ নকল বলে বুঝতে পারে না।

ঝগড়ু ফটর ফটর মাস্টার, সে চুক্তি সেরে যাওয়ার সময় মাত্র দশটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ভুলে যেও না কত্তা, তুমি না আসা পর্যন্ত বাবু তুমার পথ চেয়ে থাকবে। এবার শুধু হাতিছাপ ধানখেতে আঁকলে হবে না, এবার বিষহরিকে হাতে ধরে সব শেখাতে হবে। বাবুর আদেশ, এর জন্যি অবশ্য তুমাকে বাড়তি টাকা দেওয়া হবে।

টাকা চায় না ভীমাবুড়ো, সে চায় এই অসৎ কাজটা ভুলে যেতে। অথচ বাবুর তা ইচ্ছে নয়। বাবু বলে—এক রাজা গেলে আরেক রাজা আসে। মন্ত্রী গেলে মন্ত্রীও পাওয়া যায়। কিন্তু খুড়া তুমি মরলে এ কাজ কে করবে? তাই বলছিলাম কী—মরার আগে কাউকে হাতে ধরে এ জাদুবিদ্যে শিখিয়ে যাও। পুরা গাঁ তুমার নাম করবে।

—অমন নাম আমার চাই নে। ফুঁসে উঠেছিল ভীমাবুড়ো। তাকে শান্ত করে জটায়ু মোড়ল বলেছিল, চটো কেনে গো, এ কি চটার কথা? বিদ্যা এমনই এক জিনিস—যা দান করলে বাড়ে। তোমার নাম দশের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক—লোকে উঠতে-বসতে তুমার নাম করুক এটা কি তুমি চাও না?

কুবিদ্যা মানুষের কোনো কাজে আসে না।

—কারে তুমি কুবিদ্যা বলচ খুড়া? যে বিদ্যা মানুষের পেটে ভাত দেয়, মানুষের মুখে হাসি ফুটায় -তা কেনে কুবিদ্যা হতে যাবে। জটায়ু মোড়লের যুক্তির কাছে ভীমাবুড়োর ফণাতোলা মাথা কথার জড়ি-বুটিতে বশ মানে।

এখন শুধু পয়সার জন্য হাতির পায়ের ছাপ সে নকল করে বেড়ায় এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে। যখন যেখান থেকে ডাক আসে তখন নিজের ঝুলি-ঝাপ্পা গুছিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে পথে। জমি-পিছু দরদাম হয় প্রথমে, তারপর কিছু অগ্রিম নিয়ে কাজ শুরু। বছর-বছর ধান পাকার সময় হলে হাতির পাল নামে বন-জঙ্গল চিরে নিশ্চুপ শয়তানদের মতো রাতের অন্ধকারে। ধান মাঠের সঙ্গে তাদের গোপন সখ্যতার বুঝি শেষ নেই। হাতি ধান খায়, যত না খায় তারও অধিক নষ্ট করে পালায়। কৃষকের বুক ফাটে সেই ক্ষত-বিক্ষত মাঠের দিকে তাকিয়ে, তাদের শুকনো মলিন নিষ্প্রভ চোখে আশাভঙ্গের চিহ্ন। ভীমাবুড়োকে দেখলে তাদের মরাটে চোখে আশার আলো ঝিকমিকিয়ে ওঠে। ভীমাবুড়ো সেই আশাভঙ্গ সমস্যা-জর্জরিত হাড় হা-ভাতে মানুষগুলোর কাছে দেবদূত তুল্য। হাতি ধান খায়, ফসল তছরূপ করে পালায়, ভেজা ধানখেতে পড়ে থাকে তাদের উচ্ছৃঙ্খল পায়ের ছাপ। ভীমাবুড়োর কাজ হল হাতির পায়ের ছাপ নকল করে জমির বুকে হুবহু এঁকে দেওয়া। এতে খেত-মালিকের প্রভূত সুবিধা। ব্লক অফিস আর বন-বিভাগের লোকজন এসে খতিয়ে দেখে হাতিছাপ। বান-বন্যা, খরা-মড়কে যদি সাহায্য দেয় সরকার তাহলে হাতির তাণ্ডবলীলার চাষী কেন সাহায্য পাবে না! শুরু হয় কাগজপত্রের চালাচালি। বাবুরা উপর অফিসে চিঠি লিখে

পাঠালে সবকাব থেকে অনুদান পায চাষী। যাব খেতে যত বেশি হাতিছাপ, ফায়দা তার তত বেশি।

কানে কানে কথা গিযে পৌঁছয় ঝগড়ুর কানে, উৎফুল্ল হয়ে সে বলে, ভীমাবুড়ো যে আসবে---একথা আমি জানতাম। বাবুর কথাকে অমান্য করবে--এমন মানুষ এ-গাঁযে কটা আচে? চল, বুড়ারে এট্টু এগিযে নিযে আসি। যে আমাদের দেখে—তারে এট্টু-আধটু তোয়াজ করা ভালো।

মহুয়াতলায ভীমাবুড়ো বসেছিল গালে হাত দিয়ে, নেশাচ্ছন্ন চোখ, অবসন্ন হাত-পা, তাকে ঘিরে ছিল ছেলে-বুড়ো অতি উৎসাহী অনেকে। ঝগড়ু ছানাকাটা মেঘের মতো এগিয়ে গেল সামনে, গামছায ঘাম মুছে বলল, কত্তা, এয়েচ—ভালো কথা। চলেক, ঘর পানে চলো। বাবুর সদরে যাওয়াব কথা, শুধু তুমি আসবে বলে এটকে দিয়েছি তাকে।

ওঠার মতো ক্ষমতা ছিল না ভীমাবুড়োর, হাড়িযার নেশায শুধু মাথা নয়, পা টলছিল মাছ ঠোকরানো ফাৎনার মতো। চোখ দুটোয় হলুদ আলোর বুজকুড়ি। কোনোমতে লাঠিতে ভর দিয়ে খাড়া হযে দাঁড়াল সে। জড়ানো স্বরে বলল, আমার হাতটা টুকে ধরো। আমি একলা খাড়া হতে পারিনে। তুমাদের গাঁয়ের হাড়িয়ার ঝাঁঝ কড়া। আমার শির-তালুতে নেশার খিঁচটা গিয়ে লেগেচে।

ঝগড়ুর অভিজ্ঞ চোখ ভীমাবুড়োকেই দেখছিল, এত বয়স হল মানুষটার তবু নেশা করার কোনো কমি নেই। হাত বাড়িযে বুড়োর হাতটা ধরে সে বলল, চলো কত্তা। এ-গাঁয়ে যখন পা দিয়েচ—তখন তুমার সব দায়-দায়িত্ব আমার। আমি থাকতে তুমার কুনো অসুবিধে হবেনি। ভাবো—আমি তুমার ছেলের মতো।

হাঁ-করে আকাশ দেখে ভীমাবুড়ো, ফোকলা মাড়িটার রঙ পচা শিমূলের পাপড়ির মতো, মুখগহ্বর থেকে ছিটকে আসে হাড়িযার উগ্র ঘ্রাণ। ধাপানো মাজা, গোড়ালি ফাটা পা, লাঠির জোরে বুড়ো যুবকের ঢঙে হাঁটার চেষ্টা করে—কিন্তু পারে না, ফলত ব্যর্থতার চিহ্নগুলো ফুটে ওঠে তার ঘর্মাক্ত চোখে-মুখে। এক সময় হাঁপিয়ে উঠে বলে, বয়স হয়েচে, আর পারি নে গো, এবার তুমরা আমাকে রেহাই দাও।

---সেই জন্যি তো অতদূর থেকে ডেকে আনা। ঝগড়ু রগড়ের হাসি হাসে, তুমার দুঃখ-যাতনা সব বুঝি গো। আর বুঝি বলেই আমি বাবুকে বলে তুমারে ঘর তোলার টাকা পাইয়ে দিয়েচিলাম। এত বড অঞ্চলে মাত্র তিনজন লোক ঘর তোলার লুন পেল, তুমি তার মধ্যি একজন। ভাবোদিনি, কত তুমার সৌভাগ্য!

ভীমাবুড়া মাড়ি ফাঁক করে হাসে, হাসতে-হাসতে কঠোর হয়ে যায় তার চোখমুখ, লাঠিটা জোর করে আঁকড়ে ধরে সে অঙ্গার চোখে তাকায়, ধুঁকতে-ধুঁকতে, কাশতে-কাশতে বলে, হ্যাঁ, তা লুন পেয়েছিলাম বটে, তবে, সে টাকার আধা কেড়ে নিল বাবু নিজে। বলল---ভটভটির তেল পুড়েচে, ব্লক-আপিসের বাবুদের খুশ করতে মোণ্ডা-মেঠাই খাওয়াতে হবে—আরো কত কী হ্যাপা। তা বাপু, ফোকটের টাকা ফুটকে গেল। আমার ঘর আর উঠলি না! আমি নিশা করে সে টাকা সব ফটায় দিলাম। মাঝখান থিকে বাধা দিতে এসে মার খেয়ে মরল ঘরের বউটা। বাবুরা যখন ঘর দেখতে আমার দোরে এল—তখন বাবুদের পায়ে পড়ে বউটার কী কান্না! কী বলল—জানো? বলল, বাবু গো, তুমাদের গোডতল ধরি—আমার ঘরের মানুষটার আর 'লুন' পাইয়ে দিও না। লুনের টাকা পেলে সে গলাতক নিশা করে। গলাতক নিশা করে সে আমার বেধড়ক মারে। এই বুড়া বয়সে আমি তার হাতের মার খেয়ে আর বাঁচিনে। সরল স্বীকারোক্তি

চলার গতি শ্লথ করে দেয় ঝগড়ুর, কথা হারিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ভীমাবুড়োর মুখের দিকে। রোদ সরে গিয়ে আকাশ বড় থমথমে, ঠিক যেন ভীমাবুড়োর মুখের মতোন, ঝগড়ু সেই মুখের দিকে তাকিয়ে কথা হাতড়ায়, কিন্তু ব্যর্থ হতেই বিড়ি-ডিবা বের করে একটা বিড়ি বেছে-বুছে এগিয়ে দেয় বুড়োর দিকে, লাও কত্তা, ধরাও, এ তুমার চালানি বিড়ি নয়, একেবারে হাতে বাঁধা। ফি টানে কত্তো ধোঁয়া দেখ—

ধোঁয়ায় চোখ ভরে ওঠে ভীমাবুড়োর, দাপনার জলোমশা তাড়িয়ে স্মৃতির পুকুরে ডুবে যায়, গেল সনে মনের মতো করে হাতিছাপ আঁকলাম কিন্তু ফেরার সময় ট্যাক একেবারে হালকা। তা বাপু, এবার যেন তেমন না হয়। আমি গরিব-গুরবো মানুষ। তুমাদের কাজ-কারবার মিটে গেলে আমারে যেন ফাঁকি দিও না।

—ছিঃ ছিঃ, তাই কী হয় গো? হাজার হোক—

ঝগড়ুর মুখের কথা কেড়ে নেয় ভীমাবুড়ো, ফসফস করে বিড়িতে টান দিয়ে সে বলে, গেল সনের কথা বাদ দাও। এ বছর বাবুরে বলে তুমার ট্যাক আমি ভরে দিব। চলো গো—ঠুকে পা চালিয়ে চলো। সাঁঝের আগে না গেলে বাবু বোতল খুলে বসবে তখন দুনিয়া রসাতলে গেলেও তার কুনো সাড় থাকবে না।

এ বছর আগাগোড়া বর্ষা নেমেছে জমাট বেঁধে, এই আশ্বিনেও মেঘের বুড়ি পেটে জল বেঁধে ঝুলে থাকে পাহাড়ের মাথায়। কখনো দামাল হাওয়ার সুড়সুড়িতে মাছের বীজ ছড়ার মতো গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দেয় শস্যক্ষেত্র, অরণ্যভূমি আর নগ্ন-দীর্ণ বাসস্থান। বৃষ্টির তীব্রতা কমলে ভীমাবুড়ো দূরের জঙ্গলটার দিকে অপলক চেয়ে থাকে, ওই ঘনঘোর জটিল-কুটিল জঙ্গলের ভেতর তার জন্য যেন সুখের খনি লুকানো আছে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় কৃষ্ণকায় হাতির দল পাহাড় কাঁপিয়ে বনভূমি সচকিত করে উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্রের ইজ্জতহানির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে নেমে আসছে সমতল। হাতি ধান খায়, ফসল নষ্ট করে, মানুষের সাজানো স্বপ্ন ভেঙে দেয়--এ বিষয়ে ভীমাবুড়োর কোনো দ্বিমতো বা সংশয় নেই। কিন্তু একটা বিষয় তার বুকের খোঁদলে অষ্টপ্রহর ঝড় তোলে, তাকে চিন্তা-ভাবনায় ক্লিশ করে তোলে, শান্তিতে ঘুমোতে পর্যন্ত দেয় না। হাতি যদি ধান খায় জগেন মুর্মুর ধানখেতে তাহলে লব্বা, কিষ্টো, চরণরা বলে, খুড়া গো আমার খেতেও হাতিছাপ এঁকে দাও। এই মিথ্যে আবদার মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না ভীমাবুড়ো, পশুগুলোর ঘাড়ে মিথ্যা দায় চাপিয়ে কাউকে দু-বিশ টাকা পাইয়ে দিতে তার যত অনীহা।

তটীও এই আবদারকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না, সে যুক্তি দেখিয়ে বলে, মিথ্যের উপর জগৎ বাঁচে না। তুমার এ ফাঁকি একদিন সবাই বুঝবে—সেদিন কিন্তু ওই হাতির মতো তুমাকেও নেকনজরে দেখবে লোকে। তখন তুমি যাবা কুথায়?

ভীমাবুড়ো এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারে না, তখন মনের ভেতরে শুধু চাকড়া-চাকড়া ঘা। জংলি হাতিগুলো যেন বুকের হাড়-পাঁজরা গুঁড়িয়ে দিয়ে সদর্পে চলে যায়। তাদের দীর্ঘনিশ্বাস অভিসম্পাতের মতো বুড়োকে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যায়।

জটায়ু মোড়লের হলুদ রঙের ঘরখানা জাহাজের মতো দেখতে, এই হতদরিদ্র গ্রামে এই বাড়িখানা বুঝি সকলের দীর্ঘশ্বাসের কারণ। যতবার এই বাড়ির উঠনে পা দিয়েছে ভীমাবুড়ো ততবার তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠেছে কোনো এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়। বাবুর দেওয়া মুড়ি চিবাতে-চিবাতে এবারও ভীমাবুড়ো কিছুটা অন্যমনস্ক।

জটামোড়ল কাঁচা-পাকা মোচে তা দিয়ে বলে, আমি জানতাম তুমি আসবে কত্তা। তা এসে ভালোই করেচ। খাও-দাও আরাম করো। যতদিন পারো থাকো। এই গরিবের

পর্ণকুটির তুমার জন্যি চিরকাল খোলা থাকবে। ভীমাবুড়ো সপ্রসন্ন চোখে তাকায়, মোড়লের কথাগুলো তার মনটাকে জলে-দেওয়া সাবুদানার মতো ভিজিয়ে দেয়।

জটামোড়ল টুকটাক খোঁজখবর নিয়ে বলে, হাতি আমাদের শত্রু গো অথচ সেই শত্রুর সাথে আমরা পেরে উঠি না। এবারও পুরা ধান খেয়ে গেল পশ্চিম বাদের জমিনগুলার। কাল সকালে তুমি গিয়ে নিজের চোখে দেখো—দেখলে তুমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি শক্ত ধাঁচের মানুষ বলে এখনো লড়ে যাচ্চি।

ডানে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়ে ভীমাবুড়ো, কোঁত করে মুড়ি গিলে স্বস্তিতে বলে, এবার আমার কাজটা কী বুঝিয়ে বলো দেখি, বাবু?

—কাজ! ফি-বছর যাই করো তাই। তুমি পুরনা মানুষ, তুমাকে আর লোতুন করে কী বলব?

সকাল হবার অনেক আগেই মাঠে যাবার জন্য তৈরি হয় ভীমাবুড়ো। জটামোড়ল দাঁতন কাঠি চিবিয়ে এগিয়ে আসে সামনে; পিক ফেলে বলে, খুড়া কাল তুমাকে এট্টা কথা বলতে ভুলে গিয়েচি। আমার ঘরের রাখাল বিষহরি—সে আচ তুমার সাথে মাঠে যাবে। তুমি তারে হাতিছাপ আঁকা শিখিয়ে দিও।

—এ বিদ্যা আমি কাউরে শিখাব না।

ভীমাবুড়োর শক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জটায়ু মোড়ল বলে, তুমার বয়স হয়েচে, ফট করে মরে গেলে তুমার এ-কাজ কে করবে? তুমারও ছেলেপুলে নেই যে তারে তুমি শিখিয়ে যাবা। বিষহরি আমার ঘরের চাকর, তারে তুমি এ-বিদ্যা দান কর। তোমারে আমি ঠকাব না—বাড়তি কিচু টাকা ধরে দেব।

—টাকা দিয়ে কি সব কেনা যায় বাবু? ভীমাবুড়োর দুচোখে আগুন জ্বলে ওঠে, শ্বাস ছেড়ে সে বলে, নিজের পেটে লাথ মেরে পরের পেট আমি ভরতে পারবনি বাবু। গুরুমারা বিদ্যে যে শিখাব—তেমন মনের মানুষ কুথায়?

বিষহরি ছেলেটি হাবাগোবা, সাত চড়েও রা কাড়ে না—ধানমাঠে তাকে দেখে ভীমাবুড়োর পাথর মনও কাদা-মাটির চেয়ে নরম হয়ে যায়। বুড়ো তাকে আদর করে ডাকে, বিষা, এ বিষা—শুন। বিষহরি এগিয়ে এসে জড়োসড়ো গতরে মুখ নিচু করে দাঁড়ায়। বুড়ো শুকনো ঢোক গিলে বলে, পিয়াস লাগে বেটা, টুকে জল খাওয়াবি?

মুখের কথা শেষ হয় না কুয়ো থেকে জল এনে দেয় বিষহরি, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, এই নাও গো, খাও। আগে তেষ্টা মিটুক, তারপর না হয় কাজ করবা।

ভীমাবুড়ো তাকে শুধোয়, হা-রে বিষা, ঘরে তুর কে কে আচে?

বিষহরি কাচুমাচু মুখে বলে, কেউ নেই গো, আগে সব ছিল—এখন সব ফাঁকা।

—তার মানে?

ফিকফিক করে হাসে ছেলেটা, মুরুব্বি হয়ে সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না? তাহলে খোলসা করেই বলি। বিষহরি ডানে-বাঁয়ে চোরা চোখে তাকায়, কাউকে দেখতে না পেয়ে নির্ভয়ে বলে, আমার বাপ জটামোড়লের দোরে বাগাল খাটত। একদিন বিষমদ খেয়ে সে চোখ উলটে পড়ে থাকল বাবুর গোয়ালঘরে। তারপর, মা এল বাপের জায়গায়। মাকেও দেখেছি দিনভর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কানতে। মা কেন কানত আমি সব জানি। বাবু তারে ফি-রাতে জ্বালাত। একদিন মা-ও গলায় ফাঁস নিয়ে মরল। বাবু বলল, নষ্ট মেয়েছেলেগুলা অমনধারা মরে। মা যে পোয়াতি হয়েছিল—একথা বাবু কাউকেও বলেনি। কিন্তু আমি সব জানি, জেনেও পেটের দায়ে বাবুর দোরে এখনো

বাযালি কবি। কী কবব ? আমাব যে যাওযাব কুনো জাযগা নেই।

—তাহলে এভাবে তুই মববি ?

ভীমাবুডোব প্রশ্নবোধক চোখেব দিকে তাকিযে ঘাবডে যায বিষহবি, কুঁইকুঁই কবে বলে, গাযে আমাব তাগত নেই, খাটতে পাবিনে। যদি জন খাটতে পাবতাম তাহলে কুনদিন বাবুব দুযোব ছেডে অন্য কুথাও চলে যেতাম। মুবুব্বি গো, এখানে থাকতে আমাব মোটে মন কবে না। মা-বাপ আমাবে দুষে। বলে, পালা বিষে, পালা!

ধানখেতে হাতিব পাযেব ছাপ আঙুল গুনতি। পাকাধানেব শিষ হাতি যা না খেযেছে—তাবও বেশি ছিঁডে নিযে গিযেছে মানুষে। শুধু শিষশূন্য ধানগাছগুলো এলোমেলোভাবে ভাঙা। দেখে-শুনে ভীমাবুডোব ব্রহ্মতালুতে বক্ত চডে যায, না থাকতে পেবে শুধোয, এ-খেতেব ধান তো হাতি খাযনি ? হ্যাঁ বে বিষে, এ-ধান কে খেল এমন কবে ?

বিষহবি পাথবেব মতো দাঁডিযে। ভীমাবুডো তাকে ঠেলা মেবে শুধোয। বা কাডচিস্ নে কেনে ? মাঠেব ধান কে খেল—হাতি না মানুষ ? দাঁতে দাঁত চেপে বিষহবি বলে—মানুষ। তুমি আসাব আগে বাবু তাব লোক দিযে ধানগুলো সব ঘবে এনেচে। এখন তুমি ভেজা মাঠে হাতিব পাযেব ছাপ নকল কবে দিলে বাবু তা দেখিযে গাদা-গুচ্ছেব টাকা পাবে। এই জন্যি তো বাবু তুমাকে ডেকে এনেচে।

থবথব কবে হাত কাঁপে ভীমাবুডোব, চোখে ঝাপসা দেখে সে। মানুষেব জাল জালিযাতি কোনোকালেই তাব পছন্দ নয। তবু, দাঁতে দাঁত পিষে উবু হযে সে হাতিছাপ আঁকে। আঁকতে-আঁকতে এক সময ক্লান্ত হযে পডে, কাদামাখা হাতদুটো ভেজা মাটিব শুইযে সে যেন একটু শান্তি পেতে চায।

বিষহবি তখনই তাব সামনে এসে বসে। ঘামে তাব শবীব ভিজছে। তবু, ভাঙা ছাতাটা ধবে আছে, বুডোব মাথায।

—মুবুব্বি, এট্টা কথা শুধাই ? বিষহবিব চোখে জিজ্ঞাসা, তুমি আমাকে হাতিব পা আঁকা শিখায দেবে না ? তুমি না শেখালে বাকি জীবনটা আমি খাবো কী ? আমাব গাযে মোটে জোব নাই, আমি যে জন-মজুব খাটতে পাবি না।

—বাপবে, এ যে পাপ কাজ!

—তাহলে তুমি কবো কেনে ?

—পেটেব দাযে।

—অঃ। বিষহবি ঘাস ছেডে ধানখেতেব উদাস দৃষ্টি মেলে কখনো-বা তাকিযে থাকে দূবেব দিকে, মুখেব হাসি মিলিযে গিযে সে-একটা শুকনো গাছ। তাকে দেখে মাযা হয বুডোব, জডানো স্ববে বলে, বেটা আমাব, তোবে দেখে বুকেব ভেতবটা আমাব ধডফডায। আয, তুই কাচে আয। হ্যাঁ, দেখ—আমি কেমন কবে হাতিব পাযেব ছাপ আঁকি—তা তুই মন দিযে দেখ। প্রথমে গোল পাবা এট্টা দাগ দিবি তর্জনীতে। তাবপব, হাতেব তেলোটা গাযেব জোবে দেবে দিবি কাদা মাটিতে। তাতেও যদি না হয—তাহলে নখেব চিমটায তুলে নে মাটি। তাবপব, ধীবে ধীবে আমি যেমন কবি, তুইও তেমন কব বাপ। পাযেব ছাপ দেখে পা আঁকা কঠিন কুনো কাজ নয। এ কাজে ধৈর্য হল গিযে আসল কথা। তাবপব, হল গিযে চোখ। চোখটাবে এট্টু সডোগডো কব—তাহলে দেখবি আপসেই হাতিব পাযেব ছাপ এঁকে ফেলেচিস।

বিষহবি নিবিষ্ট চোখে দেখে, দুহাতেব দশ আঙুলে কাদা মেখে সে বীতিমতো শিক্ষানবিশ। এইভাবে সাবাদিন কাটে মাঠে-মাঠে। বেলা পডে যায, বিকেলেব আলোয

ধানমাঠ সাজগোছ করা রমণী।

ভীমাবুড়োর একপাশে বসে বিষহরি হাতির পায়ের ছাপ আঁকে। তার অপরিসীম ধৈর্য দেখে খুশি হয় ভীমাবুড়ো। সাগ্রহে কাছে ডেকে বলে, আয় দেখি, কেমন শিখেছিস গুরুমাবা বিদো।

ঘাড় ঝুঁকিয়ে বিষহরি বোকার মতো হাসে।

ভীমাবুড়ো বলে, আঁক, আমার ছিমুতে আঁক; হুবহু আঁকতে পারলে আমি তোকে মেঠাই খাওয়াব আজ?

বিষহরির দশ আঙুলে কাদা, ধান ভুঁইয়ে হাঁটুমুড়ে সে আঁকিবুকি কাটে নিবিষ্ট মনে। ভীমাবুড়ো ঝুঁকে পড়ে দেখে—হাতির পায়ের ছাপ নয়, বিষহরি এঁকেছে মানুষের মস্ত একটা পা। জটামোড়লের পা।
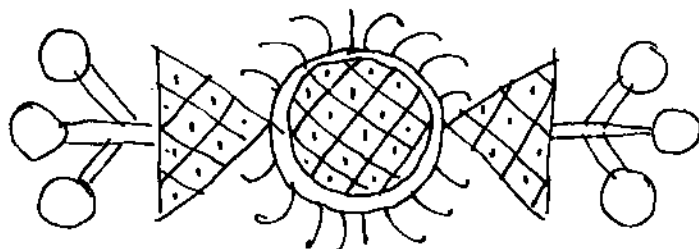
জিন্নত বেগমের বিরহমিলন ॥ আফসার আমেদ

বডকানতলা ফেলে এসে প্রথম, নিযাজ-ছোঁডাব মুদিখানাব বাখাবিব পাটাতন পাব হযে, গোবস্থানে লম্বা হেঁটে, হুই আমলিতলাব ঢিপিতক চোখ গেলে বুঝবে, বডচাচিদেব বাকুল আব-খানিক। ডাইনে জিযাদ শুকটিব চাঁদতাবাব নকশাকাটা পাকা দলিজ। তাব খানিকে মিনাব-উঁচা মসজিদ। একটুস পেছিযে মাঝখানে পাতালতক সেঁধনো পাইপ-গাডা পানিব কল। বডকান পীব, তোব দবগায একটুস গডাগডি দিই। অবে বডকান পীব, তুই জিযন্ত, মুইও জিন্দা, মোব শবীল কেটে গেলে খুনজাবি হয। তব হয? বডকানতলায হেদুযা। শালুক ফুল। বাঁশঝাডে ক্যাঁচোব ক্যাঁচোব, মেমদো ভূতেব আডগাডা। ডুমুবগাছেব নিচে ছবছব মুতেব খোশবাই। ঝাঁপডি বুডি ঝোপেব ভিতবে নযা পোলাকে দুধ দিচ্ছে। পীব তুই চোখ চিবে ব। জিন্নত বেগমেব বুকেব তোবঙ্গে ভূত লেগেছে। মেমদো ভূত। বেতেববেলা খেল দেখাইব।

আসাদ বক্স ভোব হতেই গাছ চাঁছে।

'হই গো বস খাওযাবেক?'

মবদট্টা জোযান-মেইযে দেখেনি নয। গাছ থেকে সুঁউই কবে পডে গেল গেল।

'বসেব সময হইলে ভোব থাকতে গাছেব নিচে খাডা হলে ভাঁড-ভাঁড বস খাবি।'

'এখন কি বস শুকাযে গেছে?'

'গাছেব ভিতবি বস এখন জমতেছে।'

'আ মবণ, সাবাবছব বস দিতে পাবে নাই কেনে?'

'শবীলে জিবেন দিইছে?'

'জিবেন, না ক্ষেমতা নেই?'

'ইও ত একটা জীব মেইযেছেইলেব পাবা।'

'মেইযেছেইলে ত বছব বছব বিযোয গো।'

আহা আসাদ বক্সেব বউটা বুঝি চামডা-জডানো। ডাগব বউ দেখলে চোখ তফাত বাখে না। ই কি দ্যাখাব ছিবি। শবীলে বাতাস লাগতে দেয না। কোন মিনসে পবেব মেইযেব দিকে তাকায না গ। 'আমাব নাম ননীবালা/দুধ দুই আমি দুবেলা/গযলা দিল এই/ চইলতে গেলে পাছা নডে/চলকে পডে দই।' হা হা হিঃ হিঃ বেশবম এমনিতে হই গ। আঁখিব ঠাব শবীলেব ঢেউ কাব না বুকে লাগে। হই উচা থেকে তাকিযে তাকিযে দ্যাখ, মুই চলি, কামে যাই।

পাযে ধুলা লাগে, খোলামকুচি যেন সতীনেব ছাওযাল। ঘোমটা দিযে কে আসছে লয? কাছে আসুক, বুঝুম। 'ও লালুব মা কোথাযকে যাইছ গো।'

'কে ছোটকি লয?'

কেন অন্য মেইযেব পাবা লাগতেছে লয। 'হ্যাঁ গো মুই!'

'কুথাকে চললি?'

'আলমপাড়া। তুই কুথাকে যাবি ?'

'জানুন কত্তে, খালপাড়ে।'

'ভাতার আইল ?'

'না। তোর ?'

'ভাতারের পায়ে কুষ্ঠ হইচে। আইসচে কই ? এই চাইর মাস গেইছে।'

'আহা আহা!'

'অত আহা কত্তে হবেনি।'

'হ্যালা হাটে-ঘাটে বেইরেচিস, মাথায় কাপড় টান না, ঘরের মাগ!'

'ইটা বিয়ের শাড়ি কিনা, সিল্কের, মাথায় থাকচেনি।'

গোরে দেয়ার আগে কাপড়ে মোড়া লাশ যেন, লালুর মা চলে গেল টরটর। এই মেয়েগুলি খালি-খালি ঘোমটা আছে কিনা দেখে। ঘোমটায় খ্যামটার নাচ হতে পারে, জানে নাই। কী জানে ? সব কিছু জানে, বুঝতে পারে, কইতে পারে না। বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না। মরদগুলান নদীর পথ পেইরে চলে যায় শহরে। শহরে গিয়া মাগেদের মুখ ভুলে যায়। নদী দিয়া হাট, হাট পেরিয়ে বাস, বাস হতে ইস্টিশান, তারপরেতে ঝকাঝক রেলগাড়ি। শহর। উঁচা উঁচা মোকাম, গাড়িঘোড়া লোকজন। ফরসা ফরসা মেয়ে। হাতে ঘড়ি, পায়ে উঁচা জুতা। ভাতারগুলার তাক লেগে গেছে। মুখে লাথি তোদের। ফি-শনিবার শনিবার যত মরদ আসে, তোরা আসিস না কেনে। তোদের মন ভোলায় কোন্ সতীন, তারে পাইলে নুঁচে খুঁচে মারুম। শহর শহর জানের বালাই, তুই রূপসী সর্বনাশী, মরদগুলানকে আঁচলে বাঁধিস। রেতেরবেলা কার মাগ কে নিদ যায় না তার হিসেব রাখিস কই। ভাতার ত সব কাগমারা, পয়সা কামাস, উড়াস, পিছু ফিরে তাকায় না। হা সন্ধে হা সন্ধে হা রাত্তির হা রাত্তির, বোঝা বুকে লিয়ে কাটাই।

মামি গো মামি।

মামা কুথা ?

মামা গেইছে কলকাতা।

থাকিস কি করে ?

থাকি থাকি চমকে উঠি

বালিশ বগলে।

'বালিশ বগলে'। হেই কি রকম সুন্দর কথা হল দেখ ত। মনের কথা। মনরে তুই হলদে পাখি, বুকের ঘরে আস্তে ডাকিস, ডালে বসে জোরে। 'বউ কথা কও' 'খুকির খোকা হোক' এইসব বুকের যন্ত্রণা গো। বড়কান পীর তর বুকেতে নেচে যাব, তুই জিন্দা মুই জিন্দা—তুই চোখ চিরে র। রাতেরবেলা মেমদোভূতের নাচন নাচুম।

নিয়াজ ছোঁড়ার মুদিখানা। পাটাতন। গলা টিপলে দুধ বেরবে ছোঁড়াগুলা তাকায় দেখ। বিড়িকলাই গোঁফ ধরেচে তাতেও তা। আড্ডা থেকে বেরিয়ে মা-মাসিকে দেখিস মাগের পারা। জিন্নত বেগম রাস্তায় বেরবে, ঘুরবে, আজাদিসে পা চালাবে, কারো ধার ধারে না। কারো খাই না কারো পরি না কারো চোখ-রাঙানির ধাব ধারি না। গতর খাটাই, খাই। হুই প্যাইপ-গাড়া কলে জিয়াদ শুকটি দাঁতন করে। চেক লুঙ্গি, কুমড়ো পারা ভুঁড়ি, কুচকুচে কাঁচা-পাকা দাড়ি, বুকের লোমে খেতের ঠাসবুনুনি। কুল্লি করে, দাঁতে পানের ছোপ, গলার ভিতরে পানি নিয়ে পাঁঠার মত আওযাজ করে। দলিজঘরে চাঁদতারা, পিছে কোঠাবাড়ি। চিলে ছাদ। ছাদের দড়িতে চার বিবির শাড়ি

শুকোয। ঝবোকা দিযে তুই দেখা যায বিবিবা আবশিতে সিঙাব কবে। গবুব গাড়ি চাবটে-পাঁচটা। নদীতে হাজাবমনি নৌকো আবো পাঁচটা। খেত গোনাগাঁথা নাই। খেতভবা ধান, আলু, পিঁযাজ, কুমড়ো, পটল, পালং, মুলো, কদু-বেগুন ধবে, গবম কালে ফুটি, তবমুজ, আনাজ ফসল প্রথমে গবুব গাড়ি পবে নৌকোতে, যায হাটেব পানে। জিযাদ শুকটি থুতু দিযে টাকা গোনে। শেবেব পানা তাকায। বাজেব পাবা হাঁকেব বহব। বড় বিবি আফসন চাচি খোঁড়া। মেজগিন্নি সিঁড়ি দিযা ঠেলে দিযেছিল, পা দুটি তাব শুকিযে গেছে। আবশি নিযে এখনো সে সিঙাব কবে। বড়লোকেব বিটি তো চাবভবি হাব গলায থাকে। মেজচাচি খাণ্ডাস ঢেব। বড়গিন্নিব তবকাবিতে লঙ্কাগুঁড়ো নুন ঠেসে দেয। বড়গিন্নি একা-একা সতীন ব্যাটাব মাথা খায। সেজগিন্নি শহুবে মেযে, ফুবুত ফুবুত বাড়িব বাইবে বেবোয। হাতেব কব্জিতে ঘড়ি আঁটে, চশমা আঁটে। ঘবেব ভিতবে কলেব গান নিযে নাচন-কোঁদন। জিযাদ শুকটিব নসিব ভাল। চৌথাবিবি চালওযালি। হাটেব মধ্যে চাচাব বুকে চোখেব টানে বান মেবেছে। এখন নাক উঁচা তাব। এটা খায না, সিটা খায না , গাড়োযান চাচাদেব সাথে মশকবা কবে।

'কে যায, কবিমবক্সেব মাগ না ?'

'হাঁ গ চাচা।'

'ধান-চালেব কাম কববি ?'

'হ গ।'

'আজ থিকা ?'

'আজ লয কাল ঝুঝকোবেলা থিকা, কী দিবা ?'

'চাল-কলাই-গেঁহু।'

'আমাবে আবো দিতে হইব।'

'আব কী লিবা ?'

'খুশ হইযে যা দিবা।'

জিযাদ শুকটি বুঝুম-বুঝুম না-বুঝুম এমনতব মুখেব ভাব। কী বুঝেছিস ? বুঝিস নাই ? খেলাড়ি খেল দেখাবে, দেখিস নাই তুই। খেল দেখামু। তব সামনে দাঁড়ালে খানিক ভাল হত, চাববিবি এক হত। ঝবোকা দিযে তাকিযে তাকিযে গাল দিত। কাজ আছে ঢেব। পিছু থিকা চলন দ্যাখ, পাছা-ঝাঁকানি দই উছলাইছে। পিছু ফিবুম, দেখুম জিযাদ শুকটি হ্যাংলা হইযে তাকায ক্যামন। ঢেউ খেইলে বুক উছলাইছে, হাসুম নাকি। চোখেব বাহাব দেখেইছে ত, না থাক। হাসি পাইছে, বুক হইছে ধকাস ধকাস।

মসজিদেব পাকা শানে মুসুল্লি কোবান পড়চে। ঘোমটা দিমু ? না দিমু। চলন কবি বাঁকাচোবা। হেই আল্লাব খাস বান্দা, আল্লাব কালাম হইতে মুখ তুলিস কেনে, কী দেখতেচিস ? খেল দেখামু। গহিন বাতে বাতেব পাখি ডাকে যখন।

আমলিগাছেব ঢিপি পেবিযে বড়চাচিদেব বাকুল। আঁতুড়ঘব। হেই মাগিবা ভিড় লাগিযে হুমড়ি খেযে পড়ছে। উহুঁগ আইবুড়ো মাগিবাও দেখবি নাকি ? আহা বড় চাচিব বড় বউ কী কষ্ট পাইতেছে। বেঁকে বেঁকে যায, নিঃশ্বেস উগবোতে পাবছে না গ। আসমানিব মা বড় বউ কুলশনেব পিঠে কিল ছুঁড়ছে। 'বাইত থিকে ব্যথা খাইচিস মাগি, ব্যাটা বিযোবি নাকি লা।' পা দিযা ক্যাতাক ক্যাতাক লাথি মাবে।

কুলশন নীল হযে যায। 'ও চাচি তব পাযে ধবি গ, লাত মাবিস নাই, তব সাতদিনেব ট্যানা দাঁতে কইবা টানুম, মোকে মেইবে ফেলিস নাই।'

'আহা তুলোমুখি ফুলোমুখি, আব কাবোব ছেইলে হয নাই, আট ছেইলে পেটে

ধইরেচি, বাইর কইরেচি। কষ্ট ত হইবেক। ব্যথা খা লো মাগি।'

কুলশন ব্যথা খাচ্ছে। নিঃশ্বাস বুকের ঘরে চেপে চেপে রাখছে। আসমানির মা পিঠে-কোমরে লাথি দেয়। আহা, মরে যাবে নাকি সই কুলশন! মরে যাবে নয়, মেরে ফেলছে। দম আটকা রাখছে। দম উগরিয়ে কঁকিয়ে ওঠে, 'ওগো হাসিনার বাপ, তুমি দেড়মাস ঘরে আইসনি গো, জলদি এইস, মোর মরা মুখ দেখবা গো ও ও ও...ট্যাকাও পাঠাও নাই, পেটেও দানা নাই, ব্যথা খাইতে-খাইতে মইরে যাইছি, জু চেঁদিয়ে যাযছে, মোর মরা মুখ দেইখতে শহর হইতে গাড়ি ধইরা নৌকো করে এসো গো ও ও ও...'

কি দেখ, কুলশন কিছু খায় নাই, এক পরচালার ঘর কেউ খবর রাখে নাই--'হ্যাঁলা ও চাচি বড়লোকের বেটি, কুলশন কিছু খায় নাই জানস নাই।'

'জানুম কি কইর‍্যা', গলা সরু করে সিটি দেযার মত, 'আসমানি-ইইই...।' আইবুড়ো মেয়ে দরজার সামনেতক দাঁড়িয়ে, 'এই তো মুই, কী বলবি বল না।'

'ওলো মাগি? তুই হিতা? পেটে ছেইলে ধইরতে হয় কী ভাবে শিখিস আগে, ত ফেলতে হয় কী কইর‍্যা দেখিস। এক লোচ্চা ডেকে তোর বিয়া দিযা দিমু।'

'কী কইবে ত, খালি বকম বকম।'

'তলানি বাসিভাত চাট্টি আছে, জামে কইরে আমানি-দুরানি কইরে পেঁজ দিযে আন লো, পুযাতি খালাস হতে পারতেচেনি। ডাবাপেটি পাণ্ডুলি পুযাতি কুখাকারের।'

আসমানির মা খাণ্ডাস। 'কেন অমন কর গা আসমানির মা।'

'সাধে করি, ছেইলে ধইরে কেশ পেকে গেল। এ-রকম পুয়াতি আর দেখি নাই। পেটে ছেইলে ধইবল আর ব্যথা খায়তে জানল নাই, কয় না 'ডাতারের নাম জানিনি ওহে বলে ডাকি।' ডাতার এলে তোকে তাক কেটে তুলে রাখবে।'

কুলশন উদোম-পাদাম হযে ঠেশ দিযে পা ছড়িয়ে মাথায় হাত ঠেকিযে বসে রয়েছে। মাথার চুল ফুরফুতি। তেল নাই, আগুন দিলে বাবুদপানা পুড়ে যাবে। কদু-কদু মাইদুটো নিচের পানে লম্বা হযে ঢলে রয়েছে। কুলশনকে নিদ লাগে, ঝিমোয, ঝিমোয। --আহা অহোরাত জেইগে-জেইগে যন্ত্রণা, ব্যথা খাযতে-খাযতে আধমরা হইযে গেইছে গো বউটা।

'ওলো সই কুলশন, কষ্ট পাইতেচিস?'

'কে জিন্নত, এইচিস?'

'তোর কষ্ট হইচে, না-এযে পারি।'

'তোর ডাতার আসে নাই?'

'না আসে নাই, কষ্ট পাইতেচিস চুপ র।'

'হাসিনার বাপ আইলে নুচে খুঁচে মারুম।'

'দেখুম, কেমন মারিস।'

আসমানি জামে করে আমানি-দুরানি নিযে আসে ত দুটিখানি। আসমানির মা আরো ছানছে। কুলশনের গালে গ্রাস তুলে দেয, পেঁযাজ ছাড়িয়ে দেয।--আহা আসমানির মার পরান আছে বলতে হবেক। পড়শির পেটে দানা না থাকলে পরান কাঁদে। মেইয়েছেইলের জন্যি পরান কাঁদে মেইয়েছেইলের এমন পারা! —আসমানির মা গরাস তুলে দিচ্ছে। তলানি আমানি-দুরানি পিইযে দেয়। কুলশন সই-এর মুখখান একটু ভাল দেখাল। ফের যন্ত্রণায় কুঁকড়িয়ে যাচ্ছে। ফের আসমানির মা আপন মূর্তি ধরে, 'আলগুনির বাঁশ ধইরে দম চেইপে ব্যথা খা'—

আসমানির মা কুলশন সইযের চুলের রাশি মুখের ভিতর পুরে দিযে পিঠে চাপ

দিচ্ছে। কুলশন দম আটকে অনেকক্ষণ থেকে শ্বাস ফেলতে গিয়ে পারছে না। মুখের ভিতরে চুল এককাঁড়ি, চুল সরিয়ে খানিক বাদে শ্বাস ফেললে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করে উঠছে।

চাঁচি গো তুই মোর গলা টিইপা ধর, হাসিনার বাপ এইসে দেখুক মোর মরা লাশ। আর পারি নাই, মইরা যাইবা গো ও ও ও...'

'আহা ঢঙ ছিনালি, লে ফের ব্যথা খা 'আল্লা আল্লা কইরো চালের বাতা ধইরো/ দুইজনাতে পিরিত কইরা একলা কেনে মইরো।'—'

কুলশন ব্যথা খাচ্ছে দাঁত কিড়মিড় করে।

'কি লো অ্যাত কষ্ট কইরতেচিস ব্যাটা বিয়োবি ত লা?'

কুলশনের শাউড়ি বড়চাচি মুখ বেঁকিয়ে বিচ্ছিরি কথা বলে ফেলল, 'আহা বেটা দিবে? দুইটা বেটি পর পর, সেই তরে বড়খোকা অর মুয়ে লাথ দিতেও আসে নাই।'

কুলশন বিড়বিড় করে ওঠে, 'মোরে সক্কলে মাইরা ফ্যাল, মুই বাঁচুম নাই...' দেয়ালে মাথা টিপিটিপ করে ঠুকছে কুলশন।

'হেই কি করচিস সই, মাথা ঠুকলে কষ্টই পাবি ফের, মরবি নাই।'

আসমানির মা কুলশনের শাউড়িকে মুখ ঝামটা দিল, 'যা লো এখেন থিকে বুড়ি মাগি, তোর ভাতারও তরে ছাইড়া থাকত, ইনিদ্-বিনিদ্ কত কাঁদতিস মনে নাই, এই গাঁয়ের মরদরা সক্কলেই শহরে গেলে ভেড়া হইয়া যায়। ই কুলশনের নসিব লয়, সারে গাঁ কো নসিব। শহরে মন ভুলাইতে সবকিছু আছে, অ্যাত দূর পথে মরদগুলা মাসে-মাসে হাপ্তায়-হাপ্তায় আইলে যে গ্যাঁজায় টান পইড়বে গা। যা বুড়ি মাগি -'

আসমানির মা কী বলছে গো। 'সারে গাঁ কো নসিব।' বর্ষার মাসে নদী কানায় কানায় ফুঁসে ওঠে। সেই দূর মুলুক হাট থেকে নৌকো আর আসে না। তখন না হয় মরদরা আসতে পারে নাই বলে না আসতে পারে। যখন নদী শান্ত হয়ে যায়, বন-বাদাড়ে কাশফুল ছেয়ে যায়, শীত আসে, শীত ফুরিয়ে উঁচু গাছে কোকিল ডাকে তখন ত ঘন ঘন পাউড়ি ফেলতে পারে- -পরদেশি বঁধুয়া ভুইলা যায়।—আসে দু-একবার। কুলশনবিবিরা বছর-বিয়োনি, তাদের পেটে ছেলে দিয়ে চলে যায়। চিঠি দেয় না। চিঠি লিখতে জানে নাই। মাস গেলে বিশ-পঁচিশ টাকা পাঠায়। মেয়ে ছেলে ত, গতর আছে, খেত আছে, জিয়াদ শুকটির দালানকোঠা আছে, খালবিল আছে। গাঁয়ে হাজা আছে, শুকো আছে, তখন শুধু অন্ন নাই। কী করব? গতর শুকিয়ে যাবে। আইরুড পাইর‍্যাড-শাক-শাপলা কচু-ঘেঁচু খেয়ে পরান তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। –ভাতারগুলান আইলে চুমু দিবা কোনখানে? গোরে।

'ছেইলের দেখা পাওয়া গেইছে গো।'

কুলশনের পরান ধুকুস-ধুকুস করছে। একি গো হায় গো, কুলশন সই মরে যাবে না ত? ছেলের মাথা বেরিয়েছে। —হায় লো একি লো। পিঠে দইলে দিই একটুস।

আসমানির মা সাবধান করে দিল, 'কেউ কুনু কথা কইবি না, ছেইলে কেমন কইবে হইছে কইলে ছেইলে-পুয়াতি দুই মইরে যায়।'

আঁতুড় ঘরে গুনগুনানি থেমে গেল। সকলে আরামে, কুলশন সই একা কষ্ট পাচ্ছে। মনে মনে বললে কিচ্ছু হয় না। -পাদক ছেইলে হইতেছে গো পাদক ছেইলে। বাঁচলে পয়মন্তর ছেলে হয়। আহা উ-হু, কুলশনের কী কষ্ট হইতেছে।

আসমানির মা থেমে গেছে, 'ব্যথা খা লো মাগি। জানের দুশমনটারে ফেইলা দে। তাইলে জানও যাইবে দুশমনও যাইবে।

'পারুম নাই গো চাচি মুই মইরা যাইতেচি, হাসিনার বাপ গো তুই সুখে থাক, মুই মইরা যাইব মইরা যাইব...'

ঝুঁটি ধইরা আসমানির মা দেয়ালে ঠুকে দিল 'ব্যথা খা। জানের শত্তুরকে পেটে ধইরতে ভাতারের সোহাগ খাইচিস কেমন মনে নাই ?—'ভাতার বলে ত আয়। টিপি টিপি ধায়'।'

কুলশন শুয়ে পড়ছে, বেঁকে যন্ত্রণায় শিক হচ্ছে। —আহা গো মোর কোলে মাথা দিইছে। একখালে দুইজনা মাছ ছাকনি দিযাছি। দুজনা চুল বাঁইধা লৌকো লিয়া বাইচড়ি খেইলেচি। বিয়ার সময় অকে মুই মোকে কুলশন সিঙরাইয়াছে। সইয়ের জানের কষ্ট মোরও কষ্ট, জিন্নত বেগমের কষ্ট।

'কঁয়া-কঁয়া-কঁয়া আ-আ..., নয়া পোলা আসমানির মার হাতে। আসমানির মা কচির গালে খামচে দিল, 'মায়ের জান লিতে আইছিলি।'

কুলশনের শাউড়ি বলে, 'হ্যালা মেইয়েছেইলের পারা কাঁদতেচে লয় ?'

'হ্যাঁ গো তুমার ল্যতিন হইচে ফের।'

'ফাটা-কপালির কি আর হইব।'

কুলশন কাঁদে।

ছেলে পুছাতে থাকে আসমানিব মা।

'কঁয়া কঁয়া কঁয়া আ আ আ...'

'আলো মধু দি না, কখন থিকে চিল্লাচ্ছে।'

কুলশনের শাউড়ি মুখ বেঁকিয়ে, 'নুন দে মুখে। মধু দিইছে ?'

'কী বলি লো, দু-পয়সাব মধুও কিনে রাখিস নাই নাকি ?'

'না গ চাচি, আইজ দুইটা মাস কুনু ট্যাকা পাঠায় নাই।'

কুলশন ঘুমিয়ে পড়ছে।

'এই বুড়ি মাগি, জলদি কইয়া তোর পুতার জন্যি মধু লিয়ায়।'

'কী বললি আসমানির মা ?'

'তোর পুত্যা হইচে।'

'দেখি দেখি, ঠ্যাং উলটা।'

'পয়সা লাগবা। এই দ্যাখ, তোর ছেইলের ঘরে পেরথম ব্যাটাছেইলে আইল। মধু আনগা বুড়ি।'

বুড়ি আঁতুড়ঘর ছেড়ে চলে গেল পড়ি-মরি।

—কুলশন সই তোর ব্যাটা হইল লো। কুলশন ছেলে খালাস করে নিদ যায়। —আহা অহোরাত নিদঘুম নাই চোখে। হোক। তুইলা ফেলি।

'ওলো সই নিদ যাস নাই। ছেইলেকে দেখ না।'

কুলশন ঘুমে ডুবু-ডুবু। জড়িয়ে-মড়িয়ে কয়, 'কি দেখুম।'

'আলো তোর ব্যাটা হইচে।'

'অ্যাঁ! কী বললি ? কুলশন উঠে পড়ল। মুখ দেখল বিশ্বেস হয় নাই। ঠ্যাং চিরে দেখল। আহা কুলশনের চোখে কী চিকচিকিনি খেলছে। নিদের তরে জান ছিঁড়াছিঁড়ি করছে। ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

কুলশন ঘুমিয়ে রইল। ফ্যারাকাঠি দিয়ে কচির নাড়ী কাটা হল, তেল মাখানো হল। কুলায় করে ধূপ দিচ্ছে এখন।

কুলশন ঘুম থেকে উঠছে। খুনজারি হয়ে গেছে। ভেসে গেছে আঁতুড়ঘর। 'ও

সই উঠে দাঁড়া, সাফা কাপড়টা পরিয়ে দিই, আয়। শরীরটা ধুয়ে লে আগে।'

কাপড় পরিয়ে দি।

'জিন্নত তুই আইজ থাইকা যা।'

'রয়ে গেনু।'

'মাছ খাইতে শখ যায়ছে, খাল থিকে ছাকনি দিয়ে ধরে আন সই।'

'বাব্ বা, পেট থিকে ছেইলে খসতেই খাই-খাই।'

জিয়াদ শুকটির ছুই দূর-অবদি আলুখেত। দূরে ভুটভুটি চালিয়ে পানি দিচ্ছে খেতে। নালা ধরে পানি গড়িয়ে যায়। কাপড় তুলে খালে ছাকনি দিলে কে দেখবে। দেখলে, ফরসা জাং দেখবে আর কী দেখবে। জিন্নতের শরীর। পানির ভিতর ডুবে। ছুই গাংতাড়া মাছ ভাসছে না? লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে খাব। মাথার উপর চিল উড়ছে। তারুই-তারুই। মাছরাঙা, তোরেও জিবে নুন এল, পানির ওপরে ঝটপটি করিস।

পানির ওপর ছায়া পড়ল না। কোন্ মরদ! আহা তাইকা তাইকা গিলতিচিস! জোয়ান চোখ। জিন্নত বেগমের শরীল দেখতেচিস। খালি গা, কুচকুচে শরীল। কোন গাঁয়ে ঘর রে।

'এই আঁটকুড়ির ব্যাটা তাইকে আছিস কেনে, অমন পারা তোর মা-বুনের দিকে তাইকে থাকবি।'

কথা বলে নাই কেনে? শুনতে পায় নাই? মোরও শরীলে ভূত লাচছে। এই দ্যাখ তবে। জিন্নত বেগমের শরীল। কথা বলে নাই, কেমন দাঁয়ড়ে দাঁয়ড়ে হাসতেচে দ্যাখ্। বুকের পানে তাইকা রইছে। আহা, কী বোকা বোকা। হাসতেছে। অন্য মরদ হইলে হাত ধইরে টানতে-টানতে কাশমলা বনে লিয়ে যেত।—সন্ধে হয়েছে, গোঙা নয় ত? ইশারা করে দেখাই, 'কথা কইতে পাবে না?' মাথা নেড়ে না করছে। হেই কি মানুষ, কথা কইতে পারে না? শুনতেও পায় নাই? জিয়াদ শুকটির খেতে কাম করছে। জিয়াদ শুকটির আমদানি গ। পেটভাতের মুনিশ। আহ্ কী ঢ্যাঙা, গড়ন কি পাঠান-পাঠান। ইশারা করি—'মোরে ভাল লেগেছে লয়?' মাথা নাড়ছে দেখ্। হায় খোদা, এই তাগড়া জোয়ান লোকটা শুনতে পায় না, মুখে কইতেও পারে না? চোখ ওর মানুষের পানাই ছটফট করছে। ওমা তাকিয়ে আছে। ভয় করে নাই, লজ্জা করে। ওকে কোদাল মারবার ভঙ্গি দেখিয়ে ইশারা করে কাজে যেতে বলি, 'হেই কামে যা, অ্যাঁ?'

গোঙাটা বুঝল। খালের পাড় থেকে নেমে গেল।

দুই

ভোর হল। কাক ডাকল। কুলশনের বিছানায় আজ শুয়েছিলাম। কুলশন সই ঘুমাচ্ছে। কচিটা রাত থেকেই কাঁদছে। 'ও লো সই ছেইলের মুয়ে দুধ দি না লো?' কুলশন জেগে উঠে ছেলের মুখে মাই পুরে দেয়। এও অমন চিজ, কান্না থেমে যায়।

'যাই লো সই।'

'কুথাকে যাস?'

'কামে যাই, জিয়াদ শুকটির বাড়িতে।'

'ফের আসিস।'

'আইসবখন।'

ভোর হতেই ধানের কাজ, ধান সেদ্ধ করছি। কেউ ওঠে নাই। চারবিবি শুয়ে রয়েছে। বড়লোকের বিটিদের-মাগদের কী ঘুম! পুরানো কাজের মেয়ে ময়রম গোলা খুলে দিচ্ছে। প্রথম ভাপানো হল। পরে, চৌবাচ্চার আগের ভাপানো ধান সিদ্ধ হচ্ছে। বড়-বড় মাটির হাঁড়ি তুলে ফেলা। পরে সেগুলি দু-কুড়ি সিঁড়ি ভেঙে ছাতে মেলতে হচ্ছে। —সেই গোঙা খড় কুঁচোতেছে লয়? ইশারা করি, 'হেই এদিকে আও না গো।'

কপনি-তোলা ফুলো-ফুলো পাছা দাপাতে-দাপাতে চুলোর পানে আসে। চুলোর কাঠ তুলে ট্যাক থেকে বিড়ি বার করে ধরাল গোঙা। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে। না জিন্নতকে দেখছে। ইশারা করি 'হেই জানুন এনে দাও।'

লম্বা-লম্বা পা ফেলে-ফেলে জানুন আনতে চলে গেল। ভারি ভাল রে গোঙাটা। টিপি-টিপি পা ফেলে এক আঁকড় জানুন আনে। জানুন রেখে গায়ের কাছে উবু হয়ে বসে বিড়ি টানছে। —সব মরদের দিকে খারাপ কইরা তাকানো যায় গো, এর দিকে তাকানো মুশকিল হইতেচে। চোখ দিয়া কি গিলতিচিস? জানতে চাইচিস লয় মোর মরদ আছে কি না? বে হইল মোর আইজ ছয়মাস। দুইটা মাস মরদটা ফি-শনিবার আইসত। এখন আর আসে নাই, চাইর মাস হইল। তরে কী বলুম, কী কমু? শুনতে পাস নাই, কযতেও পারিস নাই। অহ বুঝতে পারিস, লয়? লম্বা হাত তুলে গোঙাটা উত্তর পানে দেখায়। 'উ উ উ...' করছে। —তুই বুঝিছি তর ঘর হইদিকে। উত্তরে গাঁয়ে। আমারে দেখাইয়া আর বউ উত্তর পানে আছে কি না জানি, 'তুই তর বউ আছে, ঘরকে, আমার পাবা মেইয়েমানুষ।'

গোঁ গোঁ করে মাথা নেড়ে গর্দান ব্যথা করে ফেলল। গোঙা লোক। —আহারে তর বউ নাই।

গোঙাটা তার বুকে হাত দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দূরের পানে হাত তুলে বুঝায় মোর সোয়ামি আছে কি না।

মাথা হেলিয়ে বলি, 'আছে'।

ওর দিকে তাকাই নাই দেখে খানিক বাদে চলে গেল।—অহ বুঝি তর রাগ হইল। মোর মরদ আছে বইলে পরানে দাগা পেলি নয়? আঃ মরণ।

জিয়াদ শুকটি কলকাতার সেজবিবির ঘর থেকে উঠে এল। মাজন নিয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে দলিজের পানে যায়। সেজবিবি গোসলখানায় ঝপড়-ঝপড় গা ধোয়। জিয়াদ শুকটি ওর ঘরে আজ রাত কাটিয়েছে। মাগি সতীনদের শুনিয়ে শুনিয়ে বালতি ঝাঁকিয়ে, পানি ছরছর করে ফেলে গা ধুচ্ছে। আমাকে শুনাচ্ছে নাকি? ফিটফাট কাপড় পরে গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এসে সিধে রান্নাঘর পানে গেল। মরিয়ম বিবি আর দুইটা কাজের মেয়ে জিয়াদ গুষ্টির নাস্তা বানাচ্ছে ভোর থেকে। শহুরে মাগি রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নাস্তা খাচ্ছে।

ছোট বউ চালওয়ালি মেয়ে মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকছে। হুই সিধা এখান থেকে দেখা যায় স্পষ্ট। শহুরে মাগিটার দেমাক দেখ। একেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিস, তায় দরজা আগলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচিস। ছোট বউ ধাক্কা মারল। আওয়াজ করে গা ধুচ্ছিলি, লয়? সতীন মোরও আছে গো হুই শহরে। তারা মরদকে ভুলিয়ে তুক করে, গাঁয়ের পানে আসতে দেয় না। মর শহুরে মাগি। হিল জুতা পরে ঢং দেখিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস। ছোট বউ সেজ বউ চুল ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। ছোটর সঙ্গে সেজ পারে নাই। দেয়ালে মাথা ঠুকে দিচ্ছে। চেপে রেখেছে। সেজ বউ ইংলিশ কাঁদছে, চেপে ধরে রেখেছে ছোটকি।

তুই লো, বড গিন্নির বড়া ব্যাটা কান্না শুইনে ছুটে আসছে। ছোটকিকে সরিয়ে দিল। চোখে হাত ঘসছে। বুকের ঢৌল ধকধকাচ্ছে। জিয়াদের বড়া লেড়কা তার সেজ মায়ের হাত ধরে সোজা দাঁড় করাল। চোখ হতে হাত সরিয়ে দিল। ছোটকি নাস্তা নিয়ে দোতলা-ঘরে চলে গেল। সেজ বউ কাঁদছে। জোয়ান লেড়কাটা চোখের পানি নিজ হাত দিয়া মুছায়ে দিইছে। হেই গো, কাজে মেইয়া দুইটা ঘাটে গেইছে, মযরম বুড়ির চোখে ছানি। এখান থিক্কা সিধা দেখতেচি...মাকে ছেইলে বুঝি চুমা খায় গ। তওবা তওবা, বুকে বুক মিশায়ে দাঁযড়ে গ। তওবা তওবা, কি বিচ্ছিরি গো...'হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ...' আমার হাসি শুনতে পেল না ? হুইগো, দুজনে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দাঁতে কাপড় টেনে ধরি, তবু হাসি থামাতে পারি না। —জিয়াদের বড় খোকা আসতেছে মোর পানে। চুলোয় জ্বাল দিই গো, তাকাইব না। কী কটাস কটাস চোখ। ঘি-দুধ খেয়ে মানুষ।

'এই মাগি, কাজ কর ঠিক করে, নজর দিস কেন এদিক-সেদিক!'

'হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ'—হাসি চাপতে পারতিচি নাই গো।

'ফের হাসছিস ?'

'হাসুম নাই ? মেইয়েছেইলে তো মুই। বুকটা কেমন কইরে উঠল গো মোর।' গাল টিপা দিলা গো মোর ছোঁড়া। 'তুই সুন্দরী আছিস ত।'

'তাও ভাল, সুন্দরী বইললে!'

—কীরকম তুই বড়লোকের বেটা। তর সৎ মায়ের মুয়ে চুমু খাস, শরীল ডইলে দিস, তবে মোকে কেনে ক্ষ্যাপাস। মোর শরীল শরীল লয় ?

ছাদের উপর কাজ। উঁচু বাড়ি। বড়কান পীরের থান, হেদুয়া, বাঁশঝাড, ডুমুর গাছ। ঝাপড়ি আছে না ?—বড়কান পীর তর থানে সামনে শুক্কুরবার, জুম্মাবারে, গড়াগড়ি খামু। হেদুয়ায় একশ সাতটা ডুব দিমু তুই আছিস কিনা। শনিবার শিমূলতলার ঘাটে সারারাত কাটায়ে দিমু। নদীর দিকে তাকায-তাকায় থাকুম। নৌকো আইসবে। মনের মানুষ আইলে পা ধুইয়ে দিমু। না-আইলে শিমূলগাছে হাতের চুড়ি ভেঙে ফেলুম। বাঁধে শুইয়ে পইড়ে গড়াগড়ি খেইয়ে ধুলা মেইখে খেল দেখামু। ধেই ধেই কইরে নাচুম।

ছাত থেকে নেমে দোতলায় আসতে ঝরোকা দিয়ে বড় বউ ঠিক দেখতে পেল। ডাকে। 'কে লো তুই আয় না লো। কে তুই, সতীন নাকি যে পাছা ঘোরা দিয়ে পালাস।'

'মুই গো চাচি। তিনটে সতীন রইচে, ফের সতীন পুষবার শখ হইছে, লয় ?'

বড় বউয়ের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। কী আগুনপারা তাকায়। 'অতি দুশমনের যেন সতীন হয় না গ, মোর জ্বালা কোনো মেয়ে না পায় লো, বুকের ভিতর যে আগুন জ্বলছে তা পানি ঢাললেও নিভবেনি।' মোর হাতটা বড় বউ বুকের মাঝখানে নিয়ে যায়। বুকে গরম। ধুকপুকুনি। এই রকম ত মোরও বুকে হইছে গো।

'বেশ ভাল করে পান ভাঙ ত জিন্নত, তুই খাবি ত ?'

'খামু। সতীন-পারা মোরে লাগবে নি ত হিঃ হিঃ হিঃ...'

'যা ছেনালিপনা করিসনি।'

বড় বউয়ের মুখটায় খুনজারি হয়ে গেল। চোখের কানাচ ঢলঢলে লাগে সব সময়। বড় বউয়ের চোখে ছলছলানি। হর সময়। নদীর দিকে চোখ গেলে দূরপানে দূরের গাছপালা ঝাপসা হয়ে যায়। চোখ দুটো হালের গরুর মত। মানুষের মনও চোখের সনে লেনাদেনা করে।

'পান লও।'

'তোর মাথায় তেল নাই ত।'

'নাই ত কী করবা!'

'আলমারিটা খুলে ফেলে বাসতেলের শিশিটা বার করে মাথায় দে।'

—দিই না মাথায়! খোশবাই লাগবে; মনটাও খোশ থাইকবে। 'ওগো মাথাটা কি ঠেঙা হইয়ে গেল।'

'চুলটা আঁচড়ানা লো, আয়নার কাছে যা।'

—আয়নাটা কী বড। নিজের মুখ দেইখে নিজেই বুঝতে পারছি নি গো।

মোর ঠোঁটে একটু ফোঁটা তিল আছে। কতদিন দেখি নাই। হুই বিয়ের সময় দেইখেচি। কুলশন সিঙার দিইছিল। তখন একবার তিলটা দেইখেছিলম।

'আয় তোর চুল বেণী করে দিই, বিছেনে বোস লো।'

'না, দরকার নাই।'

'কেন লো।'

'ভাল দেখাইবে যে।'

'বরের মন পাবি লো।'

'ভাতারের মুয়ে লাথি দিই গো চাচি।'

'কেন লো, স্বামীর পায়ের তলায় বেহেস্ত, জানিস ত।'

'চাইর মাস হইল আসে নাইগ জহন্নমে।'

'আহা লো, নতুন বে।'

'আহা-উহু করতে হবে নি, আমি চলনু ধানে পা বুলোইতে হবে গো।'

'যাবিখন লো।'

'এত সাজালে, বিছনেয় বইসতে দিলে, সুখের আঁচ দিলে গো বড চাচি। এখন সেজেগুজে চাচার কাছে গিযা বলি, মোরে আর-একটা সতীন কইর।'

হুই গো বাবারে অত জোরে কপালে জাঁতি ছুঁইড়া মাইরল। 'উ বাবারে মেরে ফেললা গো।'

দরজার সামনে শুয়ে পড়েছি। খোঁড়া চাচি পালঙ্কে বসে-বসে আগুনপারা চোখে চায়। কপাল কেটে খুন, হাত ভরে যায়। গলা ছেড়ে নাক দিয়ে মোর কান্না বেরোয়, চাপা যায় না। 'ওঁরে বাবারে মেলে ফেললো গো।'

মেজ বউ ছুটে এসেছে। 'কি লো তোকে যে খুন কইরে ফেলেচে বুড়িমাগি।' মেজ বউয়ের ষাঁড়ের মত গতর, কোলে করে তার ঘরে নিয়ে গেল, মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে পাখার বাতাস করে। তুলোয় ওষুধ লিয়ে কপালে চেপে ধরল। আঃ কপাল জ্বলে যায় গো। —সতীন হতে চাইছিনু বইলে বড়বউ মাইরল আর মেজবউ কপালে কাটা ঘায়ে নুন দিয়া জ্বালা দিইছে নাকি গো। ছোটবিবি চালওয়াল গতর দুলিয়ে-দুলিয়ে নাক উঁচু করে ঢপের পারা এসে দাঁড়ায়। 'আলো মাগির চুলে খোশবাই পাইছি নয়, বেশি দুলাইছে, বুড়িমাগির ঘরে ফের যাবি লা—অর ঘইরে মরদ ছায়া মাড়ায নাই, মোর ঘরকে আইসে।'

মেজবিবির বুকে যেন ছুরি ঢুকে গেল। 'হালো, ছিলি খোটে কাঙালের বেটি, বড়লোক ভাতার লাফ কেটে ধরে ফেললি, তোকে ফের হাটে বসতে হবে, দুদিন পরে যখন ছুঁড়ে ফেলে দিবে তখন বুঝবি।'

'যা লো তোকে অত বড ফডং করতে হবেনি লো, নতুন মাগ বেশি আদর খাইচে বইলে তোর কইলজে কনকন করতেছে লয়?'

'হ্যালা সাতভাতারি মাগি, নাপ টিপলে ছটির দুধ বেরোবে, ভাতার শিখাচ্ছিস মোকে!'

'কী হয়েচে গো মেজ।' শহুরে বউ জুতা খটাস খটাস করে আসে।

'তরে আর কি বলব, ছোটকি ভাতারের ভাগ বেশি পায় বলছে।'

সেজবিবি উঁচা জুতা দিয়ে ছোটকির পা চেপে ধরে। ছোটকি জাত সাপের মত ফণা তুলে ফোঁস করে সেজবিবির কুর্তোয দুটো হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হেঁচকা মারল। কুর্তো ছিঁড়ে গিযে ছোট কুর্তো দেখা যায। দুইজনা দুইজনাব চুলের মুঠি ধরেছে। দুজনই কাঁদছে। মেজবিবি হেসে আর পারে না।

নিচে জিযাস শুকটি গলা ঝাড়ল। যে যার ঘরকে পালায় দৌড়ে। হেই, আমিও পালাই।

সিঁড়ি দিযা জিয়াদ শুকটি উঠছে।

'কে? করিমের...?'

'হ্যাঁ গ, হ্যাঁ।'

'চুল বেঁধেচিস্।'

'হ্যাঁ গ, হ্যাঁ।'

'ভালই দেখায, তোরে।'

'সতীন করবা?'

--মরদটা কেমন হাসতেচে দ্যাখ। তাকাইছে, না ছুরি চালাইছে?

—হেই কি শুনলাম। কুলশনের ভাতার আয়ছে শুনলাম, লয? অরে কি চিল গিযা খবর দিলা—তর খোকা হইচে, কুলশন ট্যাকার জন্যি তোর জন্যি কেঁদে কেঁদে ভেসসে ফেলতেছে। মানুষজন কেউই খবর দিল নাই তবু ঠিক মরদটা আইসছে। অনেক সামান নিয়ে এসেছে। কচি হবে জানতই, তাই হা'থেকে একটা দোলা মশারি, ছেলের কাপড। কুলশন সইযের ভাতার কি চালু, খোকা হলে পবতে পারবে, আবার মেইযে হলে পরতে পাববে সেই ধরনের কাপড এনেছে।

কুলশন কেমন মনে মনে হাসছে দেখ। 'আয লো আয।'

'কি লো মনে-মনে হাসতিচিস লয?'

'হাসুম কেনে?'

'হাসিনার বাপ আইল।'

ঠোঁট চেপে রাখতে পারছে না গো কুলশন, 'হাসি পায়ছে লয?'

'গেছলি অর কাছে?'

'না, সেইথিকে এই রান্নাঘরে রইচি, হাসিনার বাপ ঘরে রইচে, যাই নাই কাছে। গাঁয়ের বউ-ঝিরা আইসে মরদের খোঁজ-খবর লিতে, ভিড় করছিল একটুস আগে।'

'মুই একটুস ঝরোকা দিয়ে উঁকি মাইরা তোর ভাতারকে দেইখে আসি।'

'দেখে আয়।'

বিছানায বসে লম্বা সিগারেট টানছে কুলশনের মরদ। গাল হতে ধোঁয়ার রসগোল্লা ছোঁড়ে। কাপড এখনো খোলে নাই। গাযে একটা রঙচঙে বাঘ-হাতি ছাপা জামা আর পরনে কুলকুলে রক্তের পানা প্যান্টুলুন। জামার পকেটে একটা কলম। কুলশনের ভাতার লেখাপড়া শিখে এসেছে নাকি! রুমালে মুখ মুছছে, যেন ভিনদেশি পুরুষ কুটুমবাড়ি এসেছে।

'ওলো সই, তোর ভাতার রঙদার হইযে এইসেচে।'

কচি ছেলের জামা খেলনা আনলে কচি ছলে যেমন হাসে, কুলশন তেমন খোলাখুলি হাসছে। 'শরীল ভেঙে যায় নাই ত ?'

'না। তুই যা না লো, একা-একা রইচে।'

'যাই অ্যাঁ ? তুই কচিটার কাছে থাক।'

'ডাক্তারের জন্যি এবারে কেমন ছটফটানি ! বলেছিলি নয়, হাসিনার বাপ আইলে নুচে খুঁচে মারুম।'

কুলশন হাসছে। কাপড় ঠিকঠাক করে চলে গেল ঘরপানে।

আহা খোকাটা ঘুমাচ্ছে। মরদ হয়ে জন্মেচিস ত। এখন ত শিশুসাপ, বড় হলে ছোবল মারবি, লয় !—আহারে কচি নাবালক ফেরেস্তা ছেইলে, তরে কি কমু। তুই অবোলা। তর গায়ে এখন পাপ লিখা নাই। আয় তরে চুমু দিই। আহারে ঘুমাইছে দ্যাখ। ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাসতেছে। ফেরেস্তা হাসাচ্ছে কচিকে।

কচি ত ঘুমাচ্ছে, দেখি কুলশন কী করছে, উঁকি মেরে। যাই। ঝরোকার ফুটো দিয়ে দেখব। হেই, কুলশন মুখে আঁচল চেপে কাঁদছে। মরদের কাছেই বসে রয়েছে। মরদটা কুলশনের মুখ থেকে হাত সরাচ্ছে। ইড়িবিড়ি করে কী বলছে। হুই, সই-এর কান্না থামাচ্ছে। চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে। কুলশনের মুখ মরদের পরশে লাল হয়ে যায় গো।

মরদ গায়ে হাত দিলা, হেসে ফেললা কেঁদে ফেললা। আর দেখুম নাই। শরীল জিন্দা রইছে। কপাল কাটল রক্ত ঝইরল গ। সোহাগ করতি দেখলে সোহাগ খাযতে মন যায়বে। জান হু হু কইরবে। পাযে-হাতের দড়ি যেন ছিঁড়াছিঁড়ি কইরব। কেঁদে ফেলব। কান্না যেন সব কষ্টের সাঙাত-সই।

তিন

আজ জুম্মাবার।

—বড়কান পীর তর পায়ে গড়াগড়ি খাইচি। দিলের কথা মনের কথা শুনচিস ত ? তা না-হইলে তোর একদিন কি মোর একদিন। তর পায়ে মাথা ঠুকলম ত তিনবার। আর চাস ? কপাল লিয়েই মাথা ঠুকেছি। খুন বেরোয়তেচে। ধুলো মাখতেচি। এবার তোর হেদুয়ার ডুব দিই। পাঁচকুড়ি সাতটা গুনে গুনে ডুব। এক দুই তিন চার পাঁচ... হেই কী আরাম লাগতেছে। তুই তো পুরুষমানুষ, তোর শরীলেও আরাম পাইছি। আঃ কী আরাম !

আজ শনিবার। সাধের শনিবার, আহ্লাদের রবিবার, বজ্রাঘাতের সোমবার। সারা গাঁর মেয়েরা সাধ করে বসে থাকবে। খোকার বাপ আসবে। কলকাতার খাবার আনবে। টাকা আনবে। ভালমন্দ খাব। হাট থেকে আটা-চাল-ডাল-মুগ-কলাই তেল-নুন-হলদি-লঙ্কা-সাবান কিনবে।—মানুষটাও আপন লোক গো।

চুড়িওয়ালি আসছে না ?

'সোয়ামি-জাগানো চুড়ি লিবে গো ও ও ও...'

'এই চুড়িয়ওালি ইদিকে আয় না লো।'

চুড়িওয়ালি আসছে। এসে ঝাঁকা নামাল। 'ওলো তোর লতুন বে হইচে লয় ? চুড়ি কই হাতে ?'

'নতুন কই ? সাত মাস হইল। চুড়ি ভেঙে গেইছে।'

'মরদ আসে ত ?'

'আসে নাই।'

'আইসবে লো আইসবে।'

'বলতেচিস ?'

'বলচি তো চুড়ি পইরে লে দু-হাত ভইরে। ই হল সোয়ামি-জাগানো চুড়ি। রেতের বেলা সোয়ামির কাছে শুইয়ে রইলি। রাত হইল, সোয়ামি ঘুমায়ে পইড়ল। তোর চোখে ঘুম আসে নাই। চুড়ি লাড়া দিবি, দেইখবি সোয়ামি জেগে গেইছে।'

'দে দুই হাত ভইরে চুড়ি দে।'

চার

শিমূলতলার ঘাটে নৌকো আসে গভীর রাত তক। শনিবারের রাতে নদীর পাড় জ্বলজ্বল করে ওঠে। দূর থেকে জোনাকি জ্বলছে এমন দেখায়। হেরিকেন হাতে গাঁয়ের বউগুলো বসে থাকবে গহিন রাত অবদি। হুই দূরে লৌকো দেখা যায়। হুই বুঝি। ওতে আছে বুঝি। কে ? লোকটা। মানুষটা। দূরের পানে তাকিয়ে-তাকিয়ে মেয়েগুলোর চোখ ঝাপসা হচ্ছে, আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে নৌকোর আলো। চোখ ঝাপসা হলে কী হবে ? চোখের পানি গড়ালে এই আঁধারে কে দেখবে, কেই বা চিনবে ?

'হেলা হুই দূর পানে একটা লৌকো আসতেছে লয় ?' মর্জিনা বুবুর গলা।

'হ্যাঁ গ তাই ত মনে ধরে।' রওশনের বউ ভারী আঁচল মাথায় তুলে দিল।

বাহারনের মা বলল, 'উটা লৌকো নয়।'

'তবে কি লা ?'

'পেত্নি। এই শিমূলতলায় কত র‍্যাত জাইগা কাটাই, ওই আলোটারে দেখি। উটা লৌকো কুনুদিন হয় নাই, পেত্নি জ্বলতেছে।'

'পেত্নি কারে কয় ?'

'মানুষকেই কয, মেইয়েমানুষকে। এই নদীর পাড়ে কত মেইয়েমানুষ আপন-মানুষ আসার পথে তাইকে থাকে কত। কত মেইযে পায়ে আঁচল বেঁধে ডুব দিইছে এই নদীতে। তারা এখন পেত্নি হইয়ে নদীর বুকে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায।'

হুই ত একটা নৌকা আসছে। ধীরে-ধীরে আসছে দেখ। ইদিকপানে ত। সবাই চুপ করে নৌকো আসা দেখছে। চুপচাপ নিশ্বাস বন্ধ করে।—আইসচে আইসচে, হুই কাছাকাছি হইতেচে।

বাহারনের মা হাঁকড় দিল, 'কুন গাঁয়ের লৌকো গো ও ও ও...'

'পানশিউলি যাবে গো ও ও ও...'

রওশনের বউ-ভাবি ছেলেটাকে দুধ চুষাচ্ছিল। দাঁত হয়েছে তার, কট কইরে কামড়ে নিল।

ছেলেটাকে গুম-গুম কিল দিচ্ছে রওশনের বউ-ভাবি, 'সাপের বাচ্চা, দুধ ঝুনে ঝুনে শুকায়ে দিলা, ফের কামড়াইতেচিস, শোরের বাচ্চা। এক্কেবারে সদ্য গোরে দিয়া দিমু।'

বাহারনের মা রাগ করে উঠল 'হ্যালা, ছেলেটারে মারধোর কর কিছু বলুমনি কিন্তুন গোরে পাঠায়চিস ? ছেইলের কিছু যদি হয়.?'

'কি করবা মরদটা কদ্দিন ট্যাকা পাঠায়নি, তিনদিন হাঁড়ি চড়াইনি, ছ-টা ছ্যাঁওড়দের পেটে কইরেচি মুখে কী দিবা ? কোলের ছেলেটা চুযে চুযে বুক শুকায়ে শুকায়ে ফেলতেচে। রক্ত সুদ্ধ চুষে খায়ছে তা খা, খা, মাকেই না হয় খা—তোর বাপ

ত তফাতে আছে এবার এক্কেবারে তফাতে কইরে দে ওরে পেটের ছেইলেও দুশমন, কামড়ে কলজে ছিঁড়ে ফেলতেচে।'

'ওলো কচিটার মুখে চুমু খা লো, মায়ের গাল লাগবেনি।'

চুমু দিচ্ছে কচিটারে 'ওরে মোর সোনা তর কিছু দোষ নাইরে, দুধের বাছুর ফেরেস্তা ছেইলে তুই, তেরে মুই গোরে দিতে পারি ? মানিককে বুকের ভিতরি রেখে দিব। 'মানিক লাচে খানিক খানিক, মুক্তো লাচে ধেয়ে। ভাল কইরে লাচরে মানিক লোক দেখবে চেয়ে'।'

হুই রওশনের বউ-ভাবি তার ছেলেটারে নিয়ে লাচাচ্ছে। হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ করে ছেলেটা হাসছে। কান্নামুখে হাসি। বুকটা জুড়িয় যায় গো। কলজে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পেটে ছেলে ধরিনি, ছেলের মুয়ে চুমু দিইনি।—বুকটা ছিঁড়াছিঁড়ি করে গ।

হুই আর-একটা নৌকো আসছে। সব চুপচাপ হয়ে গেল। নৌকোর পানে তাকিয়ে আছে। নৌকা শিমূলতলার ঘাটেই আসছে। কারা নামছে যেন। হাতে বিজলিবাতি। দুইজন মাত্র। হায়রে। উ জিয়াদ শুকটি। পিছনে কে ওটা ? গোঙা লয় ? গোঙাই ত। হাতে লাঠি। বাঁধের পানে উঠে আসছে। জিয়াদ শুকটি সকলের মুখে বাতি ফেলে দেখছে। গাঁয়ে এত খেত থাকতে মরদগুলো শহরে মিস্তিরিগিরি করতে যায়। বাপ-দাদারা যে-খেতে ফসল ফলাত, সবগুলিই ত তোর হয়েছে। তুই চারটে মাগ নিয়ে সুখে থাকবি। মোদের মরদগুলান শহরে গেছে লয়, তুই তাদের জেলে দিইছিস। নিজের খেতে সমবচ্ছর খোরাকি হইলে মরদগুলান আর শহরে যায় ত না। জমি-জিরেতগুলা লিয়ে লিইচিস। বাতি ফেলে অমন কইরে দেখতিচিস কি ? জোয়ান মেইয়ে বলে এত সময় বাতি ধরে রেখেচিস ?

জিয়াস শুকটি চলে যায় বাতি জেলে-জেলে। পেছনে-পেছনে গোঙা যায়। ঢ্যাঙা কালো কুচকুচে শরীরটা। জোয়ান মদ্দ। শুনতে জানে নাই, কয়তে জানে নাই গ, কী কষ্ট মানুষটার।

রওশনের বউ-ভাবি উঠে পড়ল।

বাহারনের মা কয়, 'কি লো, চইলে যাচ্ছিস ?'

'আর পারি নাই গো বুবু।'

'আর খানিক দেইখে যেইতে পারতিস !'

'না। ছ্যাঁওড়গুলা ডরে-ডরে রইচে।'

কোলে ছেলে নিয়ে মেয়েটা আঁধারে চলে যাচ্ছে। হুই বড়কানতলা, হেদুয়া, বাঁশঝাড়, পেরিয়ে ডুমুরগাছ পেরিয়ে ঘর।

বাহারানের মা ফিসফিসিয়ে উঠল, 'অতগুলান ছেইলেপুলের মা কত র‍্যাত অবদি বইসে থাকবা বলত ! তাও ফের প্যাটে কিছু নাই। মোরও কি জেবন ! বাহারনের বাপ মোর সতীন পুষছে শহরে, পুষুক। আসিস নাই কেনে ? দেখা দিয়ে যায়তে পারিস ত !'

মর্জিনাবুবু কথা কয়, 'মরদটারে গালমন্দ দিতে পারি নাই, কুলশনের ভাতার এসে খবর দিলা তার কঠিন অসুখ কইরেছে। আহা, কত না কষ্ট পাইতেছে। মেইয়েছেইলের জেবন জোঁকের জেবন। টক কইরে মরব নাই। আল্লার কাছে নামাজের পাটিতে দোওয়া মাঙি—আল্লা স্বামীর কোলে যেন মোরে লও।'

বদরুর নতুন মাগ ঘোমটার ভেতর দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। ফোঁস-ফোঁস করছে। নাকের সিকনি চোখের পানি এক হয়ে যাচ্ছে।

'ওলো কাঁদিস নাই লো।'

'কাঁদব নাই ত কী করব গো।'

'না, কাঁদিস না।'

'কেনে ?'

'বলচি, কাঁদিস নাই গায়ের পাশে।'

'কান্না চাপতে পারচি নি, জিন্নত বুবু।'

'তোর কান্না শুইনে মোরও কান্না পাইছে।'

'তোর কেন কান্না পায়ছে ?'

'তোর কেন ?'

'বুকটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগতেচে তাই।'

'মোর যে বুকটা ফেইটে যাইছে।'

বাহারনের মা হাঁকড দিল, 'কাদের লৌকো আসে গো ও ও ও... ?'

এদিক পানেই আসছে—মোদের গাঁয়ের লৌকো। এই ঘাটের পানে আসছে। ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্ কে আসে, কে আসে নাই ? কে আসে, কে আসে নাই ?

'মর্জিনা, তোর ভাতার এসতেচে লো, ঐ দ্যাখ, লম্বা মতন।' বদরুর বউ কইল।

'দূর থিকা চিনতে পারছি নাই।'

'হুই গো, চিনতে পারচিস নাই ?'

'অনেক দিন আসে নাই, কেমন হইয়ে গেছে। তোর বরকে দেখতে পেলি ?'

'না আসে নাই, আর দু-জনা লাবচে। উরা উত্তরপানের লোক।'

মর্জিনার ভাতার আসছে। উঠে এল।

মর্জিনা ডুকরে কেঁদে ভাসিয়ে ফেলল, 'ওগো তুমি অ্যাতো কেন কঠিন গো ও ও ও...'

'মর্জিনা, তুই মোরে বাঁচা, মুই আর বাঁচুম নাই, মুগুগুর-মারা অসুখ হইচে মোর।'

'বাঁচুম, বাঁচুম, বড়কান পীরের দরগায় মর্জিনা খাতুন বুক চিইরে রক্ত দিবা।'

দুজনায় চলে যায়। আর তাকাল না। তাকাবার সময় কই।

বুক থেকে বিরাট এক নিঃশ্বাস শব্দ করে বেরিয়ে গেল না ? বাহারনের মা আঁধার কলসির ভিতর দিয়ে যেন কয় 'শোগেব নিঃশ্বেস ফেলিস নাই জিন্নত।'

'কেন গা ?'

'মরদ কুথাকে কখন আছে, বড়-বড় বাতাস ছাড়লে আপুনেরই ক্ষতি হয় লো ?'

চুপ করে থাকুম। নিঃশ্বেস বড-বড ফেলুম না।

'না আজ আর বুঝি আসবে নাই, মুই চনলুন।' বাহারনের মা উঠে পড়ল।

'চইলে যাইচিস বাহারনের মা ?'

'কি করুম ? শিরের হাডে ব্যথা হইয়া গেল বইসে-বইসে।'

বাহারনের মা চলে গেল। হুই দেখা যায়।

'ও জিন্নাত।

'কী কস বদরুর মাগ।'

'তুই কতক্ষণ থাকবি ?'

'থাকি না একটুস।'

'মুই চইলে যাইচি।'

'যা।'

'একা-একা থাকবি, ডর লাগবে নাই ?'

'না। ডর কি ? হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ।'

'হাসতেচিস কেন অমন কইরে ?'

'হিঃ হিঃ হিঃ...'

—মোর হাসির ডরে চলে যাইচিস বদরুর মাগ ? যা চইলে যা। মুই থাকুম। মোর কেউ নাই, থাকুম একা। গহিন রাত। ভয় নাই ডর নাই। মুই ত নিজেই মেমদো ভূত লো। নাচুম। নেচে নেচে বেড়ামু। বাঁশতলা, ডুমুরগাছ, শ্যাওড়াগাছ, কবরডেঙা। হেই মোর বুকের পাটায় ডর নাই। মোর শরীলে হাসলে ঢেউ খেইলে যায়। নেচে নেচে বেড়ামু। রেতেরবেলা তুই সব জায়গায় গো।

হেই বাঁধ হইতে কে আসতেচিস ? একা!

হাতে শহুরে বাতি। জিয়াদ চাচা বুঝি—'তুমারে ঠিক চিনেচি।'

'চিনেচিস তাইলে ?'

'চিনব না ?'

'করিম...'

'উহার কথা ছাড়।'

'ছেড়ে দে।' চাচা হাসচে। বাতি ফেলে তাকাচ্ছে।

'অ্যাত দেখতেছ কেন গা ?'

—জিয়াদ চাচার চোখে বাঘ দেখলুম গো। জ্বলতেছে। কেমন কইরে তাকায় আছে গো। মেইযেমানুষের শরীল। আচার আছে। যেমন হোক মানুষ ত একটা। পুরুষ মানুষ। ভাতারের মুখে লাথি দিই। শহরে থাক। মুই এই গাঁয়ে খেল দেখামু। 'ও কালোসোনা। আসবে বলে কথা দিলা। কেন এলে না। তোমার তারে সাজিযে ছিনু ফুলের বিছানা... নদীর পাড়ে মাথা টলত্যাচে কেনে ? চাদ্দিক আন্ধার আর ঘুরত্যাছে। পইড়ে যাইছি লয়। হেই মাথাটা ঝিম মাইরা যায়ছে। আকাশ-বাতাস সারা পিরথিবি কেমন করত্যাছে।

হেই মোরে কে ধরেচিস। শরীলে জান নাই নাকি গো। রা কাডতে পারচিনি। হেই মোর কে টাইনা-টাইনা হিঁচড়াইতে-হিঁচড়াইতে লিয়ে যাইতিচিস। মোর শরীলে জেবন নাই গ। কে মোরে তুই ঝোপের পানে লিয়ে যাইচিস, চোখে দেখতে পাই নাই বইলে। জানে সাড নাই বইলে। হাঁকড় দিইতে পারতিচিনি গো। কে মোরে লিয়ে যাস। মোরে লদীতে ভেসসে দে ত, ঝোপের পানে লিয়ে যাসনি। বাঘের চোখ। বাঘের থাকা পারা ধইরেচিস কে মোর হাত শরীল। গায়ে কাঁটা ফুটতেচে। শরীল কাঁটায় খুনজারি হইযে গেল। হেই মুই জিন্দা আছি।

একটা শব্দ শুনলাম। ফটাস করে।

বাঘটা ছেড়ে দিয়েছে।

আর একটা বাঘ এসেছে।

ধস্তাধস্তি হচ্ছে।

মোরে ঘুম পাচ্ছে।

চোখ মেলে দেখলাম আমার বিছানায় শুয়ে আছি। লম্বা কালো কুচকুচে লোকটা, সেই পরের বাঘটা, দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখেনে কে আনলে গো!

লোকটা দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে। গোঙা। হাতে লাঠি। লাঠির আগায় কী দেখলম,

গো খুন। জিযা শুকটির খুন ? লোকটা হাত নাড়িয়ে 'গোঁ গোঁ', করে কী বলছে। বুঝতে নারলাম।

যণ্ডা গোণ্ডা লোকটা আস্তে-আস্তে বেরিয়ে যায়।
হাত তুলে থামাতে পারলাম না গো লোকটারে।
চোখে ঘুম জড়াচ্ছে, ঘুমিয়ে যাই।

আলগা দরজা ঠেলে ঘরে কে ঢুকলা গো। হেই কে পাশে শুইয়ে পড়ল। চোখ খুলতে পারছি না। বুঝতে পারছি। দেখতে পাচ্ছি নাই, কইতে পারছি নাই।—কে আইল! কে আইল ?

কোকিল ডাকল নয় ? চোখ খুলে গেল গো। আন্ধার। পাশে কে শুয়ে গো। নিজের ভাতারকে চিনতে পারি নাই ? হুই কখন আইল ? ঘুমাচেছ। গহিন রাতে এসেছে। ডাক দেব। জাগাব ? সোয়ামি-জাগানো চুড়ি বাজিয়ে জাগাব ? হাত তুলতে পারছি না।—চুড়িগুলো সব ভেঙে দিইছে গো। হাতে কাঁচ ফুটে গেছে। যন্ত্রণা হচ্ছে। কী করে জাগাব লোকটারে ? মানুষটার গায়ে মোর হাত চেপে গেছে। সরে আসছে। লাগছে গো। আহ্ উঁহু 'উরি লাগতেছে গোও ও ও'..., লোকটা জেগে উঠল। মোর কান্না পায়। মানুষটার চোখের দিকে চোখ যেতে হাসলমও।
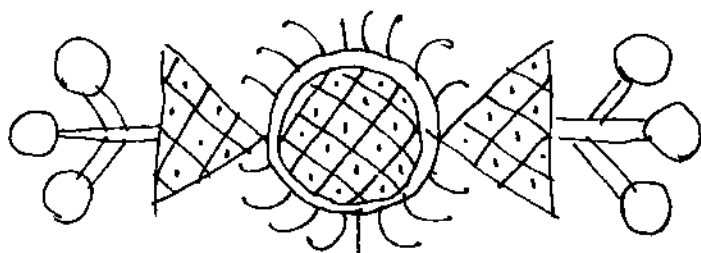
সুসময় ॥ কঙ্কাবতী দত্ত

লেবু-মধুর জল খেয়ে সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে, এই সময় দরজায় ঘণ্টা। সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা বাজে। এখনও অল্প অল্প কুয়াশা, লালচে আলো, অনন্যা বালিশে ঠেস দিয়ে হেডলাইনে চোখ বুলোচ্ছিল, মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজ সরাল। খুলে দেওয়ার মতো কেউ কি ওদিকে নেই? রান্নাঘর থেকে মানদার খুন্তি নাড়ার ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ ভেসে আসছে। মা বাবা দুজনেই গেছে বাজারে, ভাইও নেই। সে দুবার মানদা? মানদা! বলে ডাকল। বীরুকাকুর আসার কথা আজ, বাবা বার বার করে বলে গেছেন, তাঁর ফেরা পর্যন্ত যেন তাঁকে জোর করে বসিয়ে রাখা হয়।

বাবার এই বাল্যবন্ধুটি এমন খেয়ালী, বাড়ি ফাঁকা দেখে হয়তো চলেই যাবেন। অথচ একবার যদি আড্ডা দিতে বসে যান, তাহলে আবার ওঠার কথা খেয়াল থাকে না। নানান বিষয়ে উৎসাহ তাঁর, দারুণ গানের গলা, একটু লেখা-লেখিও করেন। সম্প্রতি আবার এসবের ওপর আরো একটি বিদ্যা যোগ হয়েছে— হাত দেখতে পারেন। আর আশ্চর্য ব্যাপার হলো তাঁর বেশ কয়েকটা প্রেডিকশান মিলে গেছে। হতে পারে কাকতালীয়, তবু তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

জ্যোতিষ—এই একটি ব্যাপার যা মানুষ মাত্রকেই টানে, অন্তত তরুণী মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এর জুড়ি নেই। সুতরাং বাবা-মা'র অন্যান্য বন্ধু এলে অনন্যা যেমন উদাসীন থাকে, বীরুকাকুর ক্ষেত্রে তেমন নয়। কদিন আগেই হাত দেখাবার ছলে তার নিজের কয়েকটা সমস্যার কথা বলেছে তাঁকে। তিনিও পরামর্শ দিয়েছেন। মানদার সাড়াশব্দ না পেয়ে খাট থেকে নেমে হাওয়াই চটি পায়ে গলাল। এমনিতে এতো ভোরে আসার পাত্র বীরুকাকু নন। আজ তাঁর একটা বিশেষ কাজ আছে অনন্যার বাবা সম্বিৎ সেনের সঙ্গে। জ্যোতিষ সম্পর্কে তিনি একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁর ইচ্ছে সম্বিৎ সেটাতে চোখ বুলোন। যেহেতু সম্বিৎ পেশায় সাংবাদিক, হয়তো কোথাও ছাপিয়ে-টাপিয়ে দিতে পারবেন।

অনন্যা করিডোর পেরিয়ে দরজা খুলে দিয়ে দেখে, চুয়া দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে একটা খুশির ভাব ফুটে উঠলো তার চোখে। বীরুকাকা নন, চুয়াই বেল দিচ্ছিল এতক্ষণ, তাই এত অস্থির, অধৈর্য, ঘন ঘন ঘণ্টা। ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, চুল এলোমেলা, গায়ে একটা ঢিলেঢোলা জংলা ডিজাইনের সালোওয়ার কামিজ।

'ওমা তুই!'

'তোর কাছে পঞ্চাশ টাকার খুচরো হবে? ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিই—'

'পঞ্চাশ টাকা! না তো!' বলে অনন্যা মাথা ঝাঁকালো। পঞ্চাশ টাকা একটা মস্তো বড় অঙ্ক তার কাছে। নিজের কোনো রোজগার নেই তার, এমন কি হাতখরচটাও চেয়ে নিতে হয়। তবু সে বললো, 'দাঁড়া দেখছি, মানদার কাছে থাকতে পারে, তুই ভেতরে আয়।'

চুযা অনন্যাব ঘবে পা দিল। ঘবেব কোণে একটা ইজেল , অনেককাল আগে, অনন্যাব তেবো বছবেব জন্মদিনে তাব দিদিমা কিনে দিযেছিলেন, এখনও ব্যবহাব কবে। ছেলেবেলা থেকেই আঁকিবুঁকি কাটাব অভ্যেস তাব, দেওযালে লেখাব জন্য কতোবাব বকুনি খেযেছে , তাব খুব শখ ছিলো, মাধ্যমিক পাস কবে আর্ট কলেজে ভর্তি হবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাব বেজাল্টটা খুব ভালো হযে গেল। সকলে বললো, ছবি তো আঁকাই যায, এতো ভালো বেজাল্ট নিযে সাযেন্স পড়া উচিত। সে নিজেও কেমন টলে গেলো, ভর্তি হযে গেলো যাদবপুবে, তাবপব স্কলাবশিপ নিযে আমেবিকা। এখন আক্ষেপ হয, ছবি আঁকাতেই তাব আসল ক্ষমতা লুকিযে ছিলো, এতোদিনে বুঝেছে। সব সিদ্ধান্ত ভুল হযেছিলো। চুযা তাব হাতব্যাগটা খাটেব ওপব ছুঁড়ে দিলো। খাটেব পাশে কতোগুলো ক্যানভাস দাঁড় কবানো আছে। গত দু মাস সাবা দিন-বাত ছবি এঁকেছে অনন্যা।

চুযা একটা আঙুল তুলে বললো, 'বামাযণ ?'

'হুঁ।'

'এই সিবিজেব ছবিগুলো একজিবিশনে দেওযাব কথা ছিলো তোব ?'

'হ্যাঁ। ফেবত পাঠিযে দিযেছে। আমি জানতাম না, টুযেন্টি থার্ডই লাস্ট ডেট ছিল।'

বলতে বলতে চুযাব মুখে তাব চোখ থেমে গেলো। এতোক্ষণ ভালো কবে দেখেনি, এবাব লক্ষ কবলো, চুযাব চোখেব তলায কালি পড়েছে। মুখেব ভাব অস্বাভাবিক উদ্বিগ্ন। গোপন কথা বলাব ভঙ্গিতে বললো, 'অনন্যা, অবূপেব বাবা মা বাবো দিনেব জন্য দিল্লি গেছেন।'

অনন্যা একটু অবাক হযেই বললো, 'তাতে এতো একসাইটেড হওযাব কি হলো ?'

'বাহ ! এক্সাইটেড হবাব নেই ?' বলে চুযা এমন ভাবে তাকালো যে, ইঙ্গিত বুঝতে এক মুহূর্তও সময লাগলো না অনন্যাব। দুই বান্ধবীব মধ্যে নিঃশব্দে বোঝাপড়া হযে গেলো।

চুযা চোখ নামালো। 'আমি সে কটা দিন ওব বাড়িতে থাকছি।'

'অ্যাঁ।' বলে দবজাব কাছে গিযে ছিটকিনিতে হাত দিলো অনন্যা। 'দাঁড়া, আগে দবজাটা বন্ধ কবি। কে কোথা দিযে শুনে নেবে। তোব সাহস তো কম না। বাড়িতে কি বলেছিস ?'

'বাড়িতে ? মা জানে তোব এখানে আছি।'

অনন্যা দবজায ছিটকিনি তুলে ঘাড় ঘুবিযে তাকালো। 'আমি যদি কাল ফট কবে তোব ওখানে চলে যেতাম ?'

চুযা খাটেব ওপব পা তুলে বসে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। 'আমি জানতাম তোব সেই এন্ আই ডিব বন্ধুবা এসেছে, তুই শহব দেখাতে বিজি থাকবি।'

অনন্যা চুযাব মুখোমুখি দেওযালে ঠেস দিযে বসলো। ঝুঁকি যতো বড়োই হোক, অবূপেব সঙ্গে কযেকদিনেব সহবাস, এ নিশ্চযই এক অসামান্য অভিজ্ঞতা চুযাব কাছে। বোমাঞ্চে, উচ্ছ্বাসে, খুশিতে ঝলমল কবাব কথা ছিলো তাব, কিন্তু কই, তেমন তো কোনো লক্ষণ তাব মুখে দেখছে না, ববং তাকে কেমন যেন বিপন্নই দেখাচ্ছে।

অনন্যা চিন্তিত ভঙ্গিতে গালে হাত দিল। কোনো এক বহস্যময কাবণে চুযাব বাবা-মা অনন্যাকে খুব ভবসা কবেন। 'অনন্যাব বাড়ি যাচ্ছি' বা 'অনন্যাব সঙ্গে আছি'

বললে তাঁরা নিশ্চিন্ত, যেন সে কোনো অনুচিত কাজের সঙ্গী হতে পারে না। অথচ চুয়াদের বাড়িতে বসেই তারা কতোবার কতো উদ্দামতা, কতো খেয়ালীপনা করেছে, তার ঠিক নেই। এর কারণ হলো, বাড়ির বাকি অংশের থেকে চুযার ঘরটা একেবারে আলাদা। প্রবেশ পথ স্বতন্ত্র। বন্ধুরা কখন যাচ্ছে, কখন আসছে, কেউ অতো খেয়াল করে না। এই তো শেষ যেদিন চুয়ার বাড়ি রাত কাটিয়েছে, সেদিনই আরেকটু হলে দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছিলো, প্রাণ হাতে নিয়ে বেঁচেছে। সন্ধ্যার দিকে সঞ্জিত এসেছিলো, তিনজনে বসে আড্ডা মারছে, এই সময়ে চুযার ভাই বাপ্পা এসে বললো, দিদি, রাজীবদের নতুন মারুতি এসেছে, ও বলছে, চলো, সবাই মিলে একবার চক্কর দিয়ে আসি। রাজীব হলো বাপ্পার বন্ধু। গুজরাটী ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে, রাজপুত্তুরের মতো চেহারা, স্বভাবেও বেশ মধুর।

গাড়ি ছুটছিলো ষাট থেকে সত্তরে, সত্তর থেকে আশি কিলোমিটার স্পিডে। দূরে এঁকে-বেঁকে মিলিয়ে গেছে রেড রোডের সোডিয়াম আলো, ঈষৎ লালচে আভা ছুঁয়ে দিচ্ছে।

'অনন্যা, আলোগুলো দ্যাখ।'

অনন্যা বললো, 'ছোটবেলায় 'হাইওয়ে ম্যান' কবিতাটা পড়েছিলি তোরা ?'

'হ্যাঁ।' বলে চুযা দারুণ উৎসাহে আবৃত্তি করলো ঃ

'ওই, লাইফ ইজ আ গ্লোরিয়াস সাইকল/অফ সং/ আ মেডলি অফ ইউফোরিয়া/ অ্যান্ড লভ ইজ আ থিং দ্যাট কান্ট গো রং/আন্ড আই অ্যাম মারী অফ রিউম্যানিয়া....'

সে যেন তার ছেলেবেলায় ফিরে গেছে। হাওয়ায় চুল উড়ছে। গতিতে আঁটো, অধীর হয়ে আছে শরীর, যেন এখুনি হাওয়ায় উড়বে। অনন্যা জানলা দিয়ে মুখ বার করলো। কি বিশাল বিশাল জানালা, মসৃণ গতি, উপভোগ্য যাত্রা। এবার যেন বুঝেছে অর্থের মহিমা।

'রাজীব, আমায় চালাতে দে, একবার একবার প্লিজ'--অনেকক্ষণ ধরে বলছিলো চুযা।

রাজীব বলছিলো, 'আরেকদিন, চুযা। এই অন্ধকারে একদম সামলাতে পারবে না—'

চুয়া বলছিলো, 'চুপ কর তো! আমি বারো বছর থেকে গাড়ি চালাই জানিস--'

পেছনের সিটে বসে অনন্যা মুচকি হাসলো। এটা বেমালুম মিথ্যে কথা। আগে দু একবার চুয়া স্টিয়ারিং ধরেছে বটে, কিন্তু সে গাড়ি চালাতে জানে একথা কখনই বলা যায় না। তবে তারই জিৎ হলো অবশেষে। রাজীব সরে গিয়ে চালকের আসনে তাকে বসতে দিতে বাধ্য হলো। ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলো চুয়া। অনন্যা একটু সন্ত্রস্ত হয়েই সীটের মাথটা চেপে ধরলো। আসার সময় একটা পার্কে জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকতে দেখেছে কয়েকটি ছেলেমেয়েকে। দেখে মনে হয় ফুটো পয়সাও নেই। তবু তাদের আদৌ দুর্ভাগা মনে হলো না। সে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে গাড়িটার মসৃণতায়, এখন আর সেটা তাকে আলাদা করে সুখ দিচ্ছে না।

অনন্যা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, এই সময় হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে আর ঝাঁকুনিতে গাড়ির ভেতরটা কেঁপে গেলো। সামনে একটা ঠেলার গায়ে জোরে ধাক্কা মেরেছে চুযা। কোথা থেকে লোকজন ছুটে এলো, ঘিরে ফেললো গাড়ি। ভাগ্যক্রমে ঠেলাওয়ালার গায়ে আঁচড় লাগেনি, বেশ কিছু টাকা খসিয়ে তারা সেযাত্রা ছাড়া পেলো। এরকম কতো কি, কতো বার! চুযা বলে, 'দেখেছিস তো, আমাদের লাকটা কি

খারাপ ? অথচ তুই আর আমি এতো ভালো ! কেন রে, আমাদের এতো ব্যাড লাক ?'

অনন্যা খাটের দিকে এগিয়ে এসে বললো, 'আচ্ছা চুয়া, 'চিত্রাঙ্গদা'য় সোলো গাওয়ার কথা ছিলো না তোর ?'

'দিলো না রে ! ভাস্বতী চিত্রাঙ্গদা হয়েছে—'

অনন্যা উত্তেজিতভাবে বললো, 'সে কি ! তুই এতো ভালো গাস ! ভাস্বতীর আবার সুরজ্ঞান আছে নাকি—'

চুয়া নিরসক্তভাবে বললো, 'ওই ! পঙ্কজদার ভাইঝি যে- '

'তুই তাহলে গাইছিসই না ?'

'গাইছি, সকলের সঙ্গে...'

চুয়া খাটের ওপর জোড়াসন হয়ে বসলো। 'অনন্যা, তুই কি একবারও ভেবে দেখেছিস, এ বছর আমার তেইশ বছর বয়েস হবে ?'

'না। তোর বুঝি দুঃখ হচ্ছে, সে কথা ভেবে—'

'হ্যাঁ, ভাবছিলাম, কি করলাম, এতোগুলো বছর--' বলতে বলতে চুয়া কপালের দু'পাশে আঙুল দিয়ে চাপ দিলো। অনেক গুণ আছে চুয়ার। সে নাচতে পারে, খুব ভালো গান গায়, কিন্তু কোনো কিছুতেই ঠিক মন লাগাতে পারেনি। মানুষটা খুব চঞ্চল আর উচ্ছ্বাসপ্রবণ বলে অনুশীলনের অভাব ছিলো সব কিছুতেই। অথচ যে কোনো লোক যে চুয়ার গান শুনেছে, অভিভূত হয়েছে। তার গলায় একটা দরাজ প্রসার আছে, কখনও তা গগনচুম্বী উচ্চতায়, কখনও পাতালে পৌঁছে যায়। একদিন সে সারা রাত গান শোনালো অনন্যাকে, জানালার ধারে বসে। তাদের চোখের সামনে ভোর হলো, দূরে একটা মসজিদ থেকে ভেসে এলো আজানের শব্দ। সে রাতটা আজও মনে পড়ে। অনন্যা চুয়াকে বলেছিলো, 'চুয়া, তুই আবার রেওয়াজ শুরু কর—'

'করবো !' বলেছিলো চুয়া, কিন্তু এর কিছুদিন পরেই তার মেজো কাকা মারা যাওয়ায় বাড়িতে সব ছন্নছড়া হয়ে গেলো।

অনন্যা চুয়ার দিকে তাকালো। সত্যিই তো, জীবন অতিক্রম করবে না তো তাদের ? জীবন কি শিল্পের বিকল্প ? সে ছবিগুলো আঁকতে পারবে তো ? ফোটাতে পারবে তো, যা কিছু চেয়েছিলো ? অবশেষে চব্বিশ, সময় বেশি নেই, দেখতে দেখতে তিরিশ বছর হবে, তারপর পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ, তার যৌবনের একেকটা বছর, একেকটা দিন, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের মতো মূল্যবান। সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে তারা, আর তাদের যৌবন--তাদের যন্ত্রণার কারণ, তাদের বেদনা, তাদের অহংকার, তাদের ধৈর্য্যহীনতা।

চুয়া অনন্যার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বললো, 'মাঝে মাঝে মনে হয় কোথাও পালিয়ে যাই !'

অনন্যা হাসলো। 'পালাবি কোথায় ? দ্য জার্নি ইজ ইনসাইড—'

চুয়া বললো, 'তোর মাঝে মাঝে খারাপ লাগে না ? সবাই এতো কিছু করছে, সেখানে আমরা একটা গুড ফর নাথিং, ফেইলিয়ার্স—'

'কী করছে সবাই ?'

'সঞ্চিত কতো বড়ো কম্পানিতে জয়েন করেছে, দীপিকা বিয়ে করে ঘর সংসার করছে, সেখানে আমি ভালো করে একটা নাচের প্রোগ্রামও অ্যারেঞ্জ করতে পারলাম না—আর তাছাড়া...তাছাড়া, আমার ব্যক্তিগত জীবনও কেমন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে।'

এই নাটকীয় কথাটা শুনে অনন্যা কৌতূহল ও মনোযোগের ভঙ্গিতে ভুরু দুটো

সামান্য কুঁচকে বললো, 'কেন ?'

চুয়া জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো, 'আমি অরূপের ওখানে আর পেরে উঠছি না। কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'সে কী রে !' অনন্যা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো, মাত্র গত শনিবারই চুয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, এর মধ্যে গাল দুটো যেন খানিকটা চুপসে গেছে, চোখের তলায় অল্প অল্প কালি, দৃষ্টিতে কি অসম্ভব ক্লান্তির ছাপ !

সে চুয়ার চোখে চোখ রেখে বললো, 'কি হয়েছে কি, আমায় বল...'

'সেটাই তো মুশকিল, কিছুই হয়নি। রোজ সন্ধ্যায় ভাত রেঁধে খাচ্ছি, সন্ধেবেলা অরূপের সঙ্গে বসে টিভি দেখছি। দিব্যি থাকার কথা। কিন্তু...' বলতে বলতে সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো। কয়েক মহূর্তে তার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো অনন্যা। মন্থর সকাল। দূরে কোথা থেকে মিস্ত্রিদের হাতুড়ি পেটার শব্দ ভেসে আসছে।

চুয়া ঠোঁট খুললো। 'আমি বা অরূপ কেউই বোধ হয় কারো মনের নাগাল পাচ্ছি না। অথচ এতো কাছাকাছি আছি। আগে অরূপ কানপুরে পড়তো, শারীবিকভাবে দূরে দূরে থেকেও আমরা সব সময় দুজনে দুজনের চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকতাম।'

অনন্যা হাঁটুতে থুতনি রেখে শুনছিলো। তার স্পষ্ট মনে আছে, অরূপের বাইশ বছরের জন্মদিনে কি দারুণ ঘটা করে বাজার করেছিলো তারা। প্রত্যেকটা বছরের প্রতীক হিসেবে একটা করে উপহার, অর্থাৎ সব মিলিয়ে বাইশ রকম জিনিস সাজিয়ে একেবারে বিয়ের তত্ত্বের মতো ডালা পাঠানো হয়েছিলো।

কানপুর আই আই টি-তে ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছাত্র ছিলো অরূপ, দারুণ ব্রিলিয়ান্ট, একের পর এক পরীক্ষা দিচ্ছে আর উতরে যাচ্ছে, এই সময় একবার পুজোয় কলকাতা এসে চুয়ার সঙ্গে আলাপ হলো। সঞ্চিতের ছেলেবেলার বন্ধু তারা দুজনেই, অথচ আগে কখনও চাক্ষুষ দেখেনি পরস্পরকে। সেই যে দেখা হলো, দেখতে দেখতে গভীর প্রেম। চলে যাওয়ার পরও অরূপ একের পর এক চিঠি পাঠাতে লাগলো। কোনোটা চারপাতা, কোনটা দশপাতা, এখনও মনে আছে খামের ভার দেখে সে হেসে ফেলেছিলো। বাঁ দিকে আবার গোটা গোটা অক্ষরে লেখা থাকতো, 'ব্যক্তিগত'। চুয়াও কেবল দিন গোনে, আবার কবে দেখা হবে। শুধু চিঠি নয়, সে আবার টেলিগ্রামে প্রেমের বার্তা পাঠাতো। একবার টেলিগ্রাম ফর্মের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার ব্যাকুলতার কথা লিখছে, পোস্ট অফিসের লোকটি দেখেটেখে বললো, 'হুঁ—এতো দরকার নেই। লিখুন কাম শার্প।'

প্রেমের এমনই তাগিদ, সেই অরূপ আই আই টি-তে পড়াশুনো শেষ না করেই চলে এলো। চুয়ার জন্য। আপাতত চাকরি খুঁজছে। শিগগিরই বিয়ে করবে ওরা।

চুয়া বলে চললো, 'তখন বুঝিনি, আসলে একেবারেই মনের মিল নেই আমাদের। নযতো ও চলে আসার পর এতো অল্পদিনের মধ্যেই এতো বিটারনেস, খিটিমিটি ?'

'ডেফিনিট কোনো কারণ আছে, তা নয়—' অনন্যা ভুরু কুঁচকোলো। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সব কিছুরই একটা কারণ তো থাকে।'

চুয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'জানি না। হযতো আমরা বড্ড বেশি আশা করেছিলাম পরস্পরের থেকে, ভেবেছিলাম প্রত্যেক মুহূর্তে একটা দারুণ থ্রিল থাকবে।'

'প্রত্যেক মুহূর্তে থ্রিল ? তা তো হয না চুয়া—'

চুয়া ঠোঁট কামড়ালো। 'আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না তোকে। তুই হয়তো আমায় খুব শ্যালো ভাবছিস। কিন্তু...কিন্তু তা না... আমাদের... আমাদের সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। এমনকি গল্প করার মতোও তেমন কিছু নেই। আমি কবিতা

ভালোবাসি, গান ভালোবাসি, ওর জগৎটা একেবারে অন্য, জানিস·'

অনন্যা বললো, 'ও ওরকম মনে হয়। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চুয়া বিষণ্ণভাবে বললো, 'এতো প্রবলেম, এতো বাধা পেরিয়ে আরো ভয়ানক একটা সমস্যার মুখোমুখি হলাম আমরা। সত্যি বলছি, জীবনে কোনোদিন এতো ডিপ্রেসড ফিল করিনি'—বুকের ভেতরের একটা অদ্ভুত চাপা কষ্ট নিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো চুয়া। বললো, 'অনন্যা বলতে পারিস, কবে আমি আবার সহজভাবে হাসতে পারবো, গান গাইতে পারবো ?'

অনন্যা তার দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বললো, 'শোন চুয়া, প্রেম মানে তো শুধু কবিতা আর শিল্পের কথা বলা নয়, সে সব তো সেমিনার-টেমিনারেও আলোচনা করা যায়। কমিউনিকেশন হলো নিজের সবচেয়ে ব্যক্তিগত কথাগুলো বলতে পারা। ছেলেবেলায় কথা, কি স্বপ্ন দেখলি তার কথা...'

চুয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে বিষণ্ণভাবে হাসলো, 'আমি তোকে কিছুই বোঝাতে পারছি না।' বলে উশখুশ করার ভঙ্গিতে শব্দ করে আঙুল মটকাতে লাগলো। তারপর একসময় জানালার ধারে উঠে গিয়ে চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর আস্তে আস্তে বলে উঠলো, 'বিয়ে আমি শিগগির করবো। দেরি করে কী লাভ ? দ্যাখ, মা-বাবা এখন আছেন, চিরকাল তো আর থাকবেন না ; আর মাকে ছাড়া আমি কি করে ওই একই বাড়িতে দিন কাটাবো ? তার চেয়ে এখন থেকেই অভ্যস্থ হওয়া ভালো, ইজন্ট ইট ? তাছাড়া দেখতে দেখতে আমাদের তিরিশ বছর বয়েস হবে...'

অনন্যা যান্ত্রিকভাবে মাথা নাড়ালো, কিন্তু মন থেকে ঠিক সায় দিতে পারলো না। চুয়া যে এতো প্র্যাকটিকাল হয়ে যাবে, এটা মেনে নেওয়া কঠিন। একজনকে জীবনসঙ্গী করতে চলেছে, তার পিছনে এই কি যথার্থ যুক্তি ?

চুয়ার পাশে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে অনন্যা বললো, 'কেন জানি মনটা খুব খারাপ লাগছে, চুয়া'

'কেন রে ?'

'জানি না'

'বল, একটু ভেবে বল আমায়, প্লিজ—'

অনন্যা বললো, 'হয়তো আমার মনে হচ্ছে, জীবনের একটা পর্যায় শেষ হয়ে গেলো।'

চুয়া বললো, 'তোর কি মনে হচ্ছে, আমাদের হাসিখুশির দিনগুলো শেষ ?'

'হ্যাঁ, হয়তো তাই—'

অনন্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। জানালার দিকে পিঠ, একটা গ্রিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, চুলগুলো অল্প অল্প উড়ছে হাওয়ায়, দূর থেকে সিটি বাজিয়ে চলে গেলো মেট্রো রেল। তাদের বাড়ির কাছেই মেট্রো রেলের শব্দটা খুব আধুনিক, যেন একুশ শতকীয়। প্রায় যেন মনে হয়, রকেট ছাড়তে চলেছে। কি গতি, কি উত্তেজনা, তার আর চুয়ার জীবনের মতোই যেন। গত এক বছরে সে আর চুয়া কতো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, জায়গা, বন্ধু, বান্ধবী আবিষ্কার করেছে। তাদের মধ্যে একজন ছিলো মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ছেলে, খুব লম্বা, কপালে একটা কাটা দাগ, চোখে অদ্ভুত ঠাণ্ডা নিরাসক্ত ভাব খেলা করতো।

ফোর্ট উইলিয়ামে একটা বাংলোতে থাকতো। তার বাড়ির নুড়ি বিছানো ছাদে

বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলতো, 'অনন্যা, আমি রাতে ঘুমোতে পারি না, ব্লুস্টার অপারেশনের সময় আমি নিজে হাতে গুলি চালিয়েছি। একটা লোক আমার চোখের সামনে...' —বলতে বলতে সে চোখ বুজে মাথা ঝাঁকাতো। 'আমি শুধু রক্ত দেখি। রক্ত, রক্ত—'

তার পুরুষালি, লম্বা-চওড়া চেহারায় এতো আর্তি, এতো যন্ত্রণা ফুটো উঠতো যে অনন্যার কষ্টই হতো তার দিকে তাকিয়ে। মাত্র চব্বিশ বছর বয়েস ছেলেটার। বাবা-মা থাকেন পাঞ্জাবে। বাড়ি ছেড়ে কতো দূরে, কতো জটিলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

সে সমমর্মিতার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আপন মনেই মাথা ঝাঁকাতো। 'তুমি সার্ত্রের 'আয়রন ইন্ দ্য সোল' পড়েছো ?'

ছেলেটি মাথা তুলে বেদনার্ত লালচে চোখে তাকাতো। 'না তো, কী আছে তাতে ?'

অনন্যা বলতো, 'আসলে কেউই কাউকে ঘৃণা করে না। যে মারে, তার যন্ত্রণাটা মৃতের কষ্টের চেয়ে বেশি।'

ছেলেটি জানালার শিক শক্ত করে ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতো। অনেক গাছ দেখা যেতো তার বাড়ি থেকে, কৃত্রিমভাবে তৈরি উঁচু-নিচু টিলা।

চুয়া জানালার ধার থেকে সরে এসে বললো, 'সেদিন আমার কি মনে হচ্ছিলো জানিস তো ?'

'কবে ?'

'যেদিন গাড়িতে আমরা রাজীবদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। তুই মাথাটা পেছন দিকে সামান্য ছুঁড়ে দিয়ে মিউজিক শুনছিলি, তোর চুল উড়ছিলো। আমার কি মনে হচ্ছিলো জানিস ? হঠাৎ বুকের ভেতর কেমন ধক্ করে উঠলো, হঠাৎ কেন মনে হলো, অনন্যা যদি মারা যায়, আজ যদি অ্যাক্সিডেন্টে ও মারা যায়, আর কেউ জানবে না, ও কে ছিলো, ও কি ভাবলো, জীবনে কী চাইতো, এমন কি অর্জুনও জানবে না।'

অনন্যা হাসলো। 'মারা যাবো—শারীরিকভাবে, না মরালি ?'

চুয়া বললো, 'মরালি—যদি তুই ছবি আঁকা ছেড়ে দিস।'

অনন্যা বললো, 'আর তুই নাচটা আবার শুরু কর তো। তোর সত্যিই ট্যালেন্ট আছে!'

চুয়া বিষণ্ণভাবে হাসলো। 'আমি জানি সেটা। কিন্তু কিছু হচ্ছে কোথায়। যাই করতে যাচ্ছি, একটা না একটা বাধা আসছে।'

অনন্যা উঠে দাঁড়িয়ে একটা তোয়ালে কাঁধে ফেললো। 'তুই একটু বোস চুয়া, আমি মুখ ধুয়ে আসছি। ততক্ষণ...' বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চোখ দিয়ে কি খুঁজলো অনন্যা। বললো, 'ততক্ষণ এই ম্যাগাজিনগুলো দ্যাখ। অ্যানা পাভলোভা বিষয়ে একটা রাইট-আপ আছে, পড়—' বলে কয়েকটা পত্রিকা তার দিকে ছুঁড়ে দিলো।

চুয়া সেগুলো লুফে নিলো। 'আমি ট্রাই করছি পড়তে, কিন্তু আজকাল বসে বইও পড়তে পারি না।' বলে সে ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'আহ অনন্যা, সব ঠিক হয়ে যাবে, কি বল ? গুড টাইমস উইল কাম...'

'অফ কোর্স !' বললো অনন্যা।

চুয়া হঠাৎ উঠে বসে বললো, 'তুই থিয়েটার রোডে সেই আর্ট ডিলারের কাছে গিয়েছিলি ? আমি কি ভাবছিলাম জানিস, তোর দু-একটা ছবি বিক্রি হলে কিছু পয়সা

হাতে আসবে, কদিনের জন্য শান্তিনিকেতন ঘুরে আসবো সবাই মিলে—'

অনন্যা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। একেকটা সময় যায় একরকম, যখন মানুষ বাজিতে হারে, ভুল তাস তুলে নেয়। কিছুই যেন ঠিক লাগছে না, যেখানে যাচ্ছে, ব্যর্থ হতে হচ্ছে। বিদেশে পড়তে গিয়েছিলো, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কোর্স কমপ্লিট না করেই ফিরে আসতে হলো। চুয়ার কথামতো গিয়েছিলো থিয়েটার রোডে এন মালহোত্রা বলে এক আর্ট ডিলারের কাছে, তিনি দেখাও করলেন না। অনন্যা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কল খুললো। একটা অন্যমনস্ক ভাব ফুটে উঠলো তার চোখে। চুয়া ট্যালেন্টের কথা বলছিলো। ট্যালেন্ট কি, সে ঠিক বোঝে না, এটুকু জানে, ছবি আঁকতে বসলে সে সব ভুলে যায়--এটা অতি প্রিয় বিনোদন। কিন্তু রঙ, ক্যানভাস, তারপিন তেল--আজকাল বড্ড দাম এসব জিনিসের। অয়েলে আঁকা প্রায় যেন বিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই সাধারণত জল রঙ বা প্যাস্টেলই সে ব্যবহার করে, কিন্তু মাঝে মাঝে তো ইচ্ছে হয় মস্ত দশ বাই বারো ক্যানভাসে হাত দেবে, বা একটা দেওয়াল জোড়া মিউরালের কাজে মশগুল হয়ে থাকবে। সে সুযোগ কেউ কি তাকে দেবে কোনোদিন ? কাজের সুযোগ পেলেই হলো, তা সে যে শর্তেই হোক, এমনকি রুবেন্স, হলবাইন, টিশিয়ানের মতো মহৎ শিল্পীরাও তো পোষ্য ছিলেন রাজার। সে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আলতো করে তোয়ালে চেপে মুখ মুছলো। চুয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলো, এন মালহোত্রা বলে এক আর্ট ডিলার বম্বে থেকে এসেছেন, তিনি নাকি তরুণ শিল্পীদের ছবি কিনতে ইচ্ছুক। থিয়েটার রোডের একটা অফিসে যোগাযোগের ঠিকানা দেওয়া ছিলো, জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদে ভিড়ের বাস ঠেঙিয়ে অনন্যা আর সৌমিল্য সেখানে গেলো। দুটো ক্যানভাস অনন্যার বগলদাবা করা, সৌমিল্যর হাতে তিনটে। গরমে দুজনেরই কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভিড়ের মধ্যে প্রায় পিষ্ট হতে হতে অনন্যা কোনোমতে ক্যানভাসগুলো বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, এই সময় পাশ থেকে এক ভদ্রলোক এমনভাবে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন যে যন্ত্রণায় অনন্যার মুখের রেখাগুলো কুঁচকে গেলো।

থিয়েটার রোডে একটা বহুতল বাড়ির সাততলায় সেই অফিস। লোডশেডিং। লিফট চলছিলো না বলে সিঁড়ি ভেঙেই উঠতে হলো। সৌমিল্য কপালে রুমলে চেপে ঘাম মুছলো। 'আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। তুমি ঘুরে এসো।'

ক্যানভাসগুলো নিয়ে খানিক পরেই ফিরে এলো অনন্যা। ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করেননি। সৌমিল্য চোখের কোণের খুশি খুশি ভাবটা গোপন করতে গিয়ে হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলো। অনন্যা লক্ষ করেছে, তার অসুবিধের মুহূর্তে সৌমিল্য যেমন বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশে দাঁড়ায়, তেমনি তার এই সব মুশকিলগুলো যেন উপভোগও করে। যেন তাকে অনিরাপদ, অসহায় দেখতেই সে চায়।

বাথরুমের দরজায় কে যেন দুম দুম করে ধাক্কা দিচ্ছে। অনন্যা দরজা ফাঁক করলো।

চুয়া দরজার কাছে এসে গলা নামিয়ে বললো, 'তোর সেই বীরুকাকু না কে, তিনি এসেছেন।'

অনন্যা ছিটকিনিতে হাত দিলো। 'আমি আসছি। তুই একটু বসতে বল ওঁকে। জানিস তো, বীরুকাকু দারুণ হাত দেখতে পারেন।' একটু মুচকি হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করলো। সে জানে, এতো বড়ো আকর্ষণ আর কিছুতেই বোধ করবে না চুয়া। অনেকেরই হাত দেখানোর শখ থাকে, কিন্তু চুয়ার এ ব্যাপারে উৎসাহটা একটু যেন

বেশি। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী সে, জীবন থেকে অনেক কিছু আশা করে, হয়তো সেইজন্যই এতো প্রবল আগ্রহ। কোথায় কোন সাধুবাবা আছেন, খুঁজে খুঁজে যায়। অথচ আজ অবধি জ্যোতিষীরা যা কিছু বলেছেন, সবই মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে তার জীবনে। এটা মনে করিয়ে দিলে অবশ্য হেসে ফেলে। কিছুদিন আগে অনন্যা এক জায়গায় দরখাস্ত করেছিলো, কিন্তু চাকরিটা তার হয়নি। সেই থেকে চুয়া ধরে পড়েছে, একটা গোমেদের আংটি নাকি পরতেই হবে তাকে। কোন এক জ্যোতিষী নাকি স্পেশাল অর্ডার দিয়ে সেটা করিয়ে রেখেছেন। অনন্যাও কিছুতেই পরবে না। এই নিয়ে দুজনের কতো বিতর্ক।

অনন্যা ঝপাঝপ স্নান শেষ করতে লাগল। বীরুকাকুকে আবার বসিয়ে রাখা চলবে না। একেকজন লোক থাকে রাগী, অহংকারী ধরনের, তিনি বালকের মতো চঞ্চল। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে হলেই একটু উশখুশ করেন। বছর সতেক হলো তাঁর স্ত্রী নীলিমা ক্যান্সারে মারা গেছেন। সেই থেকে জ্যোতিষী নিয়ে পড়েছেন। শুধু বই-পড়া বিদ্যা নয়, সাধুসঙ্গও করেন। তাঁর ওই নতুন শখটি নিয়ে কোনো চটুল মন্তব্য বা রসিকতা করলে তিনি হেসে চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে বলেন, 'দ্যাখো বাবা, রবীন্দ্রনাথও প্ল্যাঞ্চেট করতেন।'

রসিকতা অবশ্য বড়ো একটা করে না কেউ, বরং তিনি এলে হাত দেখানোর হিড়িক পড়ে যায়, যদিও মুখে অনেকেই কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয়। এমন কি অনন্যাও তাঁর সামনে হাতের পাতা দুটো মেলে দিয়ে বলেছিলো, 'দেখো তো কাকু, একটা কিছু হবে কি না।'

'একটা কিছু মানে ? কি হওয়ার কথা বলছিস ?' জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি।

অনন্যা ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকেছিলো। 'আমি যা-ই করতে যাচ্ছি, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না।'

বীরুকাকু মৃদু হেসেছিলেন, তাই দেখে অনন্যা ব্যস্ত হয়ে বললো, 'হাসছো যে ?'

বীরুকাকু দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'করবিটা কী, এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে ?'

বসার ঘরে পা দিয়ে অনন্যা দেখলো, বীরুকাকু ঝুঁকে পড়ে চুয়ার হাত দেখছেন। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই পরীক্ষা চলছিল বলে মনে হলো। অবশেষে হাতের পাতাটা একবার আলতো করে উল্টেই ছেড়ে দিলেন।

চুয়া প্রায় তাঁর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে জিজ্ঞেস কললো, 'বলছেন বিয়ে হবে ? শিগগিরই ?'

'সম্ভবত।' বললেন বীরুকাকু।

'সুখী হবো ?'

চুয়ার অধীর কাঁচা মুখখানার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন বীরুকাকু। একটা হাল্কা হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটের কোণে। এই হাসি অনন্যা চেনে। বড়ো বিপজ্জনক এই হাসি। এর মানে বীরুকাকু এ ব্যাপারে আর মন্তব্য করবেন না, অথচ তাঁর মনের ভাবটাও ধোঁয়াটে থেকে যাবে।

এ প্রসঙ্গে চুয়ার পীড়াপীড়ি এড়াতে অনন্যা তাড়াতাড়ি যোগ করলো, 'জীবনে প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি এসব পাবে ও ?'

'পাবে।'

'কবে পাবো ? আমার সুদিনটা কবে আসবে ?' নাটকীয়ভাবে বলে উঠলো চুয়া।

অনন্যা বীরুকাকুর দিকে তাকালো। দুই যুগেরও বেশি বয়েসের ব্যবধান তাঁদের মধ্যে ; তাই বোধ হয় তাঁকে ঠিক বোঝানো যাবে না, চুয়ার সমস্যাটা কতো গুরুতর।

যে জিনিসটাকে এতোদিন মোক্ষ ভেবে এসেছে, তাই-ই শূন্য হয়ে ধরা দিয়েছে। এর চেয়ে বড়ো যন্ত্রণা কি হতে পারে আর!

বীরুকাকু চশমা খুলে মুছতে মুছতে বললেন, 'অসাধারণ জীবন তোমাদের দুজনেরই। এতো ভালো দুটো হাত সচরাচর দেখা যায় না।'

'মানে?'

'তোমরা দুজনেই খুব ভাগ্যবতী, সুসময়ে ভরা জীবন।'

চুয়া উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগ্যেস করলো, 'তা আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টা কবে আসবে?'

বীরুকাকু চশমা চোখে দিয়ে বললেন, 'কেন, এটাই তো সবচেয়ে ভালো সময়।'

বীরেন্দ্র রায় দুটি নিরাশ তরুণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মানুষ অপেক্ষা করে, শুধু অপেক্ষা করে, কখনও অ্যানুয়াল পরীক্ষার, কখনও চাকরির, কখনও বিয়ের। তাঁর বয়েস যখন অনন্যার মতো, তখন তাঁরা বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। একবার সম্বিৎ তাঁর কাছে চলে এসেছিলো বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে। পকেটে পয়সা ছাড়াই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন দীঘা। ঝাউবনে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কিন্তু বোঝেননি, এটাই সবচেয়ে ভালো সময়, এই মুহূর্ত!
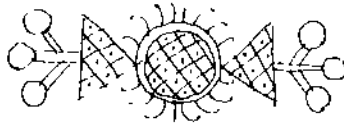
কবর ॥ আনসারউদ্দিন

এ পর্যন্ত চারটে কবর খোঁড়ার কাজ শেষ। আরো একটা কবর খুঁড়তে বাকি। এক সঙ্গে এতগুলো মানুষের আকস্মিক মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই বাদরি গ্রাম তো বটেই আশেপাশে দু'পাঁচখানা গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে এই ধরনের মৃত্যুর নজির নেই। গোটা বাদরি তাই শোকস্তব্ধ। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসা আত্মীয়-স্বজনেরা কাঁদনের ঝড় তুলে বাদরির বুকে আছড়ে পড়ছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলো নিজেদের কান্নাটাকে সমঝে নেবার আগেই ওদের উপস্থিতিতে নতুন করে শুরু হচ্ছে কান্নার সংযোজন। বাড়ির পুরুষেরা বাড়ির আনাচে-কানাচে বসে চাপা কান্নায় গুমরে উঠছে। এ অবস্থায় সান্ত্বনা দিতে যাওয়া মানে দুঃখটাকে উস্কে দিয়ে তাপ পোহানো। যে যার ঘাড়ের গামছায় মুখ আড়াল করে কেটে পড়ার ফিকির খোঁজে। যদিও গ্রামসম্পর্কে সবই চাচা-ভাইয়ের সম্পর্ক। একজনের বিপদ-আপদে আর একজন হিম্মে হয়। কিন্তু এমনটা যে হবে তা কে জানতো ! একমাত্র বুড়ো ইকামত নাকি এইরকম কিছু একটা দুর্ঘটনার নমুনা দেখতে পেয়েছিল। শনিবার শুকনো ডালে বসে কাক ডেকেছিল আর কুকুরের মুখে থাবা দিয়ে বেড়ালে খাবার কেড়ে খেয়েছে।

কথাটার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য অনেকেই ওকে জেরায় জেবায় জেরবার করে তুলছে। উত্তরে ইকামত বুড়োর একই জবাব—সে আর কোসনারে ; এমনডা যে হবে তাকি আর জানতি পেরিলাম। উই যে আলামত দেখলাম এই পোড়াচোখি—বলতে বলতে গলাটা বুজে আসে। বাক রোধ হয়। এতগুলো মানুষের এমন মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী মনে হয়। কেন গাঁয়ের মানুষকে সে আগাম আলামত অর্থাৎ পূর্বলক্ষণ সম্বন্ধে সতর্ক থাকার কথা বলেনি। সেজন্য কবর খুঁড়তে থাকা লোকজনদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে—ইরে তেরালি মুলুক, তুরা আমার জন্যিও একটা কবর খোঁড। এই বয়েসে উসব সহ্যি হয় না।

ইকামত বুড়োর অবদমিত কান্না অনুভব করে তেরালি, মুলুক। উত্তর-দখিনে আয়তাকার কবরখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছুতেই নিজেদের সামলে নিতে পারে না। কবরের উপর উবু হয়ে এহেন বুড়োমানুষটা কাঁদে তো কার সহ্য হয়। কান্নার বেগটাকে দু'পাটি দাঁতে, ঠোঁটের মধ্যে সামাল দিয়ে তড়িঘড়ি কবর থেকে উঠে এসে গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে—ইগো ভিখু চাচা আমাদের ফেইল্যে কুথায় গিলে গো ? তুমার হাতেই এই পুণ্যির কাজটা শিখচি মুঁই।

কবর থেকে উঠে অনেকটা খেদ মিটিয়ে কেঁদে নেয় তেরালি মুলুক। যথাসম্ভব চোখ শুকিয়ে নিয়ে আবারও কবরে নামে। ভিখুর কাছেই ওরা কবর খোঁড়ার কাজটা শিখেছিল। না শিখিয়ে উপায় ছিল না ভিখুর। মাঠে-ঘাটে কাজে-কামে গেলে হঠাৎ হঠাৎ ডাক পড়ে। ও ভিখু, একটু এসু গো, জাফরের মা মরেচে। কিংবা কাদেরের দাদি মরেচে। কাজে বেরুনোর আগে কারো মরণদশা দেখলে হাতের কাস্তে চালায়

গুঁজে কোদাল হাতে তো মেবে বসে থাকা। কাজেব কামাই তো বটেই তাছাড়া এক-আধ দিন ঝি-জামাইযেব বাড়ি যাবে সে ফুবসৎ কই। এ জন্য ক্ষোভও নেই তেমন। পবকালে তাব বেহেস্ত বাঁধা।

এহেন পুণ্যেব কাজটা শেখাব জন্য তেবালি মুলুক কতদিন যে ঘুবঘুব কবেছে। ভিখু চাচা, এবাব যেদি কেউ মবে তো ডেকো আমাদেব। ভিখু ওদেব ধৈর্যেব পবীক্ষা নিযে ঠিক ঠিক শিখিযে দিযেছে। কববেব দুপাশেব গাংধাবী একমুষ্টি না বেশি কম। মুর্দাব দু পাশেব পবিসব এমনভাবে থাকবে যাতে খাতা-কলম নিযে হিসেব-নিকেশেব ফেবেস্তাবা ঠিক ঠিক বসতে পাবে। যুৎসই বসাব খামতি হলেই মুর্দাব উপব পেবশানি বাড়ে। কবুবে মুনিযদেব অভিসম্পাত। তাছাড়া কবব তৈবিব নানান বকম কাযদা-কানুন। বর্ষাব সময কবব যাতে না ধ্বসে তাব জন্য একপাশে খোল কবে বগলাই কবব। অন্যান্য সময সিন্দুক কবব। যেমন যেমন দৈর্ঘ্যেব মানুষ তেমন তেমন কবব খোঁড়া। এ বড কঠিন কাজ। কাফেবেব জান দবকাব বুঝলে তেবালি, বুঝলে মুলুক, খুঁডতে-খুঁডতে একবাব চোখেব পানি ফেলেছ তো সর্বনাশ। কবব দবিযা হবে। এক কবব পানিব মধ্যে কিযামত অব্দি মুর্দাটা হাবুডুবু খেযে কষ্ট পাবে। এসব কথা ভিখু ওদেব পই পই কবে বুঝিযে দিযেছে। মাঝেমধ্যে ওস্তাদি চোখে দেখে নিযেছে। একটু ভুলচুক হলেই কথাব চাঁটি মাবতো। বলতো—হ্যাঁবে তেবালি মুলুক, এ্যাদ্দিনে তো এই শিখলি ? লোকটা কববে শুযে কি বলবে শুনি ? ঘুম হবে এ্যাঁ ? ঝটকা মেবে হাতেব কোদাল কেডে নিযে বাকি কাজটা সমাধা কবেছে। বুঝলিবে মুলুক তেবালি, এমন কবব কাটবি যেন জ্যেন্ত মানুষেব পাঁচদণ্ড ইচ্ছে কবে।

এখন সেই ভিখুচাচাব কবব খুঁডতে গিযে মনেব মধ্যে খুঁতখুঁতনি। আব তা থেকেই ভয। হযতো পিছন থেকে আবাব ধ্যাতানি দেবে। নাঃ নেই লোকটা। বুডো ইকামতেব মাথায মাথা ঠেকিযে বুকভাঙা কান্না কেঁদে বুকে পাথব বেঁধে সমান তালে কোদাল চালায। ঝুবঝুবে মাটি পাডেব দু'পাশে স্তূপাকাবে জমা হয। এই মাটিগুলোই কবব শেষে বুকেব উপব যেঁতে বসবে। যে লোকটা আজীবন কবব খুঁডে মবল সেই ভিখু চাচাব কববে এতটুকু খুঁত বাখতে চায না তেবালি মুলুক। তবু মাঝে মাঝে হাত কামাই মানে কাজ কামাই। বাতাসটা চু গেযে কাববালাব এদিকটায ধেযে আসলেই সমস্ববে গাঁযেব মানুষেব কান্নাটা তপ্ত ফালেব ছ্যাঁকা লাগে বুকে। এইতো দিন পনেব আগেও লোকগুলো এই গাঁযে চবে খুঁটে বেডিযেছে। এ ওব হুঁকোব গালে চুমু দিযে চোঁ চা দমে ফটাফট কল্কে ফাটিযেছে। সেই লোকগুলো হঠাৎ কবে কিনা নেই হযে গেল। কবব খুঁডতে খুঁডতে তেবালি মুলুকেব হাতেব কোদাল থেমে যায। ভিখুব প্রতি শ্রদ্ধায মাথাটা হেঁটে হযে যায। সেদিন যদি না বলতো—হ্যাঁবে তেবালি মুলুক, তুবাও যেদি হাজীপুবে কাজে যাস তো ক্যামন হবে। মানুষেব খামখেযালা জানেব কি আব বিশ্বাস আছে। কেউ যদি হঠাৎ কবে চোখ বোজে তো কবব-গতি কেডা কববে শুনি ?

একথাব গুবুত্ব বুঝে ওবা আব হাজীপুবে কাজে যাবাব কথা না বললে ভিখুব নেতৃত্বে বেবিযেছিল এক দঙ্গল মনিষ। এই বাদবি থেকে তিন-চাবদিনেকেব পথ হেঁটে বর্ধমান, চব্বিশ পবগনাব বিভিন্ন গাঁযে কাজে যাওযা এমন কিছু নতুন নয। দিন পনেব আগে দফাদাব ভিখুই ফ্যালা ছকিব, ইমান আলি, তাবাবককে বলেছিল—ইগো ইমান আলি ছকিব আলিব দল পীব-পাব্বন তো এসে গেলো—

এ কথাব কিছু একটা ইঙ্গিত পেযে ওবা বলেছিল একসঙ্গে, হ্যাঁ চাচা তা বটে। কাস্তেতে কি পুবি কাটাবো ?

কেটা কেটা, যেদি মন এগোয়। বকরীদের আগে আপন আপন বিবি বালবাচ্চাদেব কাছে ফিরে আসবি।

এ কথায় চালের বাতায় জিরেন খাওয়া কাস্তেগুলো বের করে নতুন করে পুরি কাটিয়েছিল। বাদরি গ্রামকে পক্ষ কালের তালাক জানিয়ে লুঙিতে কোপনী মেরে হাজীপুরের উদ্দেশে বেরিয়েছিল। নবদ্বীপের খেয়া-নৌকোয় চেপে ভরভরন্ত গঙ্গা দেখেছিল। নৌকোয় বসে থেকে হাতের কাস্তে জলে নামিয়ে ধার পরীক্ষা করেছিল। কেমন কির কির করে জল কাটে। ওদের এই ছেলেমানুষি দেখে বকুনি দিয়েছিল—আরে এই হারামজাদার দল, ভারি তো বুদ্ধির বহর, হঠাৎ করে যেদি কাস্তে ফসকায় তো কুন চৌদ্দপুরুষ পানির তলায় থেকে তুলে দেবে শুনি ? মা গঙ্গার বুকের উপর বসি বসি বেযাদপি ?

ভিখুর কথায় ওরা গুটিয়ে গিয়েছিল প্রত্যেকেই। জল থেকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল আরো দূরে। ঢেউয়ের পর ঢেউ চোল কিট কিট চোল কিট কিট করে চিলের মতো ছুটে আসছে। পাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সাদা ফেনার জাবর কাটছে। নৌকোটাও মজা করে দুলে উঠেছিল। পারে গিয়ে ফ্যালা বলেছিল—এ বড় মজুন হল তাই না চাচা।

ভিখু বলেছিল—অতই খেস হবে তো লবদ্বীপের ঘাটে প্যাটনিগিরি করিস।

নৌকোয় চড়া পুলক-শিহরণ নিয়ে নবদ্বীপ পেরিয়ে হাঁটা দিয়েছিল নাক সোজা দখিনে। সেই হাজীপুর। ফি সনে এক-আধবার যেমন বেরোয় বাদরি থেকে কিছু কাজপাগলা খিদেপাগলা মানুষ। পথের মধ্যে চাঁপাদিঘিতে ইকামত বুড়োর ছোট মেয়ে ফুলছনের বাড়িতে ঠ্যাং ছড়িয়ে নেয়া। বাদরি থেকে বেরনোর আগে ইকামত বুড়ো খোঁজ নিতে বলেছে বারবার। ফুলছন নাকি সামনে শাউনে খালাস হবে। ছোট শিশিতে নারকেল তেল ভরে শোলার ছিপিতে মুখ আটকে সুতুলি দড়ির আংটা করে ভিখুর হাতে তুলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে ন্যাকড়ার পোঁটলার তিল কালিকলাই। বলেছিল ফুলছনের আমার দেহ ভাল নয়। এ সময় মেয়েদের তিল কলাইয়ের পিঠে খাতি খেস যায়।

নারকেল তেলের আংটায় আঙুল বাঁধিয়ে মাথায় তিল কলাইয়ের পোঁটলা নিয়ে সারা পথের পিঠ চটকে উঠেছিল ফুলছনের বাড়ি। বাবার দেশের মানুষ দেখলেই ফুলছনের মুখে হাসি ফোটে। যতই হোক দুঃখ-কষ্টের ঘর-সংসার, বাপ-মা-র দেশের কুকুরও ঠাকুরের ভক্তি পায়। সেই ভক্তিই পেয়েছিল ভিখুরা। বদনায় করে পা ধোবার জল। ফুল কাটানো কাচের গেলাসে খাবার জল। নিজের হাতে তৈরি ফুল-পাতার নকশা করা কাঁথার উপর বসিয়েছিল যত্ন করে। ভারী শরীরে দাঁড়িয়ে থেকে পাখা হাতে বাতাস করে প্রত্যেকের চুল-দাড়ি নাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভিখু আপত্তি জানিয়ে বলেছিল—অত কষ্ট নাই বা করলে মা।

না গো চাচা, রোদ গরম থেকে আসলে যখন।

আরে পাগলি রোদ গরমের কাজই তো করতে যেচি আমরা।

তা হোক। এ্যাদ্দিন পরে এলে। আঁচলে চোখের জল আর ফুটি ফুটি ঘাম মুছে ফুলছন জবাব দিয়েছিল। ইনিয়ে-বিনিয়ে বাদরির খবর নিয়েছিল। খবর নিয়েছে ইকামত বুড়োর। বাবাকে একদিন আসতে বলো। তারপর একসময বলেছে—ও চাচা, বাবার গাই বিইয়েচে ?

এ প্রশ্নে ভিখু ঠোঁট কচলায়। ইমাম আলি, ফ্যালা, ছকিরেরা পরস্পরের মুখের

নামতা পড়ে। কে জানে ইকামত বুড়োব গাইটা বিইয়েছে কি না। ঘাড ঘুবিযে তাকিয়েছিল বাদবিমুখো অহেতুক। যেন ওদিকে মুখ কবলেই ইকামত বুড়োব গাইটাকে দেখতে পাবে। অনেকটা বেকাযদায পড়ে সান্ত্বনামূলক জবাব দেয—আজকালেব মধ্যে বিয়োবে ফুলছন। তোমাব বিটাকে কোলে কবে নিযে গিযে বাঁটে মুখ লেগিযে ভবপেট দুধ খাইযে এনো।

আগাপাশতলা না ভেবে বলা ভিখুব এ কথা শুনে লজ্জাব লাল হযে যায ফুলছন। হাতেব পাখা সাময়িক থেমে যায। বিযেব দু'বছবেব মধ্যে ছেলে-মেযে না হওযাব ছুতো দেখিযে লোকটা আবাব বিযে কবেছে। বাতদিন স্বামী সতীনেব মুখ ঝাড়া। ফুঁপিযে কেঁদে ওঠে ফুলছন। ওগো ভিখু চাচা, বাপ আমাবে কুন বনবাসে পেইঠ্যে দিলো গো।

চোখেব সামনে যদি দেশেব মেযে কেঁদে ভাসায তাহলে সে দুঃখটা নিজেদেবও মন আঁচায। ইকামত বুড়োব অপবাধেব শবিক হযে যায বাদবাকি বাদবি মুনিষ। ভিখু বুক্ষ মাথায হাত বুলিযে সান্ত্বনা দেয—কেঁদেস না মা, বচ্চব অন্তব বাদবি থেকে আমবা কেউ না কেউ তো দেখে যাই। এই দ্যাখ তিল, কলাই, এই দ্যাখ নাবকেল তেল। তোব বাপ পেইঠেচে বে। একটু একটু কবে মাতায দিস। এ্যাঃ মাতা দিযে ছাতা উড়ছে যে। •

ফুলছনকে মুখে মিষ্টি কথাব সান্ত্বনা দিযে ওবা চাঁপাদিঘি ছেড়ে বেবিযেছিল হাজীপুবেব পথে। একটা দিন-দশ-বাবো আউশ ধানেব গোছায চালিযেছিল কাস্তেব পোঁচ। বিশাল বিশাল মাঠ। পুবুষ্টু শিষেব ভাবে সেজদায মাথা ঠুকছে মাটিতে। ডাকালেব বাঙা বোদ পাকা ধানেব ক্ষেতে মাদুব বিছোয। আহা বে এই মাঠ এই ধান। চোখ জুড়োয মন জুড়োয। মাঠ-চবতি বাতাসেব ঝম ঝম শব্দে মা লক্ষ্মীব নূপুব বাজে। এমন ভাবনায হাতেব কাস্তে থেমে যায বাদবি মুনিষেব। এত ভাত তেলেব দেশ আছেই বা কোন বাজ্যে। সেজন্য ইকামত বুড়ো মেযেব বিযে দিযেছে এদেশেব চাঁপাদিঘিতে। মেযে তাব সাদা ভাতেব মুখ দেখবে। কিন্তু ঐ যে পো পোযে জামাই হাবামজাদা, বিযেব সময কলমা পড়তে বাকিা সবে না তোতলা মুখে সে কিনা এহেন দেখনসই মেযেটাকে ছিঃ ঘেন্না কবে আবাব একটা নিকে—সাদী কবে।

ফুলছনেব কথা মনে হলেই বুকে ব্যথা পায ভিখু। এই দূব দেশে না আছে ভাই-ভগ্নী না আছে খালা। ফুফু। যেতে-আসতে দু'বাব দেখা না কবে কি ফেবা যায। বাড়িতে পা দিলেই ইকামত বুড়ো থুঁতনিতে লাঠি ঠেকিযে দাঁড়িযে প্রশ্ন কবরে, হ্যাঁগো ভিখু, ফুলছনেব আমাব খবব কি? বাড়ি আসাব পথে কিছু বললো-টললো? মেযে আমাব খুব হেজে গিযেচে? পাঁচ মিশালী খবব ঠুকবে ঠুকবে জিজ্ঞাসা কববে। তাই এই দ্বিতীয বাবেব দেখা কবাটা জবুবি। বাদবিব মেযে ফুলছনেব একবছবেব শেষ সংবাদ। ইকামত বুড়োব সেই বযেসকাল নেই যে ছ'মাস অন্তব সুখ-দুঃখেব খোঁজ নেবে। আগেব পাঁচটা মেযেব বাড়ি বেড়াতে বেড়াতে বযসেব ছাতা ধবেছে। কিন্তু বাড়ি আসাব পথে ফুলছনেব সঙ্গে দেখা কবা মানে মেযেটাকে আবাব কাঁদিযে আসা। যতক্ষণ চোখেব-আড়াল না হবে ততক্ষণ পথেব উপব দাড়িযে থেকে চোখ মুছবে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলবে—ওগো ভিখুচাচা, আবাব একদিন ঠ্যাক কবে এসু।

এক এক কবে বাদবি কাস্তেব পোঁচে কেটে যাচ্ছিল দিন। প্রতিদিন হাজীপুবেব মাঠে পাকা ধানেব গোছায গোছায ক্ষযে আসছিল কাস্তেব ধাব। শবীবে যাবতীয ঘাম ঝবে ঝবে পড়ছিল মাটিব ফাটলে। বাতাসে বইছিলো নোনা ঘামেব গন্ধ। বোদেব তাপে ভাপে আধসেদ্ধ শবীব নিযে উঠে এসেছিল ভিখুবা। হাজীপুবেব বড় জোতেব মালিক

আবদালি মিয়াব সামনে এসে বলেছিল—শুনচ গো বড কত্তা, আজ থেকি তুমার কাজে ক্ষেন্ত দিলাম। আল্লা যেদি হায়াত বরাত দেয় আবারও দেখা হবে সামানে সনে।

একথা শুনে আবদালি মিয়ার মুখে দাড়ি নড়ে উঠেছিল—কেমন কথা হ্যাঁগো দাওয়াল বিটা। বকরীদের নামাজটা পড়ে যাবে না?

পিত্যেকবার তো দেশের মাটিতে পড়ি।

তা বলে আমাদের মাটিটা নাপাক কিসের?

অমন কতা বলে না বড় কত্তা, এ জমিনও আল্লার ছিরিষটি, মুখের কলমাও তার বয়ান।

বড মাপেব ইমানদার, দিলদার মানুষ আবদালি মিয়া। আবারও বলেছিল ভিখুদের—পীর-পাব্বন বলে কথা। ফুরফুরা শরীফের ওস্তাদজি এসে বকরীদের বয়ান করেন। শোনাটাও নেক কাজ।

রাগ করেন না বড় কত্তা। থাকবার নিয়েত করে তো আসিনে। বাড়ি না গেলে বৌ বাল বাচ্চা হা-পিত্যেশ করে শুধু চোখির পানি ফেলবে।

থাকলে কিন্তু ভালই করতে দাওয়াল বিটা। বাড়ি বাড়ি কোরবানীর গোশ আরো সব পোলাও কাবাব, খোরমা খেঁজুর...তোমরা হলে মেহমান দুবেলা খাওয়াতে পারলে খোদার কাছে আমরাও পাই কিছু নেকি-পুণ্যি। ভেবে দেখ, বাড়ি বাড়ি জিরাফত-নেমতন্ন।

গোল হয়ে বসে গিয়েছিল বাদরি মুনিষ। ইমান আলি ফ্যালা ছকির তাবারক সহ দফাদার ভিখু। এমন লোভনীয় খাবার আয়োজনে জবান বন্ধ। ভরপেট গোশ, পোলাও খোরমা খেজুর জীবনে কি চেখে দেখেছে। ফ্যালা মুখ থেকে লতিয়ে নামা লালা সুড়ৎ করে টেনে বলে, বড় কত্তা কাথাটা খারাপ বলেনি।

ইমান আলি কাস্তের বাঁটে ফ্যালার কোঁকে একটা জোর গুঁতো মেরে বলে, খাবি তো শালা একদিন। চেরজেবনটা মুখটা বেজ্জত করবি?

ইমান আলির কথাটার তারিফ করে ভিখু বললে—একদিনের ভাল-মন্দ খেয়ি মুখটা আস্কারা পেলে বাড়ি যেয়ে কচু-ঘেচুতে মন ভরবে না। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললে—শোনেন বড় কত্তা, জেবনডা তো পথে পথেই কুরবানি দিচি, তা বোললেন যেখন তেখন ভাগ্যি থাকে তো এই হাজীপুরের মাটিতে আপনের খাতিরে সেজদা দিয়ে যাবো একবার।

এরপর আবদালি মিয়া কথা বাড়াননি। ভিখুরাও নগদা-নগদি মুনিষের দাম মিটিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছিল। ফুলছনের সঙ্গে বছরওয়ারী দেখা করার জন্য দাঁড়িয়েছিল চাঁপাদিঘিতে। কই গো মা ফুলছন, কোমনে গিলে? দেশের মেয়েকে এরকম দরদী গলায় ডাক দিয়েছিল ভিখু বাইরে থেকেই। তারপর বাড়ির ঢুকেই কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। ঘরে বাইরে রাজ্যের অচেনতা মেয়েমানুষ। চাপা গুঞ্জন ফিসফিসানি। ওদের কেউ কেউ ভিখুদের দেখে মাথার কাপড়ে ঘোমটা দিয়ে লজ্জার খিল আঁটে। কি ব্যাপার? ধন্দে পড়ে বাদরির ঘরফেরতা মুনিষ জন। ইমান আলি, ফ্যালা, ছকিরেরা পায়ের উপর পিঁপড়ে পিষে ঠায় দাঁড়িয়ে। তবে কি মেয়েটাকে মারাধরা করল। তা যদি হয় দরকার নেই ফুলছনের চাঁপাখালির দোজখ পোহানো। দেশের মেয়েকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাবে দেশের বাড়িতে। বলবে, খাস না খাস মা শুকনো ডেঙায় থাক, পঞ্চায়েতের নোন পাবি, ইলিপ খাবি। এ রকম হাবিজাবি ভাবতে ভাবতেই ভিখু দেখতে পেল, তোতলা জামাইটা উঠোনে বাবলা কাঠের গুঁড়িতে বসে মনের সুখে

বিড়ি ফুঁকছে। ওকে শুধোতে যাওযাও বড় ঝক্কি। উত্তব পেতে পাযে ঝিনঝিনানি ধবে যাবো। ওগো মা জননীবা, কি ব্যাপাব গো ? ভিখু জিজ্ঞাসা কবল বাইবে দাঁড়িযে থাকা মেযে বৌদেব।

কেনে গো মিনসে, তুমাদেব অতো খোঁজ কিসে ? বাড়ি কুথায ? না জেনে না শুনে বাড়িব মধ্যে ? কথাব বাণ মাবে একজন ঠোঁটকাটা মেযেছেলে।

কি বলবে ভিখু। এযে ঘোমটাব মধ্যে খ্যামটা গাওযা। মেযেলোকটাকে চিনবাব চেষ্টা কবে হদিস কবতে পাবল না। ইচ্ছে কবল একবাব বলেই ফেলে, বিযে যেদি হতো আমাদেব গঙ্গাপাবে ত্যাবে দিতাম কষিযে বিদেব বাখানি অমন ঠোঁট-ফাটানি মুখে।

অপমানে ঝলসে যাচ্ছিল বাদবি মুনিষদেব মুখ। এই ভিন তালুকে মেযেমানুষেব কথাব ঠেস যে জষ্টিব ভাপ থেকেও জ্বালা ধবে। যত বাগ পড়ল তোতলা জামাইটাব উপব। এমন বোকা বজ্জাত জামাইটা কিনা শুনে থম মেবে বসে থাকল। আবে বাপু, মেযেটাকে এখনো তালাক দিসনি যখন তখন তো আপ্ত লোক। বল একবাব, আমাব শ্বউবেব দ্যাশেব নোক কুটুম। মুখে বললে ভিখু, গঙ্গা পাবেব বাদবিতে মা জান। বাড়ি যেবাব পথে দ্যাশেব মেযেডাব সঙ্গে একটু চোখেব দেখা কবে যাব।

সময বুঝে এযেচ যখন তখন ভালই কবেচ মুবুব্বি। বাব বাইবে বস। ফুলছন খালাস হইচে। অন্য একজন লোকেব গলা।

এতক্ষণে ব্যাপাবটা পবিস্কাব হলো। তাইতো, বাববাড়িতে না বসে একেবাবে ভেতবে সেঁদিযে যাওযা বড্ড বেযাদপি। দেশেব মেযেব যখন এই অবস্থা তখন কি ভাল মন্দ খোঁজ না নিযে ফেবা যায। নে যা, তাড়াতাড়ি কব। আত্মকথনে বাব বাড়িতে বসে থাকল বিদেশ খাটা মুনিষেব দল। কখন আঁচিঘব থেকে ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ ছিটকে আসে।

হাতে-পাযেব যখন কাজ নেই তখন কতক্ষণ আব শুধু শুধু বসে থাকা যায। ইমান আলি, ফ্যালা, ছকিব, তাবাবক ধৈর্য হাবায। মাটিতে পা ঠুকে ঝিনঝিনানি কাটিযে বিড়ি ধবায। এই বিড়ি খেতে খেতে ফুলছন খালাস হয তো হোক। আমবাও এতক্ষণে জামিনে মুক্ত হই। অনেকটা এই বকমেব ভাবনাব ছুতোয আবাব বাদবি মুনিষেবা বিড়ি ধবায। বিড়ি পোড়ে। ধোঁযায ধোঁযাব বাববাড়িতে কুযাশা জমে। বেলা যায। খিদে বাড়ে। ভিখু চাচা, কি হল ? আব কতক্ষণ ?

দুঃ শালা, আমি কি কবব ?

তা হলে কি হাঁটা জুড়ব ? শবীবে ছটফটানি ধবে বাদবি মুনিষেব।

ভিখু ওদেব মুখ থাবাড়ি দিযে বসিযে বাখে। অতো নটব-পটব কিসেব ? পবক্ষণে নিজেও অস্বস্তিবোধ কবে। আবে বিটি, যাবাব পথে পাক বাঁধালি। একেবাবেই কাণ্ডজ্ঞান নেই দেখছি মেযেটাব। গঙ্গা পাবেব তিল কলাইযেব পিঠে যেই প্যাটে পড়ল অমনি—এবকম চিন্তাব মধ্যেই ট্যাঁ-ট্যাঁ, হুযা হুযা কবে সদ্যোজাত শিশুব কান্না উড়ে এলো কানে। ভিখু বাববাড়ি থেকে বেবিযে এসে জিজ্ঞাসা কবল—কি বাচ্চা হল শুনি ?

এঁড়ে বাচ্চা।

ব্যস, বসে থাকাব প্রযোজনীযতা ফুবোয। কাপড় ঝেড়ে হাঁটা জোড়ে বাদবি মুনিষ। পিছন থেকে মেযে বউদেব কেউ কেউ চলোকি কাটে, ওগো খোকা মামু নানাবা, মিষ্টিমুখ কবে গেলে না ?

পাযেব গতি বাড়িযে একহাতে জোব ট্যাঁক খামচে ধবে অন্য পিছনে নাড়ে ভিখু।

আমাদের মেয়েটা কষ্ট করল আর তুমরা খাবা মিষ্টি? এ আবার কুন দেশি আইন গো তুমাদের। তা হবে না। তা হবে না।

ফুলছনের ঐটুকু ছেলে পেটে থাকতে যা দেরি করিয়ে দিল নবদ্বীপের ঘাটে এসে তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। শাউনের শেষ বিকেল পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে আসছিল ক্রমশ। পিছনে একটা কালো মেঘ চাঁপাদিঘির মাটি ছুঁয়ে দ্রুত উঠে আসছিল। ভিখুরা ধুকুর দৌড় দিয়েছিল। এখনই যদি মেঘ ডেকে ঝড় বয় বৃষ্টি হয় তো মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেয়ালভেজা। ফাঁকা মেঠো পথে পা চালিয়েছিল জোর। চারপাশের ধেনো জমি থেকে উড়ে আসা ম ম গন্ধে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছিল। শ্লথ হয়ে আসছিল গতি। বিকেলের নরম আলো নিমেষে উধাও। মেঘের ছায়ায় নেমে আসে মাটির বিষণ্ণতা। হাঁফিয়ে উঠছিল ভিখু। ইমান আলি, ফ্যালা, ছকির, তারাবকের পায়ের মাপে পা ফেলতে না পারলেও কথার পাঁয়তারা কেটে বলেছিল— য্যাবে যা চাঁপাদিঘির নোতন মামুরা, খেয়া নৌকো ঠেকিয়ে রাখ গে। একা নদী পাঁচ ক্রোশ।

এত হাঁফাহাঁফি করে পায়ে পায়ে বাকি পথটুকু ঠেলে নবদ্বীপের ঘাটে পৌঁছানোর আগেই আকাশের বদ মেজাজ দেখে খেয়া নৌকোটা ছেড়ে দিয়েছিল মাঝি। পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থেকে সমানতালে হাঁফাচ্ছিল ভিখু। নৌকোটা মাঝ নদীতে পৌঁছাতেই দেখতে পেল উদ্দাম ঝড়ের তাণ্ডব। গঙ্গার বুকে বেসামাল ঢেউয়ের নাচানাচি নৌকোটা নিয়ে যেন মস্করা করে। পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থেকে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল ভিখুর। দুহাত জলের দিকে বাড়িয়ে অভয় দিয়ে টান গলায় চেঁচিয়ে বলেছিল—ওরে ইমান আলি, ফ্যালা, ছকির, তারাবক মোটেই ভয় করিসনে তোরা। ওপারে যেয়ে আমার জন্যি অপেক্ষা করিস। সামনে ঈদে একজামাতে নামাজ পড়ব। বুকে বল বাঁধ। আরো চেঁচায় ভিখু—বুকে বল বাঁধরে বা'দরি জোয়ান সব। খবরদার দোয়া কালাম মুখে আনিসনে। মা গঙ্গা ব্যাজার হবে। তারপর নিজেই মা গঙ্গার মনতুষ্টির জন্য বলে ওঠে -হেই মা গঙ্গা, তোর চরণে পেন্নাম হই। জোড়া ডাবের মানত দেবো। চোপ খা। চোপ যা।

ভিখুর এ আর্তনাদ মা গঙ্গা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ঢেউয়ে ঢেউয়ে। দমকা বাতাসে মুখের কথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল পাড় ছাড়িয়ে চাঁপাদিঘি হাজীপুর ছাড়িয়ে আরো দূরে। কথা হারিয়ে ফেলেছিল সে। দু'চোখের দৃষ্টি একত্র করে গভীর বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছিল, খেয়া-নৌকেটার পাক খেয়ে ডুবে যাওয়ার দৃশ্য। দেখতে পেয়েছিল, ইমান আলি, ফ্যালা ছকির, তারাবকের মরণ বাঁচন লড়াই। জলের উপর বাঁকা কাস্তের আস্ফালন। তারপর আকাশ ভেঙে নেমেছিল বৃষ্টি। ঝমঝম। ছমছম। ওপারের অস্পষ্টতা হামা দিয়ে উঠে আসে এ পারের পাড়ে। নদীর বুকে নেমে আসে আশ্চর্য রহস্যময়তা। পায়ের পাতার সন্ধ্যা নামে। রাত হয়। বকরীদের মুখচোরা চাঁদ আকাশের দেয়ালে সিঁদ কেটে মিলিয়ে গিয়েছে তার আগেই।

দুই

অবশেষে ভিখুর কবর খোঁড়াটাও শেষ হল। তার মানে পাঁচ-পাঁচটা কবর খতম করে কোদাল হাঁফায়। গায়ে মুখের চোখের ঘাম মোছে তেরালি মুলুক। এখন কাজ বলতে নিজের নিজের জায়গা বুঝে মুর্দাগুলোকে শুইয়ে দেয়া। জনপিছু একটা কবর করার উদ্দেশ্য তো যাতে শোবার জায়গা নিয়ে গুঁতোগুঁতি না লাগে। কিংবা একজনের 'আজার' অন্য জনের চোখে না হোড়ে। ছের ছের বান্দার গোর গোর হিসাব। তা নইলে কার

শাস্তি কাব ঘাড়ে বর্তায কে জানে।

তবে শাস্তি হোক আব শাস্তিতেই থাক সে সব তো কববে গিযে। এখনো পর্যন্ত একটা লাশও এসে পৌঁছাযনি। হা-পিত্যেশ কবে তাকিযে আছে গোটা বাদবি। কাল সন্ধেতে এই কু খবব বযে এনেছে স্বরূপগঞ্জেব নিতাই মিস্ত্রি। নবদ্বীপেব ঘাটে নৌকোডুবিতে মানুষ মবেছে। জলেব তলায ডুব দিযে সবকাবি ডুবুবিবা একটা একটা কবে লাশ তুলেছে। পাড়েব উপব কাতাবে কাতাবে দাঁডিযে থাকা মানুষ দেখেছে প্রত্যেকবাব একটা কবে কাস্তে হাতে মুনিষ উঠেছে। পবনেব কাপড় সবে যেতেই হিন্দু মুসলমান আলাদা কবে চিনতে ভুল হযনি কাবো। বে-ওযাবিশ লাশেদেব শনাক্ত কবতে মুসলিমঅধ্যুষিত গ্রামগুলোতে খবব গিযেছে মুখে মুখে। অবশেষে এই বাদবিতে। বেজাত নিতাই মিস্ত্রিও চোখেব জলেব টাল সামলাতে না পেবে ফুঁপাতে ফুঁপাতে বাড়ি ফিবেছে। তাব পিছু পিছু বাঁশ-খাটুলি নিযে ঝটকা মেবে বেবিযে পড়েছে জোযান-যুবক, ছেলে-ছোকবাব দল। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পিছু পিছু গিযেছে চাচা, ভাই, নিকট আত্মীযবা। এখন এই এতখানি বেলাতে কোন লাশ না এসে পৌঁছানোয উদ্বিগ্ন সকলেই। সাবা বাতেব মধ্যে চোখেব পাতা বোজেনি, কাঁদন থামাযনি। স্বজন হাবানোব বিলাপে হু-হু বুক ভাঙে। মৃতদেব স্মৃতিচাবণ কবে এক নাগাড়ে কান্নাব বোল ওঠে। কাঁদে ভিখুব বউ, ও আমাব কোপনীমাবা মবদ বে তুমি কাঁচা কুলেব খাটা খাতে চেযেলে-এ। পিছনে দাঁডিযে থেকে তিন বছবেব ছেলেটা শোনপাপড়িব বাযনা আদাযে মাথাব চুল ছেঁড়ে। কবিমন কাঁদে এক নাগাড়ে। ঝাপসা হযে আসা চোখ মুছে নেয শাড়িব আঁচলে। তাবপব সতর্ক চোখে পথেব দিকে তাকিযে থাকতে থাকতে এক মুহূর্ত কান্না থামায। কাব লাশ ? আবেগে দ্বিগুণ বেগে কাঁদতে কাঁদতে খাটুলিব লাশেব দিকে ছুটে যায কবিমন। পচা লাশেব গন্ধ নিযে ফিবে আসে দারুণ হতাশায। বুক চাপড়ায। ইমান আলিব আত্মীযবা ঘিবে বযেছে খাট।

একটা একটা কবে চোখেব সামনে দিযে বাদবি মুনিষেব লাশ আসে। বাব বাব ছুটে যায কবিমন। এবাব নিশ্চয তাদেব লাশটা আসবে। মনেব মধ্যে সেই মানুষটাব খাটেব উপব শবীবটা ভেসে ওঠে। বুকেব মধ্যে ছড়িযে পড়ে শোকেব তীব্রতা। অন্যান্য বাদবি মুনিষেব দাফন কাফন হয। কাববালাব সমতল মাটি রূপান্তবিত হয কববে। বাববাব চবম ধাক্কা খেযে কবিমন ফিবে আসে। ফালতু কাঁদন কাঁদে ফ্যালা, ছকিব, ইমান আলি, তাবাবকেব লাশেব কাছে। ওদেব ভাই-বাবাবা কাঁদলে কোথাও যেন আনন্দেব ছোঁযাচ আছে। শক্তিনগবেব মবাব গুদোম থেকে ডোবা লাশ চিনে আনা শুবু কবেছে জোব কান্না—ও বাপ তুমি নেকিনি মবে গিযেচ পানিতে ডুবে ? ভিখু পা ঝাড়া দেয—নাবে মা মবিনি।

তিন বচ্চব পব শুধু হাতে এনু বাবাগো বাবা। আমেনাব পব পালা কবে ফতেমা কাঁদে। আনন্দে কেঁদে ফেলে কবিমন।

শেষ পর্যন্ত ভিখুব উদ্দেশ্যে খনন কবা কববটা নিযে ফ্যাসাদে পড়েছে সকলেই। যাব জন্য কবব খোঁড়া সে লোকটা তো দিব্যি বেঁচে আছে। এহেন জ্যান্ত মানুষটাকে কি কবে কববে ঢোকানো যায। জ্যান্ত আছে তাব প্রমাণ ভিখু তো নিজেব পাযে হেঁটে এতখানি পথ পেবিযে বাড়ি এসেছে। এখনো এ ওব সঙ্গে হাঁ হুঁ কবে কথাব সায দিচ্ছে। চোখেব পাতায পলক ফেলছে। নিজেব সঙ্গী সাথীদেব মবাব খববেব কাঁদাকাটি কবছে। এব থেকে বড় প্রমাণ আব আছেই বা কি। গাঁযেব যেসব কাঠামোল্লাব দল দু পাতা হাদীস আব এক পাবা কোবান পড়ে তিবিশ পাবাব ফতোযা দেয তাবা এব

নিয়মবিধি নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা শুরু করেছে। তবে একটা বিষয়ে সকলে একমত যে কাটা কবর যদি আল্‌গা থাকে তো কেয়ামত অব্দি কবরের মধ্যে দোজখের আগুন জ্বলবে। কারবালার তাবৎ মুর্দা সেই আগুনের তাপে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। কবরের জবান খুলবে। ফরিয়াদ জানাবে—ইয়া আল্লা আজ পর্যন্ত না খেয়ে বড় ভুখায় আছি, আমার খোরাক দাও। আল্লা তখন কবরের কথা শুনবে না তো মিথ্যেবাদী মানুষের কথা শুনবে ? বলবে—যারা তুমাকে পয়দা করেছে খোরাক হিসাবে তাদেরকে দিযে দিলাম।

বিভিন্ন মানুষের মুখে মুখে এইরকম বিকৃত ফতোয়া শুনে ভিখুর কবর খোঁড়া মুনিষ তেরালি মুলুক এমনকি ওদের মা-বাবা, ভাই, বোনেরা কেঁদেকেটে অস্থির। দমাদম ভিখুর পায়ের উপর মাথা কুটছে। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ও ভিখুচাচা, এ তুমি কোন্ মুছিবতে ফেললে গো। তুমার জন্যি দোজখবাসী হয়ে গেনু গো।—

পায়ের পাতা গুটিয়ে নিলেই ওদের মাথা যে নির্ঘাত মাটিতে ঠোক্কর খাবে তা ভিখু পরিষ্কার অনুভব করে। ওদের শান্ত করার কোন ভাষা খুঁজে পায় না সে। এই পাপিষ্ঠ পায়ের পাতা যাক ছেঁচে। ইচ্ছে করে নিজেই কারবালার কবরে লাশ হয়ে শুযে পড়ে। কি দরকার এই তরতাজা ছেলে দুটোকে দোজখে পোড়ানো। এতে করে সেও কি বেহেস্তবাসী হবে ? মাথাটা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে উবু হয়ে বসে ভাবতে থাকে ভিখু। কেন এই ফিরে আসা ? কেন সে উস্কে দিল কারবালাতে জাহান্নামের আগুন। হাত-পা কাঁপতে থাকে। ক'দিনের উপবাসে মাথাটা ঘুরে ওঠে। তেষ্টায় গলার ভিতরটা রোজ হাসরের মাঠ হয়ে যায়।

গ্রাম ভেঙে ছুটে আসা মানুষের মুখ আশ্চর্যরকম থমথমে। ভিখুকে সামনে রেখে নিরাপদ দূরত্বে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। যেন ওই লোকটা সাক্ষাৎ দোজকের প্রতিমূর্তি। করিমনের চোখদুটোও ভিখুর মুখের উপর থমকে পড়েছে। এতদিন পরে ফিরে আসা লোকটাকে হাত-পা ধুইয়ে ঘরে তুলে সুখ-দুঃখের খবর নেবে। কিংবা এই দুর্যোগে কেমন করে হাতে-পায়ে জান নিয়ে বাড়ি ফিরল। তা না দোজখের আগুন মুখে করে বাড়ি উঠল !

মৃত বাদরি মুনিষের মা-বোন আর সদ্য বিধবা বউরাও ভিখুর বাড়িতে। কাঁদনের জেরায় ধস্ত করেছে তাকে। বকরীদের চাঁদে আমার তাজা খাসি কুন গঙ্গায় কুরবানী দিযে এলে গো—

যে মানুষকে নিয়ে এতসব কাণ্ড সেই মানুষটার কোন বিকার নেই। না-জবাবী হয়ে মাথটা গুঁজে দেয় হাঁড়িকাটে। চারপাশে ঘিরে ধরা মানুষের জটলায় অবরুদ্ধ বাতাস। জোরে শ্বাস টানতেও ভয় হয়। মাথার উপর ঝাঁঝালো রোদের তাপ শুকনো পিঠের উপর গা ঘষে। ঘেমে উঠছিল ভিখু। এও এক আজাব। শাস্তি ভোগ। বুকের মধ্যে জমে ওঠা ব্যথায় আর অনুশোচনায় একবার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল—হেই বাদরির ভাই বিরাদার, আমিই আজরাইল। বাদরি মুনিষের জান কবজের বদলা নে।

জনতার ভিড়ে ভিড়ে ছয়লাপ মানুষের নিঃশ্বাসে তেতে উঠছিল মাটি। বাদরি মানুষের মাথা থেকে হাত নামল মোল্লা মহলের মুখের কথায়। প্রবীণ হালাল মুন্সী ফতোয়া জারি করলেন, যদি ভিখুর বদলে ওর সমান মাপের কলাগাছ কেটে দাফন-কাফন করা হয় তো প্রত্যেকে আজাব থেকে রেহাই পাবে। এমন কথায় বাদরিসহ পাঁচ গাঁয়ের উৎকণ্ঠিত মানুষ পায়ের পাতায় নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হলো। হাদীস

কুবান দুনিযা থেকে উফাৎ হয়ে হযে যাযনি তাহলে।

যে বকম কথা সে বকম কাজ। হালাল মুন্সী সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—ভিখু ?

হাঁটুব মধ্যে থেকে মাথা তুলল ভিখু।

তোমাকে গোছল কবতে হবে।

আমাকে ? খসখসে গলায বললো ভিখু।

হ্যাঁ, তুমাকে নিযেই তো আল্লাব আবশ কাঁপছে। দাঁড়াও কেবলামুখীন হযে।

হালাল মুন্সীব ভাষাব কেবামতিতে ধন্দে পড়ে ভিখু। ঘোব লাগা চোখে উঠোন জুড়ে মানুষগুলো পাক খাচ্ছে যেন। ভিখু উডে দাঁড়াল কোনমতে।

হল না হল না। কেবলামুখী বুঝলে না ? এক পা গোবে ঢুকিযে বসে আছ। মৃদু ধমকে উঠলেন হালাল মুন্সী। তাবপব নিজেই কলেব পুতুলেব মত ঘুবিযে দিযে বললেন--এই যে এই দিক, কাবা শবীফ। বল, ওযাস্তাগ তেবুল্লাহে লানা...

অতঃপব শুবু হল মুর্দাকে গোছল কবাব পদ্ধতি। দামি সাবান, আতব, গোলাপ জলে ভিখুব গোছল। নতুন গামছায মুছিয়ে দেযা হল গা। অযত্নে বেড়ে ওঠা একমুখ দাড়ি, যাব ছাযায ঢেকে আছে নিজেব সিনা। হালকা বাতাসে কাঁপতে থাকা দাড়িতে ছাযা নড়ছিল। সে অবস্থাতেই ওকে নিযে যাওযা হল কলাতলায। দাঁড কবিযে কাটা হল মাথাব মাপে ফলন্ত কলাগাছ—খ্যাচ। চিৎকাব কবে উঠতে চাইল ভিখু। পাবল না। সামনে হালাল মুন্সী। হাঁটু ছাড়িযে নেমে আসা পাঞ্জাবি। মাথাব উপব উপুড় কবা গোলটুপীব আচ্ছাদন। সম্পূর্ণ ইসলামি লেবাস। মুখেব পানে বঞ্জিত ঠোঁট নড়িযে বললেন ভিখু ঠিক থেকো।

একই পদ্ধতিতে আতব গোলাপ এবং দামি সাবানে মাজাঘষা কবা শুবু হল কলাগাছটাকে। ফ্যাবাত শব্দ কবে হাতেব টানে একফালি কলাব ডেগু উঠে আসতেই গোছল কবানো মানুষগুলো হাঁ হযে গেল। প্রশ্নটা এই, ঐ কলাব ডেগুটাব কি হবে। হাতে তসবি গুনতে গুনতে থেমে গেলেন হালাল মুন্সী। বললেন--ভিখুব ভাগ্যি ভাল। নির্ঘাত বেহেস্ত যাবে ঐ কলাব খোলায চড়ে।

এ বকম একটা আগাম সুখববে ভিখুব প্রতি মানুষেব আকর্ষণ গেল বেড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ হুমড়ি খেযে পড়ছে দেখাব জন্য। যে লোকটা দোজখেব আগুন নিযে কিছুক্ষণ আগে বসেছিল সে লোকটা এমন নেকবান ! আতব গোলাপেব জলে সদ্যস্নান কবা ভিখুব সাবা শবীব থেকে বেহেস্তেব খসবু উড়ছে। মানুষেব মুখে মুখে উচ্চাবিত কলমা, দোযা-দবুদে বিবাজ কবছিল এক থমথমে আবহ।

নিযে আসা হল প্রতীক মুর্দা কাটা কলাগাছ। হালাল মুন্সীব নির্দেশে বাবোযাবী শববাহী খাটে সযত্নে নামালো কযেকজন পবহেজগাবী মানুষ। হালাল মুন্সীব তৎপবতা এখন আবো বেশি। হাতে ধবা ভিখুব জন্য নিযে আসা ধবধবে কাফন। দুনিযা ছেড়ে যাবাব আগে ঐ এক টুকবো কাফনই ধনী গবিবেব শেষ পাওনা। ভিখু দেখছিল বিস্ময়ে। কাফনটা কলাগাছেব সঙ্গে জড়িযে ফেলতেই অবিকল মুর্দাব আকাব পেল। ফুঁপিযে কেঁদে ফেলল সে। উব চেযে আমাকেই দাফন কব মুন্সী বাবাজি। এ মুখ আব দেখাতি পাবচিনে। ইমান আলি, ফ্যালা ছকিব, তাবাবকেব পাশে কবব দাও মোবে হুঁ।

ভিখুব কান্নায কেঁদে ওঠে কবিমন। পাড়া-পড়শিব বৌ-ঝিবা কেঁদে কেঁদে কবিমনেব কান্না থামানোব চেষ্টা কবে। বুঝ দেয অমন কবে চোখিব পানি ফেলো না। উনি তো সত্যি সত্যি মবে যাযনি।

ভিখু ? হালাল মুন্সী ডাক দিল।

খাটিয়ার উপর শোয়ানো কলাগাছ। সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মৃত্যুদশা দেখছিল ভিখু। দারুণ মর্মযন্ত্রণায় দুমড়ে যাচ্ছিল মুখ।

ভিখু? ধমকে নিলেন হালাল মুন্সী। অমন করে কাঁদলে চোখের পানিতে আরাফতের ময়দান ভেসে যাবে যে।

কিছু বল মুনসী।

বলছি বউয়ের কাছ থেকে ছাড়ানটা চেয়ে নাও এবার।

ছাড়ান! আশ্চর্য গলায় বললো ভিখু।

হ্যাঁ হ্যাঁ। জীবিতকালে বউকে মারাধরা করলে তার মনে তো একটা দুঃখ থাকে। অনেক কিছুই তো বউকে দিতে পারনি। ভাল খাওয়া পরা।

বুকের ভিতর থেকে হাহাকার উথলে ওঠে। ভাল খাওয়া-পরা, সেকি কোনদিন দিতে পেরেছে তাকে? মুখমিষ্টি কথার সোহগই বা দিতে পেরেছে কতটুকু? কি আছে তার? পেটের খিদে মিটোতেই তো করিমনকে এই বাদরিতে একলা থুয়ে কতবার চলে গিয়েছে চাঁপাদিঘি, হাজীপুর। কাস্তের পোঁচে পোঁচে পাকা ধানের ঝন ঝন শব্দে খিদেটা ছড়িয়ে দিয়েছিল সেই মাঠে। বাতাসে বাতাসে। অসহায়ভাবে বউয়ের দিকে তাকাল।

বিয়ের সময় দেনমোহর কত বাঁধা ছিল মনে আছে।

ভিখু সময় হাতড়ায়। এতদিন যে সে করিমনকে বিয়ে করে ঘর করছে তা তো মনেই হয়নি। একই বাড়িতে যেমন করে সে থাকে যেমন করে করিমন থাকে তেমন করেই তো আছে তারা। বছর অন্তর সে যেমন বাপ হয়েছে করিমনও মা হয়েছে। বড় হলে বিয়ে দিয়েছে। তারপর কোনদিন মনে হয়নি দেনমোহরের কথা। মাথা নেড়ে বলল, না।

মানুষ বউ পেলেই দেনমোহরের কথা ভুলে যায়। মোচলমানের গজব কি এমনি আসে? নিদেন পক্ষে একটা গয়না গড়িয়েও বাপু দেনমোহরের দায় থেকে খালাস নিতে পারিস?

লাঠিতে ভর দিয়ে ভিড়ের মধ্যে মানুষের প্যালা গুঁতো খেয়ে কাছে দাঁড়ালো বুড়ো ইকামত। বললে, ভিখুর বিয়ে হয়েছে সেকি আজকের কথা? তখন হেঁদুস্তান পাকিস্তান হয়নি। আমার সামছের আলীর মোচলমানি হয়েছে সেবার।

ইকামত বুড়োকে দেখে চাঁপাখালির ফুলছনের কথা মনে পড়ে ভিখুর। মেয়ে তার খুব কষ্ট করে ছেলে বিইয়েছে। এরকম দুর্ঘটনা না হলে সুখবরটা অনেক আগেই দিতে পারত সে। ইকামত বুড়োর দিকে থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মাটির দিকে তাকাল ভিখু।

মাথার টুপিতে ফুঁ লাগিয়ে হালাল মুন্সী খেদ করে বললেন, যখন বিয়ের সন-তারিখ নেই, দেন মোহরের ঠিক নেই তখন একসঙ্গে ছাড়ানটা নিয়ে নাও ভিখু। বলো—তুমার কাছে যদি কোন অন্যায় করে থাকি তার জন্য আর দেনমোহরের দায় থেকে আমাকে ছাড়ান দাও। বলো ভিখু বলো। তুমার ভাগ্য ভাল বেঁচে থাকতে সামনাসামনি এমন কথাটা বলতে পারছ। ভিখুকে বউয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন কেরামত মুন্সী।

এই কথাটা এমন পরিস্থিতিতে বলাটা কত কঠিন হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে ভিখু। সামনে বসে করিমন। বুকের উপর ঘুমিয়ে থাকা দামাল ছেলে তমাল। মুখ খুলতে গেলেই ভাঙা কান্না ছড়িয়ে যাবার ভয়। তবু মানুষের তাগাদা বাইরে থেকে—সামান্য কথা বলতে এত দেরি?

শেষ পর্যন্ত বউয়ের চোখ চোখে রেখে বলতে শুরু করল, তোব কাছে—

শুরুতেই ধমকে ওঠেন হালাল মুন্সী, এতদিন যা বলেছ বলেছ আজকেব দিনে বউকে তুমি বলতে দোষ কি।

আবার মানুষের গুঞ্জন উঠল। মাথা ঠাণ্ডা কর ভিখু। বল বল। দু'তিন জন মানুষ সোজা করে ধরে বসিয়ে রাখল ওকে।

নতুন করে ছাডান বয়ানটা বলা শুবু হল আবার। হালাল মুন্সী কাটা কাটা উচ্চারণে শিখিয়ে দিচ্ছেন। ভিখু বলতে লাগল –তুমার কাছে যেদি কোন অন্যায় করে থাকি তারজন্যি আর—

গলাটা খুজে আসছিল। পাশের মানুষে সাহস দেয়--প্রায় হযেচে। প্রায় হয়েচে। বল বল!

গলার তাবৎ শক্তি একত্রিত করে শেষ কথাটা বলে ফেলল ভিখু, আমাকে দিল খুলে খালাস দাও।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল করিমন। ওগো তুমার কাছে সোনা দানা গযনা গাঁটি চাইনি গো। আমি তমালেরে সেনা বলে পেইচি গো। তমালকে বুকে জডিয়ে কাঁদতে থাকে করিমন। কাঁদে পাড়াপড়শিরা। ইকামত বুড়োর চোখের জলে দাডি ভিজছে। বারোয়াবী শববাহী খাটে কাঁধ বাঁধাতেই আল্লা রসুলের ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল। গাছের পাতা কাঁপিযে উড়ে গেল আগাম কবরখানার দিকে। পাঁচ মানুষের হেল্লা পেয়ে টালমাটাল পাযে ভিখুও হাঁটতে থাকে। পিছন থেকে দুই মেযে কাঁদন জোডে। ও বাপ্, আমার মেয়েকে চুলোটি গড়িয়ে দিতে চেয়েলে গো—

আমেনার দাবিকে চাপান দিয়ে ফতেমা স্মরণ করায়, আমার ছেলের কোমরে বটফল গডিযে দিতে চেয়েলে বাবা গো-বাবা।

ভিখুর কবরখানাকে সামনে রেখে শববাহী খাটটা নামানো হল। এই বাদরি গ্রাম তো বটেই অন্যান্য গ্রাম থেকে ছুটে আসা অনেক মানুষ হাত পা-ধুয়ে দাঁড়িযে গেল নামাজে জানাজায। চোখের জলে ওজু করছে। জানাজা নামাজে জানানো হবে তার আত্মার সদগতির শেষ আবেদন। এখানেও বলতে হল, তুমাদের কাছে যদি অন্যায় করে থাকি দিল খুলে খালাস দাও।

ডাইনে বাঁয়ে অদৃশ্যে দাঁডিয়ে থাকা ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্যে সালাম জানাতেই জানাজা শেষ হল। আবার তেরালি, মুলুক নামল কবরে। ভিখুর দিকে একবার স্পষ্টাস্পষ্টি তাকাল। অর্থাৎ কবর ঠিক আছে তো? এমন কববে জ্যান্ত মানুষের পাঁচ দণ্ড শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে?

সামনে ঝুঁকতেই থ মেরে গেল ভিখু। অবিকল তার মত কবর খুঁডেছে তেরালি মুলুক। কলার শবটা নিচে নামাতেই বাঁশ-কাঠের উপর পডতে থাকল আঁজলা আঁজলা মাটি। ধপা-ধপ মাটি ফেলার শব্দটা নিজের বুকে অনুভব করল ভিখু। এই মুহূর্তে বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ নেই। তেরালি মুলুকের মত কবুরে মুনিষ তৈরি হযেছে বাদরিতে। বউ করিমনের কাছ থেকে বহুদিনের সম্পর্কের হিসাব-নিকাশ শেষ হয়েছে। তৌবা কলমার আবার কোন পাপ কাজ এই দুনিযায় আর নেই। এই তো টাটকা কবরে শুয়ে আছে ইমান আলি, ফ্যালা, ছকির, তাবারক। ঐ তো এই সন্ধেতে বাদরির আকাশে বকরীদের বাড়ন্ত চাঁদ।

একে একে কবর ছেড়ে উঠে যায় গাঁ-গেরামের মানুষেরা। ভিখু উঠতে পাবে না। সে সমাহিত। প্রাণপণ শক্তিতে দু হাতে কবরের মাটি খামচে শুয়ে থাকে।